বল্‌তই না। কারণ সেই একমাত্র ধর্ম্মপালনের শক্তিকে খর্ব করতে বলা আত্মহত্যা করতে বলা। মূলধনের চেয়ে বড় ধন যদি কোথাও কিছু না থাকে, তা' হ'লে সেটাকে নষ্ট করা বিষম ক্ষতি। কিন্তু লাভের ধন মূলধনের চেয়েও বড় ব'লেই বণিককে সহজেই বলা যায় লোহার সিন্দুকের ভিতরে যে-টাকাটা আছে সেইটেই লোকসান। সেটাকে খরচ ক'রে খাটালেই লাভ।

পশুধর্ম্মের উপরে একটা মানবধর্ম্ম আছে। অর্থাৎ দৈহিক জীবনের চেয়েও বড় জীবন হচ্চে মানুষের। দৈহিক জীবনের প্রবৃত্তি দৈহিক জীবনের শক্তি; এই জন্যে সে শক্তি একান্ত হ'য়ে বড় জীবনকে যখন বাধা দেয় তখন আমাদের মানবধর্ম্ম বলে, "আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ঐ শক্তিটাকে কাটিয়ে ওঠ।" মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে তার আত্মার জীবনটাই তার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় সত্য— অতএব সেই জীবনটাকেই যদি না পাই, না বাঁচাই, তা' হ'লে সেইটেই হবে মানুষের পক্ষে যথার্থ আত্মহত্যা, মহতী বিনষ্টি। এই জন্যেই মানুষ আপন পশুধর্ম্মের মধ্যে আবৃত হ'য়ে থাকাকেই বন্ধন বলে। এরই থেকে আত্মার জীবনে মুক্তি পাবার জন্যে প্রবৃত্তির নাড়ি-বন্ধন সে ছিন্ন করতে চায়। তাই আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার উপদেশ—প্রবৃত্তিকে শাসন কর, মনকে নির্ম্মল কর।

এইগুলি হ'ল নীতি-কথা, এবং নীতি-কথা শুষ্ক। কিন্তু নীতি ত নিজের মধ্যে নিজে সমাপ্ত নয়—নীতির মানেই হচ্চে যাতে ক'রে আমাদের নিয়ে যায়। নীতি যদি বলে আমাতেই শেষ, আমার উর্দ্ধে আর কিছু নেই, তা' হ'লে মানুষের বলবার অধিকার আছে আমি নীতি মানব না। কাউকে যদি বলি পথই পথের লক্ষ্য, পথ কোথ[...] পৌঁছে দেয় না, তাহলে সে লোক পথ চলা বন্ধ কর[...] তাকে দোষ দেওয়া যায় না। নীতি-উপদেষ্টা সেই ভা[...] কথা বলেন ব'লে নীতি-উপদেশ শুষ্কতার চরমে গি[...] পৌঁছয়; এবং মানুষ যদি বলে স্বার্থত্যাগের ক্ষতিকে এ[...] প্রবৃত্তিদমনের শুষ্কতাকে গ্রহণ করব কেন, তার উ[...] পাওয়া যায় না।

কিন্তু বীজকে এই জন্যই বলা যেতে পারে, "তু[...] নিজেকে বিদীর্ণ কর বিলুপ্ত কর" যেহেতু সেই বিলো[...] তার ক্ষয় নয়, তাতেই তার আত্মোপলব্ধি। মানুষ আপন[...] ক্ষুদ্র জীবনের শক্তিকে অতিক্রম করবে আপনারই[...] জীবনের শক্তি লাভ করবার জন্যে। সেই অতিক্রম কর[...] পথই হচ্চে নীতির পথ, বুদ্ধদেব যাকে শীল বলেচেন[...] শীলের পথ। বীজের ভিতরকার গাছের মত মানুষ[...] এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যেতে হবে ব'লেই মাঝখা[...] এত তার দ্বন্দ্ব, এত তার দুঃখ। কিন্তু বড় জীবনকে[...] মানুষ সুনিশ্চিত সত্য ব'লে জেনেচে এই দুঃখের মূল্য দি[...] সে চিন্তা মাত্রও করে না। এই জন্যেই মানুষকে এত[...] বলতে হয় আত্মাকে জান। আত্মাকে সত্য ব'লে জা[...] সেই আত্মাকে প্রকাশ করবার পরম শক্তি নি[...] ম[...] সহজেই আবিষ্কার করি। [...] আত্মাকে সত্য ব[...] জানতে গেলেও তার আবরণ দূর করতে হবে। [...] আবরণকে দূর করবার জন্যেই প্রবৃত্তিকে দমন ক[...] স্বার্থকে ত্যাগ করা। বাধার ভিতর দিয়েও আত্মা[...] যতক্ষণ না সত্য ব'লে নিশ্চিত জানব ততক্ষণ এই কাজ ব[...] কঠিন, যখন সত্য ব'লে জানব তখন এই কাজ আনন্দময়

যোগাযোগ
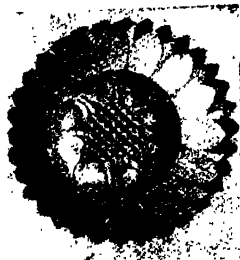
—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১

শোবার ঘরে কুমু মোতির মাকে নিয়ে বসল। কথা কইতে কইতে অন্ধকার হ'য়ে এল, বেহারা এলো আলো জ্বালতে, কুমু নিষেধ ক'রে দিলে।

কুমু সব কথাই শুনলে; চুপ ক'রে রইল।

মোতির মা বললে, "বাড়িকে ভূতে পেয়েচে বৌরাণী। ওখানে টিঁকে থাকা দায়, তুমি কি যাবে না?"

"আমার কি ডাক পড়েচে?"

"না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চল্‌বেই না।"

"আমার কি করবার আছে? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত করতে পারব না। ভেবে দেখতে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পারলেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কি করব?"

"বলো কি বৌরাণী, সংসার যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হ'লে চল্‌বে না।"

"সংসার বলতে কি বোঝো ভাই? ঘর দুয়োর, জিনিষ পত্র, লোকজন? লজ্জা করে এ কথা বলতে যে, তাতে আমার অধিকার আছে। মহলে অধিকার খুইয়েচি, এখন কি ঐ সব বাইরের জিনিষ নিয়ে লোভ করা চলে?"

"কি বলচ ভাই, বৌরাণী? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না?"

"সব কথা ভালো ক'রে বুঝতে পারচিনে। আর কিছু-দিন আগে হ'লে ঠাকুরের কাছে সঙ্কেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধোতে যেতুম। কিন্তু আমার সে সব ভরসা ধুয়ে মুছে গেছে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাট্‌ল না। আজ কতবার ব'সে ব'সে ভেবেচি দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না। তবুও মনের মধ্যে যে দেব-তাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেচে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারিনে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।"

"তোমার কথা শুনে যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না?"

"কোনো কালেই যাব না সে কথা ভাবা শক্ত, যাবও সে কথাও সহজ নয়।"

"আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা ব'লে দেখব। দেখি তিনি কি বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো?"

"চলনা, এখনি নিয়ে যাচ্চি।"

বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকেই তার চেহারা দেখে মোতির মা থম্‌কে দাঁড়ালো, মনে হোলো যেন ভূমিকম্পের পরেকার আলো-নেবা চূড়া ভাঙা মন্দির। ভিতরে একটা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিয়ে মেজের উপর বসল।

বিপ্রদাস ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "এই যে চৌকি আছে।"

মোতির মা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, এখানে বেশ আছি।"

ঘোমটার ভিতর থেকে তার চোখ ছলছল করতে লাগল। বুঝতে পারলে দাদার এই অবস্থায় কুমুকে ব্যথাই বাজ্‌চে।

কুমু প্রসঙ্গটা সহজ ক'রে দেবার জন্যে বল্‌লে, "দাদা, ইনি বিশেষ ক'রে এসেচেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।"

মোতির মা বল্‌লে, "না, না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেচি ওঁর চরণ দর্শন করতে।"

কুমু বল্‌লে, "উনি জান্‌তে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কিনা।"

বিপ্রদাস উঠে বস্‌ল; বললে, "সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাকবে কি ক'রে?" যদি ক্রোধের সুরে বলত তা' হ'লে কথাটার ভিতরকার আগুন এমন ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ত না। শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

মোতির মা ফিস ফিস ক'রে কি বল্‌লে। তার অভিপ্রায় ছিল পাশে ব'সে কুমু তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে। কুমু সম্মত হোলো না, বললে, "তুমিই গলা ছেড়ে বলো।"

মোতির মা স্বর আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল্‌লে, "যা ওঁর আপনারি, কেউ তাকে পরের ক'রে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক্ না।"

"সে কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। ওঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া করলে হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। যত শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হোত।"

এমন কথার কি জবাব দেবে মোতির মা ভেবে পেলে না। স্বামীর আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘটলে মেয়ের পক্ষের লোকেরাই তো পায়ে ধরাধরি করে, এ যে উল্টো কাণ্ড।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "কিন্তু আপন সংসার না থাক্‌লে মেয়েরা যে বাঁচে না, পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাইতো।"

"স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে ব'লে দিচ্চি কুমুকে যিনি গড়েচেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা ক'রে গড়েচেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্ত্তী সম্রাটেরও না।"

কুমুকে মোতির মা খুবই ভালো বাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এত মূল্য থাকতে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে এ কথা মোতির মার কানে ঠিক লাগল না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর অপমানও না হয় যথেষ্ট ঘটল, এমন কি তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে স্ত্রী আফিম্ খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই ব'লে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাক্‌বে এটাকে মোতির মা স্পর্দ্ধা ব'লেই মনে করে। মেয়ে জাতের এত গুমর কেন! মধুসূদন যত অযোগ্য হোক, যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষ মানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা ক'রে জিতবে কে?

মোতির মা বল্‌লে, "একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।"

"যেতে হবেই এ কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে খাটে না।"

"মন্ত্র প'ড়ে স্ত্রী যে কেনা হ'য়েই গেছে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হ'ল সেদিন সে যে দেহে মনে বাঁধা পড়ল, তার তো আর পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হ'য়ে যখন জন্মেচি তখন এ জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।"

বিপ্রদাস বুঝ্‌তে পার্‌লে মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সব চেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এই জন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে ব'সে আছে। তার পরে কেবলি মর্‌চে ভয়ে, কেবলি মর্‌চে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলি খাচ্চে মার, আর মনে করচে সেইটে নীরবে সহ্য করতেই স্ত্রী-জন্মের সর্ব্বোচ্চ চরিতার্থতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

না,—মানুষের এত লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্চে।

বিপ্রদাসের খাটের পাশেই মেজের উপর কুমু মুখ নীচু ক'রে ব'সে ছিল। বিপ্রদাস মোতির মাকে কিছু না ব'লে কুমুর মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে, "একটা কথা তোকে বলি, কুমু, বোঝবার চেষ্টা করিস্‌। ক্ষমতা জিনিষটা যেখানে প'ড়ে পাওয়া জিনিষ, যার কোন যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোন প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলি হীনতার সৃষ্টি করে। এ কথা তোকে অনেকবার বলেচি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েছিস্‌। তুই যখন বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণভোজন করাতিস্ কোন দিন বাধা দিই নি, কেবল বার বার বোঝাতে চেষ্টা করেচি, অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক'রে নেওয়ার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে ক'রে সমাজের শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এ রকম অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েচিস, বুঝতে পার্‌চিস নে, এই রকম যত দল-গড়া শাস্ত্রগড়া নির্ব্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেচে। যত সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেচে, তারি বাসা ভাঙবার দিন এলো।"

কুমু মাথা নীচু ক'রেই বল্‌লে, "দাদা, তুমি কি বলো স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে?"

"অন্যায় অতিক্রম কর' মাত্রকেই দোষ দিচ্চি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না—এই আমার মত।"

"যদি করে, স্ত্রী কি তাই ব'লে—"

কুমুর কথা শেষ না হ'তেই বিপ্রদাস বল্‌লে, "স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে ক'রে অন্যায় করা হবে। এমনি ক'রে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জ'মে উঠেচে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েচে।"

মোতির মা একটু অধৈর্য্যের স্বরেই বল্‌লে, "আমাদের বউরাণী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ কর্‌তেও পারে না।"

বিপ্রদাসের কণ্ঠ এইবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ল, "তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবচ। আর যে কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান কর্‌বার অধিকার পেয়ে সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্চে তার দুর্গতির কথা ভাবচ না কেন?"

কুমু তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, "দাদা, তুমি আর কথা কোয়োনা। তুমি যাকে মুক্তি বলো, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারিনে। যতই ঘা খাই ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জানো তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালই হোক আর মন্দই হোক, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারিনে।"

বিপ্রদাস বল্‌লে, "সেই জন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পূজারিণীর অভাব হয় না। তারা জানবার বেলা অপবিত্রকে অপবিত্র ব'লেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো ক'রেই মানে।"

কুমু বল্‌লে, "কি করবো দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে ব'লেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁক্‌ড়ে ধরি, শুক্‌নো কুটোকেও। গুরুকেও মান্‌তে আমাদের যতক্ষণ লাগে—ভণ্ডকে মান্‌তেও ততক্ষণ। জাল যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে? সেই জন্যেই ভাবি দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাইতো মেয়েরা এতো ক'রে ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে থাকে।"

বিপ্রদাস কিছুই বললে না, চুপ ক'রে ব'সে রইল।

সেই ওর চুপ ক'রে ব'সে থাকাটাও কুমুকে কষ্ট দিলে। কুমু জানে কথা বলার চেয়েও এর ভার অনেক বেশি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোতির মা কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ঠিক করলে বৌরাণী?"

কুমু বললে, "যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।"

মোতির মা মনে মনে কিছু বিরক্তই হোলো। শ্বশুর বাড়ীর প্রতি ওর শ্রদ্ধা যে বেশী তা নয়, তবু শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ব-বোধ ওর হৃদয়কে অধিকার ক'রে আছে। সেখানকার কোনো বউ যে তাকে লঙ্ঘন করবে এটা তার কিছুতেই ভালো লাগ্‌লো না। কুমুকে যা বল্‌লে তার ভাবটা এই, পুরুষ মানুষের প্রকৃতিতে দরদ কম আর তার অসংযম বেশি, গোড়া থেকেই এটা তো ধরা কথা। সৃষ্টি তো আমাদের হাতে নেই, যা পেয়েচি তাকে নিয়েই ব্যবহার করতে হবে। "ওরা ঐ রকমই" ব'লে মনটাকে তৈরি ক'রে নিয়ে যেমন ক'রে হোক সংসারটাকে চালানোই চাই। কেন না—সংসারটাই মেয়েদের। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক সংসারটাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হ'লে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমু হেসে বল্‌লে, "না হয় তাই হোলো। মরণের অপরাধ কি?"

মোতির মা উদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "অমন কথা বোলো না।"

কুমু জানে না, অল্পদিন হোলো ওদেরই পাড়াতে একটি সতেরো বছরের বউ কার্বলিক এসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার এম্ এ পাশ করা স্বামী—গবর্মেণ্ট আপিসে বড় চাকরী করে। স্ত্রী খোঁপায় গোঁজবার একটা রূপোর চিরুনি হারিয়ে ফেলেচে, মার কাছ থেকে এই নালিশ শুনে লোকটা তাকে লাথি মেরেছিল। মোতির মার সেই কথা মনে প'ড়ে গায়ে কাঁটা দিলে।

এমন সময় নবীনের প্রবেশ। কুমু খুসি হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "জানতুম ঠাকুরপোর আস্‌তে বেশি দেরি হবে না।"

নবীন হেসে বল্‌লে, "ন্যায় শাস্ত্রে বৌরাণীর দখল আছে। আগে দেখেছেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তার থেকে শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব করতে শক্ত ঠেকেনি।"

মোতির মা বল্‌লে, "বৌরাণী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেচ। ও বুঝে নিয়েচে ওকে দেখ্‌লে তুমি খুসি হও, সেই দেমাকে—"

"আমাকে দেখ্‌লেও খুসি হ'তে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেচেন তিনিও নিজেই হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেচেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

"ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে মিলে কথা কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, আমি এখন চল্‌লুম।"

মোতির মা বল্‌লে, "সে কি কথা ভাই! এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে? তুমি না আমি? গাড়ি ভাড়া ক'রে ও কি আমাকে দেখ্‌তে এসেচে ভেবেচ?"

"না, ওঁর জন্যে খাবার ব'লে দিই গে।" ব'লে কুমু চ'লে গেল।

৫২

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু খবর আছে বুঝি?"

"আছে। দেরি করতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। তুমি তো চ'লে এলে, তার পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। মেজাজটা খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা গিল্‌ট করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সম্প্রতি যাঁর অধিকারে সেটা এসেচে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে সোনা ব'লেই ঠাউরেচেন, নইলে পরকাল খোওয়াতে যাবেন কোন্ সাধে। জানো তো তুচ্ছ একটা জিনিষ ন'ড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিৎটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে ব'লে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক করেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেরে রাখব। এমন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা একদমে আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। বল্‌লেন, এখনকার মতো থাক্‌। যেই ঘর থেকে বেরতে যাচ্চেন, আমার ডেস্কের উপর বৌরাণীর সেই ছবিটি চোখে পড়ল। থম্‌কে গেলেন। বুঝলুম আড় চাহনিটাকে সিধে ক'রে নিয়ে ছবিটিকে দেখ্‌তে দাদার লজ্জা বোধ হচ্চে। বল্‌লুম, দাদা একটু বোসো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মার ছোট ভাজের সাধ, তাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্চে ব'লে বোধ হচ্চে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তার দাম হ'তে পারে। খুব বেশি হয় তো ন টাকা সাড়ে ন টাকার মধ্যেই হওয়া উচিত।"

মোতির মা অবাক হ'য়ে বল্‌লে, "ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এল? আমার ছোট ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তার কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে বল্‌তে তোমার আজকাল দেখচি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?"

"যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েচেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থেকে।"

"বীণাপাণি তোমাকে যতক্ষণ না ছাড়েন ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা যে দায় হবে।"

"পণ করেচি, স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন ক'রে যাব, বৌরাণীর চরণে এই আমার দান।"

"কিন্তু সাড়ে ন টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তখনি তখনি তোমার জুটল কোথায়?"

"কোথাও না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এসে বল্‌লুম, গণেশরাম সে কাপড় আমাকে না ব'লেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধরেচে। কি জানি কেন, পৃথিবীতে আমারি কাছে দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারো হ'লে ছবিটা ধাঁ ক'রে তুলে নিতে তাঁর বাধত না।"

"তুমিও তো লোভী কম নও। দাদাকে না হয় সেটা দিতেই।"

"তা দিয়েচি, কিন্তু সহজ মনে দিইনি। বল্লেম, দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েল পেন্টিঙ করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না? দাদা যেন উদাসীন ভাবে বললে, 'আচ্ছা দেখা যাবে।' ব'লেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চ'লে গেল। তার পরে কি হোলো ঠিক জানিনে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয়নি, আর ঐ ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখিনে।"

"তোমার বৌরাণীর জন্যে স্বর্গটাই খোওয়াতে যখন রাজি আছ, তখন না হয় একখানা ছবিই বা খোওয়ালে।"

"স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিল না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল, ঠিক সেই শুভ যোগটি ঐ ছবিতে ধরা প'ড়ে গেছে। এক একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ঐ ছবিটি দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরো বেশি ক'রে দেখা যায়।"

"দেখ, আমার কাছে অত বাড়াবাড়ি করতে তোমার একটুও ভয় নেই?"

"ভয় যদি থাকত তা হ'লেই তোমার ভাবনার কথাও থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য্য কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হ'ল কি ক'রে? আমি যে ওঁকে বৌরাণী বলতে পারচি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসি মুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এত সহজ হোলো কি ক'রে? আমাদের পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগ্য আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন ক'রে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।"

"বাস্‌রে, বৌরাণীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।"

"মেজ বৌ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে।"

"না, কখখনো না।"

"হাঁ অল্প একটু! কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নূরনগরে ষ্টেশনে প্রথম বৌরাণীর দাদাকে দেখে যে সব কথা বলেছিলে চলতি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ওসব তর্ক থাক, এখন কি বলতে চাচ্ছিলে বলো।"

"আমার বিশ্বাস আজকালের মধ্যেই দাদা বৌরাণীকে ডেকে পাঠাবেন। বৌরাণী যে এত আগ্রহে বাপের বাড়ি চ'লে এলেন, আর তার পর থেকে এতদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হয়েচে তা জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখীর কেন লোভ নেই। নির্ব্বোধ পাখী, অকৃতজ্ঞ পাখী।"

"তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান না। সেই কথাই তো ছিল।"

"আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বৌরাণী যদি যান ভালো হয়, দাদার ঐটুকু অভিমানের না হয় জিৎ রইল। তা ছাড়া বিপ্রদাস বাবু তো চান বৌরাণী তাঁর সংসারে ফিরে যান, আমিই নিষেধ করেছিলুম।"

বিপ্রদাসের সঙ্গে এই নিয়ে আজ কি কথা হয়েচে মোতির মা তার কোনো আভাস দিলে না। বল্‌লে, "বিপ্রদাস বাবুর কাছে গিয়ে বলই না।"

"তাই যাই, তিনি শুন্‌লে খুসি হবেন।"

এমন সময় কুমু দরজার বাইরে থেকে বল্‌লে, "ঘরে ঢুক্‌ব কি?"

মোতির মা বল্‌লে, "তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।"

"জন্ম জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।"

"আঃ ঠাকুরপো, এত কথা তুমি বানিয়ে বল্‌তে পারো কি ক'রে?"

"নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, বুঝতে পারিনে।"

"আচ্ছা, চল এখন খেতে যাবে।"

"খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা ক'য়ে আসিগে।"

"না, সে হবে না।"

"কেন?"

"আজ দাদা অনেক কথা বলেচেন, আজ আর নয়।"

"ভালো খবর আছে।"

"তা' হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।"

"কাল হয়তো ছুটি পাব না, হয়তো বাধা ঘটবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুসি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।"

"আচ্ছা আগে তুমি খেয়ে নাও, তার পরে হবে।"

খাওয়া হয়ে গেলে পর কুমু নবীনকে বিপ্রদাসের ঘরে নিয়ে এল। দেখলে দাদা তখনো ঘুমোয়নি। ঘর প্রায় অন্ধকার, আলোর শিখা ম্লান। খোলা জানালা দিয়ে তারা দেখা যায়; থেকে থেকে হুহু ক'রে বইচে দক্ষিণের হাওয়া; ঘরের পর্দ্দা, বিছানার ঝালর, আলনায় ঝোলানো বিপ্রদাসের কাপড় নানারকম ছায়া বিস্তার ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে, মেজের উপর খবরের কাগজের একটা পাতা যখন তখন এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্চে। আধ-শোওয়া অবস্থায় বিপ্রদাস স্থির হ'য়ে ব'সে। এগোতে নবীনের পা সরে না। প্রদোষের ছায়া আর রোগের শীর্ণতা বিপ্রদাসকে একটা আবরণ দিয়েচে, মনে হচ্চে ও যেন সংসার থেকে অনেক দূর, যেন অন্য লোকে। মনে হোলো ওর মত এমনতরো একলা মানুষ আর জগতে নেই!

নবীন এসে বিপ্রদাসের পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌লে, "বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে চাইনে। একটি কথা ব'লে যাব। সময় হয়েচে, এইবার বৌরাণী ঘরে ফিরে আসবেন ব'লে আমরা চেয়ে আছি।"

বিপ্রদাস কোনো উত্তর করলে না, স্থির হ'য়ে ব'সে রইল।

খানিক পরে নবীন বল্‌লে, "আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।"

ইতিমধ্যে কুমু ধীরে ধীরে দাদার পায়ের কাছে এসে বসেচে। বিপ্রদাস তার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে বল্‌লে,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মনে যদি করিস তোর যাবার সময় হয়েচে তা হ'লে যা, কুমু।"

কুমু বল্‌লে, "না, দাদা, যাব না।" ব'লে বিপ্রদাসের হাঁটুর উপর উপুড় হ'য়ে পড়ল।

ঘর স্তব্ধ, কেবল থেকে থেকে দমকা বাতাসে একটা শিথিল জানালা খড় খড় করচে, আর বাইরে বাগানে গাছের পাতাগুলো মর্ম্মরিয়ে উঠ্‌চে।

কুমু একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনকে বল্‌লে, "চলো আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।"

মোতির মা বাড়িতে ফিরে এসে বল্‌লে, "এতটা কিন্তু ভালো না।"

"অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেম্‌নি হোক না, চোখটা রাঙা হ'য়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।"

"না গো, না, ওটা ওদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবার উপরে।"

"মেজ বৌ, এতবড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।"

"তাই ব'লে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হবে?"

"আত্মীয়স্বজন বল্‌লেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধ'রে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার সঙ্কোচ হয়।"

"যিনি যত বড়ো লোকই হোন্ না কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।"

নবীন বুঝতে পারলে এই আলোচনার মধ্যে কুমুর পরে মোতির মার একটুখানি ঈর্ষার ঝাঁজও আছে। তা ছাড়া এটাও সত্যি, পারিবারিক বাঁধনটার দাম মেয়েদের কাছে খুবই বেশি। তাই নবীন এ নিয়ে বৃথা তর্ক না ক'রে বল্‌লে, "আর কিছুদিন দেখাই যাক্ না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।"

(ক্রমশঃ)
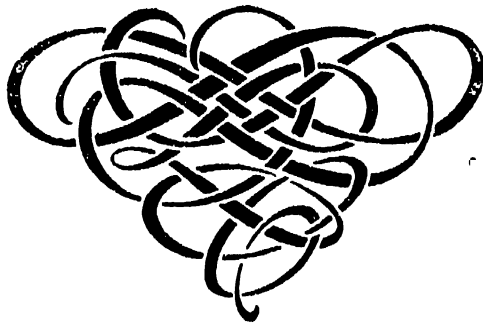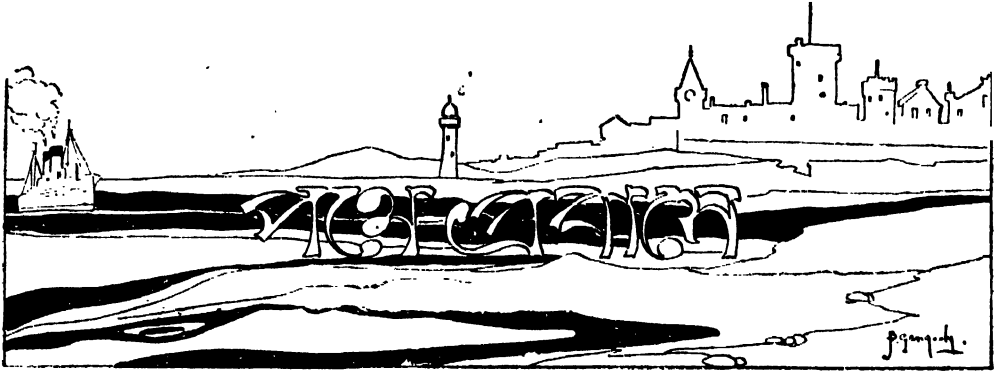
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১৫

যতগুলো রাজপ্রাসাদ দেখ্‌লুম তাদের কোনোটাই মনে ধর্‌ল না, কেননা কোনোটাই যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ নয়। পোষাকে—প্রাসাদে—যানে—বাহনে—বেগমে—গোলামে আমাদের রাজ রাজড়ারাই দুনিয়ার সেরা। আগ্রা দিল্লি লক্ষ্ণৌ বেনারসের সঙ্গে ভার্সেলস্ ভিয়েনা মিউনিক বুডাপেষ্টের এইখানেই হার যে রাজাতে প্রজাতে ভারতবর্ষে যেমন আস্‌মান জমীন্ ফরক্, সম্ভবত এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও তেমন ছিল না। আমরা ধাতে এক্‌সট্রীমিষ্ট্। আমরা রাজ বাদ্‌শা ও ভিখারী ফকির ছাড়া কারুকে সম্মান করিনে। তাই আমাদের দেশে ভোগের নামে লোকে মূর্চ্ছা যায়, ভাবে না জানি কোন রাজা রাজড়ার মতো ভোগ কর্‌তে গিয়ে ভিখারীতে সমাজ ভরিয়ে দেবে! আর ত্যাগের নাম কর্‌লে ধড়ে প্রাণ আসে,—হাঁ, সমাজের পাঁচজনের উপরে লোকটার দরদ আছে বটে। দেখ্‌ছো না, আমাদেরি জন্যে উনি কৌপীন ধর্‌লেন! "অধমতারণ পতিতপাবন জয় আমাদের—"ইত্যাদি।

ভোগের আড়ম্বর ও ত্যাগের আড়ম্বর বোধহয় কেবল ভারতবর্ষের নয়, প্রখর সূর্য্যালোকিত দেশগুলির দুর্ভাগ্য। ঈজিপ্টে ও গ্রীসে সমাজের একটা ভাগ দাসত্ব করেছে, অপর ভাগ সেই দাসত্বের উপরে পিরামিড্ খাড়া করেছে। অতটা এক্‌সট্রীমিজ্‌ম্ প্রকৃতির সহ্য হয় না—ঈজিপ্ট্ ও গ্রীস্ ট'লে পড়েছে। দাসও মরেছে, দাসের রাজাও। ভারতবর্ষেও কোনো একটা রাজবংশ দু'চার পুরুষের বেশী টেঁকেনি, যত বিজেতা এসেছে সবাই দু'চার পুরুষ পরে বিজিত হয়েছে। ইংরেজের বেলা এর ব্যতিক্রম হ'লো, কেননা ইংরেজ ভারতবর্ষের জল-হাওয়া কিম্বা ধাত কোনোটাকেই স্বীকার করেনি, ইংরেজ দূর থেকে শাসন করে এবং ঘরের প্রভাববশত মনে প্রাণে নাতিশীতোষ্ণ থাকে। ইংরেজের temper গরমও নয়, নরমও নয়; অসহিষ্ণুও নয়, সহিষ্ণুও নয়। ইংরেজ আশ্চর্য্য রকম মধ্যপন্থী। তবে এও ঠিক যে ইংরেজ অত্যন্ত বেশী মাঝারি। এই মাঝারিত্বকে লোকে গালাগাল দিয়ে বলে conservatism; আসলে কিন্তু ইংরেজের conservatism স্থাণুত্ব নয়, ধীরে সুস্থে চলা, slow but sure—কচ্ছপ-গতি। সূর্য্যের আলোর মদে মাতাল ফরাসীরা কতকটা আমাদেরি মতো এক্‌সট্রীমিষ্ট্, তাই তারা সুদীর্ঘ কাল মহাশয়ের মতো যাই সওয়াবে তাই সয়, অবশেষে একদিন এট্‌না আগ্নেয়গিরির মতো অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আবার চুপচাপ ব'সে মদে চুমুক দেয়। তার ফলে খরগোসকে ছাড়িয়ে কচ্ছপ এগিয়ে যায়।

তবে ফরাসী বলো জার্ম্মান বলো ইংরেজ বলো—কেউ আমাদের মতো ছোটতে বড়তে আস্‌মান জমীন ব্যবধান ঘট্‌তে দেয় না, সময় থাক্‌তে প্রতীকার করে। এই যে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

সোশ্যালিষ্ট্ মুভ্‌মেণ্ট্. এটার মতো মুভ্‌মেণ্ট্ প্রতি শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি দেশে দেখা দিয়েছে। আজ যদি এ মুভ্‌মেণ্ট্ অতি বৃহৎ হ'য়ে থাকে তবে যার বিরুদ্ধে এ মুভ্‌মেণ্ট্ সেও আজ অতি বৃহৎ হ'য়ে উঠেছে। সমাজের একটা পা আজ বিপর্যায় লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে ব'লেই অপর পা'টা বিপর্য্যয় লাফ দিয়ে সঙ্গ রাখ্‌তে ব্যগ্র। ইউরোপের ধনীরা আজকের এই উন্মুক্ত পৃথিবী থেকে যে প্রচুর ধন আহরণ ক'রে ঘরে আন্‌ছে, ইউরোপের শ্রমিকরা সেই প্রচুর ধনেরই একটা সমানানুপাত বণ্টন চায়।

ইংরেজ নিজে পাঁউরুটিটা মাছটা খেয়ে আমাদের ছিব্‌ড়েটা কাঁটাটা ফেলে দেয় ব'লে আমাদের একটা মস্ত অভিমান আছে। এ অভিমানটা যে এক হাজার বছর আগেও ছিল এর প্রমাণ তখনকার দিনেও আমাদের দেশে বৈরাগ্যাভিমানী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা যে ভাগ বৃহৎ ব্যবধান সইতে না পেরে সুতো-ছেঁড়া ঘুঁড়ির মতো আকাশে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। এরা ধনীলোকের ধনভার লাঘব ক'রে দরিদ্রের দারিদ্র্যতার লাঘব করেনি, কেননা সেজন্যে অনেক দুঃখ ভুগ্‌তে হয় এবং কোনোদিন সে ভোগের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাদ্যন্ত এই যে সাধনা এই ভার সাম্যের সাধনায় প্রকৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসী যোগ দেয় না, সে চিরকালের মতো সিদ্ধি চায়। যে জগতে প্রতিদিন বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র ভাঙ্‌ছে, মহাশূন্যের গর্ভে বড় বড় নৌকাডুবি ঘট্‌ছে, প্রতিদিন ছোট ছোট অনুপরমাণু থেকে নব নব গ্রহ নক্ষত্র গ'ড়ে উঠ্‌ছে, ছোট ছোট প্রবালকীট মিলে অপূর্ব্ব প্রবালদ্বীপ গেঁথে তুল্‌ছে—এই প্রতিদিনের খেলাঘরে সন্ন্যাসীকে কেউ পাবে না। সে তার কাঁথা-কম্বল ছাল-বল্কল আঁকড়ে ধ'রে বিরাগী হয়ে গেছে। এদিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রাণী মক্ষিকার সংখ্যা বাড়্‌ছে এবং দাসমক্ষিকাদের ক্রন্দনগুঞ্জনে সংসারচক্র মুখর হ'লো। প্রাসাদে আর কুটীরে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত্ত্য নয়, একাধারে স্বর্গ—পাতাল। আল্‌প্‌স পর্ব্বত ও ভূমধ্য সাগর সহ্য হয়, কেননা উঁচু নীচু হ'লেও তাদের ব্যবধান দুরতিক্রম নয়, কিন্তু হিমালয় পর্ব্বত ও ভারতসাগর সহ্য হয় না। উপরে ত্রিশ হাজার ফিট্ ও নীচে বিশ হাজার ফিট্—পঞ্চাশ হাজার ফিটের ব্যবধান দুরতিক্রম। ভারতবর্ষের রাজা মহারাজারা যে চালে থাকেন ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষা মজুররা যে চালে থাকে ইউরোপের ভিখারীদের পক্ষেও তা দুঃস্বপ্ন। এবং এই ব্যাপার খুব সম্ভব হাজার হাজার বছর থেকে চ'লে আস্‌ছে। কেননা আমরা চিরকাল In-temperate Zone-এর লোক। আর আমাদের দেশটাও চিরকাল এত বেশী উঁচু নীচু যে আমাদের চোখে জীবনের বিশ্রীরকম উঁচু নীচুও একটা সহজ উপমার মতো স্বাভাবিক ঠেকে।

রাজপ্রাসাদগুলি পরিদর্শন করবার সময় লক্ষ্য করেছি সেগুলি কেবল রাজপ্রাসাদ নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর দুঃখ সুখের নীড়—এক-একটি "home"। ইংরেজী "home" কথাটির ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই, কেননা "home" কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের কাঠ-পাথরে রূপান্তরিত প্রেম। ইংরেজ যুবক যখন বিবাহ করে তখন তার স্ত্রী তার কাছে এমন একটি গুহা প্রত্যাশা করে যেখানে সে সিংহীর মতো স্বাধীন, যেখানে তার স্বামী পর্য্যন্ত তার অতিথি, শাশুড়ী শ্বশুর জা দেবর তার পক্ষে ততখানি দূর, শাশুড়ী শ্বশুর শ্যালক শ্যালিকা তার স্বামীর পক্ষে যতখানি। গুহার বাইরে তার স্বামীর এলাকা, গুহার ভিতরে তার নিজের ; কেউ কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। বাড়ীতে একটা চাকর বাহাল করবার অধিকারও স্বামীর নেই, কিম্বা চাকরকে জবাব দেবার। বাজার করাটাও স্ত্রীর এলাকা, কেবল দাম দেবার বেলা স্বামীকে ডাক পড়ে। এক আফিসে এবং ক্লাবে ছাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না, আস্‌বাবের দোকানে গহনার দোকানে পোষাকের দোকানে ধোপার বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের ইস্কুলে বাড়ীওয়ালার কাছে নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে পার্টিতে নাচে সর্ব্বত্র স্ত্রীর বৈজয়ন্তী। এ সমস্তই "home"এর এলাকায় পড়ে। অতএব "home"কে আপনারা কেউ চারখানা দেয়াল ও একখানা সীলিং ঠাওরাবেন না। ছেলের দোল্‌না থেকে ছেলের বাপের

খাবার টেবিল্ পর্য্যন্ত যাঁর রাণীত্ব তিনি সুগৃহিণী নন্, সমাজে তাঁর নিন্দা, তিনি কুণো। গির্জ্জায়, চ্যারিটি bazaarএ, সমাজসেবার সব আয়োজনে যাঁর হাত (বা হস্তক্ষেপ) তিনিই সুগৃহিণী !

এত যদি স্ত্রীর অধিকার তবে feminismএর ঝড় উঠ্লো কেন? কারণ industrial revolutionএর ফলে সমাজে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে, ছেলেরা সারাজীবন দেশ দেশান্তরে ঘুরছে, মেয়েরা "home" করবে কাকে নিয়ে? "Home"এর মধ্যে একটা স্থায়িত্বের ভাব আছে, স্থানিক স্থায়িত্ব না হ'ক্, সাময়িক স্থায়িত্ব। প্রেম স্থায়ী না হ'লে "home" হয় না। স্বামী স্ত্রী ঠাঁই-ঠাঁই হ'লেও ভাবনা ছিল না, দুজনের হৃদয়ও যে ঠাঁই-ঠাঁই হ'তে আরম্ভ করেছে। আমরা হ'লে বল্তুম, দুয়ো-সুয়ো চলুক্ না? অন্ততঃ সদর মফঃস্বল? মুস্কিল এই যে, এতটা পতিব্রতা হ'তে এদেশের মেয়েরা এখনো শিখ্লো না। সুয়োকে কোথায় বোন ব'লে আপনার ক'রে নেবে ও স্বামীর শয্যায় পাঠিয়ে দেবার পার্ট্ প্লে করবে—তা নয়, আরে ছি ছি, রাম রাম, স্বামীদেবতাকে বিগ্যামীর অপরাধে পুলিশে দেয়! আর মফঃস্বলের খবর পেলে, একেবারে ডাইভোর্স্ কোর্ট্—ধিক্! এরি নাম নাকি সভ্যতা !

ইংরেজ—জার্ম্মান—স্কাণ্ডিনেভিয়ান মেয়েরা নিজের পাওনা গণ্ডাটি চিরকাল বুঝে নিয়েছে। অতীতকালে এরা স্বামীকে বলেছে, তোমাকেই আমি চিনি, তোমার মা-বাবাকে না। তাই এদের স্বামীরা পিতৃ-পিতামহের সনাতন ট্রাইব্ ছেড়ে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে ফ্যামিলী সৃষ্টি করেছে—ফ্যামিলী ও পরিবার এক কথা নয়, যেমন "home" ও গৃহ এক কথা নয়। এই মজ্জাগত পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার স্বভাব থেকেই বর্ত্তমানকালে feminismএর উৎপত্তি। এর মূল সুরটি এই যে, "home"এর দায়িত্ব যখন তোমরা স্বীকার করছো না তখন আমরাও স্বীকার করবো না, তোমরা মুক্ত হও তো আমরাও মুক্ত হই।" আপনারা বল্বেন, সহিষ্ণুতাই নারীর ধর্ম্ম, মা বসুমতী কত সইছেন! কিন্তু ম্লেচ্ছ মেয়েরা এত বড় তত্ত্বকথাটা বোঝে না, তাই তাদের স্বামীদের পদভারে মা বসুমতী টলমল, এবং তাদের পদভারে তাদের স্বামীরা শিবের মতো চীৎপাত।

ভিয়েনার রাজপ্রাসাদগুলিতে মেরিয়া থেরেসার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। অপরাপর রাজপ্রাসাদে রাণীর ব্যক্তিত্বের চেয়ে বাড়ীর রাণীত্বই লক্ষ্য কর্বার বিষয়। রাণী বল্তে অসপত্ন রাণী বুঝ্তে হবে—এবং জা-শাশুড়ী-হীন। এবং সামাজিক প্রাণী। দিল্লি—আগ্রা—ফতেপুর সিক্রীতে বেগমের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন-বিশেষ যদি বা দেখা যায় তবু ও সব রাজপ্রাসাদকে "home" মনে কর্তে পারিনে। এবং সামাজিক প্রাণী হিসাবে বেগমদের অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের পাঁচজন পুরুষ তাঁদের চোখে দেখেননি, তাঁদের আতিথ্য পাননি; রাজন্যশ্রেণীর পাঁচজন পুরুষ তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ কর্তে পারেননি, দু'দণ্ড নাচ্বার আস্পর্দ্ধা রাখেন নি। বাঁদী ও বান্দায় ভরা বিশাল বেগমমহলে বাদ্শা মাসে একবার পূর্ণচন্দ্রের মতো উদয় হন্, পুত্রকন্যারা মা-বাবার সঙ্গে দু'বেলা আহার কর্বার সৌভাগ্য না পেয়ে দাস দাসীর প্রভাবে বাড়েন। এমন গৃহকে গৃহিণীর সৃষ্টি বল্তে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাচ্য রাজ-প্রাসাদ আড়ম্বরে অপ্সরাপুরীর মতো হ'য়েও দুঃখে সুখে নীড়ের মতো নয়। এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, লুই-রাজার বা নেপোলিয়নেরও মফঃস্বল ছিল, কিন্তু সেটা নিপাতন ও সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। বস্তুত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে রাজার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এক নয়। আমাদের রাজারা সমাজের আইন-কানুনের উপরে, তাঁরা সমাজহীন। এদের রাজারা সামাজিক মানুষ, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পোপের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজা ও প্রজা উভয়েই চালিত হোতো। ইংলণ্ডের রাজা চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড ও পার্লামেণ্টের কাছে এতটা দায়ী যে যে তাঁর বিবাহ বা বিবাহচ্ছেদ পর্য্যন্ত সমাজের এই দুটি হাতে। রাশিয়ার অত বড় স্বেচ্ছাচারী জারও স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্ব্বার বিবাহ কর্তে পার্তেন না কিম্বা সুয়োরাণীর ছেলেকে রাজ্যাধিকার দিয়ে যেতে পার্তেন না। সে-ক্ষেত্রে তিনি গ্রীক্ চার্চ্চের নির্দ্দেশসাপেক্ষ। তবে এও অস্বীকার কর্‌ছিনে যে পোপ বা প্যাট্রিয়ার্করা মাঝে মাঝে ঘুষ খেয়ে ছাড়পত্র লিখে দিতেন না। কিন্তু সেটা নিপাতন ও তার বিরুদ্ধে সমাজের বিবেক চিরদিন বিদ্রোহ করেছে। প্রোটেষ্টাণ্টিজম তো এই জাতীয় একটা বিদ্রোহ।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ওটাও আধুনিক সোশ্যালিষ্ট মুভ্‌মেণ্ট বা এর আগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই মতো মানুষে মানুষে দুরতিক্রম ব্যবধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আস্‌বাব-শিল্পের জন্যে ভিয়েনার খ্যাতি আছে। এই মুহূর্ত্তে ইউরোপের সর্ব্বত্র আস্‌বাব-শিল্পের বিপ্লব চ'লেছে। কোলোনে মিউনিকে ও ভিয়েনায় নতুন ধরণের ঘর ও নতুন ধরণের আস্‌বাবের কত রকম নমুনা দেখা গেল। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মাঝখান থেকে আর্থিক ব্যবধান ঘুচে গেছে। চাষা-মজুরদের অবস্থার যতটা উন্নতি হয়েছে মধ্যবিত্তদের অবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি। কাজেই দুই শ্রেণীর জন্যে অল্প দামের মধ্যে মজবুত অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক বাড়ী ও আস্‌বাব দরকার হয়েছে লাখে লাখে। যার যে নমুনা পছন্দ হয় সে অবিলম্বে জিনিষটি পায়। Large scale productionএর নীতি অনুসারে খরচ বেশী পড়ে না, হাঙ্গামাও নেই, পছন্দ করবার পক্ষে নমুনাও যথেষ্ট। হাজার দেড় হাজার টাকায় ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ী, তিন চারটে ঘর, যথোপযুক্ত সজ্জা। মনে রাখ্‌তে হবে যে ঘরের সাইজ ও রঙ্‌ ইত্যাদি অনুসারে আস্‌বাবের সাইজ, রঙ্‌, রেখা ও গড়ন। দুই দিকেই বিপ্লব ঘটেছে—বাড়ী ও আসবাব দুই দিকের দুই বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। দুই-ই সরল, লঘুভার, নাতিবৃহৎ, বাতালোকপূর্ণ, বিরল-বসতি, নিরলঙ্কার। মানুষের রুচি এখন সভ্যতার অতি-বৃদ্ধিকে ছেড়ে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বলকারক সত্যগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। সেই জন্যে নতুন ধরণের চেয়ার, টেবিল, খাট বা দেরাজের উপরে পাগ্‌লামীর ছাপ যদি বা দেখ্‌তে পাওয়া যায় চালাকীর মারপ্যাঁচ বা বড়মানুষীর চোখে-আঙুল-দেওয়া ভাব এক রকম অদৃশ্য। এর একটা কারণ, আগে যে-শ্রেণী slumএ থাক্‌তো তাদেরও চাহিদা অনুসারে এ সবের জোগান। এবং তাদের রুচি অতি সূক্ষ্ম বা অতি খুঁৎখুঁতে নয় ব'লে তাদের সঙ্গে তাদের নামমাত্র উপরিতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও রুচি মেলাতে হচ্ছে। Mass productionএর মজা এই যে চাষা মজুরের সিকিটা দুয়ানিটার জন্যে যে সিনেমার ফিল্ম—তার রুচির সঙ্গে কলেজের ছাত্রের রুচি না মেলে তো কলেজের ছাত্র নাচার। সিকি দুয়ানির দিক থেকে কলেজের ছাত্র ও চাষা মজুর দু'পক্ষই সমস্কন্ধ, অগত্যা রুচির দিক থেকেও দু'পক্ষকে সাম্যবাদী হতে হবে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের দৃশ্য

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়াম

চৌরঙ্গি

চাঁদপাল ঘাটের একটি দৃশ্য

চৌরঙ্গি—বিশপ্‌ ভবন
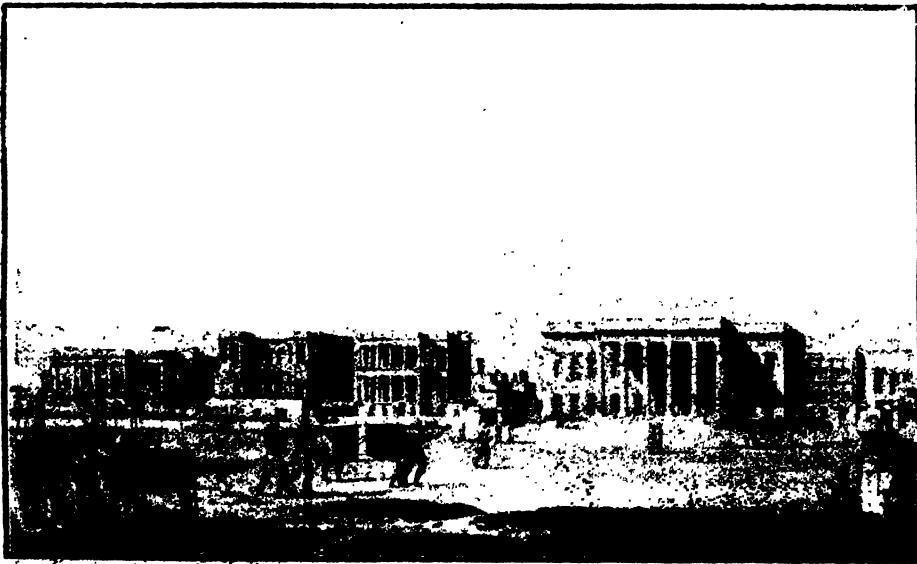
টাউন হল—এস্‌প্লানেড্‌ রো

চৌরঙ্গি
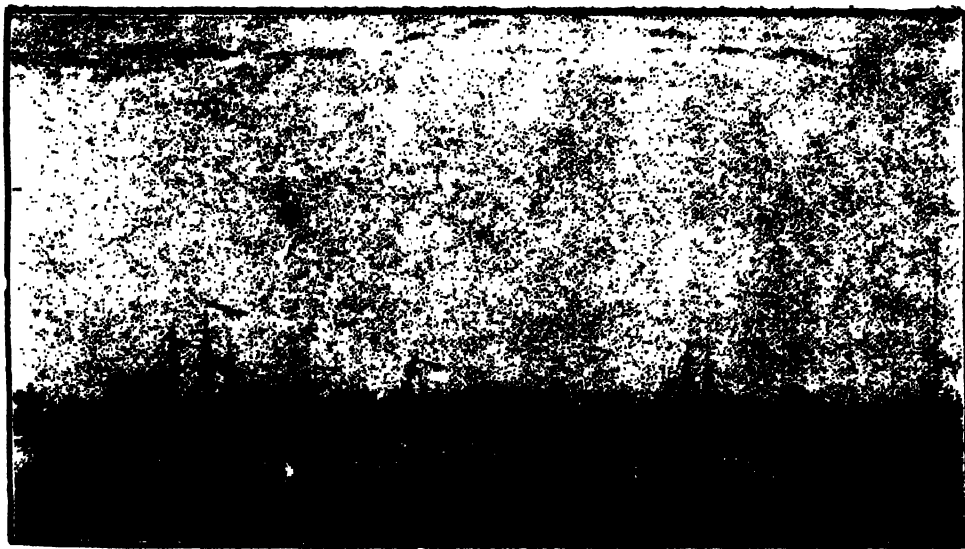
১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা

কাশীটোলা রোড, এসপ্ল্যানেড রো, ধর্ম্মতলা রোড,
তেলিবাজার—চৌরঙ্গি

জানবাজার ষ্ট্রীট্
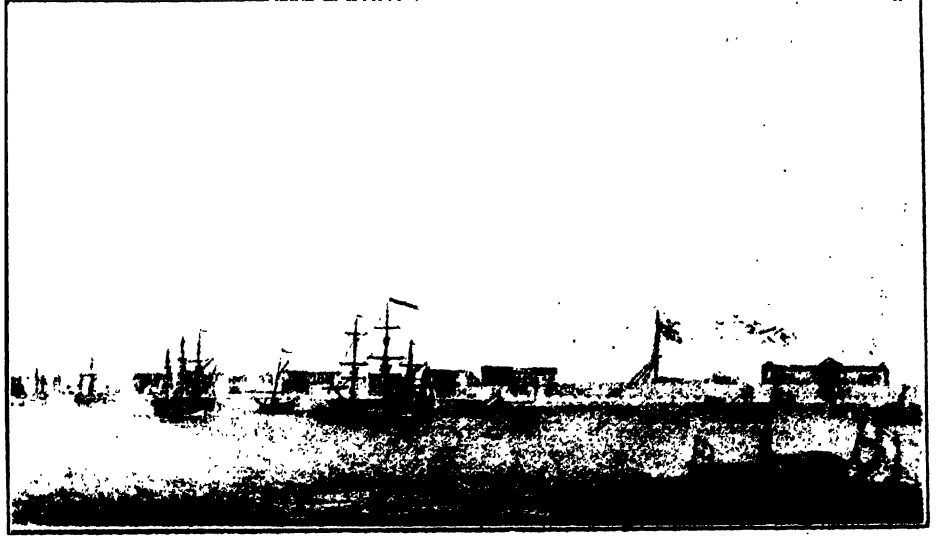
কলিকাতা—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে
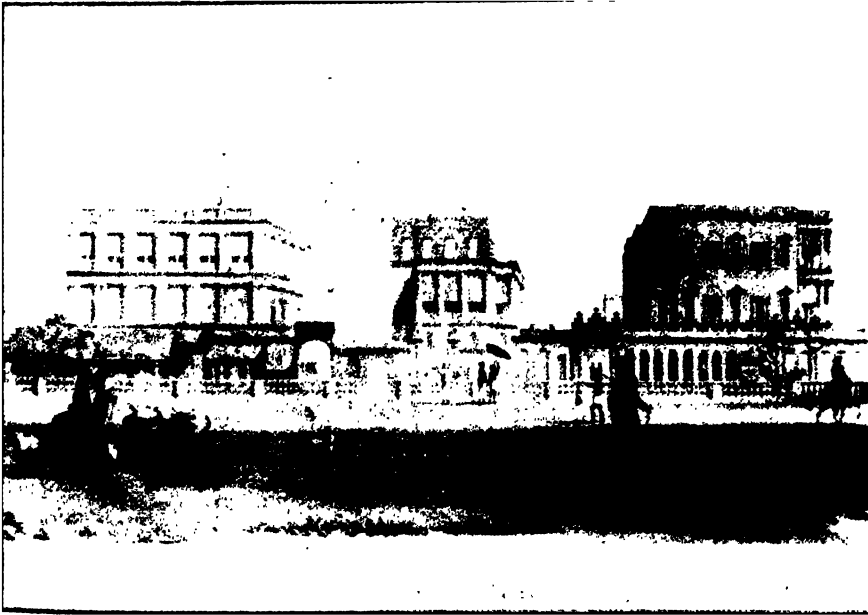
চৌরঙ্গি রোড্

এই চিত্র গুলি হইতে তদানীন্তন কলিকাতার অনেকগুলি সৌধের পরিচয়ের সহিত, পথ ঘাট জাহাজ নৌকা অশ্বযান গোযান পাল্কি সিপাহি প্রভৃতিরও একটা ধারণা করা যায়। পথে লোক জনের চলাচলও যে খুবই কম ছিল তাহা বেশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কিদিরপুর ও আলিপুরের সেতু দুইটি হইতে তখনকার সাদাসিদা সেতু সকলেরও একটা ধারণা করা যায়।

শ্রীহরিহর শেঠ।

এই ছবিগুলি চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ রক্ষিতের নিকট হইতে পাইয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বর্ণিকাভঙ্গম্

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রঙে আর রূপে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রূপ যেখানে রঙ সেখানে, রঙ যেখানে রূপ সেখানে, এই হ'ল স্বভাবের নিয়ম।

এক রঙা রূপ, পাঁচ রঙা রূপ এ রয়েছে, বদ-রঙ রূপ তাও আছে; কিন্তু রঙ ছাড়া রূপ তা কোথায়? রূপ ছাড়া রঙ তাও নেই! কচি পান্ পাকা পান্ শুক্‌নো পান তিন অবস্থাতেই রূপ ও রঙ নিয়ে বর্ত্তে আছে। নতুন পাতার অরুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে শুকনো পাতার গেরুয়াতে গিয়ে পৌঁছয়! পাতার রূপেরও অদল বদল হ'য়ে চলেছে কালে কালে। রূপে রঙের কোথাও বিচ্ছেদ নেই।

বিশ্বজগতে রচনার কাজ এই নিয়মেই চলেছে দেখি, মানুষের শিল্প রচনাতেও এই নিয়ম বলবৎ। খাতার সাদা পাতা সেটা খানিক সাদা রঙ মাত্র নয়, চতুষ্কোণ একটা রূপও আছে তার। কাগজের উপরে কালো পেন্সিলে ছবি দাগলেম—সাদা রঙ কালো রঙ, দুই রঙের মিলনে তবে রূপটি ফুটলো। এমনি কালো সেলেটে সাদা রূপ, নানা বর্ণের কাগজে নানা বর্ণ দিয়ে দাগা রূপ, এই হল ছবির পত্তন। লালে নালে কালোয় সাদায় হলুদে মিলিয়ে নিছক রঙের কাজ করলেম রূপ না ফুটিয়ে, এমনটি হবার জো নেই একেবারেই। পাঁচ রঙের হিজিবিজি সেও পাঁচ রঙা একটা রূপ। আকাশ আর সমুদ্রের নীল রঙ কতকটা রূপ ছাড়া রঙের আভাস দিলেও ভাবরূপ দিয়ে পুরোপুরি ভর্ত্তি, মরুভূমি—সেখানে রূপ রঙ ছাড়াছাড়ি ভাবে নেই। আকাশের নীল রূপের ভাবনা দিয়ে ভরা, সমুদ্রের জলে ও ধুধু বালুচরেও এই রূপভর্ত্তি রঙ। একটা চিত্র করি যদি মরুভূমির, তবে মরুভূমির রূপ এবং রঙ দুটোকেই টান্‌তে হয়। মরুভূমির পারে আকাশের নীল এইটুকু দুই বর্ণের বিভিন্নতা দিয়ে ছবিতে বোঝাতে চল্লেম,—আকাশ থাকে উপরে মাটি থাকে নীচে, অতএব কাগজের উপরটা রঙালেম নীল আর নীচেটা করলেম বেলে রঙ। শুধু এইটুকু কাজ ক'রে দিয়ে ছবিটাকে মরুপারের নীলমরীচিকাতে পরিণত করা চল্লোনা, রঙের সঙ্গে রূপকে এনে মেলাতে হল তবে ধরলো কাগজের একটা অংশ মরুরূপ অন্য ভাগ আকাশরূপ, এবং দুয়ে মিলে দৃশ্যটি পরিপাটী রূপে বর্ণিত হ'ল।

সুতরাং ছবির কোন্‌খানে কি রঙ দেবো সেটা যেমন ভাববার কথা, কোন রঙ কি কি ভাবে ফলাবো তাও জানা দরকার। আকাশ সমুদ্র ভাব রূপ দিয়ে ফলানো রঙ, ভাব রূপ চোখে দেখা যায় না কিন্তু রঙের রূপক দিয়ে ধরা থাকে জলে স্থলে আকাশে; চিত্র করার কৌশলই হচ্ছে এই ভাব রূপে গোলা রঙ সমস্তকে আয়ত্ত করা। নীল লাল ইত্যাদি রঙ এমনি লাগালেই হ'ল না—জলের বেলায় পানসে-নীল, আকাশের বেলায় হাওয়াই-নীল, বালির জায়গায় বেলে রঙ, সন্ধ্যার আকাশে আকাশী-পাটল না দিলে রঙের কাজে ভুল র'য়ে যায়, কাজেই চিত্র ষড়ঙ্গের গোড়া যেমন আরম্ভ হ'ল রূপের ভেদ ও ভাবভঙ্গী নিয়ে, তেমন ষড়ঙ্গের শেষ রইলো শুদ্ধ বর্ণ মিশ্র বর্ণ সমস্ত নানা ভেদ ও ভঙ্গ নিয়ে।

সচরাচর আমরা আকাশটি নীল ব'লে থাকি, কিন্তু এইটুকু জ্ঞান নিয়ে বর্ণিকের কাজ চলে না। আকাশ পলকে পলকে রঙ ফিরিয়ে চলেছে, গেরুয়া ধূসর সাদা সবুজ হলুদ কালো কত কী। রাতের আকাশ দিনের আকাশ একটাও যে অবিমিশ্র নীল নয় তা ছবি আঁকতে গেলেই ধরা পড়ে। ইউনিয়ান জেক্ পতাকা কি স্বদেশী-পতাকা তার রঙ অবিমিশ্র নীল সবুজ সাদা লাল ইত্যাদি দিয়ে বাঁধা; রঙের বাক্সর রঙও কতকটা অবিমিশ্র ভাবে সাজানো থাকে, কিন্তু ছবির পটে এসে মেলামেশা সুরু হয়—রঙে রঙে রূপে রঙে, বিশ্ব রচনাতে এই নিয়ম, মানুষের রচনাতেও এই নিয়মের বাঁধাবাঁধি—অমিশ্র রঙ কচিৎ, মিশ্র রঙই প্রচুর প্রয়োগ হচ্ছে।

রূপের বিভিন্নতার কথা পূর্ব্বে ব'লে চুকেছি, এখন রঙের বিভেদগুলো একটু পরিষ্কার ক'রে ধরার চেষ্টা

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করি। প্রথমত দেখি অমিশ্র ও মিশ্র এই দুই ভেদ, তারপর চিক্কণ ও রুক্ষ এই দুই ভেদ; মোটামুটি এই চার বিভাগে সব রঙকেই রাখা চল্লো। অমিশ্র রঙ সে বাঁধা রঙ, মিশ্রণের দ্বারায় তার মুক্তি। খড়ির বাঁধা সাদা তার সঙ্গে মিশলো একটুখানি পীত একটু লাল একটু নীল, তবে হ'ল দন্তধবল বা দাঁতি-সাদা; এমনি অন্যান্য রঙের মিশ্রণে খল্লিসাদা হল-পাথুরে, পান্‌সে, আবোর, ফেণি এবং কত কী সাদা তার ঠিকঠিকানা নেই। শিউলী সাদা আর শঙ্খ সাদা একই সাদা নয়। মিশিকালো মোষেকালো নিকষকালো চিকণকালো আলাদা আলাদা রঙ আলাদা আলাদা রূপ।

মিশ্রণের দ্বারায় এক বর্ণের বহুল বিস্তার ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করাই হ'ল নিয়ম। দপ্তরীর টানা কালো রেখার একটা রূপ আছে বটে, কিন্তু ছবিতে শ্যামল রঙ দিয়ে যে দিগন্ত রেখাটি টানা গেল তার সঙ্গে খাতার টানা রেখার অনেক প্রভেদ। অলঙ্কারশিল্প—সেখানে নানা বর্ণের মণিমুক্তা সোনা রূপার একত্রীকরণ দিয়ে একটা রূপ গড়া হয়; ফুলের মালাতেও এই কৌশল; আল্পনা ও কাশ্মেরী শাল সেখানেও এবং ইউরোপে মোজেইক চিত্রেও এই প্রথার প্রচলন দেখি। কাজেই ধ'রে নিতে পারি যে অলঙ্কারকলায় অমিশ্র বর্ণ সমস্তকে ভিন্নতা এবং অভিন্নতা দেওয়াই হ'ল কৌশল, বহুরঙের বহুরূপ। প্রজাপতির ডানা নানা অমিশ্র রঙের আল্পনা দিয়ে সাজানো, অপরাজিতার পাপড়িতে নীল আর সাদা দুই রঙ পাশাপাশি, আবার আকাশের ইন্দ্রধনু —সেখানে এক রঙ আর এক রঙে ঢ'লে প'ড়ে চমৎকার ভাবে মিলতে চল্লো!

দিনের আলো পাতার সবুজে ঘটালে বিকার—মাঠের ঘাস, রোদে-দেখানো সোনালি গাছের পাতা আলো অন্ধকারে নিজের রঙ হারিয়ে পেলে অপরূপ শ্যামবর্ণ যা আঁকতে গিয়ে কত-বার হারতে হ'ল কত আর্টিষ্টকে! রাতের অন্ধকার যে বর্ণ-বিকার ঘটালে তা আরো সুস্পষ্ট—সবুজ হ'ল কালো, হিমাচলে দিনের কুয়াসা সে সাদার পোঁচ দিয়ে কালো ক'রে দিলে গাছের সবুজ রঙ! প্রথম দর্শনে দূরের পাহাড়কে মেঘ ব'লে কে না ভুল করেছে?—কবি কালিদাস অনেকবার বুড়ি সে প্রথম সমুদ্র দেখে সেটাকে জগন্নাথের মন্দিরের প্রাচীর ব'লে ভুল ক'রে বসেছিল!

কাজেই রঙের একটা কাজ হ'ল ভ্রান্তি জাগানো এও বলতে পারি। আবার এও বলতে পারি যে সঠিক রূপকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখানো সেও রঙের কাজ। ধর পটে একটা ঘটের রূপটুকু মাত্র দাগা গেল পেন্সিলে, কিন্তু রঙটুকু রইলো বাদ—বস্তুটা পাথরের কি মাটির কি সোনা-রূপোর পিতল-কাঁসার কিছুই বোঝা গেল না, চিকণ কর্কশ ইত্যাদি রঙ দিতে হ'ল তবে ধাতে এল রূপটা। আকাশের মেঘমণ্ডল জলভরা না জলঝরা শুধু মেঘের রূপটা লিখে কিছুতেই বোঝানো চল্লো না, প্রতিকৃতি-চিত্রণে গায়ের চোগা চাপকান সব ঠিক ঠাক পেন্সিলে দেগে চিত্রটা সম্পূর্ণ হ'ল বলতে পারলেম না—সুতোর কাপড় না সিল্কের কাপড়, না মখমল, এসব রঙ দিয়ে দেখিয়ে তবে নক্‌সা সম্পূর্ণ করতে হ'ল।

সূর্য্যরশ্মি নানা ধাতের নানা বস্তুর রঙ কালো আর সাদায় বিভক্ত ক'রে ফটোগ্রাফের কাগজের উপরে এমন চমৎকার ক'রে ধ'রে দেয় যে সেখানে কালো সাদার ছন্দেই পাটের কাপড় সুতোর কাপড় বনাত মখমল চামড়া এ সবের তার-তম্য সহজে ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে। একখানা ভাল ড্রয়িং তাতেও রামধনুকের সাত রঙ কালো সাদার ভাষায় তর্জ্জমা হ'য়ে আসে,জল মেঘ পর্ব্বত সবই সেখানে নানা নানা ছাঁদের কালো সাদা অর্থাৎ রঙ্গীন কালো সাদা। আর্টিষ্টের হাতের পেন্ কি পেন্‌সীল এই ভাবে কালো সাদার ভাষায় রঙের নানা সুরের আভাসগুলি লেখাতে রেখে যায় তবেই না করি ড্রয়িংয়ের আদর!

কবিতার বই কালো সাদায় ছাপা হ'য়ে হ'য়ে বাজারে এল। সাদা কাগজে ছাপা অক্ষর ও বর্ণমালা নিছক সাদা আর কালো লাইনবন্দি ক'রে সাজানো; এরি ফাঁকে ফাঁকে কবি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে রঙকে পেয়ে গেলেন। শরতের নীল, কাশ ফুলের সাদা, মেঘের শ্যাম, রৌদ্রের পাটল কিছুই বাদ গেল না, কেননা কবি রঙ দিয়ে কথা ব'লে গেলেন, শুধু খবরওয়ালার মতো খবরটার বিজ্ঞাপন সাদায় কালোয় দিয়ে চল্লেন না।

কবিতা লিখেই কিছু বলি, আর ছবি দিয়েই বা

রচক মানুষ কোথায় কারবার করলে তার উদাহরণ হ'ল—বিজ্ঞানের বই এবং তার পাতায় পাতায় নানা নক্সাগুলো, অঙ্ক শাস্ত্রের পাতার নকড়া ছকড়া টানগুলো। কিন্তু মানুষ যেখানে রস দিয়ে কিছু বলতে গেল সেই খানেই রূপের সঙ্গে রঙও এসে পড়লো।

নানা বর্ণ দিয়ে একটা রূপ ফোটাতে নিপুণ ছিলেন মহাকবি বাণভট্ট। রঙের প্রচুর ব্যবহার 'কাদম্বরী কথায়' যেমন দেখা যায় এমন আর কোথাও নেই। মহাশ্বেতার রূপ বর্ণন করলেন কবি, মহাশ্বেতা নামটাই যথেষ্ট বর্ণনা হ'তে পারতো কিন্তু কবি সুনিপুণ ভাবে হাজারো রকমের সাদা রঙের অবতারণা ক'রে বসলেন এক মহাশ্বেতাকে দেখাতে—সাদা রঙের ঝাঁক উড়লো যেন শ্বেত পদ্মের চারিদিকে, শ্বেত অলঙ্কারের ঝঙ্কারে বাঁধা শুভ্রতার প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো মহাশ্বেতা। এমনি সন্ধ্যারাগটুকু পাতার পর পাতা রঙের হিসেবে বাঁধলেন কবি দেখতে পাই—"অস্তমুপগতে ভগবতি সহস্রদীধিতি, অপরার্ণবতটাতুল্লসন্তী বিদ্রুমলতেব পাটলা সন্ধ্যা সমদৃশ্যত:" (কাদম্বরী)। এমনি সকালেরও রাগবর্ণন সুরু হল দেখি—"একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্ত পক্ষসম্পুটে বৃদ্ধহংসে ইব, মন্দাকিনীপুলিনাদপরজলনিধিতলমবতরতি চন্দ্রমসি।" ইত্যাদি ইত্যাদি কত রঙ, কত রঙের রকম, তার ঠিকানা নেই।

সূচীভেদ্য অন্ধকার, এ বল্লে শক্ত রঙটা স্পষ্ট হ'ল, কোমল শ্যামল অন্ধকার এ অন্য কালোর কথা ব'লে চল্লো। এমনি নানা ধাতে রঙ কালো সাদা ইত্যাদি দিয়ে রচনা সম্পূর্ণ হ'তে চলে।

রাজনীতি উপদেশ করলেন বিষ্ণুশর্ম্মা,—এখনকার টেক্‌ষ্ট বুকের মতো বেরঙা সাদা কালোয় লিখলে না উপদেশ—'চিত্রবর্ণ' পক্ষিরাজ 'মেঘবর্ণ' দূত পাখী এরা সব এসে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে। পোলিটিকাল সায়াহ্ন রঙীন হ'য়ে এল রাজপুত্রদের সামনে!

একটা কথাই রয়েছে রঙ্গ-রস, রঙ হ'ল তো রস হ'ল জানলেম। সরস সুরঙ্গ রূপ রূপকারের কাছ থেকে পাই; রূপ রঙ একত্রে মিলিয়ে পাই সমস্ত রূপরচনাতে; বিচ্ছিন্ন ভাবে রূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে রঙ আর্টের কাজে আসে না। দু' একটা নমুনা দেওয়া ছাড়া কথাটা পরিষ্কার হবে না।

এটা জানা কথা যে ভক্ত মাত্রেই নামরূপ জপ ক'রে রস পেয়ে থাকেন। এখানে রূপটাই হ'ল যথেষ্ট, রঙ না হলেও চল্লো। সুন্দর সৎগুরুয়েঁ৷ কহা সকল শিরোমণি নাম, তাকোঁ নিশিদিন সুমরিয়ে..." রাম নামটা হ'লেই যথেষ্ট হ'ল ভক্তের পক্ষে, রামের নবদূর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ দরকারই নেই নাম রসের উপভোক্তার কাছে। "সুন্দর ভজিয়ে রামকো, তজিয়ে মায়া মোহ"। রাম একটা নাম মাত্র, রূপও নেই রঙও নেই। অবর্ণ অরূপ রামকে নিয়ে নামজপ্ চলে, ছবি লেখা চলে না কোনো কালেই!

—সুন্দর মছরী নীর মেঁ বিচরত আপনে খ্যাল।
বগুলা লেত উঠাইকে তোহি প্রলয়োঁ কাল॥

উপদেশ হ'লেও এর মধ্যে ছবি রয়েছে মাছ জল বক; বেশির ভাগ এখানে পাচ্ছি রূপ, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু রঙও পেয়ে যাচ্ছি। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ—সেখানেও কাক বক নিয়ে কথা, কিন্তু একেবারে বেরঙা কথা নয়, বেরঙা কাক বকও নয়। 'কর্পূরদ্বীপে পদ্মকলি নামে এক সরোবর সেখানে থাকে হিরণ্যগর্ভ নামে এক রাজহংস'—এখানে রূপরঙ একত্রে মিলে গেল। খানিক পরেই আবার নাম রূপের দেখা পাই, যেমন—'একদিন সেই রাজহংস সুবিস্তৃত পদ্মময় পর্য্যঙ্কে সুখে বসিয়া আছেন এমন সময় দীর্ঘমুখ নামে এক বক কোন এক দেশ হইতে তথায় উপস্থিত হইল।' এখন বকের নাম দীর্ঘমুখই রাখি বা দীর্ঘচঞ্চুই রাখি যেমনি বল্লেম কথায় 'বক' অমনি বকের রঙটাও এসে জোড়া লাগলো শ্রোতার মনে। ধর যদি বলতেম—শঙ্খধবল বক, তো রঙের সঙ্গে বকের রূপটা এসে জোড়া লাগতো—সরু পা লম্বা চোঁচ কিছুই বাদ যেতো না বক রূপটির। কিন্তু শুধু শঙ্খধবল বল্লে কি যে বোঝায় বা কি যে না বোঝায় তা বলা মুস্কিল—সাপ বেঙ সবই হতে পারে!

রূপে রঙে মিলিয়ে দেখা হ'ল সহজ ও স্বাভাবিক দেখা। তবে সময়ে সময়ে এমনো হ'য়ে থাকে যে রঙের আকর্ষণ রূপের চেয়ে কি রূপের আকর্ষণ রঙের চেয়ে কম বেশ কাজ করলে। দুই দল মেয়েতে কথা হচ্ছে রথের সময়। প্রথম দল বল্লে,—'ওপারেতে ময়রা বুড়ো রথ দিয়েছে তেরো চূড়ো,

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বানরে ধরেচে ধ্বজা, দিদি গো দেখতে মজা'—শুধু এখানে রূপের কথা হল। দ্বিতীয় দল এর জবাব দিলে—'তোদের হলুদ মাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা, আমরা হলুদ কোথায় পাবো উল্টো রথে যাবো'। রূপ-দেখার দল আর রঙ-দেখার দল—একদল রঙ্গিনী উল্টো রথের সওয়ারী, আর একদল রূপসী সোজা রথের যাত্রী!

যখন দূরে থেকে হিমগিরি দেখি তখন রূপরঙ সমভাবে মনের উপরে কাজ করে। রঙের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে রূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না এবং সে দেখায় রসও পাওয়া যায় না—নিরর্থক দৃষ্টি বদল হয় মাত্র বস্তুর সঙ্গে। যেমন,—তাজমহলটা গিয়ে দেখলেম না কিন্তু চীফ ইঞ্জিনিয়ারের নক্সার সাহায্যে দেখলেম, ভাল ফটোগ্রাফ আর একটু বিস্তার ক'রে আলো ছায়া ফেলে দেখালে, কিন্তু তাতেও দেখা সম্পূর্ণ হলনা, ই আই রেলওয়ের টাইমটেবেলের মলাট খানা তাজমহলটি বদরঙ দিয়ে দেখালে তাতে ক'রে ভুল ধারণা জন্মালো বস্তুটির, পাকা শিল্পী রূপ রঙ মিলিয়ে লিখলে তাজমহলের ছবি কি কবিতা, সত্য তাজমহলের দেখা পেয়ে গেলেম তখনই!

রূপের চেয়ে রঙ যেখানে জোর করছে মনে, তার দু'একটা উদাহরণ দেখা যাক্।

যেমন—"নিরুপম হেম জ্যোতি জিনি বরণ,
　　সঙ্গীতে রঞ্জিত রঞ্জিত চরণ,
　　নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া—"

এখানে কেবলি রঙ আর রঙ চোখে পড়ছে! আবার,—

"নাথবান কনক কষিত কলেবর
　　মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম—"

এখানে রঙের ছাঁদ রূপের ছাঁদ পরে পরে আসা যাওয়া করলে।

কিন্তু—"নমো নিরঞ্জন নিরাকার অবিগত পুরুষ অলেখ
　　জিন সন্তনকে হিত ধরো যুগ যুগ নানা ভেখ"!

এখানে রঙছাড়া রূপ ছাড়া ধ্যানটাই পাচ্ছি পরমপুরুষের।

ঠিক এই কথাই উপনিষদে—'য একো অবর্ণ বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণন্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'! জল এবং আকাশ অবর্ণের কাছাকাছি, কিন্তু জল আকাশ দুয়েরই রঙের অন্ত নাই। বায়ুস্তরের রূপও নেই রঙও নেই, কিন্তু রঙ ধরবার শক্তি ওতে আছে। বাতাসে ডোবা দূরের গাছ পর্ব্বত ঘর বাড়ি রঙ ফেরায়, এটা জানতে সায়ান্স পড়তে হয় না, চোখ থাকলেই দেখা যায়। প্রকৃতির নিয়মে কোনো কিছুর রঙ অবিমিশ্র ভাবে বর্ত্তে থাকতে পায় না, বিকার ঘ'টে যায়, আলো পড়ে ছায়া পড়ে,—তৃণভূমি, সে গাছের তলাটায় নীলাভ রঙ, গাছের ছায়া যেখানে পড়্‌লে না সেখানে পীতাভ সবুজ রঙ ধরলে! স্ববর্ণে বর্ত্তে আছে এমন কোনো কিছু নেই বল্লেও চলে; জগতে এ ওর রঙে রাঙিয়ে উঠছে দিনরাত!

এই যে রঙের মিশ্রণ ও আদান-প্রদান এ যেমন দেখছি বিশ্বছবিতে, তেমনি আবার পাশাপাশি দুই বস্তুর রঙে রঙে কঠিন ব্যবধান তাও দেখছি। কালোর পাশে আলো, একই জাতের দুই গাছ একটির পাশে আর একটি রূপ ও রঙের তারতম্য নিয়ে সুন্দর ফুটলো, সবুজের কোলে রঙীন ফুল, অন্ধকারের বুকে তারাফুলের বাহার, ঘন মেঘের গায়ে সাদা বকের সারি, আলোর গায়ে কালো কাকের দল,—রঙের এসব হিসাব শিখতে আর্টস্কুলে যেতে হয় না। কত বার দেখেছি রঙে রঙ মিশিয়ে পাখির ছানা কুকুর বেরাল বাঘ মানুষ দিব্বি গা ঢাকা দিলে, তেলাকুচো ফল বর্ণচোরা আম রঙ দিয়ে রসের অপদার্থতা লুকিয়ে চল্লো!

ফুলের রঙটাই পৌঁছে দেয় মধুর সংবাদ মৌমাছিকে, এটা জানা কথা। উৎসবের রঙ শোকের রঙ এসবই ধার ক'রে নিয়েছে মানুষ প্রকৃতির কাছে কোন্ আদিকালে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

সরল রূপ বাঁকা রূপ এমনি নানা রূপ-রেখা যেমন ভাবের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, তেমনি রঙও প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রকার বল্লেন—"শ্যামোভবতি শৃঙ্গারঃ, সিতোহাস্য প্রকীর্ত্তিত, কপোতো করুণশ্চৈব, রক্তোরৌদ্র প্রকীর্ত্তিত, গৌরোবীরস্তু বিজ্ঞেয়, কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ নীলবর্ণস্তু বীভৎস পীতশ্চৈবাদ্ভুত স্মৃতঃ॥"

ঠিক এই ভাবে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে রঙের নানা প্রতীক ও হিসেব দেখতে পাই, যেমন—

কালো রঙ হল—শোকের নিরাশার, মেটে এবং ধূসর রঙ বোঝায়—শুষ্কতা মৃত্যু ইত্যাদি, পীত নীল রক্ত—

সদর দরজা থেকে তুধারের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে হাত পাঁচেক এসে একটা হাত তিনেক চওড়া বারান্দায় প'ড়ে ডান দিকে বাঁকতে হ'ল। বাঁ দিকে বাঁকবার যো নেই, কারণ দেখা গেল সেদিকটা প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা।

ছোট্ট একটু উঠান, বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেক উঠানের চারটে ক'রে পাশ থাকে, এটারও তাই আছে দেখলাম। তুপাশে তুখানা ঘর, এ বাড়ীরই অঙ্গ। একটা পাশ প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা, অন্য পাশটায় অন্য এক বাড়ীর একটা ঘরের পেছন দিক, জানালা দরজার চিহ্ন মাত্র নেই, প্রাচীরেরই সামিল।

আমার নবলব্ধ মামা ডাকলেন, অতসী, আমার এক ভাগ্নে এসেছে, এ ঘরে একটা মাতুর বিছিয়ে দিয়ে যাও। ও ঘরটা বড় অন্ধকার।

এঘর মানে আমরা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ওঘর মানে ওদিককার ঘরটা। সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী, মস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে।

যতীন মামা বল্লেন, একি! ঘোমটা কেন? আরে, এ যে ভাগ্নে!

মামীর ঘোমটা ঘুচাবার লক্ষণ নেই দেখে আবার বল্লেন, ছি ছি, মামী হ'য়ে ভাগ্নের কাছে ঘোমটা টেনে কলা বৌ সাজবে?

এবার মামীর ঘোমটা উঠল। দেখলাম, আমার নূতন পাওয়া মামাটি মামারই উপযুক্ত স্ত্রী বটে! মনে মনে বল্লাম, মামার গলায় বিশ্রী স্বরটা দিয়ে যে ভুলটা করেছ ভগবান, মামীকে দিয়ে সেটুকু শুধরে নিয়েছ বটে! তোমার কসুর মাপ করা গেল।

মামী এঘরের মেঝেতে মাতুর বিছিয়ে দিলেন। ঘরে তক্তপোস, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির বালাই নেই। এক পাশে একটা রঙ-চটা ট্রাঙ্ক আর একটা কাঠের বাক্স। দেওয়ালে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত একটা দড়ি টাঙ্গানো, তাতে একটি মাত্র ধুতি ঝুলছে। একটা পেরেকে একটা আধ ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী লটকান, যতীন মামার সম্পত্তি। গোটা তুই চার-পাঁচ বছর আগেকার ক্যালেণ্ডারের ছবি। একটাতে এখনও চৈত্রমাসের তারিখ লেখা কাগজটা লাগান রয়েছে, ছিঁড়ে ফেলতে বোধ হয় কারো খেয়াল হয়নি।

যতীন মামা বল্লেন, একটু সুজিটুজি থাকে তো ভাগ্নেকে ক'রে দাও। না থাকে এক কাপ চাই খাবে'খন।

বললাম, কিচ্ছু দরকার নেই যতীন মামা। আপনার বাঁশী শুনতে এসেছি, বাঁশীর সুরেই খিদে মিটবে এখন। যদিও খিদে পায়নি মোটেই, বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।

যতীন মামা বল্লেন, বাঁশী? বাঁশী তো এখন আমি বাজাই না।

বললাম, সে হবে না, আপনাকে শোনাতেই হবে।

বল্লেন, তা' হ'লে বোস, রাত্রি হোক। সন্ধ্যার পর ছাড়া আমি বাঁশী ছুঁই না।

বল্লুম, কেন?

যতীন মামা মাথা নেড়ে বল্লেন, কেন জানি না ভাগ্নে, দিনের বেলা বাঁশী বাজাতে পারি না। আজ পর্য্যন্ত কোন দিন বাজাইনি। হ্যাঁ গা অতসী, বাজিয়েছি?

অতসী মামী মৃদু হেসে বল্লে, না।

যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল এমনি ভাবে যতীন মামা বল্লেন, তবে?

বললাম, মোটে পাঁচটা বেজেছে, সন্ধ্যা হবে সাতটায়। এতক্ষণ ব'সে থেকে কেন আপনাদের অসুবিধা করব, ঘুরেটুরে সন্ধ্যার পর আসব এখন।

যতীন মামা ইংরাজীতে বল্লেন, Tut! Tut! তারপর বাংলায় যোগ দিলেন, কি যে বল ভাগ্নে! অসুবিধাটা কি হে, এঁ্যা? পাড়ার লোকে তো বয়কট করেছে। বলে, অতসী আমার স্ত্রী নয়! তুমি থাকলে তবু কথা ক'য়ে বাঁচবো।

এ আবার কি কথা! অতসী আমার স্ত্রী নয়, একথার মানে?

যতীন মামা আবার বল্লেন, জমিদারীর আয় বছরে পাঁচশো, তাই দিয়ে আমি একটি স্ত্রীলোক পুষছি! কি বুদ্ধি লোকের! তিন আইনে রেজিষ্ট্রী করা বিয়ে, রীতিমত দলিল আছে, কেউ কি তা দেখতে চাইবে? যতো সব—

ত্রস্তভাবে অতসী মামী বল্লে, কি যা-তা বলছো?

অতসী মামী

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যতীন মামা বললেন, ঠিক ঠিক, ভাগ্নে নতুন লোক, তাকে এসব বলা ঠিক হচ্ছে না বটে। ভারি রাগ হয় কিনা! ব'লে হাসলেন। হঠাৎ বল্লেন, তোমরা যে কেউ কারু সঙ্গে কথা বলছ না গো!

মামী মৃদু হেসে বললেন, কি কথা বলব?

যতীন মামা বললেন, এই নাও! কি কথা বলবে তাও কি আমায় ব'লে দিতে হবে নাকি? যা হোক কিছু ব'লে সুরু কর, গড় গড় ক'রে কথা আপনি এসে যাবে।

মামী বললে, তোমার নামটি কি ভাগ্নে?

যতীন মামা সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, এইবার ভাগ্নে, পাল্টা প্রশ্ন কর, আজ কি রাঁধবে মামী? ব্যস্, খাসা আলাপ জ'মে যাবে। তোমার আরম্ভটি কিন্তু বেশ অতসী।

মামীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল।

আমি বললাম, অমন বিশ্রী প্রশ্ন আমি কখ্খনো করব না মামী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার নাম সুরেশ!

যতীন মামা বললেন, সুরেশ কিনা সুরের রাজা, তাই সুর শুন্‌তে এত আগ্রহ। নয় ভাগ্নে?

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, ইস্! ভুবন বাবু যে টাকা দুটো ফেরত দেবে বলেছিল আজ! নিয়ে আসি,দুদিন বাজার হয়নি। বসো ভাগ্নে, মামীর সঙ্গে গল্প কর, দশ মিনিটের ভেতর আসছি।

ঘরের বাইরে গিয়ে বল্লেন, দোরটা দিয়ে যাও অতসী। ভাগ্নে ছেলে মানুষ, কেউ তোমার লোভে ঘরে ঢুকলে ঠেকাতে পারবে না।

মামীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল এবং সেইটা গোপন করতে চট ক'রে উঠে গেল। বাইরে তার চাপা গলা শুনলাম, কি যে রসিকতা কর, ছি! মামা কি জবাব দিলেন শোনা গেল না।

মামী ঘরে ঢুকে বল্লে, ঐ রকম স্বভাব ওঁর। বাক্সে দুটি মোটে টাকা, তাই নিয়ে সেদিন বাজার গেলেন। বল্লাম, একটা থাক্। জবাব দিলেন কেন? রাস্তায় ভুবন বাবু চাইতে টাকা দুটি তাকে দিয়ে খালি হাতে ঘরে ঢুকলেন।

আমি বল্লাম, বেশ লোক তো যতীন মামা!

মামী বল্লে, ঐ রকমই। আর দ্যাখো ভাই—

বললাম, ভাই নয়, ভাগ্নে।

মামী বল্লে, তাও তো বটে! আগে থাকতেই যে সম্বন্ধটা পাতিয়ে ব'সে আছ! ওঁর ভাগ্নে না হ'য়ে আমার ভাই হলেই বেশ হ'ত কিন্তু। সম্পর্কটা নতুন করে পাত্ত না? এখনো এক ঘণ্টাও হয়নি, জমাট বাঁধেনি।

আমি বললাম, কেন? মামী ভাগ্নে বেশ তো সম্পর্ক!

মামী বল্লে, আচ্ছা তবে তাই। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে ভাগ্নে। তুমি ওঁর বাঁশী শুন্‌তে চেয়ো না।

বললাম, তার মানে? বাঁশী শুনতেই তো এলাম!

মামীর মুখ গম্ভীর হ'ল, বল্লে, কেন এলে? আমি ডেকেছিলাম? তোমাদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেবো?

আমি অবাক হ'য়ে মামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কথা যোগায় না।

মামী বল্লে, তোমাদের একটু সখ মেটাবার জন্য উনি আত্মহত্যা করছেন দেখতে পাওনা? রোজ তোমরা একজন না একজন এসে বাঁশী শুনতে চাইবে। রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়লে মানুষ কদিন বাঁচে?

রক্ত! রক্ত নয়? দেখবে? ব'লে মামী চ'লে গেল। ফিরে এল একটা গামলা হাতে ক'রে। গামলার ভেতরে জমাট বাধা খানিকটা রক্ত।

মামী বল্লে, কাল উঠেছিল, ফেলতে মায়া হচ্ছিল তাই রেখে দিয়েছি। রেখে কোন লাভ নেই জানি, তবু—

আমি অনুতপ্ত হয়ে বল্‌লাম, জানতাম না মামী। জানলে কখখনো শুনতে চাইতাম না। ইস্, এই জন্যেই মামার শরীর এত খারাপ?

মামী বল্লে, কিছু মনে কোরো না ভাগ্নে। অন্য কারো সঙ্গে তো কথা কইনা তাই তোমাকেই গায়ের ঝাল মিটিয়ে ব'লে নিলাম। তোমার আর কি দোষ, আমার অদৃষ্ট!

আমি বল্‌লাম, এত রক্ত পড়ে তবু মামা বাঁশী বাজান?

মামী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, হ্যাঁ, পৃথিবীর কোন বাধাই ওঁর বাঁশী বাজান বন্ধ করতে পারবে না। কত বলেছি, কত কেঁদেছি, শোনেন না। আমি চুপ করে রইলাম।

মামী ব'লে চল্ল, কতদিন ভেবেছি বাঁশী ভেঙ্গে ফেলি, কিন্তু সাহস হয়নি। হয়ত বাঁশীর বদলে মদ খেয়েই নিজেকে শেষ ক'রে ফেলবেন, নয়ত যেখানে যা আছে সব বিক্রি করে বাঁশী কিনে না খেয়ে মরবেন।

মামীর শেষ কথাগুলি যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কি বলতে গেলাম, কিন্তু কথা ফুটল না।

মামী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, অথচ ঐ একটা ছাড়া আমার কোন কথাই ফেলেন না। আগে আকণ্ঠ মদ খেতেন, বিয়ের পর যেদিন মিনতি ক'রে মদ ছাড়তে বল্লাম সেইদিন থেকে ওজিনিষ ছোঁয়াই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাঁশীর বিষয়ে কোন কথাই শোনেন না।

আমি বলতে গেলাম, মামী—

মামী বোধ হয় শুনতেই পেল না, বলে চল্ল, একবার বাঁশী লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেকি ছট্ফট্ করতে লাগলেন! যেন ওঁর সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেছে।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। মামী দরজা খুলতে উঠে গেল।

যতীন মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্লেন, দিলে না টাকা অতসী, বল্লে পরশু যেতে।

পিছন থেকে মামী বল্লে, সে আমি আগেই জানি।

যতীন মামা বল্লেন, দোকানদারটাই বা কি পাজী, একপো সুজি চাইলাম দিল না। মামার বাড়ী এসে ভাগ্নেকে দেখছি খালি পেটে ফিরতে হবে।

মামী ম্লান মুখে বল্লে, সুজি দেয়নি ভালই করেছে। শুধু জল দিয়ে তো আর সুজি হয় না!

ঘি নেই?

কবে আবার ঘি আনলে তুমি?

তাওতো বটে! ব'লে যতীন মামা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। দিব্য সপ্রতিভ হাসি।

আমি বল্লাম, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন মামা, খাবারের কিছু দরকার নেই। ভাগ্নের সঙ্গে অত ভদ্রতা করতে নেই!

মামী বল্লে, বোস তোমরা, আমি আসছি। ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মামা বল্লেন, কোথায় গো?

বারান্দা থেকে জবাব এল, আসছি।

মিনিট পনের পরে মামী ফিরল। দুহাতে দুখানা রেকাবিতে গোটা চারেক ক'রে রসগোল্লা আর গোটা দুই সন্দেশ।

যতীন মামা বল্লেন কোত্থেকে যোগাড় করলে গো? ব'লে, একটা রেকাবি টেনে নিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে তুল্লেন।

অন্য রেকাবিটা আমার সামনে রাখতে রাখতে মামী বল্লে, তা দিয়ে তোমার দরকার কি?

যতীন মামা দিব্য নিশ্চিন্তভাবে বল্লেন, কিছু না! যা খিদেটা পেয়েছে, ডাকাতি ক'রেও যদি এনে থাক কিছু দোষ হয় নি। স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে সাধ্বী অনেক কিছুই করে!

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতে গেলাম, কেন মিথ্যে—

বাধা দিয়ে মামী বল্লে, আবার যদি ঐ সব সুরু কর ভাগ্নে, আমি কেঁদে ফেলব।

আমি নিঃশব্দে খেতে আরম্ভ করলাম।

মামী ওঘর থেকে দুটো এনামেলের গ্লাসে জল এনে দিলেন।

প্রথম রসগোল্লাটা গিলেই মামা বল্লেন, ওয়াক্! কি বিশ্রী রসগোল্লা! রইলো পড়ে খেয়ো তুমি, নয়ত ফেলে দিও। দেখি সন্দেশটা কেমন!

সন্দেশ মুখে দিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ এ জিনিষটা ভাল, এটা খাব। ব'লে, সন্দেশ দুটো তুলে নিয়ে রেকাবিটা ঠেলে দিয়ে বল্লেন, যাও তোমার সুজির টিপি ফেলে দিও'খন নর্দামায়।

অতসী মামীর চোখ ছল ছল ক'রে এল! মামার ছল-টুকু আমাদের কারুর কাছেই গোপন রইলনা। কেন যে এমন খাসা রসগোল্লাও মামার কাছে সুজির টিপি হয়ে গেল বুঝে আমার চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম হল।

অতসী মামী

শ্রীমাণিক বান্দ্যাপাধ্যায়

মাথা নীচু করে রেকাবিটা শেষ করলাম। মাঝখানে একবার চোখ তুলতেই নজরে পড়ল মামী মামার রেকবিটা কপালে ছুঁইয়ে দরজার ওপরের তাকে তুলে রাখছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মামী ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাল, ধূনো দিল। আমাদের ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে মামী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

যতীন মামা হেসে বল্লেন, আরে লজ্জা কিসের! নিত্যকার অভ্যাস, বাদ পড়লে রাতে ঘুম হবেনা। ভাগ্নের কাছে লজ্জা করতে নেই।

আমি বল্‌লাম, আমি না হয়—

মামী বল্লে, বোস, উঠতে হবেনা অত লজ্জা নেই আমার। ব'লে, গলায় আঁচল দিয়ে মামার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

লজ্জায় সুখে তৃপ্তিতে আরক্ত মুখখানি নিয়ে অতসী মামী যখন উঠে দাঁড়াল, আমি বল্‌লাম দাঁড়াও মামী, একটা প্রণাম করেনি।

মামী বল্লে, না না ছি ছি—

বল্‌লাম, ছিছি নয় মামী। আমার নিত্যকার অভ্যাস না হ'তে পারে, কিন্তু তোমায় প্রণাম না ক'রে যদি আজ বাড়ী ফিরি রাত্রে আমার ঘুম হবে না ঠিক। ব'লে মামীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

যতীন মামা হো হো করে হেসে উঠল।

মামী বল্লে, আখোতো ভাগ্নের কাণ্ড!

যতীন মামা বল্লেন, ভক্তি হয়েছে গো! কলিযুগের সীতাদেবীকে দেখে।

মেয়েটির মত সলজ্জে 'ধোৎ' বলে মামী পলায়নকরল। বারান্দা থেকে ব'লে গেল, আমি রান্না করতে গেলাম।

যতীন মামা বল্লেন, এইবার বাঁশী শোন।

আমি বল্লাম, থাকগে, কাজ নেই মামা। শেষকালে রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে আবার।

যতীন মামা বল্লেন, তুমিও শেষে ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান আরম্ভ করলে ভাগ্নে? রক্ত পড়বে তো হয়েছে কি? তুমি শুনলেও আমি বাজাব, না শুনলেও বাজাব। খুসী হয় রান্না ঘরে মামীর কাছে ব'সে কানে আঙুল দিয়ে থাকগে।

কাঠের বাক্সটা খুলে বাঁশীর কাঠের কেসটা বার করলেন। বল্লেন বারান্দায় চল, ঘরে বড় শব্দ হয়।

নিজেই বারান্দায় মাদুরটা তুলে এনে বিছিয়ে দিলেন। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে বাঁশীটা মুখে তুললেন।

হঠাৎ আমার মনে হল আমার ভেতরে যেন একটা উন্মাদ একটা ক্ষ্যাপা উদাসীন ঘুমিয়ে ছিল আজ বাঁশীর সুরের নাড়া পেয়ে জেগে উঠল। বাঁশীর সুর এসে লাগে কানে কিন্তু আমার মনে হল বুকের তলেও যেন সাড়া পৌঁছেচে। অতি তীব্র বেদনার মধুরতম আত্মপ্রকাশ কেবল বুকের মাঝে গিয়ে পৌঁছয়নি, বাইরের এই ঘর দোরকেও যেন স্পর্শ দিয়ে জীবন্ত ক'রে তুলেছে, আর আকাশকে বাতাসকে মৃদু ভাবে স্পর্শ করতে করতে যেন দূরে বহুদূরে যেখানে গোটা কয়েক তারা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি, সেইখানে স্বপ্নের মায়ার মাঝে লয় পাচ্ছে। অন্তরে ব্যথা বোধ ক'রে আনন্দ পাবার যতগুলি অনুভূতি আছে বাঁশীর সুর যেন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি আরম্ভ করেছে।

বাঁশী শুনেছি ঢের। বিশ্বাস হয়নি এই বাঁশী বাজিয়ে একজন একদিন এক কিশোরীর কুল মান লজ্জা ভয় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল, যমুনাকে উজান বইয়েছিল। আজ মনে হল, আমার যতীন মামার বাঁশীতে সমগ্র প্রাণ যদি আচমকা জেগে উঠে নিরর্থক এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে তবে সেই বিশ্ব বাঁশীর বাদকের পক্ষে ঐ ছুটি কাজ আর এমন কি কঠিন!

দেখি, মামী কখন এসে নিঃশব্দে ওদিকের বারান্দায় ব'সে পড়েছে। খুব সম্ভব ঐ ঘরটাই রান্না ঘর, কিম্বা রান্না ঘরে যাবার পথ ঐ ঘরের ভেতর দিয়ে।

যতীন মামার দিকে চেয়ে দেখলাম, খুব সম্ভব সংজ্ঞা নেই। এ যেন সুরের আত্ম ভোলা সাধক সমাধি পেয়ে গেছে।

কতক্ষণ বাঁশী চলেছিল ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক হবে। হঠাৎ এক সময়ে বাঁশী থামিয়ে যতীন মামা ভয়ানক কাসতে আরম্ভ করলেন। বারান্দার ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে পারলাম, মামার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে উঠেছে।

অতসী মামী বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, জল আর পাখা নিয়ে ছুটে এল। খানিকটা রক্ত তুলে মামীর শুশ্রূষায় যতীন মামা অনেকটা সুস্থ হলেন। মাদুরের ওপর একটা বালিশ পেতে মামী তাকে শুইয়ে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, আজ আসি যতীন মামা।

মামা কিছু বলবার আগেই মামী বল্লে, তুমি এখন কথা কয়ো না। ভাগ্নের বাড়ীতে ভাববে, ; আজ থাক, আর একদিন এসে খেয়ে যাবে এখন। চল আমি দরজা দিয়ে আসছি।

দরজা খুলে বাইরে যাব, মামী আমার একটা হাত চেপে ধ'রে বল্লে, একটু দাঁড়াও ভাগ্নে, সামলে নি।

প্রদীপের আলোতে দেখলাম, মামীর সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপছে! একটু সুস্থ হয়ে বল্লে, ওঁর রক্ত পড়া দেখলেই আমার এরকম হয়। বাঁশী শুনেও হ'তে পারে। আচ্ছা এবার এসো ভাগ্নে, শীগগির আর একদিন আসবে কিন্তু।

বললাম, মামার বাঁশী ছাড়াতে পারি কিনা একবার চেষ্টা ক'রে দেখব মামী?

মামী ব্যগ্র কণ্ঠে বল্লে, পারবে? পারবে তুমি? যদি পার ভাগ্নে, শুধু তোমার যতীন মামাকে নয়, আমাকেও প্রাণ দেবে।

অতসী মামী ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

রাস্তায় নেমে বললাম, খিলটা লাগিয়ে দাও মামী।

—দুই—

কেবলই মনে হয়, নেশাকে মানুষ এত বড় দাম দেয় কেন। লাভ কি? এই যে যতীন মামা পলে পলে জীবন উৎসর্গ ক'রে সুরের জাল বুনবার নেশায় মেতে যান, মানি তাতে আনন্দ আছে। যে সৃষ্টি করে তারও, যে শোনে তারও। কিন্তু এত চড়া মূল্য দিয়ে কি সেই আনন্দ কিনতে হবে? এই যে স্বপ্ন সৃষ্টি এ তো ক্ষণিকের! যতক্ষণ সৃষ্টি করা যায় শুধু ততক্ষণ এর স্থিতি। তারপর বাস্তবের কঠোরতার মাঝে এ স্বপ্নের চিহ্নও তো খুঁজে পাওয়া যায় না। এ নিরর্থক মায়া সৃষ্টি ক'রে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস কেন? মানুষের মন কি বিচিত্র! আমারও ইচ্ছে করে যতীন মামার মত সুরের আলোয় ভুবন ছেয়ে ফেলে, সুরের আগুন গগনে বেয়ে তুলে পলে পলে নিজেকে শেষ করে আনি! লাভ নেই? নাই বা রইল।

এতদিন জানতাম, আমিও বাঁশী বাজাতে জানি। বন্ধুরা শুনে প্রশংসাও করে এসেছে। বাঁশী বাজিয়ে আনন্দও যে না পাই তা নয়। কিন্তু যতীন মামার বাঁশী শুনে এসে মনে হল, বাঁশী বাজান আমার জন্যে নয়। এক একটা কাজ করতে এক একজন লোক জন্মায়, আমি বাঁশী বাজাতে জন্মাইনি। যতীন মামা ছাড়া বাঁশী বাজাবার অধিকার কারো নেই।

থাকতে পারে কারো, অধিকার। কারো কারো বাঁশী হয়ত যতীন মামার বাঁশীর চেয়েও মনকে উতলা ক'রে তোলে, আমি তাদের চিনি না।

একদিন বল্লাম, বাঁশী শিখিয়ে দেবে মামা?

যতীন মামা হেসে বল্লে, বাঁশী কি শেখাবার জিনিষ ভাগ্নে? ও শিখতে হয়।

তা ঠিক। আর শিখতেও হয় মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে। নইলে আমার বাঁশী শেখার মতই সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।

অতসী মামীকে সেদিন বিদায় নেবার সময় যে কথা বলেছিলাম সে কথা ভুলি নি। কিন্তু কি ক'রে যে যতীন মামার বাঁশী ছাড়াবো ভেবে পেলুম না। অথচ দিনের পর দিন যতীন মামা যে এই সর্ব্বনাশা নেশায় পলে পলে মরণের দিকে এগিয়ে যাবে একথা ভাবতেও কষ্ট হল। কিন্তু করা যায় কি? মামীর প্রতি যতীন মামার যে ভালবাসা তার বোধ হয় তল নেই, মামীর কান্নাই যখন ঠেলেছেন তখন আমার সাধ্য কি তাকে ঠেকিয়ে রাখি!

একদিন বল্লাম, মামা আর বাঁশী বাজাবেন না।

যতীন মামা চোখ বড় বড় করে বল্লেন, বাঁশী বাজাব না? বল কি ভাগ্নে? তাহলে বাঁচবো কি ক'রে?

বললাম, গলা দিয়ে রক্ত উঠছে, মামী কত কাঁদে।

তা আমি কি করব? একটু আধটু কাঁদা ভাল। ব'লে হাঁকলেন, অতসী! অতসী!

মামী এল।

অতসী মামী

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মামা বল্লেন, কান্না কি জন্যে শুনি ? বাঁশী ছেড়ে দিয়ে আমায় মরতে বলো নাকি ? তাতে কান্না বাড়বে,কমবেনা। মামী ম্লানমুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মামা বল্লেন, জান ভাগ্নে, এই অতসীর জ্বালায় আমার বেঁচে থাকা ভার হয়ে উঠেছে। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লেন, নড়বার নাম নেই। ওর ভার ঘাড়ে না থাকলে বাঁশী বগলে মনের আনন্দে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়ানো টেরানো সব মাথায় উঠেছে।

মামী বল্লে, যাওনা বেড়াতে, আমি ধ'রে রেখেছি ?

রাখোনি ? ব'লে মামা এমনি ভাবে চাইলেন যেন নিজের চোখে তিনি অতসী মামীকে খুন করতে দেখেছেন আর মামী এখন তাঁর সমুখেই সে কথা অস্বীকার করছে।

মামীর চোখে জল এল। অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বল্লে, অমন করতো আমি একদিন—

মামা একেবারে জল হয়ে গেলেন। আমার সামনেই মামীর হাত ধ'রে কোঁচার কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন, ঠাট্টা করছিলাম, সত্যি বলছি অতসী,—

চট্‌ ক'রে হাত ছাড়িয়ে মামী চ'লে গেল।

আমি বল্‌লাম, কেন মিথ্যে চটালেন মামীকে ?

যতীন মামা বল্লেন, চটেনি। লজ্জায় পালালো।

কিন্তু একদিন যতীন মামাকে বাঁশী ছাড়তে হল। মামীই ছাড়াল।

মামীরএকদিন হটাৎ টাইফয়েড জ্বর হল।

সেদিন বুঝি জ্বরের সতর দিন। সকাল নটা বাজে। মামী ঘুমুচ্ছে, আমি তার মাথায় আইস ব্যাগটা চেপে ধ'রে আছি। যতীন মামা একটা টুলে ব'সে ম্লানমুখে চেয়ে আছেন। রাত্রি জেগে তাঁর শরীর আরও শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল উস্কো খুস্কো।

হটাৎ টুল ছেড়ে উঠে মামা ট্রাঙ্কটা খুলে বাঁশীটা বার করলেন। আজ সতর দিন এটা বাক্সেই বন্ধ ছিল।

সবিস্ময়ে বল্লাম, বাঁশী কি হবে মামা ?

ছেঁড়া পাম্পসুতে পা ঢুকোতে ঢুকোতে মামা বল্লেন, বেচে দিয়ে আসব।

তার মানে ?

যতীন মামা ম্লান হাসি হেসে বল্লেন, তার মানে ডাক্তার রায়কে আর একটা কল দিতে হবে।

বল্‌লাম, বাঁশী থাক, আমার কাছে টাকা আছে।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হেসে যতীন মামা পেরেকে টাঙ্গান জামাটা টেনে নিলেন।

যদি দরকার পড়ে ভেবে পকেটে কিছু টাকা এনেছিলাম। মিথ্যা চেষ্টা। আমার মেজ মামা কতবার কত বিপদে যতীন মামাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছেন, যতীন মামা একটি পয়সা নেননি। বল্‌লাম, কোথাও যেতে হবেনা মামা, আমি কিনবো বাঁশী।

মামা ফিরে দাড়ালেন। বল্লেন, তুমি কিনবে ভাগ্নে ? বেশতো !

বললাম, কতদাম ?

বল্লেন, একশ পঁয়ত্রিশে কিনেছি, একশো টাকায় দেবো। বাঁশী ঠিক আছে, কেবল সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এই যা।

বললাম, আপনি না সেদিন বলছিলেন মামা, এরকম বাঁশী খুঁজে পাওয়া দায়, অনেক বেছে আপনি কিনেছেন ? আমি একশো পঁয়ত্রিশ দিয়েই ওটা কিনবো।

যতীন মামা বল্লেন, তাকি হয় ! পুরোনো জিনিষ—

বল্‌লাম, আমাকে কি জোচ্চোর পেলেন মামা ? আপনাকে ঠকিয়ে কম দামে বাঁশী কিনবো ?

পকেটে দশটাকার তিনটে নোট ছিল বার ক'রে মামার হাতে দিয়ে বল্‌লাম, ত্রিশ টাকা আগাম নিন্, বাকী টাকাটা বিকেলে নিয়ে আসবো।

যতীন মামা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে নোটকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা !

আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যতীন মামার মুখের ভাবটা দেখবার সাধ্য হল না।

যতীন মামা ডাকলেন, ভাগ্নে—

ফিরে তাকালাম।

যতীন মামা হাসবার চেষ্টা ক'রে বল্লেন, খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে ভেবোনা, বুঝলে ভাগ্নে ?

আমার চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে মামীর শিয়রে গিয়ে বসলাম।

মামীর ঘুম ভাঙ্গেনি, জানতেও পারল না যে রক্তপিপাসু বাঁশীটা ঝলকে ঝলকে মামার রক্ত পান করছে, আমি আজ সেই বাঁশীটা কিনে নিলুম।

মনে মনে বল্লাম মিথ্যে আশা। এযে বালির বাঁধ! একটা বাঁশী গেল, আর একটা কিনতে কতক্ষণ? লাভের মধ্যে যতীন মামা একান্ত প্রিয়বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবার বেদনাটাই পেলেন।

বিকালে বাকী টাকা এনে দিতেই যতীন মামা বল্লেন, বাড়ী যাবার সময় বাঁশীটা নিয়ে যেও।

আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, থাকনা এখন কদিন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

যতীন মামা বল্লেন, না। পরের জিনিষ আমি বাড়ীতে রাখি না। বুঝলাম, পরের হাতে চলে যাওয়া বাঁশীটা চোখের ওপরে থাকা তাঁর সহ্য হবে না।

বললাম বেশ মামা, তাই নিয়ে যাব এখন।

মামা ঘাড় নেড়ে বল্লেন, হাঁ, নিয়েই যেও। তোমার জিনিষ এখানে কেন ফেলে রাখবে। বুঝলে না?

উনিশ দিনের দিন মামীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল।

যতীন মামা টুলটা বিছানার কাছে টেনে এনে মামীর একটা হাত মুঠো ক'রে ধ'রে নীরবে তার রোগশীর্ণ ঝরা ফুলের মত ম্লান মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

হটাৎ অতসী মামী বল্ল, ওগো আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না।

যতীন মামা বল্লেন, তাকি হয় অতসী, তোমায় বাঁচতে হবেই। তুমি না বাঁচলে আমিও যে বাঁচবো না।

মামী বল্লে, বালাই, বাঁচবে বৈকি। ত্মাখো, আমি যদি নাই বাঁচি, আমার একটা কথা রাখবে?

যতীন মামা নত হয়ে বল্লেন, রাখবো। বল।

বাঁশী বাজান ছেড়ে দিও। তিল তিল ক'রে তোমার শরীর ক্ষয় হচ্ছে দেখে ওপারে গিয়েও আমার শান্তি থাকবে না। রাখবে আমার কথা?

মামা বল্লেন, তাই হবে অতসী। তুমি ভাল হয়ে ওঠো, আমি আর বাঁশী ছোঁব না।

মামীর শীর্ণ ঠোঁটে সুখের হাসি ফুটে উঠল। মামার একটা হাত বুকের ওপর টেনে শ্রান্তভাবে মামী চোখ বুজল।

আমি বুঝলাম যতীন মামা আজ তাঁর রোগশয্যাগতা অতসীর জন্য কতবড় একটা ত্যাগ করলেন। অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত ঐ কটি কথা, তুমি ভাল হয়ে ওঠো, আমি আর বাঁশী ছোঁব না, অন্যে না বুঝুক আমিত যতীন মামাকে চিনি, আমি জানি, অতসী মামীও জানে, ঐ কথাকটির পেছনে কতখানি জোর আছে! বাঁশী বাজাবার জন্য মন উন্মাদ হয়ে উঠলেও যতীন মামা আর বাঁশী ছোঁবেন না।

শেষ পর্য্যন্ত মামী ভাল হয়ে উঠল। যতীন মামার মুখে হাসি ফুটল। মামী যেদিন পথ্য পেল সেদিন হেসে মামা বল্লেন, কি গো, বাঁচবে না বটে? অমনি মুখের কথা কি না! চাঁড়াল খুরোর কাছ থেকেই তোমায় ছিনিয়ে এনেছি, যম ব্যাটা তো ভাল মানুষ।

আমি বললাম, চাঁড়াল খুড়ো আবার কি মামা?

মামা বল্লেন, তুমি জান না বুঝি? সে এক দ্বিতীয় মহাভারত।

মামী বল্লে, গুরুনিন্দা কোর না।

মামা বল্লেন, গুরুনিন্দা কি? গুরুতর নিন্দা করব। ভাগ্নেকে দেখাওনা অতসী, তোমার পিঠের দাগটা!

মামীর বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মামা ইতিহাসটা শুনিয়ে দিলেন। নিজের খুড়ো নয়, বাপের পিসতুতো ভাই। মা বাবাকে হারিয়ে সতর বছর বয়স পর্য্যন্ত ঐ খুড়োর কাছেই অতসী মামী ছিল। অত বড় মেয়ে তাকে কিল চড় লাগাতে খুড়োটির বাধত না, আনুষঙ্গিক অন্য সব তো ছিলই। খুড়োর মেজাজের একটি অক্ষয় চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত মামীর পিঠে আছে। পাশের বাড়ীতেই যতীন মামা বাঁশী বাজাতেন আর আকণ্ঠ মদ খেতেন। প্রায়ই খুড়োর গর্জ্জন আর অনেক রাতে মামীর চাপা কান্নার শব্দে তাঁর নেশা ছুটে যেত। নিতান্ত চ'টে একদিন মেয়েটাকে নিয়ে পলায়ন করলেন এবং বিয়ে ক'রে ফেল্লেন।

মামার ইতিহাস বলা শেষ হলে অতসী মামী ক্ষীণ হাসি হেসে বল্লে, তখন কি জানি মদখায়! তাহলে কখ্খনো আসতুম না।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মামা বল্লেন, তখন কি জানি তুমি মাথার রতন হয়ে আঠার মত লেপ্টে থাকবে! তাহলে কখ্খনো উদ্ধার করতাম না। আর মদ না খেলে কি এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে মেয়ে চুরি করার মত বিশ্রী কাজটা করতে পারতাম গো! আমি ভেবেছিলাম, বছর খানেক—

মামী বল্লে, যাও, চুপ কর। ভাগ্নের সামনে যা তা ব'কো না।

মামা হেসে চুপ করলেন।

মাস দুই পরের কথা।

কলেজ থেকে সটান যতীনমামার ওখানে হাজির হ'লাম। দেখি, জিনিষ পত্র যা ছিল বাঁধা ছাঁদা হ'য়ে প'ড়ে আছে।

অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, এসব কি মামা?

যতীন মামা সংক্ষেপে বল্লেন, দেশে যাচ্ছি।

দেশে? দেশ আবার আপনার কোথায়?

যতীনমামা বল্লেন, আমার কি একটা দেশও নেই ভাগ্নে? পাঁচশো টাকা আয়ের জমিদারী আছে দেশে, খবর রাখো?

অতসীমামা বল্লে, হয়ত জন্মের মতই তোমাদের ছেড়ে চল্লাম ভাগ্নে। আমার অসুখের জন্যই এটা হল।

বললাম, তোমার অসুখের জন্য? তার মানে?

মামা বল্লেন, তার মানে বাড়ীটা বিক্রি ক'রে দিয়েছি। যিনি কিনেছেন পাশের বাড়ীতেই থাকেন, মাঝখানের প্রাচীরটা ভেঙে দুটো বাড়ী এক ক'রে নিতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বল্লাম, এত কাণ্ড করলে মামা, আমাকে একবার জানালে না পর্য্যন্ত! কবে যাওয়া ঠিক হ'ল?

বাঁধা বিছানা আর তালাবন্ধ বাক্সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামা বল্লেন, আজ। রাত্রে ঢাকা মেলে রওনা হব। আমরা বাঙ্গাল হে ভাগ্নে, জান না বুঝি? ব'লে মামা হাসলেন। অবাক মানুষ! এমন অবস্থায় হাসিও আসে!

গম্ভীর ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, আচ্ছা, আসি যতীনমামা, আসি মামী। ব'লে দরজার দিকে অগ্রসর হ'লাম।

অতসীমামী উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধ'রে বল্লে, লক্ষ্মী ভাগনে, রাগ কোর না। আগে থাকতে তোমায় খবর দিয়ে লাভ তো কিছু ছিল না, কেবল মনে ব্যথা পেতে। যে ভাগ্নে তুমি, কত কি হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলতে ঠিক আছে কিছু?

আমি ফিরে গিয়ে বাঁধা বিছানাটার ওপর ব'সে বল্লাম, আজ যদি না আসতাম, একটা খবর ও তো পেতাম না। কাল এসে দেখতাম, বাড়ী ঘর খাঁ খাঁ করছে।

যতীন মামা বল্লেন, আরে রামঃ! তোমায় না ব'লে কি যেতে পারি? দুপুর বেলা সেনের ডাক্তারখানা থেকে ফোন ক'রে দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ীতে। কলেজ থেকে বাড়ী ফিরলেই খবর পেতে।

বাড়ী আর গেলাম না। শিয়ালদ' ষ্টেসনে মামামামীকে উঠিয়ে দিতে গেলাম। গাড়ী ছাড়ার আগে কতক্ষণ সময় যে কি ক'রেই কাটল! কারো মুখেই কথা নেই। যতীন মামা কেবল মাঝে মাঝে দুএকটা হাসির কথা বলছিলেন এবং হাসাচ্ছিলেনও। কিন্তু তাঁর বুকের ভেতর যে কি করছিল সে খবর আমার অজ্ঞাত থাকেনি।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বাজলে যতীন মামা আর অতসী মামীকে প্রণাম ক'রে গাড়ী থেকে নামলাম। এইবার যতীন মামা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর বোধ হয় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে মামী ডাকল, শোনো। কাছে গেলাম। মামী বল্লে, তোমাকে ভাগ্নে বলি আর যাই বলি, মনে মনে জানি তুমি আমার ছোট ভাই। পারত একবার বেড়াতে গিয়ে দেখা দিয়ে এসো। আমাদের হয়ত আর কলকাতা আসা হবেনা, জমির ভারি ক্ষতি হয়ে গেছে। যেও, কেমন ভাগ্নে?

মামীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ ক'রে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালাম, যাব।

বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়ল। যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দূরের লাল সবুজ আলোক বিন্দুর ওপারে যখন একটি চলন্ত লাল বিন্দু অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ফিরলাম। চোখের জলে দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে গেছে।

—তিন—

মানুষের স্বভাবই এই যখন যে দুঃখটা পায় তখন সেই দুঃখটাকেই সবার বড় ক'রে দেখে। নইলে কে ভেবেছিল, যে যতীন মামা আর অতসী মামীর বিচ্ছেদে একুশ বছর বয়সে আমার দুচোখ জলে ভ'রে গিয়েছিল সেই যতীন মামা আর অতসী মামী একদিন আমার মনের এক কোণে সংসারের সহস্র আবর্জ্জনার তলে চাপা প'ড়ে যাবেন।

জীবনে অনেকগুলি ওলোট পালট হ'য়ে গেল। বি, এ পাশ ক'রে বার হ'তে না হ'তে ভাগ্য আমার ঘাড় ধ'রে যৌবনের কল্পনার সুখস্বর্গ থেকে বাস্তবের কঠোর পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। ব্যবসা ফেল পড়ল। বাবা মনের দুঃখে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বালিগঞ্জের বাড়ীটা পর্য্যন্ত বিক্রি ক'রে পিতৃঋণ শোধ দিয়ে আশি টাকা মাইনের একটা চাকরি নিয়ে শ্যাম বাজার অঞ্চলে ছোট একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে উঠে গেলাম। মার কাঁদা কাটায় গ'লে একটা বিয়েও ক'রে ফেল্লাম।

প্রথমটা সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তেতো লাগতে লাগল, জীবনটা বিস্বাদ হ'য়ে গেল, আশা আনন্দের এতটুকু আলোড়নও ভেতরে খুঁজে পেলাম না।

তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হ'য়ে গেল। নূতন জীবনে রসের খোঁজ পেলাম। জীবনের জুয়াখেলায় হারজিতের কথা কদিন আর মানুষ বুকে পুরে রাখতে পারে?

জীবনে যখন এই সব বড় বড় ঘটনা ঘটছে তখন নিজেকে নিয়ে আমি এমনি ব্যাপৃত হ'য়ে পড়লাম যে কবে এক যতীন মামা আর অতসী মামীর স্নেহ পরম সম্পদ ব'লে গ্রহণ করেছিলাম সে কথা মনে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে গেল। সাত বছর পরে আজ কচিৎ কখনো হয়ত একটা অস্পষ্ট স্মৃতির মত তাদের কথা মনে পড়ে।

মাঝে একবার মনে পড়েছিল, যতীন মামাদের দেশে চ'লে যাওয়ার বছর তিনেক পরে। সেইবার ঢাকা মেলে কলিসন হয়। মৃতদের নামের মাঝে যতীন্দ্রনাথ রায় নামটা দেখে যে খুব একটা ঘা লেগেছিল সে কথা আজও মনে আছে। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু হয়নি। সেইদিন আপিস থেকে ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর কঠিন অসুখ। মনে পড়ে যতীন মামার দেশের ঠিকানায় একটা পত্র লিখে দিয়ে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, ও নিশ্চয় আমার যতীন মামা নয়। পৃথিবীতে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অভাব নেই তো। সে চিঠির কোন জবাব আসেনি। স্ত্রীর অসুখের হিড়িকে কথাটাও আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আরও চারটে বছর কেটে গেছে।

আমার ছোট বোন বীণার বিয়ে হয়েছিল ঢাকায়। বীণার স্বামী তারক সেখানে কলেজের প্রফেসার।

পুজোর সময় বীণাকে তারা পাঠাল না। অগ্রহায়ণ মাসে বীণাকে আন্‌তে ঢাকা গেলাম। কিন্তু আনা হ'ল না। গিয়েই দেখি বীণার শ্বশুড়ীর খুব অসুখ। আমি যাবার আগের দিন হু হু ক'রে জ্বর এসেছে। ডাক্তার আশঙ্কা করছেন নিউমোনিয়া।

ছুটি ছিল না, ক্ষুণ্ণ হ'য়ে একাই ফিরলাম। তারক বল্লে, মা ভাল হ'লেই আমি নিজে গিয়ে রেখে আসব, সুরেশ বাবু।

গোয়ালন্দে ষ্টিমার থেকে নেমে ট্রেণের একটা ইণ্টারে ভিড় কম দেখে উঠে পড়লাম। দুটি মাত্র ভদ্রলোক, এক-কোণে র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটি স্ত্রীলোক, খুব সম্ভব এঁদের একজনের স্ত্রী, জিনিষ পত্রের একান্ত অভাব। খুসী হ'য়ে একটা বেঞ্চিতে কম্বলের ওপর চাদর বিছিয়ে বিছানা করলাম। বালিশ ঠেসান দিয়ে আরাম ক'রে ব'সে, পা দুটো রাগ দিয়ে ঢেকে একটা ইংরাজী মাসিক পত্র বার ক'রে ওপেনহেমের ডিটেকটিভ গল্পে মনঃসংযোগ করলাম।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়ল এবং পরের ষ্টেশনে থামল। আবার চলল। ওটা ঢাকা মেল বটে, কিন্তু পোড়াদ' পর্য্যন্ত

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক ষ্টেশনে থেমে থেমে প্যাসেঞ্জার হিসেবেই চলে। পোড়াদ'র পর ছোটখাটো ষ্টেসনগুলি বাদ দেয় এবং গতিও কিছু বাড়ায়।

গোয়ালন্দের পর গোটা তিনেক ষ্টেসন পরে একটা ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াতে ভদ্রলোক দুটি জিনিষপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। স্ত্রীলোকটি কিন্তু তেমনি ভাবে ব'সে রইলেন।

ব্যাপার কি ? একে ফেলেই দেখছি সব নেমে গেলেন। এমন অন্যমনস্কও তো কখন দেখিনি! ছোটখাট জিনিষই মানুষের ভুল হয়, একটা আস্ত মানুষ, তাও আবার এক-জনের অর্দ্ধাঙ্গ, তাকে আবার কেউ ভুল ক'রে ফেলে যায়!

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলুম পিছনে দৃকপাত মাত্র না ক'রে তাঁরা ষ্টেসনের গেট পার হচ্ছেন।

হয়ত ভেবেছেন, চিরদিনের মত আজও স্ত্রীটি তার পিছু পিছু চলেছে।

চেঁচিয়ে ডাকলুম, ও মশায়— মশায় শুনছেন ?

গেটের ওপারে ভদ্রলোক দুটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। বাঁশী বাজিয়ে গাড়ীও ছাড়ল।

অগত্যা নিজের জায়গায় ব'সে প'ড়ে ভাবলাম, তবে কি ইনি একাই এসেছেন নাকি ? বাঙালীর মেয়ে নিশ্চয়ই, র‍্যাপার দিয়ে নিজেকে ঢাকবার কায়দা দেখেই সেটা বোঝা যায়। বাঙালীর মেয়ে, এই রাত্রি বেলা নিঃসঙ্গ যাচ্ছে, তাও আবার পুরুষদের গাড়ীতে—

আরে! এটা পুরুষদেরগাড়ী ঠিক ত ?

চট ক'রে দুদিকের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চাঁদের আলোতে ভাল ক'রে বাইরেটা দেখে নিলাম। মেয়ে-গাড়ীর কোন চিহ্নই তো লটকান নেই!

একটু ভেবে বল্লাম, দেখুন, শুনছেন ?

সাড়া নেই।

বল্লাম, আপনার সঙ্গীরা সব নেমে গেছে, শুনছেন ?

কথাগুলি যে আলোয়ান ভেদ করে ভেতরে গেল তার কোন চিহ্নই দেখা গেল না।

কি মুস্কিল! অপরিচিতা মেয়েদের সম্বোধন করবার কোন শব্দই তো বাঙলা ভাষায় নেই! মা বলা যায়, কিন্তু সেটা কেমন কেমন ঠেকে। শেষকালে এক সঙ্গী-পরিত্যক্ত নারীর ঝুঁকি ঘাড়ে পড়বে নাকি ?

বেঞ্চের কাছে স'রে গিয়ে বল্লাম, দেখুন, আপনার স্বামী আগের ষ্টেসনে নেমে গেছেন।

এইবার আলোয়ানের পোঁটলা নড়ল, এবং আলোয়ান ও ঘোমটা স'রে গিয়ে যে মুখখানা বার হ'ল দেখেই আমি চমকে উঠলাম।

কিছু নেই, সে মুখের কিছুই এতে নেই। আমার অতসী মামার মুখের সঙ্গে এ মুখের অনেক তফাং। কিন্তু আমার মনে হ'ল, এ আমার অতসী মামীই!

মৃদু হেসে বল্লে, গলা শুনেই মনে হয়েছিল এ আমার ভাগ্নের গলা। কিন্তু অতটা আশা করতে পারিনি। মুখ বার করতে ভয় হচ্ছিল, পাছে আশা ভেঙে যায়।

আমি সবিস্ময়ে ব'লে উঠলাম, অতসী মামী!

মামী বল্ল, খুব বদলে গেছি, না ?

মামীর সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কাপড়ে পাড়ের চিহ্নও খুঁজে পেলাম না।

চার বছর আগে ঢাকামেল কলিশনে মৃতদের নামের তালিকায় একটা অতি পরিচিত নামের কথা মনে পড়ল। যতীন মামা তবে সত্যিই নেই!

আস্তে আস্তে বল্লাম, খবরের কাগজে মামার নাম দেখেছিলাম মামী, বিশ্বাস হয়নি সে আমার যতীন মামা। একটা চিঠি লিখেছিলাম, পাওনি ?

মামী বল্লে, না। তারপরেই আমি ওখান থেকে দুতিন মাসের জন্য চ'লে যাই।

বল্লাম, কোথায় ?

আমার এক দিদির কাছে, দূর সম্পর্কের অবশ্য।

আমায় কেন একটা খবর দিলেনা মামী ?

মামী চুপ ক'রে রইল।

ভাগ্নের কথা বুঝি মনে ছিল না ?

মামী বল্লে, তা নয়, কিন্তু খবর দিয়ে আর কি হোত! যা হবার তা তো হয়েই গেল। বাঁশীকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না! তোমার মেজ মামার কাছে তোমার কথাও সব শুনলাম, আমার

দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমায় আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হ'ল না। জানিত, একটা খবর দিলেই তুমি ছুটে আসবে!

চুপ ক'রে রইলাম। বলবার কি আছে? কি নিয়েই বা অভিমান করব? খবরের কাগজে যতীন মামার নাম প'ড়ে একটা চিঠি লিখেই তো আমার কর্ত্তব্য শেষ করেছিলাম।

মামী বল্লে, কি করছ এখন ভাগ্নে?

চাকরী। এখন তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মামী বল্লে, একটু পরেই বুঝবে। ছেলে পিলে কটি?

আশ্চর্য্য! জগতে এত প্রশ্ন থাকতে এই প্রশ্নটাই সকলের আগে মামীর মনে জেগে উঠল!

বল্লাম, একটি ছেলে।

ভারি ইচ্ছে করছে আমার ভাগ্নের খোকাকে দেখে আসতে। দেখাবে একবার? কার মত হয়েছে? তোমার মত, না তার মার মত? কত বড় হয়েছে?

বল্লাম, তিন বছর চলছে। চলন আমাদের বাড়ী মামী, বাকী প্রশ্নগুলির জবাব নিজের চোখেই দেখে আসবে?

মামী হেসে বল্লে, গিয়ে যদি আর না নড়ি?

বল্লাম, তেমন ভাগ্য কি হবে! কিন্তু সত্যি কোথায় চলেছ মামী? এখন থাক কোথায়?

মামী বল্লে, থাকি দেশেই। কোথায় যাচ্ছি, একটু পরে বুঝবে। ভাল কথা, সেই বাঁশীটা কি হ'ল ভাগ্নে?

এইখানে আছে।

এইখানে? এই গাড়ীতে?

বল্লাম, হুঁ। আমার ছোট বোন বীণাকে আনতে গিয়েছিলাম, সে লিখেছিল বাঁশীটা নিয়ে যেতে। সবাই নাকি শুনতে চেয়েছিল।

মামী বল্লে, তুমি বাজাতে জান নাকি? বার করনা লক্ষ্মী বাঁশীটা—

ওপর থেকে বাঁশীর কেসটা পাড়লাম। বাঁশীটা বার করতেই মামী ব্যগ্র হস্তে টেনে নিয়ে এক দৃষ্টিতে সেটার দিকে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, বিয়ের পর এটাকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছিলাম, মাঝখানে এর চেয়ে বড় শত্রু আমার ছিল না, আজ আবার এটাকে পরম বন্ধু ব'লে মনে হচ্ছে। কি ভালই বাসতেন এটাকে! শেষ তিনটা বছর বাঁশীটার জন্য ছটফট ক'রে কাটিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে বাঁশী বাজান ছাড়তে না বল্লেই হয়ত ভাল হ'ত। বাঁশীর ভেতর দিয়ে মরণকে বরণ করলে তবু শান্তিতে যেতে পারতেন। শেষ কটা বছর এত মনকষ্ট ভোগ করতে হ'ত না।

বাঁশীর অংশগুলি লাগিয়ে মামী মুখে তুলল। পরক্ষণে ট্রেণের ঝমঝমানি ছাপিয়ে চমৎকার বাঁশী বেজে উঠল। পাকা গুণীর হাতের স্পর্শ পেয়ে বাঁশী যেন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব্ব বেদনাময় সুরের জাল বুনে চলল।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ তো অল্প সাধনার কাজ নয়। যার তার হাতে বাঁশীতো এমন অপূর্ব্ব কান্না কাঁদে না! মামীর চক্ষু ধীরে ধীরে নিমীলিত হ'য়ে গেল। তার দিকে চেয়ে ভবানীপুরের একটা অতি ক্ষুদ্র বাড়ীর প্রদীপের স্বল্পালোকে আলোকিত বারান্দার দেয়ালে ঠেস দেয়া এক সুর-সাধকের সমাধিমগ্ন মূর্ত্তির ছবি আমার মনে জেগে উঠল।

মাঝে সাতটা বছর কেটে গেছে। যতীন মামার যে অপূর্ব্ব বাঁশীর সুর একদিন শুনেছিলাম, সে সুর মনের তলে কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ অতসী মামীর বাঁশী শুনে মনে হ'তে লাগল সেই হারিয়ে যাওয়া সুরগুলি যেন ফিরে এসে আমার প্রাণে মৃদুগুঞ্জন সুরু ক'রে দিয়েছে।

এক সময়ে বাঁশী থেমে গেল। মামীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝ'রে পড়ল। আমারও।

কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বল্লাম, মামী, এ কথাটাও তো গোপন রেখেছিলে!

মামী বল্লে, বিয়ের পর শিখিয়েছিলেন। বাঁশী শিখবার কি আগ্রহই তখন আমার ছিল! তারপর যেদিন বুঝলাম বাঁশী আমার শত্রু সেইদিন থেকে আর ছুঁইনি। আজ কতকাল পরে বাজালাম। মনে হয়েছিল, বুঝি ভুলে গেছি!

ট্রেণ এসে একটা ষ্টেসনে দাঁড়াল। মামী জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে আলোর গায়ে লেখা ষ্টেসনের নামটা প'ড়ে ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বলল, পরের ষ্টেসনে আমি নেমে যাব ভাগ্নে।

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পরের ষ্টেসনে ! কেন ?

মামী বল্লে, আজ কত তারিখ, জান ?

বল্লাম, সতরই অঘ্রাণ।

মামী বল্লে, চার বছর আগে আজকের দিনে—বুঝতে পারছ না তুমি ?

মুহূর্ত্তে সব দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। ঠিক্ ! চার বছর আগে এই সতরই অঘ্রাণ ঢাকা মেলে কলিশন হয়েছিল। সেদিনও এমনি সময়ে এই ঢাকা মেলটির মত সেই গাড়ীটা শত শত নিশ্চিন্ত আরোহীকে পলে পলে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল !

ব'লে উঠলাম, মামী !

মামী স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে, সামনেরই ষ্টেশনের অল্প ওদিকে লাইনের ধারে কঠিন মাটির ওপর তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। প্রত্যেক বছর আজকের দিনটিতে আমি ঐ তীর্থ দর্শন করতে যাই। আমার কাছে আর কোন তীর্থের এতটুকু মূল্য নেই !

হঠাৎ জানালার কাছে স'রে গিয়ে বাইরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামী ব'লে উঠল, ঐ ঐ ঐখানে ! দেখতে পাচ্ছ না ? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একটু স্নেহশীতল স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হ'য়ে রয়েছেন। একটু জল, একটু জলের জন্যেই হয়ত !—উঃ মাগো, আমি তখন কোথায় !

দুহাতে মুখ ঢেকে মামী ভেতরে এসে ব'সে পড়ল।

ধীরে ধীরে গাড়ীখানা ষ্টেসনের ভেতর ঢুকল।

বিছানাটা গুটিয়ে আমি বল্লাম, চল মামী, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মামী বল্লে, না।

বললাম, এই রাত্রে তোমাকে একলা যেতে দিতে পারব না মামী।

মামীর চোখ জ্ব'লে উঠল, ছিঃ ! তোমার তো বুদ্ধির অভাব নেই ভাগ্নে। আমি কি সঙ্গী নিয়ে সেখানে যেতে পারি ? সেই নির্জ্জন মাঠে সমস্ত রাত আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি, সেখানে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় ! ঐখানের বাতাসে যে তাঁর শেষ নিশ্বাস রয়েছে ! অবুঝ হয়ো না—

গাড়ী দাঁড়াল।

বাঁশীটা তুলে নিয়ে মামী বল্ল, এটা নিয়ে গেলাম ভাগ্নে ! এটার ওপর তোমার চেয়ে আমার দাবী বেশী।

দরজা খুলে অতসী মামী নেমে গেলেন। আমি নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম।

আবার বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছাড়ল। খোলা দরজাটা একটা করুণ শব্দ ক'রে আছড়ে বন্ধ হ'য়ে গেল।

ওং।

.চতসঃ ॥

গীতা ১৫-১১

কবি-প্রিয়া

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কবিদের প্রিয়তমা কেমন ধারা,
দেখেনি যারা কভু, শুধায় তারা—
আকাশের আলোর মতন, রবির মতন ?
বাতাসের গতির মতন লক্ষ্মীছাড়া ?

তারা কি ফুলের মতন হাওয়ায় দোলে ?
তারা কি ক্ষণপ্রভা— মেঘের কোলে ?
কোকিলের মাতাল গলায় 'কুহু'র মতন
ফাগুনের আগুনবাণী যায় কি ব'লে ?

বাদলের ধারা তারা ঝরঝর ?
বনেরি দ্বিপ্রহরের মরমর ?
সাঁঝেরি আধা আলো অন্ধকারে
জলেরি কাঁপন কি গো থরথর ?

যে নারী দেখছি সদা চোখের পরে,
বিরাজে এ সংসারের সকল ঘরে,
সে নারী হাসে-কাঁদে সুখে-দুখে,
নিজেরি স্বার্থ নিয়ে বাঁচে মরে ;—

কবিদের প্রিয়ারা কি তেমনি হবে ?
চলে সব গড্ডলিকার প্রলয়-রবে ?
তারা কি দেহ মনে এমনি ধারাই ?--
কবিদের নেশা কি সে জাগায় তবে ?

কবিরা গানে যে গো বন্যা আনে !
প্রেমে হয় উচ্ছ্বসিত মনে-প্রাণে !
ভুবনে দেখে সবে প্রিয়া-ভরা !—
তবে কি প্রিয়া তাদের যাদু জানে ?

কবিরা মাতাল হ'ল প্রেমে যারি,
কি জানি কেমন ধারা সেই সে নারী !
যেখানে যত রূপের আভা আছে,
গেল কি একটি মুখের প্রভায় হারি' ?

হবে কি কবি-প্রিয়া যেমন তেমন ?
ভালো সে ? ভালো ? তবু কেমন-কেমন ?
সবারে বাঁধতে পারে মায়ার ডোরে,
তারি সেই চলায় বলায় আছেই এমন ?

তবু তার রূপের আলো, গুণের আলো,
শুধু এক কবির চোখেই লাগুক ভালো !
প্রিয়া মুখ সুধাপানে ছন্দে-গানে
কবিরা, দিকে দিকে শান্তি ঢালো !

৩পস .
বার করতেই মাম।
সেটার দিকে চেয়ে
বল্লে, বিয়ের পর এট

কথা-পুরাতনী

শ্রীভূতনাথ ভট্টাচার্য্য

মরণের দ্বারা নিমন্ত্রিত অতিথি এই দীন লেখকের অন্তর আজি শৈশব-স্মৃতির যে পবিত্র পুলকস্পর্শে সুধাময় হইতেছে, সহৃদয় পাঠক-মহোদয়দিগকে তাহার যৎসামান্য আভাস-প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম ভারতীয় হিন্দু নর-নারীগণের অস্থি-মজ্জাগত। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

অতি প্রাচীন সময় হইতে সর্ব্ববর্ণের হিন্দু-সাধারণ ঐ সকল অভ্রান্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বে কতদূর আস্থাবান্ হইয়া রহিয়াছে, নিম্নলিখিত ব্যাপারটি তাহার প্রতিরূপ-প্রদর্শক।

অন্যূন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমরা যখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম, তখন আমাদের গ্রামে এক শ্রেণীর যাদুকর দল মধ্যে মধ্যে আসিত ও বিবিধ ঐন্দ্রজালিক কৌতুক দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। ক্রীড়ারম্ভের প্রাক্কালে তাহারা "আত্মারাম সরকারের ভাদর বৌ" এই কথাগুলি বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। উত্তরকালে আমার জনৈক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, কথাগুলি নিরর্থক শব্দসমষ্টি মাত্র নহে, ঐ গুলি একটি মন্ত্র; ঐ মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারা যাদুকর "আত্মসার" অর্থাৎ শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে।

এখন এই অন্তিম বয়সে উক্ত "আত্মসার" শব্দের যে অর্থ উপলব্ধি করিয়াছি, পাঠকগণকে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব।

আত্মারাম সরকার স্বয়ং জীবাত্মা আর তাঁহার ভ্রাতৃবধূ (ভাদর বৌ) দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত। দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে আত্ম-প্রত্যয়, মায়া; এই মায়া নিরাকৃত হইলে আত্মচৈতন্যের অবরোধ জন্মে। আত্মা বা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য, হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, জ্ঞাত হইলে নিখিল-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলা-কুশল কৌতুক-প্রদর্শক যেন ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হয়েন এবং বিস্ময়-বিভ্রান্ত দর্শকগণকে মায়ামুগ্ধ করেন। এই অবস্থায় নিপুণ যাদুকর মায়া-রচিত যে সকল কৌতুক প্রদর্শন করেন, সমবেত জনগণ সে-সমস্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়।

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধ-মুক্তো ভবিষ্যসি॥

যোগ-বাশিষ্ঠ—১-৩

আপনাকে দেহেন্দ্রিয়ের অতীত সত্ত্বা অনুভব করিয়া চিৎস্বরূপে অবস্থান করিবামাত্র সাধক সুখী, শান্ত ও মায়া-মুক্ত হইয়া থাকেন।

গীতায় উপদিষ্ট দেহ ও দেহী, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান আর্য্যসন্তানদিগের স্বভাবজাত সংস্কার।

আত্মার সহিত দেহের ভাশুর ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বস্তুতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেব মন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরং॥

গীতা—১৩-৩৫

বাজীকরেরা সাধারণতঃ ইতর শ্রেণীর লোক ও নিতান্ত নিম্নস্তরের হিন্দু, তাহাদের হৃদয়ে বেদান্ত প্রতিপাদ্য "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ", শ্রুত্যুক্ত "সোঽহং" প্রভৃতি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব কি প্রকারে সমুদিত হইল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং।
যতন্তোপ্যকৃতাত্মানো নৈনংপশ্যন্ত্যচেতসঃ॥

গীতা ১৫-১১

যোগিগণ যত্নপূর্ব্বক শরীরস্থ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, কলুষিত-চিত্ত মূঢ়েরা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

জীবের সুখ-দুঃখ ভোক্তৃত্বই সংসারিত্ব। মানব আপনার সুখ দুঃখের অতীত আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলে সংসারের অর্থাৎ বিশ্বমায়ার হস্ত হইতে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করে।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ।
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ॥

তস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ।
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১-১০

ভোজবাজী হইতে আমরা এই এক পরম উপাদেয় শিক্ষা লাভ করি যে, দেহাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক আমরা মুক্তিলাভ করিতে ও অমরত্বের অধিকারী হইতে পারি।

তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যু মেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩-৮।

কাজের লোক

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত

পাখী গান গেয়ে বলে, "শুন মোর স্বর।"
কাজের মানুষ বলে, "নেই অবসর।"
ফুল বলে, "চেয়ে দেখ ফুটেছি কেমন।"
কাজের মানুষ বলে, "রাখ প্রলোভন।"
নদী বলে, "তীরে ব'সে শোন গান"
কাজের মানুষ বলে, "অবসর নাই।"
পূর্ণিমার চাঁদ বলে, "প্রদীপ নিভাও।"
কাজের মানুষ বলে, "কাজ আছে, যাও।"
প্রেম বলে, "এসো দোঁহে বসি পাশাপাশি।"
কাজের মানুষ বলে, "দূর সর্ব্বনাশী।"
মৃত্যু এলো অবশেষে দ্বার তার ঠেলে,
চলিল কাজের লোক কাজকর্ম্ম ফেলে।
"এ বিশ্ব জগতে এলি বৃথা!" কবি কয়,
"হায়, হায়, বিনা কাজে কাটালি সময়"॥

ভ্রাম্যমাণের উড়ো চিঠি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নন্দী পাহাড়,
মহীশূর
২৪-৭-২৮

ভাই সুভাষ,

হঠাৎ আমার কাছ থেকে বহুদিন বাদে একটা বড় চিঠি পেয়ে হয়ত তুমি আশ্চর্য্য হবে। কিন্তু যেহেতু আজ বড়-চিঠি-লিখ্‌ব বড়-চিঠি-লিখব গোছের মনটা করছে, সেহেতু আমি লিখবই, তা তোমার বড় চিঠি পড়ার সময় থাক্ বা না থাক্। বড় চিঠি লেখার এ দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছে কেন যে আমার মনের মধ্যে ঠিক আজই দেখা দিল জানি না। হয়ত অনেকদিন ধ'রে একাদিক্রমে উড়ু-উড়ু বা ভ্রাম্যমাণ হ'লে মনটা চিঠির নিগড়ে ধরা দিতে একটু ব্যগ্র হ'য়েই ওঠে, কিন্তু সে কারণ নিয়ে গবেষণা এখন থাকুক। আমি ভেবেছিলাম যে অব্যবহারে ও অকেজো অভ্যাসটিতে আমার মরচে ধ'রে গেছে, তোমার যেমন গেছে। কিন্তু আজ এ শৈলশিখরে সুখাসীন হ'য়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে স্বভাব না যায় ম'লে। তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করবে যে বড় চিঠি লেখার স্বভাবটা তোমার তা হ'লে বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই বা গেল কি ক'রে? তার উত্তর—তোমাকে যে দেশোদ্ধার করতে হচ্ছে—আমার মতন উড়ো ভ্রমণের মধ্যে থেকে সময়কে কোনো মতে বধ করতে ত হচ্ছে না। কিন্তু তবু জেল থেকে তুমি বড় চিঠি লেখার অভ্যাসটা অন্যের অলক্ষিতে আবার একটু একটু মক্স ক'রে নিচ্ছিলে—এমন সময়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ ঠিক করলেন যে এ অকেজো কাজটিতে তোমাকে ব্যাপৃত না রেখে আবার দেশোদ্ধার-রূপ ঘরের খেয়ে-বনের-মোষ-তাড়ানো কাজে জুড়ে দেওয়াই ঠিক। তুমিও চিঠি পত্র লেখা ছেড়ে দিয়ে দেশোদ্ধারের দেশোদ্ধারে লেগে গেলে—শরৎবাবুর কথা ভুলে "সুভাষ, দেশোদ্ধার করতে যেয়ো না, কেন অনর্থক জেলে যাবে?"

—বিশেষত যখন দেশ উদ্ধার হ'তে চায় না, ও দেশের মধ্যে বিভিন্ন দল কাজের চেয়ে কলহেতেই বেশি রস পায়। তুমি একা কি করবে বল?—তবু বোধ হয় সব চেয়ে বড় গরজ এই রকম অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট্ কিছু একটারই গরজ! আমার সে গরজ নেই। তাই তুমি প্রাণপণে মীটিং ও বক্তৃতা ও নানা গঠনমূলক কাজে ব্যগ্র, আর আমি ভ্রমণ-সুখালস্যে স্তিমিতনয়ন হ'য়ে দীর্ঘ চিঠি লেখা-রূপ অকেজো কাজে রত। কেম্ব্রিজের আমাদের "ত্রয়ী"—বন্ধুর মধ্যে একা আমিই অকেজো র'য়ে গেলাম, তুমি ও ক্ষিতীশ দিলে কর্ম্মে গা ঢেলে।

কিন্তু এই সুখনিলয় হরিৎ-সমৃদ্ধ শৈলশিখরের পান্থাবাসে ব'সে মনের মধ্যে আজ নানা রকম ভাবাবেশ আলস্যের আলোড়নে মনের তলানি ভেদ ক'রে উঠে লেখনীর মুখে ধরা দিতে চাচ্ছে—স্নানার্থীর চরণাঘাতে পুষ্করিণীর তলদেশ-উত্থিত বুদ্বুদের মতনই। তাই মনে করলাম কলম ধ'রে একবার দেখাই যাক্ না—বিশেষত যখন বাইরে মেঘের মেদুরচ্ছায়ায় মনটার অবস্থাও ঘোরালো হ'য়ে এসেছে ও গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি মনটাকে আরো সঙীন গোছের নেশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাই বিজ্ঞ মনটি বল্‌ছে যে এ সময়ে চিঠি লেখার মাধ্যাকর্ষণে উড্ডনোন্মুখ প্রাণটাকে একটু ধরাধামের দিকে দাবিয়ে ধরা'র চেষ্টার মধ্যে আনন্দ আছে; যেহেতু এ-প্রয়াসের মধ্যে আছে দুটো প্রবণতার টাগ্-অফ-ওয়ার—একটা মন্থর গতিতে গা এলিয়ে দিয়ে ভেসে চলা; আর একটা এ-ভেসে-চলার মধ্যে থেকে থেকে মাথা তুলে আশপাশের তীরের একটু খবর নেওয়ার বাসনা; এবং সব প্রয়াসের মধ্যেই একটা-না-একটা সার্থকতা আছে।

তুমি হয়ত বলবে—যদি তুমি না-ও বল জহরলাল নেহরু নিশ্চয়ই বলবেন—এরকম দিবাস্বপ্ন দেখলে চলবে না, জাগ,

জাগ সবে ভারত সন্তান, নইলে—ইত্যাদি। ভ্রাম্যমাণ হওয়াটা একটা মস্ত বিলাস সন্দেহ নেই—কাজেই ওটা হচ্ছে সময়ের নিছক অপব্যয়, একেবারে "বুর্জোয়া" প্রবণতা। এ সম্বন্ধে দুচারটে কথা ক'দিন ধ'রে মনের মধ্যে ভারি গজ্

উটকামাণ্ডের রেস্-কোস

গজ্ ক'রে বেড়াচ্ছে। সেগুলো খুলে না বললে বোধ হয় তাদের অশরীরী প্রেতাত্মার স্বস্ত্যয়ন হবে না। তাই তোমার সময়ের ওপর একটু অত্যাচার করা যাক্।

তুমি জান যে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে ভারি একটা গোলমাল চলেছে ও দু তিনটে ট্রেণ ধর্ম্মঘটীরা ধ্বংস করেছে। লিলুয়ার মতনই ষ্ট্রাইক্ করেছে এদের রেলের শ্রমিকগণ; এবং কতদিন যে ধর্ম্মঘট চলবে বলা যাচ্ছে না। ফলে উটাকামণ্ড থেকে ট্রেণে আসা হ'ল না--মোটরবাসে ক'রে মহীশূর হ'য়ে বাঙ্গালোর আসতে হোল। আসতে না আসতে দু তিনটে গাড়ী জখম—মেলশুদ্ধ। কতলোক যে মারা গেছে কেউ জানে না এখনো। মনটা তাই একটু উদ্বিগ্ন আছে।

দেশময় শ্রমিকদের চাঞ্চল্য। উটাকামণ্ডে একটি বাঙালী মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি একজন মান্দ্রাজী জমিদারকে বিবাহ করেছেন। তিনি বলছিলেন ধর্ম্মঘটকারীদের চেষ্টায় একবার একটি ট্রেণ উল্‌টে যায় ও হবি ত' হ' সেই ট্রেনেই তিনি ও তাঁর স্বামী ছিলেন। তারপর থেকে তিনি ষ্ট্রাইক-রূপ সিঁদুরে মেঘের ছায়াপাত হ'লেও ডরিয়ে ওঠেন।

বেলুড়ের দুর্ঘটনার কথাও কাগজে পড়লাম। তারপরই এখানে একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে দুর্ঘটনা। এতে ভ্রাম্যমাণেরও ভাবনা আসে।

আমি এখানে, অর্থাৎ বাঙ্গালোরে, আমার একটি ইংরাজ বন্ধুর অতিথি। তিনি সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন যে শুধু এভাবে লোকজনের প্রাণহরণ ক'রে যে সমাজের কোনো স্থায়ী হিত সাধিত হবে একথায় আস্থা স্থাপন করা কঠিন; ইংলণ্ডে অনেকেই আজকাল তাই বলেন যে তাঁরা শ্রমিকগণের আদর্শ পছন্দ করেন, কিন্তু শ্রমিকদলকে করেন না।

সেদিন পড়ছিলাম একজন চিন্তাশীল লেখকের লেখা। তিনি বলছেন যে যেহেতু বর্ত্তমান সমাজে মানুষী শক্তির বিপুল অপচয় হচ্ছে সেহেতু সকলেই স্বীকার করছেন আজকাল যে সমাজব্যবস্থার একটা গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু একটা কথা ঠিক্,

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যে শুধু বেপরোয়া, নিরপেক্ষ ভাঙার মধ্যে দিয়েই একটা কিছু গ'ড়ে উঠ্‌বে না। সমাজে কোনো শুভ পরিবর্ত্তন সাধিত করতে হ'লে সব আগে চাই সজাগ পরীক্ষা, আন্তরিক চেষ্টা ও অল্পসংখ্যক বুদ্ধিমান্ লোকেরই প্রতিভার নেতৃত্ব। তিনি dictatorship of the proletariatএ বিশ্বাস করতে পারছেন না। বলছেন রুষদেশে সর্ব্বজ্ঞ প্রলেটারিয়েটদের কর্ত্তৃত্ব শুধু বাজে ফোঁশ ফাঁশ—সেখানে সত্য যা কিছু হচ্ছে সে হচ্ছে চিরকালকার মতনই—ঐ জনকয়েক মাত্র বুদ্ধিমান গঠন-মনীষীর প্রচেষ্টায়। তিনি বলছেন, একটা কথা বুঝবার আজ সময় এসেছে ও সেটা এই যে একগুঁয়েমি ও চিন্তালেশহীন আবেগ দিয়ে বড় কিছু গ'ড়ে তোলা যায় না, ও অন্ধ প্রলেটারিয়েটরা শুধু গালি দেওয়া ও ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। জগতে সৃষ্টি যা কিছু হয়েছে তা সবই অল্পসংখ্যক মানুষের বুদ্ধি ও প্রাণপাত পরিশ্রমে হয়েছে। অন্তত আজ অবধি ইতিহাস এই কথাই বলে।

কথাটার মধ্যে সবটুকু সত্য না হোক্ অনেকটা সত্য আছে মনে হয়।

ব্যক্তিগত দিক দিয়ে কয়েকটা কথা কাল সন্ধ্যাবেলা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বুর্জোয়া ব'লে আজকাল যে-একটা কথা উঠেছে, সে কথাটা বড় বিপজ্জনক। কেননা কথা জিনিষটা যখন একটা লেবেল হ'য়ে দাঁড়ায় তখন তার মোহ বড় প্রবল হ'য়ে ওঠে ও সে মোহের ফলে মানুষ বড় বেশি সহজে সব-কিছুরই সম্বন্ধে একটা রায় দিতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে, ভাবতে চায় না। কেন না ভাবা শক্ত, রায় দেওয়া সহজ।

আজকালকার শ্রমিকতন্ত্রীরা তাই অত্যন্ত অম্লানবদনে যা-কিছু বুর্জোয়া তাকেই হেয় ব'লে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। রুষদেশে আজকাল প্রলেটারিয়েট কবিরা বলছেন শেক্সপীয়র, গেটে, দান্তে, রবীন্দ্রনাথ—সব হচ্ছেন তৃতীয় শ্রেণীর কবি—যেহেতু তাঁদের সৃষ্টির ওপর নাকি বুর্জোয়া ছাপটি অত্যন্ত স্পষ্ট। আজকাল সেখানকার কবিরা সত্যিই কাব্যে লিখছেন, "বুর্জোয়াদের মাথার খুলি ভাঙো, তাদের মস্তিষ্ককে জেলির তালে পরিণত কর, সবাইকে গুলি কর—" ইত্যাদি *। শুধু তাই নয় তাঁদের আইডিয়া এই যে এই রকম কাব্যই হচ্ছে আসলে বড় কাব্য; তবে আমরা যে আজও শেক্সপীয়র প্রভৃতিকে পছন্দ করি সে কেবল আমাদের দুরারোগ্য বুর্জোয়া মনোভাবের দরুণ। কাল এই নিয়ে নানা কথাই মনে তোলপাড় করছিল। মনে হচ্ছিল, হয়ত আমরা নিজেরা বুর্জোয়া ব'লেই নিজেদের সৃষ্টি-প্রতিভাকে একটু বেশি বড় ক'রে দেখে থাকি। হয়ত প্রলেটারিয়েট সৃষ্টির মধ্যেও এমন সত্যিকার বড় কিছু দেখা দিতে পারে যা নূতন ও জীবন্তের প্রেরণা-উদ্ভূত। এ সব সম্ভাবনায় সায় দিতে আপত্তি নেই,—কিন্তু তাই ব'লে শুধু বুর্জোয়া হওয়ার দরুণই শেক্সপীয়র প্রভৃতি যে অবজ্ঞেয় একথায় সায় দেওয়া কঠিন—শুধু এইটুকুই আমার বক্তব্য।

মনে প্রশ্ন জাগছিল বুর্জোয়া সভ্যতা কি মানুষের কাছে একটা মস্ত সত্যের আভাষ বহন ক'রে এনে দেয়নি—যেটা স্ফুট হ'য়ে না উঠ্‌লে শ্রমিকেরা কখনো জাগতে পারত না?

নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি সে সত্য? উত্তর এল—সে সত্যটি হচ্ছে এই যে মানুষের গৌরব ও মনুষ্যত্ব শুধু বাঁচায় নয়—সৃষ্টিতে, ও সে সৃষ্টি বিকশিত হ'তে পারে কেবল অবসরের সুনিয়োগে। এখন, একথা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহ'লে মান্‌তেই হবে যে এ অবসর অধিকাংশ মানুষকে না হোক অনেক মানুষকে দিয়েছে—এই বুর্জোয়া সভ্যতা। সুতরাং আজ যে সকলেই এই অবসর পেতে চাচ্ছে ও পেয়ে সত্য মনুষ্যত্বে গরীয়ান্ হ'বার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেছে সেটার মূল কারণ বলা যেতে পারে—বুর্জোয়াদের এই অবজ্ঞাত সৃষ্টিরই দৃষ্টান্ত। মেটারলিঙ্ক কোথায় বলেছেন যে আমাদের—অর্থাৎ বুর্জোয়াদের—একটা মস্ত দায়িত্ব হচ্ছে এই যে আমাদেরই সত্য সভ্যতা ও বৈদগ্ধ্যের পতাকাবাহী হ'তে হবে, কাজেই যদি আমরা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে টলষ্টয়ের মতন শ্রমিকদের দারিদ্র্যকেই বরণ করি তা'হলে মানুষ কখনো উঠ্‌বে না।

* Rene Fulop Miller প্রণীত The mind and Face of Bolshevism ব'লে বইখানিতে এসব কবিদের কাব্যের নমুনা দ্রষ্টব্য। বইখানি য়ুরোপে Eucken, Wells, Thomas Mann, Russel, Rolland প্রভৃতি সকলের দ্বারাই প্রশংসিত হ'য়েছে।

কথাটার মধ্যে সার আছে মনে হয়। শ্রমিকরাও মানুষ এ সত্যও যেমন আমাদের স্বীকার করবার সময় এসেছে তেম্‌নি এ সত্যসম্বন্ধেও তাদের সচেতন হবার সময় এসেছে যে বুর্জোয়ারা সমাজের "বিষধর সাপ" (viper) মাত্র নয়। তাদের বোঝবার সময় এসেছে যে বুর্জোয়ারা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছিল ব'লেই তারা আজ অবসর ও স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী করতে পারছে, এবং বুর্জোয়াদের উত্তর না হ'লে এত বেশি সংখ্যক লোক কখনোই এত সেদিন লিখেছেন যে আমেরিকায় (যেখানে শ্রমিকরা সব চেয়ে ভাল থাকে, সেখানে) তারা অবসরের নিয়োগ করে শুধু নেচে ও বাজে সিনেমা দেখে। কিন্তু তাই ব'লে কি সত্যিই বল্‌তে হবে, "ওদের অবসর দিয়ে কি হবে—যখন অবসরের সদ্ব্যবহার তারা জানে না?" হাক্সলি মহোদয়ের মনে এ প্রশ্নটি জেগেছে ব'লেই এ কথার উল্লেখ করলাম। মানুষের মধ্যে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই যে ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশি হ'য়ে এসেছে তার আর
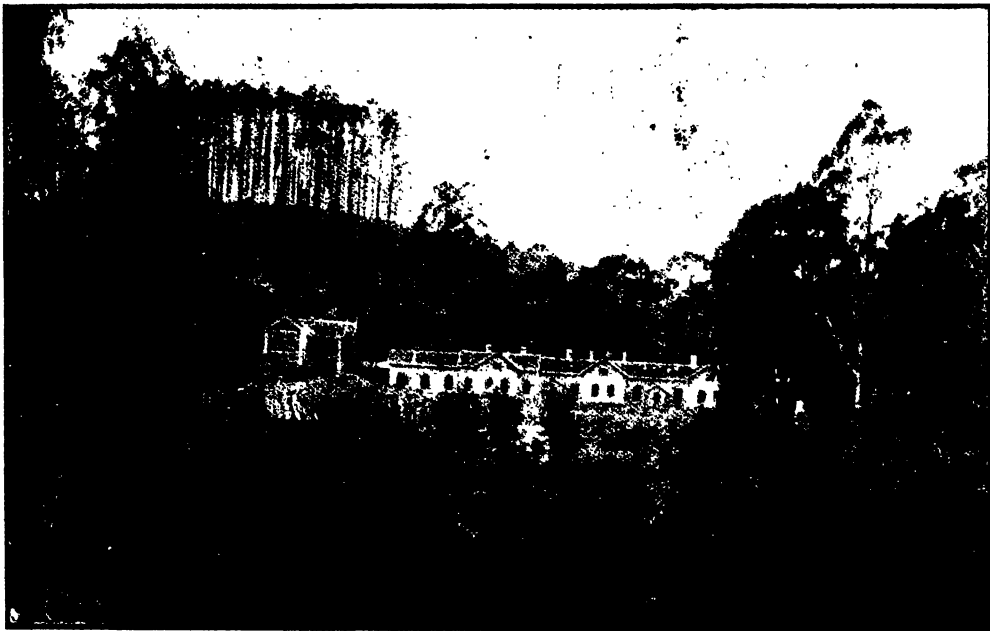
উটমাকাণ্ডের দৃশ্য

শীঘ্র এ সত্যটি শিখ্‌ত না যে man does not live by bread alone.

মানি যে বুর্জোয়াদের মধ্যেও অধিকাংশই তাদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয় নি। কিন্তু তার মধ্যে দায়ী শুধু কি তাদের বুর্জোয়াত্ব? তাহ'লে ত' বলতে হয় যে য়ুরোপে আজকাল শ্রমিকদের মধ্যে যে ঈর্ষা দ্বেষ, কুটিলতা ও নীচতা দেখা দিচ্ছে তার জন্যে দায়ী তাদের "শ্রমিকত্ব"? আসল কথা মানুষের মধ্যে অধিকাংশই সুখপ্রিয়, অলস ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। কি করা যাবে? আলডুস হাক্সলি কি করা যাবে! সে দোষ ভক্তিরও নয় কীর্ত্তনেরও নয়—সে দোষ মানুষের মধ্যে অধিকাংশের অসারতার।

কাল মানুষের অসারতার এ নিদান মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল অনেক কথা। মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশের শ্রমিকরা য়ুরোপের দেখাদেখি যতই কেননা বাহবাস্ফোট করুক, সুযোগ পেলেই যে তাদের মধ্যে আঁকে বাঁকে সুভাষচন্দ্র, জহরলাল, শরৎচন্দ্র জন্মাবে এ আশা দুরাশা। বুর্জোয়াদের মধ্যেও যেমন মাত্র অল্পসংখ্যক মানুষ আজ তাদের সত্য দায়িত্বের প্রতি সচেতন,

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রমিকদের মধ্যেও ভবিষ্যতে ঠিক্ তাই হবে। কাজেই কেবল এইটুকুর বেশি জোর ক'রে বলা চলে না যে তাদের মধ্যে সুযোগ পেলে যারা সত্যিকার মানুষ হ'তে পারত, শুধু তাদের খাতিরেই সকলকে মানুষ হবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এ সুযোগ দেবার সময় যদি আমরা এ আশা পোষণ করি যে তা পেলেই তারা জীবনের নিগূঢ় উপলব্ধির জন্যে দলে দলে ব্যগ্র হ'য়ে উঠবে তা হ'লে সে আশা প্রকৃতির পরিহাসে দুদিনে ধুলোয় লুটোবেই লুটোবে। অন্তত "অদূর ভবিষ্যতে" অধিকাংশ মানুষ যে সত্যিকার সভ্যতা সম্বন্ধে সজাগ হ'য়ে উঠবে না এটা ঠিক—"সুদূর ভবিষ্যতে" যাই হোক না কেন।

তোমায় এত বড় চিঠি লিখব ভাবিনি। ভেবেছিলাম আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে এ চিঠিতে দুচারটে কথা জানাব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর।

কেন এত কথা লিখলাম জানো? আমার ব্যাখ্যাটা শোন তা হ'লে। কদিন থেকে নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যশোভার মধ্যে ছাড়া পেয়ে মনটা বেশ বিকশিত হয়ে উঠেছে ও মনে হচ্ছে যে আমাদের সমাজ অনেকেই আমার মতন একটু আধটু ভ্রাম্যমাণ হওয়ায় সুযোগ দিলে কাজটা নেহাৎ মন্দ করত না। অথচ এ ভাব-বিলাসিতার জন্যে ক্ষোভও জাগে এবং মানুষ শুধু ক্ষোভ নিয়ে ঘর করতে পারে না, খানিকটা আটপৌরে আত্ম-সম্মানও তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাই নিজের raison d'etre অপিচ আত্মসমর্থন খুঁজতে বাধ্য হ'লাম। মানুষ এম্‌নি ক'রেই সাফাই গায় ও নানা রকম জীবনের ফিলসফি গ'ড়ে তোলে বোধহয়।

কিন্তু এ ফিলসফির মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনার উপাদান খানিকটা থাকলেও খানিকটা সত্যও যে আছে একথা আশা করি তুমি অস্বীকার করবে না। সেদিন একজন বড় লেখকের লেখায় . একজায়গায় পড়ছিলাম:—Success, power, wealth—those aims of profiteers and premiers, pedagogues and pandemoniaes, of all, in fact who could not see God in a dew-drop, hear him in distant goat bells, and scent him in a pepper tree—had always appeared to me as akin to dry-rot (গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি)

কাল সন্ধ্যায় ধূসর সূর্য্যাস্তের রঞ্জিত মেঘালোকে মনে হচ্ছিল যে প্রতি সভ্যতায় এ রকম সূক্ষ্ম উপলব্ধি যদি এক আধজনের মধ্যেও ফুটে ওঠে তবে তাতে ক'রে তার অনেক অসারতারও মস্ত ক্ষতিপূরণ মেলে। মানবহৃদয়ের নানা সুকুমার অনুভূতি, নানান্ ললিতরাগের রক্তরাগ, নানা আধছায়া আধআলো আবেগের সমষ্টি, নানান্ ধরা-ছোঁয়া যায়-না-এমন আশানিরাশার ইন্দ্রজাল, জীবনের রূঢ় অভিঘাতে নানান্ স্বপ্নভঙ্গ—এসবের মধ্যেই কোথায় একটা গুপ্ত সার্থকতার রেশ নিহিত। যে-মুহূর্ত্তে মানুষ এমন একটা অনুভূতির পরশ পায় যে "নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্। কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশ ভৃত্যকো যথা।" (মরণকেও অভিনন্দন করবে না জীবনকেও না; শুধু অপেক্ষা ক'রে থাকবে ডাকের জন্যে —যেমন ভৃত্য থাকে) সে-মুহূর্ত্তে সে তার আশে-পাশে মানুষকে একটা অপরূপ সুষমাদীপ্ত ভাবরাজ্যের সন্ধান বহন ক'রে এনে দেয় ও মানুষ তার জীবত্ব ছেড়ে খানিক পরিমাণে দেবত্বের কোঠায় ওঠে। শরৎচন্দ্রকে আজ যে সমগ্র বাংলাদেশ অভিনন্দন দিচ্ছে তার ভিতরকার কথাটা ত এই যে আমরা বল্‌তে চাচ্ছি—"হে শিল্পী, তুমি যে আমাদের জীবনের শত গ্লানির গ্লানিমার মালিন্যের মাঝে সুন্দরের অনুভূতি, সমবেদনার তৃপ্তি, সূক্ষ্ম কারুকার্যের সান্ত্বনা বহন ক'রে এনে দিয়েছ আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে তার ফলে আমাদের অনুভবজগত সমৃদ্ধতর হয়েছে নয় কি? কাজেই (এখন নিজের সাফাইয়ে ফিরে আসি) আমি যদি সঙ্গীত ও ভাববিলাসিতার চর্চ্চায় একটু গুন্ফদে চাড়া দিয়ে আমার আলস্যের সমর্থন একটু খুঁজতেই যা তাতে তোমরা একটু করুণার হাসি হাসো ত হেসো কি দোহাই, মুখ ফিরিও না, বা আমি যে এ যাত্রা মান্দ্রাজ তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, পণ্ডপম্, সেতুবন্ধ, উটাকাম বাঙ্গালোর, নন্দীপাহাড়, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, মসলিপট্টম

প্রভৃতি স্থলে চরকীর মতন ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে বেড়াচ্ছি তার জন্যে আক্ষেপ কোর না। অপিচ—তোমরা দেশোদ্ধারে নিরত আছ ভেবে সময়ে সময়ে আমারও যে বিবেক দংশন হয় একথা অবিশ্বাস কোর না।

কিন্তু এবার বাজে বকা রেখে একটু ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে উঠে প'ড়ে লাগি।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক দিয়ে সব চেয়ে ভাল লাগল উটাকামণ্ড। এমন সবুজের আগুন সেখানে এখন লেগেই আছে যে আমার কেবল মনে হ'ত তোমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে আসতে পারলে কাজটা হ'ত চমৎকার। কিন্তু বিলেতে তোমাকে তোমার দেশোদ্ধার-স্বপ্ন-মগ্ন-মনটাকে যদি বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যোপভোগের নিন্দনীয় আলস্যপরায়ণতার দিকে সময়ে সময়ে ফেরাতে পারতাম—এখানে তা হ'য়ে উঠেছে—স্রেফ অসম্ভব, যদিও আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি। ক্ষিতীশ সেদিন ঠিকই বলছিল যে তোমার পক্ষে কোনো কিছু উপভোগ করা মুস্কিল—তোমার কেবল মনস্তাপ হ'তে থাকবে এ-সময়টা যে পরিমাণে মীটিং করা যেত দেশোদ্ধারের দিনটা সেই পরিমাণেই এগিয়ে আসত তবু বিলেতে তোমাকে ডার্বিশায়ার, লঙ্কাশায়ার প্রভৃতি স্থানে টেনে নিয়ে যাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখানে ?—হায়, তুমি হেসে বলতে চাও "তে হি নো দিবসা গতাঃ।

কিন্তু আমার "তে দিবসাঃ" এখনো "গতাঃ" নয়, বিধাতাকে ধন্যবাদ। "গতাঃ" হ'তে হয়ত সে চাইত। কিন্তু বিবেক-প্রবৃত্তিকে একটু আধটু আমল দেওয়া চললেও বেশি আমল দেওয়াটা যে কিছু নয় এ বিশ্বাস আমার আজকের নয় তুমি জানো।—এমন কি দেশোদ্ধারের খাতিরেও নয়—তা তুমি যতই রাগ কর না কেন একথা শুনে। তাই শোনো একটু উটাকামণ্ডের ও নন্দীশৈলের কথা। প্রবন্ধ লিখলে ত পড়বে না—কিন্তু চিঠিটা অন্তত পড়তেই হবে—সুযোগ পাওয়া গেছে মন্দ নয়।

তুমি যদি কখনো দেশোদ্ধার কাজের মধ্যে একটু ফুরসৎ পাও ত যেয়ো উটাকামাণ্ডে একবার।

সেখানে আমার সবুজের শোভা দেখে প্রায়ই মনে হ'ত শেলির সেই লাইনটি :—"The emerald green of leaf-enchanted beams।"

কী স্ফটিকের মতন ঝকঝকে সবুজ! বোধ হয় বর্ষার সময় ব'লেই এত সবুজ হয়েছে! এমন সবুজের মেলা দেখতে পাওয়াটা একটা সৌভাগ্য সত্যি! নিছক্ সবুজ রঙের বাহার যে আমাদের মনকে কতটা উতলা করতে পারে তার পরিচয় পেতে হ'লে একবার উটাকামাণ্ডে যাওয়া ভাল। সাধ কি "কিরণমালা পত্রমুগ্ধা" হ'ল?

তার ওপর কী দীর্ঘাকৃতি গাছের শোভা! কী সুপারি, দেবদারু পাইন প্রভৃতির ঘন নিকুঞ্জের মনোহারিত্ব! আর কী সে ঋজুতার তৃপ্তি।

বস্তুত উটির বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় এইখানে। এত অপর্য্যাপ্ত ঋজু ও লম্বা গাছ বোধ হয় আর কোথাও দেখিনি। আর সে সব গাছের মধ্যে কত শাখাই যে "স্তবকাবনম্রা" সে কি বলব! বিলেতের weeping willow গাছ মনে পড়ে? এখানে সে রকম সবুজ অশ্রুভারে-লম্বিত গাছ অজস্র।

কেবল এ সময়ে উটির আকাশ খুব সদয় নন্—এই যা দুঃখ। সারাদিনই মেঘে ঢাকা। কালিদাসের "বপ্রক্রীড়া-পরিণত গজের" বাহার সমতলভূমিতে লাগে ভাল—কিন্তু শৈলশিখর এই নন্দীপাহাড়ের মতন মেঘমুক্ত হ'লেই বেশি মনোমদ হয়। হয়ত তুমি বলবে তা হ'লে শাপেনাস্তংগমিত মহিমা যক্ষের কাছে রামগিরির মেঘমালা কেমন ক'রে এত প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল? উত্তর—তার যে, সে "কামরূপ মঘবানের" কাছে নিজের "যাচ্ঞা" জ্ঞাপন করবার স্বার্থ ছিল! তবু আমার মনে উটাকামণ্ডে নিরন্তর সংশয় জাগ্‌ত যে বিষম শীকরসম্পৃক্ত শৈত্যের মাঝখানে সে-যক্ষের মনে দয়িতার কথাই বেশি জাগত না দেহের ক্লিষ্টভাবের দিকেই বেশি দৃষ্টি পড়ত! সে যাই হোক্—যেহেতু আমি যক্ষ নই সেহেতু আমি যে উটাকামাণ্ডের মেঘের বিরতিহীন আলিঙ্গনের মধ্যে খুব আনন্দ পেতাম না এটা ধ্রুব।

কিন্তু তবু সেখানকার নিসর্গশোভার প্রতি অমনোযোগী হওয়া ছিল—অসম্ভব।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বিশেষ ক'রে ভাল লেগেছিল সেখানকার বটানিকাল গার্ডেনটি। আধঢাকা ঘোমটায় বাগানটি মাঝে মাঝে এমন একটা অপরূপ শোভায় দীপ্ত হ'য়ে উঠত যে সে "মেঘালোকে" একটু "অন্যথাবৃত্তিচেতঃ" না হ'য়েই আমার উপায় ছিল না। এমন সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে হয় না। রাস্কিনের কথা কেবল মনে হ'ত যে সমতলভূমির মোহ নিতান্তই স্বচ্ছ– প্রকৃতি রহস্যের ঘোমটা পরেন কেবল তখন—যখন মাটি উচ্চনীচতার ঢেউ-খেলানোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে এলিয়ে দিতে চায়।

হর্ম্ম্যপূর্ণ সহর গ'ড়ে তোলে—রাস্তাঘাট ত রাস্তা নয়—যেন ক্ষীর-সরোবর পেতে রাখে—ও সর্ব্বোপরি আমাদের দিয়ে খাটিয়ে নিয়েই ওরা রাজার হালে শোভমান থাকবার গুহ্য তত্ত্বটি সম্বন্ধে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার কাছ থেকে তালিম নিতে জানে।

যাক্, এবার উটকামাণ্ড ছেড়ে মহীশূর-ভ্রমণের কথা ব'লে প্রবন্ধটি শেষ করি ; কি বল ? নইলে উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে যে !

কদিন থেকে বাঙ্গালোরে আমি অতিথি হ'য়ে আছি আমার একটি ইংরেজ বন্ধুর। আরও দুটি য়ুরোপীয় মহিলা তাঁর অতিথি।
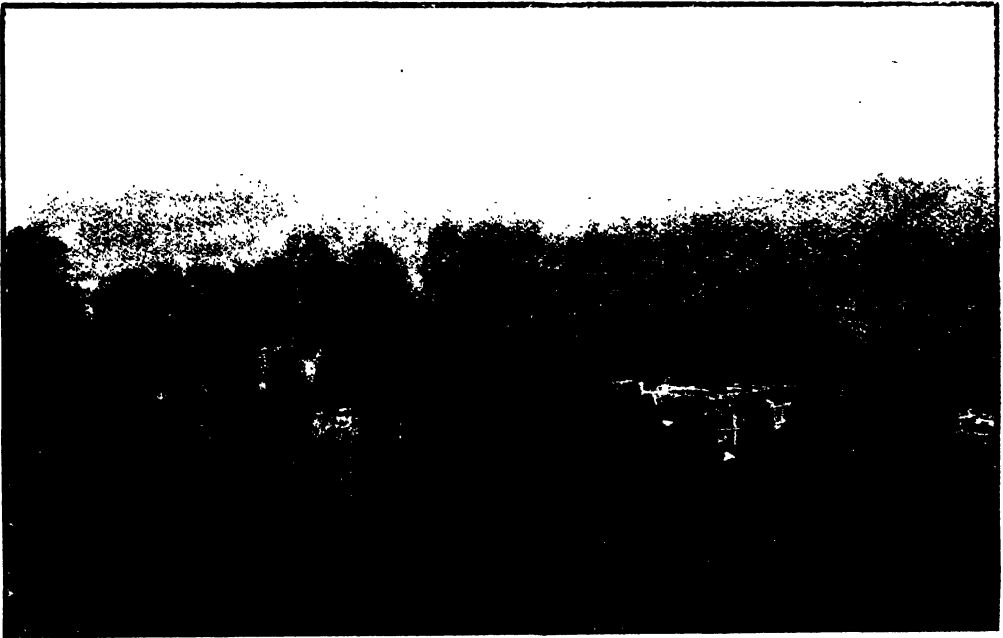
উটকামাণ্ডের দৃশ্য

আর প্রশংসা করতে হ'ত ওদের রাস্তাঘাট রাখার ক্ষমতাকে। তুমি চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হ'লেও সম্ভবত সেখানকার রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য্য আর বেশি বাড়াতে পারতে না। কী সাধনক্ষমতা ও কর্ম্মনিষ্ঠতা ওদের ! এমন একটা সহর শুধু করা নয়—রেখেছে কি সুন্দর ক'রে ! সাত সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসে মাকড়সার জালের মতন ওরা রেলপথ বিস্তার করার শক্তি ধরে—শৈল দেখলেই ওরা শুধু চ'ড়ে ক্ষান্ত হয় না—দুদিনে সেখানে সুরম্য

এদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে যতই ভাল লাগছি ততই মনে হচ্ছিল যে আমরা ক্রমশ য়ুরোপীয় মনের কি রকম কাছে গিয়ে পড়ছি ! শুধু তাই নয়—আমার মনে হচ্ছিল যে রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক গুণের অনেকগুলিই আমরা এদের কাছ থেকে নিত্য নিয়ত কি দ্রুত রেটে শিখ্‌ছি ও শেখ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীদের মন থেকে কি দ্রুতবেগে দূরে স'রে যাচ্ছি ! কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলি।

আমার মনে হচ্ছিল যে আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে যারা তাঁদের আচারগত ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটি বজায় রেখেছেন তাঁরা ক্রমেই আমাদের মনের রাজ্যে কি রকম অজ্ঞাতসারে অনাত্মীয় হ'য়ে পড়ছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমরা অজ্ঞাতে চরিত্রগত অনেকগুলি নতুন গুণ কি রকম স্থায়ীভাবে ওদের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে হজম করছি! দৃষ্টান্ত চাও? তোমার নিজেরই নেও না কেন। তোমার নিষ্ঠা, তোমার কর্ম্মশীলতা, তোমার ত্যাগ, তোমার নিয়মানুগত্য—ভেবে দেখ দেখি এসব কী পরিমাণে য়ুরোপের দ্বারা প্রভাবিত! এসবের মধ্যে ভারতীয়ত্ব কতটুকু? অবশ্য আমার এই যে হয়ত পুরাকালে আমাদের মধ্যেও এ ধারণাটা ছিল—(তার কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস ত নেই)—কিন্তু সম্প্রতি আমরা যে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে ক্রমেই বেশি আত্মকেন্দ্র হ'য়ে পড়ছিলাম এটা অস্বীকার করা যায় না। Civic life যাকে বলে সে জীবনের যে-সব দাবী-দাওয়া আছে সে-সব দাবী-দাওয়ার মর্য্যাদা রাখাটা যে আচারের দাবী-দাওয়ার মর্য্যাদা রাখার চেয়ে বেশি দরকার এ সত্যটির প্রতি আমরা উদাসীন হ'য়ে পড়ছিলাম। য়ুরোপের একটা বড় উপলব্ধি মানুষকে জানা ও মানুষের নিকটে আসা। আমরা ক্রমশই হ'য়ে পড়েছিলাম গৃহবদ্ধ,

উটকামাণ্ড থেকে মহীশূর 'বাসে' ক'রে আস্‌তে পথের দৃশ্য

ভারতে ত্যাগ ছিলনা একথা বল্‌তে চাই মনে কোরো না যেন। কারণ কে না জানে যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চার জন্যে বিলাসবর্জ্জনের আইডিয়া ছিল, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রজানুরঞ্জনের জন্যে নিজের বিশ্বাসত্যাগের আইডিয়া ছিল—ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্যে যে প্রতি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনের অনেকখানি স্বার্থ ছাড়তে হবে এ সত্যটি আমরা য়ুরোপের কাছেই নতুন ক'রে শিখেছি এই আমার বলবার কথা। নতুন ক'রে শিখেছি কথাটা বলার সদর্থ আচারবদ্ধ, ছুৎমার্গপন্থী। দক্ষিণ ভারতের সত্যকার ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে এটা আরও উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কী বিরাট টিকি এদের! কী দগ্‌দগে তিলক! আর—সর্ব্বোপরি কী অবজ্ঞা নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি!—যেন ব্রাহ্মণেতর সব জাতিই বিধাতার অভিশপ্ত সন্তান! একথা এখানে আমার একটি য়ুরোপীয় বান্ধবী কাল ব'লে আক্ষেপ করছিলেন। তাই ভেবে দেখ দেখি, তুমি-আমি যে আজ য়ুরোপীয়দের সঙ্গে এত সহজে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিশ্‌তে পারি তার কারণ কি এই নয় যে আমরা আর খাঁটি ভারতীয় নেই ? বস্তুত তুমি-আমি যে-পরিমাণে দেশের জন্যে বেদনা বোধ করি ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন নয় কি ? তাই এক কথায় বলা চলে যে দেশাত্মবোধ জিনিষটা য়ুরোপীয়—ভারতীয় নয়, অন্তত গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যে এটা দেশের লোকের মন থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল এটা খুবই বেশি সম্ভব মনে হয়।

এটা কথার কথা নয়। আমার সত্যিই মনে হয় তুমি-আমি আজ খাঁটি ভারতীয়ের মনের কাছে অনাত্মীয়। আমার একটি উদারহৃদয় ভারতীয় বন্ধু তাঁর দেশে নিমন্ত্রণ পান না—তিনি নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করেছিলেন ব'লে। এটা আমাদের কাছে আজ যে অসঙ্গত মনে হয় তাইতেই প্রমাণ হয় যে আমরা সে খাঁটি ভারতীয় নেই ; যদি ভারতীয় হ'তাম তাহ'লে বলতাম বেশ হয়েছে—নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ ! উঃ, কী মহাপাপী ! ওর সঙ্গে একত্রে বসতে আছে !

গত কয়দিন আমার য়ুরোপীয় বন্ধু বান্ধবী ক'জনের সঙ্গে একত্রে হাসি গল্প, খেলাধূলো প্রভৃতি করার সঙ্গে সঙ্গে একথা আমার বড় বেশি ক'রেই মনে হচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন উঠ্‌ছিল—মান্দ্রাজে কয়টি সত্যকার ভারতীয়ের ঘরে আমি এত সহজে প্রবেশাধিকার পেতে পারতাম বা পেলেও এত সহজ হৃদ্যতার সঙ্গে মিশতে পারতাম ? একথাটা এখানকার একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা দিয়ে আর একটু স্ফুট ক'রে তুল্‌ব।

য়ুরোপ আমাদের যে কতটা অ-ভারতীয় ক'রে তুল্‌ছে ও তার প্রভাব যে ধীরে ধীরে কী ব্যাপক হ'য়ে উঠ্‌ছে সেটার যেন নতুন ক'রে পরিচয় পেলাম সেদিন এখানে একটি দক্ষিণী তরুণীর সঙ্গে একটু আলাপ করতে করতে। মেয়েটির বয়স হবে বছর বাইশ তেইশ ; তার মাতৃভাষা কথিত ভাষামাত্র—কোঙ্কনী—তার কাল্‌চার বিশেষ ক'রে মারাঠী ও সে এম্ এ পাশ করেছে হায়দ্রাবাদ থেকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে তার বিশেষ ক'রে ভারতীয় হবারই কথা ছিল। কিন্তু সে হ'য়ে পড়েছে ঠিক্ উলটো একটি জীব, অর্থাৎ একটি পূর্ণবিকশিত য়ুরোপীয় মেয়ে ; বেশভূষায় নয়, কিন্তু মনে। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ ; আমার সঙ্গে এক ঘণ্টার মধ্যে ভাব ক'রে নিল ঠিক য়ুরোপীয় মেয়েরই মতন। চাল চলন গতি ভঙ্গী, হাসি গল্প সবের মধ্যেই য়ুরোপীয় ছাপ। এমন কি পুরুষ যে তাকে দেখলেই একটু আকৃষ্ট বোধ করে সে সত্যটির প্রতিও সে যেমন সহজেই সচেতন, এজন্যে তেমনি কুণ্ঠালেশহীন। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেটা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ সেটা হচ্ছে তার অকুতোভয় ভাব। সে আদর্শ হিন্দুরমণীর মতন লজ্জাবনতা, সঙ্কোচবিজড়িতা কথায় কথায় বেপথুমানা ও আলো-হাওয়া-বিরাগিনী নয়। শুধু তাই নয়—তার জীবনের ফিলসফি সম্বন্ধেও সে সচরাচর এমন অসঙ্কোচে কথা বলে যে, ভালও যেমন লাগে আশ্চর্য্যও তেম্‌নি বোধ হয়।

কিন্তু মনে কর কি যে, এরকম মেয়ে এখানকার গড়পড়তা ব্রাহ্মণের হাতে পড়লে সুখী হবে ? অথচ যদি সে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও আইডিয়ার সংস্পর্শে না আস্‌ত তা হ'লে যে সে অতি অবলীলাক্রমেই যে-কোন অর্দ্ধমুণ্ডিত, কচ্ছাহীন তিলকধারীকে বিবাহ করত এটা ত অবধারিত ? কি বদ্‌লেই আমরা যাচ্ছি ভিতরে ভিতরে—যদিও বাইরে একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করি !

না—সত্যি ভারতের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য যদি কিছু স্থায়ী হয় তবে সেটা হয়ত হ'তে পারে দর্শনের রাজ্যে ; কিম্বা ললিতকলার রাজ্যেও হয়ত হ'তে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে, আলো হাওয়ার এলাকায়, নৈতিক আচরণে ও নাগরিক কর্ত্তব্যজগতে আমরা আর ভারতীয় থাক্‌ছি না—এবং মোটের ওপর আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা অতি শুভ চিহ্ন। মানুষ একবার এগিয়ে এলে ফিরে যেতে আর পারে না—যতই কেননা তার কানে কানে বলা হোক্ যে মুক্তি আছে কেবল পশ্চাদ্গমনে।

অথচ তবু মনোরাজ্যে, ভাবজগতেও জীবনটাকে দেখার ভঙ্গীতে কোথায় যেন আমরা একটা মস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী—একথাও আমার মনে হয়। হয়ত তুমি বলবে আমার এ দুটি উক্তি পরস্পরবিরোধী ; ও সেই সঙ্গে হয়ত একথাও বল্‌বে যে "নৈতিক আচরণ, ব্যবহারিক জীবন প্রভৃতিতেও আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা দরকার—নইলে এ-সব বিষয়ে য়ুরোপীয় প্রভাব শেষটায় আমাদের জীবনের ফিলসফির ওপরেও ছাপ ফেল্‌বে।"

ওটা অসম্ভবও নয়। কিন্তু তবু মনে হয় যে আমাদের জীবনে য়ুরোপীয় প্রভাব ক্রমশ বড়ই হ'য়ে উঠ্‌বে; ছোট আর হবে না। সে প্রভাবকে আমরা আত্মসাৎ ক'রে একটা নতুন ধরণের ভারতীয় অবদান জগতকে দিতে পারব কিনা জানি না। হয়ত পারলেও পারতে পারি। তবে এ-বিষয়ে আমার নিজের কাছে নিজের ধারণা বড় অস্পষ্ট, তাই এখানেই আজ স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম।

না—স্তম্ভিত হ'লে চলবে না। মহীশূর থেকে উটাকামণ্ডের পার্ব্বত্য রাস্তা সম্বন্ধে কিছু লিখতেই হবে যে।—কিন্তু না—বেশি লেখা বৃথা। এটা দেখাই ভাল। তাই যদি কখনো উটাকামণ্ড অঞ্চলে যাও ত সেখান থেকে মহীশূর অবধি যে মোটর বাস যায় তাতে একবার চ'ড়ো—ভুলো না। এমন চমৎকার পার্ব্বত্য রাস্তা ও দৃশ্যবৈচিত্র্যে এরকম পথ এক নরওয়ে ছাড়া কোথাও দেখেছি ব'লে ত মনে হয় না। জায়গায় জায়গায় প্রকৃতি ঠিক্ যেন য়ুরোপের মতন, জায়গায় জায়গায় উষ্ণপ্রদেশসম্ভব, আবার জায়গায় জায়গায় স্রোতস্বিনী, ঝরণা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ। এক কথায় সমস্ত পথটি অত্যন্ত উপভোগ্য। মেঘ ও রৌদ্র, ঘন গাছ ও বৃহৎ বিরলতা, ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড় আবার সমতল ভূমির শোভা—যা চাও সবই পাবে। সত্যি এ পথটুকু অপূর্ব্ব—নিছক্ বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে।

তরশু দিন বাঙ্গালোরে এসেছি উটাকামণ্ড থেকে। পরশু দিন বাঙ্গালোরে দুটি মেয়ের গান শুনলাম। এদের নাম তঙ্গমা ও নগ্গমা। বড়টি বেশ বীণা বাজায়। ছোটটি বেশ গায়। বাঙালী মেয়েদের মতন গলা এদের নেই—কিন্তু নৈপুণ্যে এরা কারুর চেয়ে হীন নয়। কেবল এদের দক্ষিণী সঙ্গীতের মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রাণের পরশটি মেলে না। সেই কোঙ্কনী মেয়েটি সেদিন তার সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে জোরের সঙ্গেই বলল আমাকে, "মান্দ্রাজীরা দক্ষিণী গায়কদের মধ্যে কে প্রথম শ্রেণীর, কে দ্বিতীয় শ্রেণীর, কে তৃতীয় শ্রেণীর এ নিয়ে নানা রকম আলোচনা করে—কিন্তু আমার কাছে মনে হয় দক্ষিণী গায়ক বা বাদক সবই তৃতীয় শ্রেণীর।" আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম হায়দ্রাবাদে তিনি খুব ভাল হিন্দুস্থানী গান শুনে একথা বলছেন কিনা। মেয়েটি নির্ভয়ে উত্তর দিল—"হায়দ্রাবাদে রাস্তায় ঘাটে গাড়োয়ানে যে-গান গায় এদের শ্রেষ্ঠ গায়কের গানও তার কাছে দাঁড়াতে পারে না।"

কিন্তু গান বাজনা সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করব না—তুমি মহা বিব্রত হ'য়ে পড়বে বোধহয়। তোমার উপর আবার বেশি উপদ্রব করাও কিছু নয়।

পরশু বাঙ্গালোর থেকে বাসে চ'ড়ে আসা গেল এই নন্দী পাহাড়ের পাদমূলে—মাইল পঁয়ত্রিশ। তারপর সেখান থেকে এখানে—অর্থাৎ নন্দীপাহাড়ের শিখরস্থিত পান্থাবাসে—হেঁটে এলাম আমরা চার জন। আমি, আমার এক মান্দ্রাজী সঙ্গীতানুরাগী বন্ধু, আমার এক চিত্রকরী বান্ধবী—সুইস—ও একটি আমেরিকার মহিলা—দার্শনিক।

বাঙ্গালোরের উচ্চতা হাজার তিনেক ফিট; এ পাহাড়ের উচ্চতা হাজার দুই। কাজেই বুঝছ নন্দী পাহাড়ের উচ্চতা কার্সিয়াঙের চেয়ে কম নয়।

ফল—শৈত্য—কিন্তু মনোরম শৈত্য—দুঃসহ শৈত্য নয়। শুধু তাই নয়, এখানে সূর্য্যদেব নির্দ্দয় নন্। বরুণদেবও সদয় নন্। কাজেই কাল সমস্ত দিন রূপালি তপন-কিরণে খুব হৃষ্ট হওয়া গিয়েছিল ও রাত্রে অর্দ্ধ চন্দ্রের আলোকে চারিদিকের শোভা উপভোগ করা হয়েছিল।

অতি চমৎকার স্থান এ। অবশ্য হেঁটে দু হাজার ফিট উঠ্‌তে আমাকে একটু কষ্ট পেতে হ'লেও, ওঠবার পর শ্রম সার্থক হয়েছিল পুরোপুরি। বিশেষত যখন এখানে টিপুসুলতান প্রায়ই আসতেন। ঐতিহাসিক নরপুঙ্গবদের পীঠস্থানে আস্‌তে রোমাঞ্চ হবে না এমন টুরিষ্ট কে আছে?

য়ুরোপীয় বান্ধবীদ্বয়ও মহাসুখী। এঁরা সত্যই নিসর্গ শোভা ভালবাসেন, নইলে অত কষ্ট ক'রে উঠ্‌তে পারতেন না এ পাহাড়ে। তবে এঁদের শরীরও ভাল—আমাদের আধুনিক-শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ের মতন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান না। জীবনী শক্তিতে এরা এমন ভরপুর যে এখানে এসে দুজনে মিলে নেচেই অস্থির। আমাকে বলেন নাচতে হবে। অনেক কষ্টে এঁদের বুঝিয়ে নিরস্ত করা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গেল যে ভারতীয় শিল্পীর আদর্শ—গতি নয় স্থিতি—যেহেতু ভারতে শিল্পী হচ্ছে দার্শনিকেরই ভায়রা ভাই। ভাগ্যে ভারতীয় দার্শনিকের ওপর এঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা! নইলে আমাকেও এ-বয়সে ঘূর্ণামান হ'তে হ'ত হয়ত! য়ুরোপের প্রভাবে বড় জোর ভ্রাম্যমাণ হওয়া গেছে—কিন্তু তাই ব'লে নৃত্যমান হ'তে বল্‌লে চল্‌বে কেন? শরৎবাবুর সেই গল্প মনে পড়ে; "আরে, মদ খেতে প্রেজুডিস থাক্‌বে না ব'লে কি মাতাল হ'তেও প্রেজুডিস থাক্‌বে না?"

দেখা যায়। আর দেখা যায় অজস্র ডোবা। বেশ লাগে। অনেকটা চেরাপুঞ্জী থেকে সিলেটের দৃশ্যের মতন। আমার মান্দ্রাজী বন্ধু এখানে পল রিশারের সঙ্গে এসে অনেক দিন ছিলেন। কাল বলছিলেন যে এক দিন চন্দ্রালোকে অজস্র ডোবায় চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে পল রিশার বলেছিলেন; "প্রতি ডোবাই চন্দ্রদেবের প্রতিবিম্ব বুকে ধ'রে মনে করে শশী বুঝি তারই জন্যে কিরণ দিচ্ছেন। মানুষ ঠিক্ তেম্‌নি তার নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনে করে যে ভগবান্ কেবল তার

উটকামাণ্ডের দৃশ্য

ধর্ম্মেই প্রকাশ।"

ফ্রান্সে গত বছর পল রিশার এ রকম সুন্দর সুন্দর কথা প্রায়ই আমাকে বলতেন তাই এ উপমাটি তোমায় না ব'লে থাকতে পারলাম না। একদিনের জন্যে এখানে আসা গিয়েছিল, কিন্তু এসে এত ভাল লাগ্‌ছে যে আজও থেকে যাওয়া গেল। কাল বাঙ্গালোরে ফিরব।

কালরাত্রি এই পান্থাবাসেই কাট্‌ল। কী চন্দ্রালোক! কী দৃশ্য! আর কী মধুর বাতাস! তার ওপর প্রচণ্ড তর্কালাপও হ'ল ও শেষটায় গানের চর্চ্চাও হোল। এঁরা সকলেই সঙ্গীতপ্রিয়: কাজেই কালকে কাট্‌ল ভাল।

নন্দী পাহাড়টা উঠেছে একেবারে খাড়া। কাজেই ওপর থেকে চারদিকেই সমতলভূমি ক্ষেত্র, হর্ম্ম্য, তরুরাজি প্রভৃতি

আলো

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি,
চির রাত্রি চির দিন যদি তোর গীতে
ভ'রে থাকে মোর চিত্ত অপূর্ব্ব অমৃতে,
প্রভাতে সুদূর হ'তে এসে তোর বাণী
নূতন পাতার সাথে করে কানাকানি,
রাতের শিশির-মাখা নব শষ্পদল
তোমার চরণ লেগে হইত বিহ্বল—
দেখে তাই পূর্ণ হ'ত, দৈন্য মোর
না রহিত বাকি ;
ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি।

শারদ প্রভাতে সেই শুভ্র খণ্ড মেঘে
তোমার চমক যবে উঠিত গো জেগে,
সদ্যস্ফুট করবীর মঞ্জরীর তলে
তোমার চমক যেত নেচে পলে পলে,
সুপ্তি তার কেড়ে নিয়ে তারে প্রাণ দিত
মোর প্রাণে তার সাড়া জাগায়ে তুলিত,
তন্দ্রা যেত ঘুচে জীবনের হ'ত ভোর
সে আলোয় ঢাকি' ;
ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি

তবে যবে দিবাশেষে রাতের ছায়ায়
আমারে লুকাবে এসে বিপুল মায়ায়,
দূরে ঝঞ্ঝা দেখা যাবে, পুষ্প যাবে ঝ'রে,
বায়ু কেঁদে কেঁদে যাবে নব পত্র পরে,
গভীর আঁধার এসে আপনা হারায়ে
আমারে কাড়িতে চাবে দু'হাত বাড়ায়ে,
বিদ্যুত বিষম লাজে লুকায়ে হাসিবে
মেঘ যাবে ডাকি' ;
ওরে আলো, তোরে যদি ভালবেসে থাকি !

তবে আজ ব'লে যা রে হেন কোন বাণী,
দিয়ে যা রে কোন দান তারে লব মানি'।
সে-বাণীর গুঞ্জরণে দানের মহিমা
মুগ্ধ প্রাণে ছড়াইবে নাহি রবে সীমা,
দেহ মনে একটি সে লীলা হবে সুরু
তোর কাছে দীক্ষা মাগি, তোরে বলি গুরু,
সে তোর একটি কথা তার ধ্বনি স্মরি'
কেটে যাবে ঝঞ্ঝাময়ী মত্ত বিভাবরী,
সে-আঁধারে তোর বাণী টেনে নেবে মোরে
তোর কাছে ডাকি' ;
ওরে আলো, তোরে যদি গুরু ব'লে থাকি।

বিনায়ক

—গল্প— —শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

গ্রীষ্মকাল। বেলা প্রায় দুইটা। ক'দিন হইতে অসহ্য গরম পড়িয়াছে। মাথার উপর বন্ বন্ করিয়া বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে। ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিয়া যাইতেছি। ফাইলের পর ফাইল আসিতেছে, চিঠির পর চিঠি সহি হইতেছে। এমন সময় টেবিলস্থিত টেলিফোনটা রিম ঝিম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—রিসিভারটা তুলিয়া লইলে নিম্নলিখিত কথোপকথন চলিল—

"হ্যালো।"

"আপনি মিঃ জ্যোতির্ম্ময় দাস?"

"হ্যাঁ, আপনি কে?"

"আমাকে চিন্‌তে পারবেন কিনা জানি না; অনেক দিনের কথা কিনা।"

"তবু, কে বলুন না, দেখি যদি চিনতে পারি।"

"কি ক'রেই বা পারবেন, আপনি এখন মস্ত লোক, আমার সঙ্গে যখন আলাপ তখন ত কে কি হবে তা কল্পনার বস্তুই ছিল। যা হ'ক্, চুঁচুড়া ফ্রি চার্চ্চ স্কুলের কথা মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"সেখানে বিনায়ক বোস ব'লে কারুকে চিন্‌তেন? মনে আছে?"

"বি-না-য়-ক বোস?"

"হাঁ, তার সঙ্গে পড়তেন, এক পাড়ায় থাকতেন, এমন দিন যেত না যে তার সঙ্গে না দেখা করতেন।"

"ও হ্যাঁ তুমিই বিনায়ক? বাঃ, ১৭।১৮ বছর পরে কোথা থেকে কথা বলছ? কি করছ এখন?"

"করব আর কি, এক ইলেক্‌ট্রীক কোম্পানীতে সামান্য বেতনের কেরানীগিরি করি—সেদিন ফ্রিচার্চ্চের অতুল মাষ্টারের কাছে শুনলুম তুমি বিলেত থেকে খুব বড় চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসেছ। আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় করে।"

"ভয় কি? এক দিন বাড়ীতে দেখা করো।"

"বড় ভয় করে। তুমি মস্ত সাহেব। আচ্ছা জ্যোতি, গঙ্গার ধারে আমাদের সেই শপথ মনে পড়ে?"

"কি শপথ?"

"মনে পড়ছে না?"

"ও, হ্যাঁ পড়েছে বটে।"

"কিন্তু দেখ, তুমি সে কথা ভুলেছ, আমি কিন্তু ভুলিনি। আর ভুলবই বা কি ক'রে। সূর্য্য কত লোকের দিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু সূর্য্যমুখী এক সূর্য্যের দিকেই চেয়ে থাকে।"

"ও তুমি ত দেখছি মস্ত কবি হ'য়ে পড়েছো, যা হ'ক এক দিন নিশ্চয় এসো। আচ্ছা! গুড্‌বাই।"

"গুড্‌বাই।"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিলাম।

বহুদিনের কথা, শৈশব ছাড়াইয়া কৈশোরের প্রথম ধাপে সবে পা দিয়াছি। চুঁচুড়ার ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। তখন বোধহয় সাত আট বৎসর বয়স। আজ ২৮শের কোঠায় পা দিয়া ঠিক মনে করিতে পারি না তাহার সহিত প্রথম আলাপ কি করিয়া হইল। তবে সেদিনের কথাটা বেশ মনে পড়ে—অতুল মাষ্টার একটা কঠিন রকম অঙ্ক বোর্ডে লিখিয়া দিয়া বাহিরে গেলেন। অতুলবাবু বড়ই প্রহার-প্রিয় ছিলেন এবং অঙ্ক-শাস্ত্রটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বড়ই কম ছিল। কাজেই কোমল পিঠের উপর কত ঘা বেত পড়িবে ইহারই একটা পরিকল্পনা প্রায় সজল-নয়নে করিতে বসিয়াছিলাম এমন সময় কোথা হইতে বিনায়ক আসিয়া আমার পাশে ঘেঁসিয়া বসিয়া অঙ্কটা জলের মত বুঝাইয়া দিয়া কসাইয়া দিল। অতুল বাবুর ক্লাসে বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু ইতিহাসটাও ভাল মুখস্থ ছিল না। ইতিহাসের

ঘণ্টা আসিলে বিনায়ক বলিল, "পেছনের গ্যালারীতে চল।" তার পর সেখানে পাশ হইতে এমন বেমালুম prompt করিয়া দিল যে, মাষ্টার মশায় পড়ার রীতিমত তারিফ্ করিলেন। শুধু তাই নয় ইহার পর কত বিষয়েই যে ঐটুকু ছেলেটি আমায় সাহায্য করিত তা ভাবিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারি না। আমার এতটুকু সাহায্য করিতে পারিলে সে যেন ধন্য হইত। আমার বেশ মনে আছে হেডমাষ্টার মহাশয়ের ক্লাশে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিবার সময় আমার ধাক্কা লাগিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের টেবিলের উপর দোয়াত উল্টাইয়া হাজিরা-খাতার উপর কালি পড়িয়া যায়। দুর্দ্দান্ত হেডমাষ্টার বেত উঁচাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কালি ফেলেছে?"– কেহ কথা বলিবার আগেই বিনায়ক দাঁড়াইয়া কহিল "সার, আমি।" অমনি পটাপট্ করিয়া পাঁচ ঘা বেত তাহার হাতের উপর পড়িল। সে অম্লান বদনে সহ্য করিয়া নিজের জায়গায় বসিল। সেদিন স্কুল ছুটী হইলে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলাম, "কেন তুই অমন মিছে নিজের ঘাড়ে দোষ নিয়ে আমার হ'য়ে মার খেলি?" সেদিন সে আবেগে আমার অশ্রুসজল চোখ দুটি মুছাইয়া দিয়া কি গভীর দরদের সহিত উত্তর দিয়াছিল, "জ্যোতি, আমরা গরীব, আমাদের কত মার ধর খাওয়া অভ্যাস আছে; তোরা বড়লোক, সুখী, ওই গুণ্ডার মার খেলে হয়ত ম'রে যাবি, ছি ভাই, কাঁদিস নে।" ইহার পর জীবনবিধাতার হাতে কতবারই না বেত খাইয়াছি, কতই না কাঁদিয়াছি—কিন্তু সেই যে ফুটনোন্মুখ কৈশোরের প্রাক্কালে এক বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম সেই এক আমার হইয়া বুক পাতিয়া মার খাইয়াছিল আর ত কাহাকেও পাই নাই।

সে ছিল গরীব। বাস্তবিকই বড় গরীব। কিন্তু কি অসাধারণ মেধাবী, ও বুদ্ধিমান। তাহার যে কত অভাব কত দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিত তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতাম কিন্তু কোন দিন তা সাহস করিয়া দূর করিতে চেষ্টা করি নাই। সেই অতটুকু বয়সেও বেশ বুঝিয়াছিলাম যে যদি একবার সাহায্য করিবার বা সহানুভূতি দেখাইবার এতটুকু চেষ্টা করি তাহা হইলে এই আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ বালকটি হয়ত এক নিমেষে তাহার সমস্ত বন্ধুত্ব একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে। সে ছিল আমার অতি প্রিয়, অতি আবশ্যকের বন্ধু, আমার সে কৈশোরের স্বপ্নময় দিনে সে যেন আমার চারিদিকে এক অদ্ভুত মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

তাহার সহিত চার বৎসর একত্র পড়িবার পর বাবা চুঁচুড়া হইতে বদলি হইলেন, আমার স্কুল ছাড়িতে হইল। সে দিনের কথাটা আজও ভুলিব না। সে দিন সমস্ত বিকালটা দুজনে কি কান্নাটাই না কাঁদিয়াছি। অতি ক্ষুদ্র বালক তখন আমরা, জগতটা কি চিনিতাম? তবে নিজেদের যে জগতটা নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম সে জগৎটায় ছিল জ্যোতি আর বিনায়ক, বিনায়ক আর জ্যোতির সে প্রেমের মূল্য কি আজও বুঝি নাই। জীবনে তাহার কোনও সার্থকতা আছে কিনা সে প্রশ্নেরও সমাধান করিতে পারি নাই, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, সেই কৈশোরে বন্ধুবিচ্ছেদটা যত প্রগাঢ় ভাবে হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলাম তাহা বুঝি আর কখনও করি নাই। তখন বুঝি নাই যে পরস্পরকে ছাড়িতে হইবে, তাহা হইলে হয়ত অত নিবিড় ভাবে পরস্পরকে ভাল বাসিতাম না।

অনেকক্ষণ কান্নার পর বিনায়ক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— "আচ্ছা জ্যোতি, তুই কি আমায় চিরকাল মনে রাখবি?"

—"নিশ্চয়; তুই কি অন্য রকম ভাবতে পারিস বিনায়ক?"

তখন বিনায়ক আমায় হাত ধরিয়া গঙ্গার ভিতর এক হাঁটু জলে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল—"এইখানে দাঁড়ায়ে আয় আজ দুজনে শপথ করি—জীবনে কেউ কাউকে ভুলব না। এবং যদি একজন বড়লোক হয় ত, আর একজন বিপদে পড়লে—সে তাকে প্রাণ দিয়েও সাহায্য করবে।" তারপর ১৪।১৫ বৎসর তাহার কোন খবর পাই নাই। প্রথম দু'এক মাস পত্র চলিয়াছিল তাহার পর ধীরে ধীরে সব স্মৃতি মুছিয়া গেল। তাহার পর কত বন্ধু পাইলাম, কত হারাইলাম। আবার পাইলাম। কিন্তু জীবনযাত্রার আরম্ভসময়ে বিনায়ক বলিয়া এক সুহৃদের নিকট যে কত বড় শপথ করিয়াছিলাম তাহা ত ভুলিয়াই ছিলাম—এমন

বিনায়ক

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কি বিনায়ক বলিয়া যে কাহাকেও চিনিতাম তাহাও এই টেলিফোনে কথা বলিবার আগে হয়ত সহস্রবার চেষ্টা করিয়া মনে আনিতে হইত। সে শপথের হয়ত কোন মূল্য নাই, হয়ত সে বালকোচিত খেয়াল—কিন্তু মনে হয়, মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ, অসংখ্য তারা, পরিপূর্ণ চন্দ্র, পদতলে তরঙ্গচঞ্চলা লীলাময়ী ভাগীরথী, আর আশেপাশে স্বচ্ছ জলরাশি যেন সে শপথের চিরন্তন সাক্ষীস্বরূপ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

২

সে দিনও দুইটার সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

"হ্যালো।"

"আপনি কি জ্যোতির্ম্ময় বোস্?"

"হ্যাঁ, কে, বিনায়ক?"

"হ্যাঁ, গঙ্গাতীরে সেই শপথের কথাটা মনে আছে ত জ্যোতি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, আচ্ছা—এ কি পাগলামি হচ্ছে বলতো, টেলিফোন ক'রে। একদিন এসে দেখা কর না কেন?"

"বড় ভয় করে ভাই, বড় ভয় করে। আচ্ছা যাব এক দিন, যাব। আজ চল্লুম।"

"আচ্ছা।"

আশ্চর্য্য লোকটি ত।

তাহার পর দিন কি বার ছিল জানি না। কিন্তু আফিসে প্রচণ্ড কাজ পড়িয়াছিল। ঠিক দুইটার সময় আবার টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল—এবার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম—"কে, বিনায়ক?"

"হাঁ।"

"গঙ্গাগর্ভে শপথের কথাটা বেশ মনে আছে আমার। তোমায় রোজ মনে করাতে হবে না বুঝলে।" চোঙটা রাখিয়া দিলাম। একটু রাগিয়াছিলাম। এ শপথ বার বার স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য কি!

এই ঘটনার প্রায় আট দিনের পরের কথা বলিতেছি। বেলা প্রায় বারটা। পুরাদমে আফিস চলিতেছে এমন সময় চাপরাশি আসিয়া খবর দিল, যে একজন পুলিসের দারোগা ও দুজন কনেষ্টবল একটি চোরকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে—আমার সাক্ষাৎ চায়। আফিসের মধ্যে একি কাণ্ড; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম হলের ভিতর একজন সার্জ্জেন ও দুইটি পুলিশ একটি যুবকের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া, কোমরে দড়ি বাঁধিয়া, দড়িটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যুবকটি ছিপ্‌ছিপে লম্বা ধরণের, অতিশয় কৃশ। চোখে মুখে অত্যাচারের একটা নিষ্ঠুর ছাপ লাগিয়া আছে। চুলগুলা উস্ক খুস্ক, চোখের জ্যোতি অস্বাভাবিক রকমের উজ্জল। আমাকে দেখিয়াই সস্মিত মুখে কহিল—"জ্যোতি, আমি বিনায়ক।"

তাহার কথার উত্তর না দিয়া ইংরাজিতে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা কি চান্?"

দারোগা যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে এই—এই ব্যক্তি বিনায়ক বোস, পটলী নাম্নী কোন কুচরিত্রা স্ত্রীলোকের গহনা চুরির অপরাধে ধৃত হইয়াছে এবং জামিন হইবার জন্য আমার নাম বলিতেছে, পুলিস জানিতে চায় আমি উহাকে চিনি কি না এবং উহার জামিন হইতে ইচ্ছুক কি না। বিষম ক্রুদ্ধ হইলাম। আশেপাশে অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের কৌতূহলী দৃষ্টি, চাপরাশিদের ব্যস্ততা সমস্ত ব্যাপারটাকে যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের আকার দিয়া দিল। জ্যাক্‌সন্ কোম্পানীর কলিকাতা আফিসের ম্যানেজার মিঃ জে দাসকে জামিন হইতে বলিতেছে একটা চোর, যে বেশ্যার গহনা চুরি করিয়াছে! মাথার উপর যেন অগ্নিবৃষ্টি হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার লোকটার দিকে চাহিলাম। সে সঙ্কুচিত ভাবে মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর দারোগাকে কহিলাম—"আপনি কি মনে করেন যে এই লম্পট চোরটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বা আলাপ থাকা সম্ভব? আমি অনুরোধ করি এরূপ ভাবে আমার সময় নষ্ট করার আগে আমায় টেলিফোন ক'রে জানাবেন।" দ্রুতবেগে ঘরের ভিতর প্রস্থান করিলাম। শুধু যেন মুহূর্ত্তের জন্য একটা ক্ষীণ আওয়াজ কানে আসিল—"জ্যোতি!"

আজও ভাবিতে পারি না কেন তাহাকে অত নিষ্ঠুর ভাবে কুকুরের মত তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। তাহার যে মূর্ত্তি

দেখিলাম তাহা যেন দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মনে হইল এ যেন কোন নরকঙ্কাল বিনায়কের নাম লইয়া বিশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ওর যত শীঘ্র হয় চলিয়া যাওয়া উচিত। বহুদিন চলিয়া গিয়াছে তবুও বেশ মনে করিতে পারি বিনায়ক বড় হইলে কেমন দেখিতে হইত। তাহার মত সুন্দর ভ্রূ, উন্নত নাসিকা, আয়ত চক্ষু আজও ত চক্ষে পড়িল না; তবে ও কাহাকে দেখিলাম, লম্পট, স্বেচ্ছাচারী কঙ্কালসার! এই কি বিনায়ক! ভাবিতেও কষ্ট হয়।

তবু মনে হইল ইহাকেই একদিন প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবার কথা হইয়াছিল। সময়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে এত দিন কে কোথায় ছিল জানি না, যখন প্রবল স্রোতের টানে পরস্পরে এক স্থানে আসিয়া মিলিল, তখন একজন শস্যশ্যামল চন্দ্রকরোজ্জ্বল দ্বীপাবলির মধ্যে আশ্রয় গড়িয়া তুলিয়াছে আর একজন সেই দ্বীপের এক কোণে এতটুকু আশ্রয় পাইবার জন্য বাত্যাক্ষুব্ধ সাগর হইতে চীৎকার করিতেছে।

উহাকে আশ্রয় দিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে। নহিলে যে জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ-দিনের এক মহা-সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তবুও কি করিব ঠিক করিতে পারিলাম না। জামিন হইতে প্রবৃত্তি হইল না, বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হইল। এ যে কত বড় মিথ্যার মোহে কত বড় নির্ম্মম সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম আজ তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবি। যেদিন খরস্রোতা গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া দুইটি বালক পরস্পরকে বন্ধুত্বের অটুট বন্ধনে বাঁধিতে প্রয়াস পাইয়াছিল সেদিন কি তাহারা একবারও ভাবিয়াছিল—যে প্রায় ষোল বৎসর পরে, বিধাতার নিকট সেই সত্য পালনের কঠোর পরীক্ষা দিতে হইবে। সেদিন তাহা হইলে হয়ত তাহারা অত বড় প্রতিজ্ঞা করিত না। আর করিলেই বা কি, তখনও কেহ ভাবে নাই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু অ-প্রিয়, অ-সমকক্ষ তাহাদের ঘৃণা করিবার মত মনের গতি হইয়া যায়। মিথ্যার জন্য সত্যকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।

আমার ছোট-বোনের শ্বশুর সত্যব্রতবাবু পুলিস কোর্টের বেশ বড় উকিল। তাঁহাকে গিয়া বলিলাম, ঐ লোকটিকে বাঁচাইতে হইবে। পরে শুনিয়াছিলাম সত্যব্রতবাবু বিনায়কের জন্য অনেক বাক্‌যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই, শুধু অনেক চেষ্টার পর তাহার শাস্তির পরিমাণ কমিয়া গিয়া ছয়মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। সেই দিনের পর হইতে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করি নাই, কেমন যেন একটা অপরিসীম লজ্জায় মনটা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

৩

ইহার পর আটমাস পরের কথা বলিতেছি। অফিস হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় বালিগঞ্জে আমার বাসার পশ্চিম দিকের বারান্দায় আরাম-কেদারার উপর পড়িয়া আছি। সন্ধ্যার ম্লান আবছায়া অন্ধকারে সমুখের সমস্ত মাঠটি ভরিয়া গেছে। এমন সময় একটি লোক ধীরে ধীরে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল রকম দেখা যাইতেছিল না, ভাবিলাম বোধ হয় আফিসের কর্ম্মচারী, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে আপনি, কি চান্?"

লোকটি সংক্ষেপে উত্তর করিল—"জ্যোতি, আমি বিনায়ক।"

আবার সেই কথা। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিলাম। তীব্র বিদ্যুতালোকে দেখিলাম সেই মূর্ত্তি, আরও কৃশ, চোখ দুটি আরও অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল, মাথা মুণ্ডিত। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটি চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল। ইচ্ছা করিলে আজও তাড়াইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু পারিলাম না, কেমন যেন একটা ব্যথায় মনটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল। বলিলাম—"বিনায়ক, বোস।" বিনায়ক বসিলে বলিলাম—"বিনায়ক, আমার সেদিনের ব্যাপারের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

বিনায়ক সে কথার উত্তর দিল না। কহিল—"চুরি আমি কোনদিন করিনি জ্যোতি, আর বোধহয় করতুমও না; কিন্তু কত বড় দুঃখে যে ও কাজ করেছি সেই কথাটাই তোমায় ব'লে যেতে চাই। এ ভালই হয়েছে জীবনযাত্রার

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আরম্ভসময়ে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলুম আজ যাবার দিনে তেমনি একবুক ঘৃণা নিয়ে চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে সব কথা তোমায় পরিষ্কার ক'রে ব'লে যেতে চাই।"

বিনায়কের তিরস্কারটা মাথা পাতিয়া লইলাম। আজ সাহেবি-আনার সমস্ত মোহ, বিলাত-ফেরতের সমস্ত গর্ব্ব ছাপাইয়া মনটা ঠিক আট বছরের বালকের মনের মত দুর্ব্বল, অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল। আজ জোর করিয়াও রাগিতে পারিলাম না। মনে হইল এই কৃশ, মরণাপন্ন, মাতালটিই একদিন আমার জীবনে কি পূজনীয়ই না ছিল, সেদিন ওর প্রতিভা, ক্লাসে সমস্ত বিষয়ে ওর প্রথম হওয়া দেখিয়া কি অবাক বিস্ময়েই না ওর চরণে নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছি। তাই তাহার হাতদুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"রাগ করিস না বিনায়ক, কি বল্‌বি সমস্ত খুলে বল্।"

"—কি বলব সেইটেই ত ভেবে পাই না জ্যোতি, কোন থান থেকে বলব। গত জীবনটার দিকে চোখ ফেরালেই দেখ্‌তে পাই সেখানে সংঘাতের পর সংঘাত। কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ কে করলে জান? ঐ পট্‌লী। কি কুক্ষণেই না ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল! মাইনে যা পেতুম সমস্ত ওর পায়ে ঢেলে দিতুম। ঘরে বউ, ছয় বছরের মেয়ে তাদের দিকে ফিরেও দেখতুম না। মেয়েটা কিসে মর্‌ল, জান? এত রকম রোগও জগতে আছে!" বলিয়া বিনায়ক হাসিল; সে হাসির কি অর্থ বুঝিলাম না।

"—ডাক্তারে বললে, মেয়েটা ছয় বছর ধ'রে আধ-পেটা, সিকি-পেটা খেয়ে, মেরুদণ্ড বেঁকে ম'রে গেল।"

শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল যেন চোখের সম্মুখে বিশ্বের দারিদ্র্য এক ছয় বৎসরের মেরুদণ্ডহীন শিশুর আকৃতি লইয়া কোঁকাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

"এততেও আমার সুন্দরীর শান্তি হ'ল না। এক দিন বললে—অত যে ভালবাস, ভালবাস বল, কই দাও দিকিনি বউয়ের গহনা গুলো এনে।" তখন মদের নেশায় চুর হ'য়ে আছি—বল্লাম, "পারিনা?" সে বললে—"কখনো না, তোমার সব মুখে।" ব'লে পট্‌লী হাসলে—পট্‌লীকে তুমি দেখনি, তাই সে যে কত বড় ডাইনী তা আমি তোমায় আজ ব'লে বোঝাতে পারি না। তার সে হাসি আমায় পাগল ক'রে দিলে, ছুটে বাড়ী গেলুম। আমার বউ অনেক সহ্য করত। মাতালের বউরা সাধারণত যা সহ্য করে তার চেয়ে একটু বেশীই; কেন না, তুমি ত জান, আমার মার-হাতটা ছেলে বেলা থেকেই একটু বেশী। কিন্তু যখন তার বাপের দেওয়া দুচারখানা ভারী গহনা ভরা বাক্সটায় হাত দিলুম তখন সে বাঘিনীর মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে—এক থাপ্পড়ে আর দুই লাথিতে তাকে অজ্ঞান ক'রে ফেলে তার বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেলুম। যখন ফিরে এলুম তখন ভোর চারটে, এসে—এসে—"তার গলার স্বর যেন সহসা বন্ধ হইয়া গেল, সে যেন দারুণ আতঙ্কে একেবারে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "বিনায়ক, জল খাবে?"

সে বলিল—"কই দাও।" তাহার পর জল খাইয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল—"এসে দেখ্‌লুম আমার চির-অনাদৃতা বউ গলায় দড়ি দিয়ে কাঠ হ'য়ে ঝুলছে।"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইল যেন সহসা সান্ধ্য বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়া আমার দম বন্ধ করিয়া দিতেছে।

"সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলুম। সন্ধ্যার সময় ঠিক করলুম—যে গহনার জন্যে একটা নারীহত্যা ক'রে ফেল্‌লুম সে গহনার বাক্স পট্‌লীর হাত থেকে উদ্ধার ক'রে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দেব। সেইদিন রাত্রে পটলীর বাড়ী থেকে গহনার বাক্স চুরি ক'রে পালাই। যখন ধরা পড়্‌তে আর দেরী নেই তখন তোমার কথা শুন্‌তে পেয়ে তোমাকে টেলিফোন করি। কিন্তু আর পারি না। এখন মনে হয় এ জ্বালার হাত থেকে যত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাই ততই ভাল।"

সমস্ত শুনিয়া কহিলাম—"যাক্, সমস্তই ত হ'ল, এখন কি করবে ঠিক করেছ।"

"কি আর করব, একরকম ভিক্ষে ক'রেই কটা দিন চালাচ্ছি আর ধীরে ধীরে ওপারের দিকে এগিয়ে চলেছি। এই রকম ক'রেই কাটাব।"

"তার মানে?"

"মানে আর কি। অনবরত মদ খেয়ে শরীরে আর কিছু আছে রে ভাই।"

ঘরের ভিতর উঠিয়া গিয়া একখানা পাঁচশত টাকার চেক লিখিয়া বিনায়কের হাতে দিয়া কহিলাম—"আমার এ অনুরোধটা রাখতেই হবে বিনু, চিকিৎসা করা, বাঁচ্। যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিস্ তখন এমন বেঘোরে তোকে মারা যেতে দেব না।"

বিনায়ক চেকটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে কহিল—"আমি জান্‌তুম জ্যোতি—আমার ধারণা ভুল হয় না—তোর ভিতর যে কত বড় মহৎ প্রাণ লুকিয়ে আছে তা জান্‌তুম ব'লেই সেদিন টেলিফোন করতে সাহস করেছিলুম। ওরে জ্যোতি, আমার জীবনের যে কত কী নষ্ট হ'য়ে গেছে সে সব ভুলে গিয়ে আজ কি নিয়ে বাঁচব রে। আজ কি মনে হয় জানিস্, মনে হয় যদি শীঘ্র না মরি তা হ'লে কোনদিন হয়ত ঐ পটলীকে খুন ক'রে ফাঁসি যেতে হবে।"

আর্দ্রকণ্ঠে কহিলাম—"না না তোকে বাঁচতেই হবে বিনু, এমন ক'রে নিজের মূল্যবান্ প্রাণটাকে নষ্ট করিস না। যা গেছে তা গেছে, এখন আবার নতুন ক'রে জীবনটা গড়্।"

বিনায়ক হাসিয়া আমার পিঠের উপর হাতটা রাখিয়া কহিল—"বেশ ত ব'লে গেলি যা গেছে তা গেছে, কিন্তু কত যে গেছে তা ত তোকে আজ বোঝাতে পারি না। তবে যখন বলছিস্ তখন চেষ্টা করব। তবে কি জানিস্, চিরদিন ব্যর্থ হ'য়ে হ'য়ে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি—এখন মনে হয় বুঝি ব্যর্থতাই জীবন, আর সেইটেই তার চরম সার্থকতা।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তাহার যাবার পর পত্নী সরমা আসিয়া বলিল—"একটা মাতালের সঙ্গে কি বকবক করছিলে বল ত, প্রায় আধঘণ্টা হল ডিনারের বেল দিয়েছে।" কোন কথা বলিলাম না। কিন্তু ইচ্ছা হইয়াছিল বলি যে, যেদিন তোমায় স্বপ্নেও কল্পনা করিবার শক্তি হয় নাই, সেদিন সেই জীবনের প্রথম প্রভাতে হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত প্রীতিসম্ভার নিঃশেষ করিয়া ঐ মাতালটির হাতেই সঁপিয়া দিয়াছিলাম।

৪

ইহার পর অনেক দিন তাহার আর কোন খবর পাই নাই। আমার জীবনাকাশে সে ধূমকেতুর মত সহসা উদিত হইয়া আবার যে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

একদিন বিকালে পোলোক ষ্ট্রীটে কয়েকজন পাটের দালালের সহিত দেখা করিয়া শ্যামবাজারের দিকে যাইতেছি এমন সময় টেরিটিবাজারের মোড়ে মোটরের গতি থামিয়া গেল; ব্যাপার কি জানিবার জন্য মুখ বাড়াইতে দেখিলাম ফুটপাথের ধারে বেশ একটু জনতা হইয়াছে। মোটরচালক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল একটি মাতাল চলিতে চলিতে ফুটপাথের উপর পড়িয়া গিয়া অজ্ঞানের মত হইয়া আছে, এবং তাহারই আশে-পাশে এই জনতার সৃষ্টি।

অন্য সময় হইলে হয়ত মোটর চালককে গাড়ী ঘুরাইয়া অন্য রাস্তা দিয়া চলিতে বলিতাম। কিন্তু বিনায়কের কাহিনী শোনার পর হইতে সমস্ত দরিদ্র অসহায় জাতির উপর নিজের অলক্ষিতে কখন যে একটা আকর্ষণ ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। মনে হইত ভারতের প্রত্যেক দরিদ্রটির ভিতর একটা করুণ ইতিহাস লুকাইয়া আছে; একটু চেষ্টা করিলেই তাহা জানা যাইবে, আর তাহাদের সমবেত ইতিহাস হয়ত একদিন দেশের অন্তরকে নাড়া দিয়া যাইবে।

গাড়ী হইতে নামিয়া মাতালের নিকট গিয়া দেখিলাম সে বিনায়ক। বিস্মিত হইলাম না। মোটর চালকের সাহায্যে তাহাকে মোটরে তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলাম। একেবারে বেহুঁস মাতাল। নগ্নপদ, গায়ে জামা নাই। পরনের কাপড় অসংযত। সমস্ত মাথায় লম্বা লম্বা চুল—তাহাতে কাদা ও ধূলা। সমস্ত গায়ে কাদা। মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছে। মদের উগ্র গন্ধে আমার প্রাণ যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিল ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স; জ্ঞান নাও হইতে পারে। বড় আশা করিয়া সমস্ত রাত্রি শিয়রে বসিয়া রহিলাম, যদি একবার জ্ঞান হয় তাহা হইলে এইবার পারের যাত্রীর নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাহিয়া লইব। যেদিন বড় আশায় বুক বাঁধিয়া আমার আশ্রয়ে আসিয়াছিল, সেদিন কেন বিন্দুমাত্র সাহায্য করিয়া তাহাকে এই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করি নাই।

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কিন্তু জ্ঞান তাহার হইল না। কোথায় মরিতেছে, কাহার কাছে মরিতেছে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

রক্তনেত্র ললাটে তুলিয়া সারারাত্রি ভুল বকিতে লাগিল। কি যে বলিল অনেক কথাই মনে নাই, তবে এইটুকু মনে আছে, একবার বলিয়াছিল—"তুমি আমায় বাঁচ্‌তে বলছ জ্যোতি, কিন্তু কি ক'রে বাঁচি বল ত। মদ না খেলেই দেখি বউ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, মেয়েটা অনাহারে শুকিয়ে মরছে, একটা ডাইনী অনবরত টাকা আর গহনা চাইছে, এর পর মদ না খেয়ে কি ক'রে থাকি।" আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কত ডাকিলাম, কত ঔষধ দিলাম। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় তাহার যেন পরিষ্কার জ্ঞান হইল। আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"বড় সুখেই মরছি, তোর বাড়ীতে, তোর কাছে। তুই ছাড়া আজ যে আমার কেউ নেই।" বলিয়া সহসা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেদিন আর আত্মসংবরণ করিতে পারি নাই, মুহূর্ত্তের জন্য নিজের কপট গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া, সমস্ত চাকর বেয়ারাদের সামনে একবারে বালকের মত হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

বৈকালে যখন তাহার সৎকার করিয়া বাড়ী আসিলাম তখন অস্তগামী সূর্য্যের লেলিহান রক্তশিখা সমস্ত পশ্চিমাকাশকে চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে। সেই দিগন্ত-বিতত ধ্বংসলীলার পানে চাহিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম কেমন করিয়া জীবনের প্রারম্ভে এক মহাপ্রাণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। কেমন করিয়া তাহাকে হারাইলাম। তবুও মনে হয়, একটা অত বড় জীবন হয়ত পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত না, যদি জগতের কাছে সে এতটুকু সাহায্য, এতটুকু দয়া, এতটুকু সহানুভূতি পাইত। বিধাতার কালচক্র যদি ঠিক নিয়মমত ঘুরিত।

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

১

পল্লীগ্রামে যারা 'গাজির গান' ইত্যাদি লোকপ্রিয় অভিনয়ের ছড়া বাঁধেন, তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান। মুসলমানপ্রধান পল্লীর অধিবাসী বলিয়া বাল্য হইতেই আমার এই ছড়াগানের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। গান গুলির ভিতর দোষ একটু-আধটু থাকিলেও কৃত্রিমতা মোটেই ছিল না। অশিক্ষিত পল্লী-কবিদের প্রাণে যে সহজ কবিত্বের স্রোত প্রবাহিত, এ যেন তার লীলায়িত উচ্ছ্বাস। যথারীতি হয়তো তা বহিয়া চলিতে জানে না, কিন্তু শৈলগাত্রোৎক্ষিপ্তা নির্ঝরিণী যেমন আঁকিয়া-বাঁকিয়া উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে, উদ্দাম ছন্দে নাচিয়া চলে, এ গানগুলিও তেম্‌নি রীতিকে লঙ্ঘন করিয়াও সুন্দর ভাবে নাচিয়া চলিয়াছে।

এ সুন্দর কবিত্বের ডালি আজও পল্লীগ্রামের নিভৃতচ্ছায়ে আবৃত। দু চারখানি মাত্র মাঝে-মাঝে সাহিত্য-রসপিপাসুগণের দৃষ্টিলাভে সমর্থ হয়। আমাদের বেশীর ভাগ লোকই এদের কোন সংবাদ রাখেন না। অবশ্য তার অনেক কারণও আছে।

প্রথমত, পল্লী-কবিরা অশিক্ষিত বলিয়া তাদের বর্ণবিন্যাস প্রায়ই অশুদ্ধ। সর্ব্বদা প্রচলিত অনেক শব্দের বানানও এমন ভাবে করা হয় যে বোঝে কার সাধ্য! 'রূপোশীরা' শব্দটা পড়িয়া প্রথমেই একটু ধাঁধাঁ লাগে—কিন্তু পরে বোঝা যায় ইহা আমাদের চির-পরিচিত 'রূপসীরা' শব্দ। বর্ণাশুদ্ধিদোষ প্রায় প্রত্যেক শব্দেই আছে—এর উপর আবার উর্দ্দু ফার্সী শব্দের অকারণ প্রয়োগ।

দ্বিতীয়ত—পল্লী-কবিদের শোচনীয় দারিদ্র্য। প্রায়ই তাহাদের বই ছাপিবার মত অর্থ-সামর্থ্য থাকেনা। যে দু-একজন বা বই ছাপান, তাঁহারাও বিশ্রী মেটে কাগজে সাধারণ হরফে বই ছাপান। সকল রকমের ছন্দ গদ্যের ছাঁচে ঢালা—কাজেই তর্‌-তর্‌ করিয়া পড়িয়া যাওয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা। আধুনিক সাহিত্যসেবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার মত সৌষ্ঠব বা চাকৃচিক্যের ইহাতে একান্তই অভাব। ইস্‌লামীয় পুস্তকবিক্রেতাদের দোকানে ইহা অনাদরে পড়িয়া থাকে।

এই প্রেমকাব্যের কবিগণ প্রায়ই মৈমনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানের অধিবাসী। ইহাদের শত করা একজনও হয়ত বই ছাপান না। উৎসবাদি উপলক্ষে নিজেদের মন হইতে ছড়া-গান বিবৃত করিয়া পল্লী-শ্রোতৃবৃন্দকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। সহর পর্য্যন্ত তাঁদের কণ্ঠ আসিয়া পৌছায় না। পল্লী-কবিরা ভীত, সন্ত্রস্ত। পল্লীগ্রামের সীমার বাহিরে যে তাঁদের রচনা সমাদর লাভ করিবার যোগ্য, একথা তাঁহারা স্বপ্নেও বোধহয় কল্পনা করেন না।

কিন্তু একটি ভালো ঝর্ণা দেখিলে যেমন পিপাসুগণকে ডাকিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করে, আমারও তেম্‌নি ইচ্ছা করে এই পল্লী-কবিগণ সুধীবৃন্দের অগোচরে পল্লীর নিভৃতকুঞ্জে যে মধুচক্রের রচনা করিয়াছেন, তাহার ক্ষরিত মধুপাত্র সাহিত্য-রসিকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরি। তাই আমার এই ক্ষুদ্র উদ্যম। কয়েক শত ইস্‌লামি কাব্য পড়িয়া আমার যে কয়খানি সব চেয়ে ভালো লাগিয়াছে তারই কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দু ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রভাব

এই প্রেমকাব্যগুলি পড়িয়া প্রথম লক্ষ্য হয়, তাহাদের কবিদের উপর হিন্দু ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রভাব। প্রেমকাব্যের ছত্রে ছত্রে হিন্দু ভাব, গল্প, উপমা, এবং ধর্ম্ম ইস্‌লামি ভাবে ঢালাই হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অপ্সর কিন্নর—সকলেই আছেন; অবশ্য সকলের উপরে আছেন আল্লা-হ-তাল্লা। হিন্দু দেব-

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

দেবীগণ মুসলমানী ধর্ম্মের বিরোধী, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাহাদের নানারকম সম্পর্ক হইতে পারিত। ইন্দ্রের সভায় প্রেমকাব্যের অনেক নায়িকাই নাচগান করিতেন। প্রেমকাব্যে পাই—

গঙ্গা দুর্গা শিব জায়া, তাহাকে করিত দয়া,
মাসী তারা গাজির হইত।
(গাজী কালু ও চম্পাবতী)
নাগোপরি আরোহিয়া, গেল পদ্মা গাজির কাছেতে!
হাসিয়া সেলাম করে,
ভগ্নী ভগ্নী বলি করে
ধরি গাজি লইল কোলেতে।
(গাজি কালু ও চম্পাবর্তী)

গঙ্গা, দুর্গা, কালী, মনসা, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি কোন দেবতাই কবিদের কাছে মিথ্যা নয়। কিন্তু মজা এই, হিন্দু দেবদেবীতে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ এই কবিগণ হিন্দুদের মুসলমানী ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে কসুর করিতেন না। কি যে তাঁহাদের যুক্তি, তাহা স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলেন নাই। তবে—হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয়, মুসলমানী ধর্ম্ম একমাত্র সত্য, অতএব গ্রহণ কর—এমন যুক্তি তাঁহারা কোথাও প্রয়োগ করেন নাই। মুসলমানের দল ভারি করাই বোধ হয় ইঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই জনৈক কবি তাঁর নায়কের মুখ দিয়া বাহির করিতেছেন—

করাইতে পারি যদি গঙ্গার দর্শন,
হৈবা কিনা মুসলমান করহ স্বীকার।

গঙ্গায় বিশ্বাসী যাহারা, তাহারা গঙ্গাদর্শন করিয়াই আপনাদের সিদ্ধ মনে করেন। তারপর তাহারা কেন মুসলমান হইবেন, একথা কবি ভাবিয়া দেখেন নাই। আসল কথা, পল্লীবাসী মুসলমান কবিদের ধর্ম্ম খাঁটি ইস্‌লাম ধর্ম্ম নয়—উহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সংমিশ্রন।

পল্লীবাসিগণ এ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আজকাল একটু অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও সেদিনও দেখিয়াছি মুসলমানগণ হিন্দু পূজায় রীতিমত উৎসব করিয়া থাকেন। দুর্গা প্রতিমা নদীতে ডুবাইত মুসলমান,—বিজয়া দশমীর প্রণাম জানাইয়া মুসলমান সন্দেশ আদায় করিত। হিন্দুদের ন্যায় তাহারাও কালী শীতলা প্রভৃতি উগ্রচণ্ড দেবতার খোলায় কলেরা বসন্তের প্রকোপশান্তির জন্য মানৎ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের উপর হিন্দু ধর্ম্মের কতখানি প্রভাব, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে নয়, সাহিত্য সম্বন্ধে কবিরাও হিন্দুদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। গ্রামে রামায়ণ গান, ঢপ্‌ কীর্ত্তন, রয়ানি (মনসামঙ্গল গান), যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি হিন্দু অনুষ্ঠান আবহমান কাল ধরিয়া এত বেশী প্রচলিত যে, মুসলমান্ হ'ক্, খ্রীষ্টান হ'ক্, কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই তাহার প্রভাব অতিক্রম করা সহজ ছিল না। এই মুসলমান কবিগণও জানিয়া এবং না-জানিয়া হিন্দুর পুরাণাদি অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বলা যাইতে পারে।

ভেলোয়া সুন্দরী বনাম সীতা-দময়ন্তী-চিন্তা

আমির সাধুর বণিতা ভেলোয়া সুন্দরী আদর্শ সতী। একবার তিনি নদীতে জল নিতে যান্। ভোলা সাধু তখন ডিঙি সাজাইয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। ভেলোয়ার অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ ভোলা ভেলোয়াকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন। তারপর তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সুচতুরা ভেলোয়া বলিলেন, এ ছ'মাস আমার একটা ব্রত আছে, এ ছ'মাস না গেলে পুনর্বিবাহ করিতে পারিব না।

আমির সাধু নিরস্ত হইলেন, কিন্তু ভেলোয়া সুন্দরী নিরস্ত হইলেন না। তিনি নিজের কাহিনী বিবৃত করিয়া একটি গান রচনা করিলেন, এবং দেশে দেশে দূতী পাঠাইয়া সেই গান গাওয়াইলেন। কেউ সে গানের জবাব দিতে পারিল না—পারিলেন শুধু ভেলোয়ার স্বামী আমির সাধু। আমির সাধু তখন ভেলোয়ার সন্ধান পাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিয়া গেলেন। কিন্তু দেশে গিয়া এক বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এতদিন ভেলোয়া সুন্দরী পরবাসে বন্দিনী ছিলেন, তাঁর চরিত্র যে অটুট আছে, তার প্রমাণ কি? প্রবাসিনী ভেলোয়ার অগ্নিপরীক্ষা হইল। ভেলোয়া সুন্দরী অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন না বটে, তবে অভিমানে এ মর্ত্ত্য ছাড়িয়া

অন্যলোকে চলিয়া গেলেন। এই কাহিনীরচয়িতার উপর যে চিন্তা, দময়ন্তী এবং সীতার কাহিনীর প্রভাব আছে, তা পুঁথিখানি পড়িলেই অনায়াসে বোঝা যায়।

বদিউজ্জামাল বনাম বিদ্যাসুন্দর

বদিউজ্জামাল বলিয়া যে একখানি বই আছে, তাহা হুবহু বিদ্যাসুন্দরের নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন ভিন্ন দেশকাল পাত্রের অবতারণা করিয়া কবি সেই পুরাতন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই আমাদের শুনাইতেছেন। ইহার গল্পাংশ, বর্ণনা, এবং রচনাপ্রণালী সবই বিদ্যাসুন্দরের ন্যায়, তবে যে অসামান্য কবিত্বপ্রভাব রায়গুণাকর বিদ্যাসুন্দরের ভাষা রসাল করিয়াছে, বদি-উজ্জামালের কবির তাহা অণুমাত্র নাই। তাই তাঁহার ভাষা রহিয়া রহিয়া অসংযত এবং অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। গল্পটা হইল—বাদশাজাদা ছয়ফলমুলুক পরমাসুন্দরী কন্যা লালমতির চিত্র দেখিয়া উন্মাদ হইলেন, এবং নায়িকালাভের আশায় বিদেশ যাত্রা করিলেন। বহু পর্য্যটনের পর তিনি সেই দেশে আসিয়া পৌছিলেন, যেখানে লালমতি থাকেন। কিন্তু লালমতি রাজকন্যা অন্তঃপুরচারিণী। তাহাকে কি করিয়া পাওয়া যায়? তখন কৌশলী ছয়ফলমুলুক রাজবাটীর মালিনীর শরণাপন্ন হইলেন এবং এক দিন মালিনীর পুত্রবধূ সাজিয়া রাজকন্যার অন্দরে প্রবেশলাভ করিলেন। তারপর বিদ্যাসুন্দরের মত প্রেমের অভিনয় চলিল। সেই শৃঙ্গার, সেই প্রেমাভিনয়, সেই বর্ণনা, সেই বিচারের পালা। পড়িতে পড়িতে মনে হয় এ যেন দ্বিতীয় বিদ্যাসুন্দর পড়িতেছি।

কাব্যরচনার প্রণালী

এই সব কাহিনী ব্যতীত কাব্যরচনার সাধারণ প্রণালীও হিন্দু কবিগণেরই অনুরূপ। ইহাতে বারমাসী বর্ণনা আছে, বিরহিনীর কোকিল বা ভ্রমরের উপর ক্ষুব্ধ-করুণ কটাক্ষ আছে, মদনের ফুলশর, পদপল্লব ধরিয়া মানভঞ্জনের পালা আছে। শৃঙ্গারাদির বর্ণনা নায়ক নায়িকাদের দেহে সম্ভোগ-চিহ্নের বর্ণনা, নায়ক-নায়িকাদের রূপবর্ণনা প্রভৃতি সবই হিন্দু কবিদের ন্যায়। এই কবিরা বর্ণনা করিতে করিতে সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন, তাঁহারা মুসলমান। প্রায় কবিই মুসলমানী নায়িকার দেহে সম্ভোগ-চিহ্নের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, নায়িকার এয়োতি-চিহ্ন কপালের সিঁদূর বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মুসলমান রমণীরা যে সিঁদুর পরেন না, বর্ণনাকালে একথা বোধ হয় কবিদের মনে ছিল না। হিন্দুপ্রভাবের ইহা একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

কাব্যের পরিকল্পনা

এই প্রেমকাব্যকে নিছক্ কাব্য বলা চলে না। লোক-মতনিরপেক্ষ হইয়া আত্মানন্দে বিভোর কবি যে কাব্যরচনা করেন, ইহা তাহা নয়। এই প্রেমকাব্য সাধারণত পল্লীতে পল্লীতে গীত অথবা অভিনীত হয়। অতএব ইহার নাম দেওয়া যায় লোকসাহিত্য। লোকপ্রিয় করার জন্য কবির ইহাকে ঘটনাবৈচিত্র্যবহুল করিতে হয়। কবি বিশেষ বিশেষ অবস্থার অবতারণা করিয়া পল্লীশ্রোতৃবৃন্দকে চমকিত, আগ্রহান্বিত, এবং উৎফুল্ল করিয়া তোলেন। এক কথায় বলিতে গেলে—কবি কাব্যে ঘটনাবৈচিত্র্য পরিস্ফুট করিতে গিয়া এক-একটা সংঘর্ষের অবতারণা করিয়াছেন।

বস্তুত, সংঘর্ষ না থাকিলে পল্লীসাহিত্য জমে না। পল্লী-শ্রোতারা সাধারণ জীবনযাত্রার দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনিতে উৎসুক নয়। জনৈক মুসলমান এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে দিনের পর দিন সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—এতে পল্লীবাসীর তৃপ্তি হইবে না। কবিকে বাধ্য হইয়া সংঘর্ষমূলক কাব্যের পরিবেশন করিতে হয়। ইহাই লোকসাহিত্যের জন্মকথা। ইহার উপর এই প্রেমকাব্যের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত।

এই কাব্যের বিষয় হইতেছে নায়ক-নায়িকার মিলন। মিলন যাহাতে আকাঙ্ক্ষায় আগ্রহে সুন্দর হইয়া উঠে, তজ্জন্য এই মিলনের পথে কবি বিষম অন্তরায় উপস্থিত করিয়া থাকেন। ইসলামি প্রেমকাব্যে নায়কগণ সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান। এখন নায়িকারা নায়কদের সহজলভ্য হইবেন না, হইলে আসর জমিবে না, কাজেই নায়িকাগণ প্রায়ই হিন্দুকন্যা বা হিন্দুবধূ। যে ক্ষেত্রে নায়িকা

শ্রীবিমল সেন

মুসলমানী, সেখানে হয় নায়িকা নায়কের শত্রুকন্যা, অথবা পরস্ত্রী, অথবা নায়কের গুরুজন এ মিলনে বাদী। নায়কের পিতার দিক হইতে যদি বা বাধা না আসিল, নায়িকার দিক হইতে এই বাধা আসিবে। এই বাধা অতিক্রম করিয়া নায়ক-নায়িকা মিলিত হইবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে নায়ক-নায়িকারা প্রেমের প্রতাপ বুঝিবার আগেই বাল্যবিবাহে বদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাহাদের মিলনে বিচ্ছেদ ঘটানো চাই। এর জন্য শাশুড়ী-ননন্দী আছেন অথবা অভাবিত আকস্মিক কোন বিপদ আছে। মোট কথা নায়কনায়িকা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। নায়ক শতসহস্র বিপদ বাধা অতিক্রম করিয়া নায়িকার সহিত মিলিত হইবেন। এই পুনর্মিলনের বর্ণনাস্থলে প্রেমকাব্য বেশ জমিয়া উঠে।

অনেক সময় নায়িকা স্বয়ং এ বাধা জন্মান। বুদ্ধিমতী হইলে এমন দুরূহ প্রশ্নের উত্থাপন করেন যে নায়করা তাহার জবাব দিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠেন। পাণিপ্রার্থীরা নায়িকার সমস্যাপূরণে অসমর্থ হইয়া প্রায়ই রাজকন্যার বন্দী অথবা ক্রীতদাস হইয়া থাকেন। নায়ক শুধু সে সমস্যাপূরণে সমর্থ হ'ন। অনেক সময় সমস্যাপূরণের পরিবর্ত্তে পাশাখেলার অবতারণা করা হয়। নায়ককে নানান্ ফিকির-ফন্দি করিয়া এই পাশায় জয়লাভ করিতে হয়।

কিন্তু পূর্ব্বকথিত কোনো দিক হইতেই যদি বাধা না আসে তো, নায়িকাকে পরীরাজ্যের কন্যা বলিয়া দুর্লভা করিয়া তোলা হইবে। মোট কথা, নায়িকাকে অসহজলভ্যা করা চাই। কবির ধারণা,

'বিনাশ্রমে পেলে রত্ন, কে করে তাহার যত্ন ?'

নায়ককে দিয়া তাই তিনি অনেক মানুষের অসাধ্য কাজ করাইয়াছেন। মস্ত বড় বিখ্যাত বাদ্‌শার একমাত্র ছেলে হইয়া নায়ক ফকির সাজিলেন, তারপর রাজকন্যার সন্ধানে একাকী নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন। পথে কত রাক্ষস বধ করিলেন, কত শত যুদ্ধ জয় করিলেন ইত্যাদি সম্ভব অসম্ভব অনেক বর্ণনায় কাব্য পরিপূর্ণ। যেখানে কোন কার্য্য মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব, সেখানে দৈবশক্তি বা দৈব সাহায্যের অবতারণা করা হইয়াছে। বাঘ, কুমীর মাছ সকলে নায়কের পক্ষ হইয়া লড়িয়াছেন। নায়কের ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি পড়িল আর শত্রু-পুরী দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

এই ধরণের কল্পনার চাতুর্য্য সকল সাহিত্যেই আছে। হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদিতে এ কল্পনা অতিরিক্ত পরিমাণেই আছে। কাব্য জনপ্রিয় করিতে হইলে যে সংঘর্ষের প্রয়োজন, তাহার জন্য প্রায়ই ইহা অপরিহার্য্য।

রূপবর্ণনা

কাব্যের দুই প্রধান শাখা—রূপবর্ণনা এবং প্রেমবর্ণনা। রূপ এবং প্রেমের মধ্যে কোন অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, তবে সকল দেশের ক্লাসিক্ সাহিত্যেই কবিদের প্রেমসৃষ্টির প্রধান দ্যোতক হইয়াছে রূপ। নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা-চ্ছলে সকল কবিই তার মানসী মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার চরিত্র নিখুঁত রূপও নিখুঁত। প্রত্যেক কবিই সৌন্দর্য্য বর্ণনাচ্ছলে তাঁর কবিত্বের ভাণ্ডার উজাড় করিয়াছেন। এক বিষয়ে সকল কবিদের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। নায়ক-নায়িকা সাধারণত এমন সুশ্রী হইবেন যে যে-কেউ তাঁহাদের চোখ তুলিয়া দেখিবেন, তিনিই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। নর নারী পরস্পরের সৌন্দর্য্যে দগ্ধ হইয়া মূর্চ্ছা যায়, এ বরং কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু আমাদের আশ্চর্য্য লাগে তখনই যখন দেখি নরের রূপদর্শনে নর মূর্চ্ছিত হন, নারীর সৌন্দর্য্যে নারী মূর্চ্ছিতা হন। কথাটা কতদূর সত্য, মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাই তাহা বলিতে পারেন।

এই দর্শন-মোহের বর্ণনাচ্ছলে জনৈক কবি বলিতেছেন—

দেলের আখেতে তার আছু ব'য়ে যায়,
ফুকারি কাঁদিতে নারে, করে হায় হায়!
ছুরতের ফাঁদে মোরে কৈল গ্রেপ্তার,
কেমনে বাঁচিব আর বিহনে তাহার।
(বড় নিজামপাগলার কেচ্ছা)

'প্রাণের মাঝে যে চক্ষু, তাহাতে আমার অশ্রু বহিয়া যাইতেছে। ফুকারিয়া কাঁদিতে পারি না, শুধু হায় হায় করিতেছি। রূপের ফাঁদে আমায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে ব্যতীত আমি কেমনে বাঁচিব ?'

এর পরেই মূর্চ্ছা।

এই জায়গাতেই কবিগণ থামেন নাই। সুন্দর নায়কগণের দর্শনে মদনবাণাহত ক্ষুব্ধ চঞ্চল নারীগণের খেদোক্তিও ভূরি ভূরি প্রয়োগ করিয়াছেন।

'আর জন কহে বুঝা পাই যদি এরে।
গাঁথিয়া গলাতে আমি রাখি হার ক'রে॥
কেউ বলে ওগো বুয়া মোর কথা শোন।
যৌবন সঁপিয়া ওরে জুড়াই জীবন॥
আর জন বলে যদি হেন রূপ পাই।
সদা লয়ে বুকে আমি রজনী পোহাই॥
কেহ বলে যদি আমি পাই এ নাগরে।
খোঁপাপরে রাখি স্বর্ণের ডেরা ক'রে॥
(গোলেনুর ও নুরহোসেন)

এখানে একথা বলা দরকার যে কবিগণ শুধু রূপ বলিতে বাহ্য সৌন্দর্যই বোঝেন নাই। কবির সুন্দর কল্পনা-মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া রূপের আর এক দ্যুতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—তাহা পবিত্র এবং প্রকৃত ভালোবাসা! রূপকে প্রশংসা করিয়াই মানুষ তৃপ্ত হয় না,—তাহাকে পূজা করিবার একটা বুভুক্ষা অন্তরে অন্তরে জাগিয়া উঠে। কবির ভাষায় তাহাই প্রেম। এই প্রেমে বিহ্বল আত্মহারা নায়ক বলেন,—

'আমি বলি যাই-যাই, মন কিন্তু মানে নাই,
যদি বা বুঝাই মনে, না বোঝে নয়ন,
যদি যাই ক'রে জোর, প্রাণ নাহি যাবে মোর,
খালি ধড় নিয়ে মোর কিবা প্রয়োজন।'
(গুল বকাওলী)

এ প্রেম যেন চুম্বকের মত নিরন্তর আকর্ষণ করে। সুনীতির দোহাই দিয়া মনকে যদি বা কতকটা সামাল করিতে পারি, চক্ষু কোন মানা মানে না,—কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে যেন বাহিরের রূপজাল ভেদ করিয়া প্রাণও নায়িকার প্রাণের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাই কবির আক্ষেপ—

'খালি ধড় নিয়ে মোর কিবা প্রয়োজন'।'

নয়ন-মন-প্রাণের এই দ্বন্দ্বই বিশ্বের চিরন্তন প্রেমলীলার উপাদান। দ্বন্দ্বে প্রাণ জয়ী হয়। সুন্দরী নারী যেন শ্যামলা পুষ্পশোভিতা একখানি উদ্যান। তার সৌন্দর্যে যে আকৃষ্ট হয়, সে শুধু বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকে না। কম্পিত সাহসে দৃঢ়পদে সে তার অন্তরে আসিয়া আসন গ্রহণ করে।

এ প্রেমকাব্যাবলিতেও রূপের সেই অর্থটিই ফুটানো হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমি তার সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১

হেন রূপ না পাইছে দেবতা কিন্নর।
মুখের লাবণ্য জিনি কোটি শশধর॥
আর যে বত্রিশ দাঁতে মিশি লাগাইছে।
লক্ষকোটি তারা যেন উজ্জল করিছে॥
জবা ফুল জিনি জিহ্বা, তাতে খায় পান।
না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান॥
মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন।
জিনিয়া চন্দ্রের ছটা তাহার কিরণ॥
চক্ষু মেলি সেই ধনী যার পানে চায়।
প্রাণহারা হইয়া সেই করে হায় হায়॥
ভ্রমরের বর্ণ জিনি লম্বা কেশ মাথে।
দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের তলাতে
জেলেখার কটিতুল্য কটি তার সরু।
তাদৃশ নিতম্ব আর পেট-পিঠ-উরু॥
সুগঠন হস্তপদ, কি কহিব মরি।
তাহার উপমা নাহি ত্রিভুবন জুড়ি॥
আকাশের দিকে যদি চম্পাবতী চায়
প্রাণহারা হইয়া সেই করে হায় হায়॥
(গাজি কালু ও চম্পাবতী)

আকাশও প্রাণহারা হইয়া হায়-হায় করে যাকে দেখিয়া, না জানি সে কত সুন্দরী!

২

কন্যার ছুরতের খুবি কি কব জানে।
ফজরেতে ভানু যেন উঠেছে আশমানে॥
বুকেতে নূতন কুচ, কি কব বাহার।
কুন্দে বানাইছে যেন ঢেপুয়া সোনার॥
আঁখির জোড়া ভুরু যেন দুই কামানি।
মুখের বচন যেমছা কোকিলার বাণী॥

আশ্রয়

শিল্পী—শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দোপাধ্যায়

শ্রীবিমল সেন

দিঘল মাথার কেশ যেন মেঘকালি ;
হাসিতে চমকে যেয়ছা মেঘের বিজলা ॥
মুখের ছুরত রঙ্ জিনি জবা ফুল ;
মুখ দেখে চেহে-চেহে করেন গুল্-গুল্ ॥

(ছয়ফলমুলুক)

৩

'কন্যার ছুরতের খুবি' এখনই শেষ হয় নাই। কবি তাহার বিশদ বর্ণনা করিতেছেন—

মুখ চেহারা আপ্তার মেক্ !
দন্ত আনারের দানা
যেয়ছা বেলোয়ারী আয়না।
হাসি মুখের বিজলী চটক্ ॥
ঠোট দুই জিনি জবাফুল ; ..
নাসিকার ছন্দ যেন বাঁশী ! .
তাহাতে বোলাক্ বোলে।
মতির ঝালর ঝোলে ! ..
ঝিনুকের মত দুই কান !
তাহাতে সোণার ঝুমকা,
জাল বাঁধি মতি লট্‌কান্ ॥
আঁখি দুই করে টল্ টল্ ;
ধলা কালা বিচে পুতি,
টল্ টল্ তারার জ্যোতি !
দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা।
কালো কাজলের রেখা ॥
কপালে স্বর্ণটীকার ফুল।
কাকই করিয়া মাথার চুল,
বাঁধিছে লোটন খোঁপা ;
স্বর্ণ-মতির চাপা,
কত রঙ্গ মাণিকের ফুল ॥
বিউনির আগায় বাঁধিছে রতন।
ছাতি দোন ডালিম্ব আকার।
যেন নয়া পদ্মকলি,
যেমন ঢালের টুলি ॥
চিকণমাজা, পাত্‌লি কোমর।
হাতে পায়ে বিশে আঙুল,
যেন কুন্দকারি তুল।
চন্দ্র হৈতে নাখুন্ সুন্দর ॥

(বদিউজ্জামাল)

৪

কিবা দুটি ভুরুছাঁদ, যেন পাতিয়াছে ফাঁদ।
রসিকের মনপাখী করিতে বন্ধন।
উর্দ্ধ নাসা দীর্ঘকেশী, চক্ষে কাজল দাঁতে মিশি,
কুচযুগ, দেখে ধৈর্য নাহি করে প্রাণ ॥

(গুলে বকাওলী)

এই রূপবর্ণনায় অনুপম সৌন্দর্য্য ও সংযম পরিস্ফুট। অল্প কথায় ইহার চেয়ে সুন্দরতর বর্ণনা খুব বেশী মেলে না।

৫

কন্যার জামাল লাল যেমন মাকাল ফল,
দাগ তার কোন অঙ্গে নাই ॥
বেলুন সমান হাত, দেখে লাগে বজ্রাঘাত,
নরুমাঞ্জা ভ্রমর সমান ;
কমল বরণ ধনী, দেখে রূপ ভোলে মুনি,
রূপ দেখি হয়ত অজ্ঞান ॥
মুখে দন্ত মুক্তা-মতি, মনচোরা সে যুবতী
দুটি ঠোট পুষ্পের সমান।
চাহান মদন বাণ, দেখিলে হারায় প্রাণ,
ভুরু দুটি যেমন কামান ॥
গোল বদন, চিকন সিতা, তোতা মুখে কহে কথা,
শুনে কাঁদে মালুখাঁর প্রাণ।
কালনাগ যেন কেশ, হুরপরী হইতে বেশ,
মুখশোভা চাঁদের সমান ॥
আঁখি দেখে হরিণ ভাগে, সরম অন্তরে জাগে,
চলন দেখে রাজহংস পালায়।
রূপ যেন কাঁচা সোনা, ভ্রমর করে আনাগোনা,
গেল বিঁধে মালুর হৃদয় ॥

(মালুখাঁ ও রসনেছা কন্যা)

৬

আকাশের চন্দ্র যেন ভেলোয়া সুন্দরী।
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী ॥
কাছে গেলে যায় রে দেখা সোনার প্রতিমা ;
আর ভালো লাগেরে ভেলোয়ার চক্ষের ভঙ্গিমা ॥
আঁখির উপর কন্যার অতি মনোহর।
পদ্ম ফুলের মাঝারে যেমন রসিক ভ্রমর ॥

ভাল পুষ্প পাইয়া রে ভ্রমর মধু করে পান।
সেকারণে সুন্দর লাগায় বাঁকা তুনয়ান॥
চন্দ্রসূর্য্য জিনিয়ারে ভেলোয়ার উজ্জ্বল বদন।
কুন্দের কলিকা জিনি হস্তপদের গঠন॥
সারি সারি দন্তগুলি মুকুতা বাহার।
হাসিতে বিজলী ছুট্ কেরে অতি চমৎকার॥
সিনার উপরে তুটি কনককোটরা।
মধু লোভে মত্ত হইয়া গুঞ্জরে ভ্রমরা॥
(ভেলোয়া সুন্দরী)

*　　　*　　　*
*　*　　*　*　　*　*

৭

ধপ্ ধপ্ জ্বলে যেন আঁধারের বিচে।
নূতন যৌবন তাহে বাহার দিয়াছে॥
কি কব মাথার কেশ, কাল নাগ হেন।
ঘুঙ্গুরি চুলেতে খোস্বু আতর যেমন॥
আসিয়া পড়িছে কেশ নীচেতে জানুর।
পেশানি উপরে যেন চমকিছে নূর॥
কি কহিব তুটি আঁখি বয়ান করিয়া।
যেন তু'চক্ষেতে পানি চলেছে বহিয়া॥
আহা কি চক্ষের পরে ভুরুতুটি জোড়া।
সেকারাতে কামানেতে দিইয়াছে চড়া॥
নাসিকার কথা আর কি কব সাবাসি।
রাধিকার মনলোভা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী॥
কি দিব তুলনা আমি সে তুটি ঠোঁটের।
যেন আলতা গোলা আছে উপরে মুখের॥
আর সে বত্রিশ দাঁত কি কহিব আর।
আনারের দানা হেন আয়না চমৎকার॥
কি কব গলার কথা নাহি যায় লেখা।
পান খেলে লালি তার সব যায় দেখা॥
আর তার তুটি হাত বেলুন সমান।
কুন্দকার কুন্দে কাটি রাখিল যেমন॥
আর কোমর তার এমন বারিক।
ধরিলে পাঞ্জায় তায় ধরা যায় ঠিক্॥

এই বর্ণনা পাঠ করিলে কবিগণের সুন্দরীর আদর্শের একটা আচ পাওয়া যায়। এই কবিগণের মতে সুন্দরী হইলেন তিনি—যাঁর রূপ দেবী পরী কিন্নরী বিদ্যাধরী সকলের রূপকে পরাজিত করিয়াছে—যেন প্রভাতাকাশে নবোদিত সূর্য্য অথবা অন্ধ নিশীথিনী বুকে দীপ্তোজ্জ্বল চন্দ্রমা।

—মুনিজনমনোহর তনুলতা পদ্মবর্ণ, মাকাল ফলের ন্যায় লাল, অথবা কাঁচা সোনার মত শোভন।

—যার কেশপাশ দীর্ঘ, আজানু বা আগুল্‌ফলম্বিত, ভ্রমর মেঘ অথবা কালনাগের মত কৃষ্ণবর্ণ। সুন্দর চিক্কণ সিঁথি—কেশের স্বাভাবিক গন্ধ আতরের ন্যায়।

—যার ভুরুদুটি কামান তুল্য অথবা রসিকের মনপাখী বন্ধন করিবার ফাঁদস্বরূপ।

—যার নয়ন মৃগোপম, বক্রকটাক্ষসঙ্কুল অক্ষিপত্রে কালো কাজলের রেখা। অক্ষিতারকা যেন পদ্মের পাপ্‌ড়িতে আসীন ভ্রমর। দৃষ্টি হইতে তরল জোৎস্না ক্ষরিয়া পড়িতেছে। চাহনিতে মদনবাণাহত হইয়া সকলে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়ে, এমন কি আকাশ পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠে। হাসি দেখিয়া বিজলী চমকের কথা মনে হয়।

—যার নাসিকা উর্দ্ধ-সুন্দর, রাধিকার মনোলোভা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর মত।

—যার কান ঝিনুকের মত।

—যার বদন কোটি শশধর লাবণ্যে মণ্ডিত, গোল, জবা ফুল তুল্য রক্তিম। পুষ্পভ্রমে ভ্রমর উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে।

—যার দাঁত আনারের দানা, মুক্তা, অথবা আয়নার মত শুভ্র স্বচ্ছ, অথবা মিশিরঞ্জিত।

—যার জবা ফুলের মত লাল জিহ্বা পানের ছোপে আরো সুন্দর হইয়াছে।

—যার বচন কোকিল কুহরণের ন্যায় সুললিত, তোতার বুলির ন্যায় আধ-আধ, আদরমাখানো।

—যার ঠোঁট জবা ফুলের অথবা আলতার মত লাল।

—যার গলা এত স্বচ্ছ ও পাতলা যে পান খাইলে তার লালিমা দেখা যায়।

—যার কুচদ্বয় দেখিলে মনে হয় যেন একজোড়া ডালিম, অথবা নয়া পদ্মকলি—তার চারিপাশে মনভ্রমর

শ্রীবিমল সেন

গুঞ্জরণ করিতেছে, অথবা কোন কুন্দকার যেন সোনায় কুন্দিয়া বানাইয়াছে।

—যার কটিদেশ ভ্রমরসমান চিক্কণ ও সরু, অথবা এত পাতলা যে মুঠোয় করিয়া ধরা যায়।

—যার উরু রামরম্ভা বৃক্ষসম।

—যার হস্ত-পদ বেলুনের মত গোল, কুন্দকলিকার মত পেলব। কবিগণ কোন কারণে তাঁদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ ম্লান হইতে দেন নাই।

প্রেমোদ্ভব

সকল দেশের সকল যুগে প্রেমোদ্ভবের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। মানুষের চিত্ত শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়া তুষ্ট নয়, মানুষের প্রেমও এম্‌নি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অসন্তুষ্ট। যাহা হাতের বাহিরে, শক্তির বাহিরে, দৃষ্টির বাহিরে তাহাকে আয়ত্ত করিবার একটা দুরন্ত লোভ ধরাবরই মানুষের আছে। এই ইস্‌লামি প্রেম কাব্যের নায়ক-নায়িকারাও এই দুর্লভকে আয়ত্ত করিবার সাধনা করিয়াছেন। কাহারও মুখে শুনিয়া হউক্ বা কোন পুস্তক পাঠ অথবা চিত্র দর্শন করিয়া হউক্, নায়ক যখন জানিলেন এক দেশে এক সুন্দরী কন্যা আছে, অমনি নায়ক সেই অদৃষ্টপুর্ব্বা ও অশ্রুতপুর্ব্বা কন্যার প্রেমে 'দেওয়ানা' অর্থাৎ উদাসীন হইলেন। ঘর-সংসার ছাড়িয়া সেই কন্যার উদ্দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন। এই যাত্রা সফল হইবে কি না, নায়ক তা ভাবিলেন না—নির্ঝরিণী যেমন পর্ব্বত-গাত্র বাহিয়া বাহিয়া নিজের কক্ষ, নিজের পথ খুঁজিয়া লয়, নায়কও তেম্‌নি এই ভরসায় যাত্রা করিলেন যে এই যাত্রার শেষে তাঁর ঈপ্সিতা প্রিয়ার সঙ্গে মিলন হইবে। প্রেম চিরকালই অন্ধ বটে, কিন্তু চিরকালই সে সাহসী। বাহিরের রূপকে সে দেখিবে না বলিয়া সে অন্ধ। বাহিরের বাধা মানিবে না বলিয়াই সে সাহসী। ইস্‌লামি কাব্যেও প্রেমের এই দ্বৈত রূপ।

বাদ্‌শার ছেলে ছয়ফলমুলুক পিতৃদত্ত একখানা কার্পেটে নিম্নবর্ণিত একখানি চিত্র দেখিলেন।

বদিউজ্জামালের ছবি দেখিয়া নমুনা।
জানহারা সাহজাদা হইল দেওয়ানা ॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ, রতি নাহি স্থির।
কলিজায় বিঁধিল তার পেলোদের তীর ॥
ক্ষণে ছবির গলে ধরে, ক্ষণে ধরে পায়।
ক্ষণে মুখে চুমে, ক্ষণে করে হায় হায় ॥
ডাইনে বায়ে চাহে ক্ষণে, কখন আশ্‌মানে।
আছাড়ে-পাছাড়ে কখন লোটায় জমিনে ॥
হাত মারে কপালেতে মুখে হায়, হায়।
লোটন পায়রার মত জমিনে লোটায় ॥
(ছয়ফলমুলুক)

ছয়ফলের চিত্ত এইরূপে একখানি চিত্রের সঙ্গে প্রেমে পড়িল। কে সে চিত্রিতা নারী, বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, হিন্দু কি মুসলমান, হুর্ কি পরী, বৃদ্ধা কি তরুণী, মৃতা কি জীবিতা—এ সব কোন সন্ধান লওয়ার অপেক্ষা না রাখিয়া ছয়ফল প্রেমে পড়িলেন। এই প্রেমাভিভূত অবস্থার উপরই কাব্যখানি জমিয়া উঠিয়াছে। বাদশাহের ছেলে, কত শত পরমাসুন্দরী নারী তার পায়ে-পায়ে ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহাদের দিকে তিনি চোখ তুলিয়াও চাহেন না। তাহাদের শত প্রলোভনে তাঁর হৃদয় টলে না। চাতক যেমন নিম্নের নীলনির্ম্মল জল উপেক্ষা করিয়া ফটিক জলের তৃষ্ণায় ঊর্দ্ধে ছুটিয়া যায়, ছয়ফলও তেম্‌নি সেই অজ্ঞাত অখ্যাত চিত্র-নায়িকার আশায় সুদূরের পথে যাত্রা করিলেন। তাঁর চিত্ত নায়িকার চরণে সমর্পিত। তাঁর হৃদয় অস্থির, চঞ্চল। রহিয়া রহিয়া শুধু মনে হয়,—

কি করিনু, কি করিনু, প্রাণ কেমন করে!
হেন চিত্রদরশন, হৈল মন উচাটন,
আর কি পাব সে রতন,
কে আনিয়া দিবে মোরে ॥
এ হেন নব কমল, দেখে মন টল্‌টল,।
ভুলিব কেমনে বল,
ধৈর্য্য নাহি মানেরে ॥
দেখে চিত্র ভ্রূভঙ্গ, ডগমগ করে অঙ্গ,
উথলিল প্রেম তরঙ্গ,
রসেরি ভরে ॥
(বড় নিজামপাগলার কেচ্ছা)

প্রেমের এই আবেগে নায়কের অবস্থা দাঁড়ায় অনেকটা রোগীর মত—নায়িকার সঙ্গে মিলন এই প্রেমরোগের একমাত্র মহৌষধ। অন্য কোন রকমেই এ রোগ প্রশমিত হয় না।

ওগো সখি, প্রেমরোগ, নিষেধে কি যায়।
ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে, যত বল তায়॥
রোগের ঔষধি পেলে, তবে রোগ যায় চলে।
অমিলনে অঙ্গ জ্বলে, করে হায় হায়॥
(গোলেনুর)

ইস্‌লামি কাব্যের প্রাণ এই প্রথম দর্শনে প্রেমসঞ্চার। সে দর্শন চিত্রে হউক, দূতীর মুখে হউক অথবা স্বপ্নে হউক, সে দর্শন জলন্ত আগুনের মতই নায়ককে দগ্ধ করিবে।

অভিসার

প্রেমের এই দাহ হইতেই অভিসারের জন্ম। নদী যেমন সিন্ধুমিলন বাসনায় দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অগ্রাহ্য করিয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে ছুটিয়া চলে, নায়কও তেমনি সংসারের শত সহস্র বাধা উপেক্ষা করিয়া নায়িকা-মিলনে ছুটিয়া চলেন। নায়িকার উদ্দেশে দেশে-বিদেশে পরিভ্রমণ করেন। নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল তাহাকে বাধা দিতে পারে না। আকাশেও হয়ত তাহার গতি অপ্রতিহত। দৈবশক্তি-সম্পন্ন কোন কার্পেট বা আসনে চড়িয়া সহস্র সহস্র মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নায়ক আসিয়া নায়িকার নগরে উপস্থিত হ'ন। কিন্তু নায়িকালাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় অন্দরমহলের দৃঢ় পাষাণপ্রাচীর—পুরুষের সে মহলে প্রবেশ নিষেধ। অথচ মন মানে না। যে নায়কের সাহস খুব বেশী নয়, তিনি হয়ত নায়িকা যে ঘাটে স্নান করিতে আসেন সেই ঘাটের কাছটিতে বসিয়া নায়িকা-শিকারের জন্য প্রেমের ফাঁদ পাতেন। এ কাজ খুব সহজসাধ্য নয়, এবং সহজসাধ্য নয় বলিয়াই এর বর্ণনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কোন নায়ক হয়ত নিজামপাগলার মত আপনাকে ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া নায়িকার গৃহে ভৃত্যভাবে প্রবেশ করিলেন, এবং নায়িকার মন হরণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

কিন্তু যে নায়ক সাহসী, তিনি হয়ত তিলে-তিলে একটু-একটু করিয়া নায়িকার চিত্তজয় করার অপেক্ষা না রাখিয়া মালিনীর পুত্রবধূ সাজিয়া রাজকন্যার মহলে ঢুকিয়া পড়িলেন, অথবা কোন পরী বা দৈবশক্তির সাহায্যে প্রহরীদের চোখ এড়াইয়া একেবারে রাজকন্যার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিগণের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, রাজকন্যার যেন 'পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ' যাহাকে বলে, সেই অবস্থা। একজন সুন্দর নায়ক যে তাহারই রূপাবিষ্ট হইয়া দূর দূরান্তর হইতে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া তাহাকে বরণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন এ কথা ভাবিয়া নায়িকা অন্তরে অন্তরে খুবই আনন্দিত হ'ন, এবং প্রথমদর্শনেই 'মন প্রাণ যা ছিল তা' নায়কের পদে সমর্পণ করিয়া বসেন। কিন্তু সংস্কারের বশেই হউক্ বা নায়কের প্রেমকে আরও উদ্দীপিত করার বাসনায়ই হউক্, প্রথমটা তিনি কোপ এবং বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উদ্দাম প্রেমপ্রবাহের মুখে সে বাধা তৃণের মত ভাসিয়া যায়।

চম্পা বলে—আরে চোর নাহি তোর ভয়।
রজনী প্রভাত হ'লে যাবি যামলয়॥
গাজি বলে প্রাণ মোর তোমার কাছেতে।
কাহার ক্ষমতা আছে, আমাকে মারিতে॥
তুমি যদি মার তবে মরণ আমার।
পিরীতে ডুবিয়া প্রাণ করে হাহাকার॥
(গাজি কালু ও চম্পাবতী)

নায়িকা নায়ককে নিজ প্রাসাদে গোপনে সমাগত দেখিয়া ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দু একটি চাটুবাক্যে নায়ক তাহাকে জল করিয়া দিলেন। নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলা আরম্ভ হইল—গোপন প্রেমের বিপদও ওৎ পাতিয়া রহিল, কখন তাদের গোপনতার জাল ছিন্ন করিয়া দিবে। কিন্তু প্রেমের দেবতা—ইস্‌লামি কবিদের আসক্ যিনি—তিনি অন্ধ। অভিসারের পথ যে বিপদ্-বাধা মৃত্যুভয়ের মধ্য দিয়া পাতা, এ কথা জানিয়াই তিনি অভিসারে বাহির হইয়াছেন।

শ্রীবিমল সেন

মরণের ভয় যদি রইত আসকেরে।
তবে কি ঝাঁপ দিতে পারে এস্কের সাগরে॥
যে জন আসক হয়,
মরণের ভয় তার কি রয়।
কেবল মাশুকের কথা জাগে তার অন্তরে॥
(গুলে বকাওলী)

অভিসার শুধু নায়কেরই একচেটিয়া নয়। নায়িকা যেখানে মিলনের উৎকণ্ঠায় একান্ত অধীরা, সেইখানেই তাহার অভিসারিকার বেশ। অভিসারিকার অন্তরে একটা আকাঙ্ক্ষা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাজে।

যদি বিধি মিলায় আমার সেই পুরুষরতন।
যতনে রাখিব সদাই, দিয়া প্রাণ মন॥
হৃদ্‌পালঙ্কে বসাইব, মধুপান করাইব।
প্রেমের দক্ষিণা দিব এ নব যৌবন॥
(গুলে বকাওলী)

এই বাণী গুঞ্জরণ করিয়া নায়িকা অভিসারে বাহির হইলেন। কবি পয়ারের পর পয়ার বাঁধিয়া প্রেমকাব্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অন্তরের আবেগ পুঞ্জীভূত হইয়া চরমে পৌঁছিয়াছে, সেখানেই তিনি গানের মূর্চ্ছনা তুলিয়াছেন। চিত্রকর যেমন চিত্রকে জীবন্তসদৃশ করার উদ্দেশে কোনখানে রঙ গাঢ়, কোনখানে রঙ পাতলা করিয়া দেন, কবির ভাষাও তেমনি কখনও গানে, কখনও পয়ারে বা অন্য কোন ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিয়া নায়ক-নায়িকার অন্তরের সংঘাতকে মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোলে। মনের কোণের একটু-খানি ব্যথাও কবির চোখ এড়ায় নাই। নায়িকাকেও কবি প্রেমাবেগে সাহসিকা করিয়া তুলিয়াছেন। অভিসারিকা নায়িকা বলিতেছেন—

কোথা গেলে মনচোরা আমারই মন চুরি করে।
তব অন্বেষণে ফিরি দেখে দেখে ঘরে ঘরে॥
যদি দেখা পাই তোমারে, ধরিয়া আপন জোরে।
রাখিব আটক করে, পালাতে কি দিব তোরে॥
রেখে তোরে ভুজপাশে, বাহুদ্বারা বাঁধিব কসে।
মনোমত সাজা দিব, যখনি ইচ্ছা হয়ত মোরে॥
মনবেড়ী দিয়ে পায়ে, যৌবন হাতকড়া দিয়ে।
প্রেমগারদে রাখব কয়েদ্ যাবজ্জীবনের তরে॥
[গুলে বকাওলী]

'দেখে দেখে ঘরে ঘরে' ফিরিয়া নায়িকা হয়ত নায়কের সাক্ষাৎ পাইলেন। শিকারে যে বাহির হয়, ফাঁদও সে পাতে। নায়িকা অভিসারে বাহির হইয়াছেন, কাজেই নায়ককে বন্দী করিবার জন্য প্রেমের জাল তাঁকেই বিস্তার করিতে হয়। কবিদের মত নায়িকারা চিরকালই এ কার্য্যে বিশেষদক্ষ।

নারীর আঠারো কলা বুঝে ওঠা ভার।
কে বুঝিতে পারে ছলা, সাধ্য আছে কার।
এমনি নারীর গুণ, পাকা বাঁশে লাগায় ঘুণ।
পুরুষে করে খুন, প্রাণেতে করে সংহার॥
নারী এমনি সর্ব্বনাশী, ভুলায় কত যোগী ঋষি।
কহে মহম্মদ্ মুন্সী, নারীর রাঙা পায়ে নমস্কার॥
[বড় নিজামপাগলার কেচ্ছা]

প্রেমকাব্য যখন বিশেষ রূপে জমাইয়া তুলিতে ইচ্ছা হয়, তখনই কবি নায়কের বদলে নায়িকাকে অভিসারে বাহির করেন—নায়িকাকে সাহসিকা করেন। নায়িকা প্রায়ক্ষেত্রেই এক বাণেই শিকার বিদ্ধ করেন। যেখানে নায়ক একান্তই বিমুখ, সেখানেই তিনি শরসন্ধান করিতে ছাড়েন না।

শুনরে রসের ভ্রমর, চাও মোর পানে।
রঙ্গরসে রসখেলা খেলি দুইজনে॥
নারীর যৌবন মোর রসে টলমল।
ভোমর হইয়া লোট রসের কমল॥
নূতন কমলকলি রয়েছে বিকশি।
খাওরে ফুলের মধু ফুলমধ্যে বসি॥
[ছয়ফল মুলুক]

তিলে তিলে নায়িকা নায়কের চিত্ত জয় করিয়া লয়েন। কবিগণের মতে এইখানেই নারীর নারীত্ব।

যৌবন ও প্রেম

প্রেমের শ্রেষ্ঠঋতু বসন্ত, শ্রেষ্ঠ কাল যৌবন। বসন্ত অবসান হইলে যেমন কোকিলের কণ্ঠ বাজেনা, যৌবন অতিক্রান্ত হইলে প্রেমও তেম্‌নি জমাট্ বাঁধে না। যৌবন যেন একটা পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্ম, প্রেম তার সুরভিসম্ভার। এক একদিন যায় আর সুরভিবাহী একএকটি পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়ে। তাই বাংলার সাধক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন,

> জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব,
> যৌবন মিলান ভার।

প্রেমকাব্যের ছত্রে ছত্রে যৌবনের এই প্রেমময়তা, প্রেমের এই যৌবনকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ ও পরিণতি। নায়িকার অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের প্লাবন আসিয়াছে, আর তার সঙ্গে আসিয়াছে দুরন্ত প্রেমাকাঙ্খা। কিন্তু কোথায় সেই পরমকাঙ্খিত নায়ক, যার স্পর্শে এই প্রেম পল্লবিত হইয়া উঠিবে? নায়িকা হয়ত আজিও অনূঢ়া। বিবাহিতা হইলেও হয়ত তার স্বামী তার প্রতি বিতৃষ্ণ। কাজেই নিরাশায় প্রেম যেন দ্বিগুণিত বেগে ঈপ্সিতকে আশ্রয় করিতে চায়।

'গোলেনূর' ইহার দৃষ্টান্তস্থল। গোলেনূর যখন বালিকা মাত্র তখন তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের পর হইতে তিনি স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা, স্বামী তাঁহার কোন সংবাদ নেন না। প্রথমটা গোলেনূর হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার দেহে একদিন যৌবনের জোয়ার আসিল, তৃপ্তির নিঃশ্বাসের পরিবর্ত্তে একদিন দারুণ অতৃপ্তির ঝড় বহিল। গোলেনূর যৌবনের চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করিতে না পারিয়া বলিলেন,

> এ নব যৌবন কালে, পতি মোর না আইলে,
> কিসে মন রাখি বুঝাইয়া।

চির বিরহিণী নায়িকার এই যৌবনজ্বালা অন্তরকে বিশেষ করিয়া স্পর্শ করে। তার মুখে হাসি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, সারা রাত্রি বাতি জ্বালাইয়া প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত থাকেন। কিন্তু যামিনী পোহায়, প্রিয়তম ত কই আসেন না।

> আমার অমিলনে অঙ্গ জ্বলে করি কি উপায়।
> সারা রাতি জ্বালাই বাতি নিশি যে পোহায়॥
> এ নব যৌবনজ্বালা কত সয় আর।
> সহেনা সহেনা দুখে মদনজ্বালার॥

নারীর নব যৌবন যেন জীবন সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়। নায়ক তার একমাত্র কর্ণধার। নারীর যৌবন যেন বিকশিত মধুকমল, একমাত্র নায়ক তার মধুপানে অধিকারী। কিন্তু

> পুরুষ নিদয়, না দেখি কোথায়,
> এমন সময়, ফিরে না চায়।
> যার তরে মরি, সে করে চাতুরি।
> কি করি, কি করি, না দেখি উপায়॥
> আমি এ অবলা, যৌবনের জ্বালা,
> কত সব জ্বালা, মদনের দায়।
> কাণ্ডারী বিহনে, এ নৌকা তুফানে,
> রাখিব কেমনে, অকূল দরিয়ায়॥
> এ নব যৌবন, গেল অকারণ,
> পতির বিহনে, রাখা নাহি যায়।

নায়িকা যদি স্বাধীনা হইতেন তবে হয়ত এ যৌবনজ্বালা প্রশমন করা সহজ হইত। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি কুলবতী কুলবধূ। ইচ্ছা না থাকিলেও লজ্জা-ভয়ে তাঁহাকে বেদনাময় গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া যৌবনের জ্বালা পোহাইতে হয়।

> আমি নারী কুলবালা, কত সব প্রেমজ্বালা,
> করতে পাইনা প্রেমের খেলা, বঁধু আমার বাম হৈল।
> থাকতে কাছে ভোমরা বঁধু, শুকায়ে গেল পদ্মের মধু,
> অলি বিনে যায়রে যাদু, কপালেতে এই কি ছিল॥

এ নবযৌবন কি করিয়া রাখা যায়, ইহাই হইল যুবতী নায়িকার প্রধান সমস্যা।

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

প্রিয় বিনা নারীর যৌবন অকারণ।
কাহারে সঁপিব আমি একাল যৌবন॥
খাওয়ানের দ্রব্য নহে, কাটিয়া খাইব।
বেচিবার চিজ্ নহে, বাজারে বেচিব॥
বাটবার চিজ্ নহে, দিব ঘরে ঘরে।
প্রিয় বিনা এ যৌবন সঁপিব কাহারে॥
যৌবন অমূল্য ধন নবীন বয়সে!
ফুরাইয়া গেলে আর না পাইব শেষে॥

ফুল শুকাইয়া গেলে যেমন পূজা করিয়া তৃপ্তি হয় না, যৌবন অতীত হইলে তেম্‌নি প্রেম-নিবেদনেও তৃপ্তি হয় না। তাই নায়িকার এ আক্ষেপ, এ করুণ মর্ম্মবেদনা। ধরণীর কক্ষে কক্ষে নরনারী প্রেমের লীলায় বিভোর। নারী তার বাঞ্ছিতের জন্য নিজকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া তাহার প্রতীক্ষা করে, ফুলের মালা গাঁথিয়া বসিয়া থাকে, কখন তিনি আসিবেন, কখন তাঁর গলায় মালা পরাইবে। এই চির-বিরহিনী নারী ফুলের মালা গাঁথিয়া উন্মনা হইয়া বসিয়া থাকে।

'গাঁথিয়া ফুলের মালা দিব কার গলে?'

দিন আসে দিন যায়। পলে পলে বর্ষচক্র নবীন ঋতু-লীলার ছন্দে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, কিন্তু বিরহিণীর বুকে বোঝার পর বোঝা চাপিতে থাকে। ঋতুলীলার বিচিত্র ছন্দ তাহার সহ্য হয় না। তাহার শুধু মনে হয়,

যার প্রিয় ঘরে আছে আনন্দিত মন।
আমি অভাগার চিত্তে তুষের আগুন॥
একেলা যৌবন রাখি নাহি মোর ফল।
তেজিব পরাণ আমি খাইয়া গরল॥
নতুবা পরিয়া মালা হব বৈরাগিণী।
দেশে দেশে বিচ্‌রাইব (=পুঁজিব) প্রিয় গুণমণি॥

এই গেল পতিবিচ্ছিন্না নারীর অবস্থা। পতিগৃহবাসিনী কিন্তু পতি কর্ত্তৃক অনাদৃত নারীর ভাগ্য আরও বেদনাময়। এ যেন পেয় জল সাম্‌নে থাকিতে তৃষ্ণার জ্বালা সহিতে হইতেছে।

থাক্‌তে পতি শুয়ে কাছে উপবাসে যাই।
এমন কপালে কেন পড়ে নাকো ছাই॥

এই খেদোক্তির মধ্যে শুধু যৌবনের জ্বালাই নয়, অসীম গ্লানি এবং আত্মধিক্কারও আছে। যুবতী হইয়া যদি পুরুষকে জয় করিতে না পারে তবে নারী নিজেদের জীবনকে ব্যর্থ মনে করে। নারী পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ ও লাজ্জিত হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা'য় নারী-চরিত্রের এই দিক্‌টা সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন। ইস্‌লাম কবিগণও এ দিক্‌টা ফুটাইতে চেষ্টার কসুর করেন নাই।

অনাদৃতা নারী কেমন?

যেমন

'মণিহারা ফণী, জল বিনে মীন,'
জীবন বিনে তনু ক্ষীণ॥'

কারণ স্বামীই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

যেমন

জাহাজের শোভা জালি বোট। কোমরের শোভা গোট্॥
দাঁতের শোভা মিশি। ছেলের শোভা হাসি॥
বুড়োর শোভা কাশি। রাজার শোভা মুন্সী॥
মুলুকের শোভা বাদ্‌শা। জমির শোভা চাষা।
হাতির শোভা সরা। আয়নার শোভা পারা॥
মোল্লার শোভা দাড়ি। হাতের শোভা ছড়ি॥
পাখোয়াজের শোভা খোল। বাদ্যের শোভা ঢোল॥
গলার শোভা হাঁসুলি। পায়ের শোভা পাঁসলি॥
হাতের শোভা চুড়ি। ছোড়ার শোভা ছুড়ি॥

(গোলেনুর)

এমন যে স্বামী, তাহার বিহনে নারীর জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে না তো কি! তার বর্ত্তমান হাহাকারে ভরিয়া যায়, তার ভবিষ্যৎ উদ্বেগ আশঙ্কায় কালো হইয়া উঠে। ব্যথিত বক্ষপঞ্জর হইতে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে, তাহাতে একটা অভি-যোগ ধ্বনিত হয়!

যে জানে পিরীতের মর্ম্ম, সে অধর্ম্ম করে না॥
রত্ন বলি যত্ন করে।... ....

মদনজ্বালায় আমি মরি, সে কেন করে চাতুরি,
বল না কি উপায় করি, সে ত ফিরে চাহেনা ।।
(গোলেনুর)

প্রণয়ীর এই অনাদর সময় সময় নারীর মনে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত করে। নারী ভাবেন, হায়রে! 'এত সাধের প্রেম ক'রে অদৃষ্টে আর সুখ হ'ল না',—'সাধেতে বিষাদ' উপস্থিত হইল। এই প্রতিক্রিয়া শুধু হাহাকারেই পর্য্যবসিত হয় না। পতি প্রবাসে থাকিলে নারীর সান্ত্বনা থাকে, কিন্তু পতি বিমুখ হইলে নারী অশান্ত হইয়া ওঠে। শৈলসমাহিত নদীস্রোত যেমন যেখানে পথ পায় সেইখানে ছুটিয়া চলে, নারীর যৌবনও তেম্নি যেখানে আদর পায় সেইখানে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কুলের বাঁধন খসিয়া পড়ে। সতীত্বের বাঁধন শ্লথ হয়।

ইস্‌লাম কবিরা অনাদৃতা নারীর ছবি আঁকিয়াই থামেন নাই। পুরুষজীবনের সার্থকতাও যে নারীকে পাওয়া, একথা বুঝাইতেও চেষ্টা পাইয়াছেন। নায়িকার রূপ গুণ বর্ণনা শুনিয়া নায়ক আক্ষেপ করিতেছেন,

...এমন বেকুফ্ নাহি দেখি তোর মত ।।
না দেখিলি তোতা মুখ নয়ন ভরিয়া,
না দেখিলি রঙ-রূপ সেখানেতে গিয়া ।।
না দেখিলি সে গহ্ন, মরি হায়, হায় !
পাইলি চক্ষের মাথা হইয়া নিদয় ।।
কানে বলে, ওরে কান, কালা তুই হলি ।
সে তোতার মুখে কথা গিয়া না শুনিলি ।।
নাকে বলি, ওরে নাক, আছ কি জন্যেতে ।
সে গুলের খোশ্বু তুই নারিলি শুঁকিতে ।।
মুখে বলে, আরে মুখ, কি কর এখন ।
সে চাঁদ-মুখেতে নাহি করিলি চুম্বন ।।
কোন কথা নাহি কৈলে মাশুকের সাথে ।
আপশোষ্ রৈল তেরা জেন্দেগী থাকিতে ।।
হাতে বলে, ওরে হাত, বল কি আক্কেলে ।
লাজুক্ বদনে হাত কেন না ফেরালে ।
(নিজাম পাগলা)

যৌবনজ্বালার পালা গাহিয়া সকল কবিই মিলনের পালা ধরিয়াছেন।

মিলন

নায়কনায়িকার চির-ঈপ্সিত মিলন-মাঙ্গলিক গাহিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,

দুজনায় তার পরে, নজরে নজরে গেরে,
গলিতে লাগিল প্রেমের ফাঁস ।।
চার চক্ষু মেলে যদি, উথলিল প্রেমনদী,
প্রেমবদন দিইল সাঁতার।
কেহ কিছু কার তরে, কহিতে নাহিক পারে,
রহে দোঁহে মূরত আকার ।।
(নিজাম পাগলার কেচ্ছা)

প্রথমে চোখে চোখে মিলিল। তারপর প্রেমের নদী উথলিয়া উঠিল। নায়ক নায়িকার চক্ষে সমস্ত বহির্জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র জাগিয়া আছে সেই উদ্বেলিত নদীতে একখানি প্রেমাপ্লুত মুখ। কথা নাই, সাড়া নাই, নিষ্পলক পাষাণমূর্ত্তির মত একে আর এককে দেখিতেছেন! আনন্দাতিশয্যের এই বিহ্বলতা ক্রমে কাটিয়া আসে। নায়ক নায়িকার তখন মনে জাগরিত হয়, যার জন্য তার বুকে এত তৃষ্ণা ছিল, এই সে।

বহুকালের পিয়াশা, সাম্‌নে মিঠাপানি।
নিষেধ না মানে চিত্ত ধরাবে কেমনি ।।
(ছয়ফলমলুক)

নায়ক নায়িকা পরস্পরকে তপ্ত আলিঙ্গনে বন্দী করিয়া লইলেন। তাহাদের মুখে ফুটিয়া উঠিল পুষ্পের মত লাবণ্য, চোখে আনন্দের আপ্লুত ধারা—

সাহাজাদি নিজামেরে যখনই দেখিল।
বাগে গোলেস্তার মত ফুটিয়া উঠিল ।।
কি বলিতে কিবা বলে, ঠিকানা না মেলে।
ঝরঝর কাঁদে ধ'রে নিজামের গলে ।।
(নিজাম পাগলা)

শ্রীবিমল সেন

এ মধুর মিলন দেখিয়া মনে হয় যেন, 'সোঁদা গাছে পত্র মেলে বসন্ত পানে।' 'কাঙাল' যেন পরশমাণিক পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

শুক্‌না গাছেতে যেন ধরিলেক ফল।
শুক্‌না তালাব যেন সরোবরজল ॥
সারাদিন রোজা থাকি যেন রোজাদার।
সামনে পাইলখানা রোজার ইপ্তার ॥
(গোলেনুর)

প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের বাসনা অফুরন্ত। যুগ যুগ মিলনেও এ বাসনার তৃপ্তি হয় না। তাই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন,

লাখো লাখো যুগ, হিয়া হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

ইস্‌লাম কবিরাও এই অন্তহীনমিলনের ভাবটিকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শোন ওহে প্রাণধন!
ইচ্ছা হয় তোমারে রাখি হৃদয়ে আপন ॥
এ বাসনা হয় মনে, রাখি তোমায় সর্ব্বক্ষণে,
হারের সহিত গলে করিয়া যতন।
(গুলে বকাওলী)

নায়িকার পূর্ণ যৌবন, অপরিসীম প্রেম উপেক্ষা করিয়া নায়ক দূরে চলিয়া যাইবে, এ চিন্তাও তাহার পক্ষে অসহ্য। নায়িকা এই আসন্ন বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন,

কেমনে তেজিয়ে প্রিয় মোরে ছেড়ে যাবে।
দিনে দিনে অলি বিনে কমলকলি শুকাইবে ॥
দেহের জীবন তুমি, কেমনে ছাড়িব আমি।
সময়ে কে ছাড়ে স্বামী? অসময়ে কিবা হবে ॥
ছিনু বড় আশা করি, প্রিয় হবে প্রেমকাণ্ডারী
বাহিবে প্রেমের তরী। কিরূপে প্রাণ বাঁচিবে ॥
(মালুয়া ও রসনেছা কন্যার পুথি)

নায়ক উত্তর দিলেন,

ওরে প্রাণ প্রেয়সি গো! চাঁদবদনি! চাঁদের কণা।
না দেখে তোমার তরে আর ত প্রাণ বাঁচে না ॥
তুমি প্রাণ থাক হেথা, আমি যাই পেয়ে ব্যথা।
দিবানিশি তেরা কথা, ও প্রেয়সি! ভুল্‌বনা ॥
যাই যাই দেশে যাই, তুমি বই প্রিয়া নাই।
পথে যাই, ফিরে চাই, মন বলে, পাও চলে না ॥ (ঐ)

পা না চলিলেও নায়ককে জোর করিয়া পা চালাইতে হয়। প্রেমকাব্যের প্রাণ যে সংঘর্ষ, তারই আঘাতে নায়ক নায়িকা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এ আঘাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ভেলোয়াসুন্দরীর পুঁথিতে এ চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে।

আমির ভেলোয়াকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন— এক মুহূর্ত্ত চক্ষের আড় করিতে চাহিতেন না। কিন্তু

শাশুড়ী ননন্দা জান রে যার ঘরে আছে।
কোন মতে সুখ নাইরে, সে বধূর কাছে ॥

ভেলোয়ার কপালেও এত সুখ টিঁকিল না। ভেলোয়া সুন্দরী, ভেলোয়া স্বামীসোহাগিনী, আদরিণী, তার ননন্দী বিরলা তার সুখ দেখিয়া ঈর্ষান্বিতা হইয়া উঠিল।

এই মত দেখিয়া বিরলার বাড়িল বিদ্বেষ।
আপনি ছিঁড়িয়া ফেলে রে আপনার কেশ ॥

শুধু কেশ ছিঁড়িয়াই বিরলা ক্ষান্ত হইল না। স্থির করিল, যেমন করিয়া হ'ক, ভেলোয়ার এ সুখের স্বপ্ন ভাঙিতে হইবে। আমির এবং ভেলোয়ার এ মিলনকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। বিরলা মাকে আপনদলে টানিয়া লইল। মায়ে-ঝিয়ে চক্রান্ত করিয়া আমিরকে ঘরছাড়া করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। বলিল, 'ঘরে বসিয়া থাকিলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরায়। ঘরে বসিয়া না থাইয়া আমির বাণিজ্যে যাউক।'

মা-বোনের পীড়াপীড়িতে আমির রোজই বলিত, কাল বাণিজ্যযাত্রা করিব, কিন্তু কাল আর ফুরাইত না। বিরলা

রোজই উঠিয়া দেখিত আমির-ভেলোয়ার মুখে সেই মিলনানন্দ, সেই হাসি, সেই প্রেম। অবশেষে বিরলা ভর্ৎসনার বোমার মত ভাইয়ের পরে ফাটিয়া পড়িল। আমির বুঝিলেন, না যাইয়া উপায় নাই। আমির ভেলোয়াকে বুঝাইল, 'পুরুষ মানুষ আমি, আয় না করিলে চলিবে কেন।' ভেলোয়া এ যুক্তি মানিল না। সামান্য অর্থের জন্য এ মিলন-নাটকে অসময়ে যবনিকাপাত হইবে। না না, এ যে সে কল্পনাও করিতে পারে না।

না যাইও, না যাইও সাধু,
বল্‌লাম তোমারে।
হাতের বাজু বেচিয়ারে সাধু
খাবামু তোমারে॥
না যাইও, না যাইও সাধু
কহি বার বার।
তোমারে খাবামু বেচি
সপ্তনড়ির হার॥
না যাইও, না যাইও সাধু
আমি করি মানা।
তোমারে বেচিয়ারে খাবামু
গলার সোনার দানা॥
না যাইও, না যাইও সাধু
মোর প্রাণ ধন।
তোমারে বেচিয়ারে খাবামু
হস্তের কঙ্কণ॥
না যাইও, না যাইও আমার
আসকের পাগল।
তোমারে খাবামুরে বেচি
কানের শিকল॥
না যাইও, না যাইও সাধু
মোর জীবনের ভর।
তোমারে খাবামুরে বেচি
সোনালি চাদর॥
না যাইও, না যাইও সাধু
তোমার পায়ে ধরি।
তোমারে খাবামুরে বেচি
পিঙ্গনের শাড়ী॥
না যাইও, না যাইও সাধু
আমি তোমায় বলি।
তোমারে খাবামুরে বেচি
গলার হাঁহুলি॥
না যাইও, না যাইও সাধু
আমারে ফেলিয়া।
ঘরে ঘরে মাগি খাইমু
তোমারে লইয়া॥

স্বামী যে নারীজীবনের কতখানি জুড়িয়া থাকেন, এ বিলাপ হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কিন্তু নায়িকার এ আকুল আর্তনাদ সংসারচক্রকে থামাইয়া রাখিতে পারিল না। বিচ্ছেদ তাহার বেদনাবিপুল কালিমা লইয়া ঘনাইয়া আসিল। আমির ভেলোয়ার নিকট হইতে বিদায় নিলেন, এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আদরিণী ভেলোয়াকে দিয়া যেন কোন শক্ত কাজ করানো না হয়। গোবর ফেলিলে কন্যার গায়ে দাগ লাগিবে, উঠান কুড়াইলে ধূলা লাগিবে, মরিচ বাটিলে হাত জ্বালা করিবে, পানি আনিলে কাঁকাল ব্যথা করিবে—অতএব ভেলোয়াকে যেন এর একটা কাজও না করিতে হয়। পরিবার পরিজনকে সাম্‌লাইয়া আমির বাণিজ্যযাত্রা করিলেন।

ভেলোয়ার বিরহের প্রথম সপ্তাহ কোন মতে কাটিয়া গেল। এক সপ্তাহ পরে এক পরীর অনুগ্রহে এক রাত্রির জন্য আমির সুদূর হইতে শূন্যমার্গে উড়িয়া ভেলোয়ার কাছে আসিলেন। সে রাত্রি দুইজনের অপরিসীম আনন্দে কাটিল। শেষরাত্রে আমির যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইলেন। ভেলোয়াসুন্দরী বিহ্বল অসংযতবেশে ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন।

প্রভাতে উঠিয়া ননন্দী বিরলা ভেলোয়ার বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া পাড়া-পড়শী ডাকিয়া আনিল। তারপর সকলের সাম্‌নে ভেলোয়াকে অভিযুক্ত করিল—

বাণিজোতে গেলেরে ভাই সাত দিন হইল!
সুন্দরী সতী ভেলোয়ারে কোন রসিকে পাইল॥
সারারাত্রি মজা করে রসিকবন্ধু পাই।
তেকারণে ভেলোয়ার ফোঁস ফোঁস নাই॥

শ্রীবিমল সেন

ভেলোয়া প্রাণপণে আত্মসমর্থন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কাহিনী অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল ভেলোয়া অসতী। তাহার তীব্র শাস্তিবিধান করিতে হইবে পাড়াপড়শীরা নানানরকম শাস্তির বিধান দিতে লাগিল। কুটিলা বিরলা এইবার ভেলোয়ার উপর তীব্র প্রতিহিংসা গ্রহণ করিল। সে বলিল, ওকে আমার ক্রীতদাসী করিয়া রাখি না কেন, তাহা হইলে ওর উচিত শাস্তি হইবে। সকলে অনুমোদন করিলে ভেলোয়াকে জোর করিয়া বিরলার বাঁদীত্বে নিযুক্ত করা হইল। বিরলার সেবা করিয়া, গোবর ফেলিয়া, উঠান কুড়াইয়া, মরিচ বাটিয়া, ভেলোয়ার দিন কাটিত।

অকান্দনে কান্দেরে ভেলোয়া মরিচ দেখিয়া।
সাড়ে তিন সের মরিচ বাটেরে ভেলোয়া চক্ষের জল দিয়া॥

বিচ্ছেদের এই করুণ চিত্র দেখাইয়া কবি আবার নায়ক নায়িকার মিলন ঘটাইলেন।

বিরহ

আলোক যে মানুষের কত বড় বন্ধু, অন্ধকারে বসিয়া তা উপলব্ধি করিতে পারি। প্রেমরাজ্যের আলোক—মিলন; অন্ধকার—বিরহ। মিলনে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয় না, হয় বিরহে। যুগ যুগ ধরিয়া কবিকুল প্রেমের গভীরতা দেখাইতে বিরহের অবতারণা করিয়াছেন। ইস্‌লামি প্রেম-কাব্যে শ্রেষ্ঠ আসন এই বিরহের। রাধাকৃষ্ণের যে চিরন্তন বিরহ-লীলা বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন হয়, কবি যেন তাহারই ভাবে ভাবিত হইয়া বিরহচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যখন পড়া যায়, নায়িকা বলিতেছেন—

বিরহ-বেদনা বিষম যন্ত্রণা সহিতে না পারি বালা।
দহে মোর চিত, সদা সন্তাপিত, মথুরানগরে কালা॥
জীব হৈল দায়, প্রাণ না বাঁচায়, ভাবিয়া বিষম জ্বালা।
(ভেলোয়া সুন্দরী)

তখন মনে হয় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির বীণা আজিও একেবারে নীরব হইয়া যায় নাই। বাঙালী পল্লীকবি আজও 'মথুরা নগরে কালা' গাহিয়া প্রেমের সে অভিনব কল্পলোক সৃজনে ব্যস্ত। এ কল্পলোকের ভিত্তি বিরহ। কবির বিরহিণী নায়িকা আজিও বলেন,

ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ, রাতকে করিনু দিন,
এই দুখ বলিব কাহারে।　　　(গোলেনুর)

এই রাতকে-দিন-করা বিরহসন্তাপে সন্তপ্তা নায়িকার মনে একটা অভিমানের মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠে। দিন-দুয়েকের কড়ারে সে দূরে গিয়াছে, কিন্তু আর ত সে আসিল না।

মেরা সাথে দুদিনের করিয়া কড়ার।
আসিবে বলিয়া গেছে, আসিল না আর॥
(নিজাম পাগলা)

দিনের পর দিন এই বিলাপ করুণ হইতে করুণতর হইতে থাকে।

আহা মোর প্রাণনাথ, কঠিন রে হিয়া।
অবলা দাসীরে গেলে সাগরে ফেলিয়া॥
বিরহ সাগর হেন—কূল নাহি যার।
পার কর প্রাণনাথ না জানি সাঁতার॥
একবার দেখা দিয়া শান্ত কর মন।
নহে ত তোমার শোকে ত্যজিব জীবন॥
'পর' যদি দিত বিধি ডানায় আমার।
উড়িয়া উদ্দেশ আমি করিতো তোমার॥
চক্ষু প্রাণ তুমি মোর গেছ রে লইয়া।
খালি তনু রহিয়াছে জীতে মরা হইয়া॥
তোমার পালঙ্ক আর অঙ্গুরী তোমার।
দেখিতেই জ্বলে যেন অগ্নির আকার॥
মরণের রোগ এই পালক অঙ্গুরী।
দেখিতে দেখিতে জানি কোন সময়ে মরি॥
(গাজিকালু ও চম্পাবতী)

আত্মধিক্কারে বিরহের ঘনীভূত অবস্থা। বিরহিণীর চিত্ত তাই বিলাপ করিতে করিতে বলে,

আমি অভাগিনী, কঠিন পরাণী
অখিল গর্জ্জে হানে।
হেন প্রাণনিধি, হ'রে নিল বিধি,
অভাগী বাঁচিনু কেনে ॥
নবীন বয়সে, প্রেমের আবেশে,
পীরিতি করিলু বাটা।
মোর কর্ম্মফলে, হৃদয়কমলে,
ফুটিল বিচ্ছেদ কাঁটা ॥
(ছয়ফল মুলুক)

মিলনে যে প্রেম থাকে তরল, চপল,—বিরহের উত্তাপে তাহা হয় গাঢ়, ঘনীভূত। নয়নের বহির্ভূত প্রিয়তম লক্ষরূপে বিরহিণীর অন্তরে ফিরিয়া আসেন। বৃক্ষের মর্ম্মরধ্বনিতে চমকিতা বিরহিণী ভাবেন, ঐ বুঝি প্রিয়তম আসিতেছেন। নদীর বুকে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিরহিণী মনে করেন, ঐ বুঝি প্রিয়তমের হাস্তরঞ্জিত মুখখানি নদীর বুকে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

চাঁদের দেখিয়া রূপ পানির মাঝার।
সাহাজাদি বুঝিলেন মনে আপনার ॥
প্রাণকান্ত বুঝি মোরে চুম্বিতে আইল।
দেখা না পাইয়া তাই পানিতে ডুবিল ॥
এমন সময় চাঁদে আবরে আসিয়া।
একেবারে চাঁদে তবে দিল যে ঢাকিয়া ॥
আর সেই ছাঙা বিবি দেখিতে না পায়।
দেখে ভাবে নাথ বুঝি পলাইয়া যায় ॥
'প্রাণনাথ মোর তরে খুঁজে না পাইয়া।
তাই বুঝি পানি-বিচে গেলেন ডুবিয়া ॥'
এতেক বলিয়া বিবি কোমর বাঁধিয়া।
কুঁদিয়া পানির পরে ঝাঁপ দিল গিয়া ॥
(বড় নিজামপাগলার কেচ্ছা)

নদীবক্ষে প্রতিবিম্ব চাঁদ দেখিয়া অনেক বিরহিণীরই হৃদয়চাঁদের কথা মনে পড়ে, কিন্তু এত বিহ্বল-ব্যাকুল কয়জনে হন যে নদীতে ঝাঁপ দিয়া থাকেন? বিরহিণী বিহ্বলা, দুঃখম্লানা। যত উৎসবের বাঁশী, তার দুঃখ উথলিয়া উঠে। সে যে কত নিঃস্বা, উৎসব যেন তারই পরিচয় দিতে আসে। এই নর নারীর শাশ্বতী প্রকৃতি। যাহা শোভন, যাহা মনোরম, তাহা একাকিনী উপভোগ করিয়া তৃপ্তি নাই। উপভোগের বা আনন্দের ক্ষণে বিরহিণী যার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন, যে আসিলে তাঁর আনন্দযজ্ঞে পূর্ণাহুতি হয় সে তাঁর প্রবাসী স্বামী। তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য নারীহৃদয়ে সে কী আকুলতা, সে কী আর্ত্তনাদ! বর্ষার সঘন ধারায় যখন দিঙ্মণ্ডল কালো হইয়া আসে, যখন বাহিরের সব কিছু লুপ্ত হইয়া অন্তরের অব্যক্ত জাগ্রত হইতে থাকে, তখন বিরহিণীর ব্যথা সেই বর্ষারই মত ঝরিয়া পড়ে। বসন্তের মলয় সমীরণ, কোকিলের মধু গুঞ্জরণ—সকল মধুরতাই তার বিরহব্যথাকে উদ্দীপিত করিয়া তোলে।

আর ডাকিস্ না ওরে কোকিল, সহেনা মদনের জ্বালা।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ ওঠে জ্বলে, মদনেতে মন উতালা ॥
একে তোর রূপ কালো, আর তুমি নহ ভালো।
সৌরভেতে প্রাণাকুল, মজাইলি কুলবালা ॥
এই নিবেদন তোমায় করি, মের না বিচ্ছেদের ছুরি।
অলিকুলে জন্ম তোমার, কলঙ্কের নিয়ে এ ডালা ॥
(গোলেনূর)

বাঁশীর তানে বিরহের যমুনা আরও উজান যায়। বাঁশীর তানে কী যেন একটা মাদকতা মাখানো আছে! তাই নন্দ-নন্দনের বাঁশীর তানে একদিন ব্রজনারীবৃন্দ উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। বিরহিণীর কর্ণে যখন বাঁশীর তান আসিয়া বাজে, তখন তিনিও আত্মহারা হইয়া ভাবেন ঐ বংশীতানের লহরে লহরে তাহারই কাঙ্ক্ষিত প্রিয়ের আহ্বান আসিতেছে।

একরোজ শুয়েছিনু ঘরেতে আমার।
পতির বিহনে ছিনু বড় বেকারার ॥
চেতন হইল মোর আওয়াজে বাঁশীর।
বিরহ-আগুনে ফের হইনু অস্থির ॥
টিকিতে না পারি দিল গেল বিগড়িয়া।

শ্রীবিমল সেন

দেখিনু বহুৎ রাত আস্‌মান চাহিয়া ॥
সেই অক্তে নেকালিনু মাকান হইতে।
বাঁশীর আওয়াজ ধরি যাই সে দিনেতে ॥
একেলা রাতকালে নেকালিয়া গেনু।
ভয়ডর কিছু আমি সে সময় না পেনু ॥
আজিম দরিয়া এক সামনে মিলিল
দরিয়ার পাশে বাঁশী বাজিতে লাগিল ॥

বিরহিণী নায়িকা কাষ্ঠভ্রমে মড়ার ভেলায় সে দরিয়া পার হইলেন। তারপরই গতিরোধ করিল এক দেয়াল। তিনি তাহাও অতিক্রম করিলেন দড়িভ্রমে সাপের লেজ ধরিয়া। এই সর্পতে রজ্জুভ্রম বিরহের প্রগাঢ় অবস্থা। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কাহিনীর ছায়া এইখানে আসিয়া পড়িয়াছে। বিরহিণীর এই আত্মহারা অবস্থা অতি স্বাভাবিক। যাহা মানুষের প্রাণের চেয়ে প্রিয়, তাহা সে হারাইয়াও হারাইতে চায় না। মনে ভাবে, যে গিয়াছে সে চিরদিনের মত যায় নাই। আবার সে আসিবে, আবার তার অনাবিল ভালবাসার সুধাধারায় আমার এ বিরহব্যথিত চিত্ত শীতল করিবে। যাহাকে হারাইয়াছি, তাহাকে চিরদিনের মত হারাইয়াছি, এ চিন্তা পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে অসহ্য।

ইস্‌লামি কবিদের বর্ণনায় নায়িকা মালঞ্চের মত। বসন্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ হইতে পুষ্পসমূহ ঝরিয়া পড়িয়াছে। পড়ুক্ না। আবার বসন্ত আসিবে, আবার ফুল ফুটিবে।

শোনহে মালঞ্চ তুমি খেদচিন্তা কর না।
আসিবে বসন্ত ফিরে, তাকি তুমি জাননা ॥
পর্ণপুষ্প বিকশিবে, বুলবুলা আসিয়া তবে,
মত্ত হইয়া প্রেমভাবে· পুরাইবে বাসনা ॥
(ভেলোয়া সুন্দরী)

অথবা বিরহিণী নায়িকা যেন রৌদ্রম্লান প্রদীপ।

না কাঁদ প্রদীপ বেশী, যদি গত হইল নিশি,
পুনঃ ফের আসিবে নিশি; সেই সমন্ধে ভেবনা ॥

বিরহিণীর সমস্ত অন্তরাত্মাও যেন তখন এই আশ্বাসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

তব আসার আশে, থাকি চেয়ে দিবারাতে,
কতদিন প্রাণনাথ আসিবে হেথায় ॥
কই কোথা এলে তুমি, তোমার লাগিয়ে আমি,
দিবানিশি ঘুরে মরি বিরহজ্বালায় ॥
(ছহীগুলে বকাওলী)

বিরহ-বারমাসী

এই বিরহজ্বালা বুকে লইয়া বিরহী-বিরহিণীর মাসের পর মাস কাটাইতে হয়। প্রত্যেক মাসেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাই প্রত্যেক মাসেই বিরহবেদনা বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। কবি তাহারই বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে বারমাসীর আমদানি করিয়াছেন। 'বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে অসংখ্য বারমাসীর বর্ণনা আছে। ইসলামি কবিরা তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন।

বৈশাখ

প্রবেশ বৈশাখ, সময় নিদাঘ,
রাগতাপ খরতর।
আদিত্যকিরণ, না যায় সহন,
শান্তি নাহি মনে মোর ॥
যাহার কারণ, রাখিলাম যৌবন
সেই কেন নাহি পায়।
যৌবনরমণী, জোয়ারের পানি,
ভাটি লক্ষ্যে চ'লে যায় ॥

বৈশাখে প্রবেশ করিয়াই বিরহিণী অনুভব করেন তাঁর যৌবনযমুনায় ভাটি লাগিয়াছে। বৈশাখের দাবদাহ বিরহজ্বালাকে প্রখরতর করিয়া তোলে। শুধু তাই নয়।

বৈশাখ মাসেতে ফোটে ফুল নানা রসি।
ভোমরায় মধু খায় ফুলমধ্যে বসি।
ভোমরার গুণগুণে দগধে পরাণ।
আমার ফুলের মধু কে করিবে পান ॥

ফোটা গন্ধভরা ফুল দেখিয়া মনে হয়, সে-ও তো একটি ফুলের মত সংসারবৃক্ষে ফুটিয়া আছে, কিন্তু যাহার জন্য ফুটিয়া আছে, কোথায় সে ভ্রমর ? তাহার মধু যে বিফলে বিরহ-মরুর বাতাসে বিলীন হইয়া গেল।

আর বিরহীর মনের অবস্থাও এইরূপ।

এহিত বৈশাখ মাস, নানা পুষ্পের বাহার।
যাহার প্রিয়া কাছে, গলে দেয় পুষ্পহার হে॥
মোর প্রিয় নাহি কাছে কারে দিব হার।
এ ফুলের বাহার আমার অগ্নি-অবতার হে॥

জ্যৈষ্ঠ

প্রবেশ জ্যৈষ্ঠল, হৃদয় কমল,
ভাঙিয়া আমার পড়ে।
মোর কর্ম্মফলে, কান্ত নাই কোলে,
এ দুঃখ কহিনু কারে॥

এ বিলাপের ছন্দে-ছন্দে বিরহিণীর বুকের রক্ত যেন টস্-টস্ করিয়া ঝরিতেছে। কাহারে এ দুঃখ সে কহিবে। আমের বনে আম পাকিয়াছে। সকল নারী নিজের হাতে অতি যত্নে আম কাটিয়া তাদের প্রিয়তমদের খাওয়াইয়া ধন্যা হইতেছে। কিন্তু সে কি অভাগিনী।

'পতি বিনে কারে আমি চিপড়িয়া দিব ?'

বিরহীও দূরে বসিয়া ভাবে, হায়, আজ সে যদি কাছে থাকিত, তবে এই আম পাকা সার্থক হইত। সে আমাকে খাওয়াইত, আমি তাকে খাওয়াইতাম।

এ হিত জ্যৈষ্ঠ মাস আম্র পাকে গাছে॥
হাসিমুখে খায় খাওয়ায়, যার প্রিয়া কাছে হে॥
মোর প্রিয়া নাহি কাছে, কে খাওয়াবে মোরে।
তাহাতে বঞ্চিত আমি পরাণ বিদরে হে॥

আষাঢ়

আষাঢ়-আকাশে ঝম্-ঝম্ করিয়া বর্ষার ধারা বয়। বিরহ আকাশেও তখন অশ্রু বর্ষার ঘন ধারা। বাহিরের বর্ষা দেখিয়া মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি যেন বিরহী বিরহিণীদের দুঃখে সমবেদনার অশ্রু ঢালিতেছে। বিরহিণী বিভোর অশ্রুসিক্তা হইয়া গলিত মেঘরাজ্যের দিকে চাহিয়া আছেন। হঠাৎ নীলোজ্জ্বল বিজলী-প্রভায় কৃষ্ণাভ ধরণী মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হইয়া উঠিল, তারপরই ভীষণ গর্জ্জন !

আইল আষাঢ়, বৃষ্টি অনিবার,
চমকে সঘনে দামিনী।
মেঘের গর্জ্জন, শুনি ভয় মন,
লাগে অতি একাকিনী॥

একাকিনী নারী বজ্রধ্বনিতে শিহরিয়া উঠিয়া একাকিনীই শয্যাতলে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়েন। আর এই ভাবিয়া আকুল হন যে, আজ যদি সে কাছে থাকিত, তাহা হইলে এই মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি-কম্পিতা বিহগীকে সে তার বক্ষের কুলায়ে আশ্রয় দিয়া বাঁচাইত—নারী সে, তাকে এমন একাকিনী শয্যাতলে ভয়ে কাঁপিতে হইত না।

আষাঢ় মাসেতে হয় ঘন বরিষণ।
ঘোর অন্ধকার হয় বিজলী গর্জ্জন॥
প্রাণ করে থর থর, বিজলী গড় গড়ে।
পতি যার কাছে আছে জড়াইয়া ধরে॥

ভয়ের মুহূর্ত্তে ভালোবাসার জনকে জড়াইয়া ধরায় যে কী শান্তি, তাহা যাহার ভালোবাসার জন কাছে নাই সেই জানে।

বিরহীও দূরে বসিয়া ভাবে, এ বর্ষাব্যাকুলা ধরণীর তারে তারে যে করুণ সুর ধ্বনিয়া যাইতেছে, এ যেন তাহারই অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তি। এক একবার বজ্রধ্বনি হয়, আর সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবে, এই এমন সময় একখানি তনুলতা ভয়ে-ভয়ে তাহারই বুকে আসিয়া আশ্রয় নিত। আজ সে বুক শূন্য, আজ প্রিয়া দূরে, আজ এ বুক জড়াইয়া ধরিবার জন কাছে নাই।

এহিত আষাঢ় মাস, মেঘের গর্জ্জনি।
প্রিয়া নাহি কাছে মোর মেঘনাদ শুনি হে॥
ভয়েতে হইয়া ব্যস্ত ধরে সাপটিয়া।
মোর প্রিয়া নাহি কাছে, কে ধরে আসিয়া হে॥

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

শ্রাবণ

শ্রাবণ মাসেতে পানি উথলে সাগরে।
খাল-নালা-চলাচল জোয়ারের তোড়ে॥
অভাগার যৌবন জোয়ার হইল কেমন।
পতি বিনে সে জোয়ার না হবে বারণ॥

ভাদ্র

ভাদ্রল প্রবেশ, বরিষার শেষ,
বন্ধু মোর না আসিল।

বন্ধু বিদেশে গিয়াছেন। আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষণের অত্যাচারে তিনি ফিরিতে পারেন নাই। আজ ভাদ্রের গাঙে তিনি তরী ভাসাইয়া আসিবেন!

কী সুন্দর! কী আনন্দচঞ্চল এই ভাদ্রের নদী! ভাদরে আদরিণী সাজিয়া নদী আজ সমুদ্রমিলনে চলিয়াছে—আজ জলরাণীর স্বয়ম্বর, আজ নদীর লহরে মিলনগীতি। সে মিলনগীতির মূর্চ্ছনা প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়েও মিলন-বাসনা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমিক প্রেমিকাকে লইয়া তরী ভাসাইয়াছেন। তরী ঢেউয়ের দোলায় নাচিতেছে, আর প্রেমিকা ভয়কম্পিত কলেবরে প্রিয়ের বুক সবলে জড়াইয়া ধরিতেছেন। আজ বিরহী একাকী।

এহিত ভাদ্র মাস জলের অতি বেগ।
'কোষ' আরোহণে বেড়ায় আসক্-মাশুক্ হে॥
মোর প্রিয়া নাহি বেড়াইব কাকে নিয়া।
প্রিয়া বিনা দিবানিশি জ্বলে মোর হিয়া॥

আর বিরহিণী? তাহার মনের অবস্থা আরও ব্যথাতুর। তাহার চোখে শুধু বাহিরের ভরা গাঙই ছল-ছল করে না, তাহার নিজের অন্তরের মধ্যেও যে একটা প্রেমের গাঙ উচ্ছলিত, তার দেহের অণুতে অণুতে আজ যে একটা যৌবনের গাঙ উচ্ছ্বসিত, তাই তাহার চোখে বেশী করিয়া জাগে। সে হাহাকার করিয়া বলে,

ভাদ্র মাসেতে হয় পানির স্বয়ম্বর।
আনন্দে চালায় রথী দাউদ সদাগর॥
আমার যৌবননদী কেবা দিবে পাড়ি।
পতি বিনে কে হইবে যৌবনের ব্যাপারি॥

আশ্বিন

আগমনী সুরে নাচিতে নাচিতে শিউলি-ফুলের মুক্তা ছড়াইয়া শরৎ আসিয়াছে। প্রবাসী আজ দূর দেশান্তর হইতে ঘরে ফিরিয়াছে। অভাগিনী বিরহিণীর পতি শুধু আজও ফিরে নাই।

আশ্বিনের শেষ, না আইলা দেশ,
মোর অতি দুখভার।

এই দুঃখভারজর্জ্জরিতা বিরহিণীর চোখে শরতের সকল শোভা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিরহিণী দেখে শুধু আকাশজোড়া দুঃখ। ঐ যে শরতের উদ্যানে ফুল ধরিয়াছে, উহাতে অলি বসিতেছে না। উহা অনাদরে ঝরিয়া পড়িতেছে। হায়, আশ্বিন কি ভাগ্যহীন! যাহার জন্য সে ফুলের পসরা সাজাইয়া আছে, সে অলি ত কই আসিল না।

হৈব আমি অভাগিনী আশ্বিন মতন।
ফুল না বসিল অলি থাকিতে যৌবন॥

কার্ত্তিক

কার্ত্তিকে ধানের ক্ষেত শস্যভারে অবনত। তাই ঘরে ঘরে আনন্দ। বিরহিণী শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন, আমার ক্ষেত আজও শূন্য,—ফসল কাটার সময় আসিল—আমি কি কাটিব?

রাত্রে টুপ্ টুপ্ করিয়া শিশির পড়ে। বিরহিণী ভাবেন, আকাশ যেন তাঁহারই মত বিরহব্যথায় গলিয়া পড়িতেছে।

'নিশির শিশির, অঙ্গ নহে স্থির
কোথা যাব বিরহিণী॥'

অগ্রহায়ণ

কুটীরের সাম্‌নে উদ্যানে তিলের চাষ করা হইয়াছিল। আজ সেই তিলে ফুল ধরিয়াছে। তাহাদের ঘিরিয়া মধুপদল আজ গুঞ্জনরত। আজ আবার আনন্দের বাঁশী বাজিয়াছে। কিন্তু

'আমি অভাগীর অঙ্গ অনলে দাহন।'

বিরহিণী সে। তার তো প্রিয় বিনা কোন সুখই মনে জাগে না।

পৌষ

পৌষ হইল বৈরী, আমি একেশ্বরী,
হেমন্তের বাণ অতি।
উত্তর সমীর, শুকায় শরীর,
অভাগীর কিবা গতি॥
হেমন্তের বাণ, মন্দ খান্ খান্,
অঙ্গ কাঁপে থর থর।
আহা প্রাণপতি, নিষ্ঠুর প্রকৃতি।
না লইলা বার্ত্তা মোর॥

গৃহে বসিয়া বিরহিণী বিলাপ করেন। প্রবাসে বিলাপ করেন বিরহী।

এহিত পৌষ মাস নানা খাদ্যের বাহার।
সকলে খাবে সুখে, কে খাওয়াবে মোরে হে॥

প্রিয়ার হাতের পেলব স্পর্শ না থাকিলে কোন খাবারই যে সুমিষ্ট হয় না, বিরহী প্রবাসে বসিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে তা উপলব্ধি করেন।

মাঘ

বিরহিণী—মাঘের জাড়ে বাঘের অঙ্গ কাঁপে থর থর।
পতির বুকে যেই নারী শোয় একান্তর॥
শীত জার নাহি কিছু সেই নারীর অঙ্গে।
অভাগিনী মরি জারে, পতি নাহি সঙ্গে॥

প্রবেশ মন্দিরে, যুবতী সকল,
হিম ভয় মনে গুণি।
স্বামী সঙ্গে মিলি, করে কোলাকুলি
অভাগিনী একাকিনী॥
হিমেতে দহিয়া, মম অঙ্গ হিয়া,
হইল আমার কালা।
হেন শীতকালে, কান্ত নাহি কোলে,
কত সহে প্রাণে জ্বালা।
বিরহী—এহিত মাঘ মাস, শীতের অতি বেগ।
লেপ গাত্রে নারী পুরুষ থাকে এক সাথ॥
মোর প্রাণ-প্রিয়া নাই, কে রহিবে কাছে।
বিরহ-অনলে প্রাণ দাহন হইছে॥

ফাল্গুন

কোকিল বসন্তের আগমনী গাহিয়া বিরহীর দুয়ারে আসিয়া ঘা দিয়াছে। বিরহী ভাবিতেছেন—

এহিত ফাল্গুন মাস, বসন্তের বাহার।
কোকিল করিছে গান, কুহু কুহু স্বর॥
বিরহবিচ্ছেদে পোড়া অন্তর যাহার।
কোকিলের স্বরে প্রাণ বাঁচা তার ভার॥

বিরহিণীর কাছেও ফাল্গুন আগুনের অবতার।

ফাল্গুনে বসন্তবায়ে কুহরে কোকিলে।
নারীর শরীর দহে বিচ্ছেদ-অনলে॥
যার পতি ঘরে আছে নিভায় অনল।
অভাগীর পতি নাই কে ঢালিবে জল॥

কোকিলের কুহরণে প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠে। প্রিয়তমের আদর সে আগুন নিভাইবার একমাত্র জল। কিন্তু তিনি তো কাছে কাছে নাই। এ অগ্নিকুণ্ডে সে জল ঢালিবে কে?

এই আগুনে এমন করিয়া দগ্ধ হইতে হইবে, এ জানিলে কে এ প্রেম করিত। এ যে সাধ করিয়া কাটারি গিলিয়াছি; গিলিতেও পারি না, ফেলিতেও পারি না।

শ্রীবিমল সেন

মদনের বাণ, অঙ্গ খান্ খান্
নিজ কান্তে মনে স্মরি।
সহিতে না পারি, খাইমু কাটারি,
যৌবন হইল বৈরী॥

চৈত্র

এম্‌নি ব্যথায় ব্যথায় বর্ষ শেষ হইয়া চৈত্র আসিল। গ্রীষ্ম তাহার অনললীলা লইয়া আকাশের কোণে দেখা দিল। হুহু করিয়া উতলা বাতাস বয়, আর তপ্ত ধূলিজাল বাতায়ন পথ বাহিয়া উদাসিনী বিরহিণীর গায়ে তপ্ত লৌহশলাকার মত বিদ্ধ হয়। বিরহিণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভাবেন,

চৈত্র মাসেতে বড় ধূলের তাড়ন।
ফট্ ফট্ করে অঙ্গ জ্বালায় দাহন॥
যার পতি ঘরে আছে, শীতল সে নারী।
পতি বিনে অভাগিনী জ্বলে পুড়ে মরি॥

শুধু কি ধূলির তাড়ন? বসন্ত-চারা কোকিল আজিও কুহরণক্লান্ত হয় নাই।

বাতায়নপার্শ্বে উদ্যান—উদ্যানে ফুলে ফুলে উন্মুখ ভ্রমরের গুঞ্জন। যেন নবযৌবনা পরীর দল পাখা ছড়াইয়া ভ্রমর বঁধুকে হৃদি-সঞ্চিত মধুপানে আহ্বান করিতেছে, আর মধুকরবৃন্দ সে আহ্বানের প্রতিধ্বনি তুলিতেছে!

চৈত্রেতে তপন, অস্থির পবন,
সদা হানে প্রেমবাণ।
শুনি পিকনাদ, ঘটায় প্রমাদ,
বিকল সদাই প্রাণ॥
আহা প্রাণেশ্বর, দহে কলেবর,
হইল অলি প্রাণ বৈরী।
সদাই গুঞ্জরে, বসি পুষ্পপরে,
মধু খায় মোরে হেরি॥

বিরহের বার মাস এইরূপ এক অবিচ্ছিন্ন দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাস। প্রাণ দিয়া অনুভব না করিলে এ বারমাসীর সার্থকতা বোঝা যায় না।

পীরিতি

প্রেমতত্ত্বের আলোচনা বা উদাহরণ প্রসঙ্গে ইস্‌লামি প্রেমকাব্যসমূহে প্রেমের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। প্রেম বা পীরিতি কবির চক্ষে শুধু যুবক-যুবতীর আসক্তি বা বহির্মিলন নয়। ইহা হইল পবিত্র আন্তরিক একাত্মতা। এই পীরিতির উপর ভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ। ভগবদ্-অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ এই পীরিতির মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারে না। প্রেম আমাদের দেহের অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, যদি না ভগবানের কৃপায় আমাদের দিব্য নেত্র উন্মীলিত হয়।

'কেরামন কাত বিনে, তনু জ্ঞান চক্ষু কানে,
নাহি জানে থাকিয়া অঙ্গেতে।'

আমার দেহ, চক্ষু, কান, আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান কেহ তাহার সন্ধান দিতে পারে না। ভগবানের কৃপা চাই। কারণ, এই প্রেম স্বয়ং ভগবানের সৃষ্টি। এমন এক দিন ছিল, যখন ভগবান ছিলেন একা, আদি, অব্যক্ত। তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল না, গ্রহ উপগ্রহ ছিল না, বিচিত্র জীবজগৎ ছিল না। সে একাকীত্ব বুঝি ভগবানের ভালো লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি প্রেমের লীলা করেন। তাই বিশ্বভুবন সৃষ্ট হইল, জীবজগৎ সৃষ্ট হইল। আর বিশ্বের অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া রহিল প্রেম। এ প্রেম আস্বাদ করিবার জন্য ভগবান মহম্মদরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

পূর্ব্বে প্রভু নিরাকারা, প্রেমবন সৃষ্টি করি,
সেই প্রেমে মজিয়া নিজেতে।
আপনার তেজ দিয়া, আজ্ঞা কৈল, গেলা হইয়া
সাকার মহম্মদ নামেতে॥

তাই প্রেমময় ভগবান্ তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর কাছে ভয় চাহেন না, ভক্তিও চাহেন না। চাহেন হৃদয়ভরা বিরাট ব্যাকুল প্রেম। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, নিরাকার যিনি,

কেমন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিব? কবিগণ এর উত্তর দিয়াছেন। মানুষকে ভালবাসিলেই ভগবানকে ভালবাসা হয়।

সাকারে কি নিরাকারে, যাহাতেই প্রেম করে,
লভ্য তাহে প্রেমেতে মজিলে।

ইস্‌লামি শাস্ত্রের কথা জানি না, কিন্তু ইস্‌লামি এই প্রেমকাব্যের কথা বলিতে পারি, কবিগণ মানুষকে পরমেশ্বরের সাকার বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমি গাজি-কালুর তর্ক হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, এ ধারণা তাঁদের মনে কতদূর ভিৎ গাড়িয়া বসিয়াছে।

কালু বলে, নাহি আছে খোদার আকার।
গাজি বলে যত মূর্ত্তি সকলই তাঁহার।।

তাই মানুষকে ভালবাসিলে সে ভালবাসা ভগবানের চরণেই পৌঁছে। প্রেমিক-প্রেমিকার শুদ্ধ প্রেম উভয়ের হৃদয়কে শুদ্ধ নির্ম্মল উজ্জ্বল করিতে থাকে। তারপর এক শুভ মুহূর্ত্তে দুই প্রাণ এক হইয়া যায়। দুই দেহ, এক প্রাণ। প্রেমময় ভগবান সেই একাত্ম প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ে আসন পাতেন।

প্রেমিক গাজী ও প্রেমিকা চম্পাবতী শুদ্ধ প্রেমে এমনই একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। কালু গাজী দুই ভাই ধ্যানে বসিয়াছেন। কালু ভগবানের ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু গাজির ধ্যানস্তিমিত নেত্রের সম্মুখে চম্পাবতীর মূর্ত্তি ভাসমান।

কালু বলে, এই ধ্যানে খোদাকে হারাবে।
গাজি বলে, এই ধ্যানে খোদা লভ্য হবে।।
'চম্পাকে পাইবে কবে' কালু সাহা বলে।
গাজি বলে দুই মন এক হইয়া গেলে।।

দুই মন যখন এক হইয়া যায়, তখন লালসা বা কামের কথার উদয় হয় না। অন্তরে তখন অনন্ত রূপের সমুদ্র ঢেউ খেলিয়া যায়। তাহার তলে পরমমাণিক। প্রেমিক সে-প্রেমসাগরে ডুব্ দিয়া সে-মাণিকের সন্ধান করেন।

কালু বলে কি করিবে পাইলে তাহারে।
গাজি বলে মিশে যাব সে রূপসাগরে।

রূপ! রূপ! রূপ! সর্ব্বত্র প্রিয়তমার রূপের সমুদ্র-লীলা। যেদিকে চাই, সেইদিকে সে।

কালু বলে, চম্পাবতী কোথায় এখন।
গাজি বলে, চাহি দেখ মেলিয়া নয়ন।।
কালু বলে, এইভাবে কতদিন রবে।
গাজি বলে ছাড়াছাড়ি আর নাহি হবে।।

অল্পপরিসরের মধ্যে যাহারা প্রিয়তমার সঙ্গে মিলন চায়, তাহাদের বিরহের ভয় আছে, কিন্তু মিলনের ক্ষেত্র যাহাদের বিরাট্ তাহাদের বিরহ কোথায়? এই জড়দেহ দিয়া পাওয়াকেই তাহারা চরম পাওয়া মনে করে না। তাহারা মিলন উপভোগ করে অন্তর দিয়া। প্রিয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে বিশ্ব তাহাদের প্রিয়াময় হইয়া যায়। গাজি সেই মিলনের সাধক।

গাজির যোগ্যা সহধর্ম্মিনী চম্পাবতী এই মিলনানন্দে বিভোর। গাজি কাছে নাই, তাই বলিয়া চম্পাবতী তাঁহাকে হারান নাই।

বিরলে বসিয়া ধ্যান করে চম্পাবতী।
ভাবিতে ভাবিতে চম্পা হইল এমন।
যেদিকে যখন চায় মেলিয়া নয়ন।।
দেখেন গাজির রূপ করে ঝিকিমিকি।
নয়ন ভরিয়া রূপ দেখে চন্দ্রমুখী।।
আকাশ পাতাল আর চতুর্দ্দিকেতে।
গাজি বিনে আর কিছু না দেখে চক্ষেতে।।
ভাবিতে ভাবিতে সেই রূপ মনোহর।
পার হইয়া গেল চম্পা রূপের সাগর॥
আপনার কায়া-ছায়া সব পাশরিয়া।
একেবারে চম্পাবতী গেল গাজি হইয়া।।
গাজী হইয়া চম্পাবতী ভাবে আপনায়।
কেবা ছিল চম্পাবতী খুঁজিয়া না পায়।।

চম্পা সাধনার শেষ অবস্থায় চির-মিলনের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার পরেই খোদা তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।

ইস্‌লামি প্রেম কাব্য

শ্রীবিমল সেন

কী সুন্দর প্রেমের এই পরিকল্পনা। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এক নূতন রাজ্যের অর্গল ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে। সেখানে ভালবাসার মঞ্চে দাঁড়াইয়া ভগবানের নাগাল পাওয়া যায়। সেখানে কবির বীণা ঝঙ্কার তুলিয়া বলে,

ভাবিতে ভাবিতে সেই রূপ মনোহর।
পার হইয়া গেল চম্পা রূপের সাগর।।

প্রেমিকের উপমা

প্রেম বিরাট। মানুষের ভাষা তাহার বিরাটরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না। কিন্তু দুরন্ত অবুঝ্ শিশু যেমন চাঁদ ধরিবার আশায় হাত বাড়াইয়া থাকে, কবিকুলও তেম্নি এই অসাধ্যসাধনে তাহাদের সমস্ত উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রেমিকার কাছে প্রেমিক কি? না—

প্রাণনাথ, প্রেমরসের চাঁদ, মুখের হাসি, অমূল্য রতন, ধড়ের জীবন, জেন্দেগীর বাস, রঙ্গের উল্লাস, ভুখের ভক্ষণ, গ্রীষ্মের পবন, নিশিকালের রঙ্গ, কানের কর্ণফুলী, চক্ষের পুতুলী, মধুর ভাণ্ডার, অগ্নির শীতল, আনন্দমঙ্গল, জোটের খেলোয়ার, রঙ্গের পোষাক, ফানুসের চেরাগ, ছামনের আয়না, রঙ্গের ছামান, নিশিরাত্রের সাথী, আঁধারের বাতি, নয়নের জ্যোতি, হার গজমতি, ফুলের ভোমর, যৌবনের চোর, কমলের অলি, রূপের মুরলী, জমনের জসিক, রসের রসিক, ধূপকালের ছায়া, নয়াবাগের মেওয়া, কস্তুরী কাফুর, সিঁথির সিঁদুর, নয়নের কাজল ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রেমিক ও প্রেমিকাকে অনুরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

রসিক

ইস্‌লামি কবিদের ভাষায়, যার প্রেম একনিষ্ঠ, তিনি রসিক। রসিক যাহাকে একবার ভালবাসেন তাহাকে চিরদিনই ভালবাসেন। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তার প্রেম অব্যাহত।

প্রেম এমনি বিষয়।
জ্বলে, পোড়ে, তবু নাহি
ভোলেতো প্রিয়ায়॥
(গুলে বকাওলি)

রসিকের কাছে প্রেম পরশমণিসদৃশ। রূপনদীতে সুখের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহারই তীরে বসিয়া রসিক প্রেমের সাধনা করিতেছেন।

পীরিতির রীতি ভাই, শুনতে চাও যদি।
পীরিতি পরশ তুলা, রূপন্ মেলে যদি॥
নয়নে নয়ন মিশায়ে থাকে নিরবধি।
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে বয়ে যায় নদী।।
(গোলেনূর)

অরসিক ভ্রমরের মত মধু-পিয়াসী। যতদিন যৌবন-মধু থাকে, ততদিন তার আনাগোনা। শুষ্কদল ফুলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সে নতুন ফুল খুঁজিয়া লয়। নারী হয়ত তাহাকে পীরিতি-মাখা প্রাণখানি উপহার দেয়,—সে পীরিতির মর্ম্ম না জানিয়া তাহাকে অবহেলা করিয়া তাহার যৌবনকেই আকাঙ্ক্ষা করে। তাই যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে অরসিকের প্রেমও অন্তর্হিত হয়।

অরসিকের কাছে রস যদ্দিন থাকে;
যেমন, পাকা আমে ফাঁকি দিয়ে খেয়ে যায় দাঁড়কাকে।।
দেখ, পদ্মের নাগর ভোম্‌রা বেটা, কোমর ভেঙে গেছে।
তবু, স্বভাবদোষে মরতে যায় অন্য ফুলের কাছে॥
অরসিকের প্রেম তেম্নি ঠিক্ থাকে না আর।
বিরহানল জ্বেলে দিয়ে নেভায়নাক আর॥
পোড়াকপাল পুড়িয়ে মারে, আর বল্‌ব কি;
এমন পোড়া পীরিতের মুখে আগুন দি।।
এমন, কঠোর সঙ্গে করলে পীরিত মজে নাকো মন।
পথিকে কি যত্ন জানে রত্ন সে কেমন।।

মানভঞ্জন

প্রণয়ে অবিশ্বাস হইতে মানের জন্ম। মেঘ যেমন মাঝে-মাঝে সূর্য্যকে ঢাকে, মানও তেম্নি মিলনকে বিচ্ছেদের

কালিমায় অন্তর্হিত করে। রাধা কৃষ্ণের মানলীলাই গীতি-কাব্যে মানের আদর্শ। ইস্‌লামি কবিরাও ইহার অনুকরণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মৌলিকত্ব কিছুই নাই।

নায়ক খণ্ডিতা নায়িকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্তুতি করিতেছেন,—

কেন মান ক'রে বসেছ ও বিধুমুখী !
হেসে হেসে ফিরে ব'সে কথা কওনা দেখি।
(গোলেনূর)

নায়িকা মুখ বাঁকাইয়া সমানে জবাব দিলেন,—

যে দাগা দিয়েছ প্রাণে, ভুলিতে কি পারি আর !
যাও যাও শাহজাদা, তোমার পীরিতে নমস্কার ॥
আগে নাহি বুঝে মনে, মজিলাম নিঠুরের সনে।
কল গেল, কলঙ্ক হ'ল, (এখন) প্রাণে বাঁচা ভার ॥
জ্বালায় জ্বলেছি যত, তোর গুণের গুণ কব কত !
এই হ'তে হ'লেম খেও, পীরিত না করব আর ॥
(গুলে বকাওলী)

নায়ক তখন খোসামুদির সুর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিলেন।

ফিরে ব'সে কথা কও, তুলে আজি শির ॥
মান লাজ ছেড়ে দাও, মোর পানে চাও।
বিধুমুখে মধু কথা আমারে শুনাও ॥ (গোলেনূর

নায়িকা নিরুত্তর। নায়ক অগত্যা বলিলেন,

শোন প্রাণেশ্বরী, রূপসী সুন্দরী,
চন্দ্রমুখী মম প্রাণ।
আমি তো তোমার, তুমি তো আমার,
নাহি করি অন্য জ্ঞান ॥
বটে সাহা হই, তব ছাড়া নই,
দাস তব চরণেতে।
গোও-পেও মোর, সকলি যে তোর,
প্রাণ মম তব হাতে ॥
এ দাস তোমার হুকুম-বরদার,
যাহা বল তাহা করি।

আগুন-বিচেতে, কিম্বা যে কুয়াতে,
কহ, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ॥
(গুলে বকাওলী)

নায়িকা তবু নিরুত্তর। 'চরণের দাস' 'হুকুমবরদার' নায়ক তখন বলিলেন, পায়ে ধরি, ভিক্ষা করি, কথা কও।

নায়িকা এত সহজে কথা কহিবেন না। নায়ককে দিয়া সত্য সত্যই পা ধরিয়া মান ভাঙ্গাইতে হইবে,—নায়ককে নিজের পায়ের তলায় লোটাইয়া তাহার গোমর ভাঙ্গাইতে হইবে। তাই নায়িকা মুখ ফিরাইয়া শ্লেষ করিয়া কহিলেন,

সখা, পায় ধরিতে কেন চাও হে
তুমি যারে ভালোবাসে, তার কাছে যাও হে ॥
(নিজাম পাগলা)

নায়ক তখন—

একথা শুনিয়া নিরাশ হইয়া
কাঁদে সাহা জারে জারে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অস্থির হইয়া,
গিরিল পায়ের পরে ॥
খেরে যবে পায়, বিবি দেখে তায়,
কাঁদিয়া উঠাল ধ'রে।
গায়ে লাগাইয়া, কাছে বসাইয়া,

ইত্যাদি রূপে পুনর্মিলন হইল।

শেষ কথা

শৃঙ্গারবর্ণনা ইস্‌লামি প্রেমকাব্যে অত্যন্ত অশ্লীল এবং অপাঠ্য। কবিরা সকল কথাই খোলাখুলিভাবে লিখিয়াছেন। শুধু একজন কবি সংযত লেখনী চালাইয়াছেন বলিয়া শৃঙ্গার লীলা সম্বন্ধে প্রাথমিক দু-এক কথা বলিয়া বলিয়াছেন,

যে জন রসিক হবে, বুঝ ইসারায়।
খোলসা করিয়া লেখা উচিৎ না হয় ॥
(নিজাম পাগলা)

ইস্‌লামি কাব্যে একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন খুব কম। নায়ক প্রায় ক্ষেত্রেই বহু নারীতে আসক্ত। এক কবি এই বহু-প্রেমকে কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা তুলিয়া দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

তরুণ কিশোর

জসীমউদ্দীন

তরুণ কিশোর, তোমার জীবনে সবে এ ভোরের বেলা,
ভোরের বাতাস ভোরের কুসুমে জুড়েছে রঙের খেলা।
রাতের কুহেলি-তলে,
তোমার জীবন ঊষার আকাশে শিশু রবিসম জ্বলে।
এখনো পাখীরা উঠেনি জাগিয়া, শিশির রয়েছে ঘুমে,
কলঙ্কী চাঁদ পশ্চিমে হেলি' কৌমুদীলতা চুমে।
বধূর কোলেতে বধূরা ঘুমায় খোলেনি বাহুর বাঁধ,
দিঘীর জলেতে নাহিয়া নাহিয়া মেটেনি তারার সাধ।
এখনো আসেনি অলি,
মধুর লোভেতে কোমল কুসুম দুপায়েতে দলি' দলি'।
এখনো গোপন আঁধারের তলে আলোকের শতদল
মেঘে মেঘ লেগে বরণে বরণে করিতেছে টলমল।
এখনো বসিয়া সেঁউতীর মালা গাঁথিছে ভোরের তারা,
ভোরের রঙীন শাড়ীখানি তার বুনান হয়নি সারা।

হায়রে তরুণ হায়,
এখনি যে সবে জাগিয়া উঠিবে প্রভাতের কিনারায়।
এখন হইবে লোক জানাজানি, মুখ চেনাচেনি আর,
হিসাব নিকাশ হইবে এখন কতটুকু আছে কার।
বিহগ ছাড়িয়া ভোরের ভজন, আহারের সন্ধানে
বাতাসে বাঁধিয়া পাখা-সেতু-বাঁধ ছুটিবে সুদূর-পানে।
শূন্য হাওয়ার শূন্য ভরিতে বুকখানি করি শূন্যে
ফুলের দেউল হবে না উজাড় আজিকে প্রভাতে পুন।
তরুণ কিশোর ছেলে,
আমরা আজিকে ভাবিয়া না পাই তুমি হেথা কেন এলে?
তুমি ভাই সেই ব্রজের রাখাল, পাতার মুকুট পরি'
তোমাদের রাজা আজো নাকি খেলে গেঁয়ো মাঠখানি ভরি'।
আজো নাকি সেই বাঁশীর রাজাটি তমাললতার ফাঁদে
চরণ জড়ায়ে নূপুর হারায়ে পথের ধূলায় কাঁদে।

কেন এলে তবে ভাই,
সোনার গোকুল আঁধার করিয়া এই মথুরার ঠাঁই।
হেথা যৌবন মেলিয়া ধরিয়া জমা-খরচের খাতা
লাভ লোকসান নিতেছে বুঝিয়া খুলিয়া পাতায় পাতা।
ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল,
পাপ মথুরার কাল বিষ ল'য়ে চলিছে সে অবিরল।
ওপারে কিশোর এপারে যুবক, রাজার দেউল বাড়ী—
পাষাণের দেশে কেন এলে ভাই রাখালের দেশ ছাড়ি?
তুমি যে কিশোর তোমার দেশেতে হিসাব নিকাশ নাই,
যে আসে নিকটে তাহারেই লও আপন বলিয়া তাই।
আজিও নিজেরে বিকাইতে পার ফুলের মালার দামে,
রূপকথা শুনি তোমাদের দেশে রূপকথা দেয়া নামে।
আজো কানে গোঁজ শিরীষ কুসুম, কিংশুক-মঞ্জরী,
অলকে বাঁধিয়া পাটল ফুলেতে ভ'রে লও উত্তরী।
আজিও চেননি সোনার আদর, চেননি মুক্তাহার,
হাসি মুখে তাই সোনা ঝ'রে পড়ে তোমাদের যার তার।
সখালী পাতাও সখাদের সাথে বিনা মূলে দাও প্রাণ,
এপারে মোদের মথুরার মত নাই দান প্রতিদান।
হেথা যৌবন যত কিছু এর খাতায় লিখিয়া লয়,
পাণ হ'তে এর চূণ খসে নাক—এমনি হিসাবময়।
হাসিটি হেথায় বাজারে বিকায়, গানের বেসাত করি'
হেথাকার লোক সুরের পরাণ ধনে মানে লয় ভরি।

হায়রে কিশোর হায়!
ফুলের পরাণ বিকাতে এসেছ এই পাপ-মথুরায়।
কালিন্দী-লতা গলায় জড়ায়ে সোণার গোকুল কাঁদে,
ব্রজের দুলাল বাঁধা নাহি পড়ে যেন মথুরার ফাঁদে।
মাধবীলতার দোলনা বাঁধিয়া কদম্ব-শাখে-শাখে
কিশোর, তোমার কিশোর সখারা তোমারে যে ওই ডাকে

ডাকে কেয়াবনে ফুলমঞ্জরী ঘন-দেয়া-সম্পাতে
মাটির বুকেতে তমাল তাহার ফুল-বাহুখানি পাতে।

ঘরে ফিরে যাও সোণার কিশোর, এ পাপ-মথুরাপুরী
তোমার সোনার অঙ্গেতে দেবে বিষবাণ ছুঁড়ি ছুঁড়ি।
তোমার গোকুল আজো শেখে নাই ভালবাসা বলে কারে,
ভালবেসে তাই বুকে বেঁধে লয় আদরিয়া যারে তারে।
সেথায় তোমার কিশোরী বধূটি মাটির প্রদীপ ধরি'
তুলসীর মূলে প্রণাম যে আঁকে হয়ত তোমারে স্মরি'।
হয়ত তাহাও জানেনা সে মেয়ে, জানেনা কুসুমহার,
এত যে আদরে গাঁথিছে সে তাহা গলায় দোলাবে কার?
তুমিও হয়ত জান না কিশোর, সেই কিশোরীর লাগি'
মনে মনে কত দেউল গেঁথেছ কত না রজনী জাগি'।
হয়ত তাহারি অলকে বাঁধিতে মাঠের কুসুম ফুল
কত দূর পথ ঘুরিয়া মরিছ কত পথ করি' ভুল।
কারে ভালবাস কারে যে বাস না তোমরা শেখনি তাহা
আমোদের মত কামনার ফাঁদে চেননি উহু ও আহা!
মোদের মথুরা টলমল করে পাপ-লালসার ভারে,
ভোগের সমিধ জ্বালিয়া আমরা পুড়িতেছি ভারে ভারে।
তোমাদের প্রেম 'নিকষিত হেম কামনা নাহিক তায়',
কিশোরভজন শিখিয়াছে কবি তাই ও ব্রজের গাঁয়।
তোমাদের সেই ব্রজের ধূলায় প্রেমের বেসাত হয়,
সেথা কেউ তার মূল্য জানে না এই বড় বিস্ময়।
সেই ব্রজধূলি আজো ত মুছেনি তোমার সোনার গায়,
কেন তবে ভাই, চরণ বাড়ালে যৌবন-মথুরায়।

হায়রে প্রলাপী কবি!
কেউ কভু পারে মুছিয়া লইতে ললাটের লেখা সবি।
মথুরার রাজা টানিছে যে ভাই কালের রজ্জু ধ'রে
তরুণ কিশোর, কেউ পারিবে না ধরিয়া রাখিতে তোরে।
ওপারে গোকুল এপারে মথুরা মাঝে যমুনার জল,
নীল নয়নেতে তোর ব্যথা বুঝি বয়ে যায় অবিরল!
তবু যে তোমারে যেতে হবে ভাই, সে পাষাণ মথুরায়,
ফুলের বসতি ভাঙিয়া এখন যাইবি কলের গাঁয়।

এমনি করিয়া ভাঙা বরষায় ফুলের ভূষণ খুলি'
কদম্ব-বঁধু শিহরিয়া উঠে শরৎ হাওয়ায় দুলি।'
এমনি করিয়া ভোরের শিশির শুকায় ভোরের ঘাসে,
মাধবী হারায় বুকের সুরভি নিদাঘের নিশ্বাসে।

তোরে যেতে হবে চ'লে
এই গোকুলের ফুলের বাঁধন দুপায়েতে দলে' দ'লে।
তবু ফিরে চাও সোনার কিশোর, বিদায়-পথের ধার
কি ভূষণ তুমি ফেলে গেলে ব্রজে দেখে লই একবার।
ওই সোনা মুখে আজো লেগে আছে জননার শত চুমো
দুটি কালো আঁখি আজো হ'তে পারে ঘুম গানে ঘুমঘুমো।
ওই রাঙা ঠোঁটে গড়াইয়া গেছে কত না ভোরের ফুল,
বরণ তাদের আর পেলবতা লিখে গেছে নির্ভুল।
কচি শিশু ল'য়ে ধরার মায়েরা যে আদর করিয়াছে,
সোনা ভাইদের সোনা মুখে বোন যত চুমা রাখিয়াছে,
সে সব আজিকে তোর ওই দেহে করিতেছে টলমল;
নিখিল নারীর স্নেহের সলিলে তুই শিশু শতদল।

রে কিশোর, এই মথুরার পথে সহসা দেখিয়া তোরে
মনে হয় যেন ও মণি কাহারে দেখেছিনু এক ভোরে,
সে আমার এই কৈশোরহিয়া জীবনের এক তীরে
কোথা হ'তে যেন সোনার পাখীটি উড়ে এসেছিল ধীরে
পাখায় তাহার বেঁধে এনেছিল দূর গগনের লেখা
আর এনেছিল রঙীন উষার একটু সিঁদুর-রেখা।
সে পাখী কখন উড়িয়া গিয়াছে মোর বালুচর ছাড়ি,
আজিও তাহারে ডাকিয়া ডাকিয়া শূন্যে দুহাত নাড়ি।

সোনার কিশোর ভাই,
তোর মুখ হেরি মনে হয় যেন কোথায় ভাসিয়া যাই।
এত কাছে তুই তবু মনে হয় আমাদের গেঁয়ো নদী
তার ওই পারে সাদা বালুচর শুকায় মিঠেল 'রোদি'।
সেইখানে তুই দুটি রাঙা পায়ে আঁকিয়া পায়ের রেখা
চলেছিস একা বালুকার বুকে পড়িয়া ঢেউএর লেখা।

জসীমউদ্‌দীন

সে চরে এখনো মাঠের কৃষাণ বাঁধে নাই ছোট ঘর,
কৃষাণের বউ জাঙলা বাঁধেনি তাহার বুকের পর।
লাঙল সেথায় মাটিরে ফুঁড়িয়া গাহেনি ধানের গান,
জলের উপর ভাসিতেছে যেন মাটির এ মেটো থান।
বর্ষার নদী এঁকেছিল বুকে ঢেউ দিয়ে আলপনা,
বর্ষা গিয়াছে ওই বালুচর আজো তাহা মুছিল না।
সেইখান দিয়ে চলেছ উধাও, চখা-চখি উড়ে আগে,
কোমল পাখার বাতাস তোমার কমল মুখেতে লাগে।
এপারে মোদের ভরের 'গেরাম', আমরা দোকানদার,
বাটখারা ল'য়ে মাপিতে শিখেছি কতটা ওজন কার।
তবু রে কিশোর, ওইপারে যবে ফিরাই নয়নখানি
এই কালো চোখে আজো এঁকে যায় অমরার হাতছানি।

ওপারেতে চর এপারেতে ভর মাঝে বহে গেঁয়ো নদী
কিশোর কুমার, দেখিতাম তোরে ফিরিয়া দাঁড়াতি যদি।
তোর সোনা মুখে উড়িতেছে আজো নতুন চরের বালি,
রাঙা দুটি পাও চলিয়া চলিয়া রাঙা ছবি আঁকে খালি।
তুই আমাদের নদীটির মত দুপারে দুইটি তট
দুই মেয়ে যেন দুইধারে টানে বুড়ায়ে কাঁখের ঘট।
ওপারে ডাকিছে নয়া বালুচর কিশোর কালের সাথী,
এপারেতে ভর, ভরা যৌবন কামনা-ব্যথায় ব্যথী।
তুই হেথা ভাই ঘুমাইয়া থাক্ গেঁয়ো নদীটির মত,
এপার ওপার দুটি পাও ধ'রে কাঁদুক বাসনা যত।

ভ্রমণ-স্মৃতি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমরা তিনটি বন্ধু রেলগাড়ির একটি কামরা দখল করিয়া বসিয়া আছি। সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গপল্লীর মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। স্পেশাল গাড়ী কোন ষ্টেশনে অপ্রয়োজনে থামিবে না; কাজেই খুব দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কোন খান দিয়া রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম না, রেস্টুরেন্ট-কারে আহারের ডাক পড়িল। সেখানে আমরা সকলেই সমবয়স্ক; কোন জাতি-ভেদ নাই, কাজেই আনন্দসহকারে আহার চলিল। মানুষ আপনার মধ্যে কল্পিত উচ্চ নীচ প্রভেদের গণ্ডী টানিয়া দিয়াছে দিয়া আপনি বঞ্চিত হইয়াছে।

আহারশেষে আমরা নিজেদের কামরায় ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বন্ধু দুইজন ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু আমার ঘুম হইল না। আমি জানালা খুলিয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিলাম। তখন গভীর রাত্রি। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বড় কিছু দেখা যায় না। আকাশে তারা দুই একটি মাত্র মিটিমিটি জ্বলিতেছে। তিমিরাবগুণ্ঠিত রজনীতে অভিসারিকার শাড়ীতে খচিত হীরকমালা মৃদু দীপ্তি বিকাশ করিতেছে। দূরে কয়েকটা পাহাড় দেখা যায়। তরঙ্গায়িত উপত্যকারাজির মাঝে মাঝে কুটীরগুলি দেখিলে মনে হয় যেন সেগুলি শত্রু সৈন্যের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত শিবিরশ্রেণী। অন্ধকারে তরুরাজি নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পর মাথাগুলি স্পর্শ করিয়া কোন গোপন বাণী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ভাষায় বঞ্চিত বলিয়া মূক বেদনা প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। সে গুলি কি গাছ জানি না, তবু 'তমাল-তালীবনরাজিনীলা'র কথা মনে পড়ে। বাতাসের আসা যাওয়ার মধ্যে কত কিছুর আভাস পাওয়া যায়। তিমির-রাত্রির এই শব্দবিহীন স্রোতে হৃদয়ে কি মন্ত্র পড়িয়া দেয়। নৃত্যদোলায় রাত্রি কাটিয়া যায়। কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা তিনজন পাশাপাশি চুপ করিয়া বাহিরে তাকাইয়া আছি। চারিদিকে জীবনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। রাখাল গরুগুলিকে লইয়া বাহির হইয়াছে। আমার মনও ওই জাগরণোন্মুখ জীবনরাগিণীতে যোগ দিবার জন্য উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে পথের উপর পলাশ বকুল আত্মদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। নীল আকাশ-পটে তরুণ অরুণের দীপ্তি প্রকাশ হইয়াছে। গ্রাম-ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ আমাকে কোন অজানার অভিসারে ভুলাইয়াছে। ও পথ জানি না কোথায় শেষ হইয়াছে, ভাবিয়া কূল পাই না। দূরের দুষ্প্রাপ্যের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা, এই ব্যাকুলতা এ যে মানবমনের পক্ষে চিরন্তন। দূরের নেশা, গ্রাম-ছাড়া পথের নেশা মৃগচঞ্চলা আশারই মত মানবকে এই জীবনমরুতে ঘুরাইয়া বেড়ায়। তাহার শেষ কোথায় কেহ জানে না—জানে না বলিয়াই তাহা এত আকর্ষণ করে।

পথে মোগলসরাই ষ্টেশনে আমাদের চা-পান পর্ব্ব শেষ হইল। তারপর আমরা কাশী কাণ্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন বড় তাড়াহুড়ার পালা লাগিয়া গেল। আমরা ব্যাগের মধ্যে স্নানের কাপড় লইয়া মোটরবাসে উঠিয়া বসিলাম। আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য ছিল সারনাথ। সারনাথ সেখান হইতে সাত মাইল দূরে। সেখানে বৌদ্ধ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই ধ্বংসাবশেষগুলিকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পাথরের উপর সুন্দর কারুকার্য্যময় নানা প্রকার মূর্ত্তি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। চারিদিকে কত ধ্বংসস্তূপ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

রহিয়াছে। অতীতের এক গৌরবময় যুগের এই মূক মূর্ত্তি গুলি যদি কোনরকমে ভাষা পাইত তাহা হইলে কত কথাই শুনিতে পাইত'ম। এইখানে মাত্র একদিন থাকিবার কথা, কাজেই আমাদের বাস দ্রুতবেগে সেণ্ট্রাল কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি ঘুরিয়া হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে আসিল। বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার বস্তু বটে। এমন বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে চারিদিকে বিকীর্ণ কারুকার্য্যময় মনোহরঅট্টালিকা গুলি দেখিলে কোন রাজার আবাস বলিয়া মনে হয়। ইহার পাশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দাঁড় করাইলে পাখীর খাঁচা বলিয়াই মনে হইবে।

অতঃপর আমরা রাণী ভবানীর দুর্গাবাড়ীতে আসিলাম। মন্দিরটি বড় সুন্দর ; তাহা ছাড়া বিদেশে বাঙ্গালীর মন্দির বলিয়া আমার চক্ষুতে আরও সুন্দর। এই মন্দির কাশীর মত দেবতাও মন্দিরবহুল স্থানেও অতি প্রসিদ্ধ।

পরদিন প্রত্যূষে আমরা লক্ষ্ণৌয়ে পৌঁছিলাম। দূর হইতেই সহর দেখিয়া মনে হইল "হ্যাঁ, এ অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী বটে। পঞ্চাশখানি টোঙ্গায় যখন আমরা রাজপথ দিয়া যাইতেছিলাম তখন দুই ধারের বাড়ী হইতে সাহেব মেমগণ উৎসুকনয়নে এই শোভাযাত্রা দেখিতেছিলেন। কয়েকজন বাঙ্গালী আসিয়া আমাদের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া লইলেন। কাউন্সিল হাউস, উইঙ্গস্‌ফিল্ড পার্ক, রেসিডেন্সি প্রভৃতি ঘুরিয়া বেড়াইলাম। যেদিকে তাকাই খালি প্রাসাদশ্রেণী। আজ অযোধ্যার সে নবাব নাই ; লক্ষ্ণৌয়ের সে ঐশ্বর্য্যও নাই। এক সময় লক্ষ্ণৌ ভোগবিলাসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ছত্রমঞ্জিল, মতিমহল, সিকান্দির বাগ, কৈশরবাগ রহিয়াছে। এখনও হাসেনাবাদ প্রাসাদে সিংহাসন রহিয়াছে ; দ্বিতলে নবাব ইচ্ছামত বেগমদের কাছে যাইতেন, কিন্তু গোলকধাঁধার সিঁড়ি দিয়া তাঁহারা নীচে আসিতে পারিতেন না। সে সিঁড়ি আজ রুদ্ধ। দিলখুসা প্রাসাদ এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র। এই সকল প্রাসাদ আর নৃত্যগীতে মুখরিত হয় না ; আর বিলাসের অবাধ স্রোত তাহাদের মধ্যে বহে না। কালস্রোতে সবই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবুও মুসলমানী শিল্পকলার নিদর্শনগুলি আজও বর্ত্তমান। কলিকাতার বড় বড় প্রাসাদে নানাপ্রকার শিল্পধারা মিশিয়া খিচুড়ীর সৃষ্টি হইয়াছে ; কিন্তু লক্ষ্ণৌ একটা বিশেষ শিল্প-প্রণালীকে অল্পবিস্তর কৃতকার্য্যতার সহিত অনুসরণ করিয়াছে। শাহ্‌নজফে গাজীউদ্দিন ও তাঁহার বেগমদ্বয়ের কবর আছে। এই নবাবের কবরে আসিয়া আমরা একটা নূতন অনুভূতি পাইলাম। অবশ্য শাহ্‌জাহান তাজমহলে একটি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত শাহ্‌নজফের তুলনা হয় না, তবু মনে রাখিতে হইবে যে সকলের অদৃষ্টে মঠ বা কবর প্রতিষ্ঠা করা ঘটে না ; তাই বলি অর্থ বা খ্যাতির মানদণ্ডে প্রেমের তুলনা করা চলে না।
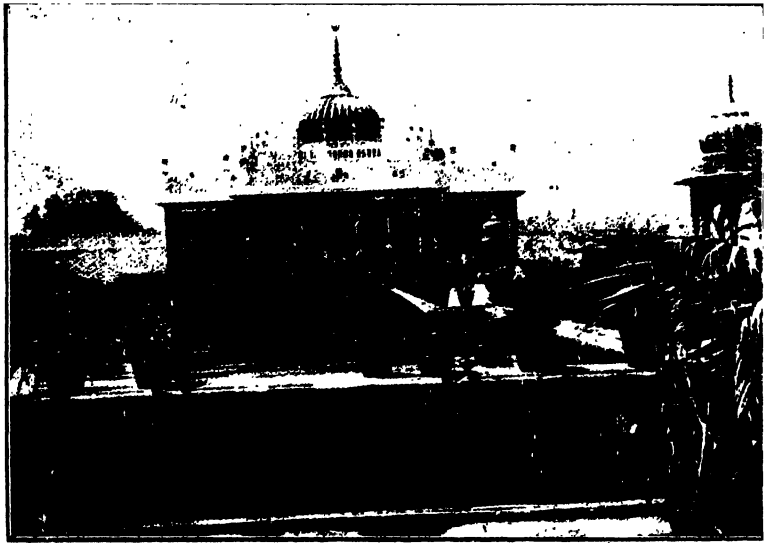
মাচ্ছি ভবন—লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিয়া আমরা হৃষীকেশে আসিলাম। তখন প্রথম উষার আগমনী গাথার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক আনন্দময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নিশাশেষের আকাশ সুনীল। সেই নীলিমা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া মাঠের উপরে, পর্ব্বতের তলে,

নিজেকে বিস্তার করিয়াছে। দূর বনান্তের বৃক্ষলতার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে বার্চ্চ পাইনের অন্তরাল হইতে বালার্ক দেখা দিতে লাগিল। ঊষার পিছনে পিছনে সূর্য্যের এই অনন্তকাল ধরিয়া অনুসরণের শেষ নাই, সমাপ্তি নাই। সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণমালা আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। এ কার স্নেহস্পর্শ! মন নিবিড় আনন্দে ভরিয়া গেল। অরণ্যানীর তলে ছায়ারৌদ্রের খেলা যেন আমাদের সুখদুঃখময় জীবনের ছবি। আমাদের জীবনে এমনি সূর্য্যোদয় হয় কিন্তু তাহার মধ্যে মেঘেরও ছায়া পড়ে; পূর্ণ আলোক কোথাও ত পাই না। এ অনন্ত শোভাময় স্থানে কবে কোন্ সময়ে জীবনের বনে যৌবনবসন্ত প্রথম মলয়ময় নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল, সে সময় যে চিরনবীন আনন্দ-পুষ্পদল ফুটিয়াছিল, আজও তাহার শুকাইয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই, এখানে আছে কেবল স্বচ্ছ নীলাম্বরের মধ্যে একটা প্রসন্ন কল্যাণ দৃষ্টি; প্রভাত শিশিরে ধৌত স্থির হাসি যেন স্বর্ণবীণার তন্ত্রী হইতে কোন সুরবালিকার চম্পক-অঙ্গুলির আঘাতে রণিয়া রণিয়া কাঁপে। সেই অনাহত ধ্বনি কি সকলের কর্ণে প্রবেশ করে? তরঙ্গের গতির মত, পুষ্পের সুগন্ধের মত, শিশিরসিক্ত তৃণদলের মুক্তালাবণ্যের মত তাহা শুধু কারো মনে গোপন চরণ ফেলিয়া একটা নিভৃত স্থান অধিকার করে। এ সৌন্দর্য্যসাগরের অস্ফুট কল্লোলধ্বনি মৃদু মৃদু আঘাতে হৃদয়বীণাতে যে তান জাগাইয়া তুলে তাহা আমাদের মনে বিদ্যুতের মত ক্ষণিক শিহরণ তুলিয়া কোথায় যেন চলিয়া যায়। সে সৌন্দর্য্য বুঝি আজ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে যে সকলকে অব্যক্ত ভাষায় ডাকে।

আমরা পর্ব্বতের উপর উঠিবার পূর্ব্বে হৃষীকেশের মন্দির দেখিতে গেলাম। নিকটেই খরস্রোতা গঙ্গা; নদীতে এত স্রোত যে হাত ডুবাইতেও ভয় হয়। মাছগুলি নির্ব্বিঘ্নে খেলা করিতেছে। এখানে কেহ মাছ খায় না; মাছ নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে নাই। শুনিলাম বাঙ্গালীরা মাছ খায় বলিয়া সকলে তাহাদের ঘৃণা করে। আমরা চারিদিকে ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল লছমন ঝোলা এখান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। অবিরত চড়াই ও উৎরাই ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে। দূরে গাড়োয়ালের রাজপ্রসাদ দেখা যাইতেছে। অতি উৎসাহে আমি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম। সকলে বারণ করিল কিন্তু ইহা বারণ শুনিবার বয়স নহে। জানি চিরদিন এ উৎসাহ থাকিবে না। জানি জীবনের অবসাদময় অপরাহ্নে যখন প্রাণের রস শুকাইয়া আসিবে, যখন চক্ষুতে সবই নিরানন্দ লাগিবে তখনও এই চিন্তার একটা ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর মনে বাজিবে।

প্রাচীন কালের তপোবন আজ আকার ধরিয়া আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চারিদিকে শৈলমালা, নিম্নে প্রখর-বাহিনী, কলনাদিনী জহ্নুকন্যা। চারিদিকে অরণ্যের খেলা, উচ্চ পর্ব্বতচূড়া দৃষ্টি অবরোধ করে; অনন্ত আকাশের কেবল একটি খণ্ডের অখণ্ড রূপ দেখা যায়। দূরে তেমনই বিটপীবেষ্টিত প্রান্তর, তেমনই স্নিগ্ধশীকরসিক্ত পর্ব্বতপথ, তেমনই বিহঙ্গকাকলী। ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়ের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত উপত্যকাগুলির মধ্যে গঙ্গা বালিকা-কন্যার ন্যায় খেলা করিতেছে; ধ্যানগম্ভীর ভূধরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আপন মনে হিমালয় যোগ সাধনা করিতেছেন। চারিদিকে বৃদ্ধ তপস্বীর গভীর অথচ মধুর, ভয়ানক অথচ আনন্দদায়ক মূর্ত্তি, চারিদিকে সাধকগণের মুখে দেবত্বের ছায়া। ঘন তরুরাজির অভিনব সবুজের নয়ন-মনোহর আবেদন, ক্ষণে ক্ষণে সিক্ত বায়ুর মধুর শিহরণ উপভোগ করিতে করিতে আমরা চলিয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ পর্ব্বতচূড়াকে ঢাকিয়া দিতেছে। এখানে বুঝি অসুখ বলিয়া কিছু নাই, অশান্তি বলিয়া কিছু নাই, আছে কেবল অফুরন্ত জীবননদের অফুরন্ত অমৃতধারা। এখানে সন্ন্যাসিগণ আমাদের সভ্যতাক্লিষ্ট জীবনের সকল কৃত্রিম আবরণ ফেলিয়া দিয়া এই অনাবিল আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

আমরা ক্লান্ত না হইয়াই লছমনঝোলায় পৌঁছিলাম। এখানে গঙ্গার উপরে একটি দড়ির সেতু ছিল। পরে গভর্ণমেণ্ট একটি লোহার সেতু করিয়া দেন। তাহাও তিন বৎসর হইল জলের স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা অতি কষ্টে নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া স্নান করিতে প্রস্তুত হইলাম। এই তুহিনশীতল স্রোতে অবগাহন বড় সুবিধাজনক নহে। তবুও আমরা দল বাঁধিয়া একটি বড় পাথরের পাশে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জলে নামিয়া কোনরকমে স্নান করিলাম। সেখানে শীতল জলে স্নান করিয়া গঙ্গার ওপারেই কিছু দুর চলিলাম। অকস্মাৎ পর্ব্বতচূড়াগুলির উপরে ঘননীল মেঘসঞ্চার হইল। তাহার পরেই গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্যে শিহরণ জাগাইয়া প্রবল বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমরা সেখানে একটি মন্দিরে আশ্রয় লইলাম। এদিকে বাহিরে বর্ষার অবিশ্রান্ত মৃদঙ্গধ্বনি হইতেছে।

সেদিন অপরাহ্নে আমরা হরিদ্বারে। কনখলের দক্ষ মন্দির দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া হরকী পিয়ারী (হরপ্রিয়া)-তে দাঁড়াইয়া আছি। এখনকার সে সৌন্দর্য্য তাহা একেবারে অতুলনীয়। মধ্যখানে একটি ইষ্টকবেদী। চারিধারে স্রোতস্বিনী আপন মনে ছুটিয়াছে। সম্মুখে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়ার অনন্ত শ্রেণী। মুগ্ধচিত্তে দেখিলাম অসীম তরঙ্গায়িত মেঘপুঞ্জসদৃশ ঘনায়মান পর্ব্বতশ্রেণী। দূরে বহুদূরে সর্ব্বশেষ স্তরে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণে রচিত শাড়ীখানির মত দুরপ্রসারী দৃষ্টির তলায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন-শীল অপরূপ দৃশ্য উদ্ভাসিত। শত শত সুরবালিকা দেবতাত্মা নগাধিরাজের সুদূর প্রান্তে বুঝি বিচরণ করে। তাহাদের স্বর্ণসূত্রখচিত অম্বরের ঝিকিমিকি আলো, সুবর্ণভূষণের অজস্র হীরকদ্যুতি এই অপরাহ্নের অস্তরাগে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। সান্ধ্য গগনের তরল রক্তহৃদয় বাহিয়া যেখানে সীমা অসীমের নিবিড় সঙ্গ চায়, যেখানে রূপ ও কল্পনা এক হইয়া যায়, সেখানে আকাশ ও ধরণী নিভৃত মিলনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সকল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। নিখিল বিশ্ব আত্মহারা হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের মোহে স্তব্ধ; কোন সাড়া শব্দ নাই। বহু দিবসের সুখ দিয়া আঁকা, বহুযুগের সঙ্গীতে মাখা ধরাতলে সংসারধূলিজালে কত ক্লান্তি, কত ব্যর্থতা রহিয়াছে, তাই

"আঁকো দুঃখে দৈন্যে আঁধারে মরণে অমর জ্যোতির শিখা,
এসগো আলোকলিখা।"

ধরণীর তলে গগনের ছায়াতে, পর্ব্বতের গায়ে ও অরণ্যে যে রঙ্গীন আভা অনন্ত নব বসন্তের মায়া বিস্তার করিয়াছে সে-আলো চিরদিন অম্লান উজ্জ্বল হইয়া নন্দনবনমধুর স্বাদ বিতরণ করে না; মাত্র ক্ষণিকের জন্য স্বর্ণচ্ছায় ও পারের আলোকশিখাকে মরীচিকার মত প্রকাশ করে, সুখ শান্তির একটু আভাস দিয়া আবার লুকাইয়া যায়। চারিদিকে শৈলমালা; মধ্যে নিরলায় স্বচ্ছ নির্ম্মলগঙ্গাপ্রবাহ। গিরিশ্রেণীর উপর যত দুর দৃষ্টি চলে কেবল একটা তরঙ্গায়িত রেখা দেখা যায়। সূর্য্যের আলো ক্রমেই সন্ধ্যাচ্ছায়ায় মিলাইয়া আসে; দূরের অপরূপ জ্যোতিচ্ছটা একটা মিশ্র আলোকের মধ্যে পড়িয়া ম্লানায়মান হইয়া যায়। মৃগতৃষ্ণিকার মত সেই অলকাপুরী ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের গায়ে 'বার্চ্চ' ও 'চিড়ের' শ্যামলতা সন্ধ্যা তখনও অধিকার করিয়া লইতে পারে নাই; দূরের দেবদারু ও ঝাউবন তাহাদের ঘন শ্যামলিমার উপর অনন্ত নীলিমার আবরণ টানিয়া দিয়া সেই অসীম বর্ণসমুদ্রে আত্মবিলোপ করিতেছে। ইচ্ছা হয়, ওই যেখানে সন্ধ্যার কূলে আকুল-প্রাণ অকূল পর্ব্বতমালার উপর দিনের চিতা জ্বলিতেছে,

গঙ্গাবক্ষে—হরিদ্বার।

যেখানে দিগবধূ অশ্রুজলে ছলছল আঁখি, ওইখানে ওই কনক-লাবণ্যসায়রে তরণী ভাসাইয়া দিই ; সুখ দুঃখের ছায়ারৌদ্র-করে মাখা উর্ম্মিমুখর সাগর পশ্চাতে পড়িয়া থাক ; কেবল ওপারের সুদূরতা ও অস্পষ্টতাময় মধুর রহস্যলোকে নির্ভাবনায় চলিয়া যাই।

সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিল। দ্রবীভূত গাঢ়রক্তিমা পরপারের চিত্রার্পিত পর্ব্বতমালার উপরে বৃক্ষাবলীর উজ্জ্বল শাখাপল্লবের মধ্য দিয়া নামিয়া গেল। সম্মুখে সূর্য্যাস্ত ; পশ্চাতে চন্দ্রোদয়। অপর দিগন্তের দূর আকাশপটে মুদ্রিত ছায়াবৎ তরুরাজির প্রচ্ছন্ন নিবিড়তার অন্তরাল হইতে চন্দ্রমা ক্লান্ত রবির পানে তাকাইয়া আছে। পশ্চিমাকাশের বিচিত্র বর্ণগৌরবের উপর দিয়া গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা ধূসর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়াছে। পত্রের মর্ম্মরে কত ব্যাকুলতা! চঞ্চল স্রোতের জলে অশ্রুবৃষ্টি ভরা কোন্ মেঘের একখানি অচঞ্চল ছায়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বসীমায় মাধুরীমথিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্যের মধ্য দিয়া অর্দ্ধপরিস্ফুট চন্দ্রমা উঠিতেছে—আরও ধীরে ধীরে আরও নীরবে।

গঙ্গার হৃদয় যেন চন্দ্রোদয়ে আরও চঞ্চল। মৃদু সান্ধ্য পবনে আন্দোলিত হইয়া দূর বৃক্ষান্তরাল হইতে দুই একটি শুভ্র নগ্ন রশ্মি তাহার প্রবহমান হৃদয় স্পর্শ করিয়া কি এক মধুময় বারতা প্রকাশ করিয়া গেল। এক দিকে লীনপ্রায় অবসান ঘনীভূত ছায়ার মধ্যে আলোক ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায় ; অপর দিকে ছায়াময় নিবিড়তা ভেদ করিয়া অল্পে অল্পে প্রশান্ত স্নিগ্ধালোক ফুটিয়া উঠে। দূরস্থিত ক্ষীণ তটভূমিতে সে সন্ধ্যার ছায়া আর থাকে না। চতুর্দ্দিকে শ্যামলা বসুন্ধরার উচ্ছ্বসিত মূর্ত্তি। দূরে দিগন্তবেলায় আকাশ ধরণীকে স্পর্শ করিয়াছে। আর দেরী নাই ; এখনই যাইতে হইবে। শুক্লাপঞ্চমীর বিবর্ণ পাণ্ডুর চন্দ্রমা পশ্চিম গগনপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িবে। হে ধ্যানমগ্ন গিরি! সুখমৌন আকাশ! হে ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যানী! অয়ি স্বপ্নমুগ্ধে নদী! তোমাদের সকলের কাছে পরিপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় চাহিতেছি। আমার দিবার মত কিছুই ছিল না, তাই কিছুই দিই নাই ; কিন্তু অনেক লইয়া গেলাম। বড় সৌন্দর্য্যময় ছবি দেখিয়াছি, আজ ইহাদিগকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া স্মৃতির মর্ম্মরমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিব।

(ক্রমশঃ)

ত্রয়ী

—গল্প—

—হুমায়ুন কবির

মানুষ কোনদিনই মানুষের মনের সন্ধান পাবে না ? যার সঙ্গে আত্মার যোগ রয়েছে ভাবি, যাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি আমি যাকে ভালবেসেছি এতো সে নয়, একে তো আমি চিনি না জানি না। অথচ সেই তার মুখ সেই তার হাসি, সেই তার রূপ। দিগন্তের চক্রবালরেখা যেমন চিরদিন এমন ক'রে দূরেই থাকবে চিরদিন এমনি ক'রে আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানার পরপার থেকে আমাদের টানবে তেমনি মানুষের মনও বুঝি চিরদিন সুদূর রহস্যময় বিস্ময়ের পূর্ণপাত্র হ'য়ে থাকবে ! যতই কাছে আসতে চাই যতই ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাই, ততই যেন সে দূরে স'রে যায়, সকল মায়া সকল প্রলোভন এড়িয়ে কেবলি পালিয়ে বেড়ায়। নিয়ত প্রেমের উচ্ছ্বসিত লীলাভঙ্গে জীবন তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে, চন্দ্রকিরণের জোয়ারে মানুষের মন দখিন বাতাসের মত সৌরভে মদির হ'য়ে ওঠে, কিন্তু প্রেমের পরিতৃপ্তি কোথায়? বড় বেশী ক'রে যাকে পেতে চাই, তাকেই আমরা হারাই। সমস্ত অন্তর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে আকাঙ্ক্ষা করি, তারই হৃদয় বারে বারে ভুল করি, মিছামিছি তার ওপর রাগ করি, আপনাকে ধিক্কার দিই। একটু হাসি একটু চোখের চাওয়া একটু করুণ দৃষ্টিতে মন কৃতজ্ঞতায় ভ'রে যায়, একটু প্রীতির ছোঁয়া পেলেই ভাবে যে এই বুঝি পেলাম, এই বুঝি আমার সন্ধান সফল হ'ল। কিন্তু হায়, তার পরে দেখি হাসিতে যে চোখের জল মেশানো ছিল সে তো দেখতে পাইনি, ফুলের তলায় কাঁটা ছিল, সুধাপাত্রের কানায় যে বিষ ছিল সে তো জানিনি। হৃদয়ের একটি কোণ মাত্র দেখেছিলাম, মহাসাগরের তরঙ্গলীলা একবার মাত্র চকিতে আভাসে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু অজানা জীবনসাগর তো অজানাই র'য়ে গেল ; তার তরঙ্গভঙ্গের যে কোন দিগন্তে অবসান, সে সন্ধান তো মিলল না।

তখন হৃদয় কাঁদে, অভিমান করে, ব্যথায় জর্জ্জর হ'য়ে ওঠে। ভাবে যাকে এত বিশ্বাস করেছিলাম, সেই এমন ক'রে আমায় আঘাত দিল ! হায়, বারে বারে ভুলে যাই এ আঘাত সে তো ইচ্ছা ক'রে দেয়নি, হয়ত জেনেও দেয়নি, এ শুধু তারই হৃদয়সিন্ধুর আর একটি তরঙ্গ।

সে দিন একথা ভাবিনি। তাই নিজেও কেঁদেছিলাম, তাদের দুজনাকেও কাঁদিয়েছি। আজ শুধু ভাবি যে জীবন আবার প্রথম থেকে সুরু করা যেতো ! হয়তো সে ভুল আবার করতাম না, হয়তো তেমনি ক'রে আবার বারে বারে ভুল বুঝে ব্যথা পেতাম ব্যথা দিতাম। হয়তো জীবনের গতি আবার সে দিনেরই মতন হোত, সেই আশঙ্কা সেই আনন্দ সেই সন্দেহে হৃদয় সেই দিনের মতনই দুলত।

তাদের দুজনাকেই আমি ভালবাসতাম। তাদের নাম আজো আমাকে উতলা ক'রে তোলে—তাদের নাম আমি বলতে পারব না। কাকে যে বেশী ভালবাসতাম সে বিচার আজ করতে বসব না—তবে বোধ হয় তাদের দুজনাকে আমি দু'রকমে ভালবেসেছিলাম। দীপ্তির সঙ্গে যে আমার প্রথম কেমন ক'রে কোথায় পরিচয় হ'ল সে কথা আজ মনে নাই, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়েই আমার মনে পড়ে যে তার চেহারায় এমন একটা তেজ একটা দীপ্তি দেখেছিলাম যে তার স্মৃতি আমাকে আজো মুগ্ধ করে। বাঙলা দেশের লোকের চোখে হয়তো তাকে সুন্দর লাগবে না কারণ তার রঙ ছিল শামলা কিন্তু তার মুখে চোখে কথায় ভাবে ইঙ্গিতে এমন একটা আভা ফুটে বেরোত যে তাকে দেখলে মনে হ'ত এখানে প্রাণ যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কোথাও যেন তার কোন দৌর্ব্বল্য নেই, কোন দ্বিধা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই। তীরের মতন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সে আপনার মনে চ'লে যেত, চারিদিকের কথা তার

গায়ে লেগে যেন ঠিকরে পড়ত, তাকে স্পর্শও করতে পারত না।

আমি তাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবেসেছিলাম। আমার হৃদয়ের যৌবন বোধ হয় প্রেমের জন্য বুভুক্ষ হ'য়েছিল, সে আসতেই বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে তাকে বরণ ক'রে নিল। সেও বোধ হয় আমাকে প্রথম থেকেই ভাল বেসেছিল কিন্তু তার বিষয়ে জোর ক'রে আমি কিছু বলতে পারি নে, আজ পর্য্যন্ত সে আমার কাছে রহস্যই র'য়ে গেছে। আমার মনে আছে আমি তাকে প্রথম যেদিন বল্লাম, দীপ্তি আমি তোমাকে ভালবাসি, সে বেশ অসঙ্কোচে তীক্ষ্ননয়ন দুটি আমার দিকে তুলে উত্তর দিল, সে তো আমি অনেক দিন জানি।

আমি উদ্বেগাকুল হৃদয়ে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম —আর তুমি? তুমি কি আমার হবে?

চাপাহাসিতে চোখমুখ ভ'রে বিদ্রূপের তরল সুরে সে বল্লে, হ্যাঁ একটু বাসি বই কি? ফুল ভালবাসি, বই ভালবাসি আকাশ বাতাস মানুষ পশু পাখী সব কিছু ভালবাসি। তুমি কি অপরাধ করেছ যে কেবল তোমাকে ভাল বাসব না?

আমি তার হাত টেনে নিয়ে কাতরভাবে বল্লাম, দেখ দীপ্তি, সব জিনিষ নিয়ে তুমি এমন বিদ্রূপ ক'রো না। আমার অন্তরের ভালবাসাকে যদি তুমি এমন ক'রে অবহেলা কর সে আমি সইতে পারব না।

সে হাত না ছাড়িয়ে নিয়ে বেশ সহজ সুরেই বল্ল, তা আমি কি করব বল ত? আমি যদি তোমার মত গম্ভীর না হ'তে পারি, বা নাটকের নায়িকার মত প্রেম-বিগলিত স্বরে তোমায় প্রাণনাথ ব'লে জড়িয়ে ধরতে না পারি, তবে সে কি আমার বড় বেশী দোষ?

আমি তার হাত ছেড়ে দিলাম। বল্লাম, আমারই অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর, আমি চল্লাম। তোমায় যদি কখনো অসন্তুষ্ট ক'রে থাকি তবে ক্ষমা কোরো, আর আজকার কথা ভুলে যেও।

আমি ফিরতেই দীপ্তি বাধা দিয়ে বল্ল, এত সহজেই চ'লে যাচ্ছ—এই তোমার ভালবাসা? আর তোলা কি এতই সহজ কথা? আমি কিন্তু এত সহজেই চ'লে যেতাম না।

আমি ব্যগ্রভাবে তার হাত বুকে চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তুমি আমাকে ভালবাস? এত ক্ষণ ছল করছিলে?

দীপ্তি হেসে উঠ্‌ল, বল্ল, এই দেখ আবার তুমি আমায় এমন তাড়া দিতে সুরু করলে যে তোমাকে আর আমি শেষে সামলাতে পারব না! এত অশান্ত কেন হও?

আমি বল্লাম, মনে শান্তি নেই ব'লেই অশান্তি—আমার প্রশ্নের তবে উত্তর দেবে না?

আজ নয়, আর একদিন, ব'লেই আমাকে কোন কথার অবসর না দিয়ে সে চ'লে গেল—বহুক্ষণেও যখন ফিরে এল না, তখন আমি অবশেষে চ'লে এলাম।

২

দীপ্তিকে সঙ্গে ক'রে বটানিক্‌সে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আগের দিন সন্ধ্যা বেলা তাকে বলতেই সে যখন রাজি হ'ল তখন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। সে যে বিনা-প্রশ্নে এমন ক'রে যেতে স্বীকার করবে সে আমি ঠিক আশা করতে পারিনি। সকাল বেলা দুজনে এসে চাঁদপালে ষ্টীমারে উঠতেই দীপ্তি হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, শোন, আজ নাই বা গেলে। আমার একটু কাজ আছে।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লাম তুমি তো বেশ! কাল রাজি হ'লে, আজ চাঁদপালে এলে, এতক্ষণ কোন কিছু বলনি, আর এখন জাহাজে উঠে মনে প'ড়ে গেল যে দরকারি কাজ প'ড়ে রয়েছে, আজ যাওয়া হবে না। তার চেয়ে সোজাসুজি বল না কেন যে একা আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছ?

দীপ্তি চুল দুলিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে বল্ল, ঈস, ভয়? তুমি বাঘ না ভালুক যে তোমাকে দেখে ভয় পাব? আমার কাজ ছিল, বল্লাম আজ থাক, তা তুমি যখন শুনলে না তখন চলো।

আমি বল্লাম, না, সত্যি যদি তোমার কাজ থাকে, তবে আজ না হয় নাই বা গেলাম।

হুমায়ুন কবির

দীপ্তি আবদারের সুরে বল্ল, বেশ তার চেয়ে বল না কেন যে আমাকে নিয়ে যেতে তোমার ইচ্ছে নেই, যেই একটা ওজর পেয়েছ অমনি পালাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ! তা তুমি থাকবে তো থাক—আমি ত চল্লাম। না হয় একাই যাব।

আমি কিছু না ব'লে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে পরম নির্ব্বিকার ভাবে বহুদূরে যে দুয়েকটি সাদা গাঙচিল ভাসছিল তাদের গতি লক্ষ্য করতে লাগল। জাহাজ ছেড়ে দিল। জলের শব্দ শুনে সে চকিত হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল যে আমি তখনো তার মুখে তাকিয়ে আছি। জানি না আমার মুখে কি দেখে যেন একটু ভয়ই পেল. হঠাৎ ত্রস্ত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, তবে থাক, আজ যাব না। চল ফিরে যাই।

তখন ষ্টীমার অনেকটা চ'লে এসেছে। আমি বল্লাম, আর তো ফেরা যায় না, দীপ্তি। আর আমার ফেরবার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। সেই কবিতাটি মনে আছে—It is too late to say farewell?

সে কিছু না ব'লে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। আমি ব'সে ব'সে তাকে দেখতে লাগলাম। হাতখানি শিথিল ভাবে কোলের উপর প'ড়ে রয়েছে, দুয়েকটি চুল ঘোমটার পাশ দিয়ে বাতাসে উড়ছে, সমস্ত দেহ শিথিল দুর্ব্বল, কিন্তু কতখানি প্রাণশক্তি ওরই মধ্যে। দুহাতে ধরে ওকে তো মাটির মত নোয়াতে পারি, কিন্তু ওই বিদ্যুতের মতন দীপ্ত মনকে কি কোনদিন বশ মানাতে পারব? সাপের মত নিষ্ঠুর আর সুন্দর লাগছিল ওকে—কিন্তু সত্যি সত্যি ওর হৃদয় করুণায় ভরা সে কথা ভুলব কেমন ক'রে?

হঠাৎ আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বল্ল, তুমি কি আমায় কোন অদ্ভুত জানোয়ার পেয়েছ যে হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছ? জাহাজের সবাই যে তোমাকে দেখে হাসছে।

আমি লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। সারা দুপুর বেলা দুজনে বাগানের চারিদিকে ঘুরে দেখলাম। আমি তো প্রায়ই ওখানে বেড়াতে যেতাম—দীপ্তি আগে কখনো আসেনি—তাকে আমার সব প্রিয় পরিচিত জায়গাগুলি খুঁজে খুঁজে দেখাতে লাগলাম। যেখানে বাগানের শেষে নদীটা হঠাৎ বেঁকে গেছে সেখানটা ভারী সুন্দর দেখায়, সূর্য্যাস্তের সময় তার অপূর্ব্ব শোভার কথা ওকে বল্লাম। সকাল বেলা দুজনের মধ্যে কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জার ছায়া এসে পড়েছিল, তাও ক্রমে কেটে গেল। ওকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকতে বলায় তখুনি রাজি হ'ল।

বিকেল যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই আমার মনও যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠতে লাগল। দেখলাম দীপ্তিও যেন কেমন বিবর্ণ অথচ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তার যে এত হাসি এত গান এত কথা সব যেন বন্ধ হ'য়ে গেল। কথায় কথায় তার বিদ্রূপ শাণিত তরবারির মত ঝিকমিক ক'রে উঠেছে, এখন তার মুখে যেন আর কথা আসছে না। আমিও কিছু বলতে পারছিলুম না, দুজনে নীরবে পাশাপাশি চলেছি, একএকবার আমাদের দেহ স্পর্শ করছে, আর দুজনেই শিউরে উঠছি।

তখন ফাল্গুনের সূর্য্য তপ্ত আলোকে পৃথিবী পূর্ণ ক'রে পশ্চিমে ঢ'লে পড়েছে। সারাদিন কোথায় ছায়ায় ব'সে একটা কোকিল ডাকছিল, এতক্ষণ আমরা নিজেদের কথায় মগ্ন ছিলাম, বাইরের পৃথিবীর কোন কিছু যেন আমাদের স্পর্শ করে নি। কিন্তু এখন সে নীরবতার মধ্যে কোকিল যেন বড় বেশী আকুল স্বরে গাইতে লাগল—তার সুর যেন আরো মদির, আরো মোহময় হ'য়ে উঠ্‌ল। দক্ষিণের বাতাস সারাদিন ভ'রেই বয়েছে, এখন ফুল ঝরিয়ে পাতা ছড়িয়ে আমাদের হৃদয়েও এসে যেন মাতামাতি করতে লাগ্‌ল:

সে নীরবতা অবশেষে আমার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লাম, ঐ একটা কোকিল ডাকছে, শুনছ না?

দীপ্তি মাটির থেকে মুখ না তুলেই বল্ল, হ্যাঁ।

আমার কথাও আবার ফুরিয়ে গেল। দুজনে চলেছি, সরুপথ, তার দেহসৌরভ আমাকে উন্মন ক'রে তুলছে, এক একবার আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখছি, চোখে চোখ

পড়তেই দুজনে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমার বুক দুরুদুরু ক'রে কাঁপছে, বুঝতে পারছি যে দীপ্তিরও বুক কাঁপছে। হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ আর মাঝে মাঝে শুকনো পাতায় পা পড়লে মরমর ক'রে উঠছে। তরুশাখায় দক্ষিণ বাতাসের অশ্রান্ত কল্লোল।

আমি হঠাৎ ব'লে উঠলাম, এস, এখানে বসা যাক।

দীপ্তি যেন চমকে উঠ্‌ল, বল্ল, না চল।

পরক্ষণেই কি ভেবে বল্ল, আচ্ছা, চল, বসি।

দুজনে একটা গাছের তলায় ঘাসে বসলাম। আবার খানিকক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। দীপ্তি তার পায়ের তলার ঘাস ছিঁড়ছিল, আর থেকে থেকে দাঁতে কাটছিল। আমি একবার তার দিকে একবার দূরে গাছগুলির গায়ে সবুজ পাতা লক্ষ্যহীন চোখে দেখছিলাম।

অবশেষে আমি বল্লাম, দীপ্তি তুমি তো জানই যে আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি কিন্তু কোনদিন আমায় বল্‌নি যে আমাকে তোমার ভাল লেগেছে কিনা। আজি আমি তোমার উত্তর চাই। এমন ক'রে দোটানার মধ্যে আমি আর টিঁক্‌তে পারছি না।

আমি কথা বলতে আরম্ভ করতেই দীপ্তি আমার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে দূরে একটা গাছের গুঁড়ির দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইল। আমি কিন্তু দেখছিলাম যে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে তার আঙুলগুলো একটু কাঁপছে।

আমার কথা শেষ হ'তেই সে উত্তর দিল, তাই বুঝি আজ আমাকে তোমার কবলের মধ্যে পেয়ে জোর ক'রে আমার কাছ থেকে উত্তর আদায় করতে চাও। এই জন্যেই বুঝি আমাকে বেড়াবার ছল ক'রে বটানিক্‌সে নিয়ে এসেছ?

আজ তার এ খোঁচায় আমি চটললাম না। লক্ষ্য করলাম যে তার মুখে হাসি এল না কেবল ঠোঁট দুখানি একটু কাঁপছে। চোখে ব্যাকুল চঞ্চল দৃষ্টি, সর্ব্বাঙ্গে ভয়ের চিহ্ন।

আমি উত্তর দিলাম, বিদ্রূপ ক'রে আমায় অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছে, দীপ্তি—আজ আর পারবে না। আজ আমি তোমার মন জানবই—এ সন্দেহ আর আমি সইতে পারছি না। আমার পরে তুমি এত নিষ্ঠুর কেন, দীপ্তি?

দীপ্তি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বল্ল, আমি চল্লাম, তুমি আসবে তো এসো। আমার কাজ আছে আগেই তো বলেছি। এখন তাড়াতাড়ি না গেলে এ জাহাজ আর পাবো না—বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে তা' হ'লে।

আমি তার হাত ধ'রে তাকে বসিয়ে বল্লাম, ষ্টীমার আসবার এখনো অনেক দেরী। তোমাকে আমি জানি বাপু, এরকম ক'রে তুমি আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না। আজ যদি সারারাত্তির এখানে থাকতে হয়, তবু আমি আমার কথার উত্তর না দিলে তোমাকে যেতে দেবো না।

দীপ্তি ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে বল্ল, কি আমাকে সারা রাত্তির তুমি আটকে রাখবে, আমি উত্তর না দিলে?

আমি বল্লাম, হ্যাঁ।

দীপ্তির মুখ নিমেষে কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্ল, এই আমি চল্লাম, যদি পারো তো আমাকে আটকাও।

ব'লেই সে দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। আমি উঠে তার হাত জোরে চেপে ধ'রে বল্লাম, দেখ এ ছেলেখেলা নয়। তোমাকে গায়ের জোরে আটকে রাখবার অধিকার আমার নেই সে আমি জানি। কিন্তু তুমিও জেনে রেখো যে আমি আর বেশীদিন আমাকে নিয়ে এ রকম খেলা সইব না। হয় আমি জোর ক'রে তোমাকে নেবই, নইলে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধের শেষ হবে।

দীপ্তি কিছু না ব'লে চলতে সুরু করল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চল্লাম। বল্লাম, তুমি কি মানুষ, না পাষাণ?

সে কোন উত্তর দিল না।

ষ্টীমার এল। একটা কথাও না ব'লে দুজনে পাশাপাশি বসলাম। সারা পথ কেউ কোন কথা বলিনি। তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে চ'লে আসছি, এমন সময় হঠাৎ সে বল্ল, কাল আসবে না? এসো কিন্তু।

আমি গম্ভীর মুখে 'আচ্ছা' ব'লে চ'লে এলাম।

৩

পরদিন দীপ্তির বাসায় গিয়ে যখন শুনলাম সে কোথায় বেড়াতে বেরিয়ে গেছে, তখন কেবল নিজের ওপর রাগ

হুমায়ুন কবির

হ'তে লাগ্‌ল। আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে সে এ রকম ক'রে বিদ্রূপ করতেই আমাকে ডেকেছিল। তবু কেন যে তার কথায় বিশ্বাস ক'রে এসেছিলাম তা ভেবে নিজেরই আশ্চর্য্য লাগতে লাগ্‌ল। একটু দুঃখও পেলাম কিন্তু তার চেয়ে বেশী হচ্ছিল রাগ। বাড়ী ফিরেই তাকে একটা চিঠি লিখলাম—তোমার ব্যবহারে আশ্চর্য্য আমি মোটেই হইনি; তবে নিজের দৌর্ব্বল্য ও নির্ব্বুদ্ধিতায় নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে। থাক্, সে কথা নিয়ে তোমাকে কোন অনুযোগ আজ করতে চাই না। আমি দুয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, বোধ হয় শিগ্‌গির ফেরবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ হয়তো তুমি বুঝতে পারবে। তোমায় যদি কখনো বিরক্ত ক'রে থাকি তবে আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কোরো। তোমার সঙ্গে হয়তো এ জীবনে আর দেখা হবে না—অন্তত আমি তো সেই চেষ্টা করব।

মনটা ভারী খারাপ হ'য়ে গেল। সেদিন বা তার পরদিন কোথাও বাইরে গেলাম না। জিনিষপত্র গুছিয়ে বহুদিনের পুরাতন চিঠিপত্র সাজিয়ে ঘরে কি কাজ করছিলাম, এমন সময় দীপ্তির একটা চিঠি পেলাম, তোমার সঙ্গে ভয়ানক দরকারি কথা আছে, আজ বিকেলে অবশ্য অবশ্য এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

কোন রকমে অশান্ত মনকে বশে এনেছিলাম—সে আবার উতলা হ'য়ে উঠল আবার আকাশকুসুম রচনা করতে সুর ক'রে দিল।—হায়রে মানুষের মন, এত সহজেই আনন্দে নেচে ওঠে, আবার একটু আঘাতেই চোখে পৃথিবীর আলো ম্লান হ'য়ে যায়। মনের অবস্থা যে কি রকম হ'ল ঠিক ক'রে বলতে পারব না। আবেগ, আশা, আশঙ্কায় পৃথিবী যেন টলছিল, আমার দেহমন ভ'রে যেন পাগল হাওয়ার মাতামাতি।

দীপ্তি বল্ল, তুমি বাড়ী যাবে শুনলাম, তোমার সঙ্গে তো বহুদিন দেখা হবে না তাই ডেকেছিলাম।

আমি প্রায় হতাশ হ'য়ে বল্লাম—এই তোমার দরকারি কথা?

দীপ্তি আমার কথা গ্রাহ্য না ক'রে বল্ল, এমন সময় হঠাৎ বাড়ী যাওয়া কেন? তোমার কি না গেলেই নয়?

আমি বল্লাম, সে কথা শুনে আজ আর কি হবে, দীপ্তি?

সে বল্ল, তুমি যেও না, এখন থাক।

আমি বল্লাম, না সে আর হয় না, দীপ্তি। এ সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে আমি আর থাকতে পারব না—আমি তোমার কাছে থেকে দূরে চ'লে যেতে চাই—

মাটির দিকে মুখ নামিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে প্রায় জড়িত কণ্ঠে দীপ্তি বল্ল, আমি যদি বলি, তবু থাকবে না?

আমি তার মুখে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, তুমি যদি বল, তবে থাকব। কিন্তু তার অর্থ কি সে তো জান!

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সে চোখ তুলে একবার আমার চোখে চাইল। চোখে চোখ পড়তেই চকিতে মুখ নামিয়ে নত হ'য়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে রইল। দেখলাম তার মুখ বিবর্ণ, ললাটে স্বেদবিন্দু, সমস্ত শরীর অবসন্ন, অসহায়।

দীর্ঘ মুহূর্ত্তগুলি যেন কাটে না। দুজনের হৃদয়ের স্পন্দন আর বাইরে বহু দূরের একটা অস্পষ্ট অস্ফুট অবিশ্রান্ত গুঞ্জন ভিন্ন কোথাও কোন শব্দ নেই। বহুক্ষণ পরে সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে দীপ্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল, বল্ল, না তবে থাক্। বাড়ী থেকে ফিরবে কবে?

কোন রকমে উত্তর দিলাম, জানিনে।

আবার নীরব মুহূর্ত্তগুলি মন্থর পদক্ষেপে চলতে লাগল। আমার সামনে নত মস্তকে নীরব বাক্যহীনা দীপ্তিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মূর্ত্তিমতী প্রাণধারা এখানে এসে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে। আমার হৃদয় করুণায় ভ'রে গেলো, আমি বল্লাম, দীপ্তি, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, নিজেও কষ্ট পাচ্ছ। তুমি যে আমাকে ভালবাস সে কথা আর লুকোতে পারবে না—আর আমার কথা তো জানই। তুমি এসে আমার ভার না নিলে আমার সমস্ত জীবন ছারখার হ'য়ে যাবে। দুটো জীবনকে এমন ক'রে ব্যর্থ করবে কেন দীপ্তি? বল, আমি থাকব?

দীপ্তি মাটির থেকে মুখ না তুলেই বলতে সুরু করল— ওর মুখে আমি কখনো এত আস্তে কথা শুনিনি, প্রত্যেকটি

কথা যেন অন্তরের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে—অত্যন্ত ধীরে ধীরে বল্ল, তোমাকে ভালবাসি সে কথা অস্বীকার করব না। তুমিও আমাকে যে ভালবাস সে কথা জানি। কিন্তু এখন যেমন আছি চিরদিন তেমনি থাকতে পারব না কেন? তুমি কেন আমাকে আরো কাছে চাও? না, না, না, সে আমি পারব না, তুমি আমার কাছে যা চাও, সে আমি দিতে পারব না।

আমার মন কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্লাম, তোমার ভালবাসার অর্থ আমি বুঝি না। ভালবাসার ধর্ম্মই আরো নিবিড় ক'রে চাওয়া, তুমি যদি আমাকে ভালবাস তবে অসঙ্কোচে আমার কাছে ধরা দিতে পারবে না কেন?

দীপ্তি হতাশ কণ্ঠে বল্ল, না, সে তুমি বুঝবে না।

আমি বল্লাম, তবে যাই দীপ্তি। আশা করি এ জীবনে যেন আমাদের আর দেখা না হয়। দূরে থেকে তুমি সুখী হয়েছো শুনলেই আমি খুসী হ'বো।

দীপ্তি আর্ত্ত কণ্ঠে বল্ল, আমায় ক্ষমা কর—যাবার সময় আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছ ব'লে যাও। আমি তোমার যোগ্য নই—কেন তুমি আমাকে ভালবাসলে?

এত দুঃখেও আমার হাসি এলো। বল্লাম, তুমি ত আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোরো। অনেকদিন তোমাকে অনেক আঘাত দিয়েছি, সেগুলো ভুলে যেও।

দীপ্তি আরও গভীর বিষণ্ণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইল।

৪

বহু জায়গা ঘুরে অবশেষে দার্জ্জিলিংয়ে গিয়ে আড্ডা গাড়লাম। জীবনে যেন সব বিস্বাদ হ'য়ে গেছে—কোন কিছুর কোন অর্থ নেই যেন। সবার সঙ্গে কথা বলি, গল্প করি, গান গাই, ঘুরে বেড়াই, সবাই ভাবে লোকটা কী সুখে আছে। অথচ অন্তর যে আগ্নেয়গিরির মতন দিনরাত্রি জ্বলছেই, তার খোঁজ কে রাখে?

সেদিন ভিক্টোরিয়া পার্কে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা ফুটন্ত ডালিয়া গাছের পাশে প্রীতি দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে সে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল—আমিও চমকে বল্লাম, আরে প্রীতি, তুই এখানে? অনেকটা বড় হয়েছিস তো!

প্রীতি সলজ্জ হাসির সঙ্গে মুখ নত করল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম, বল্লাম, তুই এত সুন্দর হ'লি কবে থেকে?

লজ্জায় সে ঘেমে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। সত্যি, ডালিয়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একটা ডালিয়া ফুলের মতনই দেখাচ্ছিল। পরনের নীল সাড়ি উজ্জ্বল গৌরবর্ণকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। শিশুর মত সরল মুখখানিকে ঘিরে দুয়েকটি কোঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে। প্রভাতের সকল হাসি এসে যেন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, আর তারই মধ্যে প্রভাতের প্রাণের মত সে দাঁড়িয়েছিল। তাকে এমন সবুজ, এমন সরস, এমন নবীন দেখাচ্ছিল যে হঠাৎ নিজের কথা মনে প'ড়ে গেল। বিদ্যুতের দীপ্তিতে সেখানে সব জ্ব'লে গেছে—ধূসর বিদগ্ধ মরুভূমি। অজ্ঞাতসারে বুক থেকে একটা নিশ্বাস পড়ল।

প্রীতিকে আমি ছেলে বেলা থেকেই জানি। যখন ও এক বছরের শিশু তখন থেকেই আমার সঙ্গে ওর ভাব—তারপরে যখন একটু বড় হ'ল তখন তো সে আমার মস্ত ভক্ত। ওর বিশ্বাস ছিল যে আমি জানি না, আমি করতে পারি না এমন কিছু দুনিয়ায় নেই। আমার মা ওর মা'র ছেলেবেলার সই—মা মারা যাবার পর থেকে আর ওদের কোন খবর পাইনি। তার পরে আজ পাঁচ ছয় বছর পরে এই দার্জ্জিলিংয়ে দেখা।

প্রীতির মা আমাকে দেখে খুব খুসী হলেন। কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটল। দেখলাম প্রীতি সেই ছেলেবেলার মত নেহাৎ ছেলেমানুষই রয়েছে। তাকে যা বলি তাই বিশ্বাস করে, কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা কোন সংশয় তার শৈশবের স্বর্গপুরীতে প্রবেশ করেনি। প্রায় যৌবনের সীমানায় এসে দাঁড়ালেও সে আজো মনে বালিকাই র'য়ে গেছে। বালিকার চাঞ্চল্য বালিকার উল্লাসে তার দেহ মন এখনো উজ্জ্বল।

হুমায়ুন কবির

আমার মনের অন্তর্দ্দাহ ধীরে ধীরে নিভে এল। কিন্তু প্রীতির প্রতি আমার যে মনের ভাব সে সম্বন্ধে আমার কোনদিনই ভুল হয়নি। তাকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু সে ভালবাসায় কোন দাহ ছিল না কোন উত্তাপ ছিল না। মনে হ'ত সে বুঝি অসহায় শিশু—সংসারের আঘাত থেকে তাকে না বাঁচালে সে বুঝি বাঁচবে না। সর্ব্বদা ভয় হ'ত এই বুঝি ওকে ব্যথা দিলাম।

সেও আমায় ভালবেসেছিল। কিন্তু সেদিন আমি তা জানতাম না। ভাবতাম যে আমি তাকে বোনের মত স্নেহ করি, সেও বুঝি তেমনি আমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। সে বোধ হয় নিজেও তখন জানত না যে সে আমাকে ভালবাসে—তা হ'লে অমন অসঙ্কোচে সে আমার সকল বিষয়েই কথা কইতে পারত না।

আমার মনে আছে আমি তাকে নিয়ে একদিন জলা-পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অত উঁচুতে উঠতে পরিশ্রমে সে হাঁপাচ্ছিল। আমি তাকে বল্লাম, তুই আমার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ওঠ্। সে অসঙ্কোচে আমার দেহে ভর রেখে আমার সঙ্গে উঠতে লাগল।

সেদিন ফেরবার পথে একটা পাথরের ওপর ব'সে বিশ্রাম করছি, হঠাৎ প্রীতি জিজ্ঞেস ক'রে বসল, তুমি আজো বিয়ে করনি কেন?

আমি হঠাৎ এ রকম প্রশ্নে অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলাম। পরক্ষণেই সামলে তার দিকে তাকাতেই দেখলাম তার গভীর স্বচ্ছ বিশ্বাসভরা চোখ দুটি আমার দিকে মেলে ও চেয়ে রয়েছে। সেখানে কোন ছল নেই, কোন সন্দেহ নেই। ও যেন স্বর্গচ্যুতির পূর্ব্বের ঈডেন-বনের দেবশিশু। ওই শিশুর মত সরল আয়ত চোখ আমাকে নিরুপায় ক'রে ফেলে—ওর কাছে কিছু লুকোতে লজ্জা করে।

বল্লাম, সে যে অনেক কথা, প্রীতি।

প্রীতি বল্লে, হোক অনেক কথা। আমি আজ শুনবই। তুমি এ রকম গম্ভীর হ'য়ে রইলে কেন? আমাকে বলবে না?

তার কালো চোখের তারায় জল জ'মে এল। আমি ব্যস্ত হ'য়ে বল্লাম, বলছি, বলছি, তোকে কাঁদতে হবে না।

যতদূর সংক্ষেপে এবং বহু কথা বাদ দিয়ে তাকে দীপ্তির কথা বল্লাম। সে শুধু একবার বল্লে, দীপ্তিদি?

আমি বল্লাম, হ্যাঁ, চিনিস নাকি?

সে কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, চল, বাড়ী ফিরে যাই।

৫

তার পরে কয়েকদিন প্রীতিদের বাড়ী যাইনি। সেদিন তাকে দীপ্তির কথা বলার পর থেকেই দীপ্তির ছবি এসে আমার হৃদয় থেকে আর সব মুছে ফেলেছে—দিনরাত এ কদিন শুধু দীপ্তির কথাই ভেবেছি। কি প্রাণময়, কি সতেজ অথচ কি কঠিন। আমার মনে হ'তে লাগল সে যেন পাষাণে-গড়া মূর্ত্তি। শিল্পী যত্নে পাথর কুঁদে তাকে তৈরি করেছে; সেখানে একটু বাহুল্য নেই, একটু জঞ্জাল নেই। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সমান কঠিন, সমান মসৃণ, সমান উজ্জ্বল।

হঠাৎ দীপ্তির চিঠি পেলাম সে দার্জ্জিলং আসচে। তার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে এই প্রথম তার খবর পেলাম। ভারি আশ্চর্য্য লাগল—কিন্তু মন তবু খুসী হ'য়ে উঠল। সেদিন সন্ধ্যায় প্রীতিকে বল্লাম, প্রীতি, দীপ্তি এখানে আসচে।

প্রীতি স্থির অবিচল দৃষ্টি মেলে বল্লে, সে আমি জানি।

আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম, প্রীতি মাটীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্লে, আমি দীপ্তিদিকে আসতে লিখেছিলাম।

কতকটা বিস্ময়, কতকটা কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তাকে কি লিখলে?

এই বোধ হয় জীবনে আমি তাকে প্রথম তুমি সম্বোধন করলাম। আমি সেটা লক্ষ্য করিনি কিন্তু প্রীতি লক্ষ্য করেছিল। আমার কথার উত্তর না দিয়ে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না। অথচ মন না বুঝে অকারণেই আনন্দে ভ'রে উঠ্ল। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, দীপ্তি আসছে—সে আসছে। এবার কি আমাদের দুজনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে? ভালবাসার টানে সে কি আমার কাছে আত্মদান করবে; ভাল সে আমাকে নিশ্চয়ই করবে, তা নইলে কেন এখন হঠাৎ দার্জ্জিলিং

আসবে? আর প্রীতি? তার প্রতি গভীর স্নিগ্ধ ভালবাসায় আমার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। ছোট বোনটির মত সে আমার বেদনার তপ্তজ্বালার পর শীতল কোমল মঙ্গল হাত বুলিয়ে দিল—মঙ্গল হোক তার মঙ্গল হোক।

আজ কিন্তু বুঝ্‌তে পেরেছি যে প্রীতির প্রতি আমার ভালবাসা কেবলমাত্র ভাইয়েরই ভালবাসাই নয়। হয় তো সে ভালবাসায় কোন উত্তাপ ছিল না, কোন দাহ ছিল না, কিন্তু উত্তেজনা না থাকলেই কি ভালবাসা গভীর হ'তে পারে না? তার প্রতি আমার ভালবাসায় ছিল গভীর প্রশান্তি আর সান্ত্বনা। দীপ্তির জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল উগ্র মদের মত জ্বালাময়, তীব্র অথচ মদির, মধুর। তার ভালবাসা আমাকে সচেতন ক'রে রাখত—সমকক্ষের ওপর অধিকারের দাবী ছিল তার মধ্যে। আর প্রীতির প্রতি আমার ভালবাসা ছিল স্বপ্নের মত, ধীরে ধীরে সকল দেহমন ছেয়ে আসে, মনে হয় আপনকে ভুলে যাই। তবু জীবনে চিরদিন দীপ্তিই চেয়েছি, দীপ্তিকে চেয়েই মরব।

দীপ্তি এল। ষ্টেশনে তাকে নামাতে গিয়েছিলাম। মনে হ'ল আমাকে দেখে তার চোখের তারা নিমেষের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেমন ছিলে এদ্দিন? সে কোন উত্তর না দিয়ে চলতে লাগল। দেখলাম যেন আগের চেয়ে একটু কৃশাঙ্গী হ'য়ে গেছে গলার হাড়টা যেন একটু বেশী স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি না বলেছিলে এ জীবনে আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না, কই তোমার কথা তো রইল না?

আমি বল্লাম, তোমার ইচ্ছার কাছে আমার কথা কবেই রয়েছে?

দীপ্তি সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্ল, চ'লে যেতে বল; তবে আজই ফিরে যাচ্ছি, এখনো ফেরবার সময় আছে।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে তার দিকে চাইলাম।

আমার দৃষ্টির সামনে সে মুখ নত করল। খানিকক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞেস করল, প্রীতি তোমার ছোট বোন নয়?

আমি বল্লাম, না, কেন বল ত?

সে বল্ল, ও আমার বোন হয়। তোমারো যদি বোন হত তবে তোমার আমার একটা সম্বন্ধ হ'তে পারত। সেখানে আমাদের কোন সঙ্কোচ থাকত না।

আমি বল্লাম, তোমার আমার সম্বন্ধ শুধু একটিই হ'তে পারে সে তুমিও জানো আমিও জানি। তা ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ হ'তে পারে না আমিও চাই না।

দীপ্তি ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল, তুমি বড় নিষ্ঠুর।

আমি তার মুখে চেয়ে শুধু একটু হাসলাম।

আবার দুজনে নীরবে পথ চলেছি। দীপ্তি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, প্রীতি তোমাকে খুব ভালবাসে, না?

আমি একটু বিরক্ত ভাবেই বল্লাম, তা কেমন ক'রে জানব?

দীপ্তি বল্ল, আর তুমি?

আমি রাগ ক'রে বল্লাম, কেন মিছামিছি এ-সব কথা জিজ্ঞেস করছ? আমি কাকে ভালবাসি সে তুমি জানো। তবে নিরর্থক এ প্রশ্ন কেন? সে আমার ছোট বোনের মত, সেও আমাকে ছেলেবেলা থেকে দাদা ব'লে জানে।

প্রীতির মা দীপ্তিকে পেয়ে মেতে উঠলেন। বহুদিনের অসাক্ষাতের অনেক কথা জ'মে উঠেছিল, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আর উত্তর দিতে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। বল্লেন, তোমরা এখন বেড়াতে যাও।

প্রীতি বল্ল, তার মাথা ধরেছে সে যেতে পারবে না। তাই শুনে দীপ্তিও যেতে চাইল না, তাকে বল্ল, কাল একসাথে বেড়াতে যাওয়া যাবে, আজ না হয় থাক।

প্রীতি কিছুতেই শুনল না—প্রায় জোর ক'রে দীপ্তিকে আমার সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে দিল। দীপ্তির যেতে ইচ্ছা ছিল না বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু তবু সে এল। তাকে যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করাতে পারে সে-কথা কোনদিন ভাবি নি। চিরদিন দেখেছি সকলে দীপ্তিরই ইচ্ছা মেনে এসেছে এবং সে নিজেও খেয়ালের হাওয়ায় ভেসে চলেছে, কিন্তু আজ দীপ্তিকেই অন্যের খেয়ালে চলতে হ'ল। তখনই ভেবেছিলাম প্রীতি এত জোর কোথায় পেল? আজ বুঝি, তার নিজের কোন দাবী ছিল না ব'লে তার দাবী কেউ ঠেলতে পারত না। আমাকে সে

হুমায়ুন কবির

ভালবেসেছিল এবং সে-ভালবাসার মধ্যে তার কোন কামনা ছিল না—সেই নিছক ভালবাসার জোরেই সে দীপ্তিকে একদিনের মধ্যে বশ ক'রে ফেলল।

দীপ্তির সঙ্গে পথে বেরোলাম। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। উত্তরে চারিদিকের ছায়াস্নিগ্ধতার মধ্যে তখনও কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণকীরিট কিরণ-দীপ্ত—একটা কুয়াসার পর্দ্দা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে আসছে। পথে আলোর মালায় সহর যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল বলা যায় না। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ওপরে নীচে যেখানে সেখানে আলোর দীপ্তি—আলোর মালা গলায় প'রে রাস্তাগুলি কোথায় নীচে নেমে গেছে কোথাও বা ওপরে উঠছে—দূরে দূরে দুয়েকটি পাহাড়ের গায় বাংলোতে বাতি জ্ব'লে উঠেছে।

দীপ্তির হাতটা টেনে আমার মুঠোয় ভ'রে দুজনে পথ চলতে লাগলাম। বললাম, দীপ্তি এত দিন তোমার অভাবে যে আমার জীবন কি ছন্নছাড়া হ'য়ে গেছে সে যদি তুমি জানতে তবে তোমার দয়া হোত। মনে আছে সব কথা?

দীপ্তি কোন উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ নীরবে আবার দুজনে চলেছি। রাস্তার ওপরে এক এক জায়গায় শাল গাছের ঘন ছায়া—কোথাও বা ঝোপমত হ'য়ে খানিকটা অন্ধকার ক'রে রয়েছে। চলতে চলতে একটা ইউকেলিপটাস গাছের ছায়ায় একটা শূন্য বেঞ্চ দেখে দুজনে গিয়ে সেখানে বসলাম—দীপ্তির হাতটা আমার কোলেই রইল।

আমি আস্তে আস্তে তার হাতে চাপ দিয়ে বল্লাম, দীপ্তি আমার কথার উত্তর দেবে না? দার্জ্জিলিং থেকে কি দুজনে একসাথে ফিরব?

দীপ্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল, সে আর হয় না।

আমি বল্লাম, কেন হবে না, দীপ্তি? তুমি আমার চোখে তাকিয়ে বল যে তুমি আমার, দেখো পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বল তুমি একান্ত আমারই।

আমার বাহু যে কখন তার কটিতট বেষ্টন ক'রে তাকে আমার বুকে টেনে নিয়েছে টের পাইনি। হঠাৎ দেখলাম আমার মুখের ঠিক নীচেই তার মুখ, তার বক্ষ আমার বক্ষস্পন্দনে ধ্বনিত হচ্ছে, তার সমস্ত দেহের কোমলতা ও উত্তাপ আমার দেহকে বিহ্বল ক'রে ফেলছিল। কালো চোখ দুটি অন্ধকারে তারার মতন জ্বলছে—কী উন্মন দৃষ্টি তার গভীর গহ্বরে। আমি আত্মহারা আবেগে তার সরস রক্তাধরে প্রগাঢ় চুম্বন করলাম—বেশ বুঝতে পারলাম যে বিদ্যুতপ্রবাহে দুজনের দেহই যেন ট'লে উঠল। পাগলের মতন তাকে বারে বারে চুম্বন ক'রে কঠিন বাহু-বন্ধনে তাকে আমার দেহে নিষ্পেষণ ক'রে তার মুখের উপর মুখ রেখে বল্লাম, তুমি আমার একান্ত আমার। বিশ্বসংসারে কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। শুধু একবার বল তুমি আমার।

দীপ্তি আরক্তমুখে প্রায় নিরুদ্ধকণ্ঠে বল্ল, ছেড়ে দাও।

আমি তাকে মুক্ত ক'রে বল্লাম, ক্ষমা কর, আমার খেয়াল ছিল না যে তোমাকে ব্যথা দিচ্ছি। আমার কথার উত্তর দাও না ব'লেই তো আমি আত্মহারা হ'য়ে পড়ি তখন তোমাকেই আঘাত ক'রে বসি।

দীপ্তি দাঁড়িয়ে উঠে আনত নয়নে ত্রস্ত কণ্ঠে বল্ল, আমায় ক্ষমা কর। বাড়ী ফেরবার যে বড্ড দেরী হ'য়ে গেল। আমি এখুনি চল্লাম।

ব'লেই ফিরে না তাকিয়ে সে দ্রুতপদক্ষেপে চ'লে গেল—আমি যে উঠে তার সঙ্গে যাব সে শক্তিও আমার ছিল না।

৬

পরদিন যখন দীপ্তির সঙ্গে দেখা হ'ল তখন সে সবে স্নান ক'রে উঠেছে। মোটা লালপেড়ে আল্‌পাকার সাড়ীতে খোলা চুলে তাকে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল সে কথা আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে। আমাকে দেখেই এক ঝলক রক্তে তার সমস্ত মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল—চোখ দুটি নিজে থেকেই নত হ'য়ে এল। পরক্ষণেই চোখ তুলে আমার চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাল কখন বাড়ী ফিরলে? তখন তার চোখে সঙ্কোচের লেশ ছায়া নেই।

বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় প্রেমে আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে উঠল। বল্লাম, অনেকটা রাত্তিরে। কিন্তু তুমি অমন ক'রে আমার কথার উত্তর না দিয়ে চ'লে এলে কেন? ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

দীপ্তি স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকিয়ে বল্ল, কালকের কথা যদি আবার আমাকে বল তবে তোমার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ আমার রইবে না। কোনদিন যদি আবার তোমার সঙ্গে কথা বলি তবে আমার নাম বদলে রেখো।

আমি আহত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্লাম, আমার জীবনে যার মূল্য অনেক, তাকে তুচ্ছ করবার মত শক্তি আমার কোথায়? তুমি আমায় তো কেবলি ঠকাতে চেয়েছ—যদি বা অনুগ্রহ ক'রে কিছু ভিক্ষা দিয়েছিলে তাও আবার এখন ফিরিয়ে নেবে?

দীপ্তির চোখে হাসি ঠিকরে পড়্‌ল—আমি তোমায় দিয়েছি না আমায় অসহায় পেয়ে অতর্কিতে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে? দস্যুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই সে কথা স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি।

পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে বল্ল, দেখ তোমায় দোষ দিচ্ছি না বা কোন কথা ভুলতেও বলছি না। তবে ও-সব কথা ভবিষ্যতে কখনো আমায় বলতে পারবে না। আর তোমার আচরণটা যে আদর্শ হয়নি সেটা কি অস্বীকার করবে?

স্নিগ্ধ হাসিতে তার মুখ ভ'রে গেল। আমি বেদনাতুর কণ্ঠে বল্লাম, দীপ্তি তোমাকে বোঝা অসম্ভব। সত্যি কি আমার হবে না কোনদিন?

দীপ্তি বল্ল, না।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই কি তোমার শেষ কথা?

সে স্থির অবচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, হাঁ। উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই রাণীর মত অটুট মহিমায় সে চ'লে গেল। আমি মুগ্ধ বিস্মিত ব্যথিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

৭

প্রায় এক মাস পরের কথা। দীপ্তি আমাকে এড়িয়ে চলেনি বটে কিন্তু তাকে আর কখনো একা পাইনি। হাসি বিদ্রূপ তার ঠিক আগের মতনই ঝল্‌সে উঠেছে, ঠিক তেমনি করেই সে আমাদের সকলের সকল অনুরোধ অনুনয় অনুযোগ পাশ কাটিয়ে আপনার খেয়ালে চলেছে, কিন্তু একটু সাবধানতা তার সব সময়েই ছিল। তাই সে-দিন সন্ধ্যাবেলা সে যখন নিজে এসে আমাকে বল্ল, প্রীতিরা কোথায় গেছে যেন, চল বেড়াতে যাই। তখন একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম। একবার তার মুখে তাকালাম, কিছু বুঝতে পারলাম না।

পথে বেরিয়েই দীপ্তি বল্ল, দেখ সেদিনের মত যেন করতে চেষ্টা কোরোনা। তুমি ব'লে সেদিন তোমাকে কিছু বলিনি আজ করলে আর কিন্তু ক্ষমা করব না।

আমি হাসলাম। বল্লাম, দীপ্তি, তোমার ক্ষমা দিয়ে আমার কি হবে? আর সেদিন অপরাধ করেছি মনে হয় না। তুমি নিজে এসে আমার বাহুবন্ধনে ধরা যে কোনদিন দেবে সে ভরসা তো আর নেই।

দীপ্তি দীপ্তনয়নে আমার দিকে তাকাল। হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, আমার একটা কথা রাখবে? যদি রাখ তবে বলি।

আমি বল্লাম, কবে তোমার কথা রাখিনি দীপ্তি? অবশ্য যদি আকাশের চাঁদ এখনি এনে দিতে হবে বল তবে হয়ত পারব না—কিন্তু তাও বোধ হয় তোমার আদেশ পেলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

দীপ্তি বল্ল, প্রীতি তোমাকে ভালবাসে, তুমি তাকে বিয়ে কর। তোমরা দুজনেই সুখী হবে।

আমি কোন কথা না ব'লে তীব্রদৃষ্টিতে তার মুখে তাকালাম—আমার দৃষ্টির সামনে সে চোখে নত করল।

ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল, আমাকে পেয়ে তুমি কোন-দিন সুখী হতে পারবে না। আমার মধ্যে যে দাহ আছে সে তো তুমি জান। তুমি নিজেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তুমি আমায় সইতে পারবে না। প্রীতির স্নিগ্ধ স্নেহই তোমার পক্ষে মঙ্গল। তোমাকে যে ভালবাসি সে কথা কি আজ নতুন ক'রে বলতে হবে? তবু দেখেছ তো যে যখনি আমার কাছে এসেছ তখনি পরস্পরকে ব্যথা দিয়েছি।

আমি তার চোখে চোখ রেখে বল্লাম, আমাদের মধ্যে যে সংঘাতের কথা বলছ সেটার কারণ তো জান। ভালবাসায় আমরা পরস্পরকে আত্মদান করতে পারি নি—কেবলি আত্মরক্ষা ক'রে এসেছি। তুমি আমার হও, আমিও তোমারই হব যখন, তখন এ দ্বন্দ্ব আর থাকবে না। এ বিরোধের একমাত্র কারণ আমাদের পরস্পরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ।

হুমায়ুন কবির

দীপ্তি হাসল, বল্ল, তোমার কথা সত্য ব'লে মানি। তোমাকে পেলে আমার জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে সে-কথা জানি। নিবিড় ক'রে তোমাকে পাওয়ার পরে জীবন যদি আমার মরুভূমি হ'য়ে যায় তবু আমার খেদ থাকবে না। কিন্তু সে তো আর হয় না, বন্ধু। অদৃষ্টের সুতোয় পাক খেয়ে গেছে। এখন সে গ্রন্থি আর খোলা যাবে না। হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে ফেলে আজ মুক্তি পেতে হবে। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।

আমি অবাক নয়নে তার দিকে চেয়ে রইলাম। ধূপছায়া সাড়ী তার তেজোময় মুখখানিতে অপূর্ব্ব আভা এনে দিয়েছিল—স্নিগ্ধ নয়ন প্রেমের কিরণে পরিপূর্ণ ক'রে সে আমার দিকে চেয়ে বল্ল, আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছ না ?

আমি তার হাতদুটি বুকে টেনে নিলাম। বল্লাম, আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি। আমাদের মিলনে কেউ বাধা দেবে না—দিতে চাইলেও পারত না। তবে কেন তুমি এমন ক'রে নিষ্ঠুর প্রাণে আমায় ছেড়ে চ'লে যেতে চাও ?

সে সঙ্কোচে আমার বুকের একান্ত কাছে এসে দাঁড়াল। আমি বাহু দিয়ে তাকে ঘিরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলতে লাগল, তোমার বিরহে কি আমি বেদনা পাইনি ? তুমি কলকাতা থেকে চ'লে এলে, আমার সমস্ত জীবন যেন মরুভূমি হ'য়ে গেল। দার্জ্জিলিংয়ে যখন এসেছিলাম তখন প্রথম ভেবেছিলাম যে তোমার কাছে এবার ধরা দেব। এমন ক'রে তোমাকে আঘাত দিয়ে নিজেকেও কাঁদব না। কিন্তু এখন তো সে আর হবে না। প্রীতি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে। আমি যদি তোমাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই তবে সে আঘাত সে সইতে পারবে না। মুখে সে কিছুই বলবে না জানি, খুসীই হ'তে সে চাইবে, কিন্তু বুকের মধ্যে যখন আগুন জ্বলে তখন হাসি দিয়ে কি তাকে আর চেপে রাখা যায় ? তুমি ওকে বিয়ে কর, তোমরা সুখী হবে। আমি তো তখন তোমার গুরুজন হ'ব, তোমায় আশীর্ব্বাদ করব, ভাগ্যমন্ত হও !

শেষের দিকে চাপা হাসিতে তার কণ্ঠস্বর তরল হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি আমার বাহুবন্ধন আরো একটু নিবিড় ক'রে বল্লাম, এখনই কেন আশীর্ব্বাদ কর না আমাকে ? যে আশীর্ব্বাদ আমি চাই সে তো তুমি জান, আর তুমিই কেবল দিতে পারো। ছিনিয়ে নেবার অভ্যাস তোমার আছে কি না জানি না। কিন্তু আমি তো কারো সম্পত্তি নই যে আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রেই এমন ক'রে আমাকে প্রীতির অধিকারী সাব্যস্ত করলে। তুমি ভুল বুঝেছ। প্রীতি আমাকে বোনের মত ভালবাসে। সে তোমার কথা জানে আর জেনেই তো সে তোমাকে আসতে চিঠি লিখেছিল।

দীপ্তি বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ল, বল্ল, তুমি প্রীতিকে বোঝনি, অথবা বুঝেও না বোঝার ভাণ করচ। আমি এত বড় স্বার্থপর হ'তে পারব না। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমার জীবন বোধহয় আমি ব্যর্থ ক'রে দিলাম, কিন্তু এ কথা জেনো যে তুমিই আমার প্রিয়তম—চিরদিন তুমিই আমার প্রিয়তম থাকবে।

আমি হতাশ কণ্ঠে বল্লাম, দীপ্তি, তাই কি হবে ?

কান্নায় আমার বুক ভ'রে এলো। দেখলাম তার চোখের কানায় কানায় জল। বল্ল, বন্ধু, এ আমাদের অদৃষ্টের পরিহাস। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

আমি নীরবে তাকে আরো কাছে টেনে নিলাম। তার মুখের ওপর মুখ রেখে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, হঠাৎ সে চমকে উঠে বল্ল, এবার ছেড়ে দাও। ফিরে যেতে হবে, কিন্তু ফেরার পথ যে বড় কঠিন।

তার দিকে চেয়ে করুণায় বুক ভ'রে গেল। বল্লাম, যাদের প্রতি ভগবানের করুণা, তাদের পথ কোন দিন সহজ হয় না। তোমার কঠিন পথে তুমি চলতে পারবে, কিন্তু আমার বোঝা কি আমি সইতে পারব ?

সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্ল, সইতে পারবে, খুব সইতে পারবে। তুমি না সইলে বেদনার ভার কে সইবে ? তোমার পথ সহজ হোক বলব না—কঠিন পথে চলবার কঠোর গৌরব তোমার হোক।

আমি আবার তাকে বুকে টেনে নিলাম। এক মুহূর্ত্ত স্থির থেকে সে বল্ল, এবার তবে বিদায়। আমার পথে

তুমি আর এসো না--কাছে এলে আমরা দুজনেই এ ব্যবধান সইতে পারব না। যদি আমার কোন দিন দরকার হয় তোমাকে ডাকব, তুমিও যখন তোমার দরকার হবে অসঙ্কোচে আমাকে ডেকো। আমি যেখানে থাকি আসবই।

সে চ'লে গেল। সন্ধ্যা-আকাশের রক্ত-রেখার দিকে তাকিয়ে আমি একা ব'সে রইলাম। পশ্চিমের অস্তরাগ কখন যে মুছে গেল, নিশীথিনীর মৌন যবনিকায় আকাশ বাতাস ঢাকা পড়ল জানিনে।

সহসা চম্‌কে দেখলাম, কৃষ্ণা পঞ্চমীর ক্ষীণ বঙ্কিম চাঁদ পাণ্ডুর লোহিত আভায় আকাশকোণে দেখা দিয়েছে। জনহীন পথ, নিদ্রিত পুরী। হতাশা গৌরবগরবদীপ্ত হৃদয়ে কেমন ক'রে যে বাড়ী ফিরে এলাম বলতে পারব না।

তারপরে আর কোন দিন প্রীতি বা দীপ্তি কারু সঙ্গে দেখা হয়নি। তবু ভরসা ক'রে ব'সে আছি যে দীপ্তি একদিন আমাকে ডাকবেই—সেদিনের প্রতিক্ষায় আমার সমস্ত জীবন উন্মুখ।

গোধূলি

শ্রীমাখনমতী দেবী

কে তোমারে পরিয়ে দিল
সন্ধ্যা তারার টিপটি মরি,
আদর ক'রে ললাটপটে
খণ্ড শশীর দীপটি ধরি।
সান্ধ্য মেঘের রঙিন নায়
কে তুই এলি মৃদুল বায়
উড়িয়ে দিয়ে মহা ব্যোমে
মাথার চারু নীলাম্বরী ?
উড়িয়ে পায় পথের ধূলি
গৃহপানে আস্‌ছে ধেনু ;
রাখালবালক উৎসাহেতে
ফিরছে ঘরে বাজিয়ে বেণু।
অরুনিমা ধূপ গোধূলি
বেণুরবে দিক উজলি'
অতীতের এক কোনও কালে
এই রূপেতে ফিরত হরি ॥
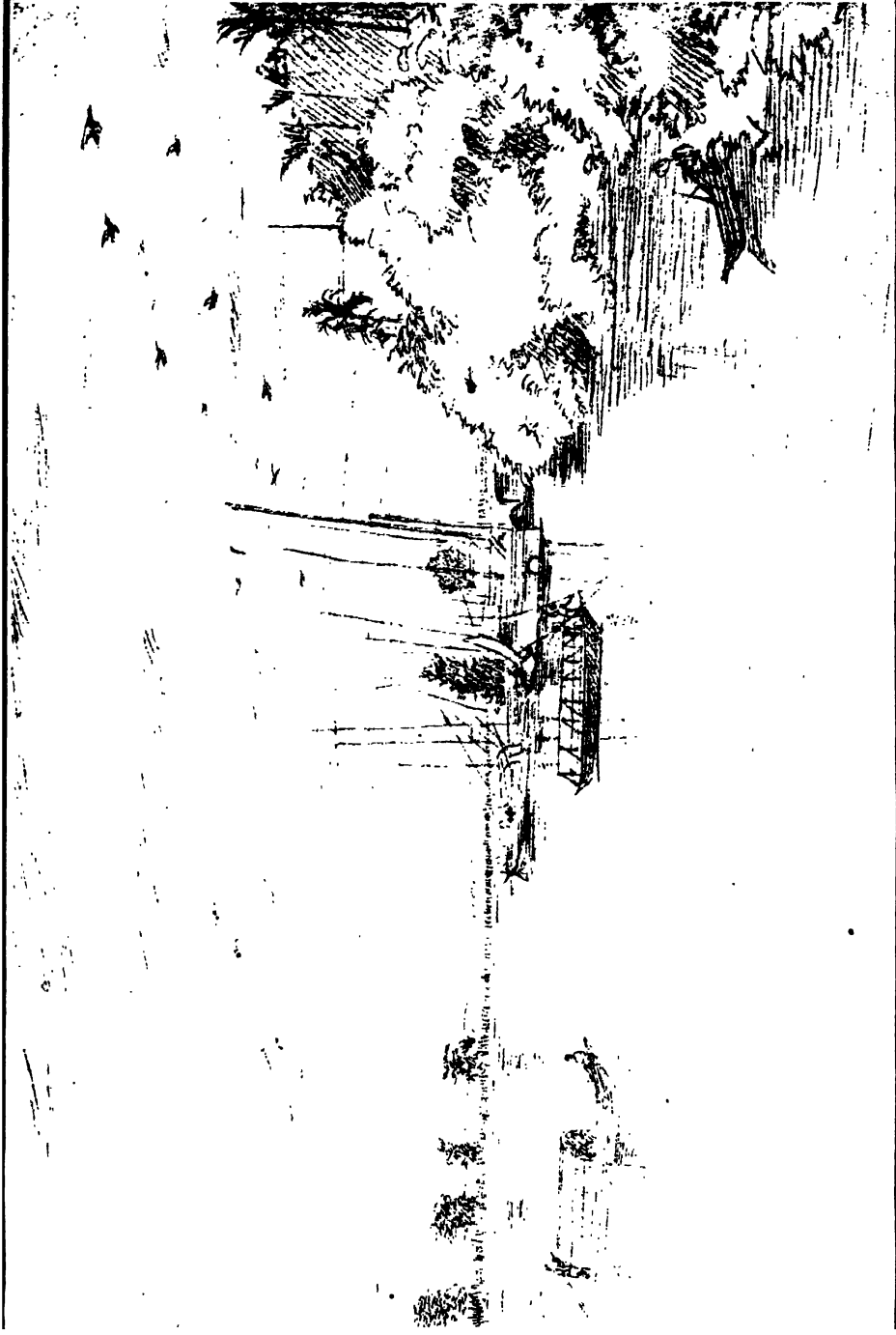
খেয়া-ঘাট, তিপকাই নদী, আসাম

শিল্পী—ডি, দত্ত

গুজরাটি ও বাঙ্গলা সাহিত্য

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী

প্রাচীন যুগ

পূর্ব্ব ভারতের বাঙ্গলা সাহিত্য ও পশ্চিম ভারতের গুজরাটি সাহিত্যের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, বিশেষত প্রাচীন যুগে, তাহা প্রণিধানযোগ্য, সাদৃশ্য কেবল ভাবে ও রীতিতে নহে, এমন কি উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশেও পরিলক্ষিত হয়। উভয় ভাষার প্রাচীন যুগ বলিতে তাহাদের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বুঝায় এবং আমাদের আলোচ্য বিষয় এই সীমাদ্বয়ের মধ্যে বদ্ধ থাকিবে।

ভারতীয় ভাষার মধ্যে কেবল গুজরাটি ভাষার গৌরব করিবার একটি বিষয় এই যে ভাষাটির উৎপত্তির ইতিহাসে কোথাও ফাঁক নাই কিংবা কোন একটা স্তর অস্পষ্ট নহে। নদীর মত এই ভাষাটি ভারতীয় সংস্কৃতজ ভাষা-সমূহের উৎস সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত। নদীসৈকতে স্বর্ণরেণুর ন্যায় অনেক বৈদিক শব্দ ও ভাষার স্রোতে প্রবাহিত হইয়া প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যুগে রূপান্তরিত হইয়া গুজরাটি ভাষায় স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসে স্রোত কোথাও প্রবলা, কোথাও ক্ষীণকায়া আবার কোথাও লুপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বহুদূরে দেখা দেয়। এই বাঙ্গলা ভাষার অপভ্রংশ যুগের চিহ্ন খুবই কম পাওয়া যায়, সুতরাং অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে রূপান্তরিত হইয়া হঠাৎ বাঙ্গলা ভাষায় দেখা দেয় কিন্তু অপভ্রংশ যুগে ঐ শব্দটি কি আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

মুখ্যত অপভ্রংশ ভাষা হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি। সৌরসেনী অপভ্রংশ কখন যে ধীরে ধীরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে গুজরাটি ভাষায় পরিণত হইল তাহা অনুসরণ করা দুষ্কর। প্রায় দশম শতাব্দীতে চারণগণ গুজরাটের রাজপুত রাজন্যবর্গের স্তুতিগান অপভ্রংশ ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করে এবং জৈন সাধুগণ জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উক্ত ভাষায় 'রাস' রচনা করেন। প্রচারের জন্য এই 'রাস' রচিত হইত বলিয়া জনসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য তাহাদের ভাষাতে সে সময়ে প্রচলিত দেশীয় শব্দের অনেক প্রয়োগ হইত। এই অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে ভাবী গুজরাটি ও মাড়ওয়াড়ি প্রভৃতি ভাষার আগমন ঘোষিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত সমসাময়িক "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"র ভাষা সম্বন্ধে যেমন বাঙ্গলার পণ্ডিতমণ্ডলের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায় সে রকম এই 'রাসের' ভাষা সম্বন্ধেও গুজরাটি পণ্ডিতসমাজে মতবৈষম্য দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে এই 'রাসের' ভাষা খাঁটি গুজরাটি, আবার কাহারও মতে গুজরাটি নহে তবে গুজরাটি ভাষার উন্মেষকালীন চিহ্ন ইহাতে বর্ত্তমান অর্থাৎ ইহা গঠন যুগের ভাষা। ভাব ও ভাষার অস্পষ্টতানিবন্ধন অনেকে "বৌদ্ধগান ও দোঁহার" ভাষাকে সান্ধ্যভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'রাস' সাহিত্যের ভাষাও সে সান্ধ্য যুগের ভাষা। 'রাস' সাহিত্যের নমুনা হিসাব নিয়ে দুইটি পদ উদ্ধৃত হইল।

"কাতী করবত কাপতাঁ বহিলউ আব্‌ই ছহ।
নারী বিধ্যা টলবলহ, জাজীব্‌হ তা দহ ॥"

ছুরিকা কিংবা করাত দিয়া কাটিলে শীঘ্রই মৃত্যু হয়। নারী দ্বারা যে বিদ্ধ হইয়াছে সে যাবজ্জীবন দগ্ধ হয়। "কাপতাঁ" শব্দটি গুজরাটি "কাপবুঁ" (কর্ত্তন করা) ক্রিয়ার বর্ত্তমান কৃদন্ত এবং "আব্‌ই ছহ" হইতে গুজরাটি ক্রিয়া "আবে ছে"র (আসিতেছে অর্থাৎ মৃত্যু আসিতেছে) উৎপত্তি হইয়াছে।

এই 'রাস' সাহিত্যের ভাষার কুক্ষিতে গুজরাটি ভাষা

গর্ভশয্যায় শায়িত ছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার স্পন্দন দেখা যাইতেছিল। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক গুজরাটি জৈন "মুগ্ধাব্‌বোধ মৌক্তিক" নামে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ দেশীয় ভাষায় প্রণয়ন করেন। মাতা এবং সন্তানের মধ্যে অবয়বের যে সাদৃশ্য থাকে, এই উভয় ভাষার মধ্যে সে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই ব্যাকরণের ভাষা অপভ্রংশও নহে, আধুনিক গুজরাটিও নহে। এই ব্যাকরণের ভাষাটি 'রাস' সাহিত্যের অপভ্রংশ ও নরসিংহ মেহেতার সময়কালীন গুজরাটি ভাষার সংযোজক। এ যাবৎ বৈষ্ণব যুগের আদি কবি নরসিংহ মেহেতা গুজরাটি সাহিত্যের জনক বলিয়া অভিহিত হইত কিন্তু এই 'রাস' সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে নরসিংহ মেহেতাকে সে পদবী হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব যুগের পূর্ব্বে গুজরাটি সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অথচ এ যাবৎ উপেক্ষিত অংশের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সে অংশটি হইতেছে কাথিওয়াড়ের লৌকিক সাহিত্য—গীতিকা (Ballads) ও "ভডলী বাক্য"। "ভডলী বাক্য" ও গীতিকাগুলির এ পর্য্যন্ত সন তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আমার মনে হয় ইহাদের অনেকগুলি বৈষ্ণব যুগের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের "খনা"র বচনের ন্যায় গুজরাট প্রদেশে-ও "ভডলী বাক্যে"র বহুল প্রচলন আছে। খনা ও ভডলী উভয়েই স্ত্রীলোক। বাঙ্গলা দেশের খনার বচনের রচয়িত্রী যেমন খনা নহে, এই গুজরাট প্রদেশের (কাথিওয়াড়) "ভডলী বাক্যে"র রচয়িত্রীও ভডলী নহে। এই সব বাক্য ও বচন কৃষকদের বহুযুগের সঞ্চিত কৃষিবিদ্যার অভিজ্ঞতার ফল। প্রকৃতির অবস্থাভেদে শস্যের ও সমস্ত বৎসরের ফলাফল দুই একটি পদে ব্যক্ত হইয়াছে এবং কার্য্যকালেও এই সব বাক্যের সত্য উপলব্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের খনার বচনে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বৌদ্ধ যুগের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার মতে সেগুলির রচনাকাল ৮০০—১২০০ শতাব্দীর মধ্যে। এই সব "ভডলী বাক্যে" বৌদ্ধ কিংবা কোন জৈন প্রভাব দৃষ্ট হয় না এবং কতকগুলি শব্দ যে দুরূহ তাহা প্রাচীন বলিয়া নহে, প্রাদেশিক এবং রূপান্তরিত বলিয়া। কৃষি যে-দিন দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সে-দিন হইতে এই সব বাক্য ও বচন রচিত হইতেছিল এবং লোকমুখে অধিক প্রচলনহেতু ভাষার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ একটি "ভডলী বাক্য" নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রাব্‌ন পহেলাঁ পাঁচদিন, মেহ ন মাঁডে আল।
পিয়ু পধারো মালবে, হমে ডাগুঁ মোসালে॥"

শ্রাবণের পাঁচদিন পূর্ব্বে যদি বৃষ্টি আরম্ভ না হয়, প্রিয়! তুমি মালবে যাইও, আমি বাপের বাড়ী যাইব (অর্থাৎ বৃষ্টি হইবে না সে জন্য শস্যাদির অভাবে দুর্ভিক্ষ হইবে।)

কাথিওয়াড়ের লৌকিক সাহিত্যের অন্য অংশ হইতেছে "গাথা" সাহিত্য (Ballads)। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই নগর হইতে বহুদূরে পল্লীগ্রামে একপ্রকার লৌকিক গীতিকার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি "গীতিকা" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কাথিওয়াড় প্রদেশে এইপ্রকার অনেক "গীতিকা" বন্য কুসুমের ন্যায় সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া আছে—কেহই তাহাদিগকে ভারতীর চরণ-যুগলে অঞ্জলি দিবার উপযুক্ত মনে করে নাই। নগরের দূষিত বায়ু হইতে বহুদূরে পল্লীগ্রামে অজানা কৃষাণ-কবিদের হৃদয়-রস আহরণ করিয়া তাহারা পরিপুষ্ট, কবে কোন অজ্ঞাত দিবসে কোন অজানা কৃষক-কবির দ্বারা রচিত হইয়াছিল ইতিহাস তাহার খবর রাখে না। কৃষাণদের সুখের দুঃখের গীতি, রাজপুতকুলতিলকদের শৌর্য্য-গাথা, প্রেমিক প্রেমিকার বিচ্ছেদের মেঘদূত, এই সব গীতিকা আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত ভাবরাশিকে আলোড়িত করে। প্রাচীন কাথিওয়াড়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান এই সব গাথার মধ্যে এত প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে যে কাথিওয়াড়ের ইতিহাস প্রণয়নকালে তাহাদের দান অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদিও অনেকগুলি গাথার সময় নির্দ্দেশ করা দুষ্কর, তথাপি দুই একটির রচনার সময় সহজে ধরা যায়। অনহিলওয়াড় পাটনের রাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক রাণকদেবীর হরণবৃত্তান্ত নিয়া যে গীতিকাটি রচিত হইয়াছে তাহা দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সিদ্ধরাজ জয়সিংহের

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী

রাজত্বকালে একাদশ শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সুতরাং দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হওয়া সম্ভব। এইপ্রকার একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক গীতিকা রচিত হইয়াছিল, এখনও কাথিওয়াড়ের ঘাটে, মাঠে কৃষকেরা দল বাঁধিয়া এই সব অতীতের গীতিকা গাহিয়া থাকে।

এই আলো আঁধারের যুগে গুজরাট তন্দ্রাভিভূত। নরসিংহ মেহেতা ও মীরাবাঈয়ের বন্দনাগানে গুজরাটের হৃদয়ে দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল—জাগিয়া উঠিয়া দেখিল নরসিংহ মেহেতা ও মীরাবাঈ প্রমুখ গুজরাটবাসী কৃষ্ণকীর্ত্তনে মত্ত, কী যেন নব জীবনের সাড়া পাইয়া আনন্দে মাতোয়ারা। পুরাতনকে বিদায় দিয়া নরসিংহ মেহেতা ও মীরাবাঈ উদীয়মান সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া গুজরাটের নব উদ্বোধনগীতি আরম্ভ করিল। ঠিক সে সময়েই বাঙ্গলা দেশেও চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি * পুরাতনকে বিদায় দিয়া নব বাঙ্গলার উদ্বোধনগীতি গাহিয়াছিল—ভক্তিধারায় বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। প্রাচীন গুজরাটি ও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এই কবি চতুষ্টয়ের একই স্থান। বাঙ্গলার চণ্ডীদাস খাঁটি বাঙ্গালী, গুজরাটের মেহেতা খাঁটি গুজরাটি। বাঙ্গলায় বিদ্যাপতি ও গুজরাটে মীরাবাঈ উভয়েই বিদেশী। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীরাও যেমন দাবী করিতে পারে, সে রকম মেবারের মীরাবাঈকে গুজরাটবাসীরাও দাবী করিতে পারে। নরসিংহ মেহেতা ও মীরাবাঈ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি, সুতরাং আমাদের আলোচ্য সময়ের বহির্ভূত। সে জন্য বিস্তারিত ভাবে তাহাদের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রাচীন এবং নবীনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া একের বিদায় এবং অপরের আহ্বানগীতি গাহিয়াছিল বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইল। ভবিষ্যতে গুজরাটি ও বাঙ্গলা সাহিত্যের বৈষ্ণব যুগের তুলনামূলক সমালোচনায় তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

* বিদ্যাপতি কবি হইলেও তাঁহার মৈথেলি ভাষায় রচিত গানগুলি বঙ্গদেশে লোকমুখে মিথিলার বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে। সে জন্য তাঁহাকে বাঙ্গলার কবি বলিলাম।
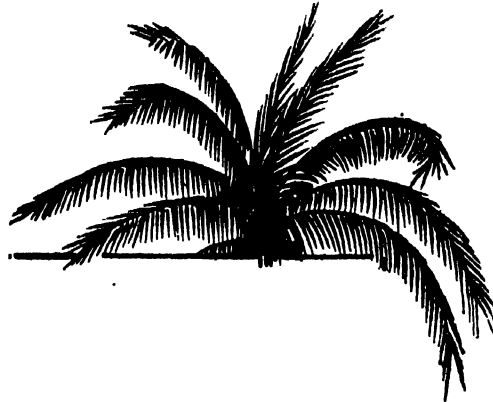
১৮

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্ক ভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মত বুকে আট্‌কাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল ও দুদিক হইতে দুটা কি, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্য্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভাল করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্ব্বেই।

কিন্তু তাহার দেখিবার অবকাশও ছিল না—একবার চাহিয়া দেখিয়া ভাবিল—দ্যাখো দিকি যত উদ্‌ঘুট্টি কাণ্ড ঐ ছেলেটার—পথের মাঝখানে আবার কি একটা টাঙিয়ে রেখেছে—

অল্প খানিক পরেই অপু বাড়ী আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না- এ কি! বারে? আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়। ককৃখনো কেউ নয় ঠিক মা। বাড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্তমনে কাঁটাল-বীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রাদলের অভিমন্যুর মত ভঙ্গিতে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশীর সপ্তমের মত রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্ট সুরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট ক'রে ছোটা গুলো বুঝি বন বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি? সর্ব্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস্? কি হয়েচে—

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত পা ছ'ড়ে যায় নি বুঝি?—

—কি বলে পাগলের মত? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে? আমি এত কষ্ট ক'রে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম, আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদ্‌ঘুট্টি কাণ্ড ছাড়া তো একদণ্ড থাকো না বাপু?—পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েচে—কি জানি টেলিগিরাপ কি কি গিরাপ—আস্‌চি তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি করবো বলো—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে তাহার মা তাহাকে ভাল বাসে অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেক দিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর, পাষাণীরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় রাজুগুরু

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মশায়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চ লতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল...এখুনি রেল রেল খেলা হইবে সব ঠিক ঠাক আর কি না...

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানোর মত কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কখ্খনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে রাজা ক'রে দেবেন কিনা ? এদিকে তো রান্না নামাতে ভস সয় না—না খাবি যা দেখবো খিদে পেলে কে খেতে দ্যায় ?

বাস্! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি, তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁটাল বীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায় ? সে যেন কর্পূরের মত উবিয়া গেল ! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ী ঢুকিতে দরজার কাছে কাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত সুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস্ অমন ক'রে—কি হয়েচে ও অপু শোন্—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হ'য়ে গেল—কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আস্চি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে ? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়িচি ? তাই ছেলের রাগ আমি ভাত খাবো না—না খাস্ যা ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা ?

মাতা পুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়—সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্ক মুখে উদাস নয়নে ওপাড়ায় পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আম গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিত, তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশ ত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল কিছুই বাকী নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার। বনের দিকটায় তার খাটানোর সময় কেবলই মনে হইয়াছে যদি বেশী ছোটা পাওয়া যায়, তবে সে এগাছে ওগাছে বাঁধিয়া বাঁধিয়া তাহার তারকে পাঠাইয়া দিত দূর হইতে বহু দূরে, একেবারে ওই বাঁশবনের ভিতর দিয়া কোথায়। বনের নিবিড় গাছ-পালাকে জয় করিয়া তাহার খেলাঘরের রেল-লাইনের তারটা সত্যিকারের টেলিগিরাপের মত নিরুদ্দেশযাত্রা করিত এই বাঁশবন, কাঁটাঝোপ, শিশিরসিক্ত, অজানা সবুজ বনের ভিতর দিয়া দিয়া। সে সতুদের বাড়ী গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ীর উঠোনে, চল রেল রেল খেলা করি—আস্‌বে ?

—তার কে টাঙিয়ে দিলে রে ?

—আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল—তুই খেল্‌গে যা আমি এখন যেতে পারবো না—

অপু মনে মনে বুঝিল বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে ? তাহাদের বাড়ীটা গ্রামের এক প্রান্তে, নির্জ্জন বাঁশবনের মধ্যে, কেই বা সেখানে খেলিতে আসিবে ? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে ? তুমি আমি আর দিদি খেল্‌বো এখন ? পরে সে প্রলোভন-জনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবী নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে ?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিয়াছিল—এত করিয়া বলিয়াও সতু-দা শুনিল না।

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিষপত্রের যোগাড়ে

বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশী রাখে—দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে আলুর ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল—চিনি কিসের কর্‌বি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভাল বালি আছে—মা চাল ভাজা ভাজ্‌বার জন্য আনে?...সেই বালি চল্ আনি গে—সাদা চক্ চক্ করচ্ছে—ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন চট্‌কা গাছের আগ্‌ডালে একটা বড় লতা উঠিয়া সারা মাথাটা যেন চক্ চকে সবুজ পাতার থোকা করিয়া ফেলিয়াছে—তাহারই ঘন সবুজ আড়ালে টুক্‌টুকে রাঙ্গা, বড় বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে! অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। এ রকম ফল তাহারা জীবনে কখনো দেখে নাই তো! অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল নীচের দিকে লতায় খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িল। মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া ফলগুলি মাটি হইতে তাহারা তুলিয়া লইল। খাসা তেল চুক্‌চুকে, তুমি হাত দাও, তোমার সারা দেহ যেন সুস্পর্শ মসৃণতায় শিহরিয়া উঠিবে! কি সুন্দর ফলগুলা?...

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জা উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে খরিদদার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় দরজা দিয়া সতুকে ঢুকতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, গ্যাখোনা কি রকম দোকান হয়েচে কেমন ফল এই গ্যাখো—আমি আর দিদি পেড়ে আন্‌লাম—কি ফল বলো দিকি? জানো?...

সতু বলিল—ও তো মাকাল ফল—আমাদের বাগানে ক-ত ছিল।...

সতু আসাতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতু-দা তাহাদের বাড়ীতে তো বড় একটা আসে না—তা ছাড়া সতু-দা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলায় ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু,আমার কাল পুতুলের বিয়ের পাকাদেখা, অনেক লোক খাবে—

অপু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বৈ কি? তোমরা তো হোলে কনে-যাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো ক'রে নিয়ে যাবো—সতুদা রানুকে বল্‌বে আজ রাত্তিরে একটু চন্দন বেটে রাখে?—সত্যিকারের চন্দন কিন্তু—সেই যেমন পুনিপুকুরের দিন ক'রে রেখেছিল—কাল সকালে নিয়ে আস্‌বো—

অপু বলিল—এক কাজ কর্‌বি দিদি—কাল তোর পুতুলের বিয়েতে সন্দেশ তৈরী কর না কেন? নেড়াকে ডেকে নিয়ে এসে—নেড়া দেখিয়ে দেবে এখন—

দুর্গা বলিল—নেড়া না দেখিয়ে দিলে বুঝি আমি আর গড়্‌তে পারব না—কাল সকালে দেখিস্ এখন—মাটি বেশ ক'রে জল দিয়ে মেখে আমি কত কি গ'ড়ে দেবো—মেঠাই, নারকোলের সন্দেশ, পাঠাইল—পণ্যের মধ্য হইতে দোকানের রক্ষিত বিক্রয়ার্থ দুর্গার কথা ভাল করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু কি একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও ওরে দিদিরে—নিয়ে গেল রে—বলিয়া তাহার রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চীৎকার করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল!

বিস্মিত দুর্গা ভাল করিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে খেলা-ঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই।...

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল সতু গাব-তলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে ৩।৪ বৎসরের বেশী, তাহা ছাড়া সে অপুর মত ও রকম ছিপ্‌ছিপে মেয়েলি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গড়নের ছেলে নয়—বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা ও শক্ত—তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে—তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল -সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণ ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চাল্‌তেতলার পথে গিয়া পড়িল।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজাইয়া একটু সাম্‌নের দিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে—দুর্গা বলিল—কি হয়েচে রে অপু ?

অপু ভাল করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দু'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধূলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি—চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নে রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর্-সর্ দেখি—ওরকম ক'রে চোখ রগড়াস্ নে— দেখি ?—

অপু তখনি দুহাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উহু ও দিদি—চোখের মধ্যে কেমন কচ্ছে—আমার চোখ কানা হ'য়ে গিয়েচে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম ক'রে চোখে হাত দিস্‌নে—সর্—পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল—দুর্গা তাহার দুই চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ?—আচ্ছা তুই বাড়ী যা—আমি ওদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব ব'লে দিয়ে আস্‌চি—রানুকেও বল্‌বো—আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো—তুই যা—আমি আস্‌ছি এখ্‌খুনি—

রানুদের খিড়্‌কি দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাকুরুণকে সে ভয় করে—খানিকক্ষণ খিড়্‌কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি একটুখানি সাম্‌নে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অত সাধের ফলগুলি গেল...তাহা ছাড়া আবার চোখে ধূলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিস্ নে অপু—আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়—চোখে কি আর ব্যথা বাড়্‌চে ?···দেখি কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস্ ?

১৯

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেক দিনেব জীর্ণ পুরাতন কোটা বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিষপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রংএর সেকালের বেতের পেঁট্‌রা, কড়ির আল্‌না, জল চৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই,তাকে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ী কলসী আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব শুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিষের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ তাহা সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে সে ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আল্‌না ছিল, ঐ ঠাকুর দাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলে মেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে কতকাল আগে!

যখন সে একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য

উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। কাঠের সিন্দুকটার উপর তাহাদের বড় ধামাটা উপুড় করিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া ঘরের আড়ার সর্ব্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোসে যে তাল-পাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক একদিন বনের ধারের জানালাটায় বসিয়া দুপুর বেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারত খানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত আর মার মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলি বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজ্‌লিসে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো? বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণ পরিচয় ছিঁড়্‌লে বাপু, শুনলে বিশ্বেস করবে না, এখনো ভাল ক'রে অঙ্ক চিন্‌লে না—বাপের ধারা পেয়ে ব'সে আছে—ঐ যে ক'দিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুঁজ্‌লেই লাঙলের মুঠো ধর্‌তে হবে। পুত্রগর্ব্বে হরিহরের বুক ফুলিয়া ওঠে। মনে মনে ভাবে—ওকি তোমাদের হবে? কর্ল্লে তো চিরকাল সুদের কারবার!—হোলামই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেন নি, পুঁথি লিখে বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েচেন, সেটা যাবে কোথায়?

তক্তপোষের পাশেই জলচৌকিতে মায়ের টিনের পেঁট্‌রাটা। চিনে মাটির একরাশ পুতুল তার মধ্যে আবদ্ধ দুটা বড় বড় মেম পুতুল, একটা হাতী, একটা হরিণ, মায়ের বাক্স খুলিবার সময় সে দেখিয়াছে। চিনেমাটির পুতুলে তাহার মন তেমন টানে না কিন্তু তাহার দিদি সেগুলার জন্য একেবারে পাগল! কতদিন দুপুরে সকালে, সন্ধ্যায় বাড়ীতে যখন মা না থাকে, দিদি প্রলুব্ধ মনে মায়ের পেঁট্‌রার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, একবার দুজনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের আঁচল হইতে চাবির রিংটা খুলিয়া লুকাইয়া রাখিবে এবং—কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় নাই। অপু দিদিকে বুঝাইয়াছে যে বিবাহের পর সে যখন শ্বশুর বাড়ী যাইবে, সব চীনে মাটির পুতুলগুলা বাহির করিয়া মা তাহার পেঁট্‌রা সাজাইয়া দিবে, পাছে সে ভাঙিয়া ফেলে এজন্য এখন দেয় না।

তাহাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁসিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাঁট্-শেওড়া গাছের মাথাগুলা, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশবনের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চাল্‌তা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচেকার কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখীর নাচ। বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটুওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্য্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্ব্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর, ডাঁটা গলিয়া আসিল, মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝল্‌মলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য্য, রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠীর মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্য্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন, অসীম অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধুই এই রকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা দুলানো, থোলো বন-চাল্‌তার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা এক একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আসে।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা, পুরানো পুকুর আছে, তারই পারে যে ভাঙ্গা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোন্ সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেইরকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময় কি বিষয়ে সফলমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতেই রুষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্ত্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটা লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্ত্তী দস্তুর মত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্ব্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টস্বরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাউঠার মড়ক আরম্ভ হবে—ব'লে দিও চতুর্দ্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দ তলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর চোখের সাম্‌নে মেয়েটি চারিধারের শীত সন্ধ্যার কুয়াসায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার সে শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়ালেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা পাড় শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মত হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?

একটু পরে তাহার মনে হয় সে ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা—খুলিবার চেষ্টা করিবে। লেপের খোলে ছেঁড়া চেলির টুক্‌রায় বাঁধা চাবির গোছা থাকে, সে টানিয়া বাহির করে। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত অনেক খুটখাট্ করিয়াও কিছুতেই কোনো চাবিটাই সে লাগাইতে পারে না, অগত্যা চেলির টুক্‌রা যথাস্থানে রাখিয়া সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্ত মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুর বেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙ্-চিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রাম খানির অতীত ও বর্ত্তমান সমস্ত ছোটো খাটো দুঃখ সুখ শান্তি দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জ্জন আকাশপথে এক উদাস, গৃহ-বিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ। প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে, নির্জ্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব্ব খুসিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতা পাতার মধুর গন্ধভরা দিন গুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিন গুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দ্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন। এই অপরাহ্ণগুলির সঙ্গে

আজন্ম সাথী, সুপরিচিত এই আনন্দ-ভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন দেশের বার্ত্তা যে জড়ানো আছে! বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায় এক তরুণ বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া—কে প্রার্থী একজন তাহার অক্ষয় কবচকুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি-গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে 'দুধ খেয়েছি' 'দুধ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে,—ঐ যে পোড়ো ভিটার বেলতলাটা—ওই খানেই তো শরশয্যা শায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণ বাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জ্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা দশরথ মৃগভ্রমে যে জল-আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ঘটিয়াছিল ওই রানু দিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা?—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলা সব হলদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতা গুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে:—

অদূরে দেখিনু হ্রদ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নউরু!...

কুলুইচণ্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে যে পুরানো, মজা পুকুরের ধারে সে বন-ভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না—চারি ধারে বনে ঘেরা সেই ছোট্ট পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ঐ নির্জ্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভগ্নউরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তর মাঠের কলা বেগুনের ক্ষেত হইতে কৃপণেরা ফিরিয়া আসে কেউ থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত বসতিশূন্য, অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনামুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনো বা এক ভাগাহত, নিঃসঙ্গ, অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্দ্ধমান, উৎসুকমনের সহানুভূতিতে জাগ্রত সার্থক হয়। ঐ অজ্ঞাত নামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

তাহার বাবা বাড়ী নাই। বাড়ী থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়। একেবারে বেলা শেষ হইয়া যায় তবুও ছুটী হয় না। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না? বেলা বুঝি আর আছে? বাবার উপর ভারী রাগ হয়, অভিমান হয়। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটী হইয়া যায়। বই দপ্তর কোনোরকমে ঝুপ্ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুসিতে সে নাচিতে থাকে। অপূর্ব্ব অদ্ভুত বৈকালটা...নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর... গুলঞ্চ-লতার তার টাঙানো...খেজুর ডালের বাঁশ...বনের দিক থেকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়...রাঙা রোদটুকু জেঠামশায়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবী নেবু গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে...চক্‌চকে বাদামী রংএর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখী বনকলমী ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে...তাজা মাটির গন্ধ...ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছ্‌লিয়া ওঠে... কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ!

সন্ধ্যার পর সর্ব্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পুজোর আর কদিন আছে মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিল। বলিল—আর বাইশ দিন আছে না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ী আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল কাপড়, তাহার জন্য আল্‌তা।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। কতদিন যে সে কোথাও

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমন্ত্রণ খায় নাই! লুচি খাইতে কেমন, তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুটফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে বাঁশবনের আলো-ছায়ায় জাল-বুনানি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুড়ি ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত, বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁক বাজে, পথে লুচি-ভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুই দিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাকরুণ বলিয়াছিল—ভদ্দর লোকের মেয়ে আবার চাষা লোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খই মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি? ওসব দেখতে খারাপ...ওরকম আর পাঠিও না বৌমা,—সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল—মা তাস খেল্‌বে?

—তা যা ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয়—একটু খেলি—

দুর্গা বিষণ্ণমুখে অপুর দিকে চাহিল। অপু হাসিয়া বলিল—চল্ আমি দাঁড়াচ্চি—

তাহাদের মা বলিল—আহা হা, মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচিনে—সারাদিন বলে হেঁট্ মাটি ওপর ক'রে বেড়াবার বেলা ভয় লাগে না আর রাত্তিরে এঘর থেকে ওঘর যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট!

বধূদের বাড়ী হইতে আনা অপুর সেই তাস জোড়াটা। তাস খেলায় তিনজনের কৃতিত্বই সমান। অপু এখনও সব রং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে—এটা কি রুইতন—দ্যাখো না মা? পরে সে বলে—তাস খেল্‌তে খেল্‌তে সেই গল্পটা বলো না—সেই শ্যামলঙ্কার গল্পটা? খানিকটা খেলা অগ্রসর হইতেই সে হঠাৎ সরিয়া গিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলো না মা—সেই শামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায়ে কেশ? দুর্গা বলে—খেলার সময় ছড়া বল্‌লে খেলা হবে কি ক'রে—ওঠ্ অপু—

তাহার মা সস্নেহে বার বার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল—সেদিনকার সেই অপু—আয় চাঁদ আয় চাঁদ খোকনের কপালে টী-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বার বার কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝুঁকাইয়া দিত—সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার মায়ের কাছে দৃশ্যটা অপূর্ব্ব, বড় অভিনব ঠেকে।

দুর্গা বলে—আজ কি হয়েচে জানো না মা—বল্‌বো অপু? বলি?

তাহার মা জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েচে?...

—বল্‌বো অপু?...এই—

—যাঃ তা হোলে তোর সঙ্গে যা আড়ি করবো—ব'লে দ্যাখ্—

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদিকে সে আজকাল বড় ভালবাসে। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলা সতু-দা লইয়া পালাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল—কেমন হোলো তো এখন? বড্ড যে কাঁদ্‌ছিলি সকাল বেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে সে বেশী আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলা হইতে কি দিদির মুখের বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতা-ভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

—ছক্কার খেলা অপু বুঝে সুজে খেলিস্?—দুর্গা মহাখুসির সহিত তাস কুড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।...

—কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে না দিদি?

তাহাদের মা বলিল তাহাদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিম গাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা ওই ছাতিম তলায় একবার বাঘ এসেছিল—বলেছিলে না? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ যাঃ, ভাত পুড়ে গেল, ধরাগন্ধ বেরিয়েচে—ভাতটা নামিয়ে দাঁড়া বল্‌চি—

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতাল কোঁড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েছে মা? সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ। খেতে ঠিক মাংসের মত, না দিদি? পাতাল কোঁড়ে এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলিনে—উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত বাক্যে সর্ব্বজয়ার বুক গর্ব্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়ীতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজ ঠাক্‌রুণকে ডাকুক না দেখি একবার তাহাকে রান্না কাহাকে বলে সেজঠাকরুনকে সে—হাঁ। সর্ব্বজয়া বলিল—অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুগ্‌গা, ওকি ছেলের কাণ্ড? ঐ রাস্তার মাঝ খানে মুখ ধোয়? রোজই রাত্রে তুমি ওই পথের উপর—

অপু কিন্তু আর এক পাও নড়িতে চাহেনা, সম্মুখে সেই ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক অন্ধকার বাঁশবন ঝোড় জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঁঙের বিচির মত কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ী···বাঘ···আরও অজানা কত কি বিভীষিকা! সে বুঝিতে পারেনা যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের উপর আঁচানটাই কি এত বেশী?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচলাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্য রাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদের ম্লান জোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায় ডালে পাতায় চিক্‌চিক্ করে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্তে ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্য ভরা। শন্ শন করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া তেলাকুচো ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক একদিন এই সময় অপুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। সেই দেবী যেন আসিয়াছেন সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী। পুলিনশালিনী ইচ্ছামতীর ডালিমের রোয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠাণ্ডা কাদায়, কতদিন আগে যাহাদের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারই এক সময়ে ফুল ফল নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে? তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনও ভোলেন নাই।

গ্রাম নিশুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গশিশুদের দেখা শুনা করেন, জোৎস্না রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাক গুলি বুনো-ভাঁওরা নট্‌কান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইচ্ছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল পাপ্‌ড়ি কলমী ফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডাল পালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল।

তাঁর রূপে স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায় জোৎস্নায় সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ চক্রবর্ত্তীর পর আর তাহাকে কেহ কোনদিন দেখে নাই।

প্রথম খণ্ডের শেষ

(ক্রমশঃ)

লাইব্রেরী আন্দোলন

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

লাইব্রেরী আন্দোলন প্রধানত শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন। যাহাতে শিক্ষার বীজ জনসাধারণের মনে অতি সহজে বপন করিতে পারা যায় তাহার প্রচেষ্টা লাইব্রেরী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিক্ষিত সমাজে নানা রূপ চেষ্টা চলিতেছে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে অল্প আয়াসে লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে পারা যায়, তাহার জন্য সভ্য জাতি মাত্রেই এখন বিশেষ সচেষ্ট।

লাইব্রেরী প্রদর্শনী

কোন আদর্শ ধরিয়া কার্য্য করিতে হইলে তাহা একাকী করাও চলে, পরকে লইয়া করাও যায়। তবে যে কার্য্য পরকে লইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে একাকী তাহা লইয়া থাকিলে চলিবে না। যে আদর্শ সমাজের মধ্যে ফুটাইতে চাই, তাহা পরিপুষ্টির জন্য লোকমতের প্রয়োজন। যে প্রথা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার কামনা হৃদয়ে পোষণ করি, তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জনসাধারণের মধ্যে তাহার অভিব্যক্তি একান্ত বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরী আন্দোলন দেশের মধ্যে চালাইতে হইলে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যে কোন আদর্শ কোন এক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তাহা যেরূপ কার্য্যকরী হয়, স্বতন্ত্র চেষ্টায় সেরূপ ফল কামনা করা দুরাশা মাত্র। এই জন্য দেখা যায় সমবেত চেষ্টায় Froebelian Movementএর

কর্ত্তৃপক্ষগণ kindergarten পদ্ধতি দ্বারা বালক বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের চেষ্টা করিয়া ছিল। এই জন্য Shakespeare Society একত্র সমাবেশে অমরকবি শেক্ষপীয়রের গ্রন্থাবলী আলোচনার জন্য ও ইংলণ্ডের ষোড়শ শতাব্দীর গৌরবমণ্ডিত অতীতমহিমা জাগ্রত রাখিতে বিশেষ ব্যস্ত। আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশনও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিতেছে কিসে লাইব্রেরীর সাহায্যে আপামর জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ও আমেরিকা হইতে সংগৃহীত লাইব্রেরী আন্দোলন সম্বন্ধে গ্রন্থ ও চিত্রাদি

করা যায়। লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার জন্য আমাদের দেশেও গ্রন্থালয় পরিষদ্ (Library Association) বিশেষ প্রয়োজন।

বাঙ্গলা দেশে লাইব্রেরী আন্দোলনের সূত্রপাত অল্পদিন হইলেও বরোদা, মহীশূর, মাদ্রাস প্রভৃতি দেশে ইহা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "নিখিল ভারত গ্রন্থালয় পরিষদ্" নাম দিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় গ্রন্থালয়গুলির অবস্থা পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ দেশের মধ্যে লাইব্রেরী আন্দোলন চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারই অন্তর্ভূক্ত হইয়া বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ্ বাঙ্গলা দেশে লাইব্রেরীগুলির অবস্থার উন্নতিবিধান ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ভার লইয়াছে। যেখানে লাইব্রেরী বা গ্রন্থালয়ের সংখ্যা অল্প সে স্থানে গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা এবং যে স্থানে গ্রন্থালয় আছে, তাহার পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা গ্রন্থালয় পরিষদের কর্ত্তব্য। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, প্রতি জেলায় একটি জেলা গ্রন্থালয়পরিষদ্ স্থাপন করা অতীব আবশ্যক। ঐ জেলা গ্রন্থালয়ের কার্য্য হইবে জেলার মধ্যে কতকগুলি লাইব্রেরী বা রীডিং রুম আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা, তাহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া আর কোথায় কোথায় নূতন গ্রন্থালয় (Library) বা পাঠাগার (Reading Room) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করা। বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের অধীনে অধুনা চারিটি জেলা গ্রন্থালয় পরিষদ্

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

কার্য্য করিতেছে, একটি হুগলী জেলায়, একটি মৈমনসিংহে, একটি নোয়াখালিতে আর একটি ২৪ পরগণায়।

লাইব্রেরী আন্দোলন এই কথাই দেশবাসীকে জানাইতে চায় যে লাইব্রেরীগুলিকে শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে। পড়া শুনার চর্চ্চা, গবেষণার কার্য্য প্রভৃতি, যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান বলিয়া দিয়া সাধারণকে সাহায্যপ্রদান প্রভৃতি লাইব্রেরীর অন্যতম কার্য্য হওয়া উচিত। যাহাতে পাঠানুরাগ বৃদ্ধি পায়, সে জন্য নানা

মহারাজ্যের Library Department আমেরিকার মত, প্রত্যেক লোকের বাড়ী বাড়ী পুস্তক সরবরাহ করে। বিনা আয়াসে, বিনা পয়সায়, ঘরে বসিয়া যাহারা বই পায়, তাহারা বই না পড়িয়া ছাড়ে না। এই রূপে ক্রমশ পাঠের নেশা জমিয়া গেলে, তাহারা আপনই পুস্তকপাঠের ব্যবস্থা করিবে এবং ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া, পুত্র কন্যাদের পুস্তকপাঠে উৎসাহ দিবে।

মহীশূর রাজ্যের সাধারণ লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আরও

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

প্রকার চিত্তাকর্ষক ছবি, chart, map, motto বরোদা-রাজ্যের লাইব্রেরীগুলির দেওয়াল পরিশোভিত করিয়া থাকে। যেন তাহারা অলক্ষ্যে পাঠক পাঠিকার হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সে mottoগুলি লাইব্রেরীর সভ্যদের নীরব ভাষায় বলিয়া দিতেছে—"যদি আনন্দ চাও, বই পড় আনন্দ পাইবে।" "যদি শিক্ষা চাও, বই পড় শিক্ষা পাইবে।" "যদি মানুষ হইতে চাও, বই পড় মানুষ হইবে।" বরোদা-

চমকপ্রদ। সেখানে লাইব্রেরীগুলিকে এরূপ একটি আকর্ষণের কেন্দ্র করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সকলেরই মন ঐদিকে আকৃষ্ট হয়। অতি সযত্নে ঐখানে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালোরের Central Public Libraryতে যে সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা আছে, তাহা অনেক লাইব্রেরীর আদর্শ হইতে পারে। তথায় আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রকার লোককে সুবিধা দিবার জন্য লাইব্রেরীটি এই কয়টি বিভাগে বিভক্ত:—পাঠাগার বা Reading

Room; Lending Section; Childrens' Department (তরুণ বিভাগ); Ladies' Department (মহিলা বিভাগ); Reference Section; এমন কি স্নানাগার ও ভোজনালয় পর্য্যন্ত মহীশূরবাসীদের শিক্ষাপ্রচারস্পৃহা এত প্রবল যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা Vernacular languageএর সাহায্যে শিক্ষা প্রচার করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন।

আমেরিকার লাইব্রেরী এসোসিয়েশন নানাপ্রকার পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধামত classificationএর পদ্ধতি এবং বিষয় অনুসারে পুস্তক-বিভাগ সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণামূলক পুস্তক তাহারা প্রায়ই প্রকাশ করে। এতদ্ভিন্ন প্রতি মাসে নূতন প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা পাঠাইয়া তাহাদের সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী-গুলিকে পুস্তকনির্ব্বাচনবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। লাইব্রেরীপরিচালনা সুকৌশলে সংসাধিত করিবার জন্য, নিয়মিতরূপে লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাহারা ঐরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারাই সাধারণ পাঠাগারে কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

প্রাচীন পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, এখনও দেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উচিত মত রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে, অল্পদিনের মধ্যে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের পাণ্ডুলিপি অতি সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত। ব্যক্তিবিশেষের যত্ন বা আগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া সাধারণ পাঠাগারগুলি যদি এ সকল সংরক্ষণের ভার লয়, তাহা হইলে অনেক অমূল্য গ্রন্থ কালের কবল হইতে রক্ষা পায়। কোথায় কোন গ্রামে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করা যেমন বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলি সাধারণের গোচর করিতে পারা বা পুনরায় প্রকাশিত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ততোধিক লোকহিতকর। এই সংবাদসংগ্রহ ও প্রকাশের ফলে গবেষণাকারী বিদ্বন্মণ্ডলী প্রয়োজন মত পড়াশুনা করিয়া সেইগুলি হইতে নানা তথ্য আহরণ করিতে পারেন। সেগুলি পুনঃপ্রচারে উহাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। নব জীবন লাভ

বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের লাইব্রেরী প্রদর্শনীর অন্তর্গত বরোদা-বিভাগ

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

করিয়া উহারা নানাবিধ জ্ঞান রত্নের অপূর্ব্ব আকরস্বরূপে জনসাধারণের অশেষ কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ, হস্তলিখিত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া ও সযত্নে সংরক্ষণ ও সুবিধামত প্রকাশ করিয়া, জ্ঞানবিস্তারকার্য্যে লাইব্রেরীগুলি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

লাইব্রেরীর কাজ পড়াশুনার নেশা জাগানো। যাহার যেদিকে রুচি সেই মত পুস্তক তাহাকে দিতে পারিলে, অধুনাতম শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ যাঁহারা সম্প্রতি Behaviourist আখ্যা পাইয়াছেন, তাঁহারাও এ সিদ্ধান্তের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। অতএব বুঝিতে পারা যায়, যুবকদের পাঠানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে, যে সকল পুস্তকে পূর্ব্ব-লিখিত প্রবৃত্তির বিশদ রূপে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি লাইব্রেরীতে সংগৃহীত করিতে পারিলে, যুবকের দল লাইব্রেরীর নেশা কোনও মতে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তিকে যদি লাইব্রেরীয়ান

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গৃহে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় কর্ত্তৃক প্রথম শিল্প-প্রদর্শনী

জনসাধারণ লাইব্রেরীর দিকে ছুটিয়া আসিবে। আত্মার সন্তুষ্টিবিধান যাহার নিকট হইতে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, মানব-মন সেই পরিমাণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যুবকহৃদয় কাব্যকলা, সাহসিকতা, উন্মাদনা, ভ্রমণেচ্ছা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মনোবৃত্তির অধিক বশবর্ত্তী বলিয়া মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মানব-মনের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া করা যায়, তাহা হইলে অনুসন্ধিৎসু আগন্তুকের পাঠেচ্ছা, লাইব্রেরীতে আসিলে, ক্রমশ বাড়িয়া যাইবে। কোন্ পুস্তকে কি কি সংবাদ পাওয়া যায়, সাধারণ ভাবে তাহা লাইব্রেরীয়ানের জানা যেরূপ প্রয়োজন, কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, কোন্ কোন্ পুস্তকের সাহায্য লইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, লাইব্রেরীয়ানকে তাহারও সদুত্তর দেওয়া চাই। সেইখানে লাইব্রেরীয়ানের কৃতিত্ব।

গীতাঞ্জলি

শ্রীনবেন্দু বসু

পরলোকগত অজিত চক্রবর্ত্তী তাঁর সমালোচনায় গীতাঞ্জলিকে কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ব'লে গ্রহণ করতে চান নি। তিনি বইখানিকে দেখেছিলেন বিশেষ ক'রে ধর্ম্মকাব্য বা Sacred Poetry ভাবে। কিন্তু এই সঙ্গীতসমষ্টিতে কাব্যরসের যে বৈচিত্র্য দেখ্‌তে পাই তা থেকে মনে হয় যে গীতাঞ্জলি বুঝি কবির কল্পনাকুসুমহারের উৎকৃষ্টতম পারিজাত। সে রস শুধু বিচিত্র নয়, বড়ই গুণসমৃদ্ধ। লেখার নাম দেবার অধিকার লেখকের নিজের। পাঠক সেই নামানুযায়ী পরিচয় গ্রহণ করতে বাধ্য। গীতাঞ্জলি নাম কবির দেওয়া, তবে গীতাঞ্জলি তুল্যপরিমাণে কাব্যকুসুমাঞ্জলিও বটে। গীতাঞ্জলির গানগুলিকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়; সঙ্গীতপ্রধান এবং কাব্যপ্রধান। ভাবের প্রেরণা এক হ'লেও গানগুলিতে কাব্যরূপগত পার্থক্য আছে। এই দুই প্রধান অংশের মধ্যে আবার ভাবের ঐক্য, সুর, আর রূপের বিভিন্নতা অনুসারে আরো সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপের বৈচিত্র্যই গীতাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য।

এ ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যে কবির কল্পিত বা আদিষ্ট তা বল্‌তে চাই না। তবে যেখানে বিশ্লেষণী সমালোচনায় রসগ্রহণের সহায়তা হয় সেখানে সেটার প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়। বিশেষত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কবির ভূমিকা এই :—"এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্ব্বে অন্য দুই একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।" ১৩১৭ সালের এই বিজ্ঞাপনই ১৩২১ সালে ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ গীতাঞ্জলিতে দেওয়া হয়েছে, এবং ঐ সংস্করণই এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

সঙ্গীত আর কাব্যের প্রকৃতি এবং রীতিগত পার্থক্য আলোচনা ক'রে দেখ্‌লে উপরোক্ত অংশবিভাগের সার্থকতা সহজেই বোঝা যায়। ধ্বনিরাজ্যে অবচ্ছিন্ন ভাবাবেগের নিরলম্ব মধুর বিকাশকেই সঙ্গীত বলি। কথার সাহায্যে চিন্তারাজ্যে সে ভাবের প্রকাশ হ'ল কাব্য। গানের লেখা কথাগুলি এই দুই রাজ্যের সংযোগস্থল। তবে লিখিত ভাষার সাহায্যে প্রকাশ পেতে হয় ব'লে সেই রচনা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা মেনে যেতে চায় না। কখন এদিকে কখন ওদিকে ঝোঁক দেয়। শ্রেণীবিভাগের এই ভিত্তি। আরো স্পষ্ট ক'রে বলি।

ভাবপ্রকাশের দিক থেকে গান কবিতার পূর্ব্বাবস্থা। অতএব সব গানের মধ্যে কবিত্ব না থাকতে পারে কিন্তু সব কাব্যের মধ্যে গানের অবস্থা নিহিত আছে। সঙ্গীতভাব কাব্যের প্রাণস্বরূপ। তাকেই পরিচ্ছদ দান ক'রে লিখিত আর পঠিত কবিতার সৃষ্টি। কবিতার মূর্চ্ছনা গানের সত্তার ভিন্নরূপ। কবিতার ছন্দ, মিল, গতি প্রভৃতিতে সে মূর্চ্ছনা বা সঙ্গীতভাব পরিস্ফুট হয়। ভাবমাত্রেরই প্রকাশকে সঙ্গীত বলি না। যে ভাবের উচ্চারণে আমাদের মনে একটা আবেগের স্পন্দন জাগে, আর হর্ষ, শোক, আশা, নিরাশা, সাহস, ভয় প্রভৃতি অনুভূতিগত রসের স্ফুরণ হয়, সেই ভাবই সঙ্গীতগ্রাহ্য। আর মানুষের সৃষ্ট স্বরগ্রামে এই স্পন্দনের অনুরণনকেই সঙ্গীত বলি। আবার এই স্পন্দন বা উন্মাদনা যখন ভাষার সাহায্যে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করি তখন সেটা ভাবের কাব্যরূপ। এই কাব্যরূপ দিতে গিয়ে কবি বাইরের অনুভূতি চাঞ্চল্যের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ভিতরকার সুষ্ঠু সত্য রূপটি দেখতে পান। তখন উদ্বেল কল্পনা ধারণার মোহানার মধ্যে প'ড়ে মন্থর হ'য়ে আসে। চঞ্চল ক্ষণিকা মূর্ত্তি সংহত আকারে বিরাজ করতে থাকে। এই ভাবে সঙ্গীতের ধ্বনিবিচ্ছিন্ন অংশটি

শ্রীনবেন্দু বসু

কাব্যের মেরুদণ্ডরূপে অবস্থান করে, এবং বাক্যপরম্পরা দিয়ে সুরবেষ্টিত শব্দের স্থান পূরণ করা হয়। কথার বাঁধুনিতে গানের উপলব্ধিটুকু বাহিত হয়। সেই সাহায্যে আমাদের চিন্তারাজ্যে সুরবোধ আর সৌন্দর্য্যানুভূতির একটা সাড়া তোলে। বাক্যযোজনার সামঞ্জস্য মনে একটা ধ্বনিমূলক অনুরণন জাগায় আর মর্ম্মের অন্তরতম প্রদেশে যা কিছু বিরাট, যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর, সে ভাবগুলি স্বতই বিকাশ পায়। কার্লাইল বলেছেন গানময় চিন্তাই কাব্য।

অতএব দেখতে পাই যে গান আর কবিতা ভাবাবেগের দুটি বিভিন্ন প্রকাশরূপ। যখন ভাবতরঙ্গের উচ্ছল, সাবলীল আন্দোলন আর প্লাবনী বেগ ভাষার বাঁধের মধ্যে আটক হ'য়ে একটা স্থির বাহ্য রূপ পায়, সেই মুহূর্ত্তে গান কবিতায় রূপান্তর গ্রহণ করে। গানের রূপ ভাবের নিজস্ব অনাড়ম্বর রূপ, বা তার আকার ও গঠনপ্রকৃতি। কবিতার রূপ সামাজিক রূপ। তাতে বসন ভূষণ আছে।

সঙ্গীত আর কাব্যের এই প্রকৃতিগত প্রভেদটুকু স্বীকার ক'রে নিয়েই গানরচয়িতা গানের কথাগুলি রচনা করেন। গানের কথা সুরের অবলম্বনস্বরূপ, তার আত্মপ্রকাশের সহায়ক মাত্র। সুতরাং মূল ভাবাবেগের নগ্ন, আত্মবর্ণনাতেও সুরের কাজ চলতে পারে। মাত্র সঙ্গীত-ভাবটুকুকে সার্থক ক'রে তুলতে গানের কথাগুলিকে কাব্য-গুণে ভারাক্রান্ত করবার তেমন প্রয়োজন নেই। প্রকৃত অনির্ব্বচনীয় ভাব একটি হৃদয় থেকে উৎসারিত হ'য়ে আর একটি হৃদয়কে স্পর্শ করতে গিয়ে মধ্যপথে ভাষা ও অলঙ্কার রূপের ধাঁধার মধ্যে আত্মহারা হবার অবসর পায় না। গানেতে মূলভাব যথাসম্ভব গোড়াতেই ব্যক্ত হয় এবং শেষপর্য্যন্ত নানা আবেদনের মধ্যে তার পুনরুল্লেখ হ'তে থাকে। গানের প্রধান পরিচয় ভাবের নিরলম্ব নিশ্চল রূপটিকে মূর্ত্ত ক'রে তোলাতে। কবিতায় ভাব নিজেতেই নিজে বিকশিত নয়। সে মানুষের জীবনকে আশ্রয় ক'রে তাকে নানা রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে সাজিয়ে দেয় এবং জীবনের অবস্থাক্রম আর ঘটনা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে [illegible]

অনেক গান চোখে পড়ে যেগুলিকে গান না ব'লে সুরবদ্ধ কবিতা বলাই সঙ্গত, যেমন, 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী' নামক স্বর্গীয় ডি এল রায়ের জনপ্রিয় গানটি। এর কথাগুলি বর্ণনাপূর্ণ এবং সমগ্র গানটি বিবৃতিমূলক কবিতা। কোন অবচ্ছিন্ন আবেগের ধ্বনিত প্রকাশ এতে নেই। অতএব বলতেই হবে যে এই গানটি সঙ্গীত অপেক্ষা কাব্যসম্পদে অধিকতর সম্পন্ন, যদিও সুরসংযোগে যে গানটি গাওয়া চলে না তা নয়।

আশা করি এতক্ষণে দেখাতে পেরেছি যে গীতাঞ্জলির গানগুলি মোটের ওপর ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত হ'লেও সেগুলিকে রূপভেদে শ্রেণীবদ্ধ করা অসম্ভব নয়। সেই অনুসারে প্রথমে সঙ্গীতপ্রধান গানগুলির কথাই বলবো। এগুলি যে পরিমাণে কাব্য-অলঙ্কারপরিচ্ছিন্ন সেই পরিমাণে সঙ্গীত-ভাবপ্রবুদ্ধ। এতে প্রকৃতিবর্ণনা বা কল্পনার লীলা যে একেবারে নেই তা নয়, তবে কম। গানগুলি ভাবের দিক থেকেই বড়। এই গানগুলিই গীতাঞ্জলির ভিত্তি এবং সংখ্যায় বেশী। এইখানে ব'লে রাখি যে প্রবন্ধে অনুল্লিখিত গানগুলি এই ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রেণীতেই পড়ে, কেবল তার মধ্যে ১০৭, ১০৯, আর ১১০ নং গান তিনটি বিশেষভাবে স্বদেশসঙ্গীত যদিও ধর্ম্মভাবেই প্রণোদিত।

গান আর কবিতার প্রভেদ অনুসারে এ গানগুলি সমস্তই সঙ্গীতপদবাচ্য। আত্মনিবেদনে যে আকুলতা থাকে, যেটা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাসে মনকে দ্রবীভূত করে আর প্রাণে সমবেদনা জাগায়, এ গানগুলিতে সেই ভাবেরই ব্যঞ্জনা। এতে আছে ব্যাকুল প্রার্থনার একটা সরল বিশ্বস্ততা যেটা ধর্ম্ম বা নীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ। এ গান সরাসরি মনে গিয়ে লাগে, এতে কোন যুক্তির মারপ্যাঁচ নেই। এর প্রথম কথা প্রেম, আর সে প্রেমের নিতান্ত সরল অভিব্যক্তি এ শ্রেণীর গান বা কবিতার প্রধান সৌন্দর্য্য। এখানে মৌলিকতার কোন আয়াস নেই এবং এগুলি একটা বিশেষ মুহূর্ত্তের চিন্তার বিদ্যুৎচমক নয়, এগুলি কবির চব্বিশ ঘণ্টার জীবনের মনোভাবচালিত সরল নিবেদন। এ শ্রেণীর গান বা কবিতার [illegible] সেই কারণে

একটা ভাবগত সরলতার ওপর নির্ভর করে। সেটা গভীর এবং আত্মনিহিত, আকুল অথচ সংযত, উল্লাস আছে অথচ চপলতা নেই, সহজ কিন্তু লঘু নয়, পারিপাট্যহীন কিন্তু মনোহারী। কবি লেখেন তাঁর প্রেমে আপ্লুত মনকে চোখের জলে ধুয়ে উজ্জ্বল, শুচি আর স্নিগ্ধ ক'রে তোলবার জন্যে, অন্যের মনে চমক লাগবার জন্যে নয়। এই সকল কারণে এ গানগুলিতে যত কিছু কল্পনাসম্ভার, ছবি রং প্রভৃতির আয়োজন আছে সে সমস্ত মূল বাণীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই। সে গুলি উপকরণ মাত্র, নিবেদন নয়।

গীতাঞ্জলির ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি এই সকল সত্যে অনুপ্রাণিত। কিন্তু মূল প্রার্থনার সুরটি কত বিচিত্র ছন্দেই বেজে ওঠে। একটা সহজ প্রকৃতিগত বিনয়ের মধ্যে দিয়ে নানাভাবে এবং মানুষের মনের নানাদিক থেকে এই চিরন্তন আবেগটুকু ফুটে ওঠে। প্রত্যেকবার নতুন নতুন আবেদনের মধ্যে দিয়ে বার বার মনকে চঞ্চল ক'রে তোলে। তা ছাড়া সমগ্র গানগুলির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য আছে যেটা পূর্ণ অনুভূতির মনোমত প্রকাশের একমাত্র নিদর্শন।

প্রথমে চারিদিকে চেয়ে দেখতেই কবির মনে জাগে একটা বিস্ময়ের ভাব। সে দেখে একজন পূর্ব্ব পরিচিতের মূর্ত্তি। এখানে এভাবে তার আনাগোনা কেমন ক'রে হ'ল? এ স্পষ্ট সজীব রূপ কোথা থেকে আবির্ভূত হ'ল? কবি জিজ্ঞাসা করেন—'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস?' (৫২)। কবি লক্ষ্য করেন যে তিনি আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, মানুষের মনে সর্ব্বত্র বিরাজিত। ৬,৩১,৩৭,৪৩,৪৬,৭৪,১১৬,১২১ নং গানগুলি এই ভাবের। কবি শুনতে পান তাঁর আসার পায়ের ধ্বনি। 'নিখিল দ্যুলোক ভূলোক' প্লাবিত ক'রে তাঁর 'অমল অমৃত' ঝ'রে পড়ে। শুধু বাইরের প্রকৃতিতে নয়, সে আলো কবির গায়ে তার ভালবাসার পরশ ছুঁইয়ে দেয়, কবির গায়ে 'পুলক লাগে,' চোখে ঘোর ঘনিয়ে আসে।

তাঁর এই আপনভোলা হ'য়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, অজস্রতার এই বাহুল্য, অসীম হ'য়ে সীমার মাঝে এই সুর বাজনোতে একটা রহস্য আছে। কবি বুঝতে পারেন যে পরে এই ছোঁয়াচ সংক্রামক হবে, এবং তখন হয়ত তাঁরও ঐ আনন্দের লীলায় যোগ দেওয়া সম্ভব হ'য়ে উঠবে; কারণ ইতিমধ্যেই যে তাঁর প্রাণেও সাড়া জেগে উঠেছে। এ ভাবটি বড় হৃদয়গ্রাহী ভাবে প্রকাশ পায় ২,৩,২২,২৯,৩৫,৩৮,৫৩,৫৫,৬৭,৯৫, এবং ১০২ নং গানের মধ্যে। কবি খুব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান'। নইলে কেনই বা 'আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে, আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান?' তা ছাড়া আয়োজন কি এক দিনের, সে যে অনেক কাল থেকে চ'লে আসছে, অনেক কাল ধ'রে এ আনন্দের রস সঞ্চার হচ্চে। একটি গানে যেন এই সমস্ত গানগুলির সুবাস নিষ্কাসন করা হয়েছে। তাই তার সবটা উদ্ধৃত করলুম—

জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ!
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।
সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে,
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপদরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রসবরষণ॥

এই সকল আভাস পেয়ে কবির মনে হয় "যেন সময় এসেছে আজ।" তাই এখন তাঁর নতুন ঝোঁক হয়েছে যে "সব বাসনা যাবে আমার থেমে, মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে" আর তখন "দুঃখ সুখের বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু না র'বে।"

শ্রীনবেন্দু বসু

কিন্তু কেমন ক'রে আশা সফল হবে? কবি প্রভুকেই প্রার্থনা জানান, "আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি," (৪৪)। তিনি নিজে ব্যাকুলতা সহ্য করতে না পেরে নানা উপায় পরীক্ষা করেন। তিনি মানের আসন ত্যাগ ক'রে (১২৬), বলেন—"আমার মাথা নত করে' দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে" (১) কেননা "তোমার কাছে খাটে না কবির গরব করা" (১২৬)। ৮৬, ৯৮, ১২৪ নং গানগুলিও দ্রষ্টব্য। নানাভাবে নিজকৃত পাপ আর দোষ স্বীকার ক'রে কবি চিত্তশোধন করবার প্রয়াস পান। তিনি স্বীকার করেন যে "অনেক দেরী হ'য়ে গেল, দোষী অনেক দোষে" (১৫১)। তাঁর প্রধান দোষ এই যে "ঢেকে তোমার হাতের লেখা কাটি নিজের নামের রেখা" (১৪৪)। তিনি তাঁকে জীবনের "শ্রেয়তম" জেনেও ভাঙ্গাচোরা ঘরেতে যা পোরা আছে তা ফেলে দিতে পারেন না (১৪৫)। নানাদিক থেকে এই স্বীকারোক্তিপূর্ণ কবিতা অনেকগুলি, যেমন ৪০, ৪১, ৫৪, ৬৪, ৯৩, ১০৮, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৭, ১৪৩ নং প্রভৃতি।

দোষ স্বীকার মাত্র ক'রেই কবি বসে' থাকেন না। তিনি দেখেন এ ছাড়া আরো অনেক বাধা রয়েছে। জগতের যত তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য আর বন্ধন সেগুলোও ছাড়তে হবে। এখনও "ধনে জনে" জড়িয়ে আছে (৩০)। তাই তো চোখে আবরণ নামে (৩৪)। ফলে যদিও "দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন করে যাওয়া আসা" এদিকে কিন্তু "ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাকবো কেমন ক'রে?" পথ দেখতে না পেয়ে এই ফিরে ফিরে যাওয়া দেখে কবি আজ পণ করেছেন যে মলিন অহঙ্কারের বস্ত্র ছেড়ে, স্নান ক'রে এসে প্রেমের বসন প'রে (৪২) নিভৃতে থালা সাজিয়ে তিনি আজ এগিয়ে যাবেনই যাবেন—

"যেথা নিখিলের সাধনা
পুজালোক করে রচনা
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা।" (৫১).

কিন্তু এ সাধনায় শক্তির প্রয়োজন। সেই বরই তিনি চান, "নয় তো যত কাল তুই শিশুর মতন রইবি বলহীন, অন্তরেরি অন্তঃপুরে থাক রে ততদিন" (১৩৭)।

শক্তিপ্রার্থনার পর তাঁর দ্বিতীয় প্রার্থনা সাহস আর বিশ্বাসের (৪, ৩৩), যাতে তিনি নিজের সকল চিন্তা সকল জীবনটাকে একাগ্রতায় বেঁধে উৎসর্গ করতে পারেন (৯৯), আর তার পর যেন সেই "অন্তরতর" কবির অন্তর বিকশিত করেন (৫)।

একাগ্র সাধনা করতে হ'লে আবার সব নৈরাশ্য দূর হ'য়ে গিয়ে মনের শান্তির নিতান্ত প্রয়োজন। সেটাও কবিকে খুঁজে নিতে হয়। তাই তাঁর প্রার্থনা, এবার যেন মুখর কবি নীরব হ'য়ে যায় (৬০), যেন সপ্তলোকের নীরবতা সেখানে এসে বিরাজ করে (৬৫)। তিনি যেতে চান "অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান" (৭৫)। যেন তিনি তাঁকে তাঁর স্নিগ্ধ শীতল গভীর পবিত্র আঁধারে ডেকে নেন, (৯৬) যেন তিনি তাঁর মধ্যে "ধুয়ে মুছে" ঘুচে যান (১৩৮), যেন তিনি সকল দিয়ে তাঁর মাঝে মিশতে পারেন" (১৩৯)। তিনি মনকে কায়াকে ঐ চরণে গলিয়ে দিতে চান (১৪২)।

তারপর কবির শেষ প্রার্থনা সেই অরূপের আনন্দময় প্রেমাশীর্ব্বাদের জন্যে (১০৩, ৯০), যাতে তিনি তাঁর "আসন-তলের মাটির পরে লুটিয়ে" প'ড়ে তাঁর "চরণ ধুলায় ধুসর" হ'য়ে যেতে পারেন (৪৭) এবং আত্মনিবেদনের সেই পরম মুহূর্ত্তে—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।" (৮০)

আজ কবি অনেক আয়াস ক'রে, 'অনেক যত্নে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে, দেবতার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন প্রধান ভয় দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা। তিনি তাই তাঁকে বলতে চান যে বোধ হয় এতদিনে সময় হয়েছে, বোধ হয় এইবার তিনি তাঁর মহাদানের যোগ্য হয়েছেন। হয়ত তাঁর চেষ্টা অসম্পূর্ণ হ'লেও ব্যর্থ হয়নি, কেননা তার মধ্যে তো কোথাও কপটতা বা কার্পণ্য ছিল না। সুতরাং তিনি নিশ্চয় মনে মনে ভক্তের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন (১৪৭, ১৫২)। এই সকল কথা ভেবে কবির মনে সাহস হয়। তিনি জানতে চান "প্রেমের দূতকে পাঠাবে ন'থ কবে?" (১৫৩) সাহস পেয়ে কবি নিজের সাধনার

পূর্ণ ইতিহাস বলতে আরম্ভ করেন। স্থান, কাল, প্রকারের একটা বিস্তৃত বিবরণ দেন (৬৬, ১২৬)—

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে
সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়।" —

শুধু দীর্ঘ সাধনাই নয়, তাছাড়া আজকে "এ গান ছেড়েছে তার সকল অহঙ্কার"। অতএব আজকে তাঁর যা কিছু সঞ্চিত ধন, যা কিছু আয়োজন, সম্পূর্ণই হোক বা অসম্পূর্ণই হোক তাঁর পায়ের কাছে ঢেলে দিয়ে নিজেকেও গ্রহণ করতে বলেন (১১৫, ১৩০, ১৪৯, ১৫০)।

গ্রহণ করার এই অনুরোধের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। শুধু গ্রহণ করতে ব'লেই ক্ষান্ত হন না। অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করেন শেষে অসহিষ্ণু ভাবে প্রশ্ন করেন—"যেথায় তুমি বস দানের আসনে, চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে" (৯৭); কবেই বা "প্রাণের রথে বাহির হতে পারব" ৮৫); "জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে, সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে" (১৬)।

এই অসহিষ্ণুতার ভাবটি ও আবার কত রকমে দেখা দেয়। কখন তাতে বাজে একটা ক্রীড়াসুলভ সুর— "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না" (২৪); কখন আবার প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলে যে আঘাত সইতে তিনি ভয় পান না; যেন "মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ" না হয় (৯১)। তখনকার ভাব বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেউ আর তাঁকে ধ'রে রাখতে পারবে না (১১৮); তিনি আর নিজেকে নিজের শিরে বইবেন না (১০৬)। কখন ধৈর্য্য ধারণ করেন (৯২)। আবার মধ্যে মধ্যে মিনতিতে ভেঙ্গে প'ড়েন (১১২) নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেন (৭৬)। কখন দেখি আত্মভর্ৎসনার ভাব আর নিজেকে সজাগ রাখবার চেষ্টা (২৫, ১১৩, ১১৪,); কখন সাদর আবাহন (৭,৫৮, ৫৯, ৭৮, ১০৫)।

কবির ধৈর্য্য, অনুরাগ, আবেগ ব্যর্থ হয় না। তাঁর প্রার্থনা সফল হয়। বোধ হয়, সেই মুহূর্ত্তে তিনি আনন্দে ধন্য ধন্য ক'রে ওঠেন (১৫)। তখন তিনি তাঁরই আদেশে গান গান, গর্ব্বে তাঁর বুক ভ'রে ওঠে (৭৯), পরম তৃপ্তিতে বলেন—"আছে আমার হৃদয় আছে ভ'রে, এখন তুমি যা খুসি তাই কর" (১১১)। তিনি উল্লাসে তাঁর রথ টানতে এগিয়ে যান (১১৯), তাঁর সঙ্গে কর্ম্মযোগে যোগ দেন (১২০), এবং শেষ ধন্যবাদে অন্তরের কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে দেন—"যা দিয়েছ আমায় এ প্রাণ ভরি, খেদ র'বে না এখন যদি মরি" (১৪০)।

এই খানেই ধর্ম্ম সঙ্গীতগুলির ভাবের পূর্ণ বিকাশ আর বিরাম। ভাবের আবেগের তীব্র শব্দিত প্রকাশে এগুলি কাব্যের সঙ্গীত রূপ, বর্ণনার সম্ভার বা কল্পনার রঙে জাজ্জ্বল্যমান নয়। তার স্থানে আছে একটা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আর ঐকান্তিক নিবেদনের প্রবল উন্মাদনা। এই পার্থিব জীবনে মানুষের মনে যত রকম আবেগের সঞ্চার হয় সে সকল এখানেও তেমনি সহজ সরল ভাবেই দেবতার কানে ভক্তের প্রার্থনাটুকু পৌঁছে দেয়। আমাদের দৈনিক জীবনের সাধারণ হাসি কান্নার সুরের সঙ্গে এই গানগুলির সুর এবং ভাবের এত যোগ আছে ব'লেই এ গানগুলি আমাদের এত ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ করে। ভগবৎপ্রেম এখানে মানুষের প্রেমের কোঠার মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। কবির পরম নিজস্ব সুদূরের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে আমাদের এই নীচেকার জগতের আশা, নিরাশা, হর্ষ, শোকের মতন চিনতে পারি ব'লেই তাঁর ব্যাকুলতায় নিজেরা আকুল হই, তাঁর ভরসাতে নিজেরাও সান্ত্বনা পাই, তাঁর আবদারে নিজেদের সুর মেলাই, তাঁর আনন্দেই নিজেদের শান্ত আর তৃপ্ত করি।

এইবার ভাবরাজ্য থেকে রূপরাজ্যের দিকে যাব। এ শ্রেণীর গানগুলিতে যে ভাব মর্য্যাদাহীন তা নয়, তেমনি গরিমার ছটায় উজ্জ্বল, তবে অলঙ্কৃত। তার পূর্ণ অভিব্যক্তি রূপের বিলাসের মধ্যে দিয়ে। রূপই এখানে প্রধান অবলম্বন। সেই জন্যে এই গানগুলিতে ছবি আঁকা, অলঙ্কারদান, প্রকৃতির ছদ্মবেশ পরান প্রভৃতি সহজ হয়েছে।

এই রূপপ্রধান গানগুলি বিশেষ ভাবে দুরকম—স্বভাব-বর্ণনা আর কল্পনাকাব্য। এর মধ্যেও সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাগ আছে, স্বভাববর্ণনামূলক গানগুলিতে বহিঃপ্রকৃতির রূপ-সম্ভার আর তার বিচিত্র প্রকাশলীলাই গানের প্রধান রস বা উপকরণ। দ্বিতীয় বিভাগে বিশেষ ক'রে স্বপ্নজগতের কল্পনাসৃষ্টি।

গীতাঞ্জলি

শ্রীনবেন্দু বসু

১। প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি গান চোখে পড়ে যেগুলি প্রাগুক্ত ধর্ম্মসঙ্গীত আর প্রকৃতিকাব্যের মাঝামাঝি। সেগুলি যেন সংযোগস্থল—যেখানে ভাব অল্পে অল্পে রূপকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আনন্দটা প্রকাশ পায় প্রকৃতিভূত বস্তুরূপের সাহায্যে। ২৬ নং গানটি থেকে উদাহরণ দিই। প্রথম দুটি কলি এই :—

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে' কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।

সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়
পল্লবদলে শ্রাবণ ধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে।

প্রথম কলিটিতে ভাবটুকুই ব্যক্ত হয় যে, বিরহ নানারূপ ধারণ ক'রে কাননে ভূধরে, আকাশে, সাগরে বিরাজ করছে,—কিন্তু দ্বিতীয় কলিতে সেই বিরাজিত রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আমরা তাকে দেখতে পাই তারার চেয়ে-থাকাতে পাতার ওপর বর্ষার জল-পড়ার মধ্যে। ৯, ১২, ১৪, ২৭, ৫০, ৭০, ৭২, ১৪১ নং গানগুলিও এই মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর। এখানে ভাবের ছায়া বহির্জ্জগতের গায়ে লুটিয়ে প'ড়ে তার মোহন স্পর্শে প্রতি মুহূর্ত্তেই স্পষ্টতর হ'য়ে যেন আমাদের মনের পটে স্থায়ীভাবে এঁকে যায়। কবির প্রেরণা ক্রমাগত প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে বিকশিত হয়। প্রকৃতি-দৃশ্যের যে দিকটা রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এ গানগুলির মধ্যে সেই দিকটাই উদ্ভাসিত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ বর্ষায় বাংলার নদীসুশোভিত পল্লীদৃশ্যের কবি।

২। স্বভাববর্ণনার মধ্যে দ্বিতীয় ধরণের গানগুলি ৮,৭১, এবং ১০০ নং। এখানে ভাবের ব্যক্ত রূপ আরো ক্ষীণ, এবং সমস্ত রসটুকু বর্ণনার মধ্যেই পর্য্যবসিত। দৃশ্যবর্ণনাও সেই জন্যে খুব উজ্জ্বল রেখাতেই আঁকা। গানগুলি সাধারণের পরিচিত—"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা," "আবার এসেছে আষাঢ়" এবং "চিত্ত আজ হারাল আমার মেঘের মাঝখানে।" এখানেও বর্ণনার উপকরণ সেই একই, উদার আকাশ, বিস্তৃত মাঠ, খরবেগে প্রবাহিতা উচ্ছল নদী, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্র—বাংলার বর্ষার সমারোহ,—বড়ই বাস্তব আর মনোজ্ঞ।

৩। কখন কখন প্রকৃতির কোন বিশিষ্ট রূপ এত প্রবলভাবে কবিকে আকর্ষণ করে যে তিনি সেই রূপের ধ্যানে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে গিয়ে একান্তভাবে সেই রূপটিরই বন্দনা করেন, এবং সেই স্তবগানের মধ্যেই তাঁর দেবতার আবাহন হয়। রূপের সংহত মূর্ত্তি শিল্পীর আঁকবার জিনিষ, আর রূপের গতিশীল ছবিই কবির বর্ণনার সম্পদ। এ গানগুলিও তাই। একটিতে ভরা বাদরের ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি পড়ার কলরোলজনিত উল্লাস যখন—

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে।
যখন মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে! (২৮)

একটিতে পাই শরতের স্নিগ্ধ চরণসম্পাতে আবির্ভাবজনিত কবির মনের শান্ত তৃপ্তি যখন সে অতিথি হয়ে "প্রাণের দ্বারে" এসে উপস্থিত হয় (৩৯), আর কত মনোরম সে আসা—

শিউলী তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে। (১৩)

তার "আলো ছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে বনে।" আবার বসন্তের আগমনে আনন্দে কবির ভ্রমর-গুঞ্জন শুনি তাঁর বন্দনায়—"আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে; অতি নিবিড় বেদনা বন মাঝেরে, আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে; এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে?" (৫৬)। বহিঃ-প্রকৃতিকে ভাবের বাহন করা, ভাব আর রূপের মিলনসাধন করা, রূপের অভিনন্দনের মধ্যে দয়িতের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-কাব্যে বড়ই উজ্জ্বল, বড়ই সজীব, বড়ই স্পষ্ট। তিনি মৃত্যুকেও রূপ দেন যখন বলেন—"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা, মরণ আমার মরণ, তুমি কও

আমারে কথা," (১১৭)। ৩৩ ও ১০১ নং গানে বর্ষার রূপ খুব উজ্জ্বল রঙে আঁকা। আবার একটি গানে শরতের যে বাহ্য রূপ দেখি সে-রকম উচ্চ মূল্যের objective poetry সহজে চোখে পড়ে না। শরৎ ঋতুর আবাহন—

এস গো শারদ লক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে।
এস ধৌত শ্যামল
আলো ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে।
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥

এমন সত্য স্বভাববর্ণনা, এত উজ্জ্বল রূপসাধন গীতাঞ্জলিতেও বেশী নেই।

৪। স্বভাববর্ণনার গানগুলির মধ্যে বিরহভাবের গান কয়েকটি এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এগুলির মূল রস,—বিচ্ছেদ, বেদনা। বিরহের এই বিষাদব্যথাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে বাইরের প্রকৃতিদৃশ্য কবিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রকৃতির প্রশান্তি আর স্থৈর্য্যের রূপ-কল্পনায় যে গোপন বেদনার ভাব নিহিত থাকে সেটুকু কবির মনে প্রতিক্ষণেই বাজতে থাকে। কবির ভাষাতেই বলতে গেলে—"এই নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ নিশ্চিন্ত নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যপূর্ণ নির্ব্বিকার উদার শান্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং তারি তুলনায় নিজের মধ্যে এমন একটা সতত সচেষ্ট পীড়িত জর্জ্জর ক্ষুদ্র নিত্য নৈমিত্তিক অশান্তি চোখে পড়ে যে অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হ'য়ে যেতে হয়।" ("জলপথে" শীর্ষক প্রবন্ধ)। অতএব বহিঃপ্রকৃতির চিন্তার মধ্যে বিরহের ভাব সহজেই ঘনিয়ে ওঠে। তাই প্রকৃতির রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তার সুরে সুর বেঁধে, তারই পটে ছবি এঁকে, তাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে, তার মধ্যেই সহানুভূতি খুঁজে পেয়ে, তাতেই নিষ্ঠুরতা আরোপ ক'রে, কবির অন্তরের কান্না ওঠে। জল, ঝড়, মেঘ, বিদ্যুৎ, অন্ধকার রাত, নিরালা পথ—তার মাঝখান দিয়ে কবিমনের দিশাহারা বিরহিণী তার জীবনের প্রেয়তমের খোঁজে বার হয়। বৈষ্ণব কাব্যের কমনায় পরিণতি!

বিরহ কবিতাগুলিকেও ভাবের ঐক্য অনুসারে সাজাতে পারি। প্রথমে আছে বিচ্ছেদের তীব্র বেদনা আর খুঁজে পাবার জন্যে একটা ব্যাকুলতা যখন "গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি, বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি" (১৮)। সেই সময়ে প্রাণ জেগে ওঠে, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে দুরন্ত বাতাসে কেঁদে বেড়ায়, কেবল "দূরের পানে মেলে আঁখি" চেয়ে থাকে, আর ভাবে, যদি দেখা না পায় তো এমন বাদল বেলা কেমন ক'রে কাটবে (১৭)। চোখে ঘুম নেই, আকাশও তার সঙ্গে হতাশ ভাবে কাঁদে। বারে বারে সে দুয়ার খুলে দেখে প্রিয়তম আসছে কিনা, কিন্তু—"বাহিরে কিছু দেখিতে না পাই" (২১)। শেষে আর থাকতে না পেরে, যত বন্ধন সব কাটিয়ে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে। বলে—"একলা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে" (১০৪)।

তখন এই ঘনিয়ে-আসা আষাঢ় সন্ধ্যার মধ্যে বাঁধনহারা বৃষ্টিধারার মধ্যে, যূথীর বনে সজল হাওয়ার শিহরে সে যেন তার মনস্কামনা পূর্ণ হবার আভাস পায় (২০)। তারপর দেখে হঠাৎ কখন নিশার মত নীরব হ'য়ে সবার দিঠি এড়িয়ে "শ্রাবণ ঘন গহন মোহে" গোপন চরণ ফেলে তার প্রাণকান্ত এসে দাঁড়িয়েছেন।

গীতাঞ্জলিতে প্রকৃতিকবিতা উপরোক্ত চার প্রকারের। আমরা আরও বুঝতে পারি যে প্রকৃতিদেবী অনেক ভাবেই কবির কাব্যে আসন গ্রহণ করেন। কখন ভাবের স্থূল আধার স্বরূপ, কখন ঋতুসম্ভারে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশ-লীলায়, কখন রূপমূর্ত্তি পরিগ্রহণ ক'রে, আবার কখন বিরহভাবের মূর্চ্ছনা জাগিয়ে।

এই সব বর্ণনার মধ্যে কিন্তু একটি বিশেষত্ব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান। কথাটা রবীন্দ্রনাথের বস্তুমূলক (objective) কবিতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে মতভেদ নিয়ে। টমসন সাহেবই এই বিতণ্ডাটুকু একটু যেন স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছেন এবং সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা এস্থানে খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে। যে বিশেষত্বের কথা বলছি

শ্রীনবেন্দু বসু

তা এই যে প্রকৃতির বর্ণনা স্থানে স্থানে সতেজ বা স্পষ্ট হ'লেও সর্ব্বত্র তাতে একটা আত্মস্থ ভাবের মন্থর ছায়া পড়ে। যেন কিসের টানে তাকে পিছন ফিরে দেখতে হয়। সময় সময় উদ্দাম গতিতে ছুটেও আবার পরক্ষণে ধীর সংযত হয়ে পড়ে। মনে হয় বুঝি বস্তুবর্ণনা করতে কবি আত্মদ্রষ্টা হ'য়ে ওঠেন। তাঁর কাব্যে জড়জগতের রূপের যত লীলার অভিব্যক্তি মানুষের মর্ম্মের আবেগের সঙ্গে একসঙ্গে জড়ানো, এক তারে বাঁধা। একটার মধ্যে অন্যটা পর্য্যবসিত। একটা কাঁপলে অন্যটা কাঁপে। মনে হয় কবি মানুষের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না—তাকে কেবল প্রকৃতির কোলে পাঠাতে চান জ্বালা জুড়োতে, কেননা সেখানে আছে একটা সান্ত্বনার প্রলেপ। কবির কথায়—"সৌন্দর্য্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু।" কাজেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আত্মা আর জড় দুটিতেই টান পড়ে। তাই বুঝি কবি বর্ষার রূপ দেখে মুগ্ধ হ'লেও তিনি সেটাকে দেখেন, "মানবের মাঝে" (১০১)। আষাঢ় শুধু আকাশ ছেয়েই আসে না, সে "নয়নে এসেছে হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।" (১০০)। "ভরা বাদরে" ঝর ঝর বারি ঝরার একটা খুব শব্দিত এবং সরস বর্ণনার মধ্যেও কবির অন্তরে কলরোল ওঠে, হৃদয়-মাঝে পাগল জাগে, যার ফলে ভেতর বা'র এক হ'য়ে গিয়ে যেন "কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।" প্রকৃতির বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ণনার মধ্যে নিজেকে ভুলে যাওয়া নেই, একটা সংবরণের বাঁধ রয়েছে। প্রকৃতি ছাড়া মানবজীবনের কোন অবস্থাক্রম কাব্যে বিন্যাস করতে গেলেও কবি ঐভাবেই সে বর্ণনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। বর্ণিত ছবিখানি যেন নিজেতেই যথেষ্ট নয়, তার যা কিছু সার্থকতা যেন কবি-প্রাণের আকাঙ্ক্ষাগুলির অবলম্বন বা প্রতীকরূপে। বস্তুবর্ণনার চেয়ে যেন মর্ম্মকাহিনীই বেশী মূল্যবান হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কবি নিজে এই আভাসবর্ণনার মধ্যেই স্থূল দেহের সাহচর্য্যের সবটুকু অনুরাগ আর সান্ত্বনা পেয়ে তৃপ্ত হন। তাঁর কাছে সেই ছায়াই সম্পূর্ণ প্রাণবান আর স্পষ্ট। মৃত্যু তাঁর "জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা।" তার প্রতি তাঁর কত সনির্ভর, সপ্রেম, আবেগপূর্ণ ভাব—

মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
　　নিত্য অনুগতা।
*　　*　　*
সেদিন আমার রবে না ঘর
কেই বা আপন, কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
　　মিলবে পতিব্রতা।" (১১৭)

ব্যক্তিক ভাবের এই চরম কবিতায় নিবিড় মিলনের কি উষ্ণ পরশ!

তা হ'লে কি রবীন্দ্রনাথের স্বভাবকবিতা বা Nature poetry তাঁর মানবগীতার বাহন মাত্র? স্বভাববর্ণন ব'লে এ গানগুলিকে পৃথকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করবার কোন আবশ্যকতা ছিল না? এবং কবিতাগুলি কি তাঁর ধর্ম্মসঙ্গীতগুলিরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলি যে উপরোক্ত আলোচনা সত্ত্বেও এই স্বভাবসঙ্গীতগুলির প্রকৃতি-কবিতা হিসাবে একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমত সঙ্গতভাবে গীতিকল্পনা (lyric imagination) যতটা বস্তুমূলক হ'তে পারে এগুলি তাই। কাব্যমাত্রই কবির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, কিন্তু গীতিকবিতায় সে প্রকাশ আত্মপরিবৃত, egotistic। গীতিকবির পক্ষে শুধু বিস্ময়-ভাব যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে একটা জীবন-চঞ্চল বিশিষ্ট প্রাণের যোগ থাকে। অতএব এ কবিতায় কবির মন প্রকৃতির রূপ দেখে ছবিটি দেখার আনন্দ পেয়েই তৃপ্ত এবং ক্ষান্ত হয় না, একটা অবস্থা সংস্থানের রসমূল্য মাত্র তাকে অভিভূত করে না। তার চোখে সে দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায় তার মনোভাব রঞ্জিত বাসনা আর আবেগের একটা সঞ্চারিণী প্রতীক। তাই কবির প্রেরণায় দৃষ্ট রূপটি তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রবুদ্ধ করলেও আংশিকভাবে ব্যক্ত হয়। অথচ সে কায়ার ছায়া ব'লে অবিচ্ছেদ্যও বটে,—বিচ্ছুরিত লাবণ্যের স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল। চোখেদেখা রূপের অবিকল ব্যঞ্জনায় কবিকল্পনার আনন্দ এবং তৃপ্তি আছে, আবার "কবিহৃদয়ক্ষত" বেদনার স্মারক বা উত্তেজকভাবে প্রকৃতিরূপবর্ণনাও কাব্যগ্রাহ্য এবং তার নামও স্বভাবকবিতা। একজনের কাছে যেটা মাত্র রূপ,

অন্যের কাছে সেটা রূপক, একজনের উল্লাস অন্যের সৌম্য শান্তি। তার কাছে কাব্যের পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও গরিমা বর্ণনাতেই সম্পূর্ণ নয়। তার কাছে বর্ণিত দৃশ্য বর্ণিত ভাবের পশ্চাত দৃশ্য, মাঝে থাকে স্মৃতি চাঞ্চল্যের ছায়ায় আচ্ছন্ন middle distance—মধ্যভূমি। সে ছবি কেমন? কবির অন্যত্র ব্যবহৃত বর্ণনার ভাষায় বলি—"পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা, গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।" আলোচ্য স্বভাব কবিতাগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য তাই গীতি কবিতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত এই কারণেই সম্ভবত বর্ণনায় বর্ণিত দৃশ্যের বৈচিত্র্যও নেই, অন্য কথায় সেগুলি মোটের ওপর অনেকটা একই ভাবাপন্ন বর্ষায় বাংলার পল্লীশোভার ছবি। কবি দেখেন যে তাঁর মনোভাব সব চেয়ে বেশী অনুরণিত হয় বাংলার পল্লীর শ্যামল শান্ত শোভায় আর সকল ঋতুর মধ্যে বর্ষার ঘন রসাপ্লুতির মধ্যে। তিনি তাইতেই আত্মহারা হ'য়ে যান। নিসর্গের সৌন্দর্য্যের অন্যান্য অভিব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর হয় না। এই বৈচিত্র্যের অভাবকে কল্পনাশক্তির দৈন্য মনে ক'রে টমসন সাহেব একটু বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি ভুলে যান যে অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে গুণের পরিমাপটাই প্রশস্ত। "Great genial power, one would almost say, consists in not being original at all, in being altogether receptive."—Emersonএর কথা। রসসঞ্চারে নতুনত্ব আর সজীবতা দান করতে পারলে একের মধ্যেই ডুবে থাকা কেন কল্পনার দৈন্য হবে? ইচ্ছার মিতব্যয় সব সময়ে শক্তির অপব্যয় নয়। একের বহু রূপ দেখতে পাওয়াটা বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর, উৎকৃষ্ট বৈচিত্র্য, মহান মৌলিকতা। এই দিক থেকেই এই প্রকৃতিসঙ্গীতগুলির বৈশিষ্ট্য আছে ব'লে মনে করি। একে মগ্ন থাকলেও কবি বৈচিত্র্য সাধন করেন কল্পনার প্রাখর্য্য আর অনুভূতির প্রাবল্য দিয়ে। এও কাব্যের একটা রীতি। আরো মনে হয় যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কবির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সম্পূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ। ইংরেজ কবির তুলনায় প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অন্য রকম। কবি স্বয়ং বলেন—"আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আর ইংরাজ প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে·· আমরা আবিষ্কার করি নাই, কারণ আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই"—(পঞ্চভূত)।

এই থেকে প্রতীয়মান হবে যে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতার রূপকের মধ্যেও রূপের প্রাধান্য যথেষ্ট। গভীর আত্মগত ভাব বহির্দৃষ্টির বর্ণচ্ছটায় যথেষ্ট উজ্জ্বল। Senseএর ওপর sensationএর মোহন পরশ, সংযমের ওপর সরসতার আবেশ।

মাত্র কল্পনার তীব্রতার ফলে কেমন ক'রে একটা ঔজ্জ্বল্যের ধারা গ'লে ব'য়ে যায়, মাত্র অনুভূতির প্রাবল্যে কেমন করে' সমবেদনার উৎস ছুটে উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার দু'একটি উদাহরণের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমে একটা সমতল ভূমির দৃশ্যে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে একটা ঘটনা সংস্থানের ছবি।

প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে?
কূজনহীন কাননভূমি
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে
একেলা কোন পথিক তুমি
পথিকহীন পথের পরে? (১৯)

স্পষ্টতা হিসাবে এই কয় ছত্র যদি প্রকৃতিকবিতা না হয় তবে আর কোথায় পা'ব? খুঁটিনাটি বা details নেই, তবে কবির দেশও তো উদার আকাশ মাঠের বিস্তৃতির দেশ! কবিও উচ্চ নীচের প্রভেদ লুপ্ত করা সমতলের প্রেমিক। তাঁর দেশে তীব্রোজ্জ্বল আলো আর ঘনঘোর আঁধারের দিগন্তপ্রসারী একাকার করা স্বর্ণগৌরিক আর ধূসর শ্যামল রূপের যে উদাস বৈরাগ্য তাই তাঁর মনকে ছেয়ে থাকে। তাই সে দেশের দৃশ্যবর্ণনায় পাহাড়ের খোপে, বনের ঝোপে, বাঁকের মুখে half lightsএর সরস কোমল ইন্দ্রজাল সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু এত অল্প কথায়

শ্রীনবেন্দু বসু

দুঃখের সম্পূর্ণতাটুকু আর কোন্ কবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন? বাংলার বর্ষার দুপুরের এমন মনোজ্ঞ ছবি আর কয়টা পেয়েছি? এমন একটা দিনের অলস নিশ্চল ভাব অস্বাভাবিক চকিত নিস্তব্ধতা, থেকে থেকে উতল বাতাসের আস্ফালন, আকাশ আর পৃথিবীর মাঝের দূরতাটুকু কমিয়ে এনে, গাছের মাথার ওপর দিয়ে লুটিয়ে গিয়ে, কাজল ধূসরতার মাঝখানে সবুজের শ্যামলিমা আরো উজ্জ্বল ক'রে, মেঘের বুকে পাখীর ডানার কাঁপন আরো স্পষ্ট ক'রে তুলে, মানুষের চোখে একটা স্নিগ্ধ আবেশের অঞ্জন লাগিয়ে, প্রাণে নবীনতার সরস সিঞ্চন এনে দিয়ে, মেঘের আবরণের ভেতর তার দৃষ্টিকে একটা সুদূরের বাসনায় বিভোল ক'রে, নিবিড় আঁধারের আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির আয়তন ছোট ক'রে এনে তার মনে পরম নির্ভর আর বিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে দিয়ে বরষাদিনের যে পূর্ণ রূপটি আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় তার সম্পূর্ণ প্রকাশ, নিখুঁত চিত্রণ, কি উদ্ধৃত লাইনগুলিতে পরিস্ফুট নয়? অল্প কথায় স্খলিতচরণ পথিকের কী স্পষ্ট জীবন্ত ছবি—সমস্ত চরাচর তখন নিস্তব্ধ, হয়ত বা পাতার ফাঁকে একটি দুটি পাখীর করুণ স্বর আর নিঃসহায় চাহনি সেখানে একমাত্র প্রাণের পরিচয়; গাছগুলি নিঃঝুম, কেবল দিগন্ত থেকে ঝর ঝর বৃষ্টি পড়ার শব্দ কানে আসে। চোখে পড়ে বাতাসের দোলায় ধানের শিষগুলির হিল্লোল। মনে লাগে পল্লীগৃহগুলির বন্ধ দুয়ার নিরুদ্বেগ, আর বৃষ্টির কাছে বুক পেতে দিয়ে খোলা মাঠের নম্র নত ধৈর্য্যের ভাব। তার মাঝখানে দেখি গ্রামের ঈষৎ উঁচু একটিমাত্র সরু পথ দিয়ে পথিকের শিথিল চরণে চ'লে যাওয়া, তার চোখে আশ্রয়বঞ্চিতের নিঃসহায় ভাব, প্রত্যেক কুটীরখানির দিকে ব্যগ্র চঞ্চল দৃষ্টিপাত, সামনে ঘন অন্ধকার। অনুভূতির আবেগপ্রাবল্যই কাব্যের প্রাণবস্তু, আর তারই উচ্ছ্বাসে সিঞ্চিত ব'লে বর্ণনা এত সরস, এত নবীন, এত হৃদয়গ্রাহী, এত মূল্যবান। তেমনি যখন কবি তাঁর চিরপরিচিতকে দেখ্‌তে পা'ন না তখনকার অবস্থা—

> বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
> তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
> সুদূর কোন্ নদীর পারে
> গহন কোন্ বনের ধারে
> গভীর কোন্ অন্ধকারে
> হতেছ তুমি পার,
> পরাণসখা বন্ধু হে আমার! (২১)

অকম্পিত হাতের দুটি একটি সরল ঋজু রেখার ক্ষিপ্র টানে কেমন সারা বনানীর দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে ওঠে। ঝড়ের রাতে, ঝাপসা অন্ধকারে, যত অলীক কালো ছায়ার মধ্যে অন্বেষী মনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরাও নিজেদের হারিয়ে ফেলি। ঐ দূরত্ব আর গভীরত্বজ্ঞাপক কথাগুলি কেমন ক'রে দুঃখের অস্পষ্টতা আরো বাড়িয়ে তোলে, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি কত আয়াসসাধ্য এই অনুসন্ধান। সুদূর নদী, গহন বন, গভীর অন্ধকার! তার মাঝখান দিয়ে যে চ'লে যায় সে নিজে আরো কত অস্পষ্ট! এই অন্ধকারে কি ক্ষিপ্র তার গতি! গানের ছন্দের লঘু ত্বরিত গতিতে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই; হয়ত ক্ষীণভাবে আরো শুনতে পাই খরস্রোতা নদীর তর্ তর্ বেগ, নিস্তব্ধ বনের মধ্যে গাছের মাথায় ক্ষুব্ধ বাতাসের স্বনন, গভীর অন্ধকারে শুক্‌নো পাতা আর তৃণের ওপর ত্রস্ত পা পড়ার শব্দ; হয়ত কাঁটা গুল্মের মধ্যে উদ্বিগ্ন গোপনচারী পথিক চলতে চলতে কতবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোন্ সে বিস্তৃত নদীর ওপারে জলের ওপর রূপালি আলো আর এপারের গহন বনের অন্ধকার মিশে একটা নিবিড় রহস্যলোকের সৃষ্টি করে? তার মধ্যে উদ্বেগ-কণ্টকিত অথচ দৃঢ়চিত্ত অভিসার! সে তো এজগতের পথ চলা নয়, সে কোন কল্পলোকের পানে সুদূর-যাত্রা।

এই প্রাকৃতিক রহস্যরাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কল্পনার সীমানায় এসে পড়ি। এ কবিতাগুলিকে বিশেষ ক'রে কল্পনাপ্রধান বলেছি এই কারণে—এতে কোথাও দেখি বাস্তব জীবন থেকে অনুকৃত ঘটনাবলী বা চরিত্র বেছে নিয়ে তাদের একটা কাল্পনিক জগতে সংস্থান ক'রে এক বিচিত্র মায়ালোকের সৃষ্টি করা হয়েছে; কখন দেখি সামান্য একটি কথার ব্যবহারে, মাত্র তার শব্দঝঙ্কার বা

ভাবের আভাসে, সমস্ত বর্ণনা একটা অর্থাতিরিক্ত সৌন্দর্য্যের প্রভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, আবার কোথাও সর্বাচ্ছন্ন কল্পনার সাহায্যেই নিপুণ সুঠাম বাস্তবতার মনোরম বিকাশ হয়েছে। যখন পড়ি—

"তোমার সোনার আলোয় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার"।

কিংবা চন্দ্রসূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে। (১০)

তখন বুঝতে পারি এ মাত্র ধর্ম্মসঙ্গীত নয়, স্বভাববর্ণনা নয়, এ কোন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির রঙ রেখার ছন্দ। এ চিত্রকাব্যগুলি দু রকম, কোনটি নিশ্চল ছবি, কোনটি সচল। ১০, ২৩, ৪৯, ৮৪, ১৩৩, ১৩৫, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭ নং গানগুলি প্রথম শ্রেণীর। এতে কবির ভাবরত্ন বাহ্য জগতের কোন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তার প্রকাশেই নিজে প্রকাশিত হয়। তার পেছনে কোন জড়দৃশ্যের আশ্রয় নেই। জগতের সব সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কেবল ভাবের অসীম শূন্যে গ্রহতারার মতন নিজের জ্যোতিতে নিজেই উদ্ভাসিত হ'য়ে প্রভা বিকীরণ করতে থাকে—স্থির অখণ্ড, নিশ্চল ভাবে। যেমন—

আনন্দ দাঁড়ায় আঁখি জলে
দুঃখ ব্যথার রক্ত শতদলে। (১৩৫)

এখানে আনন্দের একটি আঙ্গীক মূর্ত্তি তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রতিভাত হয়। রক্তশতদল জিনিষটি মনে না ভাবলে বা চোখে না দেখলে যেন বুঝতে পারি না দুঃখ ব্যথার পার্থিব কমনীয় রূপটি কেমন। এবং এ গুলি স্থির ছবি, চলচ্চিত্র নয়। আনন্দের স্থির জ্যোতির সামনে আমরা চেয়ে থাকি স্থির নির্ব্বাক বিস্ময়ে; কোন দৈহিক বা মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করি না। ভাবের এই নিঃসঙ্গ আত্মপ্রকাশের ছবিতে নানা মনোভাবের রং দেওয়া হয়—১০ নং গানটি দুঃখের চিত্রিত রূপ। ২৩ নং সুরের রূপ; সুরকে দেখি আলো, হাওয়া বা ঝরণার উৎসরূপে। ৪৯ নং গানটির আকাশের গায়ে তারা বা সোনার শতদলরূপে আনন্দের উজ্জ্বল মূর্ত্তি। ১০৫ নং গানও আনন্দের রূপ; ৮৪ এবং ১৩৩ নং গান দুটিতে ভাব নিজে কোন বিশিষ্ট বেশ না পরিগ্রহণ ক'রে একটা বিস্তৃত জীবন দৃশ্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে সেটাকে চালিত করে। ৮৪ নংএ কবির চিরদিনের সাথীর সঙ্গে জীবনসন্ধ্যায় মুক্তিসাগরে ভেসে যাওয়ার ছবি দেখতে পাই। অন্যটিতে গান গেয়ে গেয়ে দেশে বিদেশে অনুসন্ধানের আবেগে ঘুরে বেড়াবার ব্যস্ততা। বাকী তিনটি গানও ঐ রকম গীতোচ্ছ্বাসময় আত্মবিবৃতির সজ্জিত বেশ, তবে বসন বড় সূক্ষ্ম, আভরণের স্থূল রূপটি তেমন ক'রে চোখে পড়ে না—

বসন ভূষা মলিন হ'ল ধূলায় অপমানে
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে,
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষত ব্যথা
করুণা-ঘন গভীর গোপনতা। (১৫৭)

সচল শ্রেণীর কবিতাগুলিতে কবির রূপসৃষ্টি সম্বন্ধে দক্ষতা আরো স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। এই দৃশ্যমূলক গানগুলিতে একটা নাটকীয় সঙ্গতি আর পূর্ণতা চোখে পড়ে। বেশ বড় পটের ওপর ছবি আঁকা হয়েছে। এ গুলি কবির বস্তুকল্পনার উজ্জ্বলতম মুহূর্ত্তের সৃষ্টি আর ভাবের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। ৪৫, ৪৮, ৭৭ নং গান তিনটিতে কবির অন্তরতম বাসনার প্রকাশ। ৬১, ৬২, ৬৮, ৮৭ নং গানগুলি অবহেলাজনিত অনুশোচনা ও পশ্চাত্তাপের স্বীকারোক্তি। ৫৭, ৮১, ৮২, ১৩৬, ৬৯ নং এ বিস্ময়প্রসূত দিব্যজ্ঞানলাভ। শেষে ১৩৪ নং প্রাপ্তিজনিত হর্ষোচ্ছ্বাস। এ কবিতাগুলির বিশেষত্ব ভাবের বৈচিত্র্য অনুযায়ী কল্পনার লীলা ও বিন্যাসের বৈচিত্র্যে। সে বৈচিত্র্য এলোমেলো বা যথেচ্ছাচারপ্রসূত নয়, বড় অনিবার্য্য। উপরোক্ত শ্রেণীদুটিতে সমশ্রেণীর গানগুলিতে ভাষা আর ভঙ্গীরও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

বাসনামূলক গানগুলি সবই সভাদৃশ্য। রাজাধিরাজের পায়ে চরম সাধনার ফল উৎসর্গমানসে কবির বিনীত নিবেদন আর অনুমতিভিক্ষা—দেবতার পায়ে ভক্তের অর্ঘ্য। ভাবাপ্লুত বাসনার বোধ হয় সব চেয়ে সহজ ও সরল প্রকাশ। গানগুলি সুপরিচিত—

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি ;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয়রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে র'ব মরি!
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে ;
প্রাণের বীণা নিয়ে যাবো
সেই অতলের সভামাঝে।

কাব্যে কথাচাতুর্য্য (Eloquence) একটা বড় সম্পদ। সেটা ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্যঞ্জনার আর অলঙ্কারের ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিন্যস্ত পরিণতির লক্ষণ। মিশ্রিত অলঙ্কারে ছোট গীতিকবিতার আঙ্গীকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর তার ফলে রসহানি ঘটে। লেখনীর মুখে কল্পনা আর রঙীন ছবির অবিরল স্রোতকে প্রতিমুহূর্ত্তে সংযত করতে হয়। কলাজ্ঞানের এই সূত্রগুলির উদাহরণস্বরূপ এই গানটি উদ্ধৃত করলুম। কোথায় এবং কেমন সে রূপের সাগর তা কেউ জানে না, তাতে ডুব দেওয়া হয়ত কাল্পনিক জগতের ঘটনা, কিন্তু গানের শেষ লাইন পর্য্যন্ত সে ঘটনাটি চালিত হয় জাগতিক নিয়মবন্ধনের দ্বারাই, তা নইলে মরজগতের কবিপ্রাণ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয় না, তার চঞ্চল মন আশ্বাস মানে না। ডুব দেওয়ার এই ছবির ক্রম আর পরিণতি সারা কবিতাটির মধ্যে কোথাও ব্যাহত হয় না। ছবি দেখে আমাদের মনে পর পর যে আশা জাগে সে গুলি পূর্ণ হয়। রূপসাগরে ডুব দিলে সুধা ছাড়া আর কিসে তলিয়ে যেতে পারা যায়? আর তার তলায় কি মর্ম্মর প্রাসাদ, স্ফটিকের স্তম্ভ নেই? তার চারিদিকে কি জীবন মরণের ভীম পারাবারের গর্জ্জন আর আস্ফালন শুনতে পাই না? তার তোরণের সামনে মর্ম্মর সোপানে আছড়ে প'ড়ে সে ফেনোচ্ছ্বাস কি শান্ত হ'য়ে যায় না? কলরোলের মাঝখানে সে এক সুপ্তির স্বপ্নপুরী, চঞ্চল প্লাবনের মধ্যে নীরব শুভ্র প্রশান্তি। সেই সভায় গিয়ে—

চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি। (৮৮)

ভাবের এই গতি, অনাড়ম্বর এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৌষ্ঠব, এই মোহন অনিবার্য্যতা সহজে উপলব্ধি করা যায়। এ সভায় শেষের গান গেয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই (৭৭)।

অনুশোচনা আর পশ্চাত্তাপমূলক গানগুলিও বড়ই সুন্দর। এগুলিতেও প্রকাশ ভঙ্গীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বিষয়। সবগুলিতেই প্রথমে বিস্ময়, বেশীর ভাগ নিদ্রাভঙ্গের পর ; এবং পরে হতাশ হওয়া। সবগুলিতেই অবহেলা এবং অনবধানতা-জনিত বিবেকের ভৎর্সনা। সবগুলিতেই কবির বীণা কোন অলৌকিক সুরে বেজে ওঠে ; তার ঘরের বাতাস, তার রাত্রের স্বপ্ন কোন সুরভিতে ভ'রে যায় ; ধূলিকণাতেও মূর্চ্ছনা লাগে, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে না। প্রতিবার হাতের বরণ-মালা হাতেই থেকে যায়। ৬৮ নং গানটিতে নাটকানুযায়ী পরিণতি আর দৃশ্যবর্ণনা রমণীয়। বর্ণনার মধ্যে দিয়ে একটি গল্প গ'ড়ে ওঠে, যার শেষের দিকের সমাধান প্রকৃতই নাটকের চমৎকৃতিপূর্ণ—

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি
আলস ত্যাজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চ'লে
দেখা বুঝি আর হ'ল না তোমার সাথে।
সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে!

কল্পনার চাতুর্য্য এবং স্ফূর্ত্তির কি মনোহর উদাহরণ! কোন্ রাত্রে কবির ভাগ্যে এ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল? তখন—

নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি' গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া, মোর বাতায়ন পানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।

কত নীরব পুরী সে যা'র বাইরে ঠিক ভোরের পূর্ব্বক্ষণে নিথর রাজপথ প্রকম্পিত ক'রে একটি রথের চকিত ঝনঝনা শুনতে পাওয়া গেছলো? ক্ষণিকের জন্যে থেমে কত আশা

নিয়ে কে সে এক বার ব্যগ্রভাবে বাতায়নের পানে চেয়ে দেখলে এবং অমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই বা চ'লে গেল কেন?

যাক্, অনেক নিষ্ফলতা, অনেক জেগে থাকার পর কোন এক কোজাগরী রাতে কবি তাঁর বাঞ্ছিতের দেখা পান। সে শুভ মুহূর্তের ইতিহাস জানা নেই, হয়ত সেটা কবিরই অগোচর কেননা তাঁর তখন ধ্যাননিরত আপন ভোলা অবস্থা—"একলা ব'সে আপন মনে গাইতেছিলাম গান", এমন সময়ে "তোমার কানে গেল সে সুর, এলে তুমি নেমে।" দেখা পেয়ে কবি বলেন—"আমারে যদি জাগালে আজি নাথ, ফিরো না তবে ফিরো না, কর করুণ আঁখিপাত" (৮৭)। এই প্রাপ্তির মুহূর্ত গুলিকে কবি তাঁর সুরের আলোয়, কল্পনার রঙে অতিশয় উজ্জল ক'রে রেখেছেন। নানা রূপে, নানা ভাবে তাঁর পরম প্রিয়তমাকে বরণ করেছেন। কোথাও ভক্তকে অতর্কিত অবস্থায় পেয়ে দেবতা খেলাচ্ছলে তাকে ছলনা করেন। কখন কে যেন "দরিদ্র ক্ষীণ মলিন বেশে সঙ্কোচেতে একটি কোণে" এসে লুকিয়ে থাকে, রাতে কিন্তু প্রবল হয়ে পশে দেবালয়ে আর "মলিন হাতে পূজার বলি হরণ করে" (৮১)। কখন আবার প্রাণে দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যায়, তার পর কোন্‌খানে লুকিয়ে থাকে তা কেউ জানে না, কিন্তু সেই হারিয়ে ফেলার হতাশার মধ্যে কোথা হ'তে আবার সাড়া দেয়" (১৩৬)। কবিকে তাই বিস্ময়বিহ্বল হ'য়ে স্বীকার করতে হয়—"তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই, বারে বারে নূতন লীলা তাই।" অতএব এই জন্মের রাত্রি ভোর হবার পর নবজীবনের আলোয় গিয়ে যখন "আবার এ হাত ধরবে কাছে এসে, লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর" (১৩৪)। সে নূতন দেখা পরম দেখা, সব চাওয়া সব পাওয়ার সমাপ্তি। সেখানে উদ্বেগের ঝড় ঝঞ্ঝাবাত নেই, সেখানে আছে স্থির পরিপূর্ণ শান্তির স্নিগ্ধ উজ্জল আলো আর চিরন্তন প্রেমের মলয় পরশ। সেই মহান প্রশান্ত নিস্তব্ধতায়—

> হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি,
> স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
> তোমার চরণপানে নয়ন করি নত
> ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।

কবির কল্পনার ঐশ্বর্য্যের এই সম্ভার শিল্পের মণিকোঠার সামগ্রী। ভাবের সংহত গতিবেগ এক শুভ মুহূর্ত্তে শিল্পীর তুলির অপেক্ষা করতে থাকে। কবি আর শিল্পীর সৃষ্টির সে এক পরম মুহূর্ত্ত; একটা দুর্লভ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে পূর্ণ তৃপ্তির সূচক।

নয়নামতীর চর

বন্দে আলী মিয়া

বরষার জল সরিয়া গিয়াছে জাগিয়া উঠেছে চর,
গাঙ শালিকেরা গর্ত খুঁড়িয়া বাঁধিতেছে সবে ঘর।
গহিন নদীর দুই পার দিয়ে আঁখি যায় যত দূরে
আকাশের মেঘ অতিথি যেন গো তাহার আঙিনা জুড়ে।
মাছরাঙা পাখী এক মনে চেয়ে কঞ্চিতে আছে বসি'
ঝাড়িতেছে ডানা বন্যহংস—পালক যেতেছে খসি'।
তট হতে দূরে হাঁটু জলে নামি' এক পায়ে করি' ভর
মৎস্যের ধ্যানে বক দুটি চারি সাজিয়াছে ঋষিবর।
পাখ্না মেলিয়া কচি রোদে শুয়ে উদাসী তিতির পাখী
বারে বারে দুটি ডানা ঝাপটিয়া ধূলাবালি লয় মাখি'।
বিরহিণী চখী চখারে পাইয়া কত কী যে কথা কয়,
গাঙচিল শুধু উড়িয়া বেড়ায় সকল পদ্মাময়।
ডুবানো না'য়ের গলুয়ের 'পরে শুয়ে শুয়ে কাঁচা রোদে
ধাড়ি কচ্ছপ শিশু জলসাপ আলসে নয়ন মোদে।
বুনো ঝাউ গাছে টুনটুনি পাখী বেঁধেছে পাতার বাসা,
বাব্লার ডালে ঘুঘু-দম্পতি জানাইছে ভালোবাসা।
ভোর না হইতে ডাহুক ডাহুকী করিতেছে জলকেলি।
জলভরা ক্ষেতে খুঁজিছে শামুক পানিকো'র সারা বেলি।
কাঁচা বালুতটে চরণচিহ্ন রেখে গেছে খঞ্জনা,
পুচ্ছ নাচায় সুঁইচোর পাখী—চা'হ্ সুধু আন্মনা।
ফড়িং খুঁজিতে শালিকের ঝাঁক করিতেছে কলরব,
লক্ষ হাজার বালিয়া হাঁসের দিন ভরা উৎসব।

*　　*　　*　　*

দুপুরের রোদে খাঁ খাঁ করে চর দূর গ্রামে মাথা কালী,
উত্তরে বায়ে শিশু মরু হতে উড়ে যায় সুধু বালি।
অশথের তলে জলিধান লাগি' চাষীরা বেঁধেছে কুঁড়ে,
কাঁচা যবশীষ আলোর ডাকেতে এসেচে সে মাটি ফুঁড়ে।
ছায়া আর রোদে ঝিকিমিকি জ্বলে হাজার ঊর্ম্মিদল,
কূলে কূলে তার আছাড়িয়া-পড়া দিনে রাতে কোলাহল।
দুপুরে যেদিন নেমেছে সন্ধ্যা মেঘেতে ঢেকেছে বেলা,
গাঁয়ের মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসিতে না করে হেলা।
কেহ আসে একা—দল বেঁধে কেহ—চলে তারা তাড়াতাড়ি,
পথে যেতে যেতে খুলে দিয়ে গরু তাড়াইয়া আনে বাড়ী।
গোহালের পাশে শুকানো যে ঘুঁটে ধামায় ভরি' তা লয়'
কঞ্চির বেড়া ধরিয়া বধূরা প্রিয়-পথ চেয়ে রয়।
দোকানীর বউ নদী পানে ধায় কোথা গেছে নেয়ে তার,
এমন বাদলে কোন্ হাটে তার বিকাইবে সম্ভার!
জাল বোনা ভুলি জেলের যুবতী বিরহ দিবস গণে,
কোথা ধরে মাছ জেলে যে তাহার এমন উতলা ক্ষণে।
কালো মেঘে ছায় পূব্ব ঈশাণ জোরে জোরে বায়ু বয়,
বলাকার সারি শকুনের ঝাঁক উড়িছে আকাশময়।

আলোচনা

বাল্য বিবাহ

শ্রীমায়া দেবী

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি শ্রীযুক্ত হরবিলাস সারদার বিল লইয়া একটা মহা আন্দোলন চলিয়াছে ; কাহারও মতে তাহা ভাল,—কাহারও মতে মন্দ। বাল্য বিবাহ ভাল কি মন্দ, তাহাতে উপকার হয় কি অপকার হয়, সে সব বিষয়ে আমি কোন কথাই বলিতেছি না, আমি শুধু তাঁহাদের প্রতিবাদ করিতেছি যাঁহারা বলিতেছেন ইহাতে ধর্ম্মের হানি হয়। তাঁহারা মনু হইতে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছেন, যুক্তি ও তর্কদ্বারা সপ্রমাণ করিতে চাহেন, ইহা ধর্ম্মের হানিকর। স্বীকার করিলাম ;—আমিও তাঁহাদের কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, আশা করি উত্তর পাইব।

(১) কয়জন ব্রাহ্মণ সন্তান এখনও বাল্যে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া পাঠাভ্যাস পূর্ব্বক যৌবনে গৃহী হন ?

(২) কয়জন ব্রাহ্মণ গৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখেন ?

(৩) কয়জন ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় জীবন অতিবাহিত করেন ?

(৪) কে পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিলে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করেন ?

(৫) কয়জন নির্লোভ, সত্যব্রত, বিদ্বান, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ আছেন ?

(৬) ক্ষত্রিয় বা কায়স্থের মধ্যে কয়জন যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে অংশ লয়েন ?

(৭) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় ? বলিবার মত শক্তি আজিও কয়জন ক্ষত্রিয়ের আছে ?

(৮) কয়জন ক্ষত্রিয় বিপন্নের রক্ষা, আর্ত্তের সাহায্য, নারীর সম্ভ্রম, এবং শিশু ও বৃদ্ধের প্রাণ রক্ষার্থে অগ্রগামী হন ?

(৯) কয়জন বৈশ্য আজিও সর্ব্বতোভাবে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন ?

(১০) কয়জন গ্রাম-বৃদ্ধ জ্ঞানাবোধে পূজিত হন ?

আশাকরি মনুর পদ্ধতি ও ইহাদের আজি কালিকার জীবন যাত্রায় অনেক প্রভেদ হইয়াছে। আমার ধারণা ইহার সদুত্তর কেহই দিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য ভারতে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ; ইহাঁদের ভিতর হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সাগর পারে যাইতেছেন,---ইহাও ত এককালে ধর্ম্মের ক্ষতি জনক ছিল, তবে তাহা চলিল কি করিয়া ?

এ দিক ছাড়িয়া বাল্য বিবাহ ধরা যাক। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা—যাঁহাদের আধুনিক সভ্যতার বাতাস গায়ে লাগিয়াছে, তাঁহারা সত্যই কি গৌরী দানের পক্ষপাতী ?

মুখে যিনি যাহাই বলুন, শিরোমণি, তর্কচূড়ামণি, শাস্ত্রী বা বাচস্পতি,—কেহই আজকাল স্বীয় কন্যাকে গৌরী দান করিয়া পরমার্থ লাভের বাসনা করেন না, বরং দেখা যায় কন্যা, একটু শিক্ষিতা ও বয়স্থা হয়, এবং ১০ বা ১২ বৎসরের অধিক বয়জ্যেষ্ঠের সহিত তাহার বিবাহ না হয় ইহাই প্রত্যেক পিতামাতা ইচ্ছা করেন। তদনুরূপ পাত্রও খুঁজিয়া থাকেন। অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে চতুর্বিংশ বর্ষীয় যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিবার কল্পনা ধর্ম্মপাগল হিন্দুও আজকাল করেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে উচ্চবর্ণের ভিতর বাল্য বিবাহ স্বতঃই কমিয়া আসিতেছে। বাল্য বিবাহ এখনও অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর ভিতরেই গণ্ডিবদ্ধ। তবে কি বুঝিতে হইবে হিন্দু-ধর্ম্ম-সংরক্ষণ রূপ মহৎ কর্ত্তব্য, কেবল মাত্র হাড়ি, ডোম, কামার, কাহারের কর্ত্তব্য ? তাহারাই চতুর্দ্দশী কন্যার বিবাহ দিলে হিন্দুধর্ম্ম পতিত হইবে ?

চলচ্চিত্রে ক্রাইষ্ট

দশ বৎসর পূর্ব্বে চলচ্চিত্রে খৃষ্ট মূর্ত্তি প্রদর্শন বিশেষ অপরাধের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। পাদ্রীগণের মতে ইহা দ্বারা ঈশ্বরতনয়ের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আর্টের দিক হইতে চলচ্চিত্রের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে পাদ্রীগণ এখন আর ঐ মত পোষণ করিতে পারেন না। এখন গির্জ্জায়
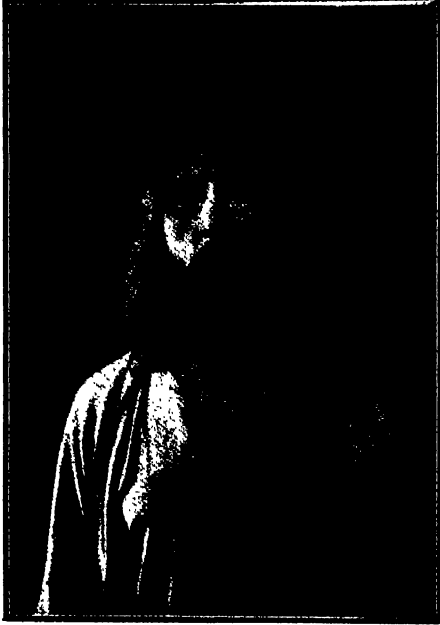
খ্রীষ্টের ভূমিকায় জঁা ডেল্ ভাল্

উপাসনার সময়ে চলচ্চিত্রে খৃষ্টচরিত প্রদর্শিত হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ক ফিল্ম যে আদৌ ছিল না তাহা নয়, তবে বাস্তবিক মনে ভক্তির উদ্রেক করিতে পারে এমন ফিল্মের প্রকৃতই অভাব ছিল।

বেনহুর নামক ফিল্ম লণ্ডনে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে এত বেশী দিন যাবৎ কোনও ফিল্ম লণ্ডনে প্রদর্শিত হয় নাই। বেনহুরে যীশুর একখানি হাত মাত্র দেখান হইত।

কিং অব্ কিংস্ নামক ফিল্মেই সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। এই ফিল্মখানি প্রথমে গির্জ্জায় প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয় পরে যখন সর্ব্বসাধারণে প্রদর্শিত করাইবার আয়োজন হয় তখন ইহার বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে নানা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতের সংবাদপত্রগুলিও এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিলাতের ফিল্ম সেন্সর্ এই ফিল্ম প্রদর্শনে অনুমতি দেন নাই, লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের অনুমতি লইয়া ইহা সাধারণে প্রদর্শিত হয়। কাউন্টি কাউন্সিল অনুমতি দিবার সময়ে কতকগুলি সর্ত্ত করাইয়া লইয়াছিলেন, যথা, এই ফিল্মের সহিত অপর কোনও ফিল্ম প্রদর্শিত হইবে না, প্রদর্শনের সময়ে দর্শকগণ ধূমপান করিতে পারিবে না ইত্যাদি।

এখন মনে হয় এই প্রকারের ফিল্ম যদি যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত প্রদর্শিত হয় তবে পাদ্রীগণের দিক হইতে কোনও আপত্তি উঠিবে না।

কিং অব্ কিংসের মত এত বেশী দিন আর কোনও চিত্র প্রদর্শিত হয় নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত বায়োস্কোপ এমন ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যে ধর্ম্মবিষয়ক ফিল্ম যত বেশী প্রদর্শিত হয় ততই মঙ্গল চলচ্চিত্রপ্রদর্শনের দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উপদেশ-দানে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। আশা করা

যায়—ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণ এই বিষয়ে আমেরিকার উদাহরণ গ্রহণ করিবেন। আমেরিকায় ইতিমধ্যেই নীতি ও ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভূত উপকার পাওয়া গিয়াছে।

রিলিজিয়াস্ মোশন পিক্‌চার ফাউণ্ডেশন নামক এক সমবায় পাদ্রীগণের সাহায্যের জন্য কতকগুলি চিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। চিত্রগুলিতে বিশেষ করিয়া খৃষ্ট মূর্ত্তি নানাভাবে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই সমবায়টি তিন বৎসর পূর্ব্বে উলিয়ম হারমান নামক একজন মার্কিণ জনসুহৃদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খুব উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা দ্বারা কতকগুলি অসাম্প্রদায়িক চিত্র প্রস্তুত করিবেন যাহাতে ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার সময় এই চিত্রগুলি উপাসকবৃন্দের মনে ভক্তি আনয়ন করিতে পারে।

খৃষ্টীয় উপাসকগণ উপাসনার সাহায্যকল্পে এই চিত্রগুলিকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা লইয়া এক আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। কারণ খৃষ্টীয় পাদ্রীগণের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে চলচ্চিত্রের দ্বারা জনসমাজে নৈতিক অবনতি হইয়াছে এবং ইহা অনেক পরিবারে অনেক অশান্তি আনয়ন করিয়াছে। এখন কিন্তু তাঁহাদের আর সে মত নাই, এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চলচ্চিত্রের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করেন।

পুরাতন ধর্ম্মমন্দিরের জানালার বিচিত্র কাচ হইতেই ধর্ম্মবিষয়ক ফিল্ম পরিকল্পিত হয়। বহু শতাব্দী যাবৎ গির্জ্জার চিত্রিত জানালা ধর্ম্মমন্দিরের গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। অবশ্য অনেকে মনে করেন ধর্ম্মমন্দির কোনও প্রকার চিত্র দ্বারা পরিশোভিত হওয়া উচিত নয় কিন্তু জানালার চিত্র গির্জ্জার শোভার জন্য অঙ্কিত হইত না পরন্তু য়ুরোপে মধ্যযুগে জনসাধারণের মধ্যে বাইবেলের কাহিনী হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই চিত্রিত হইত। প্রাচ্য দার্শনিকগণ বলেন একখানি ভাল চিত্র দ্বারা দশ সহস্র বাক্যের কার্য্য হয়। রিলিজিয়াস মোশন পিকচার সমবায় দ্বাদশ শতাব্দীর গির্জ্জার জানালার কাচের চিত্রের অনুকরণে খৃষ্ট চরিতের ফিল্ম-গুলি প্রস্তুত করিয়াছেন।

শেষ ভোজ

এই সকল চিত্রে বাইবেলের কাহিনীগুলি সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে তাঁহাদের অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে। নানাপ্রকার লোকমতেরও অনুসরণ করিতে হইয়াছে। কারণ ক্রাইষ্টকে নানা লোকে নানাভাবে দেখিয়া থাকেন। রোমান ক্যাথলিকগণের মতে ক্রাইষ্ট পৃথিবীর দুঃখ কষ্টে এত ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং মানবের নানাপ্রকার পাপাচারে এত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন যে তিনি কখনও হাসেন নাই। আর এক সম্প্রদায়

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

যীশু ও মেরি মেগ্‌ডেলিন্‌

চারিখানি ফিল্ম প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে (১) ক্রাইষ্ট তাঁহার সমালোচকগণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। (২) অনাহূত অতিথি। (৩) আমাদের ঋণ হইতে মুক্ত কর। (৪) নব্য ধনী শাসক। এই ফিল্মগুলি হইতে কতকগুলি চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হইল। চিত্রগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় অভিনেতাগণ তাঁহাদের কার্য্যে কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা সাধারণ বায়োস্কোপের চিত্রের সহিত পরিচিত তাঁহারা এই চিত্রগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

ক্রাইষ্টকে বলিষ্ঠ, পেশীবহুল, বলবান যোদ্ধার চক্ষে দেখেন। তাঁহারা মনে করেন বিজয়ী বীরের ন্যায় তিনি সকল বিপদ আপদের সম্মুখীন হইতেন। নিজের মনের বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা উদাসীন থাকিতেন এবং মানবের দুঃখ দেখিয়া যেমন ব্যথিত হইতেন তেমনই তাহাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিতেন। এই প্রকার নানা সম্প্রদায়ের লোকের নানাপ্রকারের মনোভাবের সামঞ্জস্য করিয়া ফিল্মগুলি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের মনে যাহাতে কোনও প্রকার আঘাত না লাগিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তথ্যনিরূপণের জন্যও অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইজ্রায়েলের জাতি ও পুরাতন যিরুশালেমের অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সম্পূর্ণ ভাবে কোনও প্রকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায় নাই। মেজর ডলি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণকে সকল বিষয়ে নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়া সেই সময়ে প্রচলিত রীতি নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ ও সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহারের বিষয় বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। চিত্রগুলিকে যতদূর সম্ভব সঠিক ভাবে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

যীশু খ্রীষ্ট

সাধারণত বায়োস্কোপে পোষাক পরিচ্ছদ ও আসবাব ইত্যাদির দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় কিন্তু

তাঁহাদের সমস্ত মন দিয়াই অভিনয় করিতেন। এই সকল কারণে অভিনয়গুলি মনোজ্ঞ হইয়া উঠিতে পারিত।

এই ফিল্মগুলি আমেরিকায় প্রায় তিনশত গির্জ্জায় উপাসনার সময়ে ব্যবহৃত হয়। অনেক রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদের নিকটও প্রদর্শিত হয়।

যদি এই ভাবে চলচ্চিত্রের উন্নতি সাধিত হয়, ত আশা করা যাইতে পারে যে এমন সময় আসিবে যখন সমস্ত ধর্ম্ম-মন্দিরে উপাসনার সময়ে চলচ্চিত্রের সাহায্য অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ল্যাজারাস্-এর পুনর্জ্জীবন

মেজর ডলি সে সব দিকে খুব বেশী মনোনিবেশ না করিয়া বাইবলের গল্পটি যাহাতে হৃদয়গ্রাহী করিয়া অভিনীত হয় সেই দিকেই তিনি তাঁহার সমস্ত উদ্যম ও চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছেন।

চিত্রগুলি প্রস্তুত করিবার সময়ে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া চিত্রগুলি প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহাদের উপদেশ যত্নের সহিত পালন করিতেন। এই ভাবে চিত্র-গুলিকে তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন।

অভিনয়ের সময়ে যখন বায়োস্কোপের সাহায্যে ফটো তোলা হইত তখন অনেক লোক আসিয়া ভিড় করিত—সেই ভিড়ের মধ্যে দেখা গিয়াছে—অনেকেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দাঁড়াইয়া দেখিত কেহ কেহ বা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না।

"কিং অব্ কিংস্"-নাটকে যীশুখ্রীষ্টের ভূমিকায় এইচ্, বি, ওয়ারনার

আর একটি সুবিধা হইয়াছিল অভিনেতাগণের মধ্যে তিনশত থিয়োলজিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন—তাঁহারা

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সাকারা মেমফিস্ নগরীর সমাধি

গত পাঁচ বৎসর যাবৎ মিশর গভর্ণমেণ্ট কায়রো সহরের বারো মাইল দক্ষিণস্থ সাকারা সমাধির খননকার্য্যে নিরত আছেন। কয়েকটা পিরামিড্ ও নানা যুগের বহু পারিবারিক সমাধি মিলিয়াই সাকারার সম্পদ। এই সকল সমাধির মধ্যে দুইটি মাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। থীব্স্ ভিন্ন এত বড় সমাধি মিশরে আর নাই। সাকারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ক—সিঁড়ি-ওয়ালা পিরামিড্।

খ, খ—রাজপরিবারের সমাধি, ছোট পিরামিড্।

গ—উৎসব-গৃহ।

ঘ—প্রবেশ-দ্বারের স্তম্ভশ্রেণী।

ঙ—অচল-দ্বারবিশিষ্ট ছোট অট্টালিকা।

আকর্ষণ—রাজা জোসারের (Zoser) সিঁড়ি-ওয়ালা পিরামিড্ (Step-Pyramid) এবং পবিত্র ওসিরিস (Osiris) দেবতার প্রতীক বৃষভের সমাধি (Apis Bulls)। কয়েক বৎসরের বিপুল চেষ্টার ফলে বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে আরও কয়েকটা অট্টালিকার অস্তিত্বের আভাস, নানা যুগের কতকগুলি স্থাপত্যের অংশ ও প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহলপূর্ণ কয়েকটা ছোট ছোট জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মেমফিস্ যে প্রাচীন মিশরের সর্ব্বপ্রধান নগরী ছিল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সকল দেশেই বড় নগরীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান ক্রমে ক্রমে নগরীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে, ক্রমে ধনে জনে ঐশ্বর্য্যে এত সমুন্নত হয় যে, পূর্ব্ব-নগরীর প্রাধান্য বহুলাংশে কমিয়া আসে—এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তেমনি মিশরের রাজধানীও মেম্ফিস্ হইতে সরিয়া প্রথমে ফস্টাটে ও পরে কায়রোতে আসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেম্ফিসের পূর্ব্বগৌরব ও সমৃদ্ধির কথা লোকের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান খননের ফলে এমন বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—যাহাতে অনায়াসেই বুঝা যায় সাকারাতে পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী নগরীর মত একটা কিছু ছিল। খুব সম্ভবত "মার্পেবা"—নামক প্রথম রাজবংশই ইহার স্থাপয়িতা। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৮০০ অব্দে ইহা মিশরের রাজধানী-রূপে পরিণত হয়। প্রায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া মেম্ফিস্ তাহার এই প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়াছিল। পরে তাহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িলেও থীব্স্ ভিন্ন অন্য কোন নগরীই তাহার অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হয় নাই। শুধু যে রাষ্ট্রীয় কারণেই মেম্ফিসের এত প্রতিপত্তি ছিল তাহা নহে; আলেক্জেণ্ড্রিয়ার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা উত্তর আফ্রিকার একমাত্র প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ফারাও জোসারের পিরামিড্ই (সিঁড়ি-ওয়ালা পিড়ামিড্) সাকারার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। মিশরের প্রাচীনতম রাজগণের মস্তাবা সমাধাগুলির অপেক্ষা বহু অংশে বৃহৎ এই প্রকার পিরামিড্জাতীয় সমাধি জোসারের কবরের উপরই সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয়। মাত্র

ছয়টি ধাপে এই সমাধি মন্দির ২০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছে। ইহা হইতে এক একটি ধাপের বিশালতা সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়।

সিঁড়ি-পিরামিডের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আরও দুইটি ছোট ছোট পিরামিড্ পাওয়া গিয়াছে। এগুলি নিশ্চয়ই রাজ-পরিবারস্থ লোকদের সমাধি। এই ছোট পিরামিড্ দুইটির উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁসিয়া দুইটি ভজনালয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। উন্মুক্ত আঙ্গিনা ও পিরামিড্-ঘেঁসা দেয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গি ভিন্ন এই ভজনালয়ের আর কোন সাজসজ্জা নাই। তবে এই সকলের গঠনপ্রণালীতে বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। কেন না দেয়ালের গায়ে যে রাজবংশের আমলে মিশরে যে সব স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেগুলি মসৃণ। কিন্তু এই ভজনালয়ের স্তম্ভগুলি 'পল তোলা' (শির-বিশিষ্ট)। শীর্ষদেশে, আবার স্তম্ভের গা বাহিয়া দুইটি বৃক্ষপত্রাকৃতি পদার্থ নামিয়া আসিয়াছে। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। কেন না, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এইরূপ পল-তোলা স্তম্ভ বহু বহু কাল পরে বেনিহাসান্ এবং আশুয়ান-এর সমাধিতে প্রথম নির্ম্মিত হয়। তাহা হইলে বেনিহাসানের হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত সাকারার ভজনালয়ের ইহার অস্তিত্ব পরম বিস্ময়ের বস্তু নহে কি? বিশেষত এইরূপ সুদৃঢ় স্তম্ভ অদ্যাবধি মিশরের আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।
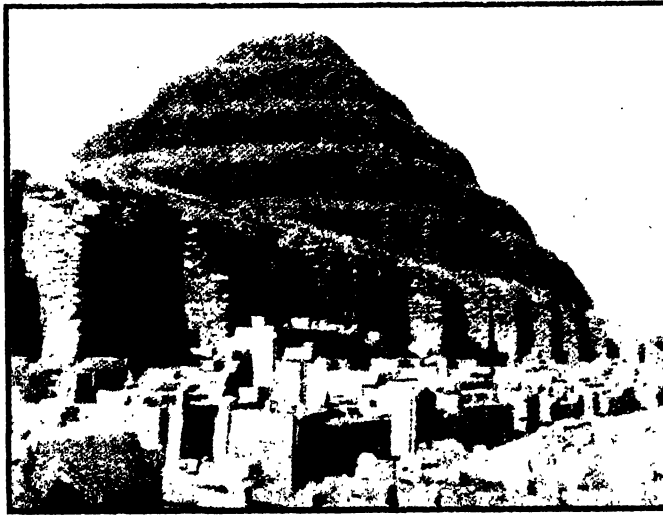
সিঁড়িওয়ালা পিরামিড্

স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, তেমন স্তম্ভ এই যুগে আর কোথাও দেখা যায় না। কোনওরূপ অবলম্বন ভিন্নও যে স্তম্ভ দৃঢ় নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে—সেই যুগে সেই ধারণা লোকের ছিল না। কিন্তু সাকারার ভজনালয়ের এই স্তম্ভগুলি দেখিয়া মনে হয় উহার স্থপতিরা এই বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ছিল না। রীতিমতভাবে স্বাবলম্বী স্তম্ভনির্ম্মাণ (মিশরের পঞ্চম রাজবংশের রাজত্বসময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়) প্রবর্ত্তিত হইবার প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বেও মেম্‌ফিসে ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে বেশ ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পঞ্চম

প্রধান পিরামিডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বিশাল একটা আঙ্গিনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিরামিডের কাছাকাছি এই আঙ্গিনার একদিকে পর পর অনেকগুলি ভজনালয় সজ্জিত আছে। প্রত্যেকটি ভজনালয়ের ভিতর সমান্তরালভাবে দুইটি করিয়া প্রকোষ্ঠ। এই ভজনালয়গুলির সঠিক ইতিহাস এখনও উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। তবে অনেক আন্দাজ করেন যে, মিশরের অতি প্রাচীন যুগে অনুষ্ঠিত "হেব্‌সেড্" উৎসবের সঙ্গে ইহার নিশ্চয়ই কিছু সম্বন্ধ আছে। মিশরীয় রাজগণের সিংহাসন-আরোহণের ত্রিংশবার্ষিক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

উৎসবের নাম ছিল "হেব্‌সেড্‌ উৎসব। এই কথা মনে করিয়াই খননকারীরা এই ভজনালয়শ্রেণীর নাম দিয়াছে—"উৎসবগৃহ"। এই ভজনালয়গুলির পশ্চাতের দেয়ালেও পূর্ব্ব-বর্ণিতরূপ 'পল্‌-তোলা' পত্রবিশিষ্ট স্তম্ভ-সারি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্তম্ভগুলির শীর্ষস্থ পত্রের মধ্যে আবার নূতনতর কারুকার্য্য আছে। পত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটা তাম্রনির্ম্মিত চোঙ্‌ বা নল সম্মুখে স্তম্ভশ্রেণীর পশ্চাতস্থ ছাদের সঙ্গে লাগানো হইয়াছে। সম্ভবত ছাদের জলনিষ্কাষণের জন্যই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার বলেন ভজনালয়ে হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জলসরবরাহের জন্যেই এই নল লাগানো হয়।

এই সকলের অপেক্ষাও বেশি কৌতূহলোদ্দীপক ভজনালয়ের অভ্যন্তরস্থ অচল চিরস্থবির দ্বারসমূহ। এই দরজাগুলি অখণ্ডপ্রস্তরনির্ম্মিত। কিন্তু এইগুলিকে উন্মুক্ত বা বন্ধ করিবার উপায় নাই, একেবারে চিরতরে গ্রথিত। এই দ্বারের প্রস্তরগুলি এমন ভাবে কুঁদিয়া তোলা হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন উহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। প্রস্তরগাত্রে খোদিত এইরূপ কাষ্ঠ-ভ্রমোৎপাদক কারুকার্য্যই এই অট্টালিকাগুলির প্রধান বিশেষত্ব।

"উৎসবগৃহের" পশ্চিমে আর একটি ছোট অট্টালিকা আছে। ইহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত অচল দ্বার ভিন্ন আর কোনও বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

সাকারায় ব্যবহৃত প্রস্তরগুলির একটা বেশ লক্ষ্য করিবার মত বিশেষত্ব আছে। এগুলি সাধারণ প্রস্তর নহে। মেম্‌ফিস্‌ হইতে কয়েক মাইল নিম্নে 'নীল' নদের পূর্ব্ব তীরে টুরা নামক স্থানে "চূর্ণ প্রস্তরের" (Lime Stone) খনি আছে। মিশরের ধূম্রবিহীন আকাশের নির্ম্মল আলোতে এই অপূর্ব্ব প্রস্তরভবনগুলি যে কি মনোরম দেখাইত তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত প্রস্তর কাটিয়া টুরা হইতে সাকারায় আনিতে এবং এই সুবিশাল অট্টালিকাগুলি নির্ম্মাণ করিতে যে কি পরিমাণ শ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা ভাবিতে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়।

বিশেষজ্ঞেরা স্থির করিয়াছেন, প্রাচীন সুমেরিয়ান স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে মিশরের এই মন্দির-শিল্পের সম্বন্ধ আছে। এই সময়ে অট্টালিকানির্ম্মাণে ইষ্টকের সঙ্গে কাষ্ঠ, কাঞ্চি প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সাকারায় প্রস্তরভবনগুলিতে কাষ্ঠ কারুশিল্পের অনুকরণ-চিহ্ন যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। জোসারের পূর্ব্বে আর কখনও প্রস্তর-ভবন নির্ম্মাণের কথা শুনা যায় নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, প্রস্তর-ভবন-নির্ম্মাণ-শিল্প মিশরে একেবারেই অতি উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ কথা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিনোৎসব

কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডে বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে গত ১লা ডিসেম্বর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মদিনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েচে। যে-সকল মহৎ ব্যক্তি নিজেদের জ্ঞান অথবা প্রতিভার সহায়তায় জগতের কল্যাণসাধন করেছেন তাঁদের জন্মকাল জগতের পক্ষে শুভ-

আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

ক্ষণ, অতএব সর্ব্বতোভাবে স্মরণীয় এবং বরণীয়। প্রতি বৎসর তারিখ অথবা তিথি হিসাবে একদিন সেই শুভদিন উপস্থিত হয় এবং আয়ুষ্কালের বৎসর-সংখ্যা একটি সংখ্যায় বাড়িয়ে দিয়ে চ'লে যায়। সেই শুভ-দিবসে উৎসবের অনুষ্ঠান ক'রে যাঁরা কোনো মহৎ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন তাঁদের কারবার সেদিন শুধু দেওয়ারই নয়, পাওয়ারও। মহত্ত্বকে স্বীকার করতে হ'লে মহত্ত্বের সান্নিধ্য অনিবার্য্য। গুণীর কীর্ত্তন গুণের কীর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে জগদীশচন্দ্র যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তার প্রসার কেবল মাত্র ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সমস্ত পৃথিবীময় তার পরিব্যাপ্তি, বিদেশের দুষ্প্রবেশ যশোমন্দিরে সে খ্যাতি তাঁর জন্যে উচ্চাসন সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েচে। তাই সেদিন তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে পৃথিবীর নানা প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন-লিপির অভাব হয় নি।

ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবচন আছে,—A black hen can lay a white egg। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁর সুদীর্ঘ সাধনা এবং সুকঠোর সংগ্রামের সফলতায় এই সরল সত্যের নিগূঢ় মর্ম্মটুকু অনেককে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছেন। যে সত্য জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন তার নূতনত্বের এবং অপূর্ব্বত্বের প্রভাবে অনেককে স্বীকার করতেই হয়েচে যে বিশ্ব-জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের দান করবার কিছু থাক্‌তে পারে।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের অভিনবত্বের মূল কারণ তাঁর অনুশীলন প্রক্রিয়ার ধারা— যা একান্তই প্রাচ্য প্রথানুগত। চিত্তকে অনুসরণ করে; চক্ষু উন্মীলিত ক'রে তিনি যা দেখেন তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেন চক্ষু নিমীলিত

মদন ও রতি

শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৩৫ | চতুর্থ সংখ্যা

পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মলাক্কা

কল্যাণীয়াসু,

এখনি দুশো মাইল দূরে এক জায়গায় যেতে হবে। সকলেই সাজ সজ্জা ক'রে জিনিষপত্র বেঁধে প্রস্তুত। কেবল আমিই তৈরি হ'য়ে নিতে পারিনি। এখনি রেলগাড়ির উদ্দেশে মোটর গাড়িতে চড়তে হবে। দ্বারের কাছে মোটর গাড়ি উদ্ধত তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করচে— আমাদের সঙ্গীদের কণ্ঠে তেমন জোর নেই কিন্তু তাদের উৎকণ্ঠা কম প্রবল নয়। অতএব এইখানেই উঠ্‌তে হোলো। দিনটি চমৎকার। নারকেল গাছের পাতা ঝিল্‌মিল্ করচে, ঝর্‌ঝর্ করচে, দুলে দুলে উঠ্‌চে, আর সামনেই সমুদ্র স্বগত-উক্তিতে অবিশ্রাম কলধ্বনি-মুখরিত। ইতি ৩০ জুলাই ১৯২৭

টাইপিং

গোলমাল ঘোরাফেরা দেখাশোনা বলাকওয়া নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ফাঁকে ফাঁকে যখুন তখন দুচার লাইন ক'রে লিখি, ভাবের স্রোত আট্‌কে আট্‌কে যায়, তার সহজ গতিটা থাকে না। এ'কে চিঠি বলা চলে না। কেননা এর ভিতরে ভিতরে কর্ত্তব্যপরায়ণতার ঠেলা চল্‌চে—সেটাতে কাজকে এগিয়ে দেয়, ভাবকে হয়রান করে। পাখী ওড়ায় আর ঘুড়ি ওড়ায় তফাৎ আছে। আমি ওড়াচ্চি চিঠির ছলে লেখার ঘুড়ি—কর্ত্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা—কেবলি হেঁচ্‌কে হেঁচ্‌কে ওড়াতে হয়।

ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচি। দিনের মধ্যে দুতিন রকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা; নিমন্ত্রণ ইত্যাদি, গীতার উপদেশ যদি মান্‌তুম, ফললাভের প্রত্যাশা যদি না থাকৃত তা হ'লে পাল-তোলা নৌকার মতো জীবনতরণী তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পারত। চলেচি উজান বেয়ে, গুণ টেনে, লগি ঠেলে, দাঁড় বেয়ে, পদে পদে জিব বেরিয়ে পড়চে। আমৃত্যুকাল কোনোদিন কোথাও যে সহজে ভ্রমণ করতে পারব সে আশা বিড়ম্বনা। পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প; অর্জ্জন করতে করতে গর্জ্জন করতে

করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জ্জন করতে করতে আমার ভ্রমণ,—গলা চালিয়ে আমার পা চালানো। পথে বিপথে যেখানে-সেখানে আচম্কা আমাকে বক্তৃতা করতে বলে, আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ব'কে যাই—আমেরিকায় মুড়ি তৈরি করবার কলের মুখ থেকে যেমন মুড়ি বেরোতে থাকে সেই রকম। হাসিও পায় দুঃখও ধরে। পৃথিবীর পনেরো আনা লোক কবিকে নিয়ে সর্ব্বসমক্ষে এই রকম অপদস্থ করতেই ভালোবাসে, বলে "মেসেজ্ দাও।" মেসেজ্ বল্‌তে কি বোঝায় সেটা ভেবে দেখো। সর্ব্বসাধারণ নামক নির্ব্বিশেষ পদার্থের উদাসীন কানের কাছে অত্যন্ত নির্ব্বিশেষ ভাবের উপদেশ দেওয়া, যা কোনো বাস্তব মানুষের কোনো বাস্তব কাজেই লাগে না। পরলোকগত বহুসংখ্যক পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশে পাইকেড়ি প্রথায় পিণ্ড দেওয়ার মতো,—যে হেতু সে পিণ্ড কেউ খায় না, সেই জন্যে তাতে না আছে স্বাদ, না আছে শোভা। যে হেতু সেটা রসনাহীন ক্ষুধাহীন নামমাত্রের জন্যে উৎসর্গ করা সেই জন্যে সেটাকে যথার্থ খাদ্য ক'রে তোলার জন্যে কারো গরজ নেই মেসেজ্ রচনা সেই রকম রচনা।

আজ বিকেলের গাড়ীতে পিনাঙ যেতে হবে। তার আগে যদি, সুসাধ্য হয় তবে, নাওয়া আছে, খাওয়া আছে যদি দুঃসাধ্য হয় তবু একটা মিটিঙে গিয়ে বক্তৃতা আছে ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, অবকাশ নেই; তারপরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা, তারপরে ষ্টেশনে মাল্যগ্রহণ, এড্রেস্ শ্রবণ তদুত্তরে বিনতি প্রকাশ, তারপরে নতুন বাসায় নতুন জনতার মধ্যে জীবনযাত্রার নতুন ব্যবস্থা, তারপরে ১৬ই তারিখে জাহাজে চ'ড়ে জাভায় যাত্রা—তারপরে নতুন অধ্যায়। ইতি ১৩ অগস্ট্ ১৯২৭

—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬
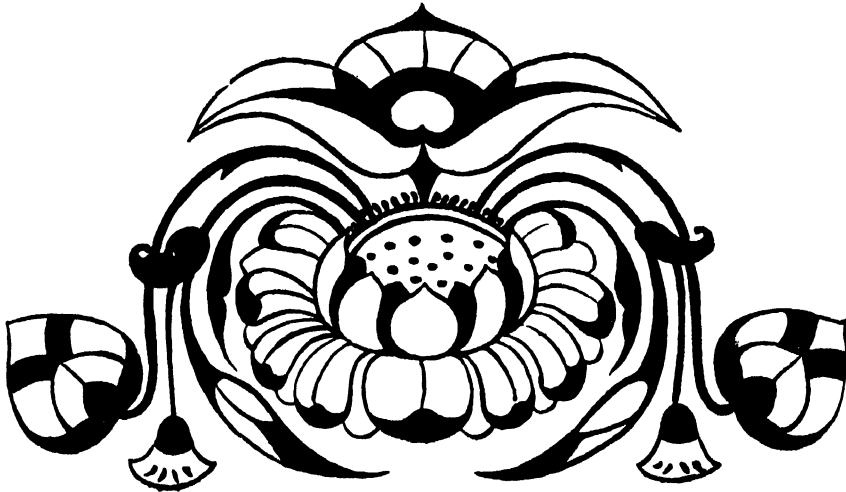
বাড়ির সামনে আসতেই পাল্কীর দরজা একটু ফাঁক ক'রে কুমু উপরের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। রোজ এই সময়টা বিপ্রদাস রাস্তার ধারের বারান্দায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ত, আজ দেখ্‌লে সেখানে কেউ নেই। আজ যে কুমু এখানে আস্‌বে সে খবর এ বাড়িতে পাঠানো হয়নি। পাল্কীর সঙ্গে মহারাজার তক্‌মা-পরা দরোয়ানকে দেখে এ বাড়ির দরোয়ান ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, বুঝলে যে দিদিঠাকরুণ এসেচে। বার বাড়ির আঙিনা পার হ'য়ে অন্তঃপুরের দিকে পাল্কী চলেছিল। কুমু থামিয়ে দ্রুতপদে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে চল্‌ল। তার ইচ্ছে তাকে আর কেউ দেখবার আগে সব প্রথমেই দাদার সঙ্গে তার দেখা হয়। নিশ্চয় সে জান্‌ত, বাইরের আরাম কামরাতেই রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে জানালা থেকে বাগানের কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন ও অশথ গাছের একটি কুঞ্জসভা দেখতে পাওয়া যায়। সকালের রোদ্দুর ডালপালার ভিতর দিয়ে এই ঘরেই প্রথম দেখা দেয়। এই ঘরটিতেই বিপ্রদাসের পছন্দ।

কুমু সিঁড়ির কাছে আসতেই সর্ব্বাগ্রে টম কুকুর ছুটে এসে ওর গায়ের পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে ল্যাজ ঝাপটিয়ে অস্থির ক'রে দিলে। কুমুর সঙ্গে সঙ্গেই লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে চেঁচাতে টম চল্‌ল। বিপ্রদাস একটা মুড়ে-তোলা কৌচের পিঠে হেলান দিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায়, পায়ের উপর একটা ছিটের বালাপোষ টানা; একখানা বই নিয়ে ডান হাতটা বিছানার উপর এলিয়ে আছে, যেন ক্লান্ত হ'য়ে একটু আগে পড়া বন্ধ করেছে। চায়ের পেয়ালা আর ভুক্তাবশিষ্ট রুটি সমেত একটা পিরিচ পাশে মেজের উপরে প'ড়ে। শিয়রের কাছে দেয়ালের গায়ের সেলফে বইগুলো উলট্‌পালট্‌ এলোমেলো। রাত্রে যে ল্যাম্প জ্বলেছিল সেটা ধোঁয়ায় দাগী অবস্থায় ঘরের কোণে এখনো প'ড়ে আছে।

কুমু বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল। ওর এমন বিবর্ণ রুগ্ন মূর্ত্তি কখনো দেখেনি। সেই বিপ্রদাসের সঙ্গে এই বিপ্রদাসের যেন কতযুগের তফাৎ। দাদার পায়ের তলায় মাথা রেখে কুমু কাঁদতে লাগ্‌ল।

"কুমু যে, এসেছিস? আয় এইখানে আয়।" ব'লে বিপ্রদাস তাকে পাশে টেনে নিয়ে এলো। যদিও চিঠিতে বিপ্রদাস তাকে আস্‌তে একরকম বারণ করেছিল, তবু তার মনে আশা ছিল যে কুমু আসবে। আস্‌তে পেরেচে দেখে ওর মনে হোলো, তবে হয়তো কোনো বাধা নেই—তবে কুমুর পক্ষে তার ঘরকন্না সহজ হ'য়ে গেছে। এদের পক্ষ থেকেই কুমুকে আনবার জন্যে প্রস্তাব, পাল্কী ও লোক পাঠানোই নিয়ম—কিন্তু তা' না হওয়া সত্ত্বেও কুমু এলো এটাতে ওর যতটা স্বাধীনতা কল্পনা ক'রে নিলে ততটা মধুসূদনের ঘরে বিপ্রদাস একেবারেই প্রত্যাশা করেনি।

কুমু তার দুই হাত দিয়ে বিপ্রদাসের আলুথালু চুল একটু পরিপাটি করতে করতে বললে, "দাদা, তোমার একি চেহারা হয়েচে!"

"আমার চেহারা ভালো হবার মতো এদানিং তো কোনো ঘটনা ঘটেনি—কিন্তু তোর এ কি রকম শ্রী! ফেকাসে হ'য়ে গেছিস্‌ যে।"

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ক্ষেমা পিসি এসে উপস্থিত। সেই সঙ্গে দরজার কাছে একদল দাসী চাকর ভিড় ক'রে জমা হোলো। ক্ষেমা পিসিকে প্রণাম করতেই পিসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কপালে চুমু খেলে। দাস দাসীরা এসে প্রণাম করলে। সকলের সঙ্গে কুশল সম্ভাষণ হ'য়ে গেলে পর কুমু বল্‌লে, "পিসি, দাদার চেহারা বড়ো খারাপ হ'য়ে গেচে।"

"সাধে হয়েচে! তোমার হাতের সেবা না পেলে ওর দেহ যে কিছুতেই ভালো হ'তে চায়না। কতদিনের অভ্যেস।"

বিপ্রদাস বল্‌লে. "পিসি, কুমুকে খেতে বলবে না?"

"খাবেনাতো কি! সেও কি বল্‌তে হবে? ওদের পাল্কীর বেহারা দরোয়ান সবাইকে বসিয়ে এসেচি, তাদের খাইয়ে দিয়ে আসিগে। তোমরা দুজনে এখন গল্প করো, আমি চল্‌লুম।"

বিপ্রদাস ক্ষেমা পিসিকে ইসারা ক'রে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু ব'লে দিলে। কুমু বুঝ্‌লে ওদের বাড়ির লোকদের কি ভাবে বিদায় করতে হবে তারি পরামর্শ। এই পরামর্শের মধ্যে কুমু আজ অপর পক্ষ হ'য়ে উঠেচে। ওর কোনো মত নেই। এটা ওর একটুও ভালো লাগ্‌লো না। কুমুও তার শোধ তুলতে বস্‌লো। এ বাড়িতে তার চিরকালের স্থান ফিরে দখলের কাজ সুরু ক'রে দিলে।

প্রথমত, দাদার খানসামা গোকুলকে ফিস ফিস ক'রে কি একটা হুকুম করলে, তার পরে লাগলো নিজের মনের মতো ক'রে ঘর গোছাতে। বাইরের বারান্দায় সরিয়ে দিলে পিরিচ, পেয়ালা, ল্যাম্প খালি সোডাওয়াটারের বোতল, একখানা বেত-ছেঁড়া চৌকি, গোটাকতক ময়লা তোয়ালে এবং গেঞ্জি। সেল্‌ফের উপর বইগুলো ঠিকমতো সাজালে, দাদার হাতের কাছাকাছি একখানি টিপাই সরিয়ে এনে তার উপরে গুছিয়ে রাখলে পড়বার বই, কলমদান, ব্লটিংপ্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস, ছোট একটি আয়না এবং চিরুনী ক্রস।

ইতিমধ্যে গোকুল একটা পিতলের জগে গরম জল, একটা পিতলের চিলেমচি, আর সাফ তোয়ালে বেতের মোড়ার উপর এনে রাখলে। কিছুমাত্র সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কুমু গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বিপ্রদাসের মুখ হাত মুছিয়ে দিয়ে তার চুল আঁচড়িয়ে দিলে, বিপ্রদাস শিশুর মতো চুপ ক'রে সহ্য করল। কখন কি ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং পথ্যের নিয়ম কি সমস্ত জেনে নিয়ে এমন ভাবে গুছিয়ে বসল যেন ওর জীবনে আর কোথাও কোনো দায়িত্ব নেই।

বিপ্রদাস মনে মনে ভাবতে লাগলো এর অর্থটা কি? ভেবেছিলো, দেখা করতে এসেছে আবার চ'লে যাবে, কিন্তু সেরকম ভাব তো নয়। শ্বশুরবাড়িতে কুমুর সম্বন্ধটা কি রকম দাঁড়িয়েচে সেটা বিপ্রদাস জানতে চায়, কিন্তু স্পষ্ট ক'রে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ বোধ করে। কুমুর নিজের মুখ থেকেই শুন্‌বে এই আশা ক'রে রইল। কেবল আস্তে আস্তে একবার জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তোকে কখন যেতে হবে?"

কুমু বল্‌লে, "আজ যেতে হবে না।"

বিপ্রদাস বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এতে তোর শ্বশুর বাড়িতে কোনো আপত্তি নেই?"

"না, আমার স্বামীর সম্মতি আছে।"

বিপ্রদাস চুপ ক'রে রইলো। কুমু ঘরের কোণের টেবিলটাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, "তোকে কি তবে কাল যেতে হবে?"

"না, এখন আমি কিছুদিন তোমার কাছে থাক্‌ব।"

টম্ কুকুরটা কৌচের নীচে শান্ত হ'য়ে নিদ্রার সাধনায় নিযুক্ত ছিলো, কুমু তাকে আদর ক'রে তার প্রীতি-উচ্ছ্বাসকে অসংযত ক'রে তুল্‌লে। সে লাফিয়ে উঠে কুমুর কোলের উপরে দুই পা তুলে কলভাষায় উচ্চস্বরে আলাপ আরম্ভ ক'রে দিলে। বিপ্রদাস বুঝতে পারলে কুমু হঠাৎ এই গোলমালটা সৃষ্টি ক'রে তার পিছনে একটু আড়াল করলে আপনাকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খানিক বাদে কুকুরের সঙ্গে খেলা বন্ধ ক'রে কুমু মুখ তুলে বল্‌লে, "দাদা, তোমার বার্লি খাবার সময় হয়েচে, এনে দিই।"

"না, সময় হয় নি" ব'লে কুমুকে ইসারা ক'রে বিছানার পাশের চৌকিতে বসালে। আপনার হাতে তার হাত তুলে নিয়ে বল্‌লে, "কুমু, আমার কাছে খুলে বল্, কি রকম চলচে তোদের।"

তখনি কুমু কিছু বলতে পারলে না। মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মুখ হোলো লাল, শিশুকালের মতো ক'রে বিপ্রদাসের প্রশস্ত বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "দাদা আমি সবই ভুল বুঝেছি, আমি কিছুই জানতুম না।"

বিপ্রদাস আস্তে আস্তে কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। খানিক বাদে বল্‌লে, "আমি তোকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারিনি। মা থাক্‌লে তোকে তোর শ্বশুর বাড়ির জন্যে প্রস্তুত ক'রে দিতে পারতেন।"

কুমু বল্‌লে, "আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাৎ তা' আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলে বেলা থেকে আমি যা কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয়নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।"

বিপ্রদাস কোনো কথা না ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগ্‌ল। মধুসূদন যে ওদের থেকে সম্পূর্ণ আর এক জগতের মানুষ, তা' সেই বিবাহ অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকেই বুঝতে পেরেচে। তারি বিষম উদ্বেগে ওর শরীর যেন কোনো মতেই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌চে না। এই দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই। সকলের চেয়ে মুস্কিল এই যে এই মানুষের কাছে ঋণে ওর সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা। এই অপমানিত সম্বন্ধের ধাক্কা যে কুমুকেও লাগ্‌চে। এতদিন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বিপ্রদাস কেবলি ভেবেচে মধুসূদনের এই ঋণের বন্ধন থেকে কেমন ক'রে সে নিষ্কৃতি পাবে। ওর কলকাতায় আসবার ইচ্ছে ছিল না, পাছে কুমুর শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে ওদের সহজ ব্যবহার অসম্ভব হয়। কুমুর উপর ওর যে স্বাভাবিক স্নেহের অধিকার আছে, পাছে তা পদে পদে লাঞ্ছিত হ'তে থাকে, তাই ঠিক করেছিল নুরনগরেই বাস করবে। কলকাতায় আসতে বাধ্য হ'য়েচে অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা করবে ব'লে। জানে যে এটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই এর দুশ্চিন্তার বোঝা ওর বুকের উপর চেপে ব'সে আছে।

খানিক বাদে কুমু বিপ্রদাসের থেকে অন্যদিকে ঘাড় একটু বেঁকিয়ে বললে, "আচ্ছা, দাদা, স্বামীর 'পরে কোনো-মতে মন প্রসন্ন করতে পারচিনে, এটা কি আমার পাপ?"

"কুমু, তুই তো জানিস, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না।"

অন্যমনস্ক ভাবে কুমু একটা ছবিওয়ালা ইংরেজি মাসিক পত্রের পাতা ওল্‌টাতে লাগল। বিপ্রদাস বল্‌লে, "ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তার ঘটনায় ও অবস্থায় এতই ভিন্ন হ'তে পারে যে ভালো মন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা ক'রে বেঁধে দিলে অনেক সময়ে সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম্ম হয় না।"

কুমু মাসিক পত্রটার দিকে চোখ নীচু ক'রে বল্‌লে, "যেমন মীরাবাইএর জীবন।"

নিজের মধ্যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব যখনি কঠিন হ'য়ে উঠেছে, কুমু তখনি ভেবেচে মীরাবাইএর কথা। একান্ত মনে ইচ্ছা করেচে কেউ ওকে মীরাবাইএর আদর্শটা ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেয়।

কুমু একটু চেষ্টা ক'রে সঙ্কোচ কাটিয়ে বলতে লাগল, "মীরাবাই আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়ে-ছিলেন ব'লেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?"

বিপ্রদাস বললে, "কুমু, তোর ঠাকুরকে তুই তো সমস্ত মন দিয়েই পেয়েছিস্।"

"এক সময়ে তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু যখন সঙ্কটে পড়লুম তখন দেখি প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে গেছে, এত চেষ্টা করচি, কিন্তু কিছুতে তাঁকে যেন আমার কাছে সত্য ক'রে তুলতে পারচিনে। আমার সবচেয়ে দুঃখ সেই।"

"কুমু, মনের মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলে। কিছু ভয় করিসনে, রাত্তির মাঝে মাঝে আসে, দিন তা ব'লে তো মরে না। যা পেয়েছিস তোর প্রাণের সঙ্গে তা এক হ'য়ে গেছে।"

"সেই আশীর্ব্বাদ করো, তাঁকে যেন না হারাই। নির্দ্দয় তিনি দুঃখ দেন, নিজেকে দেবেন ব'লেই।"

"দাদা, আমার জন্যে ভাবিয়ে আমি তোমাকে ক্লান্ত করচি।"

"কুমু, তোর শিশুকাল থেকে তোর জন্যে ভাবা যে আমার অভ্যেস। আজ যদি তোর কথা জানা বন্ধ হ'য়ে যায়, তোর জন্যে ভাবতে না পাই, তা হ'লে শূন্য ঠেকে। সেই শূন্যতা হাৎড়াতে গিয়েই তো মন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে।"

কুমু বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "আমার জন্যে তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না, দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা করবেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই।"

"আচ্ছা, থাক ওসব কথা। তোকে যেমন গান শেখাতুম, ইচ্ছে করছে তেমনি ক'রে আজ তোকে শেখাই।"

"ভাগ্যি শিখিয়েছিলে, দাদা, ওতেই আমাকে বাঁচায়। কিন্তু আজ নয়, তুমি আগে একটু জোর পাও। আজ আমি বরঞ্চ তোমাকে একটা গান শোনাই।"

দাদার শিয়রের কাছে ব'সে কুমু আস্তে আস্তে গাইতে লাগ্‌ল,—

"পিয় ঘর আয়ে, সোই প্যারী পিয় প্যাররে!
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণকমল বলিহাররে!

বিপ্রদাস চোখ বুজে শুন্‌তে লাগল। গাইতে গাইতে কুমুর দুই চক্ষু ভ'রে উঠ্‌ল এক অপরূপ দর্শনে। ভিতরের আকাশ আলো হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রিয়তম ঘরে এসেচেন, চরণ-কমল বুকের মধ্যে ছুঁতে পাচ্চে। অত্যন্ত সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল অন্তরলোক, যেখানে মিলন ঘটে। গান গাইতে গাইতে ও সেইখানে পৌঁচেছে। "চরণকমল বলিহাররে"—সমস্ত জীবন ভ'রে দিলে সেই চরণ-কমল, অন্ত নেই তার—সংসারে দুঃখ অপমানের জায়গা রইল কোথায়! "পিয় ঘর আয়ে—" তার বেশি আর কি চাই! এই গান কোনোদিন যদি শেষ না হয় তা হ'লে তো চিরকালের মতো রক্ষা পেয়ে গেল কুমু।

কিছু রুটি-টোস্ট্ আর এক পেয়ালা বার্লি গোকুল টিপাইএর উপর রেখে দিয়ে গেল। কুমু গান থামিয়ে বল্‌লে, "দাদা, কিছুদিন আগে মনে মনে গুরু খুঁজ্‌ছিলুম, আমার দরকার কি? তুমি যে আমাকে গানের মন্ত্র দিয়েছ।"

"কুমু, আমাকে লজ্জা দিস্‌নে। আমার মতো গুরু রাস্তায় ঘাটে মেলে, তারা অন্যকে যে মন্ত্র দেয় নিজে তার মানেই জানে না। কুমু, কতদিন এখানে থাক্‌তে পার্‌বি ঠিক ক'রে বল্ দেখি?"

"যতদিন না ডাক পড়ে।"

"তুই এখানে আস্‌তে চেয়েছিলি?"

"না, আমি চাইনি।"

"এর মানে কি?"

"মানের কথা ভেবে লাভ নেই দাদা। চেষ্টা করলেও বুঝতে পারব না। তোমার কাছে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট যতদিন থাক্‌তে পারি সেই ভালো। দাদা, তোমার খাওয়া হচ্চে না, খেয়ে নাও।"

চাকর এসে খবর দিলে মুখুজ্জে মশায় এসেচেন। বিপ্রদাস একটু যেন ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বল্‌লে, "ডেকে দাও।"

৪৭

কালু ঘরে ঢুকতেই কুমু তাকে প্রণাম করলে।

কালু বল্‌লে, "ছোট খুকি, এসেচ? এইবার দাদার সেরে উঠ্‌তে দেরি হবে না।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমুর চোখ ছলছল ক'রে উঠ্‌ল। অশ্রু সামলে নিয়ে বল্‌লে, "দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না ?"

বিপ্রদাস উদাসীন ভাবে হাত ওল্‌টালে, অর্থাৎ না হ'লেই বা ক্ষতি কি। কুমু জানে বিপ্রদাস বার্লি খেতে ভালোবাসে না, তাই ও যখনি দাদাকে বার্লি খাইয়েচে বার্লিতে নেবুর রস এবং অল্প একটু গোলাপজল মিশিয়ে বরফ দিয়ে সরবতের মতো বানিয়ে দিত। সে আয়োজন আজ নেই, তবু বিপ্রদাস আপন ইচ্ছে কাউকে জানায়ওনি, যা পেয়েচে তাই বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেয়েচে।

বার্লি ঠিক মত তৈরি ক'রে আনবার জন্যে কুমু চ'লে গেল।

বিপ্রদাস উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করলে, "কালুদা, খবর কি বলো।"

"তোমার একলার সইয়ে টাকা ধার দিতে কেউ রাজি হয় না, সুবোধের সই চায়। মাড়োয়ারি ধনীদের কেউ কেউ দিতে পারে, কিন্তু সেটা নিতান্ত বাজি খেলার মতো ক'রে— অত্যন্ত বেশি সুদে চায়, সে আমাদের পোষাবে না।"

"কালুদা, সুবোধকে তার করতে হবে আসবার জন্যে। আর দেরী করলে তো চলবে না।"

"আমারো ভালো ঠেক্‌চে না। সেবারে তোমার সেই আঙটি বেচা টাকা নিয়ে যখন মূল দেনার এক অংশ শোধ করতে গেলুম, মধুসূদন নিতে রাজিই হোলো না; তখনি বুঝ্‌লুম সুবিধে নয়। নিজের মর্জ্জি মতো একদিন হঠাৎ কখন ফাঁস এঁটে ধরবে।"

বিপ্রদাস চুপ ক'রে ভাবতে লাগল।

কালু বল্‌লে, "দাদা, ছোট খুকি যে হঠাৎ আজ সকালে চ'লে এলো, রাগারাগি ক'রে আসেনি তো। মধুসূদনকে চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখ্‌তে হবে।"

"কুমু বল্‌চে ওর স্বামীর সম্মতি পেয়েচে।"

"সম্মতিটার চেহারা কি রকম না জান্‌লে মন নিশ্চিন্ত হচ্চে না। কত সাবধানে ওর সঙ্গে ব্যবহার করি সে আর তোমাকে কি বল্‌ব দাদা। রাগে সর্ব্ব অঙ্গ যখন জ্বল্‌চে তখনো ঠাণ্ডা হ'য়ে সব সয়েচি, গৌরীশঙ্করের পাহাড়টার মতো দুপুর রোদ্দুরেও তার বরফ গলে না। একে মহাজন তাতে ভগ্নীপতি, একে সামলে চলা কি সোজা কথা!"

বিপ্রদাস কোনো জবাব না ক'রে চুপ ক'রে ভাবতে লাগলো।

কুমু এলো বার্লি নিয়ে। বিপ্রদাসের মুখের কাছে পেয়ালা ধ'রে বললে, "দাদা খেয়ে নাও।"

বিপ্রদাস তার ভাবনা থেকে হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল। কুমু বুঝতে পারলে, গভীর একটা উদ্বেগের মধ্যে দাদা এতক্ষণ ডুবে ছিল।

কালু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুমু তার পিছন্ পিছন্ গিয়ে বারান্দায় ওকে ধ'রে বল্‌লে, "কালুদা, আমাকে সব কথা বলতে হবে।"

"কি কথা বল্‌তে হবে, দিদি ?"

"তোমাদের কি একটা নিয়ে ভাবনা চল্‌চে।"

"বিষয় আছে ভাবনা নেই, সংসারে এও কি কখনো সম্ভব হয় খুকি ? ও যে কাঁটা গাছের ফল, ক্ষিদের চোটে পেড়ে খেতেও হয়, পাড়তে গিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ছ'ড়েও যায়।"

"সে সব কথা পরে হবে, আমাকে বলো কি হয়েচে।"

"বিষয়কর্ম্মের কথা মেয়েদের বল্‌তে নিষেধ।"

"আমি নিশ্চয় জানি তোমাদের কি নিয়ে কথা হচ্চে। বলব ?"

"আচ্ছা, বলো।"

"আমার স্বামীর কাছে দাদার ধার আছে, সেই নিয়ে।"

কোনো জবাব না দিয়ে কালু তার বড়ো বড়ো দুই চোখ সকৌতুক বিস্ময়হাস্যে বিস্ফারিত ক'রে কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমাকে বল্‌তেই হবে, ঠিক বলেচি কি না।"

"দাদারই বোন তো, কথা না বল্‌তেই কথা বুঝে নেয়।"

বিয়ের পরে প্রথম যে দিন বিপ্রদাসের মহাজন ব'লে মধুসূদন আস্ফালন ক'রে শাসিয়ে কথা বলেছিল, সেই দিন থেকেই কুমু বুঝেছিল দাদার সঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধের অগৌরব। প্রতিদিনই একান্তমনে ইচ্ছে করেছিল এটা যেন ঘুচে যায়। বিপ্রদাসের মনে এর অসম্মান যে বিঁধে আছে তাতে কুমুর সন্দেহ ছিল না। সেদিন নবীন যেই বিপ্রদাসের চিঠির ব্যাখ্যা করলে, অমনি কুমুর মনে এলো সমস্তর মূলে আছে এই দেনা পাওনার সম্বন্ধ। দাদার শরীর কেন যে এত ক্লান্ত, কোন্ কাজের বিশেষ তাগিদে দাদা কলকাতায় চ'লে এসেছে, কুমু সমস্তই স্পষ্ট বুঝতে পারলে।

"কালুদা, আমার কাছে লুকিয়ো না, দাদা টাকা ধার করতে এসেচে।"

"তা, ধার ক'রেই তো ধার শুধ্‌তে হবে; টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কুটুম্বদের খাতক হ'য়ে থাকাটা তো ভালো নয়।"

"সে তো ঠিক কথা, তা টাকার যোগাড় করতে পেরেচ?"

"ঘুরে ফেরে দেখচি, হ'য়ে যাবে, ভয় কি!"

"না, আমি জানি, সুবিধে করতে পারোনি।"

"আচ্ছা, ছোট খুকি, সবই যদি জানো, আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ছেলে বেলায় একদিন আমার গোঁফ টেনে ধ'রে জিজ্ঞাসা করেছিলে গোঁফ হোলো কেমন ক'রে? ব'লেছিলুম সময় বুঝে গোঁফের বীজ বুনেছিলুম ব'লে। তা'তেই প্রশ্নটার তখনি নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছ্‌ল। এখন হ'লে জবাব দেবার জন্যে ডাক্তার ডাক্‌তে হ'ত। সব কথাই যে তোমাকে স্পষ্ট ক'রে জানাতে হবে সংসারের এমন নিয়ম নয়।"

"আমি তোমাকে ব'লে রাখচি, কালুদা, দাদার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানতে হবে।"

"কি ক'রে দাদার গোঁফ উঠ্‌ল, তাও?

"দেখ, অমন ক'রে কথা চাপা দিতে পারবে না। আমি দাদার মুখ দেখেই বুঝেচি টাকার সুবিধে করতে পারোনি।"

"নাই যদি পেরে থাকি, সেটা জেনে তোমার লাভ হবে কি?"

"সে আমি বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমাকে জান্‌তেই হবে। টাকা ধার পাওনি তুমি?"

"না, পাইনি।"

"সহজে পাবে না?"

"পাব নিশ্চয়ই, কিন্তু সহজে নয়। তা দিদি, তোমার কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে পাবার চেষ্টায় বেরোলো কাজ হয়তো কিছু এগোতে পারে। আমি চললুম।"

খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এসে কালু বল্‌লে, "খুকি, এখানে যে তুমি আজ চ'লে এলে, তার মধ্যে তো কোনো কাঁটা খোঁচা নেই? ঠিক সত্যি ক'রে বলো।"

"আছে কি না তা আমি খুব পষ্ট ক'রে জানিনে।"

"স্বামীর সম্মতি পেয়েছ?"

"না চাইতেই তিনি সম্মতি দিয়েচেন।"

"রাগ ক'রে?"

"তাও আমি ঠিক জানিনে; বলেচেন, ডেকে পাঠাবার আগে আমার যাবার দরকার নেই।"

"সে কোনো কাজের কথা নয়, তার আগেই যেয়ো, নিজে থেকেই যেয়ো।"

"গেলে হুকুম মানা হবে না।"

"আচ্ছা, সে আমি দেখ্‌ব।"

দাদা আজ এই যে বিষম বিপদে প'ড়েচে, এর সমস্ত অপরাধ কুমুর, এ কথা না মনে ক'রে কুমু থাক্‌তে পারল না। নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে, খুব কঠিন মার। শুনেছে এমন সন্ন্যাসী আছে যারা কণ্টক শয্যায় শুয়ে থাকে, ও সেই রকম ক'রে শুতে রাজি, যদি তা'তে কোনো ফল পায়। কোনো যোগী—কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেয় তা' হ'লে চিরদিন তার কাছে বিকিয়ে থাক্‌তে পারে। নিশ্চয়ই তেমন কেউ আছে, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যায়। যদি মেয়ে মানুষ না হ'ত, তা হ'লে যা হয় একটা কিছু উপায় সে কর্‌তই। কিন্তু মেজদাদা কি করছেন! একলা দাদার ঘাড়ে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোন্ প্রাণে ইংলণ্ডে ব'সে আছেন?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমু ঘরে ঢুকে দেখে বিপ্রদাস কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বিছানায় প'ড়ে আছে। এমন করলে শরীর কি সারতে পারে! বিরুদ্ধ ভাগ্যের দুয়ারে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে।

দাদার শিয়রের কাছে ব'সে মাথায় হাত বুলতে বুলতে কুমু বল্‌লে, "মেজদাদা কবে আসবেন?"

"তা তো বল্‌তে পারিনে।"

"তাঁকে আস্‌তে লেখো না।"

"কেন বল্ দেখি।"

"সংসারের সমস্ত দায় একলা তোমারি ঘাড়ে, এ তুমি বইবে কি ক'রে?"

"কারো বা থাকে দাবী, কারো বা থাকে দায়; এই দুই নিয়ে সংসার। দায়টাকেই আমি আমার করেচি, এ আমি অন্যকে দেব কেন?"

"আমি যদি পুরুষমানুষ হ'তুম জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতুম।"

"তা হ'লেই তো বুঝতে পারচিস্ কুমু, দায় ঘাড়ে নেবার একটা লোভ আছে। তুই নিজে নিতে পারচিস্‌নে ব'লেই তোর মেজদাদাকে দিয়ে সাধ মেটাতে চাস্। কেন আমিই বা কি অপরাধ করেছি!"

"দাদা, তুমি টাকা ধার করতে এসেচ?"

"কিসের থেকে বুঝলি?"

"তোমার মুখ দেখেই বুঝেচি। আচ্ছা, আমি কি কিছুই করতে পারিনে?"

"কি ক'রে বল?"

"এই মনে করো, কোনো দলিলে সই ক'রে। আমার সইয়ের কি কোনো দামই নেই?"

"খুবই দাম আছে; সে আমাদের কাছে, মহাজনের কাছে নয়।"

"তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বলো, আমি কি করতে পারি।"

"লক্ষ্মী হ'য়ে শান্ত হ'য়ে থাক্, ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা কর্, মনে রাখিস্ সংসারে সেও একটা মস্ত কাজ। তুফানের মুখে নৌকা ঠিক রাখাও যেমন একটা কাজ, মাথা ঠিক রাখাও তেমনি। আমার এসরাজটা নিয়ে আয়, একটু বাজা।"

"দাদা, আমার বড়ো ইচ্ছে করচে একটা কিছু করি।"

"বাজানোটা বুঝি একটা কিছু নয়।"

"আমি চাই খুব একটা শক্ত কাজ।"

"দলিলে নাম সই করার চেয়ে এসরাজ বাজানো অনেক বেশি শক্ত! আন্ যন্ত্রটা।"

(ক্রমশঃ)
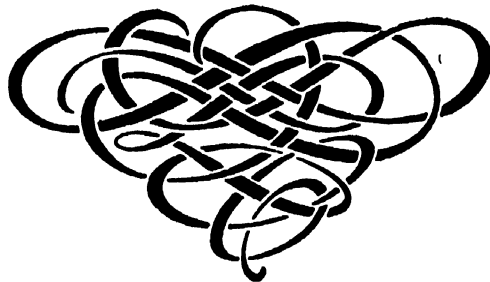
আদিম মানব

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আমি সর্ব্ব প্রথমের আদিম মানব।
বক্ষে মোর যুদ্ধ জাগে ; বিজয়-গৌরব
লিপ্ত মোর সর্ব্বদেহে ; চরম প্রীতির
নিদর্শন আমি একা মাতা ধরিত্রীর ;
বিশ্ব-প্রকৃতির আমি প্রথম উল্লাস
প্রবুদ্ধ মনের ; মোর কভু নহে আশ
অন্ধ প্রকৃতির যত সহজ সঞ্চয়,
তাই আলিঙ্গনি' লক্ষ জয় পরাজয়
চলিয়াছি যাত্রা করি' ; অরণ্য কান্তার
গিরি নদী নদ কিম্বা মরুভূ দুর্ব্বার
পারে নাই টানি' দিতে স্থির গণ্ডীরেখা
আমার যাত্রার পথে ; সঙ্গীহীন একা
চলিয়াছি অরিন্দম বিশ্ব-বিধাতার
ছাড়পত্র আর তার আশীষ সম্ভার
সাথে নিয়ে ; সুখ মোরে পারে না থামাতে,
দুঃখ মোরে কশাঘাতে পারে না নামাতে
আমার সংকল্প হ'তে ; ঝঞ্ঝা বহ্নি ভয়
দৃঢ়তর করে মোর প্রাণের সঞ্চয় ;
আমার জীবনব্যাপী মহা মহোৎসব—
আমি সর্ব্ব আদিমের প্রথম মানব।

সেদিন আধেক আলো আধ অন্ধকারে
ঘিরি' ছিল ত্রিভুবন ; অরণ্য কান্তারে
মাতা ধরিত্রীর লক্ষ বরষের স্নেহ
রেখেছিল সঙ্গোপনে শ্বাপদের গেহ
হরিত অঞ্চল ঢাকি' ; মোর আবির্ভাব
নিমেষে খসায়ে নিল শান্তির প্রভাব
বন-অন্তরাল হ'তে ; ছায়া সুশীতল
বনে বনে বিচ্ছুরিল ভীম দাবানল
মোর দৃঢ় মুষ্টিমুক্ত ভল্লের আঘাত
হানিল নিষ্ঠুর রোষে অশনি সম্পাত
শ্বাপদের বুকে বুকে ; অক্ষম হুঙ্কারে
স্বনিল গগনভেদী অরণ্য কান্তারে
ক্রুদ্ধ রোষ ; মোর বাহু-পেশীর উল্লাস
দিকে দিকে ছেয়ে দিল মরণের ত্রাস,
হিংস্র পশু কে কোথায় নাহি পেল পথ
পলাইতে, মোর দীর্ঘ দীপ্ত ভবিষ্যত
জয়গর্ব্ব বৈজয়ন্তী কেতন উড়ায়ে
করিল স্থাপনা অন্ধ অরণ্যের ছায়ে
সম্রাটের সিংহাসন ; দেব দিগঙ্গনা
এক কণ্ঠে উচ্চারিল আশীষ কামনা
বজ্ররবে ;—"জয় বিশ্বজননীর জয়,
মুক্ত মর্ত্ত্য মানবের প্রাণের সঞ্চয়
জয় জয় জীবনের মহা মহোৎসব।"
আমি সর্ব্ব আদিমের প্রথম মানব।

ধীরে বন-অন্তরালে পল্লী দিল দেখা।
দূর-বিসর্পিত দীর্ঘ স্নিগ্ধ নদী-রেখা
পল্লীর উপান্ত ঘিরি' তুলিল কল্লোল
নৃত্য গানে ; ধমনীতে শোণিতের দোল
স্নিগ্ধ মৃদু হ'য়ে আসে নব স্বপ্ন ছায়ে
আঁখির পল্লব-ঘেরা ; মৃদু মন্দ বায়ে
ঝ'রে-পড়া ফুলরেণু ; পত্রের মর্ম্মর,
দূর-হ'তে-আসা বন্য কপোতের স্বর,

আদিম মানব

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাদলের জলধারা, কাজল দেয়ার
গুরু গুরু দুরু দুরু, কদম্ব কেয়ার
বিচ্ছুরিত ঘন বাস করিল শিথিল
সুদৃঢ় বাহুর পেশী; বসন্ত অনিল
বক্ষে মোর লেপি' বিরহ ব্যাকুল,
আনমনে তুলি' দুটি কাননের ফুল
বেঁধে দিনু প্রেয়সীর নিবিড় কুন্তলে,—
আচম্বিতে আঁখিপাত ভরি' এলো জলে।
অশ্রুজলে বসন্তের হ'ল অবসান।
এই কি রে জীবনের চরম সন্ধান?
অন্তিম আদেশ কি রে বিশ্ব-বিধাতার?
পরম বিরাম চিহ্ন? প্রাণের হুঙ্কার
লক্ষ বাহু প্রসারিয়া কহে—নয় নয়,
হে প্রেয়সী, দুটি দিনে হ'ল তব জয়,
এ নহে বিরাম-চিহ্ন। এই দুটি দিনে
নিভৃত নিলয়ে মোর হৃদয়ের বীণে
বাজাইনু প্রেমগান, গাঁথি' পুষ্পহার
সোহাগে সাজানু তব কুন্তলের ভার,
কণ্ঠে দিনু ফুলমালা, প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ,
ব্যথাভরা আঁখিদুটি করিনু চুম্বন
বিরহ-বিলাপে আর মিলন-বিলাসে;
শিহরিত বসন্তের শেষ দীর্ঘশ্বাসে
ঝরি' গেল ফুলদল; স্তব্ধ হ'ল পিক,
অশ্রুভারে ভারাক্রান্ত হ'ল দশ দিক,
ছিন্ন হ'ল জীবনের সুবর্ণ শৃঙ্খল
নিষ্ঠুর হতাশে;—নহে এ বিরাম—নহে—
ধমনীতে ধমনীতে অগ্নি স্রোত বহে
আজো সেই মতো; সেই আদিম প্রভাত
ব'য়ে আনে জীবনের স্বপন-সংবাদ
দুর্নিবার; হে প্রেয়সী, নহে এ বিরাম,
শুধু তব সাম্রাজ্যের আজি অবসান,—
অবসান নহে এই জীবন-উৎসব,
বক্ষে মোর আজো জাগে আদিম মানব।

পল্লী-প্রাণ নিঃশেষিত; শান্তির আরাম
মৃত্যুর করাল কোলে লভিল বিশ্রাম
শেষ দীর্ঘশ্বাসে; গর্ব্বোদ্ধত শির তুলি'
সৌধশ্রেণী নগরীর বুকে ওঠে ফুলি'
প্রাণের ঐশ্বর্য্যে; মোর বক্ষ-পত্র হানি'
লুক্কায়িত ছিল যেই দানবের বাণী
মুখরিত হ'ল দিক তারি জয়গানে,
আসুরিক আকাঙ্ক্ষার আহ্বানে আহ্বানে
হৃদয় পিষিয়া গেল; বস্তুর পর্ব্বত
দেবতার সিংহাসনে র'হি অবিরত
পায় পূজা পুঞ্জীভূত ভোগ কামনার,
গিরি মরু অরণ্যানী জলধি অপার
মথিত দলিত করি' চলে অরিন্দম
মানবের জয়বার্ত্তা; সকল সংযম
মিথ্যা করি' ছোটে প্রাণ; জয়যাত্রা তার
আকর্ষিতে চাহে গ্রহ চন্দ্রমা তারার
অনাদি রহস্যধারা; মুষ্টি মাঝে ধরি'
চূর্ণ করি' তাহাদেরে দিতে চায় ভরি'
আপনার ভোগপাত্র; মাতা ধরিত্রীর
অবজ্ঞায় ভরি' তোলে স্নিগ্ধ স্নেহনীড়;
মাতা নহে, মাতা নহে—কহে অট্টহাসি—
দীন বসুন্ধরা আজি মোর ক্রীতদাসী!
দম্ভ গর্ব্ব ধীরে তোলে অভ্রভেদী শির
আপনার শক্তি নিয়ে আপনি অস্থির
মানব-অসুর।
　　একদিন অকস্মাৎ
বস্তুর পর্ব্বত 'পরে হ'ল বজ্রপাত
ভীষণ সংঘাতে; লক্ষ মৃত্যু বিভীষিকা
ছুটিল প্রচণ্ড বেগে, লেলিহান শিখা
যেথা যেথা মানবের কণ্ঠ জয়-মালা
খুলেছিল মানবের লক্ষ ভোগশালা—
নিঃশেষে জ্বালায়ে দিল অঙ্গারের স্তূপে,
ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি মহাকাল-রূপে

প্রান্ত হ'তে আর প্রান্তে জ্বালি' হুতাশন
মানবের ঔদ্ধত্যেরে করিল শাসন
দুর্নিবার তেজে, নগরীর সৌধমালা
কীর্ত্তিস্তম্ভ জয়স্তম্ভ শত পণ্যশালা
চূর্ণ হ'য়ে গেল সব নিমেষে পলকে,
ধ্বংসের প্রলয়-বহ্নি ঝলকে ঝলকে
দিক হ'তে দিগন্তরে করিল বিস্তার
নগ্ন কদর্য্যতা মূর্ত্তি ; জয়ের হুঙ্কার
কোথায় মিশায়ে গেল ; দীন আর্ত্তনাদ
মানুষের কণ্ঠ জুড়ি' ঘোষিল প্রমাদ,
নিশ্চিহ্ন জীবন ব্যাপী জয়ের বিভব
শুধু রেখে গেল দীন আর্ত্ত কলরব।

চূর্ণ মানবের অভ্রভেদী অহঙ্কার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভীম অন্ধকার
ঘেরি' দিল—মন প্রাণ হৃদয়ের তল
নিবিড় ব্যথার ভারে অশ্রু ছল ছল,
পুনরায় ফিরি' এলো মানব-অসুর
মাতৃক্রোড়ে যেন শিশু ক্ষুব্ধ ব্যথাতুর।

ধীরে মাতা ধরিত্রীর স্নেহের ছায়ায়
শিশু মুখে হাসি ফোটে, বিস্মৃতি-মায়ায়
প্রাণ পুনঃ পায় প্রাণ ; চিত্ত পুনঃ জাগে
কষিত কাঞ্চন-সম অরুণের রাগে
নবীন ঊষায় ; বক্ষে জাগে নব বল ;
ধ্বংস কোথা ? মৃত্যু কোথা ? কোথা অশ্রুজল?
অনিত্য অনৃত যত দুখ শোক ত্রাস ;
নিত্য শুধু দিকে দিকে প্রাণের উল্লাস,
নিত্য শুধু ধমনীতে শোণিতের দোল,
সত্য শুধু জীবনের ছন্দের হিল্লোল,
সত্য শুধু অন্তরের অনন্ত দুরাশা ;
ঝড় ঝঞ্ঝা উল্কাপাত তার ক্রুদ্ধ ভাষা
দুদিনের তরে শুধু, চির চিরন্তন
অন্তরের মাঝে যাহা রয়েছে গোপন
সে শুধু গতির আলো, অনন্ত উদ্যম ;
লাজ মানি যদি রহি অথর্ব্বের সম
জীবনের যাত্রা-পথে ; যদি মৃত্যুভয়
সহস্র স্বপন মোর করে পরাজয়
মরমের পটে আঁকা ; নহে—নহে—নহে !—
মিথ্যা যেথা দৈন্য তার দীন স্রোত বহে,
সত্য শুধু জীবনের জয়ের উৎসব
শাশ্বত এ বক্ষতলে আদিম মানব।

আদিম মানব পুনঃ ধীরে তোলে শির
মরমের গোপন মন্দিরে ; অশ্রু-নীর
কোথায় শুখায়ে গেছে নাহি চিহ্ন আর,
নব সুরে নব ছন্দে বাজিছে ঝঙ্কার
জীবন-বীণায় ; তরুণ তরুণ রাগ
কষিত কাঞ্চন মেলি হৃদয়ের ভাগ
রঞ্জিত করিয়া দিল নবীন সোহাগে,
বিশ্ব জননীর নব আশীর্ব্বাদ জাগে
উন্নত ললাটে পুনঃ ; আঁখি তেজোজ্জ্বল ;
বক্ষের শোণিত পুনঃ হরষ-চঞ্চল ;
প্রাণের পুলক মত্ত তুরঙ্গম প্রায়
দিকচক্রবাল পানে ছুটিবারে চায়
অদম্য উল্লাসে পুনঃ। কোথা মৃত্যুভয় ?
জয় জয় জয় শুধু জীবনের জয় !
মিথ্যা ব্যথা শোক মিথ্যা মিথ্যা অশ্রুজল,—
তার চেয়ে শতগুণ লক্ষগুণ ফল
সত্য এই জীবনের মহা মহোৎসব,
সত্যতম মৃত্যুহীন আদিম মানব।

কিন্তু আজি কোন নব স্বপ্ন আঁখিপাতে
ফুটিয়া উঠিতে চায় ; স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
নির্নিমেষে চেয়ে থাকে অনন্ত গগনে
তারাদের দৃষ্টি মেলি' ; কিসের স্বপন

আদিম মানব

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গুঞ্জরিয়া কহিবারে চায় কানে কানে
সুদূর নীলিমা ওই ; কিসের আহ্বানে,
হিয়ায় কাঁপন লাগে, মর্ম্ম ওঠে দুলি',
কোথা যেন অন্তহীন কার ব্যথাগুলি
বিকশিত হ'তে চায় শুভ্র পদ্মসম
এ মর্ত্ত্যের বক্ষ 'পরে ; যেন অনুপম
কোন্ নব রূপ রস কোন্ ছন্দ গান
এই দীন ধরণীর রণক্লান্ত প্রাণ
নিঃশেষে কাড়িয়া নিতে চায় ; কার বাণী
ধরিত্রীর আশে পাশে করে কানাকানি
পুষ্পসম মুঞ্জরিতে ; কিসের বিলাস
গুমরিয়া মরে তার জানাতে আভাস
নবীন ছন্দের ; দূরে ফেরা অপ্সরীর
নূপুর গুঞ্জন শুনি' মর্ত্ত্যের শরীর

রোমাঞ্চিত হয় বুঝি ; নব রূপ-রেখা
নবীন স্বপ্নের বুঝি যায় ওই দেখা
দূর দিকচক্রবালে ; নিভৃতে নির্জ্জনে
কোন্ নব জয়মাল্য গাঁথিছে গোপনে
জয়লক্ষ্মী দোলাইতে মানবের গলে,
বিশ্বের জননী আজি নব কুতূহলে
সত্য করিতেছে কোন্ নব আশীর্ব্বাদ
উন্মুক্ত করিতে এক নবীন প্রভাত
মানবের হিয়া-পটে ; কোন্ লীলা নব
উজল করিবে চির জয়ের উৎসব
বিশ্ব মানবের ; আদিম মানব-প্রাণ
দানিবে মর্ত্ত্যেরে কোন্ নব অবদান !

মানুষের জন্মদিন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জড়ে ও জীবিতে কোনও কোনও বিষয়ে হয়ত সাম্য আছে, কিন্তু সাম্যের চেয়ে বৈষম্যই যে অধিক সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। জীবিতের মধ্যে এমন একটি শক্তি-চক্র খেলা করচে যে সে তার বলে পারিপার্শ্বিক জড় ও জীবিত বস্তুর দেহ থেকে খাদ্য সঞ্চয় করে, গৃহীত আহারের দূষিত ও নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করে, সমস্ত অবয়বের সহিত সামঞ্জস্যে আপনাকে বর্দ্ধন করে, পোষণ করে, সঞ্চালিত করে। তার সমস্ত শরীরযন্ত্র তার নিজের স্বাভাবিক নিয়মে পরস্পরের সহিত ঐক্যে ও সামঞ্জস্যে আপন আপন কার্য্যে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে বেড়ে ওঠে। সে আপনাকে আপনি বাড়ায়, বংশসন্ততিতে আপনাকে আপনি বহুধা বিভক্ত করে। কোনও কাজ সম্পন্ন করাতে বা উত্তাপ উৎপাদনে আমরা জড়শক্তির পরিচয় পেয়ে থাকি। অবয়বের সঞ্চালনে দেহযন্ত্রের নানাবিধ ব্যাপারে, দেহের উত্তাপে, জীবিতের যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার সমস্তটুকুই প্রায় তার আহার থেকে সঞ্চিত হয়। জীবিতেরা জড় বা জীবিতের জড়দেহ থেকে আপন আপন আহার সংগ্রহ করে। এই আহৃত জড়বস্তুর উপাদানে ও শক্তিতেই জীবিতদের আপন আপন জড়দেহ গ'ড়ে ওঠে। এই আহৃত জড়বস্তুই জীবদেহের উপাদান। মানুষ যতটা পরিশ্রম করে কিম্বা তার শরীরের যান্ত্রিক ব্যাপারে যতখানি শক্তি ব্যবহার হয় তার অধিকাংশই সে তার আহার থেকে সঞ্চয় করে। এই জড়ের শক্তি ছাড়া জীবিতের এমন কোনও স্বতন্ত্র শক্তি আছে কিনা যাহা জড়শক্তির সহিত সমকক্ষভাবে, তাহার সহযোগে বা বৈপরীত্যে আপনাকে প্রকাশ করে তাহা এখনও মীমাংসা করা যায় নাই। যাঁরা জড়শক্তিবাদী তাঁরা বলেন যে জীবনশক্তি ব'লে স্বতন্ত্র কোনও শক্তি নেই। জীবনব্যাপারের সমস্ত কাজ যে এখনও জড়শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তার প্রধান কারণ এই যে জড়শক্তির আত্মব্যাপারের সমস্ত মহিমা আজও আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নাই। যাঁরা জীবনশক্তিকে স্বতন্ত্র শক্তি ব'লে স্বীকার করেন, তাঁরা বলেন যে অদৃশ্য জীবন-শক্তির প্রেরণার দ্বারাই জড়ের উপাদান থেকে জীবিতের দেহ গ'ড়ে ওঠে। জীবিতের দেহে যত কিছু ভৌতিক বা রাসায়নিক ব্যাপার ঘটে তার মূল হচ্ছে জীবনশক্তি। এই জীবনশক্তি জড়শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্রশক্তি। এই অদৃশ্য অপ্রমেয় দুরধিগম্য জীবনশক্তি আপন বীর্য্যে সমস্ত জড় বস্তুকে আপন কার্য্যে নিয়োজিত ক'রে আপন ব্যবহারোপ-যোগী দেহকে গ'ড়ে তোলে। কেহ বা বলেন যে জীবনশক্তি জড়শক্তিরই একটি নূতন স্তরের নূতন বিকাশ। কিন্তু এ চুলচেরা তর্কে কোনও ফল নেই। এ সমস্ত তর্কের আড়াল থেকে একটা সত্য বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সেটি হচ্ছে এই যে জড়শক্তির যে কল্পনা আমরা ক'রে থাকি এবং তার যে লীলা আমরা আমাদের চারিদিকে দেখে থাকি তদ্দ্বারা আমরা কিছুতেই জীবনব্যাপারের মীমাংসা ক'রে তুল্‌তে পারি না। একই আহার বিভিন্ন প্রাণিদেহে যে রক্তমাংস উপাদান করে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে তার প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য ধরা পড়ে। প্রত্যেক জীবদেহে এমন সব নূতন নূতন রাসায়নিক বস্তু সর্ব্বদা তৈরী হচ্ছে যা জগতে অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। একটি দেহের মধ্যে যেমন সর্ব্বদা নানারকম নূতন নূতন উপাদান তৈরী হচ্ছে তেমনি পুরাতন উপাদানগুলি ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে। শরীরের মধ্যে নিত্যই এই ভাঙ্গাগড়ার লীলা চলেছে; কিন্তু সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে তার মূল উদ্দেশ্যের একটুও নড়চড় হয় না! যতই ভাঙ্গাগড়া চলুক না কেন, তার মূলসূত্রটি কখনই নষ্ট হয় না; এবং সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে সমগ্র দেহযন্ত্রের অখণ্ড ঐক্যটি কখনই ছিন্ন হয় না। যে মন্ত্রে দেহের গঠিত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

উপাদান ভাঙ্গিয়া যায় ঠিক্ সেই মন্ত্রেই আবার নূতন উপাদান আপনা হইতে গড়িয়া ওঠে। ভাঙ্গে বলিয়াই গড়িতে পারে এবং গড়িতে পারে বলিয়াই ভাঙ্গিয়া যায়। যতদিন জীবদেহ বাঁচিয়া থাকে ততদিনই ভাঙ্গাগড়ার অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা চলিতে থাকে। মুহূর্ত্তের জন্য ইহার বিশ্রাম নাই। অথচ ইহার কোনও ব্যাপারে বাহির থেকে কোনও শক্তি এসে একে প্রণোদিত করে না। ভিতর থেকে কি যে রহস্যময় লীলায় আহারসঞ্চিত সমস্ত জড় উপাদানগুলিকে অবলম্বন ক'রে একটি নূতন ছন্দে নূতন ভাঙ্গাগড়ার নৃত্য আবির্ভূত হয়, কোনও যুক্তির জালেই তাকে ধরা যায় না। জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিষই হচ্ছে এই ছন্দ ও সামঞ্জস্যের নৃত্য। জীবনশক্তি ব'লে জড়শক্তির বিরোধী একটা স্বতন্ত্রশক্তি আছে কি না সে তর্ক তুল্‌তে আমার আগ্রহ নেই। কিন্তু জড় থেকে যেখানেই জীবের কোঠায় আমরা পা দিই সেইখানেই আমরা দেখি যে কোন্ মায়াবী পুরুষের মায়াদণ্ডের স্পর্শে সমস্ত জড়ধাতুর মধ্যে একটা নূতন সম্পর্ক, একটা নূতন সামঞ্জস্য, একটা নূতন রকমের পরস্পর নির্ভরতা এসে উপস্থিত হয়েছে। অথচ এটা একটা শুধু থাকাথাকির সম্পর্ক নয়, এটা একটা নূতন রকমের প্রাণময় ব্যাপারময় সম্পর্ক। আমরা দেখি যে জীবিতের দেহের মধ্যে সমস্ত জড় উপাদান গুলি একটা নূতন প্রেরণায় প্রণোদিত হ'য়ে একদিকে যেমন নূতন রকম ভাঙ্গাগড়ার কাজে ব্যাপৃত আছে অপরদিকে তেম্নি একটা সংযমের কঠিন বেষ্টনীতে তার সমস্ত ব্যাপার যথা-নির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলেছে। বাহির থেকে দেখতে গেলে সমস্ত প্রাণীরই জীবনযাত্রা মোটামুটি একই রকম প্রণালীতেই চলে, অথচ প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর জীবন-প্রবাহ এক একটি স্বতন্ত্র প্রণালীতে চলে। তার সমস্ত জীবনপ্রবাহ জৈব উপাদান জৈব প্রকৃতি সেই সেই বিশিষ্ট প্রণালীর মধ্যে সংযন্ত্রিত। শুধু বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মধ্যেই যে এই বিভিন্নতা আছে তা নয় প্রত্যেকটি প্রাণীরই একটি স্বাভাবিক স্বগত বৈশিষ্ট্য আছে যেটি শুধু বিশেষভাবে তারই। প্রত্যেকটি মানুষের জৈব ধাতু জৈব উপাদান জৈব সম্পর্ক জৈব প্রকৃতি তার একটি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলে। তার নিজের অভ্যন্তরস্থ জৈব প্রবাহ সেই বিশিষ্টতার গণ্ডীকে সংযমের সহিত পালন করে। আর এই স্বগত স্বাতন্ত্র্যের নিয়মানুসারে প্রত্যেক জৈবপ্রবাহ দেহযন্ত্রের অপরিসংখ্যেয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যান্ত্রিক ব্যাপারের যথোপযোগী অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলে এবং কোটি কোটি ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে দেহযন্ত্রটিকে অবিকল, সমগ্র ও অখণ্ড ক'রে রাখে।

জৈবশক্তি যদি শুধু জড়শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী একটি মূঢ়শক্তিই হয়, তবে জীবদ্দেহে যে অসংখ্যেয় ভৌতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া চলেছে ও তার যে সমস্ত দুরধিগম্য অসংখ্য ব্যাপার-পরম্পরা চলেছে, সে কেমন ক'রে তার পথ নির্দ্দেশ করবে। কোন্ সর্ব্বজ্ঞ তার পিছনে রয়েছেন যাঁর ইচ্ছায় আমাদের প্রাণশক্তি সহস্রগ্রন্থি সঙ্কুল অনন্ত প্রসারিত পথে তার প্রাণ-ব্যাপারকে সার্থক ক'রে তোলে। একজন প্রসিদ্ধ প্রাণবিৎ এই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ—In order to "guide" effectually the excessively complex physical and chemical phenomena occurring in living material, and at many different parts of a complex organism, the vital principle would apparently require to possess a superhuman knowledge of these processes. Yet the vital principle is assumed to act unconsciously. The very nature of the vitalistic assumption is thus totally unintellgible (Haldane's Mechanism Life and Personality P. 28.)

শুধু তাই নয় ক্ষুদ্রতম জীবকোষের মধ্যেও একটি মূঢ় আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা বা একটা প্রচ্ছন্ন সুপ্ত মননশক্তি কাজ করছে। মননশক্তির একটা প্রধান সার্ব্বভৌম চিহ্ন হচ্ছে এই যে তার দ্বারা কৃতকার্য্যের স্মরণ বা তজ্জাতীয় এমন একটা কিছু থাকে যা'তে পুনরায় সেই রকম কাজ করার সময় সে কাজটা করা সহজ হ'য়ে আসে। তাকেই বলি আমরা মননশক্তির একটা অতি ব্যাপক স্বভাব বা লক্ষণ যা' দ্বারা অতীতটি বর্ত্তমানের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আপনাকে ক্রিয়াময় ক'রে তুলে ভবিষ্যতের কাজকে সহজ ক'রে তোলে।

যে কোনও ক্ষুদ্রতম প্রাণীর জীবনবৃত্তান্ত দেখ্‌লে বোঝা যায় যে তার জীবনশক্তি যে শুধু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে তার আপন ব্যবহারের উপযোগী ভাবে গ'ড়ে তুলে তার শরীরের নানা ব্যাপার সম্পন্ন ক'রে তুল্‌চে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রসুপ্ত মননব্যাপারের কাজেও চালিয়ে চলেছে। ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও ব্যবহার পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তার অতীত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তার যেরূপ ঘাত প্রতি-ঘাত হ'য়েছে তার দ্বারা তার বর্ত্তমানের ব্যবহার অনেকটা পরিমাণে নিরূপিত হয়। অতীতের সুখদুঃখপ্রাপ্তি, সুবিধা অসুবিধা ভোগ করা এবং যে উপায়ে এগুলি ঘটেছে এ সমস্ত গুলিই যেন কোনও অভূতপূর্ব্ব উপায়ে তার শরীরের মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে রয়েছে, এবং এমন ভাবেই সেগুলি তার জীবনশক্তির মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে যে তার বলে সে শিক্ষাটি তার পক্ষে সহজ হ'য়ে গেছে, এবং সে অতীতের শিক্ষা দ্বারা তার বর্ত্তমানের ব্যবহারকে সংযত ও পরিবর্ত্তিত করতে শিখেছে। অথচ এ স্তরের প্রাণীদের মধ্যে যে মন ব'লে একটা জিনিষ আছে এ কথা কোনও রকমেই হয়ত স্বীকার করা যায় না। জীবনশক্তির মধ্যেই এই যে ঠেকে শেখার একটা ব্যাপার এটা যেন প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রয়েছে। জীবনশক্তি যে শরীর যন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি সুনির্ব্বাহ করতে পারে, সে যে শুধু জানে কেমন ক'রে বৃক্কযন্ত্রটিকে (kidney) চালাতে হবে যাতে রক্তের সমস্ত অপ্রয়োজনীয় দূষিত পদার্থ সংগ্রহ হবে অথচ সারপদার্থের একটুও স্পৃষ্ট হবে না এবং সেই সমস্ত পরিত্যাজ্য বস্তুগুলি রক্ত থেকে সংগৃহীত হ'য়ে মূত্ররূপে সঞ্চিত হবে তা নয়, সে জানে কেমন ক'রে প্রত্যেক জীব-কোষে যে রকম অবস্থায় যখন যেভাবে কাজের সুবিধা পেয়েছে সেইটি তার মধ্যে কেমন ক'রে শিখিয়ে সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌তে হবে এবং সেই অনুসারে কেমন ক'রে সে তার ভবিষ্যতের আত্মব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করবে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত যন্ত্র সকলের পিছনে সেই একই শক্তি তাকে সমস্ত কাজে নিয়মিত ক'রে চলেছে, সমস্ত জড়শক্তিকে অভিভব ক'রে এমন এক শক্তিচক্রের মায়া চলেচে যা দ্বারা কি এক অজ্ঞাত নিয়মে নানা বৈষম্যের মধ্যে একটি সাম্য ও সামঞ্জস্যের ছন্দ একটি নূতন রহস্যের সৃষ্টি করচে। উপনিষদের ঋষি এই শক্তিচক্রের পিছনে একটি অখণ্ড ব্রহ্মশক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা এ কথাও অনুমান করেছিলেন যে সমস্ত জড়শক্তির পিছনেও সেই একই শক্তি আপনাকে প্রকাশ করচে। এবং সেই শক্তির বলেই সমস্ত জড়শক্তি, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি আপনাদের বলবান রূপে প্রকাশ করচেন। তাই "কেন" উপনিষদে দেখ্‌তে পাই ঋষি জিজ্ঞাসা করচেন কাঁর ইচ্ছায় প্রেরিত হ'য়ে মন নিয়োজিত হয়, কাঁর দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে প্রাণশক্তি স্বব্যাপারে নিযুক্ত হয় ; কাঁর ইচ্ছায় বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, কাঁর ইচ্ছায় চক্ষু ও শ্রোত্র স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, তিনি বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, মনের মন। সেখানে চক্ষুও যায় না, বাক্যও যায় না, মনও যায় না, কাজেই তাঁর বিষয় জানাও যায় না, ব্যাখ্যাও করা যায় না। চোখে তাঁকে দেখা যায় না কারণ তিনিই চক্ষুকে দেখেন, কাণে তাঁকে শোনা যায় না কারণ তিনি কাণের শ্রবণশক্তি, তিনিই ভূমা, তিনিই বৃহৎ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের শক্তিদ্বারা আবিষ্ট না হ'লে অগ্নির সাধ্য নাই যে সে একটি তৃণকেও দগ্ধ করতে পারে, বায়ুর শক্তি নাই যে সে একটি তৃণকেও উড়িয়ে নিতে পারে।

কিন্তু এই ব্রহ্মশক্তি এক কি বহু, ইহা জড়শক্তির প্রতিস্পর্দ্ধী একটি অখণ্ড জীবনশক্তি, কি মায়াময় শক্তি-চক্রের ছন্দোময় রহস্য, এ জটিল প্রশ্নের মধ্যে আমি এখন প্রবেশ করতে চাই না। কিন্তু জীবন-ব্যাপারের মধ্যে নানা শক্তির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যে আত্মপ্রকাশের যে একটি লীলাচ্ছন্দ আছে সেইটিই বিশেষ ক'রে আমাদের চোখে পড়ে। ভূগর্ভে, কি ডিম্বগর্ভে, কি মাতৃগর্ভে যেখানেই প্রাণের লীলা প্রথম আপনাকে প্রকাশ করে, সেইখানেই দেখি যে কি এক মোহন মায়ার অনির্ব্বচনীয় রহস্যে পূর্ণ হ'য়ে এমন একটি নূতন শক্তিচক্রের উদয় হ'য়েছে, যার দ্বারা জড়শক্তির জড়তা অভিভূত হয়েছে, এবং যার কাছে জড়শক্তি আপনাকে আত্মসমর্পণ করেছে। জড়শক্তিকে পরাভূত ক'রে এই যে একটি নূতন অনির্ব্বাচনীয় শক্তিচ্ছন্দের উদয়, এইটিই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। কিন্তু এই জীবনচ্ছন্দের আবির্ভাবের প্রথমস্তরে বাহির

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

থেকে তাকে জান্‌বার কোনও উপায় থাকে না। প্রকৃতির তিমিরাচ্ছন্ন গর্ভবেষ্টনীর মধ্যে সর্ব্বলোকচক্ষুর গোপন অন্তরালে, প্রাকৃতিক ও ভৌতিক দ্বন্দ্বসংঘাত থেকে বহুদূরে নির্ব্বিঘ্নতার মাতৃগুহায় এই নবজীবাঙ্কুর যখন আপনাকে প্রকাশ করে, তখন প্রকৃতি তাকে সযত্নে আপন গহ্বরে ঢেকে রাখে; ধীরে ধীরে অনুকূল অবস্থার মধ্যে থেকে যখন সে শক্তিসঞ্চয় ক'রে বলবান হ'য়ে ওঠে, তখনই তার বাহিরের আলো বাতাসের দ্বন্দ্বসংঘাতের জগতে জন্মলাভ হয়। কোনও পক্কফলের কঠিন বীজকে যখন আমাদের চর্ম্মচক্ষুতে চেয়ে দেখি, তখন তার সঙ্গে জড় প্রস্তরখণ্ডের কোনও পার্থক্য আমরা বুঝ্‌তে পারি না। সে বীজটি যখন আমাদের অজ্ঞাতে মাটিচাপা পড়ে তখন তার কথা আমরা ভুলে যাই। ভূগর্ভে কি মায়াচক্রের রহস্যে কখন যে জীবনশক্তির এই আবির্ভাব হয় তা কেউ জান্‌তে পারে না। সে তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিতি থেকে তার আহার সংগ্রহ করে, জল থেকে রস সঞ্চয় করে, তেজোধাতুকে আপন আহারের পরিপাকের কার্য্যে নিয়োজিত করে, বায়ুধাতুকে আপন দেহে প্রবাহিত ক'রে আপনাকে দোষমুক্ত করে এবং আকাশধাতুকে আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অবকাশ দানের কার্য্যে নিয়োগ করে। এম্‌নি ক'রে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই নবদেবতা পঞ্চভূতের প্রভু হ'য়েই আবির্ভূত হন। পঞ্চভূতের সাহায্যে যখন তিনি তাঁর আপন উপযোগী দেহ গঠন ক'রে বলভূয়িষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন, তখন তিনি ভূমিপৃষ্ঠ ভেদ ক'রে সূর্য্যের দিকে মাথা তুলে অবতীর্ণ হন। প্রতিদিন কোটি কোটি প্রাণধারা আমাদের চারিদিকে এমন ক'রে উপ্‌চে উঠ্‌ছে, যে একটি কোমল অঙ্কুর যে কঠিন ভূপৃষ্ঠ ভেদ ক'রে জন্মলাভ করে এটা যে কতবড় ব্যাপার তা আমরা তলিয়ে দেখি না, কিন্তু তথাপি আমাদের চিত্ত যদি বৈষয়িক মলিনতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে না থাকে, তবে আমাদের যত্নরোপিত বীজটি যখন অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে, তা দেখে একটি বিমল আনন্দের জ্যোতিতে আমাদের হৃদয় আলোকিত হ'য়ে ওঠে; প্রাণের অবতার দেখে আমরা আমাদের হৃদয়ে প্রাণের স্পর্শ অনুভব করি, এবং ক্ষুদ্র অঙ্কুরটির সঙ্গে আমাদের গভীর আত্মীয়তার আকর্ষণে আমাদের হৃদয় তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ওঠে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর উচ্চ আসন ছেড়ে ধূলায় নেমে বৃক্ষশিশুর জন্মোৎসবের মাঙ্গলিক গান করেছেন—

"প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক্ হে শিশু চিরায়ু
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্ সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালক বৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণ কামনা
শ্রাবণ-বর্ষণ-যজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হ'য়ে, আমাদের বন্ধু হ'য়ে থাকো;
মোদের প্রাঙ্গনে ফেলো ছায়া; পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষা গীতিকায়
সন্ধ্যা বন্দনার গানে মোদের নিকুঞ্জ বীথিকায়
মঞ্জুল মর্ম্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হোতে
প্রাণ-মাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্য্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাবো আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণ মহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক মৃত্যুহীন!
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব পরিমলে॥

জন্মের মত বড় ব্যাপার বিশ্বে আর নাই। জন্ম মানেই হচ্ছে প্রাণশক্তির জয়ঘোষণা। কিন্তু প্রাণের এই যে প্রথম অবতার এটা জীবনশক্তির মূঢ় প্রথম আত্মপরিচয়। নবশক্তির এই প্রথম জাগরণে যে দিকটা আমাদের প্রথম চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে নবীনতার আত্মহারা নববোধি; সেটা হচ্ছে সেই বোধ যাতে প্রাণশক্তি সমস্ত জড়তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে, সকলকে ভেঙ্গে চুরে নূতন ক'রে নিজের মতন ক'রে গ'ড়ে নিতে চায়। রোদ বৃষ্টি ঝড় ঝাপ্‌টা মাটি পাথর সে কিছুই মান্‌তে চায় না। মানুষের মধ্যেও তাই আমরা দেখ্‌তে পাই যে জীবনশক্তি যখন বাল্য ও যৌবনের প্রথম আরম্ভে আপনাকে আত্মপ্রকাশ করে

ও বহির্জগতের আপনাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপৃত থাকে, তখন শুধু যে তার দেহ চারিদিক থেকে অনুকূল আহার গ্রহণ ক'রে বেড়ে উঠতে থাকে তা নয়, সমস্ত সমাজের চিত্তভাণ্ডারে ভালমন্দ যা কিছু সঞ্চিত হ'য়ে আসছে, তার সবটাতে সে হাত দিয়ে লুট ক'রে নিয়ে তার মনকে পরিপুষ্ট করতে থাকে। যা কিছু তার বিরুদ্ধ সে চায় সে তার সমস্ত ভেঙ্গে গুড়ো ক'রে দিয়ে তার উপর সে আপন বিজয়কেতন স্থাপন করবে। সম্ভব অসম্ভবের তুচ্ছ ভয়ে সে ভীত হয় না। যে প্রাণপ্রবাহ জড়কে পরাজিত ক'রে নানা ক্রমবিকাশের পদ্ধতিতে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে তাকে মানুষরূপে জন্ম দিয়েছে, তারই মূঢ়প্রত্যয় মানুষের শিরা উপশিরায় ধাবিত হ'য়ে চলেছে। মানুষ যে অপরাজেয়, অদম্য, সে যে সমস্ত ভেঙ্গে চুরে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে, সে কথা সে জানে না জানতে পারে; কিন্তু তার প্রাণচক্রের সঙ্গে বিশ্বের প্রাণচক্রের যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে, সমস্ত প্রাণব্যাপারের ইতিহাস তার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে; তাই তার জীবনশক্তির মূঢ় স্মৃতির আত্ম-বোধিতে সে আপনাকে অজর অমর দুর্জ্জয় ব'লে জানে। তাই জন্মের পরই আমরা পাই নবীনতার যুদ্ধঘোষণা, নবীনতার দুর্দ্দামতার লীলা, ভালমন্দ ভুলভ্রান্তি তুচ্ছ ক'রে বেড়ে ওঠবার জন্য এগিয়ে যাবার জন্য দুর্নিবার পণ।

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা
আয় দুরন্ত আয়রে আমার কাঁচা॥

শিকলদেবীর ঐ যে, পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামী, তুই আয়রে দুয়ার ভেদি"।
ঝড়ের মাতন, বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আনরে বাছাবাছা।
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা॥

আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে,
বিবাগী কর্ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত আয়রে আমার কাঁচা॥

চির যুবা তুইরে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস্ ধরা
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস্ আকুল করা
আপন গলার বকুল মাল্যগাছা।
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা।

নবীনতার এই যে দুর্দ্দাম উচ্ছ্বাস, এই যে ভাঙ্গাগড়ার লীলাচঞ্চলতা, এটা জৈব-ধর্ম্মেরই রশ্মি বিচ্ছুরণ মাত্র।

জৈবব্যাপারের কথা বলতে গিয়ে বলেছি যে প্রত্যেক জৈবব্যাপারের সঙ্গে একটা মূঢ় মনন-ব্যাপার নিহিত থাকে। এই মূঢ় মনন-ব্যাপারকে পারিভাষিক ভাষায় ব্যবহার বা behaviour বলা যায়। প্রাণ-ব্যাপারের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে কোনও প্রাণী যখন কোনও কাজ সম্পন্ন করে, তখন সেই কাজে তার ইষ্ট বা অনিষ্ট যা কিছু ঘটে, তার একটা প্রমুষ্ট স্মৃতি তার শরীর-যন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত থাকে এবং ভবিষ্যতের কাজে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের কাজে তার সাহায্য করে। প্রত্যেক প্রাণীই তার experienceএর দ্বারা, তার ইষ্টানিষ্ট ভোগের দ্বারা, তার ভবিষ্যৎ ব্যবহারকে নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত করতে পারে। অথচ এমন নিম্নতম প্রাণী থেকে এ জিনিষটার আমরা আরম্ভ দেখে থাকি, যে এ জিনিষটাকে আমরা যাকে জ্ঞান বলি তা বলতে পারি না। ইতরপ্রাণীর ব্যবহারের সঙ্গে মানুষের

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ব্যবহারের যে একটি নিকট সাম্য আছে একথা আমাদের দেশের মনীষীরাও জান্‌তেন। শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসভাষ্যে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন যে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ ব্যবহারে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনও ভেদ নাই। পশু যেমন প্রতিকূল শব্দ শুনিয়া নিবৃত্ত হয় এবং অনুকূল শব্দ শুনিয়া উন্মুখ হয় মানুষও ঠিক্ তেমনই। লাঠি হাতে করিয়া মারিতে উঠিলে আমাকে মারিতে আসিতেছে মনে ক'রে পশু যেমন পালায়, এবং হাতে শ্যামল ঘাস দেখিলে যেমন এগিয়ে আসে, মানুষও ঠিক তেমনিভাবে খড়্গধারী কোনও ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধভাবে তর্জ্জন করিতে দেখিলে ভয়ে পালায় এবং মিষ্টভাষী কোনও ব্যক্তি যদি আহারের নিমন্ত্রণ করে, তবে সানন্দে তার গৃহে এসে উপস্থিত হয়। কাজেই প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণব্যবহারে মানুষও যেমন পটু পশুও তেম্‌নি পটু। অনেক পশুপক্ষী স্বাভাবিক প্রাতিভ জ্ঞানে এমন কত আশ্চর্য্য কৃতিকুশলতার পরিচয় দেয় যে বুদ্ধ্যভিমানী মানুষকেও লজ্জিত হইতে হয়। পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গেরা এমন যৌথ বন্ধনের ও শৃঙ্খলার পরিচয় দেয় যে তেমন যূথ বন্ধন বোধহয় সকল সময় মানুষেরাও ক'রে উঠ্‌তে পারে না। কিন্তু এই ব্যাপারটির বিশ্লেষণে প্রাচীনদের সঙ্গে আধুনিকদের বেশ একটু প্রভেদ আছে। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ কর্‌তে গিয়ে বল্‌তেন যে পশুরা মানুষের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু আধুনিকেরা বলেন যে পশুরও যেমন বুদ্ধি নেই মানুষেরও তেমন বুদ্ধি নেই। অবস্থা বিশেষে প্রয়োজনের উৎপীড়নের ও পূর্ব্বতন সুখদুঃখ ভোগের স্মৃতি অনুসারে প্রত্যেক প্রাণী-যেমন নানারূপ কাজের মধ্য দিয়ে আপনাদের জীবন চালিয়ে নেয়, মানুষও তেম্‌নি একটা মূঢ় অভ্যাসের দ্বারা তার আপন জীবনযাত্রা চালায়। পশুর ক্রমবিকাশেই পশুবংশ থেকে মানুষের উৎপত্তি, তাই পশুর সহিত তা একটি প্রকৃতিগত সমতা আছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও নূতন রহস্য নেই, জ্ঞান বিজ্ঞান ব'লে কোন্‌ও স্বতন্ত্র বস্তুও নেই যার প্রভাবে মানুষ আপনাকে কোনও উচ্চতর শ্রেণীর ব'লে মনে কর্‌তে পারে। পশুর মতন মানুষেরও সমস্ত ব্যবহারই তার জীবনযাত্রার সঙ্গে সংবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রা নানারকম পদ্ধতিতে জটিল ও ঘূর্ণাময়; তাই তার জীবনযাত্রা এত কৃচ্ছ্রসাধ্য। এবং এই জীবনযাত্রার অনুরোধে তার শরীরের প্রত্যেকটি তন্ত্রী তদুপযোগী জীবন-ব্যাপারের অনুকূলে এমন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, যে কোনও দুরূহ কার্য্যের নানা ক্রমগুলি একটির পর আর একটি তার দেহযন্ত্রেরই অনুপ্রাণনায় এম্‌নি ক'রে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং তার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি আপন আপন স্বাভাবিক সংস্কার ও অভ্যাসের মূঢ় প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন করে। আমরা মনে করি যে আমরা ভাবি, আমরা চিন্তা করি। কিন্তু যথার্থতঃ আমরা ভাবিও না চিন্তাও করি না। কোনও কাজ করিতে গেলে পূর্ব্ব সংস্কার বশে মস্তিষ্ক যন্ত্রের স্বাভাবিক জৈবগতিতে কতকগুলি কার্য্যপ্রণালীর দিকে প্রবৃত্ত হবার জন্য আমাদের নাড়ীযন্ত্র উন্মুখ হ'য়ে ওঠে; যখন একসঙ্গে নানারকম কার্য্যপ্রণালীর দিকে প্রবৃত্ত হবার জন্য নাড়ীযন্ত্রটি ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে, তখন আমরা তাকে বলি "কি মুস্কিল" "কি ভাবনার বিষয়" "কি করা যায়"। আমরা নিজেদের বুঝাতে চাই যেন আমরা তখন ভেবে একটা সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু বস্তুতঃ নাড়ীযন্ত্রটি বিভিন্ন দিকে উত্তেজিত হ'য়ে দীর্ঘকাল স্থির থাক্‌তে পারে না; সে একটা না একটা পথ নেবেই নেবে। যে দিকে তার গতি হয় সেইটিই আমাদের তখনকার সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন দিকের উত্তেজনায় নাড়ীযন্ত্রটি যে সত্য সত্যই আহত হ'য়ে ওঠে, সেটা তখনই আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি, যখন আমরা কোনও দিকে মন স্থির ক'রে উঠ্‌তে না পেরে বলি যে "আর পারা যায় না, যা হোক্ একটা ক'রে ফেলি"। এম্‌নি ক'রে আমাদের সমস্ত দেহযন্ত্রটি আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী ব্যাপারের সহিত এমন ক'রেই সর্ব্বদা বাঁধা আছে, তার প্রতি প্রয়োজনের আবেদনে সে এমন ক'রেই ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে, যে তাতেই আমাদের জীবনের সব কাজ চ'লে যায়। জ্ঞান বুদ্ধির কথা যতই আমরা বলি না সেটা শুধু কথার কথা মাত্র। আসলে সর্ব্বপ্রাণী-সাধারণ জৈববৃত্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিছক্ জৈব উপায়েই আমাদের সমস্ত কাজ চলে।

একথা যদি ঠিক্ হয় তবে জৈব জন্মের চেয়ে আর কোনও বড় জন্ম নেই। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এই জৈব বৃত্তিটি ব্যাপক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠভাবে ক্রমশঃ তার কাজ সুসম্পন্ন ক'রে চলে। এবং আমাদের প্রথম জন্ম দিনে যে কাজটি আরম্ভ হয়, পরবর্ত্তী কালের প্রত্যেক জন্ম দিনে সেই দিনটিরই ক্রমব্যাপ্তি বা ক্রমপ্রসারের উৎসব চল্‌তে থাকে। জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে সেই একই জৈবপ্রবাহের দৃঢ় বিস্তার ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছতে হয়। কিন্তু এ তর্কের মধ্যে একটা কথা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে। সেটা হচ্চে এই যে এই বিশ্লেষণটি হয়ত বা জীবনযাত্রার ব্যবহারের সম্বন্ধ ঠিক, হয়ত বা ঠিক নয়, কিন্তু মানুষের জীবন ত শুধু জৈব ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ প্রয়োজনের তাড়নায় যা কিছু করে তার সঙ্গে হয়ত সকল সময়েই একটা জৈববৃত্তি কাজ করতে থাকে। এবং সেই অছিলায় সেগুলিকে হয়ত কোনও না কোনও রকমে জৈবব্যাপারের কোঠায় ফেলা যেতে পারা যায়। কিন্তু বিনা প্রয়োজনের যে সমস্ত লীলা মানুষের চিত্তকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে, সেগুলিকে কোনও রকমেই জীবনযাত্রার জৈবপ্রয়োজনে উদ্ভূত ব'লে মনে করা যেতে পারে না। আহার, নিদ্রা, শারীরিক সুখদুঃখ, কল্যাণ অকল্যাণ এ সমস্তগুলিকে হয়ত জৈব ব'লে মনে করা যেতে পারে এবং সে অংশে মানুষকে পশুবৎ ব'লে কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে মানুষের মধ্যে এমন একটি বোধি আছে যার প্রেরণায় সে দেশের জন্য, দশের জন্যে, এমন কি একটা ধর্ম্মমত সমাজমতের জন্য, স্বেচ্ছায় অনায়াসে আপন জীবন বিসর্জ্জন কর্‌তে পারে। ধর্ম্মমতের সঙ্গে জৈবজীবনের কোনও বিশেষ সম্পর্ক নাই; ধর্ম্মমত কোনও জৈব প্রয়োজনে আসে না, তথাপি মানুষ ধর্ম্মমতের জন্য কতই না সহ্য করছে। যে জীবন নিছক জৈব নিয়োগে চলে, সে জীবনে আদর্শ ব'লে কোনও জিনিষের স্থান নেই, সে জীবনে পরম বা চরমজ্ঞানকে লাভ কর্‌বার জন্য বর্ত্তমান সুখভোগকে হেলায় পরিত্যাগ কর্‌তে পারে না। আমাদের জীবন যদি এর চেয়ে বেশী কিছু প্রসব কর্‌তে না পার্‌ত তবে কখনও এমন কথা লোকে বল্‌তে পার্‌ত না যে

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং বিলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

জীবনের সমস্ত ভোগবাসনাকে তুচ্ছ ক'রে অমৃতকামী নচিকেতা বলেছিলেন "শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ. অপি সর্ব্বং জীবিতং অল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা (সমস্ত পৃথিবীর ভোগ কেবল ইন্দ্রিয়কে ক্লান্ত ক'রে তোলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভোগের শেষ, তাই সুখভোগে মানুষ তার চরম তৃপ্তি পায় না) যাজ্ঞবল্ক্যের সমস্ত ধনসম্পত্তি প্রত্যাখ্যান ক'রে মৈত্রেয়ী বলেছিলেন যে ধনের দ্বারা ত অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, যাতে অমৃতত্ব পাওয়া যায় না, তাতে আমার কি প্রয়োজন, কিমহং তেন কুর্য্যাং যেনাহং নামৃতা স্যাম। এই যে অমৃতত্বের কামনা, এই যে নিজের মধ্যে গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাণকে দর্শন করা, এ অনুভূতিকে ত শুধু জৈব ব্যবহারের অনুভূতি ব'লে চুকিয়ে দেওয়া চলে না। কাজ ছাড়া জৈব ব্যাপার চলে না, আর সে কাজও এমন হওয়া চাই যা'তে এই জীবদ্দেহ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, এবং এই জীবদ্দেহকে কেন্দ্র ক'রে যে মন গ'ড়ে উঠেছে, সে যাতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে, তাই সমস্ত জৈব ব্যাপারই তার প্রাতিভ জ্ঞানে (instinct) দেহ ও মনের অনুকূল কাজে আপনাকে নিয়োজিত করে। কিন্তু জৈব ব্যাপার কোনও অনুভূতিকে বা কোনও আত্মদর্শনকে বা দেহমনের উপকারে আসে না এমন কোনও আত্মানন্দকে তার চরম প্রাপ্তি ব'লে মনে কর্‌তে পারে না। জৈবধর্ম্ম যে অমরত্ব চায় সে রসায়নের দেহের অমরত্ব। কিন্তু মৈত্রেয়ী যে অমরত্ব চেয়েছিলেন সে হচ্ছে সেই অমরত্ব যেখানে সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধি নিবৃত্ত হ'য়ে গেছে, সেখানে কেউ কাকেও দেখে না, কেউ কিছু শোনে না, কেউ কিছু স্পর্শ করে না, কেউ কিছু জানে না; তার অন্তরও নাই বহিরও নাই, সে হ'চ্ছে একটি নিছক আনন্দরস। বৌদ্ধ চান সেই অমরত্ব যাতে জীবজন্মের সমস্ত প্রবাহ একেবারে বিরুদ্ধ হ'য়ে নিঃশেষে শেষ হ'য়ে যায়, কোনওখানে তার কিছুর অবশেষ না থাকে। এই যে বোধি, এই যে অমর অনুভূতি যা সমস্ত দেহযন্ত্রকে উপেক্ষা ক'রে সমস্ত জৈব আকর্ষণকে পরাজিত ক'রে তার সমস্ত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রলোভনকে জয় ক'রে, কোনও জৈব উপায়ে একে পাওয়া যায় না। জড়শক্তির ব্যাখ্যায় যেমন জীবনশক্তিকে পাওয়া যায় না অথচ জড়শক্তিকে অবলম্বন ক'রেই জীবনশক্তির অভাবনীয় রহস্যময় জন্ম হ'য়েছে তেম্‌নি জীবনশক্তির উপর নির্ভর ক'রে, অথচ তার শক্তির অনেক উর্দ্ধে এই দেদীপ্যমান আত্মানুভূতির জন্ম। জড়ের পরিণতি জড়ে, জীবনশক্তিরও পরিণতি ক্রমাবচ্ছিন্ন জীবন প্রবাহের আগমনির্গমে সৃষ্টিধ্বংসের ক্রমপরম্পরায়। জৈবগতির পথে এই ক্রমপরম্পরার হাত থেকে আর মুক্তির উপায় নেই। জৈবগতির পথ ছেড়ে মানুষ যখন তার আত্মানুসন্ধানের আত্মপ্রকাশের আত্মানুভূতির ক্ষেত্রে জন্মলাভ করে তখনই তার যথার্থ জন্মলাভ ঘটে এবং তার চরম সার্থকতা আসে। শুধু যে জৈব জন্ম সেটা ত একান্তভাবে সর্ব্বপ্রাণীসাধারণ, তাতে মানুষের কোনও বিশেষত্ব নাই; সত্যই সে ক্ষেত্রে মানুষ পশুর সগোত্র। কিন্তু সমস্ত প্রয়োজনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ যে এক বিরাট ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ ক'রে, আপন অমরত্বের রসে আপনি আত্মতৃপ্ত হ'য়ে থাকে, এইটিই যথার্থ মনুষ্য জন্ম, কারণ এ জন্ম অন্য কোনও প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব নয়।

এ পর্য্যন্ত কেবল উপনিষদের ব্রহ্মদর্শনের দৃষ্টান্ত দিয়েছি কিন্তু তাই ব'লে এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে আমি কোনও সাম্প্রদায়িক অর্থে ব্যবহার করি নাই। ব্রহ্মদর্শন উপনিষদের ঋষিদেরই নিজস্ব নয় বা হিন্দু জাতিরও নিজস্ব নয়। শুধু তাই নয়, ব্রহ্ম বল্‌তে আমি উপনিষদের পারিভাষিক আত্মতত্ত্বকেও মনে করি না। ব্রহ্ম অর্থ বৃহৎ এবং তাই বৃহৎ যা প্রয়োজনের বাঁধন থেকে আপনাকে মুক্ত কর্‌তে পারে। মানুষ তার নিজের মধ্যে এবং নিজের মধ্য দিয়ে জগতের মধ্যে অহরহই এমন একটি বৃহতের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যেখানে তার সমস্ত বন্ধন কেটে যায়। শিল্পী বা কবি যখন বর্ণের ছন্দে বা কথার ছন্দে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, এবং আপন সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা হন তখনও তিনি এমনই এক ব্রহ্মের সম্মুখীন হন, যেখানে সমস্ত অন্তর ও বাহির ছিন্ন হ'য়ে শুধু একটি রসমূর্ত্তিতে আপনাকে অভিব্যক্ত করে। যখন জৈবপ্রবাহের সমস্ত দাবী এড়িয়ে এই রসমূর্ত্তির জন্ম হয়, তখন আমরা কবিকে পাই, শিল্পীকে পাই। যখন তত্ত্বদর্শী তত্ত্বের দিক্ দিয়ে জগতের রহস্যকে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করেন তখনও তিনি এম্‌নিভাবেই ব্রহ্মের সম্মুখীন হন; যখন দেখি ভক্ত হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে রসে বিভোর হ'য়ে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তখনও দেখি তিনি সেই বৃহতের মধ্যেই জন্মলাভ করেছেন। এই যে বৃহতের মধ্যে মানুষের জন্ম, এটা মানুষের নিজস্ব ধর্ম্ম। মানুষ অমৃতের পুত্র তাই তার যথার্থ জন্ম হচ্ছে এই ভূমার জন্ম। কেউ বা এই ভূমার জন্মলাভ ক'রে এইখানেই আপনাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়ে রাখে; কেউ বা অল্পক্ষণের জন্য ভূমার স্পর্শ লাভ ক'রে আবার জৈবজীবনের মর্ত্ত্যধামে ফিরে আসে। কিন্তু সে মানুষই নয় যার যথাকালে এই ভূমার মধ্যে তার যে অক্ষয়লোক রয়েছে তার মধ্যে একবারও তার প্রবেশলাভ ঘ'টে ওঠে নাই। আমরা জৈবজীবনের জন্মদিন রক্ষা ক'রে উৎসব করি, কিন্তু এ উৎসব তখনই সার্থক হবে, যখন উৎসবরাজ তাঁর অতুল করুণায় তাঁর অনন্ত অসীমের বিচিত্ররূপের মধ্যে নব বোধির নব জাগরণে আমাদের নূতন জন্ম দেবেন। সেইটিই চৈতন্যকৃষ্ণের অপার্থিব অপ্রাকৃত জন্মাষ্টমী। আমাদের সমস্ত জন্মদিনের উৎসব সেই একটি দিনে সার্থক হবে। আমার কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীরও হয়ত সেদিন একদিন আস্‌বে, এই আশাতেই আজকার এই জন্ম উৎসব শরৎকালের প্রভুর হাসিতে জ্যোৎস্নাময় হ'য়ে উঠুক্।

মন তুমি নাগ লবে হ'রে ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে
নীলাকাশে ওই তারা ভাসে, নীরব নিশীথে শশী হাসে
দু'নয়নে বারি আসে ভ'রে, ব'সে আছি আমি আশা ধ'রে।
স্থলে জলে তব ধূলিতলে, তরুলতা তব ফুলে ফলে
নরনারীদের প্রেমডোরে, নানাদিকে দিকে নানাকালে
নানা সুরেসুরে নানা মতে নানা তালে তুমি লবে মোরে
বসে আছি সেই আশা ধ'রে।*

* লেখকের কন্যা কুমারী মৈত্রেয়ীর জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত।
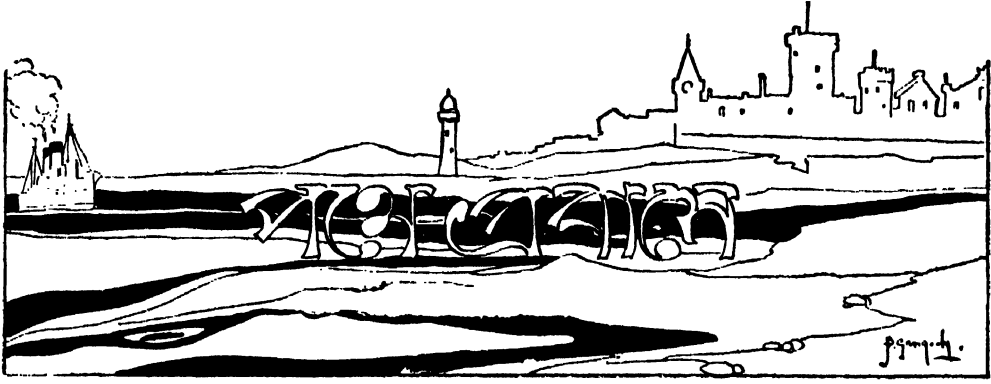
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

১২

সম্প্রতি এখানে air raid হ'য়ে গেল। একদল লোক এরোপ্লেনে লণ্ডন আক্রমণ করলে, আরেক দল লোক লণ্ডন রক্ষা করলে। যুদ্ধটা এমন নিঃশব্দে হলো যে খবরের কাগজ ছাড়া কোথাও রেশ রেখে গেল না। নিন্দুকেরা বল্‌ছে আসল যুদ্ধ এত সহজ ব্যাপার নয় এবং যারা সত্যিই লণ্ডন আক্রমণ করবে তারা এই যাত্রার দলের যোদ্ধাদের রিহার্সেলের সুযোগ দেবে না।

ইংলণ্ডের মতো দেশে যুদ্ধ একটা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। যারা পেশাদার সৈনিক তারা ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত রয়েছে, যারা অব্যবসায়ী তারাও "দরকার পড়্‌লে সৈনিক হবো" এই মনোভাব নিয়ে খাট্‌ছে ও খেল্‌ছে। এ ক্ষেত্রে বড়লোক ছোটলোক নেই, সব শ্রেণীর সব অবস্থার লোকের পক্ষে এটা সন্ধ্যাহ্নিকের মতো আচরণীয়। পাঁচ বছরের ছেলের দলও মার্চ্ ক'রে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রায় চলে, বড়দের তো কথাই নেই। মেয়েরা তাদের নকল করে, উৎসাহ দেয়, এবং নিজেরা দল ক'রে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলোর জন্যে তৈরী হয়। আহতদের শুশ্রূষার ভার তো মেয়েদেরি উপরে। আকাশ-যোদ্ধাদের মধ্যে মেয়েও আছে।

সামরিক সংস্কার এদের আবালবৃদ্ধবনিতার মজ্জাগত। পরিবারের দু'টি একটি ছেলে যুদ্ধকে তাদের জীবিকা করবেই, একথা প্রত্যেক পিতা মাতা একরকম ধ'রেই রাখেন, এবং পরিবারের দু'টি একটি মেয়ে সৈনিককে বিবাহ ক'রে বিধবা হ'লেও হ'তে পারে, এও পিতা মাতার দূরদৃষ্টির বাইরে নয়। একান্নবর্ত্তী পরিবার এদেশে নেই, ছেলে বড় হ'লে ঘর ছেড়ে যায়, তার উপরে বাবা মায়ের দাবী নগণ্য। সুতরাং ছেলে যদি যুদ্ধে প্রাণ হারায় তবে বাবা মায়ের শোক যত বড়ই হোক্ অসুবিধা অপ্রত্যাশিত হয় না। একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা না থাকায় এদেশের যুবকের পক্ষে দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের তুলনায় সহজ। বিধবাবিবাহও এদেশে নিষিদ্ধ নয়, সুতরাং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ দিলে স্ত্রীর শোক যত বড়ই হোক আশার ক্ষীণ রশ্মি থাকে। সেই জন্যে হয় প্রাণ দিতে, নয় যশস্বী হ'তে এদের স্ত্রীরা যেমন এদের যুদ্ধে ঠেলে, আমাদের স্ত্রীরা তেমনি আমাদের যুদ্ধে দূরের কথা বিদেশে যেতেও ঠেলে না, অধিকন্তু বাধা দেয়। যখন সহমরণ প্রথা ছিল তখন স্ত্রীর আনুকূল্য পাওয়া দুষ্কর ছিল না; কেননা বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির উপায় ছিল; এবং পুনর্ম্মিলনের আশাও ছিল নিকট।

আমাদের স্ত্রীলোকদের মতো প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদের আর নেই। তারা যে এদের স্ত্রীলোকদের চেয়ে স্নেহময়ী এমন মনে করলে দেশকাল-নিরপেক্ষ নারীপ্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তারা এদের স্ত্রীলোকদের তুলনায় স্নেহান্ধ, তারা আমাদের "রেখেছে বাঙালী ক'রে, মানুষ করেনি।" কোনো দুঃসাহসিক ব্রতে তারা আমাদের

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

নিষ্ঠুর আনুকূল্য করে না, তাই সে হতভাগিনীদের আমরা "পথি বিবর্জ্জিতা" ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাওয়াটাকেই মনে করি চরম দুঃসাহসিকতা। এবং যখন সন্ন্যাসী হ'য়ে যাই, তখন কুলবনিতায় বারবনিতায় ভেদ রাখিনে, এক নিশ্বাসে ব'লে যাই নারী কালভুজঙ্গিনী কামিনী, কাঞ্চনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক! ইউরোপের উপরে যে খ্রীষ্টিয়ানিটি নামক ও সন্ন্যাসীশাসিত ধর্ম্মমতটি চাপানো হয়েছে সেটিও সম্ভবত বৃহৎ-পরিবার-কণ্টকিত কাঁটা গাছের ফল। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানিটি তো ইউরোপের সত্যিকারের ধর্ম্ম নয়, সরকারী ধর্ম্ম; তাই চার্চ্চের কর্ত্তারাও ষ্টেটের কর্ত্তাদের মতো যুদ্ধ বিগ্রহে পাণ্ডার কাজ ক'রে থাকেন; এমন কি ফরাসী যাজকরা উঁচুদরের diplomat ও পর্ত্তুগীজ যাজকরা উঁচুদরের ব্যবসাদারও হ'য়ে থাকেন। এই যে এখন যুদ্ধ নিবারণের প্রচেষ্টা চলেছে, এতে চার্চ্চের নেতৃত্ব নেই, এবং যেটুকু যোগ আছে সেটুকু চার্চ্চ্-ভক্ত জনকয়েক ব্যক্তি বিশেষের।

ইংলণ্ডে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিবাদীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু যে কারণে বাড়ছে সে কারণটা ইংলণ্ডের বার্দ্ধক্যের লক্ষণ কি না বলা যায় না। শান্তিবাদীদের দলে যাদের নাম দেখি তাঁরা সাধারণতঃ বর্ষীয়ান এবং তাঁদের ভাবনা এই যে, আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়াকে যদি একটুও প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে ভাবী যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী ছারখার হ'য়ে যাবে। এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুঁড়ে এত শতাব্দীর এতবড় লণ্ডন সহরটাকে একদিনেই শ্মশান ক'রে দেওয়া সম্ভব। মানুষ যত সহজে ধ্বংস করতে শিখেছে তত সহজে নির্ম্মাণ করতে শেখেনি। একটা যুদ্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কত বৎসর চ'লে যায়। আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়া এমন মারাত্মক যে, যে সব দেশ যুদ্ধে যোগ দেবে না, সে সব দেশেও মহামারী পৌঁছাতে পারবে। এবং এক দেশের বিষে সব দেশ জর্জ্জর হ'তে পারবে। এক জাতির ক্ষতিতে সব জাতির ক্ষয়, এটা যে কত বড় সত্য তা মানুষ এতকাল বুঝত না, এখন বুঝছে। কিন্তু বুঝলে কি হয়, বুদ্ধি তো মানুষের সব নয়, প্রবৃত্তি যে তার বুদ্ধির অবাধ্য। "জানামাধর্ম্মং ন চ'মে নিবৃত্তিঃ।" গত মহাযুদ্ধে যে শিক্ষাটা হলো, সে শিক্ষা ইতিমধ্যেই বাসি হ'য়ে গেছে। আর কয়েক বছরেই নতুন পুরুষ (generation) রাজত্ব করবে; নবীন চিরদিনই বেপরোয়া; শৈশবের যুদ্ধস্মৃতি যৌবনে মিলিয়ে যাবে; তখন চলবে নতুন যুদ্ধে নতুন কীর্ত্তির আয়োজন। সে আয়োজনে তরুণকে প্রেরণা দেবে তরুণী; সে তার কানে কানে বলবে "None but the brave deserves the fair"; অর্জ্জুনের রথে সারথি হবে সুভদ্রা। তারপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; তারপরে পতিপুত্রহীনাদের নারীপর্ব্ব; তারপরে আবার নতুন বংশ নতুন পুরুষ নতুন সৃষ্টি।

শান্তিবাদীদের চেষ্টা যদি সফল হয়, তো বুঝতে হবে ইউরোপের বার্দ্ধক্য দেখা দিয়েছে. ইউরোপ কুরুক্ষেত্রের ক্ষতি পুষিয়ে নেবার মতো রক্তের জোর হারিয়ে বুদ্ধদেবের মুখে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" শুনতে চাইছে। বুদ্ধ ও গান্ধীকে সত্যিই কেউ কেউ আবাহন ক'রে আনছেন; এমন কি একটা বৌদ্ধ মিশন পর্য্যন্ত লণ্ডনে বাসা বেঁধেছে। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের উপরে বুদ্ধদেবের প্রভাব অল্প নয়। এঁরা বলছেন মরণেই তো সব শেষ, কেন তবে দু'দিনের জীবনটা খুইয়ে দু'দিনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হই; চাই জ্ঞান চাই প্রেম চাই পরমায়ু। বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ সাহসী লোক, কিন্তু নির্ব্বোধের মতো মানুষ মেরে মরতে চান না।

কিন্তু বেঁচে থেকে মানুষ করবে কি? মানুষ যে কঠিন কিছু না করতে পারলে জড় হ'য়ে যায়, ভীরু হ'য়ে যায়। যুদ্ধ মানুষ হাজার হাজার বছর ক'রে আসছে শুধু কঠিন কিছু না ক'রে তার শান্তি নেই ব'লে। যুদ্ধহীন জগতের শান্তির মতো অশান্তি তার পক্ষে আর নেই। মানুষ যে মানুষকে হিংসাই করে এটা মিথ্যা, সুতরাং "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" মানুষের পরম ধর্ম্ম নয়। মানুষ আঘাত করতে ও আঘাত পেতে ভালোবাসে, কারণ মানুষ প্রেমিক। তার প্রেমে আঘাত আছে অবহেলা নেই; অহিংসা তো অবহেলারই নামান্তর। আমি তোমাকে অহিংসা করি বললে তোমার প্রতি কিছুই করা হয় না, না ভালো না মন্দ। অহিংসা হচ্ছে একলা মানুষের নিষ্ক্রিয় মানুষের ধর্ম্ম, সে মানুষ অসহযোগীই বটে। তেমন মানুষের সমাজে বাস ক'রে আনন্দ নেই। আমরা চাই দু'টো মারতে দু'টো মার খেতে,

আমরা রাগীও বটে অনুরাগীও বটে, কিন্তু রক্ষা করো, আমরা বৈরাগী নই।

আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়ায় মানুষকে কি মানুষের নিকট ক'রে তোলেনি? মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়নি? অধিকাংশ মানুষ দেশের বাইরে যাবার সুযোগ পায় না, প্রধানত আর্থিক কারণে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে যোগ দিয়ে তারা যখন বিদেশ অভিযান করে তখন বিদেশকে জান্‌বার সুযোগ পায়, বিদেশীকেও জানে। গত মহাযুদ্ধে দ্বীপবদ্ধ ইংরেজ প্রথমবার জার্ম্মান সংস্পর্শে এসে জার্ম্মান জাতিকে জান্‌লে, তার ফলে এখন জার্ম্মানীর প্রতি শ্রদ্ধা তাদের কত! গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স থেকে যাঁরা যুদ্ধ কর্‌তে গিয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো লেখায় পড়্‌লুম, জীবন মরণের সন্ধিক্ষণেই দুই যোদ্ধা বোঝে যে তারা দু'জনেই মানুষ; তাদের দু'জনের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। কিসের এক অবোধ্য প্রেরণায় তাদের এক ক্ষেত্রে মিলিয়েছে; অমূল্য এ মিলন, কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে জীবন দান ক'রে! মিলন মাত্রেই বিয়োগান্ত!

ভাবী যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী মহামারীতে মানুষকে আরেকটু-খানি মিলাবে। অকথ্য লোকসান দিয়ে মানুষ জান্‌বে যে সকলেরই স্থান এক নৌকায়। ভারতবর্ষের লোক ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখে গেছে পৃথিবীটা নেহাৎ ছোট, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে মেনে নিয়েছে পৃথিবীর এক কোণের ছোঁয়াচ আরেক কোণে পৌছায়। গত মহাযুদ্ধের পর সকলেই অল্পাধিক বুঝেছে যে জেলায় জেলায় যুদ্ধ যেমন জ্ঞাতিবিরোধ দেশে দেশে যুদ্ধও তেমন জ্ঞাতিবিরোধ। সেদিন এক গির্জ্জার দ্বারে লিখেছে "Duelling is illegal. War is the duel between nations. Why not make it illegal by taking your national quarrel to an international court of justice?"

এদেশের "লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ ইউনিয়ন" যুদ্ধনিবারণের জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। নানা দেশের নানা জাতির মানুষের যাতে দেখাশুনা আলাপ পরিচয় হয় সে চেষ্টারও বিরাম নেই। ভাবী যুদ্ধ যদি নিকট ভবিষ্যতে ঘটে তবে ইংলণ্ডের জনসাধারণ আত্মরক্ষার গুরুতর কারণ না দেখ্‌লে যুদ্ধে নাম্‌তে চাইবে কিনা সন্দেহ। যদি সুদূর ভবিষ্যতে ঘটে তবে বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিই প্রবল হবে বোধ হয়। পৃথিবীকে এক রাষ্ট্রে পরিণত না করা অবধি যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। শুধু এক রাষ্ট্র নয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শুধু গণ-তান্ত্রিক নয় ধনসাম্যমূলক। রেল্ ষ্টীমার যেমন কল্‌কাতা বম্বে মাদ্রাজ দিল্লিকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর ক'রে ভারতবর্ষকে এক রাষ্ট্র করেছে এরোপ্লেন তেমনি নিউইয়র্ক্ লণ্ডন কায়রো সিঙ্গাপুর টোকিওকে পরস্পরের পক্ষে নিকট-তর না করা অবধি পৃথিবীব্যাপী এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার আশা নেই। তবে ইউরোপ যে তাড়াতাড়ি এক রাষ্ট্র হ'য়ে উঠ্‌ছে এর সন্দেহ নেই। "United States of Europe" আর বেশী দিন নয়, পঞ্চাশ বছর।

কিন্তু যুদ্ধ কি কোনোদিন থাম্‌বার? কদাচ নয়। মানুষে মানুষে যুদ্ধ থাম্‌লে পৃথিবীবাসীর সঙ্গে মঙ্গলবাসীর যুদ্ধ বাধ্‌তে পারে। যুদ্ধ না ক'রে আমাদের শান্তি নেই। যেদিন আমাদের প্রকৃতি থেকে যুদ্ধপ্রিয়তা চ'লে যাবে কিম্বা আমাদের সমাজ আমাদের যুদ্ধ কর্‌বার পরিসর দেবে না সে দিন আমাদের কঠিন পিয়াসী মন বিবাগী হ'য়ে বনে বেরিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর মতো নিষ্ফল হ'য়ে যাবে; পৃথিবীতে আবার হয়তো একটা বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান যুগ আস্‌বে; যে যুগ মানব প্রকৃতির শীত ঋতু। ফাল্গুনের লক্ষ লক্ষ মুকুল ঝরিয়ে একটি ফল পাওয়া। একটি শিশুর জন্মের জন্যে লক্ষ বীজের প্রতিযোগিতা। সবাই ব্যর্থ হয়, একটিই সফল হয়। সমাজের যৌবনকাল ততদিনই থাকে, যতদিন সমাজ লক্ষ লক্ষ যুবককে প্রাণান্তক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে বলে, কয়েকজন উত্তীর্ণ হ'লে সকলের ব্যর্থতা সার্থক হয়; সমাজ হয় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমাজ যখন বলে, "না, এত লোকসান দিতে আমি পার্‌বো না, আমার মূলধন অল্প," তখন বুঝ্‌তে হবে সমাজ বুড়ো হ'য়েছে, সমাজের যুবকগুলিকে হরিনামের সংকীর্ত্তনে পাঠাবার সময় এসেছে।

যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যুদ্ধেরই মতো কঠিন কিছু উদ্ভাবন কর্‌তে হবে। নতুবা মৃত্যু-সংখ্যা কমাবার জন্যেই যদি যুদ্ধ তুলে দিতে হয়, তবে যুদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যাবে; সমগ্র পৃথিবীটাই একটা ভারতবর্ষ হ'য়ে উঠবে, যেখানে

পথে প্রবাসে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

যযাতির রাজত্ব হাজার কয়েক বছর থেকে চ'লে আস্‌ছে। তখন পৃথিবীময় "পিতা স্বর্গ" ও "জননী স্বর্গাদপি"র জ্বালায় মাথাটা ভক্তিতে এমন নুয়ে আস্‌বে যে মেরুদণ্ড যাবে বেঁকে, এবং পিঠের উপর চেপে বসবেন পতিব্রতার দল। ইউরোপেরও যদি এহেন অবস্থা হয়, তবে পৃথিবীর কোথাও বাস ক'রে শান্তি থাক্‌বে না, সর্ব্বত্রই এত শান্তি! যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যৌবনের পক্ষে সে বড় দুর্দ্দিন। ভাবুকরা বল্‌ছেন প্রচুর খেলা ধূলার ব্যবস্থা করা যাবে, ভয় নেই। এই যেমন Olympic games। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এমন কিছু চাই যা আরো বিপজ্জনক, আরো প্রাণান্তক। সমাজকে অতীতকালের মতো ভাবীকালেও প্রচুর প্রাণক্ষয় ক'রে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পেতে হবে; সমাজের বাজেটে লোকসানের ঘরের অঙ্ক চিরকাল সমান বিপুল হওয়া চাই। ইতিহাসে এই দেখা গেছে যে কোটি প্রাণীর তপস্যায় কয়েকটি প্রাণী সিদ্ধিলাভ করেছে, অভিব্যক্তির ইতিহাসে যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন। যে মানুষ সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে যোগ্যতম, সে মানুষকে সহজ পথ দেখিয়ে মানবজাতি লাভবান হবে না।

যুদ্ধকে অনাবশ্যক ব'লে যদি তুলে দেওয়া হয় তো ভালোই, কিন্তু ক্ষতিকর ব'লে যদি তুলে দেওয়া হয় তবে বুঝ্‌তে হবে ক্ষতি স্বীকার করবার মতো ক্ষমতা মানবজাতির নেই। সে ক্ষমতা বর্ব্বরের ছিল, কেননা বর্ব্বরের প্রাণশক্তি ছিল প্রভূত। সভ্যতা যদি মানবের প্রাণশক্তি হরণ ক'রে থাকে তবে সভ্যতার পক্ষে সেটা ভয়ের কথা। বর্ব্বরতার শক্ত বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সভ্যতার পাকা দালানে ফাটল দেখা দেয়। মানবের মধ্যে যে পশু আছে তাকে দুর্ব্বল করলে মানব দুর্ব্বলই হয়। বহুকাল মানবকে মনে করা হয়েছে পশু থেকে স্বতন্ত্র একটা সৃষ্টি একেবারে ভূঁইফোড়। সভ্য মানবকে মনে করা হয়েছে বর্ব্বর থেকে স্বতন্ত্র একটা জাতি, পূর্ব্বপুরুষ-হীন। কৌলিন্যের পেছনে যেন সাঙ্কর্য্য নেই, অভিজাত্যের পেছনে যেন জারজতা নেই, পদ্মের পেছনে যেন পাঁক নেই! আসলে কিন্তু পাঁকই হচ্ছে সার, সে না থাক্‌লে জলের পদ্ম হতো কাগজের পদ্ম। বহুকাল থেকে আমরা বর্ব্বরতার তেজ হারিয়ে সভ্যতার আলো নিয়ে খেলা ক'রে এসেছি, তৈমুরের ভোঁতা তরোয়ালে শান দিয়ে তাকে দাড়ি চাঁচবার ক্ষুর বানিয়েছি, জীবনের মোটা কথাগুলোর সূত্র হারিয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বের জট পাকিয়েছি।

তাই জন্যে দেখি আমাদের যুগে আদিম যুগের সঙ্গে অন্বয়রক্ষার চেষ্টা; কেউ বল্‌ছে 'back to the village"; কেউ বল্‌ছে "back to the forest"; কেউ বল্‌ছে বর্ব্বরের মতো দিগম্বর হও; কেউ বল্‌ছে পশুর মতো আকাশের তলে ঘাসের উপরে খাও-শোও। এ সবের তাৎপর্য্য এই যে আমরা আদিম প্রাণীর জোর হারিয়েছি, আপনার গাঁথা জালে জড়িয়েছি। অতি বুদ্ধির নাকে দড়ি; সেই হয়েছে সভ্য মানবের দশা। যুদ্ধ দোষের নয়, দোষের হচ্ছে কূটনীতি, গুপ্তচরবৃত্তি, বিষবায়ু-প্রয়োগ, ব্যাধিবীজনিক্ষেপ ইত্যাদি কৌরবসুলভ কুকার্য্য। মানুষ ধর্ম্মযুদ্ধ ভালোবাসে, যে যুদ্ধে তার গুণগুলোর পরিচয় দিয়ে সে তৃপ্তি পায় মরণেও। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের বারো আনাই যে মিথ্যাপ্রচার, কাগজে কাগজে যুদ্ধ। অসির চেয়ে মসীর উপদ্রব বেশী। আধুনিক যুদ্ধে যত মানুষ প্রাণে মরে তার বেশী মানুষ আত্মায় মরে,—এইখানেই অধর্ম্ম, যুদ্ধে অধর্ম্ম নেই।

যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার পরীক্ষা। যুদ্ধের চেয়ে সহজ উপলক্ষ্য চাইনে, যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অন্যবিধ উপলক্ষ্যে আপত্তি নেই। কিন্তু সে উপলক্ষ্যে যেন আবালবৃদ্ধবনিতাকে যে কোনো মুহূর্ত্তে প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত রাখে, সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে প্রত্যেককে ভ'রে দেয়। যুদ্ধনিবারণী প্রচেষ্টার যাঁরা নায়ক তাঁরা যুদ্ধের বদলে করবা'র কী আছে তা বলেননি, শুধু বল্‌ছেন, "যুদ্ধ কোরো না"; হাঁ-মন্ত্র না দিয়ে দিচ্ছেন না-মন্ত্র; 'Thou shalt" না ব'লে বল্‌ছেন "Thou shalt not"। যুবকের প্রাণ ভাবের বদলে অভাবে ভ'রে ওঠে না, যুবক চায় positive commandment। যুদ্ধের বদলে সালিশি করা তরুণের কাজ নয় এবং যুদ্ধের বদলে পুলিশি ক'রেও তরুণের তৃপ্তি নেই। তাই শান্তিবাদীদের আবেদন তরুণের বুক দোলায় না। এখন যদি কেউ এসে বল্‌তেন "তোমরা

প্রেমের অভিযানে জগতের হৃদয় জিনে লও" তবে সেও হতো এক রকম যুদ্ধ, তাতে দুঃখ কিছুমাত্র কম হতো না, মরণাধিক বেদনা থাকৃতো। সে যুদ্ধে স্বার্থপরতার গ্লানি ও মিথ্যাভাষণের পাপ চাপা পড়্‌ত এবং ভীরুতার স্থান থাকৃতো না। সে যুদ্ধে বর্ব্বরকে ঘৃণা ক'রে তার অবদান হ'তে সভ্যতাকে বঞ্চিত করা হতো না; পশুকে অবহেলা ক'রে তার সংস্পর্শ হ'তে মানুষকে দূরে রাখা হতো না। যে ডাক শুচিবাতিকগ্রস্তের নয়, নীতিবাতিকগ্রস্তের নয়, অহিংসাবাতিকগ্রস্তের নয়, প্রেমিকের, সেই ডাকের প্রতীক্ষায় আমাদের যুগ পদচারণ কর্‌ছে।

(ক্রমশঃ)

কথার জন্ম

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্তব্ধ ছিল দশদিক্ নির্নিমেষ অচপল স্থির,
অকম্পিত মহীরুহ মৌন মূক, নিস্তরঙ্গ নীর।
সহসা বহিল সমীরণ,
ধরণী লভিল তার নিশ্বসিত প্রথম নিস্বন।

মর্ম্মরিল অরণ্যের মর্ম্মখানি পুলকে কৌতুকে,
কলধ্বনি সুরু হ'ল তটিনীর হিল্লোলিত বুকে,
দিকে দিকে জড় পেল প্রাণ;
আকাশ ধ্বনিল তার অনাহত তরঙ্গের গান।

ভাষাহীন সেই বাণী ছুটে চলে দিগন্তের পার,
অপরিচয়ের বাধা লুপ্ত হ'ল শুনি অজানার
ছন্দময় হৃদয়ের কথা,
উচ্ছ্বসিল বসুধার কম্প্র চিতে নব ব্যাকুলতা।

বহুশত বর্ষ পরে একদিন উঠিতেছে শশী,
তারা হ'তে তারকায় সুরধারা চলিছে নিশ্বসি',
আকাশে বাতাসে জাগে প্রীতি,
মুগ্ধ হ'য়ে শোনে তট তটিনীর কলময়ী গীতি,

পাদপে জড়ায় লতা, পাখী গায়, গুঞ্জরে ভ্রমর ;—
প্রেয়সীর ধরি' বুকে মানবের কাঁপিল অধর,
অকস্মাৎ নিঃসরিল বাক্,
অর্থ-তার বুঝি' হ'ল লজ্জা-সুখে মানবী অবাক্!

পাশ্চাত্য পরিব্রাজক বর্ণিত পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারত

শ্রীহরিহর শেঠ

আগন্তুক বা বৈদেশিক পরিব্রাজকদিগের অল্পকাল বসবাস বা অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পর্য্যালোচনা হইতে যে অসম্পূর্ণ ও ভ্রমদুষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বহুক্ষেত্রে সর্ব্বৈব গ্রহণীয় না হইলেও, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে অনেক পুরাতন কথা জানা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েকজন পাশ্চাত্য পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণ করিয়া যে বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইল। *

সে সময় ভারতবর্ষ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম পারস্য হইতে ইন্দাস্ নদী; দ্বিতীয় ইন্দাস্ হইতে গঙ্গা, এবং তৃতীয় অবশিষ্টাংশ। এই শেষোক্ত অংশ ধন সম্পদ সভ্যতা ও আড়ম্বরে শ্রেষ্ঠ ছিল। অধিবাসীদের সুন্দর বাসভবন ও মনোরম আসবাবপত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে বর্ব্বরতা ছিল না এবং জীবনযাপনপ্রণালী বিশুদ্ধ ছিল। লোকেরা সাধারণতঃ সহৃদয়, এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অত্যন্ত ধনী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও চল্লিশখানি জাহাজ ছিল তাহার প্রত্যেকখানির মূল্য পঞ্চাশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা। এই সকল ধনীরাই কেবল ইউরোপীয়দের ন্যায় টেবিলে রৌপ্য পাত্রে ভোজন করিতেন, নচেৎ অপর সকলের সাধারণতঃ ভূমিতে বস্ত্র বিছাইয়া তদোপরি ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। মদ্যের ব্যবহার তাঁহাদের মধ্যে অজ্ঞাত থাকিলেও, ধান্য হইতে উৎপন্ন তৎসহিত কোন কোন উদ্ভিদরস মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার মাদকদ্রব্য পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত।

ইন্দাস্ ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থানে এমন একটি হ্রদ ছিল যাহার জলে এক প্রকার অতি সুন্দর গন্ধ ছিল, সেই জল লোকে আনন্দের সহিত পান করিত। রুটির চলন সে সময় বড় ছিল না, অন্ন মাংস দুগ্ধ প্রভৃতিই তাহাদের প্রধান ভোজ্য ছিল। অনেকে দিবসে দুইবার ভোজন করিত, রাত্রে খাইত না। গৃহস্থগণ তাহাদের বাটিতে বিস্তর গৃহপালিত ও অন্যান্য বন্য পশুপক্ষী পালন করিত। অনেকেই শিকারপ্রিয় ছিল।

পুরুষ মানুষেরা শ্মশ্রু রাখিত না কিন্তু লম্বা চুল রাখিত, ও কেহ কেহ বেণী বাঁধার ন্যায় কেশপাশ রেশমী সূতা দ্বারা বদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। যুদ্ধযাত্রাকালে তাহারা এইরূপেই কেশপাশ সংবদ্ধ করিত। নাপিত দ্বারা চুল কাটার ব্যবস্থাও ছিল। অধিবাসীদের দৈহিক গঠন ও জীবনী ইউরোপীয়দের মতই ছিল। তাহারা অনেকে রেশমী শয্যায় এমন কি সুবর্ণ খচিত শয্যায় শয়ন করিত। পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ছিল। পশমি বস্ত্রের ব্যবহার প্রায় ছিল না। কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত ও রেশমী বস্ত্রের ব্যবহারই অধিক ছিল। পুরুষেরা হাঁটু পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোকেরা পায়ের গ্রন্থি পর্য্যন্ত কাপড় পরিত। কোথাও কোথাও রমণীরা এক প্রকার রেশমী অথবা পালকের উপর সুবর্ণখচিত জুতা ব্যবহার করিত। দেহের সর্ব্বত্র তাহারা প্রচুর পরিমানে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিত।

নিজ নিজ স্বতন্ত্র বাসগৃহমধ্যে বাস করিলেও সহরের সর্ব্বত্র বারবিলাসিনিগণ বাস করিত। তাহারা সুসজ্জিত ও সৌগন্ধসিক্ত হইয়া তাহাদের রূপ যৌবন লইয়া প্রকাশ্যে লোকের মন হরণের চেষ্টা করিতে দেখা যাইত। ভারতীয়দের লাম্পট্য প্রবল ছিল।

বিবিধ প্রকারে কবরীবন্ধন ও মস্তকসজ্জার ব্যবস্থা ছিল। পরচুলার দ্বারাও অনেকে বেণী বন্ধন করিত। বিবিধ বৃক্ষপত্র দ্বারাও কেহ কেহ মাথার সাজ করিত কিন্তু মুখে রং মাখার প্রথা ছিল না।

* India in the Fifteenth Century By R. H. Major গ্রন্থে পরিব্রাজক Athanasius Nikitin, Hieronimo Di Santo Stefano, Nicolo Conti প্রভৃতির বর্ণনা হইতে গৃহীত।

কেবল মধ্যভারতে এক বিবাহ ভিন্ন বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, নচেৎ অধিকাংশ স্থানেই বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কালিকাটে রমণীরা ৭।৮টি বিবাহ করিত। স্বামীর মৃত্যুতে প্রথমা স্ত্রীর সহগমন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল, তবে অন্যান্য স্ত্রীকেও স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রায়ই সহগামিনী হইতে হইত। এমন কি তাহাদের বিবাহের সময় এই চুক্তি করিয়াই প্রায় বিবাহ হইত। সে সময় একজনের মৃত্যুতে বহু নারীর সহমৃতা হওয়ায় মৃত ব্যক্তির গৌরব ও আড়ম্বর বিঘোষিত হইত। সচরাচর সঙ্গীত বাদ্যাদি উৎসবের মধ্যেই এই কার্য্য সমাধা হইত। অনেকে নিজ হইতেই অগ্রসর হইয়া প্রথামত স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিত। যদি কাহারও মধ্যে এ কার্য্যে ভয় বা সঙ্কোচের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত, তাহা হইলে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিত।

মৃতের জন্য শোক প্রকাশার্থ সেকালে বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত। পিতা মাতার মৃত্যু ভিন্ন অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় তিন দিন শোকবেশ ধারণ ও শোকবিধি পালন করিত। পিতৃ মাতৃ বিয়োগে এক বৎসর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিত না; দিবসে মাত্র একবার আহার করিত, এবং এক বৎসরের মধ্যে নখ চুল দাড়ি গোঁফ কামাইত না।

ভারতের সর্ব্বত্র এক শ্রেণীর জ্ঞানী লোক ছিলেন, তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ভবিষ্যৎ গণনা লইয়া থাকিতেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলিত। তাঁহারা শিক্ষিত ও সভ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহার উচ্চাঙ্গের ছিল।

ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের অপেক্ষা বৃহদায়তনের জলযান বা জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিত। উহাতে পাঁচখানি পাল ও আবশ্যক মাস্তুল থাকিত। উহার নিম্নাংশ তিন প্রস্থ তক্তার দ্বারা নির্ম্মিত হইত। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার তাহারা জানিত না।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভগবানের পূজা প্রচলিত ছিল এবং দেবমন্দির নির্ম্মিত হইত। উহার ভিতর বহু প্রকার অঙ্কিত মূর্ত্তির দ্বারা সজ্জিত থাকিত। নির্দ্দিষ্ট পূজাদি উপলক্ষে উহা পুষ্প পত্রাদি দ্বারা সাজান হইত। দেবমূর্ত্তি সচরাচর প্রস্তর স্বর্ণ রৌপ্য এবং গজদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইত। এই মূর্ত্তি কখন কখন ৬০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ দেখা যাইত। পূজা ও বলিদান পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। মন্দিরে ধূপ ধূনা দিবার ব্যবস্থা ছিল। বিবাহে বাদ্যোৎসব সঙ্গীত ও ভোজের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

তাঁহারা বৎসরকে বার মাসে বিভক্ত করিতেন। কোন কোন প্রদেশে মুদ্রার প্রচলন ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে এক প্রকার প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হইত। স্থানে স্থানে লৌহমুদ্রারও ব্যবহার ছিল। রাজার নামাঙ্কিত পত্র দ্বারাও কোন কোন স্থানে বিনিময়ের কার্য্য সমাধা হইত। স্বর্ণ রৌপ্য ও পিতলের মুদ্রাও স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল।

যুদ্ধকালে বড়শা, তলোয়ার, ঢাল ও ধনুক প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। নগর আক্রমণের জন্য অন্যান্য যন্ত্রাদিও ব্যবহৃত হইত। কেবলমাত্র কাম্বে নামক স্থানে কাগজের ব্যবহার ছিল, নচেৎ সর্ব্বত্র বৃক্ষের পত্র বিশেষে লেখার কার্য্য হইত, এবং পুস্তকের কাজও তদ্দ্বারাই হইত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহারা বাম হইতে দক্ষিণে বা দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লিখিত না, উপর হইতে নীচের দিকে লিখিবার ব্যবস্থা ছিল।

ক্রীতদাস রাখার ব্যবস্থা ছিল, এবং দেনাদার দেউলে হইলে পাওনাদার তাহাকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিত। ফৌজদারি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য কেহ না থাকিলে শপথ করার প্রথা ছিল। দেবসমীপে শপথ বা উত্তপ্ত লৌহখণ্ড স্পর্শ দ্বারা, বা ফুটন্ত ঘৃতে অঙ্গুলি নিমজ্জিত করিয়া অনাহত হইলে তাহাকে নির্দ্দোষ ধরা হইত, নচেৎ দণ্ড প্রদত্ত হইত। গুরুতর অপরাধীদের হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

এদেশে মড়ক অজ্ঞাত ছিল, এবং ইউরোপের ন্যায় জনবিধ্বংসী ব্যাধিরও প্রাদুর্ভাব ছিল না।

ব্যথার ভুল

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

সকল কথা সারা হোলো—শেষ কথাটি কানে কানে,
কইব তারে মনে ছিল—রইল গাঁথা প্রাণে প্রাণে ;
চিরজীবন রইল গোপন বুকের মাঝে প্রকাশ-ব্যথা,
তারি রাঙা রক্ত-রেখা আঁকি আমার গানে গানে !

জ্যোৎস্নালোকে অশোক-শাখে কোকিল-পাখী যখন ডাকে,
ভাবি তখন সেই কথাটি বল্লে হোতো হয়তো তাকে ;
কণ্ঠ আমার বিকল ক'রে দিল স্নায়ুর দুর্ব্বলতা,
কোথাও খুঁজে পেলেম নাক হারিয়ে-যাওয়া সাহসটাকে ।

দুষ্টু হাসি মিষ্টি ঠোঁটে তাইত চোখে দেখলে পরে,
আজো আমার হয় অনুতাপ—আজো আমায় পাগল করে ;
স্মৃতির বাসি গোলাপ-জলে ভিজিয়ে দে যায় আঁখির পাতা,
সৃষ্টি যেন ঝাপসা হ'য়ে মিলিয়ে আসে দৃষ্টি-'পরে !

অসীম অপার নীল পারাবার সাম্‌নে দেখি উঠচে দুলে,
প্রবাল দ্বীপে রূপের রাণী দেখচে তুফান জান্‌লা খুলে ;
দুঃসাহসী দিচ্চে পাড়ি—মাস্তুলের ঐ কাঁপচে মাথা,
ঐ রে তরী তলিয়ে গেল কূল না পেয়ে কোন্ অকূলে ।

লাগিয়ে চমক জাগিয়ে দিয়ে কোথাকার এক পাগ্‌লী এসে
বারে বারে কয় আমারে, ফুটিয়ে গোলাপ রঙীন হেসে—
"বলো বলো আমায় বলো, কোন কথাটি বলতে বাকী ?"
—মিনতি তার সজল হ'য়ে নয়ন-কোণে ওঠে ভেসে !

"অতীত কালের কবর খুঁড়ে কঙ্কালেরি অন্বেষণে
কেন মিছে ছুটে বেড়াও ? – আগুন ওড়াও ফুলের বনে ?
হাসির বাঁশী বাজাও কবি—বিলাপ গীতি বন্ধ রাখি',
এই ধর এই মালাখানি—প্রীতির অর্ঘ্য-নিবেদন এ !

—বলো বলো আমায় বলো, কোন কথাটি বলতে বাকী,
তোমার বুকের বোঝাখানি আমার বুকে নামিয়ে রাখি।"
—একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসে ব্যাকুল ক'রে বাতাসটাকে
মৌন নীরব বাক্যহারা থির অচপল দাঁড়িয়ে থাকি !

কণ্ঠ হ'তে মালা আমার কণ্ঠে তারে পরাই খুলে,
—ঠিক যেন এই সেই প্রতিমা আবার বুঝি এলো ভুলে।
দুঃখ সুখের রাগরাগিণী যুগল সুরে বাজায় বাঁশী,
স্বপ্ন-জাগরণের মায়া সঞ্চরে তার এলোচুলে।
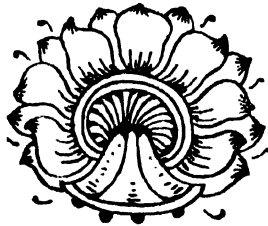
ইন্দ্রধনু ও গোধূলি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

The demand for activity and realism or for a direct and exact and forceful presentation of life in poetry proceeds upon a false sense of what poetry gives or can give us. All the highest activities of the mind of man deal with things other than the crude actuality or the direct appearance or the first rough appeal of existence... It is no real function of art to cut out palpitating pieces from life and present them raw and smoking or well-cooked for the aesthetic digestion. For in the first place, all art has to give us beauty, and the crude activity of life is not often beautiful; and in the second place, poetry has to give us a deeper reality of things and the outsides and surface faces of life are only a part of reality and do not take us either very deep or very far ..The Future Poetry ... ..Aurobindo.

We should conceive of it (poetry) as capable of higher uses, and called to higher destinies, than those which in general men have assigned to it hitherto. More and more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life for us, to console us, sustain us . Essays in Criticism ...Mathew Arnold.

For all men live by truth and stand in need of expression. In love, in art, in avarice, in politics, in labour, in games, we study to utter our painful secret. The man is only half himself, the other half is his expression .. The poet has a new thought ; he has a whole new experience to unfold ; he will tell us how it was with him, and all men will be the richer in his fortune. .The Poet.. ..Emerson.

আনাতোল ফ্রাঁস তাঁর Trois Poetes প্রবন্ধটিতে লিখেছেন একজন ফরাসী কবি তাঁর এক বন্ধুকে ব'লেছিলেন "Vous avez merité la sympathie et la reconnaissance de tous ceux qui lurent vos vers dans leur jeunesse ; vous les avez aidés a aimer"—অর্থাৎ যারা তাদের যৌবনে তোমার কাব্য প'ড়েছিল তুমি তাদের কৃতজ্ঞতাভাজন—যেহেতু তুমি তাদের ভালবাসতে হয় কি ক'রে সে বিষয়ে সহায় হয়েছিলে।

তারপর তিনি এর উপর টিপ্পনি করছেন এই ব'লে যে "এই খানেই কবিরা আমাদের সত্য সহায় হ'য়ে থাকেন ও তাই তারা আমাদের প্রিয় ; কারণ—তাঁরা আমাদের এলোমেলো আনন্দ ও অস্পষ্ট ব্যথার সম্বন্ধে শুধু যে বর্ণনা ক'রেই ইতি করেন তা নয়—আলোও দেন। তাঁরা আমাদের বলেন সেই সব কথা যা আমরা অনুভব ক'রে থাকি আবছা ভাবে।...তাঁদের মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের প্রেমের বাসনা ও হৃদয়ের বেদনা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠি।"

উপরোক্ত অভিমতগুলি ইচ্ছে ক'রেই একটু বড় ক'রে উদ্ধৃত করলাম। কারণ কাব্য ও সাহিত্যে রিয়ালিসম্ রিয়ালিসম্ ক'রে যে একটা ধুয়ো আজকাল উঠেছে তার ফলে প্রায়ই অত্যন্ত সাধারণ লোকও দেখ্‌তে পাই পাঁক নিয়ে ঘেঁটে রিয়ালিসমের সহজ বাহাদুরের তক্‌মা পরতে পাচ্ছেন। ফলে তাঁরা প্রায়ই কাব্যের একটা গোড়াকার কথা ভুলে যাচ্ছেন যে কোনো "ইজমের" দোহাই দিয়েই বাজে মালকে নিয়ে গৌরব করা সাজে না। কাব্য বস্তুতঃ একটা ফুল। পঙ্ক ও মালিন্যের মধ্যেও যদি তার জন্ম হয় তা হ'লেও সে ফুল, কেন না আশপাশের আবর্জ্জনাই তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চরম কথা নয়,—সৌন্দর্য্যই তার প্রাণ সে ক্লেদের মধ্যে থেকেও সুন্দরের রসটুকুই সংগ্রহ করতে চায়। ওই-ই কাব্যের সত্যকার প্রবণতা ও আসল ধর্ম্ম। তাই প্রতি সভ্যতাকে একটা মস্ত পরীক্ষা পাশ করতে হয় ;

* যথাক্রমে শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর সদ্য প্রকাশিত দুইটি কবিতাপুস্তক। মূল্য ১৲ ও ১৷৹। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাকে দেখাতে হয় যে তার আবহাওয়ায় মানুষের নিহিত কবিত্বের স্ফুরণ হয়েছে এবং কবিত্বের মধ্যে মানবমনের চিরন্তন সৌন্দর্যাস্পৃহা সৌষমবোধ ও উচ্চাশার প্রেরণা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। নইলে সে জগতের মানুষের সভ্যতার প্রদর্শনীতে পাশমার্ক পাওয়া দূরে থাকুক—কল্‌কেও পায় না। তাই অরবিন্দ বড় সত্য কথা বলেছেন, যখন তিনি কাব্যে তথাকথিত বাস্তবতার অসারতা দেখাতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, সত্য কাব্য জীবনের নিম্নস্তরের বাস্তবতা নিয়েই মাথা ঘামায় না, তার বাণী মানবমনের চিরন্তন ঊর্দ্ধগতিকেই রূপ দেয়। কেননা জীবনের কদর্য্যতা, পিছুটান প্রভৃতি ত আছেই। তার চর্চ্চা যদি বা ললিতসাহিত্যের বিষয়ীভূত হয় হোক্—কিন্তু গৌণভাবে হয় যেন। কাব্য—যাকে বলা হ'য়েছে the highest speech of man—সে-ও যদি তথাকথিত হেয় বাস্তবতার মধ্যেই আকণ্ঠ ডুবে থাকে তবে আলো দেখাবে কে? কাব্য যে আমাদের প্রাণের সহস্রদলকে আলোর দিকে চোখ মেল্‌তে শেখায় এই সত্যটিকেই আর্ণল্‌ড্‌ ব'লেছেন তার higher destiny।

শুধু তাই নয়। একটা বড় অনুভূতি সার্থক হ'য়ে ওঠে তখনই যখন সে আমাদের নীহারিকার মতন আড়ষ্ট ধ্যানজগৎ থেকে উড়ে এসে সীমানির্দ্দিষ্ট কল্পজগতের মাঝখানে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে ওঠে। ক্রোচে, এমার্সন প্রমুখ বড় বড় দার্শনিক তাই জীবনে expressionকে—ফুটে-ওঠাকে এত দাম দিয়েছেন। কেননা একটা অনুভূতি যে-মুহূর্ত্তে একজন চিন্তাবীর, কবি ধ্যানীর মগ্ন চৈতন্য থেকে ব্যক্ত চৈতন্যের মধ্যে রূপ নেয় সে মুহূর্ত্তে সে আপনাকে নতুন ক'রে পায়, যথাযথভাবে উপলব্ধি করে। এবং উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের অনেক নিহিত অনুভূতিকে সক্রিয় ক'রে তোলে। আমরা দেখি কবি আমাদের মনের কথা যেন টেনে বলেছেন।

বাঙ্‌লার শত দুঃখ দৈন্যের মধ্যে তাই বাঙালী তার কাব্যে একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে। এটা সত্যই বেশি বলা হবে না যে সে তার ব্যর্থ রাষ্ট্রীয় জীবনের একটা মস্ত ক্ষতিপূরণ পেয়েছে তার আধুনিক সাহিত্যে। শুধু ক্ষতিপূরণই নয়, বাঙালী তার সাহিত্যে যা পেয়েছে সেটা ক্ষতিপূরণের চেয়ে অনেক বেশি। কেননা রাষ্ট্রীয় জীবনে সার্থকতা মানে কি?—না, মানুষের সত্য সভ্যতার বিকাশের অবসর পাওয়া। সভ্যতা যে আসলে হচ্ছে মানুষের সেই সব প্রচেষ্টার সমষ্টি যাকে একজন বড় চিন্তাবীর বলেছেন not biologically necessary to survival। তাই সুন্দর কাব্য, শিল্পকলা, চিন্তা প্রভৃতি জীবনে ফাল্‌তো নয়, তারাই জীবনে সত্য সার্থকতা এনে দিতে পারে—তারাই সভ্যতার কষ্টিপাথর।

কাজেই একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন শেলি, একজন গেটে, একজন শেক্সপীয়ার সহস্র ব্যর্থ জীবনের ক্ষতি-পূরণ বহন ক'রে আনেন; তাঁরা সুন্দরের আরাধনার মধ্য দিয়ে জাতীয় দৈন্যকে অনেক পরিমাণে অস্বীকার করবার দাবী করতে পারেন। মানুষের শত দুঃখ দৈন্যই তার অস্তিত্বের চরম সাক্ষ্য নয়, তার মধ্যেকার কাঁটাই তার বিকাশের দৃশ্যের চরম সত্য নয়, বাইরের দিকে তার জীবনের শত ব্যর্থতাই তার চরম পরাজয় নয়। কবি তাঁর অনুভূতির আলোতে এই সত্যটি দেখতে পান ও প্রচার করেন যে সংসারের শত আবর্জ্জনার মধ্যে কালের শত ভ্রূকুটির মধ্যে, জীবনের শত ক্লেদের মধ্যে একটি সত্য ললিত সৃষ্টি, দেখতে পেলব ও সুকুমার হ'লেও, আসলে অবিনশ্বর; একটি ফুল শত কাঁটাকেও সার্থক করতে সক্ষম; একটি মহৎ চিন্তা জীবনের শত পরাভবকেও অস্বীকার করবার শক্তি ধরে।

একথা শুধু যে শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার সম্বন্ধেই খাটে তা নয়, কম বেশি সব কবি ও মনীষীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ভেদ—degree নিয়ে, kind নিয়ে নয়।

তাই বাংলাদেশে যে আজ কয়েকটি সত্য কবি দেখা যায় তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা অসম্ভব হ'লেও কিছু আসে যায় না, যেহেতু তাঁরা তাঁদের আপন আপন শক্তিমত আমাদের মধ্যেকার সত্য মনুষ্যত্বের পূজাই ক'রে এসেছেন। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি সমান প্রযোজ্য;—যিনি যে-পরিমাণে নিজের অন্তরলোকের গোপন সৌন্দর্য্য-উৎসকে বাইরের সুষমার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি সেই পরিমাণেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

ইন্দ্রধনু ও গোধূলি

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

কেবল সৌন্দর্য্যজগতে রস-উৎস ফোটাতে হ'লে, মানুষের কৃতজ্ঞতা পেতে গেলে, গোঁয়ারতুমি ক'রে শুধু রিয়ালিস্‌ম্‌ ব'লে চেঁচালে হবে না—যেমন আজকাল বলশেভিক কবিরা করছেন। * সত্য কবি হ'তে হ'লে তাঁকে দেখাতে হবে যে তিনি সুন্দরের প্রেরণা থেকেই কবিতা লিখছেন, বীভৎসতার চটক থেকে নয়। মানুষের মনের বড় স্বপ্ন বড় আকাঙ্ক্ষা, বড় আনন্দ-বেদনা—এই সবের অভিসারে ছুটতে হবে- তামসলোকের ক্রূরতা ও কদর্য্যতার চিত্রনের মধ্যে ওরিজিনালিটির সস্তা বাহবার লোভে পড়লে পথহারা হ'তেই হবে।

বর্ত্তমান সময়ের দুজন কবির দুটি শ্রেষ্ঠ বই পাশাপাশি পড়তে পড়তে মনটা তাই খুসি হ'য়ে উঠেছিল ও উপরোক্ত কথাগুলি মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্ত মন যেন বল্‌ছিল যে 'হাঁ, এঁরা দুজনে আমাদের কাব্যসাহিত্যে সত্যিকার সৌন্দর্য্য কিছু এনেছেন বটে।' এই সত্যটির প্রতি বাংলার পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই এ বই দুখানির সম্বন্ধে দুচারটি কথা লিখতে বসেছি। আমার এ সামান্য প্রবন্ধের দাবী এর চেয়ে বেশি নয়।

সুরেশচন্দ্র ও নিরুপমা দেবী বাংলা কাব্যসাহিত্যে অপরিচিত নন। সুরেশচন্দ্রের "ষোড়শী" কবিতা বিজলীতে বহুদিন আগে প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ আমার এক বন্ধুর কাছে ভূয়সী সুখ্যাতি করেছিলেন। এঁর "ভূপর্য্যটক" কবিতাটি (যাকে রবীন্দ্রনাথ "পথিক" নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন, এবং কবিতাটির "পথিক" নামই সুষ্ঠু) প'ড়ে তিনি আশীর্ব্বাদ করেছেন :—

> রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি
> শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
> ভূয়াৎ কুশেশয়রজো মৃদুরেণুরস্যাঃ
> শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

এবং বলেছেন, "পথিক যে-পর্য্যন্ত ছায়া ও জল না পেয়েছেন সেই পর্য্যন্তই বন্ধুসহায়তার অপেক্ষা থাকে—তার পরে আর ভাবনা থাকে না। সুরেশের যাত্রাপথে ফলবান্ তরুচ্ছায়া ও উচ্ছ্বসিত উৎসধারা দেখা দিয়েচে, এখন তিনি তাঁর সফলতার সম্বল সহজে আহরণ ক'রে চল্‌বেন।" *

কয়েক বৎসর আগে নিরুপমা দেবীর প্রথম কবিতা পুস্তক 'ধূপ'' প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন :—

"তোমার "ধূপ"খানি প'ড়ে খুসি হ'য়েচি। এ ত কাঁচা হাতের লেখা নয়। সুভদ্রা যেমন ক'রে রথ হাঁকিয়ে গিয়েছিলেন, তুমি তেমনি অনায়াসে তোমার কাব্য রথের দুই উদ্দাম ঘোড়া—ছন্দ আর মিলের মুখে লাগাম দিয়ে অতি অনায়াসে হাঁকিয়ে চলেছ—কোথাও তাদের কোনো পথসঙ্কটে একেবারে উঁচোট খেতে দেখলুম না। তারপরে ছন্দের বিচিত্রতায় তোমার যেমন আনন্দ, তেম্‌নি সাহস, তার মধ্যে যেমন সৌন্দর্য্য তেম্‌নি নৈপুণ্য। এই জিনিষটি বড় দুর্লভ। অনেক মেয়ে-কবিকে কবিতা লিখতে দেখেচি। তাঁরা বেশ রস দিতে পারেন, কিন্তু রূপ দিতে পারেন না। কিন্তু তোমার কবিতাগুলি রূপে রসে অপরূপ হ'য়ে উঠেচে, তোমার সঙ্গীতে সুরের সঙ্গে তালের কোথাও বিরোধ ঘটে নি। কোনো বই সম্বন্ধে চিঠিতে কাউকে অভিমত দেব না প্রতিজ্ঞা ক'রে ছিলুম, কেন না তাতে কাজ বড় বেড়ে যায়। অনেকদিন পরে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলুম। তোমার বইটি যতক্ষণ মোড়কের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ আমার প্রতিজ্ঞা খুব দৃঢ়ই ছিল, ইতস্তত ক'রে যখন খুললুম তখনো মন নরম হয় নি। তার পরে দ্বিধাভরে এ-পাতা ও-পাতা যতই ওল্‌টাতে লাগলুম ততই প্রতিজ্ঞার টান আল্‌গা হ'য়ে এল, অবশেষে পরিণাম কি হ'ল এই পত্রের দ্বারাই তা বুঝতে পারবে।"

ধূপের কবিতাগুলির চেয়ে গোধূলির কবিতাগুলি বেশি

---

* The Mind and Face of Bolshevism পুস্তকে Reno Miller দেখিয়েছেন কি রকম proletarian কাব্য আজকাল সেখানে শেক্সপীয়রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবিতা ব'লে গণ্য হ'চ্ছে। মানুষের মাথা ভাঙো, বুর্জোয়াদের পিণ্ডি চটকাও ঠিক্ এই রকম কথা জোর ক'রে তাঁরা কবিতায় আন্‌ছেন।

* এঁর পথ মাঝে মাঝে কমলদলহরিৎ সরোবরে মনোরম হোক্; গাছের নিবিড় ছায়ায় (পথে) সূর্য্যের উত্তাপ সংহত হোক্; পদ্মের পরাগে (পথের) ধূলি কোমল হোক্; শান্ত অনুকূল বাতাসে পথ শিবময় হোক্।

"ইন্দ্রধনু"—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

নিটোল, বেশি গভীর। তাই রবীন্দ্রনাথের এ প্রশস্তি নিরুপমা দেবীর "গোধূলি" বইখানি সম্বন্ধে আরো বেশি ক'রেই খাটে। প্রথম দৃষ্টিতে কাব্যানুরাগীর মনে একটু দুঃখ হ'তে পারে বটে যে সুরেশচন্দ্র ও নিরুপমা দেবী কাব্যসাহিত্যে এখনো ততটা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি যতটা প্রতিষ্ঠা তাঁদের কবিপ্রতিভার প্রাপ্য। কিন্তু দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করলে স্বতঃই মনে হয় যে এতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কেন না অদূর ভবিষ্যতে যে এঁরা দুজনে রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম ব'লে স্বীকৃত হবেন এ কথা মনে করবার কারণ আছে। সাহিত্যে অনেক সময়েই সত্য প্রতিভার স্বীকার হ'তে বিলম্ব হয় দেখা যায়। কোনো এক সময়ে কবির যোগ্য মূল্য যদি না মেলে পরে প্রতিক্রিয়ার উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে তার ক্ষতিপূরণও মেলে, আবার কোনো এক সময়ে যদি অবান্তর কারণে কোনো কবি তাঁর যোগ্যতার চেয়ে বেশি মূল্য পান নিরপেক্ষ কাল শেষটায় সে খ্যাতি হরণ করে।

তাই আজ আমি এঁদের কবিতার একটা সম্পূর্ণ ধরণের সমালোচনা করতে বসি নি। সে সময় এখনো আসে নি, সে কাজের ভার কালই নেবে। আমি শুধু বাংলার কাব্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এঁদের দুজনার সত্য কবিপ্রতিভার দিকে। বল্‌তে চাই এঁদের কবিতার মধ্যে কোথাও কোথাও দৌর্ব্বল্য থাকতে পারে, ভাবের বিকাশে ত্রুটি থাকতে পারে, বলার ভঙ্গীতে অত্যুক্তিও হয়ত থাকতে পারে—কিন্তু তা সত্ত্বেও বল্‌তেই হবে যে, এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে যে কবিশক্তি আছে তাতে ভেল নেই। কাব্যানুরাগীরা এঁদের কবিত্বের মধ্যে সত্য প্রেরণা পাবেন—রস পাবেন—রূপ পাবেন; আর পাবেন ব্যঞ্জনা।

সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে নিরুপমা দেবীর কবিতার একটি প্রধান প্রভেদ এই যে সুরেশচন্দ্রের কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অনেক পরিমাণে কাটিয়ে উঠেছে, নিরুপমা দেবীর কবিতার ওপর রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গীর প্রভাব এখনো বড় বেশি। তবে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা বড় সহজ কথা নয়। তাই এখানে নিরুপমা দেবীর অগৌরব নেই। কিন্তু তবু তৃপ্তির নিবিড়তা বেশি মেলে—প্রকাশের ভঙ্গীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকলে। উদাহরণত সুরেশচন্দ্রের ও নিরুপমা দেবীর কয়েকটা শ্রেষ্ঠ কবিতা নেওয়া যাক।

সুরেশচন্দ্রের "অদরকারের না" কবিতাটি উদ্ধৃত করতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু সে-কবিতাটি অত্যন্ত বড় ব'লে তাঁর "অনুরোধ" কবিতাটি নেওয়া যাক্—

বালা! হিয়ার আলো জ্বালো জ্বালো বসন্ত ঐ আসে;
সারা জীবন একটিবার একটি নিশার অভিসার
একটি দীর্ঘশ্বাসে!
একটি সাঁঝের মাদকতা, এক নিমেষের আকুলতা
নিবিড় করি' ধর আজি পরম বিশ্বাসে।
বালা! হিয়ার আলো জ্বালো জ্বালো বসন্ত ঐ আসে!
বালা! প্রাণের বাণী কহ রাণী! বসন্ত যে যায়,
একটি নিমেষে দুইটি ক্ষণ রইবে না ত আজীবন
ফিরবে না ত হায়!
সজল দুটি আঁখির পাতে কাজল মাখা ঘন রাতে
নিবিড় করি' ধর আজি প্রেমের বর্ত্তিকায়—'
বালা! প্রাণের বাণী কহ রাণী বসন্ত যে যায়! (ইন্দ্রধনু)

এ কবিতাটিতে প্রকাশভঙ্গী কি অপূর্ব্ব! অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হ'তে কবি কতটা মুক্তি পেয়েছেন!

কিন্তু পক্ষান্তরে নিরুপমা দেবীর "গোধূলির" "যৌবন প্রয়াণ" কবিতাটি প্রাণস্পর্শী হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত স্পষ্ট যে সে সাদৃশ্য ধরতে একটুও দেরি হয় না—

আমার জীবনবনগহনের তলে ক্ষণেক দাঁড়াও মন্ত্রবলে
ওগো মোর যৌবনের পরিপূর্ণ প্রাণ, কণ্ঠে নিয়ে গান
বক্ষে নিয়ে মিলনের আশা
ফুলময় বসন্তের মুগ্ধ ভালবাসা!
চোখে দাও প্রণয়ের হাসির কাজল, রূপ দাও ঢলঢল
সর্ব্ব তনু ভরি, মধুভরা ফুটাইয়া সহস্র মঞ্জরী;
কেশে দাও আকুলতা অধরে লালিমা
প্রাণে দাও প্রেম মধুরিমা
বুকে দাও গানে ভোলা মন
আমার জীবনতলে ক্ষণেক দাঁড়াও মোর হে শেষ যৌবন!

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কিন্তু তবু কবিতাটির মধ্যে আন্তরিকতা, স্পষ্টতা, লৌকিক কুণ্ঠা ত্যাগ ক'রে নারীর প্রাণের কথা ফুটিয়ে তোলার প্রেরণা এত মনোজ্ঞ হ'য়ে ফুটে উঠেছে যে হৃদয়ের তারে আঘাত করে। মন বলে—এ ভঙ্গীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ওতপ্রোত হ'য়ে থাকলেও এ অনুকরণ মাত্র নয়··· সত্য কাব্য প্রেরণায় টলটল্ করছে।

আবার দেখুন সুরেশচন্দ্রের "বাদল রাতের প্রলাপ"—

জানিনা ওই দেহের মাঝে কোথায় যে এক বাঁশি বাজে
কোথায় যে এক কমল বিকসিত!
সেই বাঁশরীর ছন্দ সুরে সারা জীবন বেড়ায় ঘুরে
খোঁজে কমল কোথায় অলখিত।
চুম্বনে আর আলিঙ্গনে চোখে চোখে মিলন সনে
তোমার দেওয়া কিম্বা চাওয়ার লাগে,
ফাগুন সাঁঝে, জোস্না রাতে গহন ঘন বাদল সাথে
ধরতে চাহে কোথায় বাঁশি বাজে।
কোথায় সে যে গোপনতম মৃগনাভি মৃগের সম
নিজেই নিজের জাননা উদ্দেশ!
শুকিয়ে ওঠে গলার মালা গোপন কর চোখের জ্বালা
কোথায় যেন মেলায় বাঁশির রেশ!

এ-কবিতাটির মধ্যে ইন্দ্রিয়বিলাস (sensuousness) আছে—কিন্তু তাই ব'লে বৈশিষ্ট্যেরও অভাব নেই। প্রেমের চরম আত্মদানের গৌরব, মিলনের মধ্যে অতৃপ্তির ব্যথা ও হৃদয়ের অধীর অন্বেষণের মধ্যে প্রেমিকের সূক্ষ্ম নিরাশার চিরন্তন ইতিহাস বড় সুন্দর—মর্ম্মস্পর্শী! কবির মনে হচ্ছে "কোথা? কোথা? যা চাই তা কোথা?" হঠাৎ সংশয় আসে "তবে কি সব ফাঁকি?" তৎক্ষণাৎ প্রেমের দেবতা আলো দেন, বলেন—"না"—

দারুণ ফাঁকি? যদি বা হয় এই নিমেষে সত্য সে নয়
যতক্ষণ ঐ ঠোঁটে হাসি টানা
যতক্ষণ ঐ বুকের তলে একটা মিলন বাতি জ্বলে
একটা বীণার বাজছে তা না না না!
একটি আনন দুইটি আঁখি বিশ্বে সকল ফেলে ঢাকি
রঙীন করে জীবন-তরী বাওয়া;
একটা সহজ জয়োল্লাসে জটিল সহজ হ'য়ে আসে
পাল ভরে যে দিগন্তরের হাওয়া!

এ-কবিতাটির আরম্ভ ইন্দ্রিয়বিলাসে হ'লেও পরিণতি বড় সুন্দর আত্মদানে—

এই যে খেলা দুটি হিয়ার প্রণয় এবং সরম প্রিয়ার
নয়নে মরু নয়নে মরীচিকা,
হাজার ফাঁকি শ্রান্তি মাঝে জীবনব্যাপী ব্যর্থ কাজে
একটি সহজ জয়ের শুভ টীকা!

প্রেমের গৌরবকে স্বীকার করার কী মনোজ্ঞ আদর্শবাদ! ভোগকে কী সুন্দর ভাবে রূপান্তরিত করা! লালসাকে প্রেমের অমলিন শিখায় কী চমৎকার শুদ্ধ ক'রে নেওয়া!

নিরুপমা দেবীর প্রেমের কবিতা পাশাপাশি নেওয়া যায়।

এ মোর পূর্ণ যৌবন তার ধন্য হ'য়েছে অঙ্গ তাহার
লেপিয়া রয়েছে গন্ধ আকুল শুভ্র চন্দনে,
বুকের পুলক ঝুলন দোলায় প্রণয় তাহারে গোপনে দোলায়,
চুম্বন সুধা অধরে ছোঁয়ায় সোহাগ নন্দনে।

কিম্বা

তবে কি এমন জোছনাহসিত মিলনরজনী হবে শেষ?
দুটি বুকে শুধু কাঁদিয়া মরিবে প্রেমাবেশ?
বিফলে যাবে কি পূজা আয়োজন
কাঁদিয়া পোহাবে রজনী এমন।
বিরহ শয়নে বক্ষে লুটাবে কালো কেশ?
তবে কি বিফলে জ্যোৎস্নাবিধুর মিলনরজনী হবে শেষ?

এ-দুটি কবিতার মধ্যেও ইন্দ্রিয়বিলাসের অভাব নেই, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের প্রেমের কবিতার মতন এদের গতি ঊর্দ্ধদিকে নয়। এ শুধু আক্ষেপে গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠা। এরা ভরসা দেয় না—কেবল ব্যথায় লুটিয়ে পড়ে। বড় আন্তরিক সে বেদনা, গোধূলির প্রায় সমস্ত প্রেমের কবিতারই ঐ একস্থানে গৌরবের হানি হয়েছে। তবে কিন্তু আর এক বিষয়ে আবার সুরেশচন্দ্র ও নিরুপমা দেবীর প্রেমের কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যও আছে—তাঁদের কবিতার মধ্যে হাজারই ইন্দ্রিয়বিলাসের ইঙ্গিত থাকুক না কেন এ ইঙ্গিতের মধ্যে কখনো গ্রাম্যতা দোষ আসে না—তারা উভয়েই শুভ্রতায় পূত। দুজনের লেখাতেই মানবমনের চিরন্তন দেহ-তৃষ্ণা কবির কবিদৃষ্টিতে শুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

এটা শুধু সত্য কাব্যেই সম্ভব—ও সত্য কবির তুলিতেই ফুটে উঠ্‌তে পারে—যিনি আবেগকম্পিত হ'য়েও আবেগকে অতিক্রম ক'রে যান—যেহেতু তিনি শুধু প্রেমিক নন তিনি দ্রষ্টাও। প্রকৃত শিল্পীর হাতেই নগ্নমূর্ত্তি নিছক দেহের আবেদনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। সাধারণ মানুষ বাস্তবের অন্তরালে পৌঁছতে পারে না। যেমন সুরেশচন্দ্রের রমণীর দেহকে দেখার ভঙ্গী ধরুন—

হে রমণি ! বক্ষের সৌন্দর্য্য নিবিড়
নহে নহে নহে কভু দুরন্ত ভোগীর
সুপ্ত পশু জাগাইতে ; বলয়-নিক্কণ
আজি মোর চক্ষে আনে সুদূর স্বপন
যেন কোন্ অতি দূর দূর অতীতের
বিস্মৃত সঙ্গীত সনে ;
আষাঢ় গগনে
আমার মিলন জাগে পুঞ্জ মেঘ সনে
তোমার আঁখির দুটি কৃষ্ণ তারকায়
আষাঢ়ের মেঘ সম ; বসন্ত সন্ধ্যায়
তোমার তনুর দীপ্ত বরণ উচ্ছ্বাসে
আমি মোরে পাই মুক্ত অনন্ত আকাশে
সান্দ্র কৌমুদীতে ভরা ; কুন্তলের ঘাণ
সিন্ধুসম করি তোলে এ মোর পরাণ ,
হে রমণি ! যে সঙ্গীত বক্ষে নাহি ফোটে,
তোমার ইঙ্গিতে চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

কী সুন্দর ভঙ্গী এ ! যদিও স্বীকার করতে হবে সুরেশচন্দ্রের এ কবিতাটিতে শুধু ভঙ্গী নয়—আইডিয়াও অনেকটা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত—তবু এর সুর এত সুরেলা যে হৃদয়ের তরফের তারকে ছুঁয়ে যায়ই যায়। হৃদয়ের তন্ত্রী কেঁপে ওঠেই, কেননা এ-রকম কবিতাই যে মানব হৃদয়ের অনুভূতির উচ্চতর স্তরের কাঁপনের খবর দেয়। আর্ণলডের ভাষায় একেই বলা যায় কাব্যের higher uses এর অন্যতম, কেননা এ ভোগের মধ্যে মানব মনের যে চিরন্তন উচ্চাশাটি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে—দেহের মাধ্যাকর্ষণকে ছাড়িয়ে সূক্ষ্ম প্রেমের অনুভূতি-জগতের সন্ধান দেওয়া। এর মধ্যে ভোগের ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু সে ভোগ—গড়পড়তা মানুষের অন্ধ ভোগ নয়—সে ভোগ দ্রষ্টার, ধ্যানীর, কবির সন্ধানপরতায় ওতপ্রোত। ভোগের মধ্যে থেকেও কবি যে ভোগের মধ্যে পথ হারিয়ে যেতে পারেন না—এ রকম কাব্য এই ভরসার বাণী শোনায়।

নিরুপমা দেবীর অধিকাংশ প্রেমের কবিতার মধ্যে দেহকে দেখার ভঙ্গীর মাঝে এতটা নিবিড় অনাসক্ত দৃষ্টি হয়ত নেই, কিন্তু তবু তাঁর দুচারটি কবিতায় তিনিও এ অন্তর্দ্দৃষ্টির খোঁজ পেয়েছেন যা বাস্তবের সহজ পন্থারই পথিক নয়, কিন্তু প্রেমলীলার আবর্ত্তের মাঝখানে প'ড়েও প্রত্যয়কে স্থির রাখতে সক্ষম, হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাতেই তৃপ্ত নয়—যা ধরা-ছোঁওয়া যায় না অথচ আভাস পাওয়া যায় তার পানে হাত বাড়াতেই ব্যগ্র। এই রকম ইঙ্গিতের মধ্য দিয়েই কবি আমাদের অনুভবজগতকে বড় ক'রে তোলেন :—

দেহে দেহে আর আধারে আধারে
বারে বারে আমি তারেই পূজি,
দেহাতীতেরেই ফিরি যে খুঁজি।
মাটির প্রতিমা ভেঙে ভেঙে যায়,
দেবতা নূতন আধারে লুকায়,
লুকোচুরি কেন খেলে মোর সাথে কিছু না বুঝি।
তাই বারে বারে নূতন আধারে তারেই পূজি।

প্রেমের আশ্রয় মলিন হ'তে পারে কিন্তু আলো অমলিন, নিষ্পাপ, অচঞ্চল—

প্রদীপের গায়ে লেগেছে কেবলি
মলিনতা-কালী অশুচি কালো ;
চির উজ্জ্বল প্রেমের আলো ! (যুক্তি গোধূলি)

আবার—

গোপনে গোপনে দেবতা আমার
পূজা লয় তুলে আমি যে জানি
শোনে সে আমার প্রেমের বাণী !
ভাঙিবে মাটির প্রদীপ যেদিন
সেদিন জ্বলিবে শিখা অমলিন ;
লোকে লোকে তারি আরতি করিবে বদনখানি ;
তাই আজো মোর পূজা লয় তুলে আমি যে জানি !
(যুক্তি—গোধূলি)

ইন্দ্রধনু ও গোধূলি

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

সুরেশচন্দ্র ও নিরুপমা দেবীর কবিতা পাশাপাশি পড়লে আর একটা জিনিষ বড় পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে। একজনের কবিতা সত্যই পুরুষের, অপরটি নারীর। আধুনিক বাংলা কাব্যে পুরুষের মুখে নারীর ছাঁদের কথা এত বেশি শুনি যে এক এক সময়ে মনটা অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। অপরদিকেও সমান বিপদ।

নারী ছোটেন পুরুষের অনুকরণ করতে; নিজের নারীসুলভ অনুভূতির প্রতি তাঁদের আস্থা নেই, তাঁরা পুরুষের পুরুষালির অনুকৃতির মোহে প'ড়ে ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হ'ন। কিন্তু নিরুপমা দেবী শুধু নারী নন্—নারীর কথা নারীর মতন ক'রে বলায় বিশ্বাসী। তাঁর দু একটি কবিতা আছে বটে যা পুরুষের দ্বারাও লিখিত হ'তে পারত, কিন্তু সে রকম কবিতায় তাঁর বৈশিষ্ট্যটি ফোটে নি। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নারীর কথা নারীর ছন্দে বল্‌তে ভয় পান নি। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে অনেক সময়েই মিসেস ব্রাউনিঙের কথা মনে পড়ে। দু একটা উদাহরণ দেব—যেমন একথা পুরুষেই বল্‌তে পারে—

> আজ যে মোদের স্বপ্ন চোখে　　নবীন তরুণ স্বপ্ন চোখে
> দেখছে কোথায় জাগল প্রবাল দ্বীপ,
> আজকে মোদের জীবন তরী　　চিরবে লহর সিন্ধু-বুকে,
> আন্‌তে সাপের মাথার মণির টিপ!
> আজ যে মোরা ঘুরব মহী　　খুঁড়বপ পাহাড় চুঁড়ব নদী
> চেতন করি বিরাট প্রাণের ভাষা;
> বল্‌গাবিহীন বাজীর মতো　　ছুটবে আজি নিরবধি
> শিষ্ট যত দুষ্ট যত আশা! (নবীনের গান——ইন্দ্রধনু)

কিম্বা সাগরের গান:—

> এই বুকেতেই গুপ্ত ছিল ঐ যে তোদের জাহ্নবী
> এই বুকেরই স্নেহ নি স্নেহ কোন্ কবি সে কোন্ কবি?
> এই বুকেতেই চন্দ্র তারা　　সারা নিশীথ তন্দ্রাহারা
> এই বুকেরই পাঁজরা ভেঙে উষায় জাগে হেম রবি!
> (গীতি মঞ্জরী)

তেমনি একথা কেবল রমণীর মুখেই সাজে—

> কেন তুমি প্রথম জীবনে এলেনা এলেনা মোর প্রিয়,
> কালো দুটি তরুণ নয়নে দিঠি যবে মধু কমনীয়
> সুখাবেশে কাঁপিত সঘনে, তখন এলেনা কেন প্রিয়?
> ত্রিভুবন ছিল এ মুঠায় অদেয় ছিল না কিছু যবে,
> এই দুটি অধর ছায়ায় জীবন নাচিত গৌরবে
> বুকে বুকে হিয়ার হিয়ায় অদেয় ছিল না কিছু যবে।
>
> ফুলশেষে তুমি পাতিয়াছ বঁধু? কাজ নাই প্রিয়, কাজ নাই!
> অঙ্গে আমার ফুলের ভূষণ সাজ নাই!
> এ তনু কোথা সে কমলের দল　বুকে কোথা আশা প্রাণে কোথা বল?
> প্রথম তরুণ প্রেমের মিলন লাজ নাই!
> ফুলশেষে তুমি পেতেছ বক্ষ?—কাজ নাই প্রিয়, কাজ নাই।

পড়লেই মনে হয়—সত্যিকার নারী হৃদয়ের স্পন্দন!

সত্য বটে রবীন্দ্রনাথের এরকম ধরণের কবিতা অনেক আছে যা আসলে রমণীর প্রাণের কথা; যেমন—

> যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো
> মোর হৃদয় নীরে;
> কল কল ছল ছল কাঁদিবে গভীর জল
> ঐ দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে!

এবং একথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয় যে রমণীর হৃদয়ের কথা পুরুষের কল্পনা করার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু তবু একথা মান্‌তেই হবে যে নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন একটা ভেদ আছে যে একের কথা অপরের মুখে শুন্‌লে ঠিক ততটা তৃপ্তি দেয় না। "নারীর মূল্য" সম্বন্ধে অপূর্ব্ব প্রবন্ধটি তাই শরৎচন্দ্রের লেখনী-অগ্রে না ফুটে উঠে ইন্দিরা দেবীর লেখায় ফুটে উঠ্‌লে যেন মনটা বেশি খুসি হ'ত মনে হয়।

তাই নিরুপমা দেবী আমাদের কাব্যসাহিত্যে এই একটা সত্য অভাব মোচন করেছেন যে তিনি নারী হ'য়েও সাহসের সঙ্গে এমন অনেক নারীর কথা বলেছেন যা নারীর মুখ থেকে না শুন্‌লে মনটার মধ্যে কেমন যেন একটা আক্ষেপ থেকে যেত। যেমন যখন শুনি যে আমাদের সতী-সাধ্বী-অধ্যুষিত দেশেও একজন নারী বিদ্রোহের কণ্ঠে বলছেন—

> সকলের মত তোমারেও ভাল বেসে থাকি যদি
> কি কার ক্ষতি?—এই যদি হয় মনের গতি!
> যারা এসেছিল জীবনে প্রথম তাহাদেরো ভালবাসিনি ত কম,
> তা ব'লে ত মিছে নয় ভালবাসা তোমার প্রতি।
> ভালবেসে যদি থাকি তাহে বল কি কার ক্ষতি?
> সে কাহার দোষ আমার মুগ্ধ চোখে যদি ভাল

তোমায় লাগে ?—ডোবে যদি মন প্রেমানুরাগে ?
সুন্দর যদি নব রূপ ধরি নয়ন মনের পুজা লয় হরি'
জীবন সন্ধ্যা লগনে আবার আরতি জাগে
আমার বিভল চোখে যদি ভাল তোমায় লাগে ? (মুক্তি—গোধূলি)

অবশ্য মনটা যে খুসী হয় তা এ কবিতাটির নিছক কবিত্ব গৌরবের জন্যে নয়। সামাজিক কারণেও বেশ একটা আনন্দ গর্ব্ব বোধ করি যে স্বাধীন চিন্তা শুধু য়ুরোপের মেয়েদেরই একচেটে নয়, আমাদের দেশের মেয়েদের মতন ব্রীড়াবনতা, লজ্জাবিনম্রা, বাতাহতকদলীবৎশিহরণকুশলা, একান্ত পরনির্ভরগৌরবস্ফীতা মেয়েদের মধ্যেও দুএকজন এমন নারী আছেন যাঁরা এমন ধারা অসামাজিক চিন্তাও অকুণ্ঠে, শুধু বলা নয়, কাব্যে লিখে প্রকাশ করতে পারেন। নিরুপমা দেবীর অনেক কবিতার মধ্যেই এই নির্ভীকতার আমেজটি বড় তৃপ্তি দেয়; মনটা প্রীত হ'য়ে ওঠে যে যা হোক্ অবশেষে একজন নারীর মুখেও ত অন্ততঃ নারীর হৃদয়ের কথার খানিকটা আভাষ পাওয়া গেল। শরৎচন্দ্র একদিন আমার কাছে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন দুঃখ ক'রে। তিনি বলেছিলেন,—আমাদের দেশের মেয়েরা ভাল উপন্যাস লিখ্‌বে কি ক'রে বল? বড় বেশি উৎপীড়িতা হওয়ার দরুণ শেষটায় সমাজের মুখ ত তাদের চাইতেই হয়। কাজেই নিজের অনুভূতির কাছে খাঁটি থাক্‌তে তারা যে পারেই না—ভরসা পায় না। চরিত্র চিন্তা করতে গিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ত তাদের সয় না! সমাজ লাঠি উঁচিয়েই আছে যে!"

তবে সুখের বিষয় নিরুপমা দেবী ও রাধারাণী দেবীর মতন দু একটি নারী এক এক ক'রে আমাদের কাব্যগগনে দেখা দিতে আরম্ভ করছেন। আমরা যেন এ-রকম স্বাধীন মতামতকে অভিনন্দন দিতে শিখি! যেন বুঝি যে নারীর কথা নারীর মুখ থেকে না শুন্‌লে কখনো ঠিক মতন তাকে জানা যায় না।

রাধারাণী দেবীর অন্যান্য কবিতার মধ্যে বিশেষ ক'রে "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ" কবিতায় বা নিরুপমা দেবীর "মুক্তি", "প্রেমের মুক্তি," "ফুলশয্যা", "শেষকথা", "বরলাভ", "অকূলে" প্রভৃতি কবিতায় নারীর হৃদয়ের কথা এমন অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে বিশেষ প্রশংসা না ক'রেই থাকা যায় না। কারণ শুধু কাব্যের জন্যই নয়, সমাজকে প্রশস্ত করবার জন্যেও আমাদের সমাজে নারীর মুখে এমন সাহসের কথা অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়েছে।

সুরেশচন্দ্রের লেখায়ও সে সাহসের পরিচয়ের মোটেই অভাব নেই। উদাহরণত—

বসনখানি শাসন করো অয়ি! বয়েস তোমার হ'ল বছর ষোলো
বুকের পরে জমাট বাঁধা মধু, এ-বারতা কেমন ক'রেই ভোলো?
দুটি পায়ের নূপুর রিণি ঝিনি জান না কি আজ কি সুরে বাজে
রঙীন করে সঙীন তাহার ধ্বনি কিশোর হিয়া—গোপন করো লাজে।
সুরভিতে আজ গিয়েছে ছেয়ে কবরী আর মোহন তনুলতা
একটুখানি—একটুখানি নাড়ায়—ঠিক্‌রে পড়ে রঙীন মাদকতা!
চক্ষে যে আজ রক্ষা নাহি লেখা অধরকোণে নেই ত ক্ষমার রেখা?
শ্রোণি-ভারে আজ মেখলা বেঁকা—এসব খবর কেমন ক'রেই ভোলো?
বসন তোমার শাসন করো রমা—কাচা পাকা আজ যে বয়স ষোলো।

এ কবিতাটি ইন্দ্রিয়বিলাসের দিকে হয়ত একটু বেশিই ঘেঁসেছে—কিন্তু কি চমৎকার expression! বীরবলের ভাষায় বল্‌তে ইচ্ছে হয় "সাবাস"!—

নীতিবাগীশের ভয়াবহ দাড়িনাড়ার ভয়ে কেমন ক'রে বলি যে এরকম কবিতা লেখা অন্যায়—

ফাগুনের আজ আগুন দিনে বামা থামাও তোমার কাকণ ঠিনি ঠিন
জাননা কি কিশোর কানে যত কয় সে—এসো চিনি, তোমায় চিনি?
আর কি আছে অবোধ অবহেলা একলা নিয়ে আপন মনে খেলা?
ভুবন ভরা তরুণ মনের মেলা—হায় সে কথা আজ কেমনে ভোলো—
কাকণ হাতে শাসন করা সাজে—আজ যে বয়েস সর্ব্বনাশা যোলো!

"তরুণ মেলা"র মধ্যে কে এমন ভালো ছেলে আছে যে লজ্জায় বেগুনী হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীর প্রতি তরুণের এই ধরণের সকুণ্ঠ অথচ সাগ্রহ দৃষ্টির এমন বর্ণনাতে সাড়া না দেবেন? কবি যে নিজের মনের অনুভূতিকে তাঁর যাদু তুলির ছোঁওয়ায় বিশ্বমনের সার্ব্বজনীন রেশে ফুটিয়ে তোলেন এরকম কবিতা কি তার একটা মস্ত প্রমাণ নয়?

এক বিষয়ে নিরুপমা দেবী সুরেশচন্দ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠতার দাবী করতে পারেন। সে তাঁর ছন্দের বৈচিত্র্য ও মিলের নৈপুণ্যে। এবিষয়ে অন্ততঃ এখনো অবধি তিনি সুরেশচন্দ্রের

শ্রীদিলীপকুমার রায়

চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন, সুরেশচন্দ্র ঠিক এ রকম ছন্দের কবিতা কখনো লেখেন নি—

ওলো ভুবন জুড়ে আজি কাহার সাড়া
তার বরণ ডালি নিয়ে সকলে দাঁড়া!
কেহ রবে না বাকি কারো সবে না ফাঁকি
ওরে সবারে ডাকি লহ দুবাহু বাড়া'!
নিয়ে আমের কলি হ'তে পরাগ ধূলি
আঁকে আলিম্পনা কার নিপুণ তুলি।
নব চামেলি দোলে খোঁপা মধুপ ভোলে
ঐ কোকিল বলে প্রেম পাগল বুলি। (বরণ গোধূলি)

অথবা

একি জাগরণ একি তন্দ্রা
একি স্বপ্ন মোহিনী করিল বিভোর কলকল্লোল মন্দ্রা?
(সাগরিকা)

অথবা

সিন্ধুর হিন্দোলে চঞ্চল কম্পিত শঙ্কিত মন দোলে সিন্ধুর হিন্দোলে
উচ্ছল বিক্ষেপে বিহ্বল প্রাণ শিব প্রলয়ঙ্কর সুন্দর কান্ত
সঙ্গীত ঝঙ্কৃত অম্বর মুখরিত
উত্তাল উদ্দাম উন্মাদ কল্লোলে সিন্ধুর হিন্দোলে!
(সাগরিকা)

কিন্তু অপরদিকে, মনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব, নিবিড় বেদনা, সমাহিত আনন্দ, যৌবনের অভিযানের বিজয় নিশান ওড়ানো ও বেপরোয়া স্বপ্ন দেখায় সুরেশচন্দ্র শ্রেষ্ঠতর। তিনি যে দার্ঢ্যের সঙ্গে পুরুষের পৌরুষের উদ্দাম উচ্ছল গতি চিত্রিত করেছেন সে দার্ঢ্য নিরুপমা দেবীর কোনো কবিতাতেই ফোটে নি—কেননা বলেছি নিরুপমা দেবী হচ্ছেন মনে প্রাণে নারী। পুরুষের অনুকরণ তিনি করতে যান নি—করতে গেলেও কৃতকার্য্য হতেন না। রাধারাণী দেবী তাঁর কয়েকটি কবিতায় বরং একটু সাফল্যলাভ করেছেন—ওজস্বিতা আঁকতে গিয়ে, কিন্তু নিরুপমা দেবী এদিকে তাঁর ছন্দ মিল ও ঝঙ্কারে অসামান্য কৃতিত্ব সত্ত্বেও কৃতকার্য্য হন নি। উপরোক্ত 'সিন্ধুর হিন্দোলে' কবিতাটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। কী চমৎকার ছন্দ ও নিখুঁত মিল! ঝঙ্কারও যথেষ্ট। তবু বেশ বুঝা যায় যে এ তাঁর রাজ্য নয়। আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্—

ওগো শঙ্কর, ওগো শঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর নৃত্য হে!
নট উচ্ছল বক্ষের তল চল-চঞ্চল চিত্ত হে!
তব দুঃসহ হাস্যের তলে মোহ মূর্চ্ছিত জ্যোতিমণ্ডলে
মহামন্থনে কাটো বন্ধনে মহানৃত্যের স্পন্দে গো!
(তাণ্ডব—গোধূলি)

বেশ বোঝা যায় এ কোনো সত্য একটা হৃদয়স্পন্দন থেকে লেখা নয়—লেখার সহজ নৈপুণ্য থেকে লেখা। আসলে নিরুপমা দেবীর রাজ্য—সূক্ষ্ম সুকোমল পেলব কোমল নারীমনের ধরা ছোঁয়া যায় না এমনি সব অনুভূতিতে।

যেমন

বঁধু থামিও না গো বাজাও বাঁশি বৃন্দাবনে,
মোর জীবন মরণ বাজুক মোহন বাঁশির সনে।
তুফান ওঠে নীল যমুনায় মরণ বাজে
সে ঢেউ নাচে কালনাগিনী হৃদয় মাঝে।
ঐখানে ঐ প্রেমের বাঁশি সঙ্গোপনে
বাজাও তুমি, বাজাও হৃদয় বৃন্দাবনে। (বাঁশির নেশা গোধূলি)

অথবা

তুমি কিছু দাও না দাও আমার মনে মন জোগাও।
আমি ত দিই সেই সুখেই দাবী দাওয়া নেই ত নেই
বন্ধু আমার প্রেম ত এই।
ঋতুর পরে ঋতুর দান গাহে যেমন ঋতুর গান
আমার মাঝে আমার প্রাণ ভ'রে ওঠে সেই প্রেমেই
দাবী দাওয়া নেই ত নেই।
(প্রেমের মুক্তি—গোধূলি)

অপরপক্ষে সুরেশচন্দ্রের মুখে এ কবিতা ঠিক সাজে না

ওহে সুন্দর, ওহে সুন্দর,
গতি কেন আজ মন্থর?
দেখেছিলে কোন্ তটিনীর তটে অসিতনয়না চঞ্চলা
দেখেছিলে কোন্ পবনতাড়িত স্বর্ণ মেখলা অঞ্চলা
(ওহে সুন্দর ওহে সুন্দর—ইন্দ্রধনু)

কারণ এরকম কবিতায় তাঁর সহজ স্ফূর্ত্তি নেই, তাঁর উধাও গতির উচ্ছাশা নেই, তাঁর নিবিড় বেদনাকে পৌরুষের সহজ শক্তিতে বরণ ক'রে নেওয়ার সামর্থ্যের সার্থকতা নেই। তাঁর "বর্ষায়" কবিতাটির সম্বন্ধেও একথা সমান খাটে।

কিন্তু ওজস্, দার্ঢ্য, ও উধাও গতিতে সুরেশচন্দ্র সত্যই সাবলীল হ'য়ে উঠেছেন—

ওই যে ঘরে একলা প'ড়ে কোন্‌বা সুখের স্বপ্ন দেখা
কোন্ অলোকের প্রলেপ-দেওয়া চোখে ;
ওই যে কোণে প্রলাপ-ঘেরা স্বর্গ-সুখের মগ্ন শেষা
করছে জমা অশ্রু দুখে শোকে।
আজ যে সাগর পারে পারে প্রাণের ভাষা কল্লোলিত
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত মন
আজ যে দিকে দিগন্তরে ছোটার হাওয়া হিল্লোলিত
জীবন আজি করবে মরণ পণ ॥

(বেদুঈন—ইন্দ্রধনু)

প্রেমের অভিষেক, জীবনের ব্যথা, মিলনের মাঝে বিদায়ের সুর—এসবের মধ্যেও 'ইন্দ্রধনু' ও 'গোধূলি'র সুর আলাদা আলাদা ছন্দে বাজছে। একটা পুরুষের অপরটা নারীর।

যেমন একাকিত্বের অসহ ব্যথার মধ্যেও সমাহিতভাবে মিলনাকাঙ্ক্ষা একান্ত ক'রে পুরুষেরই—তা সে কি উচ্ছ্বাসের সংযমে, কি আতিশয্যের বর্জ্জনে, কি ব্যথার নিবেদনের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে—

এই যে চলা দূরের ডাকে একদা এক পথের বাঁকে
জানি জানি থাম্‌তে হবেই হবে,
হয়ত দুটি আঁখির পাতে পড়ব ধরা সন্ধ্যা রাতে
আপন নিয়ে ব্যস্ত বিপুল ভবে ;
দূরের যত স্বপ্নরাশি কোন্ কিশোরীর মুখের হাসি
এক নিমেষে সফল করি দেবে
ছোট্ট দুটি বাহুর ডোরে দুর্ব্বলতার সহজ জোরে
শেষের ডাকে আমায় ডেকে নেবে!

(ভূপর্যটক—ইন্দ্রধনু)

কী করুণ! অথচ নারীর উচ্ছ্বসিত রোদন নেই এতে! মনে পড়ে শেলির বিখ্যাত উক্তি—

We look before and after and pine for what is not
Our sincerest laughter with some pain is fraught.

পুরুষ একাকিত্বকে বরণ ক'রে পুরুষেরই ভঙ্গীতে—

কঠোর চলা?—হয়ত হবে! আপন ভোলা বিশাল ভবে
দীঘল কালো তরুণ আঁখি দুটি
ছায়ায় ঢাকা কুঞ্জবনে মায়ায় ঘেরা গেহের কোণে
আমার তরে কোথাও নেই ছুটি?
আমার শুধুই পথের চলা দূরের চলা স্রোতের চলা
কালের চলা—নেইরে বিরাম কভু,
গর্জ্জুক তারা কাঁপুক ধরা ঝঞ্ঝা তড়িৎ প্রলয়ভরা
আমার পথে চল্‌তে হবে তবু! (ভূপর্যটক— ইন্দ্রধনু)

কিন্তু নারী বিরহকে দেখে অন্য চোখে—

কই পূজা নিলে দেব এ মোর দেউলে? সিংহদ্বার খুলে
বসে আছি কত জন্ম জন্মান্তর ধরি আহা মরি মরি!

(বসন্তের আক্ষেপ- গোধূলি)

কিম্বা মিলনকে দেখে—

জানি বঁধু এ জীবনে চিনিয়াছ মোরে সোহাগে আদরে
ভরেছ এ জীবনের চিরশূন্য থালা! পুষ্প কণ্ঠমালা
পরায়েছ অভাজনে, স্বর্ণ সিংহাসনে বসায়েছ ভিখারীরে!

(জিজ্ঞাসা—গোধূলি)

কিন্তু তবু পরজীবনে কি হবে সে চিন্তায় নারী আকুল—একলা চলার সম্বন্ধে সে বলে না "আমায় পথে চলতে হবে তবু।" সে বলে

তাই বড় আশা, তাই বড় ভয়
এ সুখ সৌভাগ্য ফিরে হয় কি না হয়
এ জীবন হ'লে শেষ ; জানিনা সে কতদূর ওপারের দেশ
হয়ত বহে না হাওয়া, নাহি এই চোখে চোখে মুখে মুখে
চাওয়া। (জিজ্ঞাসা—গোধূলি)

কেননা প্রেম পুরুষের পথ চলায় একটু বেশি আলো দেয় মাত্র—কিন্তু নারীর পক্ষে প্রেম তৃষ্ণার জল, জাগ্রতের ধ্যান। তাই একাকিত্বের সম্ভাবনায়—আমাদের শাস্ত্রমতে—পুরুষ সিংহের মতই অবিচলিত থাক্‌তে পারে তার বেদনা সত্বেও, —কিন্তু নারী একবারে অধীর হ'য়ে ওঠে, কোনো দার্শনিক সান্ত্বনাই তাকে একলা চলার পথে বল দেয় না। নিরুপমা দেবী বিশেষ ক'রে প্রশংসনীয় তাঁর এই আন্তরিকতাটুকুর জন্যে যার আলোতে তিনি সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে জীবনে যে-তত্ব পুরুষের পক্ষে সত্য সেটা নারীর পক্ষে সত্য নয়। তিনি বিশেষ ক'রে অভিনন্দনীয় এই জন্যে যে তাঁর কাব্যের আকুল কামনা, ব্যর্থ আশা ও স্বপ্নভঙ্গ—প্রভৃতি সব অনুভূতিই অনুভূত হ'য়েছে নারীর দরদ দিয়ে, পুরুষের উপদিষ্ট বা নির্দ্দিষ্ট নীতি দিয়ে নয়। এই জন্যেই তাঁর কবিতা অন্য সব মেয়ে কবিদের মত গতানুগতিক হ'য়ে পড়েনি—নিজের সহজ গৌরবে সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছে।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুরেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঠিক্ উল্টো। তাঁর বাণী—পুরুষের, একান্ত ক'রেই পুরুষের। কিন্তু ঠিক যে কারণে নিরুপমা দেবীকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ জানাই, সেই কারণেই সুরেশচন্দ্রকে আমরা অভিনন্দিত করি।

কেবল একটা সংশয় মনে উদয় হয়—নিরুপমা দেবীর সম্পর্কে।

সেটা এই যে তাঁর কথা নারীর কথা হ'লেও তিনি পদার্পণ করেছেন—অনেকটা রবীন্দ্রনাথের রাজ্যে। অর্থাৎ নিরুপমা দেবী যে-ধরণের কবিতা লিখছেন সে-ধরণের কবিতা রবীন্দ্রনাথ শুধু যে লিখে গেছেন তাই নয়—অজস্র লিখে গেছেন। তিনি তাঁর অনুপম তুলি দিয়ে যে-সূক্ষ্ম পেলব সুকুমার অনুভূতির আলোছায়া এঁকে গেছেন—সে-রকম ধরণের অনুভূতিরাজ্যে কোনো নতুন বিশিষ্ট অবদান দেওয়া সুকঠিন। অবশ্য নিরুপমা দেবী দিতে পারবেন না এ কথা আমরা বলছি না—এ বিষয়ে আমাদের সংশয়ের হেতুটি প্রকাশ ক'রে রাখছি মাত্র। তবে আশা হয় তাঁর কাব্যের পরিণতি হয়ত শেষটায় তাঁকে এমন সব রেখাপাতে ব্রতী করবে, এমন সব অভিজ্ঞতার পরশ আমাদের দেবে, যার ফলে (এমার্সনের ভাষায়) all men will be the richer।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে সুরেশচন্দ্র কৈশোর হ'তে শুধু কবি-প্রতিভা নিয়ে জন্মাননি, সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন একজন মহামানুষের যাঁর প্রকৃতিটি শুধু কবির নয়—যোগীর, পুরুষসিংহের, ত্যাগীর। তাই সুরেশচন্দ্রের অনেক কবিতাতেই এমন একটা প্রবণতা দেখা যায় যে প্রবণতাটি ঠিক রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিশিষ্ট প্রবণতা নয়। সেইজন্যেই সুরেশচন্দ্রের কাছে আমরা নূতন কিছু আশা করি। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর কাব্য আশা করি বল্‌ছি না অবশ্য—তবে স্বতন্ত্র শ্রেণীর অবদানের প্রত্যাশা রাখি এ কথা বল্‌তে পারি। কেন না আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তিনি চিন্তাশীলতার সঙ্গে যে কবিত্বময় গম্ভ পত্তের ঢং এনেছেন, যে আত্মসমাহিত দার্ঢ্যের জ্যোতি এনেছেন, যে প্রশান্ত ওজস্বিতার আভাস দিয়েছেন তার সবে মাত্র স্ফুরণ হ'য়েছে, কিন্তু যতটা হ'য়েছে তা থেকে আশাকে আমল দেওয়া চলে। এইমাত্র।

বিশেষতঃ তাঁর ইন্দ্রধনুর শেষ কবিতা "দ্বন্দ্ব" ও সম্প্রতি লেখা "আদিম মানব" কবিতাটি প'ড়ে মনে হয় যে তাঁর মধ্যে বল্‌বার কিছু জ'মে উঠছে।

পাঠক পাঠিকাকে "দ্বন্দ্ব" কবিতাটি আদ্যন্ত উদ্ধৃত ক'রে শোনাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু প্রবন্ধের কলেবরটি এত স্ফীত হ'য়ে উঠছে যে সে লোভ সংবরণ করতেই হ'ল। তাই এই কথা ব'লেই আমার ধৃষ্টতার সমাপ্তি টানি যে "দ্বন্দ্ব" কবিতাটির মধ্যে মুক্তি ও বন্ধন, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ত্যাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সংগ্রাম তিনি এঁকেছেন তা বাংলা ভাষায় সত্যই অপূর্ব্ব। শুধু মানবমনের চিরন্তন দ্বন্দ্বটি ফোটানোর জন্যই যে কবিতাটি এত প্রশংসনীয় তা নয়।

অরবিন্দ যাকে বল্‌ছেন deeper reality of things সুরেশচন্দ্র এ কবিতায় তার আভাস দিয়েছেন যখন তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেছেন:—

> পরক্ষণে চোখে আসে জল
> নেহারিয়া সরোবরে প্রস্ফুটিত দল
> শতদলে; প্রজাপতি রঙীন পাখায়
> ফুলবনে ফুলসনে অধীর খেলায়,
> অলির গুঞ্জনে বন্য কপোতের ডাকে
> উদাস আবেগে যবে চিত্ততল ঢাকে,
> মনে জাগে—এর চেয়ে আর কিবা আছে
> ইন্দ্রিয় বিলাস? কোন্ সংগ্রামের মাঝে
> আছে এর সুখ লেশ? রমণীর রূপে
> যা কিছু আনন্দ আছে, আছে চুপে চুপে,
> ভোগ যেথা ইন্দ্রিয়েরে করি' অতিক্রম
> রচিয়াছে মৌন নীড়; সকল সংযম
> মিথ্যা যেথা হ'য়ে গেছে ঊর্দ্ধের আলোকে,
> জীবন্ত দেবতা যেথা রোমাঞ্চ পুলকে
> আনন্দের বীজ খোঁজে আপনারি মাঝে,
> সৃষ্টি যেথা নবরূপে পূর্ণ হ'য়ে রাজে
> ভোগের ওপারে।

ত্রোকাদেরো
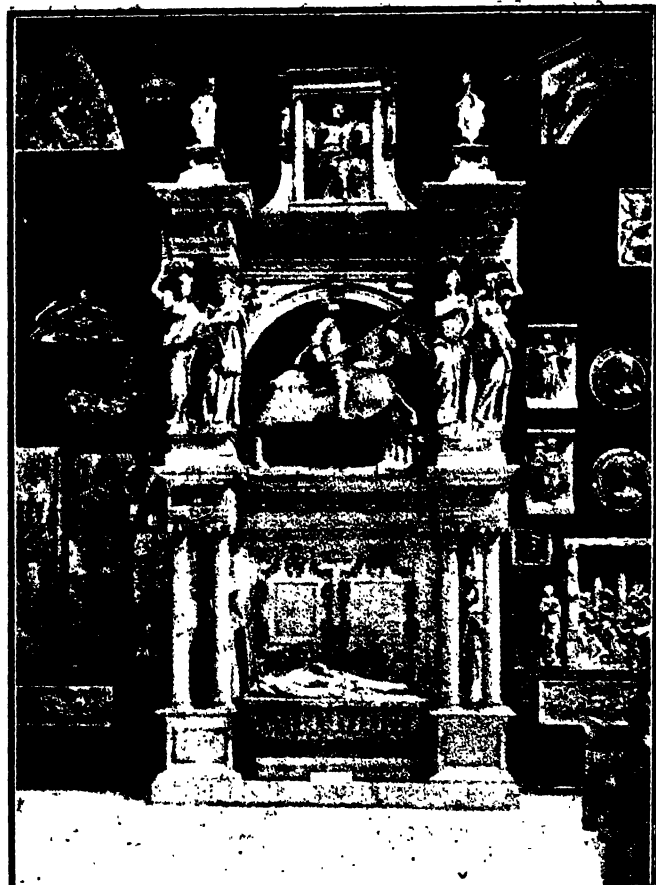
রুয়েন্-এ
নোতর্ দাম্-এর মহাধর্ম্মমন্দির

অপ্সরা

চিত্রসংগ্রহ

রীম্‌স্‌-এ
নোত্র-দাম্‌-এর মহাধর্ম্মমন্দির
পশ্চিম দেউড়ি

ভাজেলে-তে
লা মাদ্‌লিনের গির্জ্জা
নার্থেক্সে যাইবার দেউড়ি
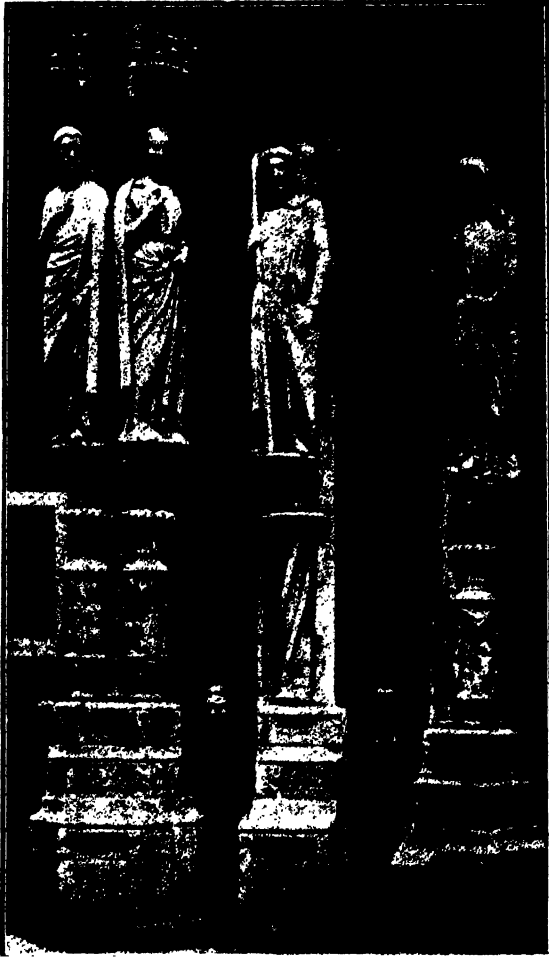
চার্তার্স এ
নোতর-দাম এর মহাধর্ম্মমন্দির

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর
স্মৃতিমন্দির

চার্লিয়ুতে গির্জ্জা
পশ্চিম দ্বার
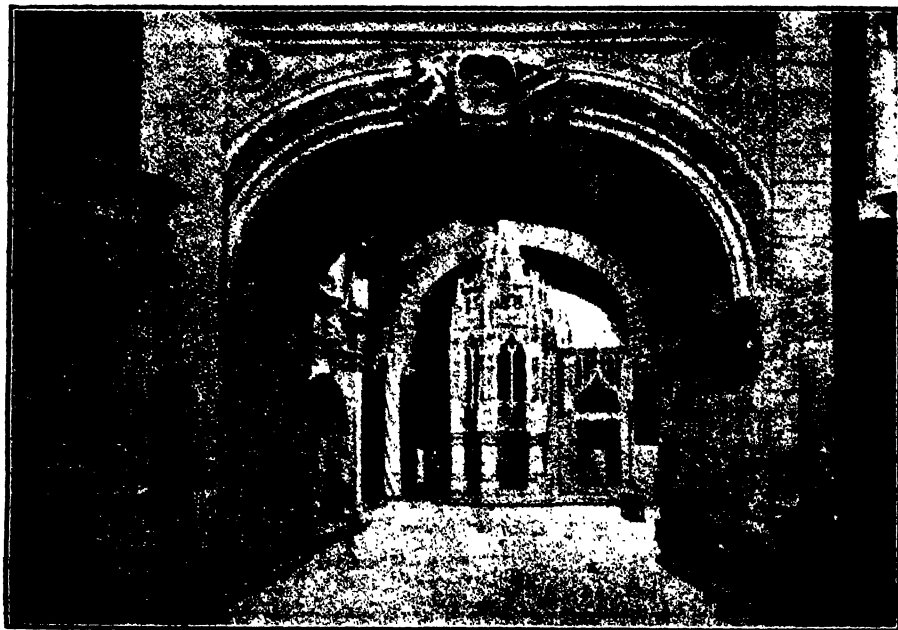
য়্যাভিয়থ্‌ এ ভজনালয়
পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ
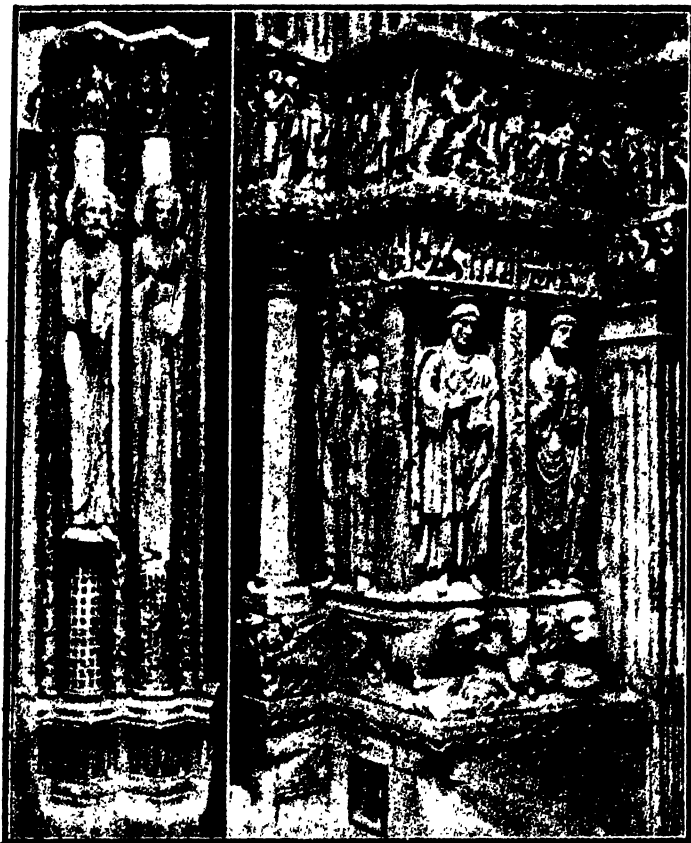
চার্ত্রার্-এ
নোতর্-দাম্-এর মহাধর্ম্মমন্দির
পশ্চিম দেউড়ি

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ-
শতাব্দীর স্মৃতি-মন্দির

পারিতে
নোতর্-দাম্-এর মহাধর্ম্মমন্দির

সেণ্ট্-গিল্স্-এর
গির্জ্জা
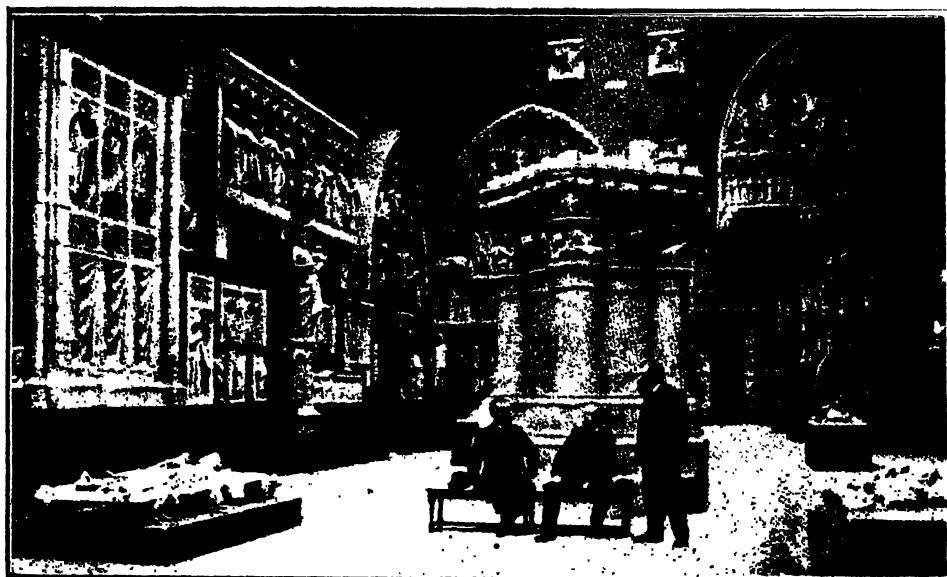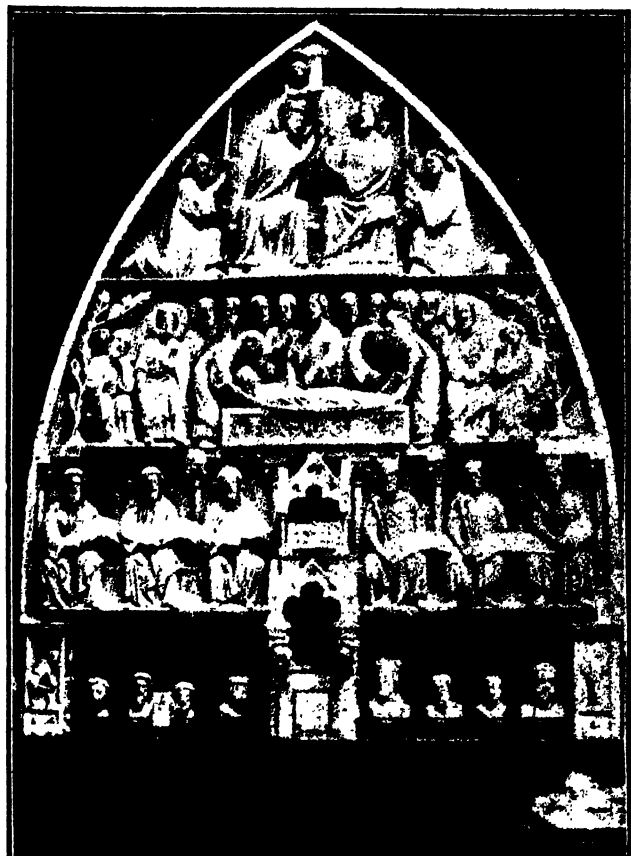
শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত

রাহুর প্রেম

—গল্প—

—শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

ছত্রিশ বছর বয়স, সাড়ে পাঁচশ টাকার মাহিনার চাকুরি এবং একটি মোটরকার। এরূপ যুবক যে আজও অবিবাহিত, তাহা আবার বিবাহপ্রিয় বাঙালী জাতির ভিতর, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইত, কিন্তু হইয়াছিল তাহাই। যে বয়সটা বিবাহ করিবার সে বয়সটায় যে কেন বিবাহ হইল না, তাহা আজিও কেহ জানেনা; শুধু আত্মীয়স্বজন এইটুকু জানে, রবির পিতা বার দুই সন্তানকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন রাজি করাইতে পারিলেন না, তখন মনঃক্ষুন্ন হইয়া কাশীবাস করেন, এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। রবির মাতা কি জানি কেন কখনও রবিকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন নাই, শুধু মৃত্যুকালে রবির হাত দুটা ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"মা হ'য়ে তোর যে শত্রুতা করেছি, তার শাস্তি হয়ত পরকালেও পাব। কিন্তু যদি পারিস্ ত তোর মার এই শেষ অনুরোধ মনে ক'রে সংসারী হ'স বাবা, হয়ত পরকালেও তা' হ'লে শান্তি পাব।"

সে ত আজ প্রায় চার বৎসর হইল। কিন্তু কর্ম্মক্লান্ত পাঠপ্রিয় মনটাকে আজও সংযত করিয়া সে সংসারবস্তুর দিকে টানিয়া আনিতে পারে নাই। তাহার চুলের উপর বার্দ্ধক্য তার শুভ্র ধ্বজা একটি একটি করিয়া উঠাইতেছিল সেদিকে তার খেয়াল ছিল না। শুধু কর্ম্মের উত্তেজনায় আর সংসার করার ভাবনাটাকে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিবার জন্য সে নানা দেশ বিদেশে ঘুরিয়া শেষে কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিল।

কিন্তু কলিকাতাও অসহ্য হইল। প্রথম সেই পরিপূর্ণ শস্যশ্যামল উদার উন্মুক্ত আর্য্যাবর্ত্তের বুকের উপর শ্যামায়মান নগরীগুলি তাহার মনে একটি সবুজের নেশা লাগাইয়া দিয়াছিল, তাই ধূলিধূসরিত কোলাহলমুখরিত কলিকাতা সহরের ভিতর তাহার পৈতৃক ভিটাটি আজ চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তাহাকে যেন দানবের মত গিলিয়া লইতে আসিল। তাহার পর আত্মীয়দের অযথা আদর এবং সংসারী করিবার দিবারাত্র উদ্যম তাহাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। শেষে অনেক ভাবিয়া সে কলিকাতা হইতে মাইল দশেক দূরে গঙ্গার উপর একটি ছোট বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিল।

২

সেদিন রবিবার। আপিসে যাইবার তাড়া ছিল না। গঙ্গার ধারে, পশ্চিমের বারান্দার উপর একটি কেদারায় পড়িয়া রবি কলনাদিনী ভাগীরথীর পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া শুইয়াছিল। এতদিন যাহা তাহার কোনদিন মনে পড়ে নাই, যে কথাগুলি সে চিরদিন যক্ষের মত হৃদয়ের অতি গোপনতম গুহায় আবদ্ধ করিয়া আগ্‌লাইয়া ছিল, সেই কথাগুলি যেন এই ইছাপুরের বাঙলোটিতে আসিবার পর হইতে যখন তখন চুপি চুপি বা'র হইয়া আসিতেছিল। তার কারণও ছিল। কোনদিন তাহাকে বাড়ী গুছাইয়া বসিতে হয় নাই, চিরকাল সাজান বাড়ীতে বাস করিয়া আসিয়াছে, আজ এখানে আসিয়া মনের মত করিয়া বাড়ীটি সাজাইতে গিয়া কাহার যেন একটা অভাব, কাহার যেন একটা অনুপস্থিতির প্রবল অনুভূতি তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া দিতে লাগিল। তাহার কানে আসিল বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া স্মৃতির শ্মশানের ঝড়ো হাওয়ার মত কার বাণী—"এই টিপয়টা এইখানে রাখ্‌লে হয় না,—"সে স্বপ্নোত্থিতের মত বলিয়া উঠে,—"বেশ হয়।" কি যেন আশা করে, কাকে যেন পাইতে চায়, চাহিয়া দেখে পুরাতন ভৃত্য বৃন্দু এই প্রশ্ন করিল। বিরক্ত হইয়া উঠে, নিরাশ হইয়া বলে, "আজ থাক্ বৃন্দু, কাল এই ঘরটা গুছান যাবে।"

রাহুর প্রেম

শ্রীসমারেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কাচ ভাঙিলে জোড়া যায় না। তাহার ভাঙা মনটা জুড়িতে গিয়া সে সহস্রবার ঠকিয়া একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে সেই সবি ভাবিতেছিল। জীবনে সে পায় নাই কি, সবই ত পাইয়াছে, রূপ, যৌবন, মান, সম্ভ্রম, অর্থ, মানুষ যা কল্পনা করে সবই। তবু কেন এই হাহাকার, এই ক্ষুধা, এই অনন্ত প্রতীক্ষা!

সুন্দরী ভাগীরথী রূপের পসরা মাথায় লইয়া সহস্র তরঙ্গতালে নিপুণা নটীর মত নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়; রবির ভাবরাজ্যে কোন ভুলিয়া-যাওয়া দিনের দুটি চপল পদপল্লবের সলীল গতি মনে পড়িয়া যায়, মনটা দুমড়াইয়া উঠে, অমনি গোপনগুহার চিন্তারাশি হুল্লোড় করিয়া বাহির হয়।

"তা' হ'লে আপনাতে আমাতে কিছুতেই মিলন হ'তে পারেনা মিঃ বোস।"

"কিছুতেই না মিস্ রায়, আমার স্বার্থের চেয়ে আমার পিতামাতার ব্যথাটা আমি বেশী অনুভব করি।"

"কিন্তু আমার পিতামাতার দিক থেকেও ত আমার একটা কর্ত্তব্য আছে।"

"নিশ্চয়, তুমি তাই কর্‌বে অনীতা, এ পাগলামি রাখো, হাসিমুখে অলকনাথের সঙ্গে engaged হ'য়ে যাও। আমাদের উভয়কেই ত্যাগের ভিতর দিয়ে পরস্পরকে পেতে হবে।"

অভিমানে অনীতা উত্তর দিয়াছিল, "দর্শনটাই মস্ত ব'লে ধ'রে তার থিয়রিটাই জীবনে আদর্শ ক'রে বসেছেন, কিন্তু নিজে যে কত বড় দুর্ব্বল, তা' হয়ত একদিন টের পাবেন।"

ব্যাপারটাকে লঘু করিবার জন্য রবি হাসিয়া বলিয়াছিল, "আমাকে অভিশাপ দিলে ত অনীতা!"

ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় কাঁদিয়া ফেলিয়া অনীতা উত্তর দিয়াছিল, "অভিশাপ আপনাকে দিইনি মিঃ বোস্, তবে যে অভিশাপের নাগপাশে আজ আমাকে ফেল্‌লেন, তার এত টুকুও ব্যথা যদি নিজে অনুভব করতেন—"

কথাটা অনীতা শেষ করে নাই, ছুটিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। পুরুষের কাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে ছিল। তাহার পর আর দেখা হয় নাই। সে আজ চতুর্দ্দশ বৎসর। আবার মনটা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। মাথার ভিতর রক্ত ছুটিয়া যায়। সম্মুখে পিতার কাতর অনুরোধভরা মুখ, মাতার দীন নয়ন দুটি ভাসিয়া উঠে, চীৎকার করিয়া রবি চাকরকে ডাকিয়া বলে, "বুদ্ধু, আর এক কাপ চা দিয়ে যা রে।" তাহার পর একাগ্র চিত্তে সাহিত্যের কমলবনে ঘুরিয়া বেড়ায়।

৩

এমনি করিয়া সে তাহার নির্জ্জন বয়স কাটাইয়া যাইতেছে। বাড়ীর পাশেই একটু পতিত জমি ছিল, তাহাতে সে নানা রকম ফুলের বাগান করিল, তাহারই পাশ দিয়া গঙ্গার ঘাটে যাইবার পথ। সন্ধ্যার সময়টিতে গ্রাম্যবধূগণ কলসি লইয়া সেই বাগানটির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইত ছোট একটি পাথরের বেদীর উপর বসিয়া রবি একটি কবিতার বই পড়িতেছে, কখন বা ছবি আঁকিতেছে, কখন বা এসরাজ লইয়া সুর দিতেছে। বনের পাখীর মত, ভাগীরথীর তরঙ্গের মত এও যেন এই স্তব্ধ বিরাট সান্ধ্য-প্রকৃতির একটি প্রয়োজনীয় সৌন্দর্য্যের অঙ্গ।

সেদিনও বসিয়াছিল। হঠাৎ কাহার কচি কণ্ঠের কলহাস্যে তাহার চমক ভাঙিল। অস্তগামী সূর্য্যের সোনালি আলোয় দিগন্ত রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই সোনালি আলোয় পরীস্থানের অধিবাসীর মত একটি পঞ্চদশী কিশোরী একটি বছর ছয়ের ছেলেকে বলিতেছিল, "দুষ্টু ছেলে, আর ফুল নেয় না, চ।" "না দিদি আরও, ঐটে নেব, ওটায় আমার হাত যায় না। না, দে।" বালিকা রাগিয়া উঠিল, বালক বায়না করিতে লাগিল। রবি আস্তে আস্তে ছোট ফটকটির আগল খুলিয়া দিয়া কহিল, "ভেতরে এসে যত পার ফুল নাও। ছেলেমানুষকে কাঁদিও না।" কিশোরী ফুল লইয়া চলিয়া গেল। অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলো তখনও তাহার গালে, মুখে, রাশীকৃত চুলের উপর এলাইয়া পড়িয়াছিল। রবি বুদ্ধুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বুদ্ধু, ও মেয়েটি কে রে?" বুদ্ধু একটু ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিল, "ওমা, ও যে সেই তারক বোসের নাত্‌নি দা' বাবু, যার জন্যে তুমি পাত্র ঠিক করছ।" "ও, তাই

নাকি ?" বলিয়া রবি বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল ঐ কিশোরীর পদক্ষেপ আর লীলায়িত ভঙ্গিমা যেন তাহার সমস্ত হৃদয়ে এক সোনার আগুন জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠিক এরই জন্য হয়ত এই দীর্ঘ তপস্যা, এই কৃচ্ছ্র সাধন, নিঃসঙ্গ, দীন, নিদ্রাহীন জীবনের প্রয়োজন ছিল। মনে হইল কতদিন আগের এক মুমূর্ষু বৃদ্ধার মরণের সিংহদ্বারে কর হানিতে হানিতে কাতর অনুরোধ, "যদি পারিস ত সংসারী হোস্ বাবা, পরকালে শান্তি পাব।" সে কি তাহাকে শান্তি দিবে না ? নিজেও জ্বলিবে, আর এক তৃষিত আত্মাকে চিরদিন অনন্ত আক্ষেপের জ্বালায় জ্বালাইবে। যাহা গিয়াছে, তাহা ত গিয়াছে, তবে কেন এই বাকি জীবনটাকে সে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে না, ভস্মাবশিষ্ট অট্টালিকা আবার নূতনতর উৎসাহে, নবসাজে সাজাইয়া তুলিবে না ? কক্ষহারা তারার মত সে শূন্য পথে খসিয়া পড়িতেছিল, ঐ কিশোরী পঞ্চদশী যেন তাহাকে মধ্য পথে কুড়াইয়া লইয়া আঁচলে চাপিয়া রক্ষা করিল। বিরাট ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইয়া লইল। সে-রাত্রে সে কবিতা পড়িল, গান গাহিল, এসরাজ বাজাইল। আজ যে সে সম্পূর্ণ সুন্দর, স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চায়।

৪

পরদিন প্রভাতে তারক বোস নিয়ম মত দেখা করিতে আসিলে রবি এ কথা সেকথার পর বলিল, "সলিল ছেলেটিকে কেমন মনে হ'ল কাকা ?" তারক গড়গড়াতে সজোরে একটি টান টানিয়া কহিল, "দিব্যি ছেলে বাবা, রূপে গুণে, আমার নিরু দিদির ভাগ্যি খুব ভাল, তাই অমন ছেলে জুটেছে। আর এও দেখে নিও বাবা, নিজের নাত্‌নি ব'লে বড়াই করছি না, নিরু আমার যার বাড়ীতে পড়্‌বে সে বাড়ীতে মা লক্ষ্মী উথ্‌লে উঠ্‌বেন।"

রবি শেষের কথাগুলি যেন গিলিতেছিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কিন্তু দেখুন, কথা হচ্চে সলিলের অবস্থা তত ভাল নয়, নিজে বড় চাকরি করে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, মেয়ে দিতে হ'লে বিশেষ নিরুর মত মেয়ে, সব রকমই ত দেখে দিতে হয়।"

তারক উচ্চস্বরে কহিল, "তা'ত বটেই বাবা, তা'ত বটেই, কিন্তু কথা হচ্চে, পাত্র পাই কোথায়? এই তুমি ত দু মাস ধ'রে বুড়ো পড়শীর জন্যে একেবারে হায়রাণ হ'য়ে গেলে একি বুঝছিনে ?"

রবি বাধা দিয়া কহিল, "না না, ও কথা বলবেন না, তবে কি জানেন, আপনারা অনেক বার বলেছেন, আমি শুনিনি, আমার ইচ্ছে—আমার ইচ্ছে হয় সংসারধর্ম্ম করি, তা' যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, নিরুকে—এই বলছিলুম আর কি—"

বৃদ্ধ কথাটা শেষ করিতে দিল না, কহিল, "সে ত খুবই ভাল কথা বাবাজি, তোমার সঙ্গে হৃদ্যতা হয়, একথা আমরা অনেকবার ভেবেছি, তবে কি জান বাবাজি, নিরুর মায়ের মত হয় না। বয়সের অনেক তফাৎ, আর সলিলকে দেখে নিরুদিদিও বড় সুখী, সলিল আমাদের দেখতে চমৎকার কিনা ! বাবাজিও ত রাজপুত্তুর, তবে কি জান বাবাজি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই দেখনা কেন বাবাজি, আমাদেরও—"

রবি বাধা দিয়া কহিল, "সে ত বুঝ্‌ছি কাকা। তা, বেশ, সলিলকে আমি টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি, আপনারা বিয়ের আয়োজন করুন। আর আমার কথাটা যেন কেউ না শোনে, কি একটা ছেলেমানুষি ক'রে ফেললুম।"

বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "সে কি কথা বাবা, একটি ডাগর গোছের মেয়ের চেষ্টা আমিই করছি, তোমার মত ছিল না তাই, কালীঘোষের ভাগ্নী দিব্যি মেয়ে ছিল।"

সমস্ত কথাগুলি যেন রবির কাণে গলিত সীসা ঢালিয়া দিতেছিল, সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল,—"বিয়ের ইচ্ছে আমার কোনও কালেই ছিল না কাকা। কিন্তু সে কথা শুনে কি লাভ আপনার, যান বাড়ী যান।"

এখানেও কর্ত্তব্য, মাতার ব্যথা, দাদামহাশয়ের অমত।

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে রবি সেই খানেই বসিয়া রহিল। আজ তাহার স্নান করিতে, আহার সারিতে, আফিস যাইতে কিছুই ইচ্ছা করিতেছিল না। একি ভুল, একি ভ্রান্তি, একি আকাঙ্ক্ষা ! তাহার যে রূপ ছিল, গিয়াছে, তাহার যৌবন ছিল, নাই, বিশ্বের সম্মুখে সে আজ কুৎসিত কুরূপ,

কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার ক্ষুধা, হৃদয় জুড়িয়া যে এক অনন্ত পিপাসার সৃষ্টি করিয়া রহিল তাহার ত পরিসীমা নাই, শেষ নাই, ক্ষান্তি নাই। সে ঘরে গেল, বৃহৎ দর্পণে নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেই চমকাইয়া উঠিল। শুভ্র কেশ কানের উপর লুটিয়া পড়িয়াছে, চোখ বসা, চোয়ালের হাড় দুটি ঠেলিয়া বাহির হইয়াছে। কোথায় সেই চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বের জীবন? আর একটি দিনের জন্যও কি তাহাকে ফিরাইতে পারিবে? অথচ সমস্ত মন পরিব্যাপ্ত করিয়া অভাবের কি বুকফাটা হাহাকার, স্ত্রীর অভাব, পুত্রের অভাব, সংসারের অভাব।

নিরুর বিবাহের পরদিন, বরকনে বিদায়ের সময় রবি একটি জড়োয়া নেকলেস নিরুর হাতে দিয়া কহিল, "এই আশীর্ব্বাদ করি, স্বামী সোহাগিনী হও।"

নিরু সমস্তই শুনিয়াছিল, সে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে রবির হাতদুটি ধরিয়া কহিল, "তুমিও আমার সঙ্গে চল দাদা, এখানে তোমায় দেখ্‌বে কে?

রবি হাসিয়া কহিল, "তোর সঙ্গে দেখা হবার আগে যিনি দেখ্‌ছিলেন তিনিই দেখবেন।" তারপর সলিলের পিঠ চাপড়াইয়া ম্লান শীর্ণ মুখখানি যথাশক্তি হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া কহিল, "Cheerio Young Chap!"

তাহার পর?

তাহার পর রবি ছুটি লইয়া তীর্থদর্শনে বাহির হইল। তাহার সাধের ইছাপুরের বাঙ্‌লোয় আর সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না, ঝাঁট পড়ে না। শুধু পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ভাগীরথীতটচুম্বী অধীর বাতাস তাহার অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া বিরহীর দীর্ঘ নিশ্বাসের মত হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া থাকে।

প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শূন্য ব্রহ্মপুত্র চর সীমান্ত অবধি
প'ড়ে আছে একটানা; বালু জমি পরে
বাড়িতেছে তরমুজ—যতদিন নদী
নাহি জাগে পুনর্ব্বার; ম্লান দিগন্তরে
দূর পাহাড়ের লেখা; সন্ধ্যার আঁধার
নেমে আসে; ঝিল্লি ডাকে; জোনাকী চমকে;
বিলম্বিত তরণীর ঘাটে ফিরিবার
করুণ আহ্বান; অশ্রু নামে মোর চোখে॥
রিক্ত সুধাপাত্রসম পঞ্চমীর শশী
প'ড়ে আছে আকাশের প্রান্তে; সমাধান
সপ্তর্ষির প্রদক্ষিণ ধ্রুবেরে ঘিরিয়া;
হঠাৎ পঞ্জর ভেদি উঠিল নিঃশ্বাস
পুরাতন অশ্রুধ্বনি; কাঁদিল পরাণ
ওই ওই অতি দূর দিগন্তে চাহিয়া॥

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরাধারাণী দত্ত

—ক্ষান্ত বর্ষা—

শরৎলক্ষ্মী স্বর্ণ-আলোর দূত পাঠাচ্ছেন—"যাবো যাবো—"কাজল-শ্রাবণ বিপুল অশ্রুরাশি সম্বরণ করতে করতে বলছে—"যাই যাই"।

শরতের ঝিকিমিকি সোণালী আলোর স্নিগ্ধ মধুর সম্পাতে, সাশ্রুনয়ন ঘন-শ্রাবণের বিদায়-নেওয়ার মাধুর্য্যটি, এত মোহন সুন্দর অথচ বেদনা-করুণ হ'য়ে উঠেছে যে, সে ছবি আমাদের শুধু বিমুগ্ধ করে না, ব্যথিতও করে। এ যেন পরম বাঞ্ছিত সুপাত্রের হাতে প্রাণাধিকা তনয়াকে অর্পণ ক'রে পুলকিত পিতামাতার বিদায়-মুহূর্ত্তে সাশ্রু-নয়না কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আকুল ক্রন্দন! এর সুখের পরিমাণ বেশী, কিম্বা দুঃখের পরিমাণ বেশী নির্দ্দেশ করা কঠিন।

বিদায়োন্মুখী বর্ষার মোহন-করুণ ছবি আমাদের মর্ম্মের কোমলতম তারটি স্পর্শ করে। যেমন,—

ক

"আজি, বর্ষা-রাতের শেষে—
অই, সজল মেঘের কোমল-কালো
অরুণ-আলোয় মেশে।
বেণু-বনের মাথায় মাথায়
রং লেগেচে পাতায় পাতায়
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়
কোথায় যে যায় ভেসে।
এই ঘাসের ঝিলিমিলি—
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন
এক তালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক জাগে,
বনের সাথে মন যে মাতে
ওঠে আকুল হেসে।"

খ

"শ্রাবণ মেঘের আধেক-দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা।
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে
উত্তরী তার যায় যে উড়ে,
সজল-হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা॥
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কে জানে,
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্ খানে।
নানা বেশে নানা ক্ষণে,
ঐ তো আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা-সুরের ঢেউ-তোলা॥"

গ

"ভোর হ'ল যেই শ্রাবণ-শর্ব্বরী,
তোমার বেড়ায় উঠলো ফুটে
হেনার মঞ্জরী" ইত্যাদি।

ঘ

"শ্রাবণ-বরিষণ পার হ'য়ে—
কি বাণী আসে অই র'য়ে র'য়ে—
গোপন কেতকীর পরিমলে,
সিক্ত বকুলের বন তলে,
দূরের আঁখি-জল ব'য়ে ব'য়ে।
কি বাণী আসে অই র'য়ে র'য়ে।" ইত্যাদি

ঙ

"বৃষ্টি-শেষের হাওয়া কিসের খোঁজে
বইছে ধীরে ধীরে!
গুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও যে
বুকের শিরে শিরে।
ঋতুর পরে ঋতু ফিরে আসে
বসুন্ধরার কূলে।
চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে
ফুলের পরে ফুলে।
গানের পরে গানে তারি সাথে
কত সুরের কত যে হার গাঁথে (এই হাওয়া)

শ্রীরাধারাণী দত্ত

ধরার কণ্ঠ বাণীর বরণ-মালায়
সাজায় ঘিরে ঘিরে।"

আকাশের এক চোখে হাসি এক চোখে কান্না। ওষ্ঠে আনন্দ, অধরে বেদনা। আধ-কালো আধ-সোণার মধুর সমন্বয়ে কবি তাঁর উদাস রাগিনী ধরেছেন—

"একলা বসে বাদল-শেষে শুনি কত কী।
"এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে
ডেকে গেল আকাশ-পারে
তাইতো সে যে উদাস হ'ল
নইলে যেত কি ?"

বাদলের বিদায় যতই এগিয়ে আসছে, চিত্ত যেন ততই চঞ্চল হ'য়ে উঠছে। তাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না, তাকে ধ'রে রাখবা'র জন্য,—যে থাকবার অনুরোধ প্রাণে ঘনিয়ে উঠেছে,—তার উত্তর কবি 'পূব-হাওয়া' ও 'শরৎ' এর মুখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'পূবহাওয়া' ও 'শরতের' আলাপে বরষার বিদায়-মাধুর্য্যটি অতি স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে।—

"শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া নাইবা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
পূব-হাওয়া কয় "ওর যে সময় গেলো চলে।"
শরৎ বলে "ভয় কি সময় গেলো বলে—
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা,
অসময়ের খেলা খেলে।"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন ?
ওযে হ'ল সাথীহীন।
পূব হাওয়া কয় - "কালোর এবার যাওয়াই ভালো।"
শরৎ বলে—"মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোণার সাজে
আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।"

বোঝা গেল ওকে রাখা যাবে না, ও যাবেই যাবে। এবার তাই কবি ব্যাকুল সুরে যেন তার হাত দু'খানি ধ'রে আটকে রাখতে চাইছেন—ওগো প্রিয়া, ওগো প্রিয়তমা, তুমি যেওনা, আমার গাওয়া যে এখনও শেষ হয়নি! সব কথা যে এখনও বলা হয়নি, সকল কথা শোনা হয়নি —

"যেতে দাও গেল যারা, তুমি যেওনা যেওনা,
আমার বাদলের গান হয়নি সারা।"

কিন্তু অশ্রু-সিঞ্চিত করুণ রৌদ্রের কোমল হাসি হেসে, বাদল তার সজল চাহনির মাঝে শেষ মেলানি মাগ্‌ল। কবি এবার তাঁর গোপন ব্যথার গন্ধ-সুরভিত করুণ সুরের ছন্দ-গুচ্ছ খানি তার হাতে তুলে দিলেন।—

"ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি!
অশ্রুভরা পূরব-হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি।
উদাস-হৃদয় তাকায়ে রয়,
বোঝা তাহার নয় ভারী নয়;
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি।
ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে।
মনে ভাবি তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারিগানে,
সেই আঁখি তার মনে আনে;
আকাশ-ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি।"

নদীর তীরে শারদলক্ষ্মীর কাশের আঁচল উড়ে এসে পড়েছে। শিউলীতলার সবুজ আঙিনার শিশির-ধোয়া সাদা ফুলের আল্‌পনা আঁকা হচ্ছে। আকাশের গণ্ড হ'তে অশ্রুর কালির চিহ্ন মুছে যাচ্ছে,—নবীন আনন্দের আভাসে তার নয়ন স্বচ্ছ নীল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কবি গান ধরেছেন—

"ছাড়্‌ল খেয়া ওপার হ'তে
ভাদ্র-দিনের ভরা স্রোতে,
দুলচে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুর।
কদম-কেশর ঢেকেছে আজ বন-পথের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়া বনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ-হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর।"

বর্ষার কালো আভাস একেবারেই ফিকে হ'য়ে এসেছে। ধারা যন্ত্রের গুঞ্জরণ বন্ধ হ'য়ে গেছে। কবি এবার তল্পী-তল্পা গুটিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছেন; তাঁর বিদায়বিধুর কণ্ঠে বাদলের শেষ গান খানি গুঞ্জরিত হ'য়ে ফিরছে,—

"বাদলধারা হ'ল সারা, বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ ক'রে দে, যাবি অনেক দূর।"

ব্রাহ্মণ্য ও বিজ্ঞান

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

শেষ প্রস্তাব

পাশ্চাত্য বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টির বিবরণ ও বিজ্ঞান-সম্মত জীবন্ত পদার্থের ক্রমবিকাশের (Organic Evolution) মত লইয়াই প্রধান বিবাদ। অত্র সম্বন্ধে সর্ব্বত্র সম্মানিত ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির বিবরণ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায় আর ঐতরেয়ের চতুর্থ খণ্ডের উল্লেখ হইতে পারে। শেষোক্ত শ্রুতির ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি যে, "নহি সৃষ্টেরাখ্যায়াদি পরিজ্ঞানাৎ ফলং কিঞ্চিদিষ্যতে।" এইরূপ আখ্যায়িকার প্রয়োজন কি? কালে অনিবৃত্ত পরিবর্ত্তনের তুলনায় কালাতীত এক ভাব বা শান্তির উপাদেয়ত্ববোধ একটি প্রয়োজন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অপর প্রয়োজন জীবন্ত জগতের পরতন্ত্রতা বুঝিয়া পরতত্ত্বে নিষ্ঠা লাভে মতি।

ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত এক শ্রেণীর শাস্ত্র আছে যাহাতে মনুষ্যের মাতৃগর্ভস্থ অবস্থার ইতিবৃত্তের যে বর্ণনা দেখা যায় তাহা হেগেল যাহাকে জগতীয় ক্রমবিকাশের পুনরুক্তি (Doctrine of Recapitulation) বলেন তাহার সহিত এক বাক্যে এ ক্ষেত্রে একটি জিজ্ঞাসা উঠে যে জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে বিজ্ঞান তাহার কি ইতিহাস দিতে সক্ষম। ভিন্ন ভিন্ন Protoplasm নামে কম্পমান পদার্থ বিন্দু যাহাদের মধ্যে কোন ভেদই বিজ্ঞানের চক্ষুগোচর নহে, তাহাদের মধ্যে একটি মনুষ্য, অপর একটি পশুরূপে, এবং তৃতীয়টি কেন উদ্ভিদরূপে পরিণামে বিকশিত হইতেছে তাহার বিজ্ঞানসম্মত নির্দ্দিষ্ট কারণ কি? যে পদার্থবিন্দু যে জাতীয়রূপে পরিণত হয়, যদি সেই জাতীয় কেহই পূর্ব্ববর্ত্তী নাই এ প্রকার ধারণা করা যায় আর তদনন্তর সেই ধারণাক্রমে পদার্থ বিন্দুর জাতীয়রূপে উৎপত্তির প্রকার অনুসন্ধান বিজ্ঞানের সাহায্যে সফল হইবার সম্ভাবনা আছে কি না তাহারও বিচার আবশ্যক। Protoplasm আছে কিন্তু যে জাতীয় রূপে তাহার পরিণত বস্তু পরে দেখা যায় যদি সে বিশেষ জাতীয় কোন বিন্দু সেই পরিণতির পূর্ব্ববর্ত্তী না থাকে, তবে সেই বিন্দু সেই রূপেই পরিণত হয় কেন তাহার কারণনির্দ্দেশে বিজ্ঞান কি সক্ষম? আর এক প্রশ্ন উঠে এই যে বিজ্ঞানের চক্ষে অভিন্ন তিনটি পদার্থ বিন্দু তিনটি ভিন্নরূপে পরিণত হয় কেন ইহার বিজ্ঞানমূলক উত্তর আছে কিনা ইহাই জিজ্ঞাস্য।

এখন শব্দের উৎপত্তি ও স্বভাব বিচার্য্য। সংস্কৃত ভাষায় অর্থশূন্য কর্ণগোচর বিষয়ের নাম ধ্বনি। অর্থযুক্ত ধ্বনির নাম শব্দ। চেতন অচেতন পদার্থ মাত্রেই ধ্বনির উৎপত্তি। কিন্তু শব্দেরও কি সেইরূপ! প্রথমতঃ, ধ্বনির স্বভাব চিন্তনীয়। ধ্বনির মিষ্টতায় ধ্বনির উৎপাদক ধ্বনির শ্রোতাকে আকর্ষণ করিতে পারে। ধ্বনির কর্কশতায় তাহার বিপরীত ফল দেখা যায়। কিন্তু ধ্বনির দ্বারা শরীর-গত কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য হয় কি? অন্যান্য বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া অপরকে জানাইতে পারা যায় এমন কোন স্থায়ী ভাবের উৎপত্তি ধ্বনিতে দেখা যায় না। এদিকে প্রীতি বা ভয় শব্দ যে ভাব উৎপন্ন করে তাহা স্থায়ী, ব্যক্তিসাধারণ্যে প্রকাশ যোগ্য। মানুষের ভিতর শব্দ-শক্তিতে যে ভাব উৎপন্ন হয় তাহা শব্দ ভুলিয়া যাইলেও নষ্ট হয় না, অন্য শব্দ বা বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ হইতে পারে। সংক্ষেপতঃ শব্দ সমুদয় ব্যক্তিজীবনব্যাপী অথচ ব্যক্তিজীবনে আবদ্ধ নহে, সাধারণে কার্য্যকরী।

শব্দ ব্যষ্টি ও সমষ্টিব্যাপী। ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত অথচ শীর্ষস্থানীয় নহে এরূপ তন্ত্রশাস্ত্রে শব্দের উৎপত্তির বর্ণনা

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

পাওয়া যায়। সেই উৎপত্তির চারিটি অবস্থা বা ভাব। প্রথমে একটি ভাব যাহার উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করা যায় না তাহা আসিয়া মনে আঘাত করে। এই ভাবের নাম পরা। তাহার পর সেই ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দের অনুসন্ধানের জন্য সচেষ্ট হয়। তাহার নাম পশ্যন্তী। অনন্তর শব্দ মনোগোচর হয় অথচ উচ্চারিত হয় না। ইহার নাম মধ্যমা। শেষ অবস্থায় শব্দ উচ্চারিত হইয়া কর্ণগোচর হয়। ইহার নাম বৈখরী। এই হইল শব্দের ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত ভাব। এখন শব্দের সমষ্টি বা সর্ব্বব্যাপী ভাব বিচার্য্য। সমষ্টিভাবে শব্দের নাম শব্দব্রহ্ম। কাণ্যকুব্জ-বাসী লক্ষ্ণাচার্য্যকৃত সারদাতিলক নামক বিখ্যাত তান্ত্রিক নিবন্ধ গ্রন্থে শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে তান্ত্রিক উপদেশের সংক্ষিপ্ত সার পাওয়া যায়। যথা—

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥

বুদ্ধিগ্রাহ্য চেতন ভাবের পরাকাষ্ঠা অথচ সৃষ্টির সাক্ষাৎ কারণ নাদ। সৃষ্টিপ্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাতে নাদের পর বুদ্ধিতে উঠে বিন্দু বা Determining point বা ধারণা-যোগ্য বিশেষতঃ যাহার সংস্কৃত নাম উপাধি, যাহাকেই পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে বলে accident।

নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে কথাটি আরও পরিষ্কার রূপে পাওয়া যায়। যথা—

বিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মা বরোভবৎ।
শব্দ ব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥
শব্দ ব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ।
নহি তেষাং তয়োঃসিদ্ধি জড়ত্বাদুভয়োরপি।
চৈতন্যাং সর্ব্বভূতানাং শব্দ ব্রহ্মেতি মে মতিঃ॥

অর্থশূন্য শব্দ যাহার বিশেষ নাম ধ্বনি তাহাই শব্দ ব্রহ্ম অথবা তাহার অর্থ যাহার পাণিনি সম্প্রদায়ে প্রচলিত নাম স্ফোট এই দুই মত পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণাচার্য্য নিজের মত স্থাপন করিতেছেন যে "চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দ ব্রহ্মেতি মে মতিঃ।" শব্দ ব্রহ্মের সার্ব্বভৌমত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উঠিলে যোহন লিখিত সুসমাচারের কথাগুলি দ্রষ্টব্য। যথা—

"আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাহার মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের মধ্যে জ্যোতি ছিল আর সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দিতেছে। আর অন্ধকার তাহা গ্রহণ করিল না।" *

পূর্ব্বোক্ত কতকগুলি কথা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, ইহাতে শব্দের সহিত বিজ্ঞানসম্মত ক্রমবিকাশ (Organic Evolution) কি সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য! এখন বিচারের বিষয় হইতেছে কি? জীব-জগতে প্রাপ্ত ধ্বনি হইতে ভিন্ন যে মানুষের শব্দ তাহার অভাবের দ্বারা ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তের সূচনা হয়। ধ্বনি হইতে শব্দের ভেদ ইহাতেই প্রত্যক্ষ যে প্রত্যেক ভাষায় শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ ছাড়িয়া দিলেও প্রতিশব্দের অভাব নাই। ধ্বনি আর শব্দের ভেদ ইহাতে কি সুস্পষ্ট নহে? জন্তুদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ধ্বনি প্রত্যক্ষগোচর। তাহাতে ভয় প্রভৃতির অভিব্যক্তিতে, ব্যক্তিগত ও সমবেত জীবনরক্ষার উপযোগিতা দেখা যায়। কিন্তু শব্দের উপযোগিতার ক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। হেতু, জাতি, সমবায়, সম্ভাবনা বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি ধারণা বা প্রকাশ বিনা শব্দে কি সম্ভবপর?

উচ্চ ধ্বনিতে দৈহিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ সম্ভবপর কিন্তু শব্দ ব্যতীত ভয়ের ভাব যাহা ভয়-জনিত শারীরিক বিপ্লব হইতে ভিন্ন তাহার প্রকাশ সম্ভবপর নহে। শব্দের এই বিশেষত্বের পাণিনি সম্প্রদায় গৃহীত নাম স্ফোট। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "গো"—শব্দ। এই শব্দের উচ্চারণমাত্র কেহ শাদা কেহ লাল কেহ পুষ্ট কেহ ক্ষীণ, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গো-জাতীয় মূর্ত্তি মনোগোচর হয়। মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও জাতির দৃষ্টিতে একই গো শব্দে সিংহ বা মনুষ্য কাহারও মনে উদিত হয় না। স্ফোট বা শব্দশক্তির প্রভাবে বর্ত্তমান দৃষ্টান্তস্থলে জাতি জ্ঞান হয়। যেরূপ মূর্ত্তি যাহার মনে উদয়

* বৃদ্ধ প্রয়োগ অনুসারে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া সংযুক্ত শব্দ সমষ্টির নাম "বাক্য"। এখানে "বাক্য" "শব্দ" এই অর্থে ব্যবহৃত

হউক না কেন শব্দার্থের প্রভাবে সেই মূর্ত্তিতে বোধ অনাবদ্ধ। বোধের স্থিতি মূর্ত্তি ছাড়িয়া জাতিতে। এই-রূপে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়ের অতীতভাব শব্দ ব্যতিরেকে মনোগোচর হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণীতে শব্দের অভাবে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হয় না—এইটিই ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব কি প্রকারে ইতর প্রাণী হইতে ক্রমশঃ মানুষে বিকশিত ইহা বৈজ্ঞানিকগণের বিচার্য্য। স্ফোট শব্দ ব্রহ্ম নহে যেহেতু শব্দব্রহ্ম চেতন, স্ফোট অচেতন। এই অর্থে লক্ষ্মণাচার্য্যের বাক্য যে,

শব্দ ব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ।
নহি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধি জড়ত্বাদুভয়োরপি॥
চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দ ব্রহ্মেতি মে মতিঃ॥

বিষয় ভেদবশতঃ বিজ্ঞান ও পারমার্থিক উপদেশের অধিকার ভিন্ন। এজন্য উভয়ের মধ্যে বুদ্ধিসম্মত বিবাদ অসম্ভব। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে "স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২০।২৬।

বন্ধু

হুমায়ুন কবির

বন্ধু তোমারে আমি যদি ভালবাসি,
তুমি যদি মোরে ভালবাস প্রতিদানে,
জীবনে আমার ঝলিবে আলোক হাসি
ভুবন আমার ভরিয়া উঠিবে গানে!
জীবনের পথে সাথী হবে তুমি মম
নয়নে ধরণী ভাসিবে স্বপনসম।
আর কারো তাতে কিবা কহিবার আছে,
তুমি যদি আসি' দাঁড়াও প্রাণের কাছে?

ভালবাসা যদি এ জীবনে কোনদিন
মুকুটের মত শিরে মোর নাহি ঝলে,
সুখহারা পথে তব প্রেমআলোহীন
হৃদয় বহিয়া চলিব নয়ন জলে!
স্বপন রচিয়া ভুলাব আপন হিয়া,
আপনার মনে মানস প্রতিমা নিয়া,
রচিব স্বর্ণ মন্দির তব লাগি'
সেথা তুমি রবে দিবস রজনী জাগি'!

'প্রতিদান কেন নাহি মিলে ভালবাসি'?
তোমার হৃদয় আমার পরাণ দিয়া!
হাসির বদলে কেন নাহি মিলে হাসি?
—বেদনায় সারা হিয়া ওঠে গুমরিয়া!
সকল ভুবন শূন্য তোমার লাগি',
দীর্ঘ রজনী তোমারে স্মরিয়া জাগি',
চারি পাশে যত হাসি, আলো, কথা, গান,
তোমার বিরহে সবি হোল অবসান!

কতজনে আসি' মুখপানে চেয়ে হাসে
আমার হৃদয় দেয়নাক কোন সাড়া;
কেহ ফিরে যায়, আঁখি জলে বুক ভাসে।
আমি পথে পথে ঘুরে মরি সাথীহারা!
বাদল আঁধার সজল ব্যাকুলতর,
কান্নায় ভরা তরুশাখামর্ম্মর,
তপনবিহীন গগনে ঘনায় ছায়া,
হৃদয়ে ঘনায় অশ্রু-সঘন মায়া!

হাসি

শিল্পী—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

১২

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানের পেঁপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোনা গর্ত্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিকোণে কলার ছোট বোগ্ পুঁতিয়া ধারে ধারে পিটুলি-গোলার আল্পনা দিতেছে—পদ্মলতা, পাখী, ধানের শিষ্, নতুন-ওঠা সূর্য্য।

দুর্গা বলিল,—দাঁড়া, এই মন্তরটা ব'লে নিয়ে চল্ এক জায়গায় যাবো।

—কোথায় রে, দিদি—

—চল্ না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন—পরে আনুষঙ্গিক বিধিঅনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে দুকুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী
ভাই বোন্ ভাগ্যবতী—

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল,—বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল—ইঃ!

দুর্গা ছড়া থামাইয়া ঈষৎ লজ্জা মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল—তুই ওরকম কচ্চিস্ কেন? যা এখান থেকে—তোর এখানে কি?—যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

আমি সতী লীলাবতী
ভাই বোন্ ভাগ্যবতী
হি হি—ভাই বোন্ ভাগ্যবতী—হি হি—

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না? মাকে ব'লে তোমার ভ্যাংচানো বার করবো এখন—

অপু সত্যসত্যই ভ্যাংচায় নাই—নতুন ধরণের বলিয়া মনে হওয়ায় সে ছড়ার পদটা বার বার আবৃত্তি করিয়া কবিত্ব-রস-মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করিতেছিল মাত্র। বলিল, বা রে, ভ্যাংচালাম বুঝি? আমি তো মুখস্ত করচি।

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল্ গড়ের পুকুরে অনেক পান্‌ফল হ'য়ে আছে—ভোঁদার মা বল্‌ছিল, চল্ নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বাঁশবন ও আগাছায় এবং প্রাচীন আমকাঁটালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর

বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোন্‌কালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এই খাতটাতে বার মাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর। মজুমদারের বাড়ীর কোনো চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল—অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি ভাখ্‌তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে টেনে আন্‌বো। পরে সে পুকুরধারের ঝোঁপের শেওড়া গাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল—ও দিদি, ও ফল খাস্‌নি।—দূর্—আশ্‌শেওড়ার ফল কি খায় রে? ও তো পাখীতে খায়—

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল—আয় দিকি—ভাখ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড়—কে বলেচে খায় না? আমি তো ক-ত খেইচি!

অপু কঞ্চি-কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল—খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি—

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—এটু এটু তেতো যে দিদি?

—তা এটু তেতো থাক্‌বে না? তা থাক্, কিন্তু কেমন মিষ্টি বল্ দিকি—কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুসির সহিত গোটাকতক বড় বড় পাকাফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্য্যন্ত ইহারা কখনো কোনো ভাল জিনিষ খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস বিশেষতঃ মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এইসব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালক বালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল—কত লাল ফুল রয়েছে অপু? দাঁড়া তুল্‌চি। জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল—ডাঙ্গায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—ধর্ অপু। অপু বলিল—পানফল তো খুব জলে—ওখানে কি ক'রে যাবি দিদি? দুর্গা একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলা টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। বলিল—বড্ড গড়ানো পুকুর রে—গড়িয়ে যাচ্চি ডুব জলে—নাগাল পাই কি ক'রে? তুই এক কাজ কর্, পেছন থেকে আমার আঁচল ধ'রে টেনে রাখ্ দিকি আমি কঞ্চি দিয়ে পানফলের ঐ ঝাঁকটা টেনে আনি—

বনের মধ্যে হল্‌দে কি একটা পাখী ময়নাকাঁটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া পাতা নাচাইয়া ভারী চমৎকার শিষ্ দিতেছিল। অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কি পাখী রে দিদি?

—পাখী টাখী এখন থাক্—ধর্ দিকি বেশ ক'রে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে যাবো—জোর ক'রে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড় চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না—আরও একটু খানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল। অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু তখনই সাম্‌লাইয়া হাসিয়া বলিল—দূর্, তুই যদি কোনো কাজের ছেলে—ধর্ ফের্। অতিকষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলা পানফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙ্গায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর্‌তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল—খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির ঝুঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল—পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গা হাসিয়া বলিল, দূর্—

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুর প্রান্তের নির্জ্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল—এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে? গাবের ঢেঁকি কোথাকার!

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শেওড়া বনের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি ছাখ্, কি রে? পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটী খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে? পরে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটী খুঁড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটী মুছিয়া সাফ্ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল—ছাখ্ দিদি চক্‌চক্ কচ্ছে—কি জিনিষ রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমত ধারওয়ালা ছুঁচালো-মত চক্‌চকে কি একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার রুক্ষ চুলে ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; চুপি চুপি বলিল—অপু এটা বোধ হয় হীরে—চুপ্ কর, চেঁচাসনে। পরে সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা—যদিও তাহার এ আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নাই।

অপু দিদির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে,—মায়ের মুখে, দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু হীরা জিনিষটা কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিমের মত, হল্‌দে হল্‌দে, তবে নরম নয়—শক্ত।

সর্ব্বজয়া বাড়ী ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলেমেয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপি চুপি বলিল—মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা—গড়ের পুকুরে পান্‌ফল তুল্‌তে গিইছিলাম মা—সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল।

অপু বলিল—আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—ছাখো দিকি কি এটা মা? সর্ব্বজয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপি চুপি বলিল—মা, এটা ঠিক হীরে নয়? সর্ব্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা অপুর অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা করিল—তুই কি ক'রে জান্‌লি হীরে? দুর্গা বলিল—মজুমদারেরা বড় লোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল পিসি গল্প করতো—এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রদ্দুর লেগে চক্‌চক্ কচ্ছিল—এ ঠিক মা হীরে।

সর্ব্বজয়া বলিল—উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

দুর্গা বাহির উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল—হীরে যদি হয় তবে দেখিস্ আমরা বড় মানুষ হ'য়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মত হি হি করিয়া হাসিল।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্ব্বজয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। গোলমত, ধারকাটা ও পলতোলা, এক মুখ ছুঁচালো—যেন সিন্দুর-কৌটার ঢাক্‌নির উপরটা। বেশ চক্‌চকে। সর্ব্বজয়ার মনে হইল যে, অনেক রকম রং সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। তবে কাচ যে নয় ইহা ঠিক। এ রকম ধরণের কাচ সে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। হঠাৎ তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল—তাহার মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল—সত্যই যদি হীরে হয়, তা' হোলে?

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরশপাথর কিম্বা সাপের মাথার মণি জাতীয় ছিল। কাহিনীর কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না—আর যদি বা দেখা যায়, তবে দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য বোধ হয় একটুকুরা হীরার বদলে পাওয়া যাইতে পারে।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ী ঢুকিয়া বলিল—বিলে জাল ফেলেচে—আমাদের গাঁয়ের জেলেরাও সব আছে—বল্লাম, দে বাবুরাম, গোটাকতক বড় বড় দেখে, তাই এই কটা দিলে।

সর্ব্বজয়া বলিল—ওগো শোনো এদিকে এসো তো? ছাখো তো এটা কি?

হরিহর হাতে লইয়া বলিল—কোথায় পেলে?

—দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পান্‌ফল তুল্‌তে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েচে— কি বল দিকি?

হরিহর খানিকক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—কাচ না হয় পাথর টাথর হবে—এতটুকু জিনিস ঠিক বুঝ্‌তে পারচি নে—দেখি?

সর্ব্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল—কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না? পরে সে চুপি চুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধ যুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল—হীরে নয় তো? দুগ্‌গা বলছিল মজুমদার বাড়ীর গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েচে! যদি হীরে হয়?

—হ্যাঁঃ—হীরে যদি পথে ঘাটে পাওয়া যেতো তবে ভাবনা কি ছিল? তুমিও যেমন! তাহার মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল হয়তো হইতেও পারে! বলা যায় কি! মজুমদারেরা বড় লোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়তো তাহাদেরই গহনায় টহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কি করিয়া মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে। কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মত ঘটিবে?···দেবতারা দয়া করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের পথের উপর মোহরের পুঁটুলি রাখিয়া দিলেন ঠিক সেই স্থানটীতে আসিয়াই ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হইল—আচ্ছা, অন্ধেরা কি করিয়া পথ হাঁটে একবার দেখি তো? সখ্‌ করিয়া চোখ বুজিয়া হাঁটিয়া ব্রাহ্মণ মোহরের পুঁটুলি পার হইয়া গেল—টেরও পাইল না।

সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলীবাড়ী দেখিয়ে আসি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্ব্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল—দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়—এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ী আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—বাবা এখনও বাড়ী ফেরে নি, হ্যাঁ মা? বাবা দেখে বল্লে কি হীরে?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বলিল—হুঁঃ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই সত্যবাবু কল্‌কাতা থেকে এসেচেন—তিনি দেখে বল্লেন, এ একরকম বেলোয়ারী কাচ—ঝাড় লণ্ঠনে ঝুলোনো থাকে, তবে সেকেলে জিনিস দেখ্‌তে বেশ ভাল গড়ন। এই—হীরেও নাঃ ফিরেও নাঃ—রেখে দাও বাবা অপু—খেলা কোরো—রাস্তাঘাটে যদি হীরে জহরৎ পাওয়া যেত, তা' হোলে— তুমিও যেমন!

১৩

বৈশাখ মাসের দিন। প্রায় দুপুর বেলা।

সর্ব্বজয়া বাট্‌না বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের সাজিতে (অনেক দিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) কি খুঁজিতে গিয়া বলিল—আবার জিরে মরিচের পুঁটুলিটা কোথায় নিয়ে পালালি? কত জ্বালাতন কচ্ছিস্‌ অপু—রাঁধতে দিবিনে? তারপর একটু পরেই বোলো এখন—মা খিদে পেয়েচে!

অপুর দেখা নাই।

—দিয়ে যা বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার—কেন জ্বালাচ্ছিস্‌ বল্‌ দিকি?—দেখ্‌চিস্‌ বেলা হ'য়ে যাচ্ছে?

অপু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দুয়ারের পাশ দিয়া ঈষৎ উঁকি মারিল—মায়ের চোখ সেদিকে পড়িতেই তাহার দুষ্টুমির হাসি ভরা টুক্‌টুকে মুখখানা শামুকের খোলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মত তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সর্ব্বজয়া বলিল—ছাখ দিকি কাণ্ড—কেন বাপ দিক্‌ করিস্‌ দুপুর বেলা? দিয়ে যা—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপু পুনরায় হাসিমুখে ঈষৎ উঁকি মারিল।

—ঐ আমি দেখ্‌তে পেয়েচি—আর লুকুতে হবে না—দিয়ে—

হি-হি-হি—আমোদের হাসি হাসিয়া সে আবার দুয়ারের আড়ালে মুখ লুকাইল।

সর্ব্বজয়া ছেলেকে ভালরূপেই চিনিত। যখন অপু ছোট্ট খোকা, দেড় বছরেরটি, তখন দেখিতে সে এখনকার চেয়েও টুকটুকে ফর্সা ছিল। সর্ব্বজয়ার মনে আছে সে তাহার ডাগর চোখ দুটীতে বেশ করিয়া কাজল পরাইয়া কপালের মাঝখানে একটী টিপ্‌ পরাইয়া দিত ও তাহার মাথায় একটা নীল রংএর কম দামের ঘুন্টি ওয়ালা পশমের টুপি পরাইয়া কোলে করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুর টানিয়া টানিয়া বলিত—

আয়রে পাখী—ঈ—ঈ—ঈ লেজ্‌ঝোলা—

আমার খোকারে নিয়ে—এ—এ—এ গাছে তোলা—

টাপা টাপা ফুলা ফুলা গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত—পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ অকারণে দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মল-পরা অসম্ভবরূপ ছোট্ট ছোট্ট পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত। সর্ব্বজয়া হাসিমুখে বলিত—ওমা, খোকা আবার কোথায় লুকুলো—তাইতো দেখ্‌তে তো পাচ্ছিনে—ও খোকা? পরে সে ঘরের দিকে মুখ ফিরাইতেই শিশু আবার হাসিয়া মুখ সাম্‌নের দিকে ফিরাইত এবং নির্ব্বোধের মত হাসিয়া মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইত। যতই সর্ব্বজয়া বলিত—ওমা তাইত—কৈ আমার খোকা কৈ—আবার কোথায় গেলো—কৈ দেখি? ততই শিশুর খেলা চলিত। বার বার সাম্‌নে পিছনে ফিরিয়া সর্ব্বজয়ার ঘাড় ব্যথা হইলেও শিশুর খেলার বিরাম হইত না। সে তখন একেবারে আন্‌কোরা, টাট্‌কা, নতুন সংসারে আসিয়াছে—জগতের অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডারের এক অণুর সন্ধান পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেইটাকে লইয়াই লোভীর মত বার বার আস্বাদ করিয়াও সাধ মিটাইতে পারিতেছে না—তখন তাহাকে থামায় এমন সাধ্য তাহার মায়ের কোথায়?—খানিকক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে তাহার ক্ষুদ্র শরীরের শক্তির ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিত, সে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া হাই তুলিতে থাকিত—সর্ব্বজয়া ছোট্ট হাঁ-টীর সাম্‌নে তুড়ি দিয়া বলিত—ষাট্‌, ষাট্‌—এই দ্যাখো দেয়ালা ক'রে ক'রে এইবার বাছার আমার ঘুম আস্‌চে। পরে সে মুগ্ধ নয়নে শিশুপুত্রের টিপ্‌ কাজলপরা কচি মুখের দিকে চাহিয়া বলিত—কত রঙ্গই জানে সন্‌কু আমার—তবুও তো এই ষাঠের দেড় বছরের, হঠাৎ সে আকুল চুম্বনে খোকার রাঙ্গা গালদুটী ভরাইয়া ফেলিত; কিন্তু মায়ের এ গাঢ় আদরের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই শিশুর নিদ্রাতুর আঁখি-পাতা ঢুলিয়া আসিত—সর্ব্বজয়া খোকার মাথাটা আস্তে আস্তে নিজের কাঁধে রাখিয়া বলিত—ওমা সন্দেবেলা দ্যাখো ঘুমিয়ে পড়লো—এই ভাব্‌চি সন্দেটা উৎরুলে দুধ খাইয়ে তবে ঘুম পাড়াবো—দ্যাখো কাণ্ড।

সর্ব্বজয়া জানিত ছেলে আট বছরের হইলে কি হইবে, সেই ছেলেবেলাকার মত মায়ের সহিত লুকাচুরী খেলিবার সাধ তাহার এখনও মিটে নাই। এমন সব স্থানে সে লুকায় যেখান হইতে অন্ধও তাহাকে বাহির করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজয়া দেখিয়াও দেখে না—ছেলেকে আমোদ দিবার জন্য এক জায়গায় বসিয়াই এদিকে ওদিকে চায়, বলে—তাই তো? কোথায় গেল? দেখ্‌তে তো পাচ্ছিনে।...অপু ভাবে মাকে কেমন ঠকাইতে পারা যায়! মায়ের সহিত এ খেলা করিয়া মজা আছে, দিদির সঙ্গে কিন্তু এ খেলা মোটে জমে না—সে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিল—দিদি গিয়া দরজার পাশ হইতে, হাঁড়ি কলসীর পিছন হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করে।

সর্ব্বজয়া আরও জানিত যে খেলায় যোগ দিবার ভাণ করিলে এইরূপ সারাদিনই চলিতে পারে—কাজেই সে ধমক দিয়া কহিল—তা হোলে কিন্তু থাক্‌লো প'ড়ে রান্নাবান্না, অপু, তুমি ঐ রকম করো, খেতে চাইলে তখন দেখ্‌বে মজাটা। অপু হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটুলি মায়ের সাম্‌নে রাখিয়া দিল।

তাহার মা বলিল—যা একটু খেলা করগে যা বাইরে—দেখ্‌গে যা দিকি তোর দিদি কোথায় আছে? গাবতলায়

দাঁড়িয়ে একটু হাঁক দিয়ে ছাখ্ দিকি? তার আজ নাইবার দিন· হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওয়ার যো কি? যা তো? লক্ষ্মী ছেলে—

কিন্তু এখানে মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া সুপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহার দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটারত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

—হু-উ-উ-উ-উম্—

সর্ব্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্য চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট্ আনিয়া মুড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

—ছাখো ছাখো,ছেলের কাণ্ড ছাখো একবার—ও লক্ষি-ছাড়া, ওতে যে সাত রাজ্যির ধূলো—ফ্যাল্ ফ্যাল্ -সাপ মাকড় আছে না কি আছে ওর মধ্যে—আজ কদ্দিন থেকে তোলা রয়েছে।

—হু-উ-উ-উ-উম্—(পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর সুরে)

—নাঃ, বল্লে যদি কথা শোনে—বাবা আমার, সোনা আমার, ওখানা ফ্যাল্। আমার বাটনার হাত—দুষ্টুমি কোরো না, ছিঃ।

থলে-মোড়া মূর্ত্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দু কদম আগাইয়া আসিল। সর্ব্বজয়া বলিল—ছুঁবি ছুঁবি—ছুঁওনা মাণিক আমার—ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঠ হ'য়ে গিইচি—ভারী ভয় হয়েচে আমার—

অপু হিহি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল, মুখ, চোখের ভুরু, কান ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে, মুখ কাঁচু মাঁচু করিয়া সে সাম্‌নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত জোরে জোরে চাপিয়া দেখিতে লাগিল—ধূলায় কি পরিমাণ দাঁত কিচ্ কিচ্ করিতেছে।

—ওমা আমার কি হবে! হাঁরে হতভাগা, ধূলো মেখে যে একেবারে ভূত সেজেচিস্? উঃ—ওই পুরোনো থলেটার ধূলো! একেবারে পাগল!

ধূলা যে একটু আশাতিরিক্ত রূপেই লাগিয়াছে, তাহা অপুর কাঁচুমাঁচু মুখ দেখিয়াই অনুমান করা যাইতেছিল। সে খাপছাড়া ভাবে মাথায় মুখে হাত দিয়া ধূলা ঝাড়িবার অনিপুণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ধূলিধূসরিত অবোধ পুত্রের প্রতি করুণা ও মমতায় সর্ব্বজয়ার বুক ভরিয়া আসিল, কিন্তু অপুর পরণে বাসি কাপড়—নাইয়া ধুইয়া ছোঁয়া চলে না বলিয়া বলিল—ঐ গাম্‌ছাখানা নে—ঐ দিয়ে চুলগুলো আগে ঝেড়ে ফ্যাল্—ছেলে যেন কি একটা—

খানিকটা পরে ছেলেকে রান্নাঘরে পাহারার জন্য বসাইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যাইতেছে, দরজার কাছে দুর্গা বাড়ি ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উস্‌কো খুস্‌কো অথচ ধূলোমাখা পায়ে আল্‌তা পরা। একেবারে মায়ের সাম্‌নে পড়াতে আঁচলে বাঁধা আম দেখাইয়া ঢোক গিলিয়া কহিল—এই পুণ্যিপুকুরের জন্যে ছোলার গাছ আন্‌তে গেলাম রাজীদের বাড়ী, আম পেড়ে এনেচে, ভাগ হচ্চে, তাই রাজীর পিসিমা দিলে—

—আহা, মেয়ের দশা ছাখো, গায়ে খড়ি উড়্‌চে, মাথার চুল দেখ্‌লে গায়ে জ্বর আসে—পুণ্যিপুকুরের জন্যে ভেবে তো তোমার রাত্তিরে ঘুম নেই। পরে মেয়ের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল—ফের্ বুঝি লক্ষ্মীর চুব্‌ড়ি থেকে আল্‌তা বের ক'রে পরা হয়েচে?

দুর্গা আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া উস্‌কো খুস্‌কো চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল—লক্ষ্মীর চুব্‌ড়ির আল্‌তা বৈকি? আমি সেদিন হাটে বাবাকে দিয়ে আল্‌তা আনালাম এক পয়সার, তার দরুণ দুপাতা আল্‌তা আমার পুতুলের বাক্সে ছিল না বুঝি?

হরিহর কল্‌কে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আগুন লইতে আসিল।

সর্ব্বজয়া বলিল—ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোমাকে আগুন দিই কোথা থেকে? সুঁদরী কাঠের বন্দোবস্ত ক'রে রেখেচো কিনা একেবারে? বাঁশের চেলার আগুন থাকে কতক্ষণ যে আবার ঘড়ি ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন যোগাবো?··· পরে আগুন তুলিবার জন্য রক্ষিত একটা ভাঙা পিতলের হাতাতে খানিকটা আগুন উঠাইয়া বিরক্তমুখে সাম্‌নে ধরিল। সুর নরম করিয়া বলিল—কি হোল?

—এক রকম ছিল তো সবই ঠিক, বাড়ীশুদ্ধ সবাই মন্তর নেবার কথাই হয়েছিল—কিন্তু একটু মুস্কিল হ'য়ে যাচ্চে। মহেশ বিশ্বেসের শ্বশুরবাড়ীর শিষ্য আশ্রয় নিয়ে কি গোল-

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাল বেঁধেচে, বিশ্বেস্ মশায় গিয়েচে সেখানে চ'লে—সেই আসল মালিক কিনা। তাই আবার একটু পিছিয়ে গেল—আবার এদিকেও তো অকাল পড়্চে—আষাঢ় মাস থেকে।

—আর সেই যে বাসের জায়গা দেবে—বাস করাবে বলেছিল তার কি হোল ?

—কথা তো ছিল ঠিকই, আপাতোক বিঘে দুই জমি দেবে, বাড়ী বাঁধবার বাঁশ খড় সব তারা দেবে—কিন্তু এই নিয়ে একটু মুস্কিল বেঁধে গেল কিনা। ধর যদি মন্তর নেওয়া পিছিয়ে যায়, তবে ও কথা আর কি ক'রে ওঠাই ?

সর্ব্বজয়া খুব আশায় আশায় ছিল, সংবাদ শুনিয়া আশা-ভঙ্গ হইয়া পড়িল। বলিল, তা ওখানে না হয়, অন্য কোনো জায়গায় দেখো না ?—তোমার তো কত জায়গায়—এখান থেকে যত শিগ্‌গির হয়ে গেলেই সুবিধে। বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোঁছে ? এই ছাখো আম কাঁটালের সময়, একটা আম কাঁটাল ঘরে নেই—মেয়েটা কোত্থেকে দুটো আধ-পচা আম নিয়ে এসে রেখে দিয়েচে। পরে সে উদ্দেশে বাড়ীর পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—এই ঘরের দোর থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি আম পেড়ে নিয়ে যায়—আমার বাছারা চেয়ে চেয়ে ছাখে—এ কি কম কষ্ট ?

বাগানের কথার উল্লেখে হরিহর কহিল—উঃ, কম ধড়ি-বাজ নাকি ? বছরে পঁচিশ টাকা খাজনা ফেলে ঝেলে হোতো, তাই কিনা লিখে নিলে পাঁচ টাকায়! আমি গিয়ে এত ক'রে বল্লাম, কাকা, আমার ছেলেটা মেয়েটা আছে, ঐ বাগানেই আম জাম কুড়িয়ে মানুষ হচ্চে; আমার তো আর কোথাও কিছু নেই, আর ধরুন আমাদেরই জ্ঞাতির বাগান—আপনার তো ঈশ্বর ইচ্ছেয় কোন অভাব নেই, দুটো অত বড় বাগান রয়েচে, নারকেল সুপুরি—আপনার অভাব কি ? বাগানখানা গিয়ে ছেড়ে দিন গে যান্—তা বল্লে কি জানো ? বল্লে, নীলমণিদাদা বেঁচে থাকতে ওঁর কাছে নাকি তিনশো টাকা ধার করেছিল, তাই অমনি ক'রে শেষ ক'রে নিলে—শোনো কথা! নীলমণিদাদার বড্ড অভাব ছিল কিনা তাই তিনশো টাকার জন্যে গিয়েচে ভুবন মুখুয্যের কাছে হাত পাত্‌তে! বৌদিদিকে ভাল মানুষ পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে আর কি ?

—ভাল মানুষ তো কত ? সেও নাকি বলেচে যে, জ্ঞাতি-শত্তুর,—এখানে তো বাস করবো না, বাপের বাড়িতে যখন গিয়ে থাক্‌তে হবে তখন ওদের হাতে বাগান থাক্‌লে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না—ফল পাকড় এম্‌নিই খাবে, তার চেয়ে কিছু কম জমাতেও যদি বন্দোবস্ত হয়, খাজ্‌নাটা তো পাওয়া যাবে ?

হরিহর বলিল—খাজনা কি আর আমি দিতাম না ? বাগান জমা দেবে তাই কি আমায় জান্‌তে দিলে ? বৌ-দিদিকে ঘি মোহনভোগ খাইয়ে হাত ক'রে চুপিচুপি লিখিয়ে নিলে।

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতেই মেঘ মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ীর সাম্‌নের বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলা পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হঠিয়া ওধারে পড়াতে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধূলা, বাঁশপাতা, কাঁটাল পাতা, খড় চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল—অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—শীগ্‌গির ছোট্—তুই বরং সিঁদুরকৌটো তলায় থাক্—আমি যাই সোনামুখীতলায়—দৌড়ো—দৌড়ো। ধূলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া নেড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে—বাগানে শুক্‌না ডাল-কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুক্‌না বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়ার মত পালক-ওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না!

সোনামুখি তলায় পৌছিয়াই অপু মহা উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়্‌লো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি—চীৎকার যতটা করিতে লাগিল—তাহার অনুপাতে সে

আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদি বা শোনা যায় ঠিক কোন্ জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল; অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুটা। তাহাই সে খুসির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই ত্যাখ্ দিদি—কত বড় ত্যাখ্—ঐ একটা পড়লো—ওই ওদিকে —।

এমন সময় হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলে মেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গা-দি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখীতলায় পৌঁছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েছো? ..পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখিচিস্ টুনু?—যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গা-দি—মাকে গিয়ে নৈলে বোলে দেবো।

রানু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস্ সতু? ওরাও কুড়ুক্—আমরাও কুড়ুই।

—কুড়ুবে বই কি? ও এখানে থাক্‌লে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আস্‌বে ও? না, যাও দুগ্‌গা-দি—আমাদের তলায় থাক্‌তে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না—কিন্তু সেদিন ইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয়রে চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু—এখানে থাক্‌তে না দিলে, না দিলে—বুঝলি তো?—এখানকার চেয়েও বড় বড় আম—তুই আমি মজা ক'রে কুড়োবো এখন—চ'লে আয়। এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃত পক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল। রানু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারী হিংসুক কিন্তু সতু দা? রানুর মনে দুর্গার চোখের ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন্ জায়গায় বড় বড় আম রে দিদি? পুঁটুদের সল্‌তে-খাগী তলায়? কোন্ তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে—চল্-। সেই গড়ের পুকুর যেখানে একবার দুর্গা হীরক কুড়াইয়া পাইয়াছিল—এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়ি পথে অনবরত বন বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়। অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁটালের গাছ—গাছ তলায় বন-চাল্‌তা, ময়না-কাঁটা, যাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল—দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মত মোটা মোটা অনেক কালের পুরানো গুলঞ্চ-লতা এগাছে ওগাছে দুলিতেছে—বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোঁপ জঙ্গল খুঁজিয়া তলায়-পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই। তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড় কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভাল দেখা যায় না। তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বিষ্টি এল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটীর সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—এবং একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া চারিদিকের গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এইখানে বিষ্টি পড়্‌বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাট্‌কা ভিজা মাটীর গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল—দুর্গা যে গাছ-তলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পূবে হাওয়ার ঝাপ্‌টা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ী হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি—বড্ড যে বিষ্টি এল!

তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধ'রে গেল ব'লে—বিষ্টি হোলো ভালই হোলো—আমরা আবার সোনামুখীতলায় যাবো এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতা করম্‌চা,
হে বিষ্টি ধ'রে যা—

কড়্—কড়্—কড়াৎ—প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক্ হইতে ওদিক্ পর্য্যন্ত চিরিয়া গেল—চোখের পলকের জন্য চারিধার আলো হইয়া উঠিল—সাম্‌নের গাছের মগ্‌ডালে থোলো থোলো বন-ধুঁদুঁল ফল ঝড়ে দুলিতেছে!—অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি।

ভয় কিরে?…রাম রাম বল্—রাম রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করম্‌চা—হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—

বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুম্-গুম্-গুম্-ম্-ম্—চাপা, গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল লোহার রুল কে যেন আকাশের ধাতব মেজেতে এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে—অপু শঙ্কিত সুরে বলিল—ঐ দিদি, আবার—

—ভয় নেই, ভয় কি?—আর একটু স'রে আয়—এঃ, তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুব্‌ড়ি হ'য়ে গিয়েচে—

চারি ধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টি পতনের হুস্-স্-স্-স্ একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দম্‌কা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও, বোঁ ও-ও-ও-ও রব, ডাল পালার ঝাপটের শব্দ, মেঘের ডাক—কানে তালা ধরিয়া যায়! এক একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি!

অপু বলিল—দিদি বিষ্টি যদি আর না থামে!

হঠাৎ ঝটিকাক্ষুব্ধ অন্ধকার আকাশের এ প্রান্ত হইতে লক্‌লকে আলোর জিহ্বা মেলিয়া, বিদ্রূপের বিকট অট্ট-হাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

কড়্-কড়্-কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিরিয়া ফাঁড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্তার মাঝখানে ধরা-পড়া দুই অসহায় বালকবালিকার চোখ ঝল্‌সাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল!

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,—বাজ পড়িতেছে না কি?—গাছের মাথায় বনধুঁদুলের ফল দুলিতেছে।

সেই বড় লোহার রুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুর ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা—হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশী বিলম্ব নাই। ঝড় বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্ব্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্ব্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁা মা, দুগ্‌গা আর অপুকে দেখিচিস্ ও দিকে? আশালতা বলিল—না খুড়ীমা, দেখিনি তো? কোথায় গিয়েচে?

—সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই ব'লে, আর তো ফেরেনি—এই ঝড় বিষ্টি গেল, সন্ধে হোল, ও মা কোথায় গেল তবে?

সর্ব্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কী দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগ্‌লো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্ব্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্ত ভাত হইচিস্? কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়?—ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একবারে জুব্‌ড়ি! পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল্ কোথায় পেলি রে দুগ্‌গা?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ্ চুপ্ মা—সেজ জেঠীমা বাগানে যাচ্ছে—এই গেল—ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা? ওরই তলায় প'ড়ে ছিল। আমারাও বেরুচ্চি সেজ জেঠীমাও ঢুক্‌লো।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেচে—পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় প'ড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাই নি, সোনামুখীতলায় যদি আম প'ড়ে থাকে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগ্‌লোটা প'ড়ে রয়েচে। অপুকে বল্‌লাম—অপু, বাগ্‌লোটা নে—মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তার পরই দেখি,—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড় না, মা?

অপু খুসির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল—আমি অম্‌নি বাগ্‌লোটা নিয়ে ছুট্—

সর্ব্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকোল্‌টা। ছেঁচতলায় রেখে দে জল দিয়ে নোবো—

অপু অনুযোগের সুরে বলিল—তুমি বলো মা নারকোল্ নেই, নারকোল নেই—এই তো হোল নারকোল্। এইবার কিন্তু বড়া ক'রে দিতে হবে। আমি ছাড়্‌বো না—কখ্‌খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠাণ্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপ্‌টাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্ব্বজয়া বলিল—আয় সব কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্ সব—

খানিক পরে সর্ব্বজয়া কুয়ায় জল তুলিতে ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গেল। ভুবন মুখুয্যের খিড়্‌কী দোর পর্য্যন্ত যাইতেই সে শুনিল সেজঠাকুরুন বাড়ীর মধ্যে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিতেছেন—

—একটা মুঠো টাকা খরচ ক'রে তবে বাগান নেওয়া—মাগ্‌না তো নয়। তার ওেনোগাছটা—যদি হা'ঘরেদের জন্যে ঘরে ঢুক্‌বার যো আছে! ঐ ছুঁড়ীটা রাদ্দিন বাগানে ব'সে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুল্‌বে—এতে মাগীরও শিক্ষে আছে, ও মাগী কি কম নাকি?—ওমা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নারকোল্‌টা কুড়িয়ে নিয়ে একবার ড়ড়্ ড়ড়্ করে দোড়!—এত শত্তুরতা যেন ভগমান্ সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যান্, উচ্ছন্ন যান্—এই ভস্ সন্দে বেলা বল্‌চি, আর যেন নারকোল্ খেতে না হয়—একবার শাগ্‌গির যেন ছাতিমতলা সই হন—

সর্ব্বজয়া খিড়্‌কীর বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণ-সিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল যদি গালাগাল ওদের লাগে। বাবা যে লোক! দাঁতে বিষ আছে, কি করি! কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্ব্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুয্যে বাড়ী ঢুকিল না—আশশেওড়া বনে, বাঁশ-ঝাড়ের তলায় বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যায় জোনাকী জ্বলিতেছে, পা যেন আর উঠিতে চাহে না—ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বাল্‌তিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—যদি নারকোল্‌টা ওদের ফেরৎ দিই—তা' হলে কি গাল লাগ্‌বে? তা কেন লাগ্‌বে—যার জিনিস তাকে তো ফেরৎ দেওয়া হোল। তা কখনো লাগে? বাড়ী পা দিয়াই মেয়েকে বলিল—

দুগ্‌গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ী দিয়ে আয় গিয়ে। অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল—এখ্‌খুনি?

—হাঁ,—এখ্‌খুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়্‌কী দোর খোলা আছে। চট্‌ ক'রে যা। ব'লে আয় আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা? বড্ড অন্ধকার হয়েচে, চল্‌ অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্ব্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল্‌ ওরা শত্তুরতা ক'রে কুড়্‌তে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে বর্ত্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেও, দোহাই ঠাকুর।

১৪

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বে-পরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনোরূপে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু ওঠ্‌ শিগ্‌গির ক'রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট্‌। হাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আস্‌বেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্যনিদ্রোত্থিত চোখ দুটা তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্ট ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাই বোনেদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিকপরে সর্ব্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ্‌ অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমার অনেক ক'রে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব'সে ব'সে খেও এখন, ওঠো লক্ষী মাণিক! মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ। পরে সে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ্‌ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মার প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্‌খনো আর বাড়ী আস্‌চিনে দেখো!

—ষাট্‌ ষাট্‌, বাড়ী আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ—পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্বে হোক্‌, ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখো, তখন দেখ্‌বে তুমি কত বড় চাক্‌রী করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই, গুরু মশয় কিছু বল্‌বে না। ওগো তুমি গুরুমশয়কে ব'লে দিও, যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোকে বাড়ী নিয়ে যাবো অপু, ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি করোনা! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন,

কয়েকটী বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটী ছেলে (অপু জানে ছেলেটী ও পাড়ার নন্দী মশায়ের ছেলে কিন্তু নাম জানে না বা আলাপ নাই) দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া আপন মনে পাত-তাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটী বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, আর ছেলেটী বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে দ্রব্যাদি বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতে ছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরু মহাশয় হঠাৎ বলিলেন, এই ফণে, শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটী অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরু মহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই সতে, ফনের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো? তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শ্লেটে?—সতে, ধ'রে নিয়ে আয় তো দুজনকে? কান ধ'রে নিয়ে আয়।

যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যে ভাবে বিপন্নমুখে সাম্‌নের ছেলে দুটী পরে পরে গুরু মহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরু মহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাস্‌বে কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? হ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কি অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট্ নিয়ে এসো তো? তেঁতলা থেকে বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্য্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটীর জন্য। বয়স অল্প বলিয়া হউক বা নতুন ভর্ত্তি ছাত্র বলিয়াই হউক, গুরু মহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

সেই হইতে বছরখানেক অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সে প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় গিয়াছিল। পরে তথায় কিছু হইতেছে না দেখিয়া তাহাকে তাহার বাবা রাজুরায়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

রাজু রায়ের পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবশুদ্ধ আট দশটী ছেলে মেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে রাজু রায়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা, গরম রৌদ্র বাতাবীলেবু, গাব, ও পেয়ারাতলী আম গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালা ঘরের বাঁশের খুঁটীর পার আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ, রাজু রায়ের বাড়ীতেই এই পাঠশালা বসে, এই পাঠশালা ঘর ও আর একখানা ছোট্ট মাটীর ঘর ছাড়া তাহার বাড়ীতে আর কোনো ঘর নাই।

আট দশটী ছেলে মেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে রাজু গুরু মহাশয়ের গলা শুনা যায়,—"এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌চিস্? কান মলে ছিঁড়ে দেবো একেবারে!" "সুটু তোমার কবার নেতি ভিজুতে হবে? ফের্ যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচ—"

রাজু রায় একটা খুঁটী হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাইএর উপর বসিয়া থাকে। তাহার মাথার তেলে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশের খুঁটীর হেলান-দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তাহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথমে যৌবনে বাণিজ্য লক্ষ্মীর বাস স্মরণ করিয়া কি করিয়া আষাড়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অন্য চাকর ছিল না, সস্তায় গাছ তামাক কিনিয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া নিজে সেই সকল তামাক দা দিয়া কাটিতেন। তামাক বিক্রয় করিতে করিতে তাঁহার হাতের আঙুল হাজিয়া গিয়াছিল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া অনেক রাত্রে বেত্না নদীতে রোজ স্নান করিয়া আসিতেন, আলু ভাতে ও মাছের ঝোল রাঁধিয়া আহার করিয়া দুটা তিনটা রাত্রিতে তবে শুইতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। কেমন সুন্দর কাজ বেশ! কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়ীতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়ত মাঝে মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটীর প্রদীপের সাম্নে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া! বাইরে অন্ধকার বর্ষারাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ্ ডাকিতেছে, অপু আর ভাবিতে পারে না, সে অভিভূত হইয়া পড়ে। বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিত, ও গ্রামের ওপাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্নাল মহাশয় যে দিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক্ না কেন সেটী সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্নাল মহাশয় দেশ-ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতেন, খরচপত্র করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে সান্নাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশী আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্নাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল, না চন্দ্রনাথভ্রমণে গিয়াছেন। অনেক দিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুক্ ঠুক্ শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সান্নাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু সমান উঁচু বিছুটী ও অর্জ্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া রাজুরায়ের পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে রাজু, কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেচ, কটা মাছি পড়্লো?

নাম্তা মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্নাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট, বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখদুটী গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠীর মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্তাকুড়ির জোল বলে ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজ্রার ভাই চন্দর্ হাজ্রা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল হঠাৎ চন্দর্ হাজ্রা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ীর কানাগত মাটীর মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আনিয়া দেখে এক হাঁড়া সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর হাজ্রা দিনকত খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্নাল মশায়দের সাম্নে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট

হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়। সান্নাল মশায় নাম বলিলেন—"প্যাঁড়া"। নামটা শুনিয়া অপুর ভারী হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে "প্যাঁড়া" কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্নাল মশায় একটা কোন্ জায়গার গল্প করিতেছিলেন। কোন্ জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্নাল মশায় বার বার যে জিনিষটা দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছিলেন—"চিকা মস্‌জিদ"। 'চিকা মস্‌জিদ' কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝিয়াছিল একটা ভাঙ্গা পুরাণো বাড়ী। অন্ধকার প্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চাম্‌চিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে—চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল-জঙ্গল, কেউ কোথায় নাই, ভাঙ্গা পুরাণো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অম্‌নি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পালাইয়া গেল—রানুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরীর মত অন্ধকার ঘরটা।

কোন্ দেশে সান্নাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশথ্‌তলায় থাকিত। একছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুসি হইয়া বলিত—আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও ওখানে লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়ত আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে!

রাজুরায় বলিতেন—ও সব মন্তর তন্তরের খেলা আর কি? সে বার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙ্গার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখোচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখোচো। কাঠের দড়ী বাঁধা এক ধরণের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতেকামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আস্‌তো। একশ' বছর বয়েসে মারা যায়, মারাও গিয়েচে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়েসে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠ্‌তাম না। এক-বার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ কুড়ি বয়েস, চাকদা' থেকে গঙ্গাস্নান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফির্‌ছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম যে আজ কাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করেছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিল, তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়ে-মানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁ খানা বসেচে?—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন চারেক ষণ্ডামার্কোগোছের মিশ্‌কালো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ হুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে হুজন, ওদিকে হুজন। দেখে তো মশাই আমাদের তো মুখে আর রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধ'রে সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্ পিট্ ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইসারা ক'রে আমাদের কথা বল্‌তে বারণ ক'রে দিলে। বেশ, আছে। এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে—ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে—সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব—অনেক কাকুতি মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষণো এরকম আর করিস্‌নি! তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চ'লে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা! মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, অম্‌নি ধ'রেই রয়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্য নেই—চলেচে গাড়ীর সঙ্গে। একেবারে পেরেক আঁটা হ'য়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর্ তন্তরের কথা—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রুক্ষ রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁটাল গাছের, জলডুমুরগাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা ঘরে বনের লতাপাতার গন্ধের সঙ্গে, তালপাতার চাটাই, ছেঁড়াখুঁড়া বই দপ্তর পাঠশালার মাটির মেজের কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সব মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে, একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে, সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম, চিক্কণ, সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক্ ধরণের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে! গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধার ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশু মন থৈ পায় না!

ঐ যে বাগানের ওদিকের বাঁশবন—ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ও ধারে কোথায় চলিয়া গেল—তুমি বরাবর সোজা যদি ওপথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাঁখারী-পুকুরের পাড়ের বনের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে—বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে—কত মোহর-ভরা হাঁড়ী-কলসীর কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বন-ঝোপের নীচে, কটুওল ও বন-কলমীর চক্‌চকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায়।

কিন্তু এই যে তোমার মাথার উপর রায়ুদের বাগানের বেড়ার ঝুপসি গাছগুলা সন্ধ্যার ছায়ায় কালো হইয়া আছে, বাঁশঝাড়ের মগ্‌ডালে ফিঙে পাখী বসিয়াছে, এরাই কি কম? বিশেষ করিয়া এই বৈকালটায়, এসব অতি পরিচিত, দুবেলা দেখা-শুনার সঙ্গীদেরও যেন কতদূরের, কেমন রহস্যময় বলিয়া মনে হয়—ঐ বাঁশগাছের মগ্‌ডালটা?—ঐ হল্‌দে হল্‌দে ভেরেণ্ডা ফলের থোলোগুলি?—সে মুখে বুঝানো যায় না কি মনে হয়!

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোনো গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় রাজু গুরুমহাশয় বলিলেন—দেখি, শেলেট নেও শ্রুতিলিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরু মহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালির ছড়া মুখস্থ বলে তেম্‌নি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলা অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না কিন্তু অজানা শব্দও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার জড়ানো এ অপরিচিত, শব্দসঙ্গীত অনভ্যস্ত, শিশুকর্ণে অপূর্ব্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুণই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ সমষ্টীর পিছন হইতে একটা অপূর্ব্ব দেশের ছবি বার বার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। ইহার শিখর-দেশ আকাশ পথে সতত-সমীর-সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপ-সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়···পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া··········।

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়। সেই যে বছর দুই আগে কুঠীর মাঠে সরস্বতী পূজার দিন

নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দুধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তা ভাবিয়া সে কূল পায় না।

তাহার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিয়াছিল—ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর দশঘরা হ'য়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে।

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত, ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারতের দেশে।

সেই অশথ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে ওঠে—সেই বহুদূরের দেশটা।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই বছর আগে দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ পর্ব্বত! বন ঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যার সেই স্বপ্নমুলুকের ছবি তাহাকে অবাক্ করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ গিরির উন্নত শিখর, আকাশ পথে সতত সঞ্চরমান মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

সেদিনকার সন্ধ্যায় এক অশিক্ষিত গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালার কতকগুলি শব্দকে উপলক্ষ করিয়া যে গভীর, ভাবমহাসমুদ্রের নীলবেলার সঙ্গীত অস্পষ্ট ভাবে তাহার কাণে বাজিয়াছিল—তাহার জন্য সে গুরুমহাশয়ের কৃতিত্ব বেশী কিছু নাই, কৃতিত্ব প্রকৃতির, যে সব সময় পথে ঘাটে নিজের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ দেয়।

কিন্তু সে বেতসীকণ্টকিত তট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিলনা। বাল্মিকী বা ভবভূতি তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। পৃথিবীর কোথাও তাহার অস্তিত্ব ছিল না—থাকিবার সম্ভবও ছিল না। উদ্ভিদ্ বা বস্তুজগতের কোনো নিয়ম মানিয়া তাহাদের সৃষ্টি হয় নাই। মেঘের, বনের আকাশের বর্ণে তুলি ডুবাইয়া শিল্প বা বাস্তব জগতের সমস্ত নিয়ম বন্ধন অস্বীকার করিয়া কে বেপরোয়া খাড়া তুলি টানিয়া গিয়াছিল—বাস্তব জগতে তাহার অস্তিত্ব সম্ভব কোথায়?

কেবল অতীত দিনের কোনো ছায়াভরা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি পল্লীবালকের অপরিণত শিশু কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটী, অতি সুপরিচিত। পৃথিবী পৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশব মনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ পর্ব্বত তাহার সতত সঞ্চরমান মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল।

(ক্রমশঃ)

মানুষ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৩

মানুষ অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অনন্ত, অনাদি,
নিত্য শুদ্ধ পবিত্র সে রস-সামবাদী।
সর্ব্ব জীব জন্তু প্রাণী স্থাবর জঙ্গম,
সকলের রস-বস্তু যাহা সর্ব্বোত্তম—
তিল তিল করি লয়ে তিলোত্তম নর,
মানুষ পশুর উর্দ্ধে তাই বিশ্ব' পর।
বায়ু আসে, যায়; জল শুকায় আবার,
বরষে ধরায়; বহ্নি জ্বলে, নিভে আর;
একটি তরঙ্গ টুটে, রাখিয়া পশ্চাতে
সহস্র উদ্যত উর্ম্মি-প্রবাহ বহাতে;
বহে তথা চিরন্তন মানব-নির্ঝর
পশুত্বের শৈল-শৃঙ্গ হ'তে ধরা' পর।
পশু নহে নর, কিন্তু পশু আছে তথা—
দেবতা মানুষ নহে, মানুষই দেবতা।

১৪

আজি যাহা গুরুভার শৃঙ্খল এমন—
যার ভারে স্তব্ধ কণ্ঠ, পিষ্ট প্রাণ মন,
বন্ধ রক্তচলাচল, শ্বাস-রোধা ফাঁসি,
অন্ধ-পঙ্গু-মূক-করা, এ জীবন-নাশী—
ছিল না সে কভু হেন হত্যাযন্ত্রখানি;
সে ছিল অমৃত, সত্য, মূর্ত্ত আশীর্ব্বাণী,
মৃত-সঞ্জীবনী, রক্ষা-কবচ নির্ম্মল,
স্বর্ণ-সূত্র, উপবীত, জাতির মঙ্গল।
সেই বহুদিনকার বহু পুরাতন
শৈশবের কণ্ঠহার, যৌবনে এখন
ছোট হ'য়ে টিপে টুঁটি; ত্যাজি' এরে আজ
পরিতে হইবে তোরে নব কণ্ঠ-সাজ।
উর্দ্ধবাহু তপঃশেষ, নামাও এ হাত—
গৃহদীপে করিওনা গৃহ ভস্মসাৎ।

১৫

মিথ্যা আশা—পারিবেনা হ'তে অগ্রসর,
এক পা-ও কভু; শত শত নারী নর
যাদেরে পশ্চাতে ফেলি, ক্ষুদ্র ঘৃণ্য ভাবি,
অকারণ অপমানে, উপেক্ষিয়া দাবী,
অত্যাচারে, মিথ্যা ছলে, কলঙ্ক-লেপনে,
লাঞ্ছিত বাঞ্ছিত করি—তুমি ভাব' মনে
বড় হবে? নিবে আগে উচ্চসিংহাসন?
বৃথা চেষ্টা, দিবে না তা' উপেক্ষিতগণ।
তব রথ-চক্র তারা অবরোধি' বলে
ঘুরিতে দিবেনা চাকা, হাঁকিছে সকলে।
অহঙ্কার অভিমান ত্যাজি এস পথে,
পৌছাবে তোমারে পথ, কিবা কাজ রথে?
ধূলিমাখা এই পথ চির পূজ্য ভবে,
ধূলারে করিলে ঘৃণা পথ কোথা তবে?

১৬

ভিক্ষা করি মিলিবে না সুখ; ছাড়ো পথ—
ও-পথে মিটিবে নাক' তব মনোরথ।
দিতে হবে রূপ রস প্রাণ বাসনায়,
রক্ত দানি' প্রতিষ্ঠিতে হইতে তাহায়,
রক্ষিতে হইবে তারে অপমান হ'তে—
তবে তো সার্থক হবে পাওয়া এ জগতে!
চাই শক্তি; শক্তিমান অমর অক্ষয়;
শক্তিহীন জীবন্মৃত বিশ্ব তার নয়।
শক্ত শ্রান্ত হয়ে যায় ক্ষণিক বিস্মৃতি,
ভিক্ষুক—অক্ষম, আত্ম বিস্মৃত-অকৃতী।
দ্বারে দ্বারে সব ঠাঁই অপমানি' নিজে
অপমান ভাবে না যে—ছোট সেই কী যে!
ভিক্ষা চেয়ে তবু ভাল চুরি দাগাবাজী,
মানব-শক্তির বাঁশী ওঠে তায় বাজি।

নারীর মূল্য

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

১

তর্কের এক মহা গুণ এই যে তার শেষ নেই ; ও-বস্তু টানলে বাড়ে। আজকাল পৃথিবীর আবাল বৃদ্ধ যে সব বিষয় নিয়ে দীর্ঘ তর্ক ক'রে থাকেন, তার মধ্যে 'নারীর মূল্য' একটি। বাংলা দেশে নারীর মূল্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে ; এই বৃদ্ধি যদি এম্নি ভাবে অগ্রসর হ'তে থাকে তা'হ'লে কালক্রমে পুরুষের মূল্য তর্কের বিষয়বস্তু হ'য়ে উঠবে। সে রকম দুর্ঘটনা যাতে না হয় তার জন্য বাংলার পুরুষদের এখন থেকেই সশস্ত্র হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের অস্ত্র-নির্ম্মানশক্তির অভাবে ইউরোপের কাছ থেকে ধার নেওয়া চলবে, কারণ সে দেশে এই জাতীয় বহু অস্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়ে মজুত আছে। তার মধ্যে একেবারে নূতন বেরিয়েছে Authory M. Ludovicir Man: An Indictment। লুডোভিকি আজকালকার এক মস্ত বড় সমাজতত্ত্ববিদ্ ; সুতরাং তাঁর লেখায় যে ধার আছে তা বলাই বাহুল্য।

Fact এবং figure সংযোগে যুক্তির শক্তি যত বাড়ে তেমন আর কিছুতেই নয়। ও দুই বস্তু লুডোভিকির কলম থেকে অজস্র ধারায় ঝরেছে। মোটের উপর লুডোভিকি প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন, নারীর পক্ষে পুরুষের সমান অধিকারের দাবী একেবারে আজ্‌গুবি এবং অসম্ভব। লুডোভিকির যুক্তির মর্ম্ম এ প্রবন্ধের কাঠামো।

মানবজাতির জন্মকালে নারী ও পুরুষ নিশ্চয়ই পৃথক্ অধিকার নিয়ে জন্মায়নি, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের স্রোতে নারী পুরুষের পাশাপাশি সাঁতার কেটে চলতে না পেরে পিছিয়ে গেল প্রধানত পাঁচটি কারণে।

(১) মানুষের দেহমনের প্রত্যেক কাজ তার ওজঃশক্তি (vital energy) দিয়ে নিষ্পন্ন হয় ; উক্ত ওজঃশক্তির খানিকটা শরীররক্ষার্থে অর্থাৎ আহারবিহার, অঙ্গসঞ্চালন, স্নায়বিক কাজ ইত্যাদিতে খরচ হ'য়ে যায় ; বাকিটা যায় সুদৃঢ় মাংসপেশী এবং তীক্ষ্ণ ধীশক্তির গঠনে। নারীকে কিন্তু এমন কতকগুলো শরীর ধর্ম্ম পালন করতে হয়, পুরুষ যা থেকে মুক্ত। এই সর্ব্বজনবিদিত শারীরিক ব্যাপারে তার আরও অনেকখানি ওজঃশক্তি নিঃশেষিত হয় ; সুতরাং মাংসপেশী এবং মনোবৃত্তির গঠনের জন্য তার হাতে ও বস্তুর খুব বেশী বাকি থাকে না। যা থাকে, সে পুরুষের চেয়ে অনেক কম, যেহেতু প্রকৃতি পুরুষকে এমন ভাবে গড়েছে যাতে পুরুষের দেহযন্ত্রে অপচয়ের বেশী সম্ভাবনা নেই। এর ফলে নারীর দেহমন স্বভাবত পুরুষের দেহমনের মত সুপরিণত হ'তে পায় না।

(২) পূর্ব্বোক্ত শরীরধর্ম্ম ছাড়া সন্তানধারণ এবং সন্তান পালনেও নারীর অনেকখানি শক্তি নষ্ট এবং স্বাধীন বিচরণের পথ বন্ধ হয়। যে বস্তু মাথায় মস্তিষ্কের সৃষ্টি করতে পারত, সে বস্তু সন্তানের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির কাজে লাগে, এবং সন্তানের জন্মের পরে মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন করে।

(৩) নারী ও পুরুষের দেহের গঠন বিচার ক'রে দেখে Dr. Oskar Schultze প্রমুখ বড় বড় শরীরতত্ত্ববিদ্ মত প্রকাশ করেছেন যে নারীর দৈহিক শক্তি কোনমতেই পুরুষের অনুরূপ হ'তে পারে না, কেননা তার দেহ শিশুর দেহের মত গঠিত, মাংসপেশী তেম্নি কোমল ও ঠিক্ শিশুর মাংসপেশীর মত সংস্থিত। তারাবাইয়ের মত নারী জন্মাতে পারেন, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মে সাধারণ নারী সাধারণ পুরুষের চেয়ে দুর্ব্বল হ'তে বাধ্য। কবিরা যে নারীদেহের সঙ্গে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার আর পুরুষের সঙ্গে দীর্ঘ শালতরুর তুলনা ক'রে থাকেন, সে তুলনা খুব সঙ্গত। এ সঙ্গতি মনে মনে বেশ বোঝেন ব'লেই মায়েরা তাঁদের মেয়েদের নামের শেষে 'লতা' সংযুক্ত ক'রে দেন—যেমন স্নেহলতা, পুষ্পলতা। অবশ্য মেয়েরা শুধু শরীরগঠনেই 'লতের' নন্, কাজেও তদ্রূপ ; কেন না পুরুষকে

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

বেয়েই তাঁরা উপরে উঠে থাকেন এবং পরম পরনির্ভরশীল থেকে স্বচ্ছন্দমনে নিজেদের পত্রপুষ্পে শোভিত করবার অবসর পান্।

(৪) শুধু দেহের দিক থেকেই প্রকৃতি নারীর মূল্য কমিয়ে দেয়নি—মনের দিক থেকেও। মনের পুষ্টির জন্য তার সামান্যমাত্র ওজঃশক্তি বাকি থাকে এ কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। পরিণতির অভাবে নারীর Variationএর ধারা প্রতিহত হয়। ডারউইন্ কিম্বা ম্যাণ্ডেলের লেখা যাঁরা প'ড়েছেন তাঁরা কথাটা বুঝ্‌বেন। প্রকৃতি তার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য আনতে ভালবাসে; তার এই বৈচিত্র্যের ক্ষুধা থেকে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী জন্মলাভ করেছে। Variation কথাটাতে উক্ত বিচিত্রতা অভিব্যক্ত হয়। এই Variationএর জন্য চরম পরিণতির প্রয়োজন, এবং তার পরিণাম নূতনের উৎপত্তি। পুরুষের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে ব'লে প্রকৃতি তাকে নিয়ে Varaition বা নবরূপ প্রস্তুত করতে পারে। প্রকৃতির এই রূপসৃষ্টির এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্ থেকেই প্রতিভা এবং তার সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু Idiocyর উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু নারীর মধ্যে এত বাড়তি প্রাণ নেই যাতে তাকে নিয়ে প্রকৃতির সৃষ্টিলীলার এবম্বিধ এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্ চলতে পারে। তাই প্রতিভাবান্ পুরুষ ও নির্ব্বোধ পুরুষ এই দুই টাইপ সচরাচর যত দেখা যায়, প্রতিভাবতী নারী ও নির্ব্বোধ নারী তত বেশী দেখা যায় না। পুরুষ থাকে পাদমূলে, অথবা সর্ব্বোচ্চ শিখরে; আর নারীর পথ মধ্যপথ। প্রকৃতির নিয়মে কালক্রমে অযোগ্যের উচ্ছেদ হয় এবং যোগ্যতম আরো উপরে উঠতে থাকে; পুরুষ এম্নি ক'রে এগিয়ে চলে, আর নারী বিকাশের অভাবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করতে থাকে।

(৫) শক্তির এই ভিন্নতা-বশত পুরুষ চিরদিন নারীর কাছে একটা অবোধ্য রহস্যের মত। নারী পুরুষকে পরিষ্কার বুঝতে পারে না—একথার প্রমাণার্থে বলা যায় যে কোনো নারী-শিল্পী এযাবৎ পুরুষচরিত্রচিত্রণে যশ লাভ করতে পারেননি। পক্ষান্তরে পুরুষের চিত্রিত নারী-চরিত্র যে কত সত্য হ'তে পারে তার প্রমাণ সব দেশের সাহিত্যেই বিদ্যমান। বাংলা সাহিত্যের দিক্ থেকে কথাটা ভেবে দেখা যায়। কিন্তু মজা এই, এর ঠিক্ বিপরীত কথাই লোকে সাধারণত বিশ্বাস করে। নারীচরিত্রের রহস্যের কথাই এ যাবৎ শোনা গেছে। আসলে নারী তার মনের অগভীরতা ঢেকে রাখে লীলানৈপুণ্য দিয়ে। তার মুখের হাসি, চোখের চাওয়া, দেহের গতিচাঞ্চল্য—এসবের মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে যাকে আপাত দৃষ্টিতে রহস্য ব'লে ভুল হ'য়ে থাকে। কিন্তু সে হাসি এবং কটাক্ষ ভেদ ক'রে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে যে ও-বস্তু একেবারে অন্তঃসারশূন্য, অভিনেত্রীর মুখের কৃত্রিম রঙের বহিরাবরণ মাত্র। মোনা লিসার মত নারী আইডিয়াল, অর্থাৎ সে পুরুষের কল্পনায় জন্মায়, বাস্তবলোকে নয়। নারী পুরুষকে বোঝে না, কিন্তু পুরুষ নারীমনের ভিতর তল পর্য্যন্ত দেখতে পায়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই যে, নারী পুরুষকে শ্রদ্ধা ও সঙ্গে সঙ্গে ভয় করতে শেখে, ক্রমশ পুরুষকে সে দেবতার আসন দেয়, এবং নিজেকে প্রতিনিয়ত ছোট মনে ক'রে বাস্তবিকই ছোট হ'য়ে যায়। এক্ষেত্রে পুরুষ তার আত্মচৈতন্য জাগাবার চেষ্টা করে না, অথবা তার হাত ধ'রে বলে না,'তুমি আমার সঙ্গিনী, তোমার শক্তিতে আমার শক্তি।' বরং নিজের egoর প্রভাবে নারীর দেওয়া পূজার নৈবেদ্য সে সগৌরবে প্রাপ্যের মত গ্রহণ করে, এবং নারীর চেয়ে আসলে যতখানি উপরে তার স্থান, নিজেকে সে তারও অনেক উপরে তুলে ধর্‌তে থাকে।

২

প্রকৃতি দেহমনে নারীকে কেমন ক'রে পুরুষের চেয়ে নীচু ক'রে রেখেছে তা দেখানো হ'ল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ যুগে নারী সহসা নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠল কেন—এ প্রশ্ন হ'তে পারে। নারীর স্বাধীনতা, পুরুষের সমকক্ষতা, ভোটের অধিকার—এ জাতীয় কথা বাংলা দেশে হয়তো এখনো শুধু একটা ফ্যাসানের মত আছে, কিন্তু ইউরোপে ও-সব কথা নারীর বুকের রক্ত থেকে জন্মেছে; তার জন্য নারী যে কত কঠিন পণ করতে পারে সে দেশের সফ্রাজিট্‌রা তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। কিন্তু আসলে এর মূলে নারীর উন্নতি নেই, আছে পুরুষের অবনতি। এ যুগের পুরুষ তার পৌরুষের অনেকখানি হারিয়ে বসেছে; ক্রমবিকাশের চাকা উল্টো দিকে ঘুরে তাকে পিছিয়ে এনে

নারীর সঙ্গে একাসনে বসিয়েছে। তাই আধুনিক নারী আজ এমন দুঃসাহসী, পুরুষের অবনতির সুযোগে আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তার এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা।

অতীতের দিকে ফিরে চাইলে এমন কোনো সময়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না যখন নারী ছিল সমাজের রাণী। মানুষের অসভ্য অবস্থাতে নারী পুরুষের দাসী ছিল। কেন? দৈহিক দুর্ব্বলতা কি তার কারণ? কিন্তু সে যুগের মানুষ তো দুর্ব্বলের হাতেও শাসনাধিকার দিত, অবশ্য যদি সে দুর্ব্বলের শাসনশক্তি থাকত। দুর্ব্বল বৃদ্ধরাই সচরাচর সেকালে জাতিকে শাসন করত; সে বৃদ্ধরা নিজেদের দৈহিক দৌর্ব্বল্য অতিক্রম করত তীক্ষ্ণ ধীশক্তি দিয়ে। দুর্ব্বল নারীরও ধীশক্তির প্রভাবে শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করবার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু নারীর সেরূপ কর্তৃত্ব লাভ করতে না পারার মূলে শুধু থাকতে পারে ধীশক্তির অভাব।

৩

আধুনিক পুরুষ জন্মসূত্রে লব্ধ আদি-মনোভাববশত এখনো নিজেকে নারীর চেয়ে বড় ভাবে, কিন্তু তার এই পুরানো মনোভাবের পাশাপাশি ঠিক্ এর বিপরীত মনোভাব প্রসার লাভ করছে। জীবনে নারী নিঃশব্দে কত গভীর যন্ত্রণা সহ্য করে—এই বিশ্বাসে পুরুষ তার সহানুভূতি দিয়ে, নিবিড় স্নেহে আদরে নারীকে ঘিরে রাখে, এবং বাইরের ঝড়-ঝাপ্‌টার সাম্‌নে নিজের বুক পেতে দিয়ে সযত্নে নারীকে রক্ষা করে। সঙ্গে সঙ্গে সে নারীর মধ্যে অসাধারণ সহনশক্তি দেখতে পেয়ে তাকে শ্রদ্ধা করতে থাকে। লুডোভিকির মতে তার এই সহানুভূতির উৎপত্তির পিছনে আছে—

(১) মাতৃত্ব ও পত্নীত্ব যে আত্মত্যাগের চরম এই বিশ্বাস।

(২) পুরুষের চেয়ে নারীর নীতিজ্ঞান বেশী প্রবল এই ধারণা।

(৩) পুরুষের আংশিক বা সম্পূর্ণ impotence।

পুরুষের পূর্ব্বোক্ত দুটী বিশ্বাস যে কাল্পনিক তার প্রমাণ এই :—

(১) মাতৃত্বে নারী যন্ত্রণা যত পায়, আনন্দ পায় তার চেয়ে বেশী। প্রকৃতির নিয়মে সন্তানকামনা তার সমস্ত দেহ মনে একটা উগ্র ক্ষুধার মত। সে ক্ষুধার নিবৃত্তিতে তার পরম পরিতৃপ্তি। সন্তানধারণের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরস্থ তীব্র অনুভূতির স্রোতধারা উক্ত সন্তানকে ঘিরে স্বপ্নজাল রচনা করতে থাকে; এতে তার প্রকৃতি শান্তি পায়।

সন্তানের জন্মের পরে নারী তাকে স্তনদুগ্ধ দিয়ে পালন করে। স্তনদুগ্ধ উৎপাদন কার্য্যে তার নিজের কোনো হাত নেই; যদি থাকত তবে সে স্বেচ্ছায় এতখানি ওজঃশক্তি (যা তার বাহুবল ও বুদ্ধিবল বৃদ্ধির কাজে যেতে পারত) খরচ করতে চাইত কিনা অসংশয়ে বলা যায় না। দেহের পরিণতি, রক্তের গতি, কেশের বৃদ্ধি, নিশ্বাসপ্রশ্বাস এগুলো যেমন স্বাভাবিক ক্রিয়া, মাতৃত্বময়ী নারীর স্তনদুগ্ধ-ক্ষরণও তেম্নি এক স্বাভাবিক ক্রিয়া। তার মধ্যে যদি আত্মত্যাগ থাকে তা হ'লে নিশ্বাসগ্রহণেও তেম্নি আত্মত্যাগ আছে। অপর পক্ষে ও-কার্য্যে নারীর যথেষ্ট স্বার্থ বিদ্যমান। সন্তানকে স্তন্যদানে তার দেহে তীব্র সুখের বিদ্যুৎ খেলে যায়; শিশুর ক্ষুধা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে সে এম্নি ক'রে নিজের দেহমনের স্বভাবজাত ক্ষুধা মিটিয়ে নিতে থাকে। হ্যাভেলক্ এলিসের জগদ্বিদিত 'Sex Psychology' ঠিক এই কথাই বলে। সুতরাং নারীর সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ অংশত দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ। দেয় সে বুকের রক্ত, আর ফিরে পায় সুখের শিহরণ। এ সুখ কত তীব্র তা ভাষায় বলা যায় না।

"......স্বর্গ মর্ত্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবন মরণ
অচেতন হ'য়ে গেল অসহ্য পুলকে।"

এ কথাগুলোয় রক্তের যে চাঞ্চল্য, আনন্দের যে নিবিড়তা অংশত অভিব্যক্ত, সে চাঞ্চল্য ও নিবিড়তা নারী শিশুর কাছে পায়। তা ছাড়া আরও এক দিক থেকে শিশু নারীকে পরিতৃপ্ত করে—যার কথা লুডোভিকির মনে ধরা পড়েনি। মানুষের হৃদয়বৃত্তির অর্দ্ধেকটা জুড়ে ব'সে থাকে তার ego। ও-বস্তু না থাক্‌লে পৃথিবীর চেহারা

নারীর মূল্য

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

একদম্ বদ্‌লে যেত। Egoর তুষ্টিবিধান করবার চেষ্টাতেই মানুষের অনেকখানি শক্তি, বুদ্ধি, উদ্যম খরচ হ'য়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক যখন একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করেন, কিম্বা কবি যখন সুন্দর এক কাব্য লেখেন, তখন তাঁদের দানের আনন্দ যতই হোক্, ego বা আত্মসত্তার পরিতৃপ্তির আনন্দ তার চেয়ে সম্ভবত বেশীই হয়। কবির কাব্যসৃষ্টির চেয়ে নারীর সন্তানসৃষ্টির মূল্য অনেক বেশী, কারণ কবির সৃজনের দেহ কল্পনা দিয়ে রচিত, আর নারীর সৃজন রক্ত, মাংস, প্রাণ, মনে গঠিত। আর সে রক্ত মাংস নারীর নিজের দেহের রক্ত মাংস। সে প্রাণ মন নারীর নিজের প্রাণ মনের বৃন্তের উপর বিকশিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সন্তান নারীর egoকে প্রচুর পরিতৃপ্তি দেয়। তাই নারী নিজের দেহটাকে যেমন গভীর ভাবে ভালবাসে, দেহজাত সন্তানকেও স্বভাবত তেম্নি ভালবাসে।

অপর পক্ষে, পুরুষ সন্তানের কাছ থেকে দৈহিক আনন্দ অল্পই পেয়ে থাকে, কারণ সন্তানধারণ ও স্তনদুগ্ধদানে যে আনন্দ নারী পায় তার থেকে সে বঞ্চিত। তা ছাড়া পুরুষের egoকেও সন্তান তত বেশী তৃপ্ত করতে পারে না, কারণ সন্তানের সৃষ্টিবিষয়ে পুরুষের অংশ খুব বেশী নয়। তবুও পুরুষ যে সন্তানকে এত ভালবাসে এ তার নিঃস্বার্থ স্নেহপ্রবৃত্তির প্রমাণ। নারী যদি শুধু সমাজের কল্যাণকামনায় অশেষ কষ্ট সহ্য ক'রে মাতৃত্ব স্বীকার করত, তা'হ'লে ত্যাগের প্রশংসা অবশ্যই তার ন্যায্য প্রাপ্য হ'তে পারত।

(২) মনস্তত্ত্ব বলে পুরুষের চেয়ে নারীর যৌনমিলনের প্রবৃত্তি অধিক। এ হিসাবে তাকে পুরুষের চেয়ে বেশী নীতিপরায়ণ বললে ঠিক্ উল্টো কথা বলা হয়। তা ছাড়া নারীর sexual lifeও পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘকালস্থায়ী। অন্য কোনো ক্ষেত্রেও তার এমন কোনো গভীর নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়নি যার জন্য সে সবিশেষ প্রশংসনীয়।

(৩) পুরুষ যখন সম্পূর্ণত বা অংশত তার পৌরুষ হারায় তখনই সে নারীকে বিশেষ বড় ক'রে দেখে এবং তার স্বতন্ত্রতা কামনা করে। মিল্ ও রাসকিন্ প্রথম নারীজাতির অধিকার স্থাপনের জন্য অস্ত্র ধরেছিলেন। তারপর ইবসেনের হাতে সে অস্ত্র আরো তীক্ষ্ণধার হ'য়ে ওঠে। এই তিন জনের জীবন আলোচনা ক'রে লুডোভিকি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন অংশত impotent। এ যুগের পুরুষদের অনেকেই উপরোক্ত তিন জনের মত। এমন হবার কারণ প্রবন্ধের শেষের দিকে বলা হবে। রূঢ় সত্য যাঁদের সহ্য হয় না তাঁদের এ কথায় বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক।

৪

গৃহলক্ষ্মীরূপে নারী পুরুষের প্রতিভার প্রদীপ জ্বেলে দেয় ব'লে শোনা যায়। কিন্তু সে প্রদীপ যে নারীর হাতের স্পর্শ না পেয়েও জ্বলে উঠতে পারে তার প্রমাণ, মাইকেল এঞ্জেলো, নিউটন, বীটোফেন্, কাণ্ট্, শোপেনহর, নিচ্চে, স্পেনসার, প্লেটো, গ্যালিলিও, দেকার্ত্তে—এঁরা সবাই এবং এম্নি আরো অনেক প্রতিভাবান্ পুরুষ ছিলেন যাবজ্জীবন অবিবাহিত। গত আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় শ্রীমতী আশালতা দেবী যে 'নারীলাবণ্যে'র কথা বলেছেন, সাদা কথায় তার নাম sex appeal। নারী ও পুরুষের পরস্পরের বন্ধুত্বে নিজেদের অন্তঃপ্রকৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের পথ সোজা ক'রে তুলতে পারে এ কথা বললে খুব বড় কথা বলা হয়, এবং তার প্রমাণ পাওয়া শক্ত। উক্ত বন্ধুত্বের আকর্ষণ আসলে sexএর আকর্ষণ এবং এ আকর্ষণ উভয় পক্ষেই সমান। হাত এবং মুখ উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন। এর একজন ধর্ম্মঘট করলে দুজনকেই মরতে হবে, যেহেতু তাতে সমস্ত দেহটার বিনাশ অনিবার্য্য। তাই এদের দুজনের মিলে মিশে কাজ করার মধ্যে উভয়েরই স্বার্থ রয়েছে; সুতরাং এদের মধ্যে কৃতজ্ঞতার যোগসূত্র নেই; কারণ কৃতজ্ঞতার বন্ধন থাকে সেইখানে, যেখানে আছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। এ ভাবে দেখলে পুরুষ ও নারী এদের একে অপরের কাছে বন্ধুত্বের জন্য কৃতজ্ঞ নয়।

শোনা যায়, পুরুষের সৌন্দর্য্যজ্ঞান জাগাবার সোনার কাঠি নারীর হাতে থাকে। এ কথার কোনো মানে হয় না, কারণ নারীর সৌন্দর্য্যদৃষ্টি যে পুরুষের চেয়ে বেশী তার কোনো প্রমাণ নেই। সৃষ্টিকার্য্যে নারীর অক্ষমতা বরং

এর বিপরীত কথা প্রমাণ করে। স্ত্রীজাতি নিজের দেহ সাজাতে ভালবাসে রূপলক্ষ্মীর প্রীতির জন্য নয়, শুধু নিজের sexএর আকর্ষণীশক্তি বাড়িয়ে পুরুষের প্রাণে মোহের সঞ্চার করবার জন্য। পুরুষ এভাবে নিজের দাম বাড়াতে চায় না, কারণ তার কোনো প্রয়োজন নেই। Coquetry নারীর ধর্ম্ম, পুরুষের নয়।

গৃহশিল্পে নারীর দক্ষতার পিছনে আছে বহুদিনের প্রয়াস; সেরূপ প্রয়াসে পুরুষ এবিষয়ে সহজেই নারীর সমকক্ষতা পেতে পারে। এমনকি রান্নাঘরেও যদি অধিকারের প্রতিযোগিতা সুরু হয়, তাতে পুরুষ যে পিছিয়ে থাকবে না একথা বলাই বাহুল্য। পরিবেশনের গুণে অবশ্য খাদ্যের মূল্য বাড়ে, কিন্তু তারো মূলে আছে sex urge বা শ্রীমতী আশালতাদেবীর ভাষায় 'নারীলাবণ্য।'

দেহ এবং মনে পুরুষ যে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা দেখানো হ'ল। কিন্তু পেশীশক্তিই দেহের সর্ব্বস্ব নয়। আর এক দৃষ্টিভূমি থেকেও তার দিকে চাওয়া যায়,—সে দেহের রূপ। রূপ বলতে এখানে আমি রক্তমাংসের আকর্ষণের দিক থেকে কথাটা বলছি না, কারণ সে হিসাবে স্বভাবত পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে অধিক সুন্দর বলবে। যেখানে ভালোবাসার সম্বন্ধ আছে সে ক্ষেত্রেও এম্নি পরস্পরে রূপের আরোপ চলবে। কিন্তু রূপের আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা আত্মগত ভাব আছে যেখানে ও-বস্তু কোনো complexএর সৃষ্টি করে না। ফুলের রূপ যেমন। এদিক্ থেকে দেখলে নারী ও পুরুষের মধ্যে রূপের নিবিড়তা অধিক কার? অনেকের কাছে এ প্রশ্ন অনর্থক, এমন কি হাস্যকর, কেননা নারীর রূপের কাছে পুরুষ যে দাঁড়াতে পারে না এ বিশ্বাস জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। কেন—তা বলা শক্ত। একটু ভেবে দেখলে মনে হয় কবিরা এর জন্য কতকটা দায়ী। ব্যাস, বাল্মীকি নানাস্থানে পুরুষের রূপের বর্ণনা ক'রে গেছেন, কিন্তু এ যুগের পুরুষ কবিরা একেবারে নারী-রূপ-সর্ব্বস্ব। এ যুগে কোনো বড় নারী কবি নেই; থাকলে হয়তো তিনি পুরুষের রূপ বর্ণনা করতেন। সে যা হোক্, একজন বড় দেহতত্ত্ববিদ্ লিখেছেন যে বহু বিভিন্ন জাতির নরনারীর দৈহিক রূপ বিচার ক'রে দেখা গেছে যে মোটের উপর কুৎসিত পুরুষের চেয়ে কুৎসিত স্ত্রীলোকই সংখ্যায় বেশী। যে সব জাতি এখনো অসভ্য আছে তাদের ক্ষেত্রে কথাটা বেশী খাটে। কিন্তু এ হল রূপহীনতার কথা। রূপের পরম উৎকর্ষ যেখানে সেখানে কাকে বেশী সৌন্দর্য্যময় বলা হবে? সুন্দর ও সুন্দরীর কার স্থান উঁচু? দেহসৌন্দর্য্যে সুভদ্রা বড় না অর্জ্জুন বড়, রাধা বড় না শ্রীকৃষ্ণ বড়? এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যায় যে এঁরা সৌন্দর্য্যের দুইটা বিভিন্ন টাইপ্, এবং এঁদের একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন। এতক্ষণে এই এক জায়গায় আসা গেল যেখানে নারী পুরুষের সমকক্ষ। নারীদেহের বর্ণের রক্তশুভ্র শোভনতা, মাথায় মেঘের মত রাশি রাশি চুল, সুপুষ্ট অঙ্গ, মধুর কটাক্ষ সৌন্দর্য্যের নিবিড় প্রকাশ। আর পুরুষের দীর্ঘায়ত গঠন, (পুরুষ সাধারণত স্ত্রীলোকের চেয়ে দু'তিন ইঞ্চি বেশী লম্বা হয়) বিশাল বক্ষ, সুদৃঢ় পেশীবহুল বাহু, বলিষ্ঠ অবয়ব। নারীর মুখে সুকোমল লাবণ্য, চোখে বিদ্যুৎ; পুরুষের ললাটে প্রতিভার রেখা। নারীর পায়ে গতির নৃত্যছন্দ, পুরুষের ধীর গর্ব্বিত পদক্ষেপ। নারীর সর্ব্বশরীরে ঢেউয়ের মত লীলাচাঞ্চল্য, পুরুষের দেহ স্থির, সংহত, অবিচল। রূপের কষ্টিপাথরে দুজনে বিভিন্ন রেখা টানে, কিন্তু সে দুই রেখায় উৎকর্ষের দিক থেকে কোনো তারতম্য নেই।

৫

পূর্ব্বেই বলেছি এ যুগের পুরুষ তার পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব হারিয়ে উত্তরোত্তর নেমে এসে এখন নারীর কাছে দাঁড়িয়েছে। লুডোভিকি তার কারণ দেখিয়েছেন বিস্তর; সে সবের বিস্তৃত আলোচনায় 'বিচিত্রা'র তিনখানা সংখ্যার প্রথম থেকে শেষ পাতা ভরিয়ে দেওয়া যায়। আমরা এ প্রবন্ধে শুধু সাতটি মূল কারণ ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করব।

(১) ধর্ম্মাভাব। এ যুগের পুরুষ ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না; তাই নীতিকথাকে সে দিয়েছে ধর্ম্মের স্থান। এতে সে ধর্ম্মবিশ্বাসের গভীর উপলব্ধির জায়গায় পায় শুষ্ক, নীতিবাক্যের কঙ্কাল। নারী কিন্তু সে কঙ্কালকে নিয়ে তৃপ্ত নয়; ধর্ম্মে তার প্রগাঢ় বিশ্বাস, এবং বিশ্বাসে তার জীবন-অনুভব অনু-

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

রঞ্জিত। এখানে ধর্ম্ম বলতে আমি যা বল্‌ছি সে বস্তু আসলে ইংরাজিতে যাকে বলে religion, তাই।

(২) এ যুগে পুরুষ মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবে না, ভাবে হৃদয় দিয়ে। হৃদয় দিয়ে ভাবার জন্য এক নাম সহজানুভূতি বা intuition। Intuitionএর অবশ্য একটা সত্য রূপও আছে, যার কথা অরবিন্দ বলেছেন, এবং ধ্যানী সাধক যা তাঁর সাধনার দিব্য মুহূর্ত্তে পেয়ে থাকেন। কিন্তু নারীর যে সহজানুভূতির কথা বলা হ'য়ে থাকে সে যে উক্ত সাধকের দিব্যজ্ঞানের মতই—একথা বলতে আমি কিছুতেই রাজী নই, যেহেতু একথা বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করা যায় ব'লে আমি জানি না। বরং মনে হয় ও-বস্তু মোটেই লোভনীয় নয়, কারণ সহজানুভূতির উপর নির্ভর ক'রে কাজ করলে ধীশক্তি ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসে। এ যুগের পুরুষ নারীর দেখাদেখি সহজানুভূতির আশ্রয় নিয়েছে; এতে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা না করায় মানসিক কুড়েমিতে যে সুখ আছে তা সে প্রচুর পায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনো বস্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা সে হারায়। পুরুষের এই মনোভাবের কাছে এক জাতীয় লোক খুব ঋণী,—দৈনিক কাগজের মালিকরা; কারণ দৈনিক কাগজের লেখা বিশেষ ক'রে অচল মনের খাবার।

(৩) পুরুষ তার স্বাস্থ্যশক্তি হারিয়ে নির্ব্বীর্য্য হ'য়ে পড়ছে। এর পিছনে রয়েছে তার কঠোর জীবনসংগ্রাম। এ যুগের যন্ত্রসভ্যতার চাকার আবর্ত্তনে তার স্বাস্থ্য গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে। অপর পক্ষে নারীকে জীবিকার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না ব'লে তার স্বাস্থ্যের তেমন হানি হয়নি। পুরুষের মুখে আজ ক্লান্তির কালি, বুক জুড়ে অবসাদের জগদ্দল পাথর।

(৪) এ কালের পুরুষ আনন্দ বলতে বোঝে সুখের শিহরণ। সুখের ব্যর্থ অন্বেষণে সে তিলে তিলে নিজেকে বিনাশ করছে। ইচ্ছাশক্তি তার মৃতপ্রায়, ভাববার প্রবৃত্তি তার আর নেই।

(৫) পুরুষের মিথ্যা chivalry আমাদের দেশে নূতন আম্‌দানি হয়েছে— ইউরোপ থেকে। নারীর মুখের এতটুকু হাসি যাদের কৃতার্থ ক'রে দেয় এমন পুরুষের এদেশে আজকাল ছড়াছড়ি। নারীর পাশে মৌমাছির মত নিয়ত গুঞ্জন করবার জন্য এদের বিষম আগ্রহ। যাকে মেয়েলি ভাব বলে সে পদার্থ তাঁদের কেশে বেশে, ভাবভঙ্গিতে জল্‌জল্‌ করতে থাকে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এই সব পুরুষের নারীর জন্য চিন্তা ও manners-এর অন্ত নেই, কিন্তু সে mannersএর আদিতে আছে, নারীপ্রীতি নয়,—দাস-মনোভাব। সত্যকারের ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন হ'লে তাঁদের এ বাহ্যভাব বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাইরে যাই হোক্‌ মনে মনে সব নারীই এঁদের বিদ্রূপের চোখে দেখে থাকেন।

(৬) Love institution পূর্ব্বে পুরুষের কাজ ছিল, এখন ও-কাজ নারীর হাতে গিয়েছে। পতঙ্গের কাছে আগুন যেমন, সন্দীপের মত পুরুষ নারীর কাছে ঠিক্‌ তেম্নি। বলিষ্ঠ পুরুষত্বের পায়ে নারী নিজেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত ক'রে দিতে চায়। পুরুষ পূর্ব্বে নারীর জন্য যুদ্ধ করত, আর নারী বিজয়ীর গলায় মালা দিত। কিন্তু এখন পুরুষ নারীর কাছে তার মনোভাব ব্যক্ত করতেই ভয় পায়! সমস্ত মন দিয়ে চাইতে, (ক)

(ক) বার্ণার্ড্‌ শ তাঁর Man and Superman নাটকে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, একালে আর Don Juan নেই, আছে সব Don Juana! এ যুগের রামচন্দ্র সীতার জন্য ধনুর্ভঙ্গ করে না, যেহেতু ধনুভঙ্গের শক্তি তার থাকলেও প্রবৃত্তি নেই। প্রবৃত্তি বলতে আমি স্পষ্টত সেই বস্তু বুঝছি যার দুঃসহ তাড়নায় দুটি সিংহ একটি সিংহীর জন্য জীবনপণে যুদ্ধ করে, কিংবা যার আগুনে আদিম মানবের দেহমন মানবীর আকাঙ্ক্ষায় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠত। ও-বস্তুকে অস্বীকার করাকেই এ যুগের পুরুষ বড় ব'লে মনে করে, যদিও তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করাই আসল সংযম। বাষ্পহীন এঞ্জিনের সংযম নেই; যে এঞ্জিন বাষ্পবেগে একটি বিশেষ পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে, অথচ যাকে মুহূর্ত্তে নিবারণ করা যায় তারই আছে আসল সংযম। নারীর কাছে প্রেমনিবেদনে আধুনিক পুরুষের বীতস্পৃহা সম্বন্ধে আমি এখানে যা বললুম, বন্ধু অন্নদাশঙ্কর গত আষাঢ়ের "বিচিত্রা"র 'পথে প্রবাসে' প্রবন্ধে ঐ জাতীয় সিদ্ধান্ত করেছেন, যদিও তিনি সে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন ভিন্ন পথ দিয়ে। লেখক।

সমস্ত প্রাণ দিয়ে শুধু নিজের ক'রে রাখতে যে দৃঢ়তার প্রয়োজন, তা তার নেই। বিজিত হ'তে সে চায়, বিজেতা হ'তে নয়। এ যুগে আত্মসমর্পণ করে নারী নয়,—পুরুষ।

(৭) 'Sex-phobia' পুরুষের অধঃপতনের একটা খুব বড় কারণ। (ক) দেহের দিক থেকে সে নারীকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। (ডাঃ মারী ষ্টোপস্‌এর মতে অর্দ্ধতৃপ্ত কামনা থেকেই hysteria রোগের উৎপত্তি)।

(১), (২), (৪) ও (৫) সংখ্যক কারণগুলি থেকে পুরুষের মানসিক অবনতি এবং (৩), (৬) ও (৭) থেকে তার দৈহিক অবনতি ঘটেছে। এই দুই অবনতির পরিণাম এক—পৌরুষের অভাব। সুদৃঢ় পুরুষত্বের টীকা আধুনিক পুরুষের ললাটে আঁকা নেই। মন তার ইচ্ছা-শক্তির অভাবে অবশ, বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্প্রভ, দেহ সামর্থ্যহীন। সেণ্টিমেণ্ট্ তার খাদ্য, এবং নারী-প্রশস্তি তার তৃপ্তির উপায়।

('ক') এই প্রসঙ্গে লুডোভিকি বেশ এক কৌতুকপ্রদ কথা বলেছেন। তাঁর মতে কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের মধ্যে খুব বেশী "sex-phobia" নামক মনোভাব বিদ্যমান ছিল। Intimations Ode নিয়ে লুডোভিকি লিখছেন, "The whole of the fifth stanza of this Ode, in fact, is worth reading for the light it sheds on Wordsworth's own psychology and sex-phobia, and there is probably a no more monumental record of the Anglo-Saxon misunderstanding of childhood than these 19 lines of English verse." —লেখক।

এ অবস্থায় নারী পুরুষকে কিছুতেই শ্রদ্ধা করতে পারে না, এমন কি ভালবাসতে পারে কিনা সন্দেহ। ভালোবাসা অবশ্য পাত্রাতীত হ'তে পারে, এবং হ'য়েও থাকে, কিন্তু সচরাচর ও-বস্তু পাত্রকে আশ্রয় ক'রেই মুঞ্জরিত হ'য়ে ওঠে। মনে মনে হয়তো তাকে সে ঘৃণাও করে, না করাই স্বাভাবিক, বিশেষত যখন (৬) ও (৭) সংখ্যক কারণ দুটি রয়েছে। পুরুষের প্রতি এই ঘৃণার ভাব থেকে নারীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্ম লাভ করেছে। একথা ইউরোপ, আমেরিকা সম্বন্ধে যেমন সত্য, আমাদের দেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয় নারীর এ দাবী মেটানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় আর কিছুদিন পরে পুরুষের হাতে থাকবে না, যেহেতু নিজের দেহ মনের পুনর্গঠনের সুযোগ সে দ্রুত নিঃশেষে হারিয়ে ফেলছে। এখন তার প্রয়োজন নিজেকে নূতন ক'রে সৃষ্টি করা। শিশুর মত জীবনটাকে গোড়া থেকে গ'ড়ে তুললে এ পুরুষজাতি আবার সত্যকারের পুরুষ হ'তে পারে। ইতিমধ্যে নারী হয়তো পুরুষের পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিকার ক'রে বসবে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই; কেননা সত্যকারের পুরুষ যদি একদিন জন্মায়, স্বভাবের অনিবার্য্য ধর্ম্মবশত নারী স্বেচ্ছায় সে সিংহাসন হ'তে নেমে এসে উক্ত পুরুষের সাম্‌নে নতজানু হ'য়ে বসবেই। সব্যসাচী প্রমীলাকে বিনা যুদ্ধে জয় করেছিল, মহাভারতে তার নজির আছে।
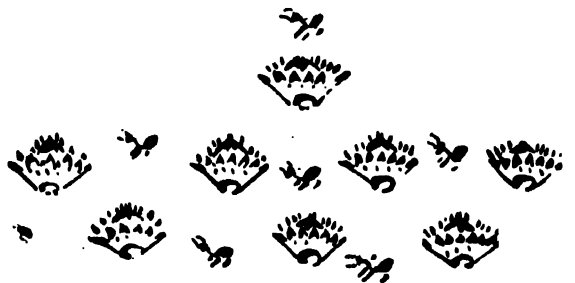
অন্ধ

—গল্প—

—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

চক্ষুর অভাবে পশুপতির বিবাহের ফুল ফুটিল না, আর অর্থের অভাবে মুরলা অরক্ষনীয়া হইয়া রহিল।

পশুপতি হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। তাহার দেহে রূপ ছিল, পেটে বিদ্যা ছিল, বিষয় সম্পদও ছিল; ছিলনা দু'টি চক্ষু। বি, এ পাশ করিবার পর এক দোষাশ্রিত জ্বরে প্রাণের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া চক্ষু দু'টি লইয়া গিয়াছিল।

ঐ গ্রামেই জগদীশ ভট্টাচার্য্যের গৃহে কন্যার মরশুম পড়িয়া গিয়াছিল। মুরলা তাহার একটি। মুরলার গায়ের রং কিছু মাটো, তা' ছাড়া চক্ষু দু'টি বড় বড়, কেশ ঘনকৃষ্ণ ও পৃষ্ঠব্যাপী, ললাট ও নাসিকা উন্নত; গড়ন পেটন গোলগাল; সর্ব্বোপরি একটা কোমলতার স্রোত দেহখানির উপর সর্ব্বদা বহিয়া যাইত। দুঃখের মধ্যে সে গরীবের মেয়ে।

হরিহর জগদীশকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একই গ্রামে বাস—পাড়াটা ভিন্ন।

এই দু'টি পুত্র ও পুত্রী লইয়া পিতারা যখন বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তখন উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি হইল। অন্ধ পুত্রের আইবড় গালি ঘুচাইবার জন্য ঐশ্বর্য্যাভিমান ভুলিয়া হরিহর এই দুঃখী কন্যাকে গৃহে লইতে সম্মত হইলেন। আর জগদীশের মস্তকের উপর যে শাণিত সামাজিক অস্ত্রখানি উল্লাসে নাচিতেছিল, তাহার শক্তি ব্যর্থ করিয়া দিবার উপায় স্বরূপ এই অন্ধ ছেলেটিকে জামাতৃ পদে বরণ করিয়া লইতে তাঁহার আর কোন আপত্তি রহিল না।

কিন্তু এক গোল বাধিল। "ওমা! চন্দর সূযির মুখ দেখে না, তার হাতে মেয়ে দেব?" জগদীশের স্ত্রী জাহ্নবী বাঁকিয়া বসিলেন। বুড়ো বয়সে স্বামীর ভীমরতি ধরিয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া অন্ধের হাতে মেয়ে দিবে না স্থির করিলেন এবং প্রতিনিয়ত স্বামীর সঙ্গে তর্কে চক্ষু দুটি দিয়া আগুনের ফুল্‌কি বাহির করিতে লাগিলেন।

জগদীশ চেষ্টা করিতে কসুর করেন নাই। নানা স্থানে হতাশ হইয়া সেদিন পাঁচু চক্রবর্ত্তীর ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ তুলিতে গিয়াছিলেন। পাঁচু দিন আনে দিন খায়। পুত্রটি ভাঙ্গা খাটে বসিয়া গোলপাতার ছিদ্র পথে চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখে। তা' ছাড়া বকাটে ছেলেদের আড্ডার একজন মাতব্বর পাণ্ডা সে। শুনা যায় গাঁজার কলিকা হাতের কাছে পাইলে তাহার মত দীর্ঘকালব্যাপী দম লইতে বড় একটা কাহাকেও দেখা যায় না। এ হেন পুত্রের পিতা পাঁচু যখন গহনা বরসজ্জা বাবদে নগদ পাঁচশত টাকা বাজাইয়া লইতে চাহিলেন তখন হইতে জগদীশ মেয়ের মনের সুখ আর খুঁজিতেছিলেন না। সমাজ যে নিষ্ঠুরতাকেই শ্রদ্ধা করে—দুর্নীতিকেই কাজে লাগায়। নাই বা থাকিল পশুপতির চক্ষু। জমীদারের ছেলে সে, টাকার খোঁজে কিছু পথে বাহির হইতে হইবে না। চক্ষু লইয়া মেয়ে কি ধুইয়া খাইবে? অমন বিদ্যা বুদ্ধি, অমন মিষ্ট স্বভাব গ্রামের কোন্ ছেলেটির আছে? এই রকমে জগদীশের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছিল।

এক এক সময় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া জাহ্নবী যখন চক্ষু দুটি নিংড়াইয়া জল বাহির করিতেন, মুরলা তখন ভাবিত, তাহার পিতা যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে ধরিয়া দিলে সে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু যখন সত্য সত্যই অন্ধের সহিত তাহার সুদীর্ঘ জীবনটা জুড়িয়া গাঁথিয়া দেওয়া একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিল, তখন সে এ প্রস্তাব অন্তরে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। দিন দিন সে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

মেয়ের ভাবগতিক দেখিয়া জাহ্নবী একদিন স্বামীকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, "মেয়ে নিয়ে আমি দেশত্যাগী হব সেও ভাল, তবু অন্ধের হাতে মেয়ে দিতে পার্‌ব না।"

জগদীশ বলিলেন, "বেশ ত! হাজার পাঁচেক বের কর না? ক'টা চোখ চাও তুমি এনে দিচ্ছি। সমাজে ত টিঁকে থাক্‌তে হবে আমাকে? অমন ঘরে মেয়ে দিতে পার্‌ছি সে আমার পরম ভাগ্য।"

জাহ্নবী চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, "মেয়ের ভাগ্য দিয়ে নিজের ভাগ্য কেনার দরকার করে না। দুঃখী লোকে কি দিয়ে মেয়ে পার কর্‌বে তার বিধি নেই, আছে কেবল অসার আস্ফালন। কি হবে অমন সমাজ নিয়ে? একটু খুঁজে পেতে দেখ। যার চক্ষু নেই তা'কে নিয়ে ঘরকন্না করাই যে বিড়ম্বনা। আমার অমন লক্ষ্মী মেয়ে, অন্ধের হাতে পড়্‌বে বিধাতার তেমন ইচ্ছা নয়। তুমি খোঁজ কর।"

ক্রমে এই বিবাহের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মুরলাকে দেখিলে পাড়ার লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে, যেন সে সৃষ্টিছাড়া কিছু হইয়া পড়িয়াছে। মুরলা লজ্জায় মরিয়া যায়। এই সকল দৃষ্টিতে যেন পিতার দৈন্য, তাহার দুরদৃষ্ট এবং অন্ধ পাত্রের সৌভাগ্যের কত কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে। মাতা বলেন,—এ বিবাহ হইতে দিব না। কিন্তু পিতার ম্লান চক্ষু দুটি দেখিলে কোন ভরসাই সে পায় না।

জগদীশ আহার করিতেছিলেন। মুরলা তাঁহাকে অন্ন ব্যঞ্জন দিয়া নিকটে বসিয়াছিল। আর্দ্র চুলগুলি পৃষ্ঠময় ঝাঁপিয়া পড়িয়াছিল। কপালে একখানা কাচপোকার টিপ চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। কর্ণের দুল দুটি কখনো স্থির কখনো বা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বাম হস্তখানি মাটিতে ভর করিয়া বামদিকে হেলিয়া সে মলিন মুখে মস্তকটি স্কন্ধদেশে ন্যস্ত করিয়া পিতার ভাতের থালার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। জগদীশ এক একবার অন্যদৃষ্টিতে কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিলেন; যেন জীবন্ত পরিতাপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকটে আত্ম নিবেদন করিতেছে। জগদীশ ভাবিতেছিলেন,—দু'দিন বাদে যে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে সে কেন মায়া দিতে আর মায়া পাইতে সর্ব্বক্ষণ চোখের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়? মুরলা কহিল, "বাবা! ক'গ্লাস জল খেলে?"

জগদীশ কন্যার দিকে এক নজর তাকাইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন, এবং তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "তেষ্টা বেড়ে গেছে মা! পুকুর ধ'রে দিলেও মেটে না। আচ্ছা! তুমি খেতে বস গে। তোমার দেহটা আমার দরকারের পিছনে সর্ব্বক্ষণ অমন জুগিয়ে রেখ না। তোমার বাবার হাত দু'খানা বিধাতা এখনও শক্ত রেখেছেন। কপালে করাঘাত করতে হবে এই দিয়ে—তিনি তা জানেন।"

নির্ম্মম প্রস্তরে বন্দীকৃত পিতৃস্নেহ উচ্ছল হইয়া উঠিতে না উঠিতেই তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন।

মুরলা জানালার ধারে যাইয়া পান ছেঁচিতে বসিল। পিতার মনোবেদনার দিক দিয়া তাহার অন্তরে কত কথাই উঠিতেছিল। সে ভাবিতেছিল,—প্রত্যহ কত লোকই রাস্তা দিয়া গতায়াত করে, একটি লোকও ত অন্ধ দেখি না। জগতে অন্ধের সংখ্যা তবে খুবই বিরল।

জননী কাছে আসিতেই সে কাঁপিয়া উঠিল এবং অশ্রু গোপন করিবার চেষ্টা করিল। জাহ্নবী বলিলেন, "কেন কেঁদে সারা হ'স্? আমি ত বলেছি,—এ কাজ হ'তে দেবো না।"

মুরলার ইচ্ছা হইতেছিল, মায়ের চরণ ধরিয়া সে বলে,—"অমন কাজ কোর না মা! কোর না! বাবাকে একটু স্বস্তি দাও।"

তাহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিল।

জাহ্নবী বলিলেন "চল্ খাবি আয়! আমরা পাঁচজনা থাক্‌তে তোর এত কি ভাবনা?"

সে মুখ গুঁজিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পিছু পিছু চলিয়া গেল।

কন্যাকে ভাত দিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "না হয় তোকে নিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায়, চ'লে যাব! তার ভাবনা কি!"

মুরলা এবার কথা কহিল। বলিল, "তুমি বড্ড বাড়িয়ে তুলেছ মা!"

কন্যার অভিপ্রায় না বুঝিয়া জাহ্নবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন। "কেন, কি করেছি আমি?"

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

মুরলা ভাতের থালার দিকে মাথা নীচু করিয়া কহিল, "বাবার মুখ দেখেও তোমার কষ্ট হয় না! আশ্চর্য্য!"

স্নেহে ও বেদনায় জাহ্নবীর হৃদয় আবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সে দেখ্‌তে গেলে এখন চলে না। দেখ্‌ছিস্ ত কি খাঁড়াই তোর মাথার উপর ঝুলছে!"

চোখের জলে মুরলার অন্নের গ্রাস একাকার হইয়া যাইতেছিল। বলিল, "সে ঝুলুক্ গে। তুমি চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে অমন জ্বালাতন কোর না।"

জাহ্নবী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মা হওয়া যে জ্বালা—সময় আসুক, তখন বুঝবি।"

মুরলা কহিল, "তা হোক্। আমি কি কেবল তোমারই মেয়ে? তাঁর কেউ নই? না—তাঁর স্নেহ নেই আমার উপর?"

কন্যার নিষ্কলঙ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া মাতার অন্তরের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল।

২

পশুপতির প্রকৃতি গম্ভীর। কিন্তু অহঙ্কারের লেশমাত্র তথায় ছিল না। তিনি সরল ও সংযমী। দুষ্ট ব্যাধি যেদিন চক্ষুদুটি অন্ধকার করিয়া জীবনে ক্রন্দন জড়াইয়া দিয়া গেল, এবং আলোক সম্পদ হইতে চিরদিনের তরে তাঁহাকে বঞ্চিত করিল, সেইদিন হইতে তিনি ভাবিয়া আসিতেছিলেন যে, তাঁহার এই অন্ধকার জীবনের রাশীকৃত ধোঁয়ার মধ্যে অপর দুইটি চক্ষু টানিয়া আনিয়া রাঙা করিয়া তুলিবেন না। কিন্তু পিতার একমাত্র সন্তান তিনি। বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পিতা অধুনা যেরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মা লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া গৃহটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে মাতাও সেইরূপ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পশুপতি জ্ঞানী, শিষ্ট, শান্ত ও পিতৃমাতৃভক্ত। এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া তিনি মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুখ শুধু একজনের খুঁজো না মা! যে তোমার ঘরে মেয়ে হ'য়ে আস্‌বে, তার সুখটাও দেখো।"

এইরূপ অনেক যুক্তি তর্ক ও কাকুতি মিনতির দ্বারা তিনি পিতামাতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন না। পশুপতি মুখ ভারি করিলেন। মাতা কাঁদিয়া কাটিয়া শয্যাশায়ী হইলেন; পিতা অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এইরূপে স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া অবশেষে পুত্রের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তিত হইল।

পশুপতির নিকট গীতার অর্থ বুঝিতে ইঁহাদের এক জ্ঞাতিকন্যা বিনোদিনী নিত্য আসিত। এই মেয়েটি বিদ্যালয়ে মুরলার সহপাঠিনী ছিল, এবং উভয়ের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। একদিন পশুপতি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিনু, ঘটকালি কর্‌তে পার্‌বি?"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "কেন? তোমার ত ঘটকালি হ'য়ে গেছে পশুদা!"

"তা' গেছে। আমার তরফ থেকেও একবার হওয়া দরকার।"

"কেন, জনে জনে ঘটক পাঠাবে নাকি?"

পশুপতি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "গুরুজনের উপরে কথা বলি সেই রকম কষ্টের জীবনই যে আমার! আমি অন্ধ সে কথাটা ভুলে যাস্ কেন? বাপ মার কাছে কানা ছেলেও পদ্মলোচন হয় জানিস্ ত? তুই একবার যাবি সেখানে। ব'লে আস্‌বি, আমি পদ্মলোচন ত নইই বাদুড়ের মত আধখানা পরদাও নেই আমার চোখে; যা হোক্ তারা রাতের বেলাটা দেখ্‌তে পায়। আমার রাত দিন দুইই সমান।"

বিনোদিনী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিল, "এক-জনের বিয়েতে ভাঙ্‌চি দাও, তুমি বড্ড দুষ্ট লোক পশুদা!"

পশুপতি কহিলেন, "অন্যের কান ভারি করা আমার অভ্যাস নয়। আমার যা বলবার মা বাবাকে প্রথমেই বলেছিলুম, তাঁরা তা' শুন্‌লেন না। মা শয্যাশায়ী হ'লেন! তাঁদের দুঃখ দিতে পারিনে সত্য, কিন্তু অমিলনের মিলনে কি সুখ হয়? আমার অবস্থাটা লোকে তাকে কি ভাবে বুঝিয়েছে, আর সেইবা কি ভাবে বুঝেছে, তাই হয়েছে ভাবনা। তুই তাকে স্পষ্ট ক'রে ব'লে আস্‌বি, বিধাতা আমার আলোর কলটি বামদিকে ঘুরিয়ে শুধু খাটো করে' রাখেন নি—নিবিয়েও দিয়েছেন।"

বিনোদিনীর চোখের পাতা ছুটি ভিজিয়া উঠিল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "তা যেতে পারি। অনেক কথাই খরচ করতে হবে। কিছু পুরস্কার আমি পেতে পারিনে?"

পশুপতি বলিলেন, "বেশী কথা বলার ত কিছু নেই। সে বল্‌তে গেলে শেষটা হয়ত আমার পক্ষে ওকালতী ক'রেই আস্‌বি। বুঝে ত্থাখ্, না হয় কোন শত্রু লোককে সেখানে পাঠিয়ে দি।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "তোমার সব চেয়ে শত্রু লোক ত আমি। আমি যতটা জানি তোমাকে, আর কে ততটা জানে? পুরস্কার কিছু দেবে ত বল, ঠিক্ ঠিক্ সব ব'লে আস্‌ব।"

পশুপতি বলিলেন- "কি চাস্ তুই? আমার এই অন্ধকার রাজ্যের বাইরের কিছু চেয়ে বসিস্‌নে যেন।"

বিনোদিনী কহিল, "এর পরে ত অন্যের ইঙ্গিতে চলবে তুমি। তোমার কাছে যে শিক্ষা পাই, সেই অধিকারটুকু তুমি তাঁর কাছে চেয়ে নিও।"

পশুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তোর অধিকার নষ্ট ক'রে দিতে পারে এমন হ'লে আমার ভাই, নাম্‌টা থাক্‌বে না যে!"

"সে কি লোকে সব সময় রাখ্‌তে পছন্দ করে?"

পশুপতি কহিলেন, "সকলে কি করে না করে জানিনে। আমি ত করি। এখন একবার যাবি ত সেখানে?"

বিনোদিনী কহিল, "হাঁ," কিন্তু সে ভাবিত হইল। কহিল, "কি বলতে হবে, ব'লে দাও তুমি।"

পশুপতি কহিলেন, "হয়ত সে জানেওনি যে একটা অন্ধ তাকে গিলে খেতে রাক্ষসের মত হাঁ করে এগুচ্ছে। অন্ধ ব'লে যদি সে শ্রদ্ধা করতে না পারে, আমি ত তাকে ব্যথা দিতে পারিনে।"

বিনোদিনী একটু চুপ করিয়া বিষণ্ণমুখে কহিল, "কি বল্‌ব আমি তুমি ব'লে দাও না আমাকে! আমি কি তোমাকে লোকের কাছে মিথ্যে মিথ্যে খাটো ক'রে দিতে পারি?"

পশুপতি চুপ করিয়া রহিলেন। বিনোদিনী তাহার এ নীরবতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল, যাব না তা' হ'লে?"

পশুপতি কহিলেন, "না—থাক্। দেখি আর কা'কেও পাঠাবো। লোকের কাছে আমাকে খাটো করতে পার্‌বিনে, আমার মিথ্যে চোখ ছুটোও যদি তোর কাছে সত্য হ'য়ে ওঠে, তোর মুখের সত্যটাও কতখানি মিথ্যে হ'য়ে যাবে আমার প্রতি মমতার উৎসাহে সে তুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌বিনে।"

বিনোদিনী মাথা নীচু করিয়া রহিল। চোখের কথাটা না হয় সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া আসিবে। কিন্তু শুধু চোখ ছুটো নিয়াই ত পশুদা নয়। আর সকলগুলি বাদ রাখিয়া শুধু চোখের কথাটাই বা সে কেন বলিতে যাইবে! বলিতে হয় ত সবই সে বলিবে। সে কহিল, "আর কাকেও পাঠাতে হবে না। আজ বিকেলেই যাব আমি।"

পশুপতি বলিলেন, "অতটা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লি। কিন্তু আমি কতখানি অন্ধ বুঝিয়ে বল্‌বি ত? আর চক্ষুর অভাবে লোকের কর্ম্মের শক্তি কতটা জড়তা পায় সেটাও বুঝিয়ে দিয়ে আস্‌বি।"

বিনোদিনী চলিয়া গেল।

বিকালে সে মুরলাদের বাড়ী যাইয়া তাহাকে কিছু নির্জ্জনে লইয়া বসিল। এবং নানারূপ অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিয়া সঙ্গিনীর অন্তরের কোথাও কোন ব্যথা স্পর্শ করিয়া আছে কিনা সূক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলিয়া মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল।

মুরলাও সংযমী মেয়ে। বাহিরের দিক দিয়া যখন এই মেয়েটির সঙ্গে সত্যকার পরিচয় হইল না, তখন মুরলার খোঁপাটায় একটা খোঁচা দিয়া বিনোদিনী কথা তুলিল। বলিল, "বিয়ের ফুল ফুট্‌ল বুঝি এবার তোর?"

মুরলা কথা বলিল না। কিন্তু তাহার ওষ্ঠ ছখানা কিছু কাঁপিয়া গেল।

বিনোদিনী কহিল, "তোমার বাবা আর পাত্তর খুঁজে পেলেন না? অন্ধের হাতে সঁপে দিচ্ছেন! গাঁয়ের লোকে কিন্তু অবাক হ'য়ে গেছে।"

মুরলার মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। সে চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

বিনোদিনী কহিল, "কি ক'রে এমন পাত্তর পছন্দ করলেন তিনি ?"

মুরলা নতমুখে কহিল, "পছন্দর কথা আমি জানিনে। তবে যাঁরা অবাক হ'য়ে গেছেন বললে, তাঁদের জ্বালায় তিনি অস্থির হ'য়ে উঠেছেন।"

বিনোদিনী কহিল, "পশুদার জন্যে আমার ভাই ভারি দুঃখ হয়। এমন রূপ, এমন গুণ, চক্ষু দুটির অভাবে শুধু ত্রুটি আর অক্ষমতায় ঘিরে ধরেছে।"

মুরলা একটা নিশ্বাস ছাড়িল।

বিনোদিনী বলিল, "বিধাতা তাঁকে এতখানি বঞ্চিত করেছেন, মানুষের কি আরও বঞ্চনা করা উচিত ?"

মুরলা বলিল, "সে ত সত্যি।"

বিনোদিনী কহিল, "আমাকে যখন গীতার ব্যাখ্যা ব'লে দেন, তাঁর জ্ঞান দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই। যেমন শান্ত, তেমনি মিষ্ট কথা, তেমনি সরল আর সহজ মীমাংসা। ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি।"

মুরলা কান খাড়া করিয়া শুনিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধ লোকে কি ক'রে দেখে আর ব'লে দেয় ?"

বিনোদিনী কহিল, "আমি শ্লোক প'ড়ে শুনাই, তিনি ব্যাখ্যা ক'রে যান। দেখতে কি সুপুরুষ, যেন কার্ত্তিক। জ্ঞানও অনন্ত।"

অপরাহ্ণের অবসন্ন রৌদ্র দিনের শেষ ধারটি পরিশোধ করিতে তখনও গাছের ডগায়, গৃহের চূড়ায়, গবাক্ষের ছিদ্রপথে জ্বলিতেছে। মৃদু হাওয়া বিনোদিনীর মিষ্ট সুরের সহিত মিশিয়া মুরলার চিত্তের বৈরভাবের উপর দিয়া বহিয়া যেন তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিবার প্রয়াস করিতেছিল। সে কহিল, "এমন স্নেহ, এমন প্রেম, এমন দয়া তুমি দেখনি ভাই! বিধাতা শুধু চক্ষুদুটিই নিয়েছেন, আর কোন সম্পদে তাঁকে বঞ্চিত করেন নি।"

মুরলাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সে পুনর্ব্বার কহিল, "আমার কথা বিশ্বাস হ'লনা বুঝি ?"

মুরলা মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, "যা' বলছ, জলের মত সরল। কিন্তু এই শুনতে ত আমার সাত রাত ঘুম হয়নি।"

বিনোদিনী চক্ষু দুটি পাকাইয়া ধরিল। সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ভাই! পশুদার উপর তোমার মনের খোঁজ খবর কিছু দেবে না নাকি ? কি বলিষ্ঠ গড়ন, এমন শক্তিমান পুরুষ তুমি দেখনি।"

মুরলা ভাবিল, নিয়তির সর্ব্বশেষ ছলনার বেশে এই নিষ্ঠুর মেয়েটি তাহার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল নাকি ? মেয়ে হইয়া, অপর মেয়েকে শুধু নয়, তাহার প্রিয় সখীকে একটা অন্ধের স্বপক্ষে কিরূপে সে এমন উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছে ? গ্লানিতে তাহার অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বিরক্তির সহিত সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে তিনি ঘটক ক'রে পাঠিয়েছেন বুঝি ?"

বিনোদিনীর চেতনা হইল। পশুপতি যাহা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষ হইয়া সেই ওকালতীই ত সে করিতেছে। সে সলজ্জভাবে মাথা নামাইয়া বলিল, "তা' কেন ? তিনি বুঝি দেশে আর লোক খুঁজে পাননি ? তোকে ত আমি চিনি। মা বাপের কাছে মুখ ফুটাবি তেমন মেয়ে তুই নস্। তাই ত জানতে এলুম। বল্‌বিনে নাকি কিছু ?"

"কি বলব ?"

"এই পছন্দ—অপছন্দ ?"

মুরলা ঘাড় হেঁট করিয়া একটু হাসিল। বলিল, "কার্ত্তিকের মত রূপ যখন বলেছ তখন কি আর অপছন্দ হয় ? তুমি কি বল ?" একটু পরে সে পুনর্ব্বার হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা আমি যেন তোমার দাদাটির দিকে চেয়ে চেয়ে দিন রাত ভুলে গেলুম, আমার রূপটা কি মাঠে মারা যাবে ?"

সে তাহার সঙ্গিনীকে চিম্‌টাইয়া ধরিল।

বিনোদিনী কহিল, "কেন, আমি রূপের ব্যাখ্যানা ক'রে আসর সরগরম করে তুলব। তিনি হাঁ ক'রে ব'সে ব'সে শুনবেন। চোখে দেখ্‌বেন না, শুধু কানে শুনে ক্ষুধিত হবেন, সে কিন্তু ভারি মজা! ভারি আমোদ পাবি তুই।"

মুরলা বলিল, "তোমার খাটুনি অনেক বেড়ে যাবে। কার জন্যে এতটা করবে ? আমার—না তাঁর ?"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "তিনি গুরু, আর তোমাকে যদি গুরুপত্নী ব'লে নাও মানি, সখী ব'লে মান্‌ব ত! দুজনার জন্যেই খাটতে হবে আমাকে।"

মুরলা কহিল, "সে কথা ভাল!"

বিনোদিনী ভুল বুঝিল। ভাবিল, মুরলার বুঝি অমত নাই। চোখ্ দুটোর জন্যে যে চঞ্চলতা, রূপ আর গুণের স্বাদ পেলে তা কেটে যাবে। সে কতকটা হৃষ্টমনে বিদায় গ্রহণ করিল। মুরলা সেইখানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সে ভাবিতে লাগিল, নারী যে, সে আশ্রয় চায়। কিন্তু অন্ধের কাছে কি? কি আশ্রয় দিবে সে? জগৎ সংসার যেখানে অন্ধকার, নৈরাশ্যে যাহার জীবন ঘেরা, সে তাহাকে কিসের বার্ত্তা শুনাইবে? নিবিড় অন্ধকারে জমাট-বাঁধা—নির্ভরতা পাইবার কি আছে সেখানে? কিছু নাই—নাই। লাভের মধ্যে স্বামীর ঘরণীর সুখ স্বস্তির খবর নিতে পাড়ার লোকের কৌতূহল আর খাটুনি বাড়িয়া যাইবে। মুরলার চিত্ত হাহাকারে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

৩

তখন দিনের আলো নিবিতেছে। মুরলা বাড়ীর কাছের ছোট পুকুরটিতে কলসী ভাসাইয়া দিয়া খেজুরের খাটিয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল। পশ্চিমাকাশে একখণ্ড রাঙা মেঘ ভাতের ফেনের মত স্তরে স্তরে ফুলিয়া উঠিতেছিল। মুরলা ভাবিতেছিল, হায়! হায়! সংসারে প্রাণভরা দৃষ্টি কাহারও নাই! বাল্যের সঙ্গিনী সে, সেও কিনা অন্ধটির পক্ষ হইয়া উপস্থিত হইল! আর একজনের শক্তির প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, চক্ষু দুটির দৈন্য সৌভাগ্যের মত বুকে তুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিয়া গেল! গ্রামের লোকে এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছেন। কিন্তু কোথাও কাহারও প্রাণে এতটুকু ব্যথা জাগিয়াছে শুনিলাম না ত! সমাজের সঙ্গে এই ত সম্বন্ধ। বাঁধন আছে—সম্পর্ক নাই। মুরলার চোখের কোণে মুক্তাফলের মত দু'ফোঁটা জল জমিয়া চিক্ চিক্ করিতে লাগিল। এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে তাহাকে স্পর্শ করিল। মুরলা চম্‌কাইয়া পিছনে ফিরিল।

বিনোদিনী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভয় কি, আমি খাঁটি বিনো, প্রেতাত্মা নই।"

মুরলা হাসিয়া কহিল, "সে হ'লে এতক্ষণ চেঁচামিচি ক'রে দিতুম। রাত হ'ল না?"

"হলই বা। একটু স্থান তুমি না দাও, মার কাছে ভিক্ষে ক'রে নেবো।"

মুরলা মৃদুস্বরে কহিল, "অমন সান্ত্বনার সম্বলকে বেশী ক্ষণ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌ব আশা করিনে। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"পিসিমার বাড়ীটা একবার ঘুরে এলুম। ঘাটের পাড়ে একলাটি ভাবনা চিন্তা বেশ জমে কিন্তু। কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল ফুটেছে, চরণ পদ্মের ভাবণা বুঝি?"

মুরলা বিষণ্ণ মুখে কহিল, "সে আর আমি কি ভাব্‌ব? তুমিই ত নিজে সে ভার নিয়েছ।"

বিনোদিনী চাহিয়া দেখিল, তাহার চক্ষু দুটি বিরোধে টলমল করিতেছে।

বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল।

সঙ্কুচিতা হইয়া সে কহিল, "আমি ভাই কিছু বলিনি। একই গাঁয়ের ছেলে। দেখে শুনে পছন্দ ক'রে নাও না?"

মুরলা হাসিয়া কহিল, "এতটা বদ্‌লে গেলে, পাড়ার লোকে ভাঙ্‌চি দিলে নাকি?"

বিনোদিনী মুখ শুষ্ক করিয়া বলিল, "আমি বুঝি পাড়াময় ঢাক পিটুতে এসেছি? সত্যি ভাই, তাঁর সম্বন্ধে যা' যা' বলেছি, সমস্ত ঠিক। তুমি জেনে শুনে দেখ্‌তে পারো।"

মুরলা বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, তা দেখ্‌ব বৈ কি! তোমার গুরুমহাশয়, তুমি অবশ্য টেনেটুনেই বলেছ!"

পশুপতির বিবাহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি হওয়া বিনোদিনীর অসহ্য। সে যখন বুঝিল অন্তরের কান্না বুকের মধ্যে চাপিয়া চাপিয়া তাহার অস্ফুট শব্দটা মুরলা শুধু ভাবভঙ্গীতে জানাইয়া দিতেছে, তখন সে আর কিছু না বলিয়া বিষণ্ণমুখে জোরে জোরে খেজুরের খাটিয়ার ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া পাড়ের উপর উঠিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

কহিল, "তুমি এমন ডিঙিয়ে ডিঙ্গিয়ে বুঝ্‌বে জান্‌লে কে কথা পাড়্‌তে যেতো। আমি ঘটক সেজে আসিনি জেনো।"

এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

পিতার কথা স্মরণ করিয়া মুরলার প্রাণ ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মেয়েটি যে দম্ভে মুখ ফুলাইয়া চলিয়া যাইতেছে, ফলে না জানি পিতার বুকে কি শক্তিশেলই আসিয়া পড়ে! মুহূর্ত্ত পরে একএক লম্ফে দুই-দুই সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সেও উপরে আসিয়া উঠিল এবং ত্বরিত পদে যাইয়া পশ্চাৎ দিক হইতে বিনোদিনীর অঞ্চল চাপিয়া ধরিল। বলিল, "রাগ কর কেন ভাই! গরীবের কি মতের জোর আছে? না জোর খাটালে দয়া পায়? তুমি রাগ কোর না ভাই!"

বিনোদিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সমবেদনায় তাহার অন্তর মথিত হইতে লাগিল। সে তাহার করস্পর্শ করিয়া কহিল, "থাক্‌গে, পয়সা কড়িরই ত অনটন। শেষটা একটা বনমানুষের হাতে প'ড়ে যাবি। এ কাজে আর অমত কোর না। অমন রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য কার আছে? তুমি অসুখী হবে না?"

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। মুরলা ধীরে ধীরে ঘাটে নামিয়া কলসটি ভর্ত্তি করিয়া কক্ষে লইল।

রান্নাঘরে কলস রাখিয়া সে বস্ত্র ত্যাগ করিল। ঘন কৃষ্ণ চুলের রাশ তখনও তাহার পশ্চাতে ছড়ানো ছিল—বাঁধা হয় নাই। চুলগুলি সুসম্বদ্ধ করিবার জন্য সে আয়না লইয়া বসিল। জাহ্নবী ঘরে ঢুকিয়া মেয়েকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যাবেলা চুল নিয়ে বসেছিস্? ক্ষণ-অক্ষণ নেই, যা' খুশী তাই করিস্? হচ্ছেও তেমনি। কোন্ মেয়েটা তোর মতন সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় থাকে?"

মুরলা প্রথমটা অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পরে কিঞ্চিৎ নরম সুরে সে কহিল, "কবে দেখ্‌লে পাড়ায় পাড়ায় থাকতে?"

মাতা তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "দেখাদেখি আবার কি? এত সময় যায় গা ধুতে, আর এক কলস জল আন্‌তে?"

মুরলা কথা বলিল না। সে দুই দাঁতে চুলের গোড়ার বন্ধন-দড়িটা চাপিয়া ধরিয়া বেণী রচনা করিতে লাগিল।

জাহ্নবী একটা কাঠের সিন্ধুক খুলিয়া পোটলা পুঁটুলি হইতে কিছু মসলা অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া রান্নাঘরে প্রস্থান করিলেন।

চুলবাঁধা শেষ হইলে মুরলা পিতার গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিল জগদীশ চৌকির উপর বসিয়া গালে হাত দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নালোকের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। অদূরে তাহারই স্বহস্ত রোপিত ফুলগাছগুলির সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প সকলের উপর জ্যোৎস্নার রজতধারা বর্ষিত হইতেছিল। মুরলা বুঝিল, পিতার চক্ষুদুটি সেইদিকে, কিন্তু মন সেখানে নাই। মন প্রাণের জাগ্রত বেদনার সহিত গ্রথিত হইয়া সে যেন ভিন্ন পথে চলিয়াছে। একে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এই খাটুনি, তার উপর সন্তান লইয়াও দুঃখ! কবাট ধরিয়া পিতার মুখের দিকে সে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। জগদীশের বুকের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। মুরলার কর্ণে তাহা বজ্রের মত বাজিয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! আহ্নিক—"

জগদীশ চক্ষু ফিরাইলেন। বলিলেন, "হাঁ, এইবার কোর্‌বো।"

আহ্নিকের জায়গা করিয়া রাখিয়া কলিকা লইয়া আগুন আনিতে সে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

জাহ্নবী ভাত চাপাইয়া দিয়া একলাটি বসিয়া কন্যার কথাই ভাবিতেছিলেন। মুরলা একখানা ধোপদোস্ত রঙিন কাপড় পরিয়াছিল। কলিকার উপর আগুন ঢালিয়া সে যখন ফুঁ পাড়িতেছিল, বস্ত্রের আভায় এবং অগ্নির দীপ্তিতে তাহার মুখশ্রী অপরূপ রঙে ফুটিয়া উঠিয়া মাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "সন্ধ্যেবেলা নেশার এই সাজ সরঞ্জাম দেখ্‌লে গা জ্ব'লে উঠে। তামাকের ধুমে বুদ্ধিটা গজিয়ে উঠ্‌লে রান্নাঘরে ঢুক্‌বে, আর সেই অন্ধ ছোঁড়ার কথা তুল্‌বে, এই হয়েছে এখনকার কাজ।"

বিরক্তিতে মুরলার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। একটু তীব্র স্বরেই সে বলিল, "তোমার আর কাজ কর্ম্ম নেই মা?"

জাহ্নবী শুষ্কমুখে কহিলেন, "নেই তবে এ করছি কি?"

"ছাই করছ। যা' করছ তাই নিয়ে প'ড়ে থাক্‌লেই পার?"

"তা' পারি। মা না হ'লে পারতুম।"

"মা হ'য়ে এত দরদ, আর একজনকে যে খুন করতে বসেছ সে দরদ নেই?"

জাহ্নবী এবার রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে চোখ রাঙাবে, তুই রাঙাবি, কেন্ না? মা ত, চোর হ'য়ে ঘরে এসেছি—না? উচিত ধরে বরে বে দিতে পারবে না ত মেয়ে জন্মালো কেন?"

কি নিবিড় স্নেহে পরিপূর্ণ এই মাতৃবক্ষ। ইহার মর্য্যাদার সাড়া মুরলার অন্তরে জীবন্ত ছবির মত ফুটিয়া উঠিতে থাকিলেও সে কিন্তু হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "সেটা ভুল করেছেন তিনি। তুমি ত কাছে ছিলে যুক্তি দিলেই পারতে।"

জাহ্নবী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আহা! মেয়ের ঢং দেখো। করবি বে সেই অন্ধ ছোঁড়াকে?"

মুরলা মুখ সিট্‌কাইয়া কহিল, "করব—ভুতুম্।"

মেয়ের চক্ষু দুটি দিয়া মাতৃস্নেহ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শিশিরের মত তরল, শিশিরের মত নিবিড়, এই ত স্নেহ!

জাহ্নবীর সমস্ত রাগ জল হইয়া গেল। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ত ভুতুম আছি। দেখি রূপসী হ'য়ে কেমন বর ঘরে আনিস্?"

মুরলা তখন পুনর্ব্বার কলিকায় ফুঁ পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে আলোকে জাহ্নবী দেখিলেন, কন্যার চক্ষু দুটি যেন বেদনায় ফাটিয়া ফাটিয়া বলিতেছে, "তোমরা চুপ্ করো। আমি আর পারি না গো—পারি না।"

কলিকা লইয়া সে চলিয়া গেল। জাহ্নবী তাহাকে শুনাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেবতা কি জাগ্রত নেই? এ বিয়ে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না।"

মুরলা বাহিরের ঘরে আসিয়া হুঁকার মাথায় কলিকাটি বসাইয়া পিতার হস্তে দিল। জগদীশ শূন্যের উপর চক্ষু পাতিয়া আকুল ভাবনায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। মুরলা আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি গণ্ডগোল হচ্ছিল?"

"কি হবে? সকল কথায় কেন কান দাও বাবা।"

জগদীশ জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সমাজও আছে—আমিও আছি। এর একটি না গেলে ত জ্বালা জুড়ুবে না। তাই ব'লে তোমাকে নখে ছিঁড়তে যায় কেন?"

নিজের অন্তর্বিপ্লব এবং পিতামাতার অন্তর্বেদনা এই দুয়ের মধ্যে যখন একটা যোগসূত্রের সন্ধান জগদীশের মুখে সে স্পষ্ট করিয়াই পাইল, তখন সে-ও পিতাকে স্পষ্ট করিয়া অনুরোধ করিতে চাহিতেছিল, "তোমাদের মেয়ে হ'য়ে আমি স্বার্থপর হব না বাবা! তুমি ভেবে ভেবে কাহিল হয়ো না, আমার ভাগ্যে যা' থাকে তাই হবে।" কিন্তু সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেবলই সমাজের দোহাই দিচ্ছ। সমাজ তোমার কি করেছে বাবা?"

জগদীশের চক্ষু দুটি ভীষণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তোমার এতদিনের প্রতীক্ষাকে তারা একটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে শেষ করতে চায়। নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় দিচ্ছে না, এমনই বয়সে বেড়ে উঠেছ নাকি তুমি। অথচ নির্ধন দেখে কেউ এগুলো না। শেষটা একটা অন্ধ—"

জগদীশ চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখের কথা না ফুরাইতেই মুরলা ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

৪

জগদীশ যে সময় সম্বন্ধটি পাকা করিবার জন্য হরিহরের বৈঠকখানায় বসিয়া দিন স্থির করিতেছিলেন, তখন সে সংবাদ বাতাসের আগে আগেই চলিয়া জাহ্নবীর কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

জাহ্নবী কুটনা কুটিতেছিলেন! বটিখানা পায়ে ঠেং-লাইয়া তিনি ভূমিশয্যার উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

মুরলাও সমস্ত শুনিয়াছিল, এবং মায়ের ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিল। বেলা বাড়িয়া চলিল, উনুন জ্বলিল না, পিতা শ্রান্ত দেহ লইয়া আসিতেছেন, সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। মাতাকে ডাকাডাকি করিল, উত্তর পাইল না।

সে তখন তরকারি পত্র ঘরে তুলিয়া লইয়া উনুন ধরাইল। ঘরের চালে ধূম দেখিয়া জাহ্নবী দুপ্ দাপ্ পদশব্দে সেখানে আসিয়া ঢুকিলেন এবং মুরলাকে এক ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। তারপর দরজায় তালা লট্‌কাইয়া শয়ন ঘরের মেঝের উপর আসিয়া শুইয়া রহিলেন।

জগদীশ গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, রান্নাঘর তালাবন্ধ, গৃহিণী মাটির উপর লুটাইতেছেন, মুরলা একস্থানে মুখখানা ভারি করিয়া বসিয়া আছে। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে নাকি?"

মুরলা কহিল, "রান্নাই ত হয়নি।"

"কেন?"

মাটির দিকে দৃষ্টি নত করিয়া সে জবাব দিল, "আমি জানিনে।"

জগদীশ সমস্তই বুঝিলেন, তিনি খুঁটি ঠেস দিয়া দাওয়ার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জাহ্নবী মনে মনে গর্জ্জিতেছিলেন। কিন্তু হতভাগা মেয়েটাও মুখ গুঁজিয়া রহিল। এই নীরবতা সেও কি ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না? অন্তরে যত ক্রোধই গচ্ গচ্ করিতে থাকুক না কেন, স্বামীর শুষ্ক মুখখানা কল্পনায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি দুটি ভাতেভাত সিদ্ধ করিয়া দিবার জন্য রান্নাঘরের দিকে তাঁহার পা দু'খানা টানিতেছিল। মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখখানা যেন ক্রমশঃ ক্রোড়ের মধ্যে লুকাইয়া যাইতেছে। তিনি তখন আলুথালু বেশে উঠিয়া পড়িলেন। "যত জ্বালা ত হতচ্ছাড়ি তোকে নিয়ে। যম কি এ বাড়ীর দ্বার দিয়ে পা মাড়াবে না?" বিকৃত মুখভঙ্গিমায় এই কথা বলিতে বলিতে তিনি রান্নাঘরে যাইয়া ঢুকিয়া থালা বাসনগুলির উপর ক্রোধের মাত্রা ঝন্ ঝন্ শব্দে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

মুরলা মাতালের মত টলিতে টলিতে তেলের বাটিটা পিতার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

জগদীশ মোহাবিষ্টের মত আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া স্নান করিতে গেলেন।

খাইতে বসিয়া তিনি বলিলেন, "সকলের কম অঙ্কে পাঁচু চক্রবর্ত্তীর ছেলেটার নাগাল পাঁচশো টাকায় ধরা গেছে। ছেলেটা মুখ্‌খু, নেশা ভাঙও করে। তা'ও গলায় সাপ বেঁধে দ্বারে দ্বারে কতজনার পায়ে তেল দিলে টাকাটা জোগাড় করতে পারব ঠিকানা নেই। দেখ্‌ব কি তাই চেষ্টা ক'রে?"

জাহ্নবী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তাই দেখো। মুখ্‌খুর গাল আর বেশী কি? অন্ধ যে!"

জগদীশ পাঁচুর সঙ্গে পুনর্ব্বার কথা বলিয়া আসিলেন এবং টাকা সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন।

এ সংবাদও গ্রামের অনেকে পাইলেন। বিনোদিনীও শুনিল। পশুপতির উপর বিনোদিনীর যেমন দরদ ছিল বাল্যসঙ্গিনী মুরলার প্রতিও তাহার তেমনি অত্যধিক মমতা ছিল। নাই বা হইল পশুপতির সঙ্গে বিবাহ, কিন্তু একটা গেঁজেলের হাতে সে পড়িবে কেন? এই সংবাদে সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

বিকালে সে মুরলাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। গল্প সল্প করিয়া যখন গৃহে ফিরিবে তখন বাহিরের ঘরে আসিয়া জগদীশকে সে কহিল, "আপনারা শুধু চোখ দুটোই দেখ্‌ছেন কাকামশায়! কিন্তু যখন গাঁজার ধোঁয়ায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন সে চোখের দাম অন্ধের চোখের চেয়ে বেশী হবে না। আমাকে ব'লে দিন্, কোন গুণটা আছে সে গেঁজেলের। শুধু চোখের তারা দুটো জ্ব'লে কি সব দোষ চেপে নিলে? আর নিভে পশুদার সব গুণ ঢেকে গেল! দিচ্ছেন—দিন্, কিন্তু ষণ্ডামার্কটার হাতের চাপড়ে মেয়ের হাড়ে যদি কালি না পড়ে—তখন বল্‌বেন।"

জগদীশ বুঝিলেন, ঠিক। কিন্তু উপায় কি? তিনি ভাবিত হইলেন। বলিলেন, "আমি এখনও পাকা কিছু করিনি। হরিহর দা ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতা করি বা না করি তাঁর যুক্তি আমি সকল কাজে নিয়ে থাকি। সন্ধ্যার পর একবার যাব সেখানে।"

বিনোদিনী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় জগদীশ হরিহরের নিকট আসিয়া জানাইলেন যে, গৃহিণী অত্যন্ত বাঁকিয়াছেন, তাঁহাকে সোজা করিয়া লইবার সাধ্য তাঁহার হইতেছে না। তদ্ভিন্ন শুভকার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

হরিহর বলিলেন, "মেয়েদের মতামত আমি ধরিনে, সংসারের লোকগুলা কি সূত্র ধ'রে কোলাহল ক'রে উঠ্বে, সেইটেই তাঁরা ভাল বুঝেন। সন্তানের ইষ্টানিষ্ট তাঁরা তলিয়ে দেখেন না। শুন্‌লাম পাঁচুর ছেলেটির সঙ্গে কাজ করার তাঁর মত হয়েছে। এই ত মতামতের মূল্য তাঁদের? তোমার যদি মনে কিছু থাকে স্পষ্ট ক'রে বল, এ নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিনে। তবে একথা ঠিক যে তাঁর মনে যত গ্লানিই উঠুক না কেন, মেয়ের সুখের বার্ত্তা যখন পাবেন, তখন সে সকল কেটে যাবে।"

অনেক আলোচনা ও যুক্তি পরামর্শের পর অবশেষে স্থির হইল যে, পাত্র খুঁজিবার ছলে জগদীশ শুধু মেয়েটি লইয়া কলিকাতায় যাইবেন। হরিহর নিজ ব্যয়ে তাঁহার জন্য বাড়ী করিয়া রাখিবেন, সেখানে যতটা গোপনে পারা যায় কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

ইহার পর জগদীশ বাড়ীতে বিবাহের সম্বন্ধে কোন কথা কিছুদিন তুলিলেন না। পরে পাঁচুর ছেলেটির গুণের কথা, যাহা জাহ্নবী ভালমতই জানিতেন, অল্পে অল্পে তুলিয়া তাঁহার মন বিগ্‌ড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তারপর একদিন প্রস্তাব করিলেন, "মেয়েটি নিয়ে কল্‌কাতায় যাই। সেখানকার বরের বাজারদর আমার ঠিক জানা নেই, কিন্তু লোকের ভিড় খুব বেশী জানি। দেখি যদি কারও নজরে প'ড়ে যায়।"

জাহ্নবী এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন। কিন্তু নিজে সঙ্গে যাইবেন বলিলেন। জগদীশ ব্যয়বাহুল্যের কথা তুলিয়া এবং অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

তারপর মুরলাকে সঙ্গে লইয়া একদিন তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন এবং হরিহরের নির্ব্বাচিত বাসা-বাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

হরিহর নিজের জন্য পৃথক একটি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি জগদীশের বাসায় তাঁহার এক আত্মীয়াকে অভিভাবিকা স্বরূপ পাঠাইলেন। মুরলা যাহাতে বিবাহের পূর্ব্বে কোন কিছু বুঝিতে না পারে সে জন্য সকলে সতর্ক হইয়া চলিতেছিলেন।

তারপর মুরলা একদিন শুনিল, অন্ধের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এতদিনে একটি সৎপাত্র তাহার উপর সদয় হইয়াছেন। আগামী পরশ্ব শুভবিবাহ। কিন্তু উদ্যোগ আয়োজন কিছুই দেখা যাইতেছে না। গরীবের মেয়ে—ধুম্‌ধাম্ না হউক—দেশ হইতে তাহার জননীও কি আসিবেন না? কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে এমন একটি লোকও তাহার কাছে নাই। সে মনে মনে স্থির করিয়া লইল, পিতা দরিদ্র, কোন গতিকে সাত পাকটা ঘুরাইবার জন্য শুধু সন্ধ্যার অবসরই খুঁজিতেছেন।

যাহা হউক সে ইহাতে দুঃখিত হইল না। তাহার যে অন্ধের হাতে পড়িতে হইল না, পিতা যে এই বিষম দায় হইতে রক্ষা পাইলেন এবং মাতার যে ঘাড় হেঁট হইল না—ভাবিয়া বরঞ্চ সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বিবাহের দিন কন্যা পাত্রস্থ করিবার আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী সমস্তই হরিহর পাঠাইয়া দিলেন। তিনি যে-বর্ষীয়সীকে অভিভাবিকারূপে পাঠাইয়াছিলেন তিনি মেয়ে সাজান হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজনই করিলেন।

রাত্রি নয়টার সময় কন্যা সম্প্রদান হইল। শুভদৃষ্টির সময় যিনি বর, তাঁহার দৃষ্টিটা চোখের পরদায় আটকাইয়া রহিয়া গেল। যিনি বধূ তিনি দেখিলেন, তাঁহাদের গ্রামের হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এ সেই অন্ধ পশুপতি!

মুরলা মঙ্গল পিঁড়ির উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৫

বিবাহের পরদিন হরিহর বর ও বধূকে বাসায় লইয়া গেলেন। দেশ হইতে তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যা সুরমা আসিয়াছিলেন। মুরলা শ্বশুর ও শ্বশ্রূর ন্যায্য সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। সুরমা তাহার দুই তিন বৎসরের বড়। তাহার সহিতও সে ভাব করিয়া লইল। কিন্তু পশুপতির সহিত সে কথাও বলিল না—এক শয্যায় শয়নও করিল না। তাহার সমস্ত বিদ্রোহবহ্নি একমাত্র পশুপতির

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

উপর যাইয়াই পুঞ্জীভূত হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, পিতার এ ছলনা করিবার হয়ত আবশ্যকতা ছিল; কোন দিকে কোন পথ না পাইয়া মাতার ভয়ে হয়ত তিনি এমন করিতে পারিলেন। কিন্তু যিনি স্বামী? কিরূপে এই ঘৃণিত চক্রান্তে তিনি সম্মতি দিলেন? জ্ঞানী তিনি, বুদ্ধিমান তিনি, শিষ্ট শান্ত সদ্বিবেচক তিনি। বিনোদিনী সেদিন তাঁহার গুণের কতই না কীর্ত্তন করিয়া গেল। ছিঃ! গরীবের মেয়ে—তাই এ ছলনা!

অন্ধ হইলেও হয়ত তাঁহাকে একদিন মানাইয়া লইয়া চলিতে পারা যাইত। কিন্তু সম্পূর্ণ চাতুরীর উপর এই মিলন-মন্দির যিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহাকে লইয়া দেবতা জ্ঞানে অন্ধকারে চরণ পূজা করিতে হইবে? থাক্।

অধিকন্তু সে ভাবিল, সে দেখাইবে যে, দুর্ব্বলকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিতে এতটা কৌশল না চালাইলেও চলিত। কিন্তু দুর্ব্বলেরও হৃদয় আছে। সেখানে বিপ্লব জাগাইয়া তুলিলে যত শক্তিহীনই সে হউক না কেন—আজীবন চেষ্টা ও প্রাণান্ত সংগ্রামের দ্বারা একদিন সবলেরও সুখ শান্তি যে ম্লান করিয়া দিতে পারে। এইরূপে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল।

পশুপতি কিন্তু নিরপরাধ। এ-সকলের কিছুই তিনি জানিতেন না, অন্ধ তিনি যন্ত্রচালিতের মতই চলিতেছিলেন।

পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া হরিহর দেশে আসিলেন। এবং দুই চারিদিন বাদে গা ভরা গহনা দিয়া মুরলাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সে সে-সকল একটা বাক্সের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তালাবন্ধ করিল। আর খুলিল না। জাহ্নবী দিন কতক কাঁদিলেন। পরে কন্যার অদৃষ্টের দোহাই দিয়া শান্ত হইলেন।

৬

বৎসরের পর বৎসর চলিল—মুরলা স্বামীর ঘর করিতেছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে একটা গুপ্ত ব্যবধান প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা সংসারের কেহই সন্ধান রাখিতেন না। পল্লীগ্রামে স্বামী স্ত্রীতে তেমন স্বচ্ছন্দ বিচরণের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং মুরলা দিনের বেলা স্বামীর সম্মুখে পড়িলেই হাতখানেক ঘোমটা টানিয়া দিয়া লজ্জার আবরণে নিজের সঙ্কল্প অটুট রাখিয়া চলিতে পারিত। তাহার সলজ্জ ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু রাত্রের বেলা শয়নঘরেও সে ঘোমটা সে বজায় রাখিত। স্বামীর ছায়া স্পর্শ করিতেও তার ইচ্ছা হইত না। এ পর্য্যন্ত স্বামীর সঙ্গে সে বাক্যালাপও করে নাই।

দিনের বেলা স্বামীকে সে ভাত দিত, জল দিত, অনেকটা সুরমা অথবা অন্য বালক বালিকাকে আশ্রয় করিয়া। কেহ কাছে না থাকিলে ঘোমটার মধ্যে বোধ করি চক্ষু বুজিয়াই স্বামীর প্রয়োজন সে সুসম্পন্ন করিত। সে সময় স্ত্রীর অঙ্গের সৌরভ পশুপতি কতকটা অনুভব করিতে পারিতেন এবং ধন্য হইতেন। কিন্তু যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিত তখন পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের সিংহদ্বারটি সম্মুখীন দেখিয়া উভয়েই চঞ্চল হইয়া উঠিতেন।

পশুপতি শয়ন করিবার পর মুরলা বাকী গৃহকর্ম্ম সারিয়া ঘরে ঢুকিত, এবং দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া মেঝের উপর একটি মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিত। একবার ফিরিয়াও দেখিত না সুসম্পন্ন যৌবন লইয়া অন্ধটি তাহার অপেক্ষায় কিরূপ ব্যগ্র হইয়া আছে।

মুরলা না আসা পর্য্যন্ত পশুপতি জাগিয়াই কাটাইতেন। তিনি যখন অনুভব করিতেন, মুরলা মাদুর বিছাইয়া শুইল তখন তিনি পালঙ্ক হইতে নামিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্য হাত্ড়াইতে হাত্ড়াইতে কাছে আসিতেন। তিনি যতই নিকটবর্ত্তী হইতেন মুরলা ততই সরিয়া যাইত। এইরূপে অধিকাংশ রাত্রি উভয়ে গৃহের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া কাটাইতেন। অবশেষে হতাশ হইয়া পশুপতি শয্যা আশ্রয় করিতেন। পশুপতি নিদ্রিত হইলে তবে মুরলা ঘুমাইত।

তিনি দুই একবার তাহার নাম ধরিয়াও ডাকিতেন। উত্তর না পাইয়া আর কিছু বলিতেন না। বলিতে সাহসও করিতেন না। যে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সে যে কান পাতিয়া কথা শুনিবে তার ভরসা কোথায়? নিষ্ফল কথায় লাভও কিছু নেই। অন্ধ তিনি, সে যে তাঁহার কথা গ্রহণ করিতেছে, অথবা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া রাখিতেছে—কি করিয়া বুঝিবেন?

প্রায় প্রতিদিনই এইরূপে তাঁহার উগুম ব্যর্থ হইত। কিন্তু তিনি নিরস্ত হইতেন না। নিতান্ত ভ্রমে পড়িয়া এই যে মেয়েটি তাহার সমস্ত নারী জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতে বসিয়াছে হয়ত এ কথা আজ সে বুঝিয়াছে। নারীজাতির স্বামীর রূপ গুণ বিচার করিয়া দেখিতে নাই হয়ত আজ সে বুঝিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া কোথাও পড়িয়া রহিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া তাহাকে কাছে পাইবার জন্য তিনি প্রতিদিনই ব্যর্থ চেষ্টা করিতেন।

একদিন রাত্রে এক অনর্থ ঘটিল। পশুপতি হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া মুরলার সন্নিধানে যাইবার সময় এক-খানা জলচৌকিতে বাধিয়া পড়িয়া গেলেন, এবং জলচৌকির কোণে মাথা কাটিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল।

মুরলা তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিল। দেখিল, অজস্র শোণিত ধারায় স্বামীর দেহ প্লাবিত করিয়া বস্ত্রখানি সিক্ত ও রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। পশুপতি তাহা হাতে পুঁছিয়া লইতেছেন, আর বলিতেছেন, "কি লাগ্‌ল—তেল না জল ?"

মুরলা তখনও স্বামীদেহ স্পর্শ করিল না। তখনও সে দ্বিধা করিতেছিল।

স্বামীকে তদবস্থ রাখিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। এবং সুরমার গৃহদ্বারে করাঘাত করিয়া তাহাকে জাগরিত করিল।

দ্বার খুলিয়া সুরমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। নিদ্রালস চক্ষু ঢুটি রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

মুরলা কহিল, "দেখ যেয়ে—কেটেকুটে খুনখারাপি ব্যাপার ক'রে বসেছে।"

সুরমা ব্যস্তভাবে পশুপতির গৃহের দিকে ছুটিল।

দেহ হইতে রক্তের ধারা বহিতেছে প্রথমত পশুপতি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তারপর হাত দিয়া দেখিতে দেখিতে যখন ক্ষতস্থানটির নাগাল পাইলেন তখন বুঝিলেন, শুধু কাটা নয়—ক্ষত অত্যন্ত গভীরও হইয়াছে।

সুরমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দাদা ?"

পশুপতি বলিলেন, "কেটে গেছে। ত্যাখ্ দেখি, কিছু দিয়ে যদি রক্তটা বন্ধ কর্‌তে পারিস্ ? আর একটা পটি বেঁধে দে।"

সুরমা দেখিল তখনও রক্ত বন্ধ হয় নাই। সে তাড়া-তাড়ি কলস হইতে শীতল জল গড়াইয়া লইয়া ক্ষতমুখে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। বলিল, "কি ক'রে কাট্‌লে দাদা ? আলো না জ্বেলে ওঠ কেন ? বৌকে বল্‌লে জ্বেলে দিত !"

পশুপতি কথা বলিল না।

সুরমা রান্নাঘর হইতে ঝুল আনিয়া ক্ষতস্থানে চাপিয়া পটি বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বালা কর্‌ছে ?"

পশুপতি বলিলেন, "না। রাত হ'য়েছে, তুই এখন শুতে যা। আর কিছু কর্‌তে হবে না।"

মুরলা এতক্ষণ দ্বারের কাছে চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়া-ইয়াছিল; সে আসিয়া ঘরে ঢুকিতে সরমা চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, "বৌ, বড় কম কাটে নি, একটু বাতাস কোরো।"

স্বামীকে সে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু তাহার ভূমিশয্যার উপর সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শয়নও করিল না, আলোও নিবাইল না।

কিছুকাল পরে রাত্রি যখন গভীর হইয়া আসিল এবং স্বামীর নিদ্রার শ্বাস ঘন ঘন তাহার কর্ণে আসিয়া পৌছিতে লাগিল, তখন সে আলোক হস্তে খাটের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, স্বামী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। ক্ষণপূর্ব্বে যে ঢুর্ঘটনা তাহারই অবাধ্যতার দরুণ ঘটিয়া-গিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র তাপ অন্তরে নাই, মুখমণ্ডল এমনই শান্ত, পবিত্র। এমন করিয়া স্বামী-মূর্ত্তি সে কোন-দিন চাহিয়া দেখে নাই। দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ; তপ্ত কাঞ্চন বর্ণে রক্তের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে; মস্তকের কুঞ্চিত কেশগুলি অযত্নে এলোমেলো চতুর্দ্দিকে ছড়ানো। সে কিছুক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। লোভ জন্মিল। তাই তথায় আর দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আলো নিবাইয়া ঘরটি সে অন্ধকার করিয়া ফেলিল,

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

এবং খাটের নীচের সেই মাদুরের বিছানায় যাইয়া একলাটি শুইয়া পড়িল।

৭

পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া হরিহর এক সময়ে দেশ ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। পশুপতি বাড়ীতে থাকিলেন, কাজেই মুরলার যাওয়া হইল না। এই সময় স্বামীকে লইয়া সে বিপদে পড়িল। সুরমা কাছে নাই; বালক বালিকারাও কেহ নাই। চাকরবাকরের সাহায্যে পশুপতির অধিকাংশ প্রয়োজন সে সম্পন্ন করিয়া দিত। যখন তাহাদের অভাব হইত, যাহা শুধু কাছে জোগাইয়া দেওয়ায় চলিত না, প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিত, সে সময় বাধ্য হইয়া দুই একটি কথা তাহাকে বলিতে হইত। কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে স্পর্শটুকু সম্পূর্ণ সে বাঁচাইয়া চলিতেছিল।

বিনোদিনী প্রায় প্রত্যহই পশুপতির নিকট গীতা বুঝিতে আসিত। মুরলা একপার্শ্বে অন্যদিকে মুখ করিয়া দূরে বসিয়া বসিয়া শুনিত। স্বামীর জ্ঞান ও স্বচ্ছন্দ ব্যাখ্যা শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া যাইত। সময় সময় তাহার মনে উঠিত, শুধু চক্ষু কেন, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হইয়া গেলেও যে অমন স্বামীর পায়ের তলায় মাথা লুটাইয়া পড়িতে হয়। কি মিষ্ট বাক্য, এতটুকু উত্তাপ নাই, তাহার এই দুর্ব্যবহারের প্রতিও আকারে ইঙ্গিতে এতটুকু ঘৃণা নাই! কি উদার প্রাণ ইঁহার, কি অসাধারণ ধৈর্য্য এই লোকটির! স্বামী ইনি, ক্ষমতা ইঁহার অসীম, অথচ কেমন নীরবে সকল অত্যাচারই সহ্য করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাহার চিরাচরিত ব্যবহার সে ছাড়িতে পারিল না। ছাড়িতে লজ্জা বোধ করিত।

একদিন স্বামীকে আহারে বসাইয়া মুরলা ইতস্ততঃ গৃহ-কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছিল। পশুপতির আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া নিকটে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু চাই?"

"না, আর কিছু চাইনে।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পশুপতি বলিলেন, "গাড়ুটা কোথায় মুরলা?"

নিকটেই বারান্দার ধারে মুরলা গাড়ু-গামছা রাখিয়াছিল, গাড়ুটা তুলিয়া ধরিয়া স্থানের উপর সে একটু ঠুকিয়া রাখিল।

"আচ্ছা, বুঝেচি।" বলিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে গাড়ুর নিকটে গিয়া বসিয়া একটু হাত বাড়াইয়া গাড়ুটা স্পর্শ করিলেন।

এমন সময় পাশে গৃহদ্বারে এক ভিক্ষুক উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল। "জয় হোক, রাণীমা! অন্ধ নাচারকে দয়া কর মা! এক মুঠো ভিক্ষে দাও।"

স্বামীর ঘরে পান রাখিয়া আসিবার জন্য মুরলা যাইতেছিল, কে যেন তাহার পায়ে নিগড় বাঁধিয়া দিল। গতিহারা হইয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

"মা করুণাময়ী, করুণা কর মা! দুটি চক্ষু হীন! যার চক্ষু নেই তার কিছু নেই মা!"

মুরলার মুখ অস্তাকাশের মত আরক্ত হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, "আঃ, চুপ করো! চেঁচিয়ো না! দিচ্ছি।"

আচমন শেষ করিয়া তখন পশুপতি দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া কক্ষাভিমুখে যাইতেছিলেন, পায়ে চৌকাঠ বাধিয়া পড় পড় হইয়া কোনো প্রকারে সামলাইয়া গেলেন।

মুরলার প্রাণের ভিতর দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। সে কিছু ভাবিল না, বুঝিল না, মনে মনে কোনো বিচার-বিতর্ক করিল না,—একটা অজ্ঞেয় অনিরূপেয় শক্তির আবর্ত্তে পড়িয়া সে মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বামীর পাশে আসিয়া দৃঢ়বলে পশুপতির বাম বাহু ধরিল।

চুড়িবালার মৃদু ঠুংঠাং শব্দে চকিত হইয়া সবিস্ময়ে পশুপতি বলিলেন "একি, মুরলা! কেন বল দেখি?"

তখন কিন্তু মুরলার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। বিবাহের এতদিন পরে স্বামীকে এই তাহার প্রথম স্পর্শের, তাহার এই পরম বিস্ময়কর আচরণের, কোনো কৈফিয়ৎই সে দিতে পারিল না। শুধু আকর্ষণের গতির দ্বারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পশুপতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্,—আমি এখন আপনিই যেতে পারব।"

মুরলা কিন্তু সে কথা শুনিল না, পশুপতির বাহু ধরিয়া ঘরে আনিয়া তাহাকে খাটের উপর বসাইয়া দিল। তাহার পর ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সহসা পশুপতির বিলম্বিত পদদ্বয় দুই বাহুর দ্বারা বুকের মধ্যে সজোরে চাপিয়া

ধরিয়া আবেগের সহিত সে দুলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া গেল কান্নার পালা—উচ্ছ্বসিত বাক্যহীন, মর্ম্মন্তুদ, চিত্তভেদী কান্না! অশ্রুর উচ্ছল বন্যায় পশুপতির পদদ্বয় ভাসিয়া গেল, আলুলায়িত কেশদাম সেই অশ্রুসিক্ত পদদ্বয়কে ঢাকিয়া ফেলিল।

তখন গৃহদ্বারে ধৈর্য্যচ্যুত ভিখারী হাঁকিতেছিল, "জয় হোক্ রাণী মা! জয় হোক্ রাণী মা!"

বিব্রত হইয়া পশুপতি দুই হস্তে মুরলাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "ছি ছি মুরলা, অমন অধীর হ'য়ো না, এস উঠে এস!"

মুরলা কিন্তু উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। তখন মুরলার বাহুবন্ধন হইতে সবলে পদদ্বয় মুক্ত করিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া পশুপতি বলিলেন, "আগে যাও, ভিখিরীকে কিছু দিয়ে এস।" তাহার পর নিজ অঙ্গুলী হইতে মূল্যবান আংটি খুলিয়া মুরলার হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার হ'য়ে এটা ভিখিরীকে দিয়ো।"

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া একটু শান্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া মুরলা প্রস্থান করিল; তাহার পর ভিখারীকে নিজের অন্নপাত্র ধরিয়া দিল, চাল দিল, ডাল দিল, তরিতরকারী দিল, টাকা পয়সা দিল, বস্ত্র দিল। অবশেষে দেহ হইতে একটা অলঙ্কার খুলিয়া দিল।

স্বপ্নেও এরূপ ঘটনা ঘটিলে ভিখারী ভয় পাইত। সন্ত্রস্ত হইয়া ভীতিবিহ্বল চক্ষে সে বলিল, "দোহাই রাণী মা! আমি বিপদে পড়ব। আমাকে পুলিশে ধরবে।"

মুরলা তাহাকে অভয় দিয়া বলিল, "তোমার কোনো ভয় নেই বাবা, কেউ কিছু বল্‌লে আমাদের কাছে তাকে ডেকে নিয়ে এসো।"

ইহার কিছুক্ষণ পরে ঘরে বসিয়া পশুপতি শুনিতে লাগিলেন ভিখারী উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে, "জয়হোক্ রাণী মা! ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ক—"

পশুপতির অন্ধ চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

চঞ্চলতা

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

কেবলি বলে সে যে, যাই গো যাই,
কোথায় যাবে তার ঠিকানা নাই।
সে বলে, চ'লে যাই বাতাস বেগে,
সে বলে, ভেসে যাই শরত মেঘে,
সে বলে, কোথা যাই ভাবি গো তাই,।
কোথায় যাবে তার ঠিকানা নাই!

সে চাহে ছলকিতে হাসির সাথে,
সে চাহে ঝলকিতে অশ্রু পাতে।
সে চাহে উঠিবারে উৎস ধরি'
ঝর্ণা সাথে চাহে পড়িতে ঝরি'।
মমতা নাহি তার কাহারো প্রতি;
সে চাহে গতি, আর কেবলি গতি!

পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

বহুকাল হইতে প্রাচ্যের আকর্ষণী শক্তি য়ুরোপের কল্পনার উপর কিরূপভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে তাহা আলোচনা করিয়া হেনরি ক্যালেণ্ডার ন্যুয়র্ক টাইমস্ ম্যাগাজিনে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ক্রুজেডের সময় হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। বিদেশীর ধনসম্পদ ও গরিমা চিরদিনই মানুষের মনকে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু এই মোহ কয়েক বৎসর যাবৎ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্যবাসিগণ এক সময়ে স্বর্ণ অথবা হস্তিদন্ত অথবা বানর অথবা ময়ূর ইত্যাদির সন্ধানে উষ্ট্রপৃষ্ঠে বা অর্ণবপোতে নানাদেশে ভ্রমণ করিত, কিন্তু প্রাচ্যের পথ মধ্যযুগের ন্যায় পুনরায় এই দুই মহাদেশের সভ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষাকে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে। য়ুরোপীয় দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ গত মহাযুদ্ধের ভীষণ দুরবস্থায় হতাশ্বাস হইয়া নিজেদের সভ্যতার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। নূতন অনুপ্রেরণার সন্ধানে তাহারা এখন প্রাচ্যের দিকে তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে।

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে জর্জ ক্যানিং পুরাতনের সহিত সাম্য সংস্থাপনের চেষ্টায় নূতন মহাদেশে যাত্রা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আজ সেই জাতির দৃষ্টি তাহাদের অপেক্ষা আরও পুরাতন মহাদেশের উপর পড়িয়াছে। ইহা তাহাদের রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে গত মহাযুদ্ধে তাহাদের প্রচলিত সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাই সেই সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা দান করিবার জন্য তাহারা আজ প্রাচ্যের মুখাপেক্ষী। পাশ্চাত্য দেশের এই ছত্রভঙ্গ ব্যাপারে ও তাহাদের মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া প্রাচ্যদেশবাসিগণ তাহাদের আর তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। এসিয়ার সহিত সুপরিচিত বহু লেখকই অনুমান করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য সংস্কার ও পাশ্চাত্য শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে শীঘ্রই ভীষণ এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। লোথ্রপ ষ্টডার্ড পীত, পিঙ্গল ও কৃষ্ণবর্ণ জাতির অভ্যুত্থানের এক ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই তিন জাতিই শ্বেতকায়ের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ প্রথমতঃ শ্বেতকায় জাতির উপর হইতে তাহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস, দ্বিতীয় কারণ গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্রাচ্য জাতির মনে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ভাব বিশেষভাবে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কয়েকমাস পূর্ব্বে ব্রিটিশ সৈন্য যখন চীন প্রদেশে প্রেরিত হইতেছিল সেই সময়ে উইনষ্টন চার্চ্চহিল তাঁহার এক বক্তৃতায় বলেন যে চীন জাতিকে উত্তেজিত করিবার জন্য মার্কিন ধর্ম্মপ্রচারকগণই দায়ী।

পাশ্চাত্য জগৎ, বিশেষতঃ প্রাচ্যদেশসমূহে যাহাদের রাজনৈতিক স্বত্ব অথবা বাণিজ্যের যোগ আছে, তাহারা যখন গান্ধী ও লেনিনের কার্য্যকলাপ ও প্রভাবে অস্থির হইয়া উঠে, সেই সময়ে য়ুরোপের মনীষিগণ তাহাদের সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, যদি য়ুরোপ তাহার বর্ত্তমান অক্ষমতা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চাহে, তবে প্রাচ্যদর্শন হইতে তাহাদের জ্ঞানলাভ করা কর্ত্তব্য।

প্রাচ্যদেশ য়ুরোপের নানা প্রকৃতির লোকের নিকট নানাভাবে প্রতিভাত হইয়া আসিতেছে। কিপ্‌লিংএর চক্ষে প্রাচ্যদেশ ব্রিটিশ জাতির অতুলনীয় বীর্য্য ও সুচারু শাসনপ্রণালীর দৃষ্টান্তস্থল। কনরাডের মতে মানবের চরিত্র ও মনোভাব সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক গবেষণা করিবার পক্ষে এইখানে বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়। পিয়ের লোটির ধারণা ছিল চিরাভ্যস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার ইহা

এক লোভনীয় স্থান। লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের রাজপুরুষগণের নিকট ইহা এক রাজনৈতিক সমস্যা। কিন্তু য়ুরোপের যে সকল ব্যক্তি প্রাচ্যের বেদ ও উপনিষদের সন্ধান পাইয়াছে, তাহাদের মতে এই প্রাচ্য মহাদেশ য়ুরোপের আশার স্থল, তাহাদের জীবনীশক্তিকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করিবে, তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন শক্তি দান করিবে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

ক্রুজেডের দুই শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধাভিযানের ফলে য়ুরোপ মধ্যযুগের অবসাদ হইতে জাগ্রত হইয়া উঠে। সৈন্যের পর বণিকেরা আসিতে আরম্ভ করে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীরে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার লইয়া অর্ণবপোত যাতায়াত করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা এক নূতন বস্তুর সন্ধান পায়। এসিয়ার তুলা তাহাদের নিকট এক অভিনব বস্তু বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই সময় হইতে ফ্ল্যাণ্ডার্স, শ্যাম্পেন, জার্ম্মানি ইত্যাদি য়ুরোপের নানাস্থানে কর্ম্মিষ্ঠতার ব্যস্ততা পড়িয়া যায়। সকল দেশের মনেই কাজ করিবার জন্য এক ব্যগ্রতা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাচ্যের সহিত নূতন যোগস্থাপনের সফলতা দেখিয়া কলম্বসের মনে পশ্চিমে আর এক মহাদেশের সন্ধানে যাত্রার ইচ্ছা প্রণোদিত হয়।

বর্ত্তমান য়ুরোপ আর এক তামস যুগের সম্মুখীন না হইলেও অত্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নিজেদের ভবিষ্যতে আস্থা স্থাপনের জন্য অপর দেশ হইতে নূতন প্রেরণা তাহাদের পক্ষে এখন বিশেষ প্রয়োজন, এবং এই কার্য্যে প্রাচ্য দেশই তাহাদের সাহায্য করিবে।

যুদ্ধাবসানের প্রায় বৎসরেক পূর্ব্বে লর্ড ল্যানসডাউন য়ুরোপের তখনও যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা রক্ষা করিতে, যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া এক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত য়ুরোপ শরীরিক ও মানসিক অবসন্নতা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারে নাই।

য়ুরোপের দুরবস্থা আলোচনা করিয়া হেনরি স্পেঙ্গলার বলেন এই অবস্থার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া কোনও লাভ নাই, কারণ প্রতীচির এখন শেষ অবস্থা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অবনতি নামক গ্রন্থে তিনি বলেন, নানাদেশের সভ্যতার তুলনামূলক গবেষণা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমরা আমাদের বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছি। আমাদের এই অনতিক্রমণীয় নিয়তি হইতে নিস্তার পাইবার জন্য চেষ্টা করা বৃথা। তাঁহার মতে পাশ্চাত্য দর্শনকে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা উচিত।

স্পেঙ্গলারের মতে ইতিহাস সভ্যতার অভ্যুত্থান ও পতনের বৃত্তান্ত। একের পিছনে আর চক্রের মত ঘুরিতেছে। পুরাতন সকল প্রকার সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যতের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া থাকা মূঢ়তা মাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার অন্তিম অবস্থা সন্নিকট।

ইহার পর হইতে পাশ্চাত্য মনীষিগণ প্রাচ্যকে নূতন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সত্যই যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা অন্তিম অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে তবে স্পেঙ্গলারের ইঙ্গিত মত প্রাচ্য দর্শনের অনুশীলন সর্ব্বতোভাবে সমীচীন।

স্পেঙ্গলারের ইঙ্গিত অনুসারেই অথবা অন্য যে কারণেই হউক য়ুরোপের অনেকেই এখন প্রাচ্য দর্শন ও ইতিহাস ইত্যাদির গবেষণায় রত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্যের বাণী লইয়া রবীন্দ্রনাথ যখন য়ুরোপে গিয়াছিলেন তখন য়ুরোপের অনেক স্থানেই তিনি অনেক ব্যক্তির নিকট হইতে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিলেন, এবং শ্রদ্ধার সহিত তাহারা তাঁহার বাণী শুনিয়াছিল। রোম্যা রোলাঁ, যিনি এককালে মাইকেল এঞ্জেলো, টলষ্টয়, বেটোফেন ইত্যাদির জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি গান্ধীর জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচ্যের প্রতি য়ুরোপের শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রমাণ করিবার পক্ষে আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কুমারস্বামীর পুস্তকাবলী য়ুরোপে যত্নের সহিত পঠিত হইতেছে। য়ুরোপীয় ও মার্কিনগণের নিকট রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এক পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে; পরম শান্তিপ্রদ এক তীর্থস্থান বলিয়া ইহা পরিগণিত হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

সম্প্রতি প্যারিস হইতে হেনরি মাসিসের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে য়ুরোপের যে সকল লেখক প্রাচ্য সভ্যতার চিন্তাধারায় মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মতামত বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

অনেকেই মনে করেন য়ুরোপ আজকাল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। রোলাঁ বলেন বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাউণ্ট হারম্যান কাইজারলিঙ্ বলেন য়ুরোপ তাঁহাকে আর উদ্দীপিত করিতে পারে না, ইহা অত্যন্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তাঁহার মনের উন্নতির জন্য নূতন কোনও আদর্শ তিনি এখানে খুঁজিয়া পান না। তিনি বলেন এমন কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয়, যেখানে তাঁহার জীবনের ধারা নূতন নূতন উৎসবের সন্ধান পাইবে। এই জন্য তিনি য়ুরোপ হইতে বিশাল প্রাচ্য দেশে আসেন, প্রাচ্যভূমি তাঁহার প্রকৃতির অনুকূল বলিয়া তাঁহার মনে হয়।

কাইজারলিঙের পরে আর এক দার্শনিক, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রাচ্যদেশ পরিভ্রমণে আসেন। ইনিও কাইজারলিঙের ন্যায় য়ুরোপের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। গণিত শাস্ত্রবিদ রাসেল ও ভাববাদী কাইজারলিঙ্ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও দুই জনেরই এই বিশ্বাস, য়ুরোপের সভ্যতার ধারার পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক, এবং প্রাচ্যবাসিগণ কিভাবে তাহাদের জীবনের সমস্যার প্রতিবিধান করেন সেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করা য়ুরোপের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে তাহাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

রাসেল বলেন সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে চিন্তার ধারাকে নিয়মিত ও সংযত করিতে হইবে। দর্শনের অধ্যাত্মতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বে তিনি গণিত শাস্ত্রের ন্যায়, অন্তর্নিবিষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কাইজারলিঙের মত প্রাচ্যের রহস্যময় অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই।

প্রাচ্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে চীন জাতির উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তিনি বলেন চীন জাতির নানা দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে যাহা পাশ্চাত্য জাতির আদৌ নাই। তিনি একথা অবশ্য বলেন না যে চীনে য়ুরোপের ন্যায় বিস্‌মার্ক বা নেপোলিয়নের জন্ম হইবে, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান ও চীনের শিক্ষাদীক্ষার মিলনে এমন এক অপূর্ব্ব সভ্যতার সৃষ্টি হইতে পারে, যাহাতে মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার বিশ্বাস চীনজাতি যদি অবাধে তাহাদের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা জগৎকে এমন এক সভ্যতা দান করিবে, যাহা দ্বারা য়ুরোপ রক্তস্রোতে ধ্বংস হইয়া গেলেও জগতে কলাবিদ্যা বা বিজ্ঞানের চর্চ্চা অপ্রতিহত ভাবে চলিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হইবে না।

কাইজারলিঙের য়ুরোপে প্রাচ্যরহস্যবিদ্ বলিয়াই বেশী খ্যাতি আছে। তিনি তাঁহার "এক দার্শনিকের ভ্রমণ কাহিনী" নামক পুস্তকে প্রাচ্যের চিন্তাধারা ও তাহাতে তিনি কতটা মগ্ন হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা তিনি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং যাহাদের বুঝিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের তিনি প্রাচ্যের মরমীপন্থীর ন্যায় আত্মোপলব্ধি করিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। তিনি নিজে অনেক সময়ে অনেক আলোচনা করেন কিন্তু অন্য সকলকে ইহা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন আত্মোপলব্ধির দ্বারাই সত্যকে পাওয়া যায়—বুদ্ধি বা আলোচনা দ্বারা নয়।

কাইজারলিঙ্ বলেন মহাযুদ্ধের অবসানে আমরা এক নূতন যুগে আসিয়া পড়িয়াছি। খৃষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং এই মিলন এখনও সেই সময়ের মত সুফল প্রসব করিবে, জীবনের ভিত্তি প্রসারিত হইবে।

ডামষ্টার্ডে "স্কুল অভ্ উইজডামের" বিদ্যার্থীদের নিকট তিনি এই সকল বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ১৯২১ অব্দে এই স্কুলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যার্থিগণ অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

মেটারলিঙ্ক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মানব মস্তিষ্কের দুই অংশের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক

অংশ হইতে যুক্তি, বিজ্ঞান ও বাহ্যজ্ঞান প্রসূত হয় আর একটি হইতে স্বানুভূতি, ধর্ম্ম ও অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এক অসীম ও ধারণাতীতের সন্ধানের পথ দেখাইয়া দেয়, আর— যাহা কিছু বোধগম্য তাহারই চর্চ্চা করে।

মাসি (Massis) বলেন, য়ুরোপে প্রাচ্যের প্রতিপত্তি আবার হ্রাস হইয়া আসিবে; য়ুরোপ আবার তাহাদের নিজেদের সভ্যতার উপর আত্ম নির্ভর করিতে সক্ষম হইবে।

কাজল রেখা

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজল রেখা কাজল রেখা, কাজল আঁকা তোমার চোখে,
বাদর বেলার নীল নীরদের মাধুরীটি ঘনালো কে !
লাজুক ভিজে যূথির মত
বয়ান তোমার সরম-নত,
সাঁঝের প্রথম দীপ্তি তুমি আকাশ ভরা তারার লোকে,
জোৎস্না দিয়ে অঙ্গ ঘিরে বল তোমায় রচিলো কে !

আব্‌ছা মনে পড়ছে তোমায় প্রথম কবে দেখেছি যে
ফাগুনে কি হোলির দিনে !—শাঙন দিনে বাদর ভিজে।
সোনার নীপের সুনীল মায়া
জড়িয়ে ছিল তোমার কায়া,
আমার পানে চেয়ে তুমি নীরব চোখে কইলে কি যে,
অধর ভরা হাসি হঠাৎ চোখের জলে উঠ্‌ল ভিজে।

তারপর যে হারিয়ে গেলে মলিন ক'রে সকল স্মৃতি—
রইলে হ'য়ে অখিল লোকের মানসবীণার মধুর গীতি।
মিলিয়ে গেলে ফুলে ফুলে
পূর্ণ চাঁদের কূলে কূলে ;
নদীর পারে ধানের ক্ষেতে বাজিয়ে বাঁশী ডাক্‌ছ নিতি।
ভুবন ঘিরে আছে তোমার রাঙা হিয়ার মধুর প্রীতি।

একদিনে এক ফুল ফোটানো ফাগুন সাঁঝের শুভক্ষণে
গন্ধ ব্যাকুল চাঁপার তলে হঠাৎ দেখা তোমার সনে ;
পাণ্ডু তোমার অধর রাঙি,
কেশর-কলস কে দেয় ভাঙি,
কি যে কথা বল্‌তে গিয়ে ফেল্‌লে কেঁদে অকারণে,
পলক মাঝে মিলিয়ে গেলে উতল দখিন বাতাস সনে।

সেই যে সেদিন একটুখানি এই জীবনে দেছ ধরা
সে পরিচয় কাজলরেখা আজকে তোমার বিশ্বভরা।
তোমার মধুর ছলের খেলা
কাঁদায় হাসায় সকল বেলা,
রূপের রাণী, আজকে তুমি রূপে রূপে ভুবন ভরা।
কাজল রেখা সোনার মেয়ে দেবে নাকি আমায় ধরা !

নাই বা দিলে ধরা তুমি দূরে থেকো সুরের রাণী ;
নিশীথ রাতে ঘুমের ঘোরে বুলিয়ে যেও সরস পাণি,
বর্ষা শরৎ মাধবীতে
কতই রূপে কতই গীতে
নূতন রূপে আমার দ্বারে চিরদিনই আস্‌বে জানি।
উজল-আঁখি কাজল রেখা জীবন সাথী তাইত মানি।

ভুলের ফুল

—গল্প—

—শ্রীরামেন্দু দত্ত

১

হারাণচন্দ্র কারফর্ম্মা আমাদের-ই সঙ্গে কোন ক্রমে বি, এ, টা পাশ ক'রে ফেল্‌লো। শুধু বি, এ, পাশ নয়, সে আবার কবিতাও লিখ্‌ত। সে কবিতা কোথাও ছাপা হোক্ আর না হোক্,—তা'র ছন্দ, অর্থ, মূল্য থাক্, বা না থাক্,—সে কবিদের ধাঁচাটি আগা-গোড়া নকল ক'রে ফেলেছিল। সেই লম্বা চুল, তেরছা চাহনি, কোঁচা ও কাছার স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, জামার অভাবে বিছানার চাদরকেই সম্বল করে' নেওয়া···ইত্যাদি ইত্যাদি।

হারাণচন্দ্র কারফর্ম্মা জমিদারের ছেলে নয়। সে চাকুরির খোঁজে মামার দেওয়া জুতা জোড়াটি একেবারে নষ্ট ক'রে ফেল্‌লো। হারাণচন্দ্রের কোন বড়লোক আত্মীয়ও ছিল না, সুতরাং তার হ'য়ে কেউ সুপারিশও কর্‌লো না। অতএব সে যখন পঁচিশ টাকা মাইনের একটা কেরাণী-গিরি পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে কর্‌লো, তখন আমরা তাকে কিছু মাত্র দোষ দিতে পারি না। তার ওপর হারাণ ছ'দিন আগেই একটা বন্ধন-ও বাড়িয়ে ফেলেছিল, অর্থাৎ তার বিবাহটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, আর তার ছ'দিন পরেই সে এই চাকরিটা পেল। সকলে বল্‌লে, "স্ত্রী-ভাগ্যে ধন, আর পুরুষের ভাগ্যে সন্তান; বিয়ে ক'রেই হারাণের এই চাকরিটা হ'ল।" চাকরি ত হ'ল, কিন্তু পঁচিশ টাকায় মেসের খরচই চল্‌তে পারে, পরিবার প্রতিপালন হয় না।

হারাণের মা বাপ, ভাই বোন কেউই ছিল না; অর্থাৎ ছিল সবাই কিন্তু ইহ জগতে নয়। সুতরাং কথায় যে বলে 'আপনি আর কোপ্‌নী', হারাণ-ও হ'ল তাই। বৌ থাক্‌তো বাপের বাড়ীতে। সপ্তাহে একখানা আর বেশী বৃষ্টিবাদল হ'লে দু'খানা ক'রে চিঠি লেখা ছাড়া তার পেঁছুনে আর অন্য কোন খরচ কর্‌তে হ'ত না। পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণীর পক্ষে এই খরচটা করা সুসাধ্য না হ'লেও দুঃসাধ্য নয়। সেই জন্যে কখনো অফিসে ব'সে, কখনো রাত্রে শোবার আগে সে দু'একখানা চিঠিপত্র লিখ্‌ত। আগেই বলা হয়েছে হারাণচন্দ্র কারফর্ম্মার কাব্য-রোগ ছিল। সুতরাং চিঠির মধ্যে কবিতা লেখার এমন সুযোগ সে যে প্রতিবারেই ছেড়ে দিত, সে কথা জোর ক'রে কি ক'রেই বা বলি! বিশেষ, সেই নিয়েই যখন এতটা কাণ্ড হ'য়ে গেল!

সেদিন বৃহস্পতিবার—'মেল-ডে'। আমাদের হারাণ, 'করেস্‌পণ্ডেণ্ট্ ক্লার্ক'। তার কাজের অন্ত নাই, চিঠির পর চিঠি—লিখেই চলেচে। হাতের কলম যখন ছাড়্‌লো আঙুলগুলো তখন যেন কাঠি হ'য়ে গেছে। নড়্‌তেও চায় না, চড়্‌তেও চায় না। মাথাটা ত ঝিম্ ঝিম্ কর্‌চে। ঘড়ির ছোট কাঁটা পাঁচটার ঘরে। এমন সময় হারাণের ডাক পড়্‌লো বড়বাবুর খাস্-কামরায়।

"তাই ত হে হারাণ, বিলাতী চিঠিগুলো সব শেষ হ'ল কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু দেখ, আর একটা বাপু ভারী ভুল হ'য়ে গেছে। এই 'ম্যাক্‌মারে' কোম্পানীর চিঠিখানার একটা জবাব আজকার মেলে না গেলে আমাদের প্রায় দশ হাজার টাকার একটা 'কাস্‌টামার্' সময়ে জিনিষটা পাবে না; হয়ত এমনো হ'তে পারে, এত বড় খদ্দেরটা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। তা দেখ, আর 'ড্রাফট্' করবার সময় নেই, আমি ব'লে যাই, তুমি 'টাইপ্' ক'রে যাও।"

হারাণ যখন আফিস্ থেকে বেরুলো, তখন যেন সে আধমরা হ'য়ে গেছে। সে এই চাকরিতে বাহাল হবার আগে তার জায়গায় দু'জন লোক কাজ কর্‌ত। অল্প বেতনে একজন 'গ্র্যাজুয়েট' পেয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যেন বামুনের গরু হাতে পেলেন। চাঁটও ছোড়ে না, দুধও দেয় বেশী, খায়ও কম।

ফলে, হারাণচন্দ্র কোনোদিন ছ'টার আগে অফিস থেকে ছুটি পেত না। আর তা' ছাড়া মাঝে মাঝে 'ফাইল' গুলো তার সঙ্গে সঙ্গে 'মেস্' পর্য্যন্ত আস্ত। আজ বৃহস্পতিবারের বারবেলায় এই অত্যাচারটা হারাণের হঠাৎ অসহ্য ব'লে মনে হ'ল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে কর্‌তে চল্‌লো যে আজ বাড়ী গিয়ে সে বড়বাবুকে একখানা জোর চিঠি লিখ্‌বেই লিখ্‌বে,—আর তার সঙ্গে একটা দিন কতকের ছুটির দরখাস্তও পেশ করবে। এই ছুটিটা একবার সে কয়েকদিনের জন্যে স্ত্রীকে নিয়ে কার্ম্মাটারে শ্যালিকার কাছে কাটিয়ে আস্‌বে। আর একখানা চিঠি তাকে লিখ্‌তেই হবে, সেটা যাবে কনকলতার কাছে; গতানুগতিক প্রেম নিবেদন ছাড়া তাতে এই কল্পিত আসন্ন শুভ সংবাদটাও দিতে হবে।

সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর, অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার মেসের মধ্যে থেকে, সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ খাদ্যপেয় উদরস্থ হবার পরেও কেরাণীকুলের যে আরো কাজ কর্‌বার স্পৃহা থাকে তা' আমাদের হারাণকে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা শক্ত। একটা এক পয়সা দামের লিক্‌লিকে সরু মোমবাতি জ্বেলে হারাণ বাবু পত্র রচনা করতে বস্‌লেন। প্রথমেই বড়বাবুর চিঠিখানা আরম্ভ হ'ল। চিঠিটা হারাণ লিখল ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে, নিজেকে অতি কষ্টে সজাগ রেখে মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্যে তাকে হাত দু'খানা চোখে ঘ'সে দিতে হচ্ছিল।

তারপর আরম্ভ হ'ল আসল চিঠিখানা। কনকলতাকে মনের মতন ক'রে চিঠিখানা লিখে যখন হারাণ নামটা সই কর্‌লো তখন সে রীতিমত ঢুল্‌ছে। রাতও তখন সাড়ে বারোটা। চিঠি দু'খানা তাড়াতাড়ি মুড়ে দুটো সাদা খামে বন্ধ ক'রে, একটার ওপরে লিখলে বড় বাবুর নাম আর আফিসের ঠিকানা, অন্যটায় তা'র স্ত্রীর নাম আর শ্বশুরালয়ের ঠিকানা। এক ফুঁয়ে বাতিটা নিবিয়ে একটা লম্বা হাই তুলে দুটো তুড়ি দিয়ে 'হরি-বোল্ হরি-বোল্' ব'লে হারাণ ক্লান্ত শরীরটাকে ছেঁড়া মাদুরে মেলে দেবা-মাত্রই মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ল। ছারপোকা আর মশা তার সে গাঢ় নিদ্রা কিছুতেই ভাঙাতে না পেরে সেদিন পেট ভ'রে একটা নেমন্তন্নের খাওয়া খেয়ে নিলে। সকাল বেলায় হারাণ একখানা এক আনার টিকিট, তার স্ত্রীর ঠিকানা-লেখা বন্ধ করা খামে এঁটে দিয়ে সেটাকে তখুনি ডাকে দিয়ে এল। অপরখানি পকেটে ক'রে আফিসে নিয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পর যখন আফিস থেকে বেরুচ্ছে, বেয়ারার হাতে খামখানা দিয়ে হারাণ বিশেষ ক'রে ব'লে গেল যেন তার পরদিনই সেটা বড়বাবুর চিঠির 'ট্রে'তে অন্য চিঠি পত্রের সঙ্গে সে দিয়ে আসে। নগদ দু'টো পয়সাও বেয়ারাকে এই সঙ্গে হারাণ পান খেতে দিলে।

২

এই স্মরণীয় দিনটির আর একদিন পরে শ্রীমতী কনকলতার হাতে তা'র ছোট বোন এসে একখানা চিঠি দিয়ে বল্‌লে, "দিদি, সন্দেশের পয়সা?" "ভারী ফাজিল হয়েছিস, যাঃ" ব'লে চিঠিখানা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কনকলতা চচ্চড়ির জন্যে বড়ি আনবার ছল ক'রে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকে ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে দিলে। চিঠি খুলে চোখের সুমুখে ধ'রে সে একটা জানলার কাছে স'রে গেল। তারপর আঁচল দিয়ে একবার চোখ দুটোকে ভাল ক'রে মুছে চিঠিখানা আবার পড়তে চেষ্টা কর্‌লো। সম্বোধন প'ড়েই অপরিসীম লজ্জায় তার মুখখানি টক্‌টকে রাঙা হ'য়ে উঠল। অস্ফুট স্বরেই সে ব'লে উঠল, "মা গো, ছিঃ। একটু কি বুদ্ধি নেই? এতে যে আমার পাপ হবে।" তারপরে আরো গোটা দুই তিন লাইন প'ড়েই তার সে লজ্জা বিস্ময়ে, এবং বিস্ময় বিরক্তিতে পরিণত হ'ল। ছিঃ, এ কি ঠাট্টা! এ যে অত্যন্ত স্থূল পরিহাস! দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষের ক'লাইন প'ড়ে কনকলতা রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিঠিটাকে মুড়ে একটা গুলি পাকিয়ে ফেল্‌লো। চিঠিটায় লেখা ছিল:—

শ্রীচরণকমলেষু

শতকোটি প্রণামান্তর নিবেদন—

আমি আপনার শ্রীচরণে নতুন নিয়োজিত দাস। আমি বাহাল হওয়ার পর আপনার আগের লোক দুটিকে ছাড়িয়ে দেওয়াতে আমি নিতান্ত একলা হ'য়ে পড়েছি। এ কারণে আমার অতিশয় কষ্ট হচ্ছে। আপনি যদি

শ্রীরামেন্দু দত্ত

দয়া করে' এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করেন তা' হ'লে বাঁচব, নইলে এ ভাবে আমায় একলা যদি রাখেন তা' হ'লে অচিরে আমি মারা পড়ব।

আর একটি কথা ভয়ে ভয়ে আপনার চরণে নিবেদন করছি। যদিও অতি অল্প দিনই হ'ল আপনার অধীনতায় আসবার আমার সৌভাগ্য হয়েছে, তবু দয়া ক'রে আমায় কয়েকদিনের ছুটী দেন এই আমার ভিক্ষে। সেই ক'দিন আমার বদলে আপনি যদি আর একজন লোককে বাহাল করেন ত আমার কোনও আপত্তি নাই।

আশা করি দাসের এ ধৃষ্টতা মাপ করবেন ও করুণা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইবেন। ইতি—

সেবক—শ্রীহারাণচন্দ্র কারফর্ম্মা।

ছিঃ ছিঃ, এই কি স্বামীর চিঠি! এ রকম অভদ্র রসিকতা যে মূর্খ চাষারাও তাদের স্ত্রীকে করে না। চিঠিখানা আঁচলে বেঁধে কনকলতা রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করবে ঠিক করলো। ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দোরের কাছে তার ছোট বোন আর একবার সন্দেশের পয়সা চাইবার ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে বেচারী কিন্তু কনকলতার মুখের দিকে চেয়েই ভয়ে ভয়ে স'রে পড়লো।

৩

"ম্যাক্‌ফারসন্" কোম্পানীর 'পিস্-গুড্‌স' (Piece-goods) আফিসের বড়বাবুর 'প্রাইভেট্' কামরায় একটি ট্রে ক'রে চাপরাসী ডাক দিয়ে গেল।

ইলেক্‌ট্রিক কর্পোরেশনের একখানা বিল এসেছে, তাঁর ঘরের লাইন মেরামতি করা হয়েছিল ব'লে; তারপর একটা প্রসিদ্ধ কোম্পানীর চিঠি, তারা কতকগুলো জিনিষ পাঠিয়েছে তারই একটা ইন্‌ভয়েস্; তারপর একখানা শাদা চৌকো খাম, বড়বাবু খুলে দেখলেন একটা বাংলা চিঠি। তিনটে কথা প'ড়েই বড়বাবুর চোখ বড় বড় হ'য়ে উঠল। কে এই লোকটা? সটান চিঠির নীচে চেয়ে দেখলেন, সই রয়েছে, 'তোমারই এক মাসের চেনা একটি লোক—হারাণ।' এ যে দেখছি সেই নতুন গ্র্যাজুয়েট একাউন্টস্ ক্লার্ক, হারাণচন্দ্র কারফর্ম্মা। ব্যাপার কি? তিনি আবার পড়লেন "ছুটির দরখাস্ত পেশ করেছি, সে ছুটি মঞ্জুর হ'লেই তোমাকে নিয়ে কার্ম্মাটার!" এর মানে?

বড়বাবু মোটেই বুড়ো ছিলেন না। তাঁর মুখখানি বেশ ফর্সা ছিল, দাড়ী-গোঁফ তিনি সযত্নে রোজ কামিয়ে আফিসে আস্‌তেন। পয়সার অভাব নাই, জবাকুসুম মেখে চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া কালো কালো ঘাড় পর্য্যন্ত থোকা থোকা হ'য়ে ঝুলত; মুক্তাবিন্দুর মতন ঘর্ম্মবিন্দুতে তাঁর মুখখানি হেজলিন্-লেপনের বার্ত্তা প্রচারিত কর্‌ত। তার ওপর তিনি একটু অতিরিক্ত রকমেরই পান খেতে ভালবাসতেন। তিনি জান্‌তেন যে কেরাণীকুলের মধ্যে তাঁর এই কমনীয় মুখচ্ছবি সম্বন্ধে নানারূপ পরিহাসোক্তি প্রচলিত আছে। ছিটকে কখনো তার দু'একটা কথা তাঁর কানেও এসেছিল। তাদের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য যে তাঁর কোঁকড়া চুল আর পানে রাঙা ঠোঁট, এ-ও তিনি জান্‌তেন। কিন্তু তা ব'লে এতদূর? আর নতুন কেরাণীর এত স্পর্দ্ধা! হারাণ কি হঠাৎ জমিদারের সম্বন্ধী হ'য়ে গেল! চাকরি, টাকা, তার কাছে কি এখন আর কিছুই নয়? সে কি জানে না, এর পরিণাম কি? দুর্ভিক্ষ, উপবাস, শুক্‌নো মুখ, উমেদারী এ সকলই কি সে ভুলে গেল? ওঃ লিখেছে দেখ! ডবডবে চাঁদ মুখ, চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভ, কে-ই বা বড় সাহেব 'জোন্স' কে-ই বা ম্যানেজার 'হ্যালিডে', তুমিই আমার সব, তুমিই আমার নিকটতম প্রভু,— স্বয়ং বড়বাবু! উঃ, অসহ্য! অসহ্য! তারপর আবার এটা কি? এ যে ছড়া!—আরে লেখে কি?

"ওরে আমার নতুন-পাওয়া বুল্‌বুলি?" উঃ, হতভাগা! একমাস আগে তুইই না বলেছিলি আপনার জুতো বুরুশ ক'রে দোব, পা টিপে দোব, আমায় চাকরিটা দিন্। খেতে পাচ্ছি না, না খেয়ে মলুম, যদি না দেন, তবে আত্মহত্যা করব!—ওরে পাজি! ওরে ছুঁচো! সে দিন একেবারে ভুলে গেছিস? আমিই চাক্‌রি দিলুম, আর আমাকেই কিনা—

"ওরে আমার নতুন-পাওয়া বুল্‌বুলি?"
"পান-খাওয়া লাল ঠোঁট দু'টি তোর,
ভোম্‌রা-কালো চুলগুলি?"

উঃ, ছোঁড়াটা লিখেছে দেখ! যেন বৌকে লিখ্‌ছে!

"হেলে দুলে লহর তুলে
পর্দ্দাঢাকা অন্দরে
যখন তুমি যাও গো চ'লে
তুফান ওঠে অন্তরে !"

ওরে হতভাগা ! আমার ঘরে না হয় একটা পর্দ্দাই টাঙানো আছে !

"তোমায় পেয়ে ধন্য আমি,
সব খাটুনি যাই ভুলি' ।"

ভোলাচ্ছি তোমায় !

"ওরে আমার নতুন-পাওয়া বুল্‌বুলি,
ওরে আমার নতুন-পাওয়া বুল্‌বুলি !"

সয়তান ! সয়তান ! বড়বাবুর মাথার মধ্যে হু হু ক'রে আগুন জলতে লাগ্‌ল । মুখ চোখ গরম হ'য়ে গেল, কোন কাজে আর মন বসাতে পারলেন না । কারণ, চিঠিখানা এই :—

আমার প্রাণের বড় সাহেব,

তোমাকে আজ একটা ভারী আনন্দের খবর দিচ্ছি । জানো, আমি একটা ছুটির দরখাস্ত পেশ করেছি, সে ছুটি মঞ্জুর হ'লেই তোমাকে নিয়ে কার্ম্মাটার ! আজ আমার মন খুশীতে ভরপুর । কি ক'রে যে নিজেকে প্রকাশ করি, বুঝতে পার্‌ছিনা । তোমার চাঁদমুখ, ডব্‌ডবে, ফর্সা, স্বেদ-সিক্ত—'সেই মুখখানি' আমি রোজই স্বপ্নে দেখি । তোমার একটা ছবি আমি কবিতায় এঁকেছি, নীচে দিলুম । তুমিই আমার এ জীবনের সাধনা ; তোমাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ ফল-লাভ ! কেই বা বড় সাহেব 'জোন্স', কে-ই বা ম্যানেজার 'হ্যালিডে', তুমি-ই আমার সব, তুমিই আমার নিকটতম প্রভু, স্বয়ং বড়বাবু ! তুমিই ম্যানেজার, তুমিই আমার বড় সাহেব !

"ওরে আমার নতুন-পাওয়া বুল্‌বুলি !
পান খাওয়া লাল ঠোঁট দুটি তোর
ভোম্‌রা-কালো চুলগুলি !
হেলে দুলে লহর তুলে
পর্দ্দা ঢাকা অন্দরে
যখন তুমি যাওগো চ'লে
তুফান ওঠে অন্তরে !
তোমায় পেয়ে ধন্য আমি,
সব খাটুনি যাই ভুলি !
ওরে, আমার নতুন-পাওয়া বুলবুলি !
ওরে, অমার নতুন-পাওয়া বুলবুলি !"

ইতি,
তোমারই
এক মাসের চেনা
একটি লোক—
"হারাণ"

অস্থির হ'য়ে বড়বাবু তখনি একটা 'স্লিপ্‌', লিখে বেয়ারার হাতে দিলেন :—

Haran Chandra Karforma, wanted in my room.

উল্লসিত হারাণ 'জয় মা দুর্গা' ব'লে চেয়ার ছেড়ে চাপ্‌রাশির পিছু পিছু চল্‌লো । যেতে যেতে ভাব্‌লে, তবে বোধ হয় বড়বাবু সদয় হয়েছেন । তারপর কল্পনা-প্রিয় কবি-প্রকৃতি হারাণের মানস-নেত্রে ফুটে উঠ্‌ল, 'সুট-কেশ' হাতে ট্রেন থেকে অবতরণ, শ্যালকের সহাস্য অভিবাদন, এবং উপসংহারে কনকলতার সহিত প্রণয় আলাপন । কিন্তু তাকে এই স্বপ্নরাজ্য থেকে হঠাৎ রূঢ়ভাবে বাস্তবের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে এল বড়বাবুর সুতীব্র কণ্ঠের ক্রুদ্ধ সম্ভাষণ ।

"বলি হতভাগা, পাজি, বেল্লিক, এ সবের মানে কি ?" হারাণ প্রথমটা কিছুই বুঝ্‌তে পারলো না, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে বড়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল । শেষে অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, "আজ্ঞে আমি ত খালি ছুটির দরখাস্ত করেছিলাম, তাতে কি এতই দোষ হয়েছে ?"

বড়বাবু ভীষণ চ'টে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ, ছুটির দরখাস্ত করেছিলে, আমায় কার্ম্মাটারে নিয়ে যাবে না ? খুশীতে মন ভরপুর হ'য়েছে ; বটে ! ওরে হতভাগা ! আমি তোমার অন্নের যোগাড় ক'রে দিলুম, আর আমারই সঙ্গে ঠাট্টা ? পাজি ছুঁচো, আমি তোমার নতুন-পাওয়া বুলবুলি, না ?"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

এত দুঃখ ত্রাসেও বড়বাবুর শেষ কথাটি শুনে হারাণের ভয়বিহ্বল মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিলে। বড়বাবুকে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে সে কি একটা বল্‌তে গেল, কিন্তু বড়বাবু হারাণের কথা শোনবার কোনো আগ্রহ না রেখে তীক্ষ্ণ মিহি স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "আবার হাসি হচ্চে!—পাজি, Impertinent!"

নিমেষের মধ্যে হারাণের মুখে হাসি মিলিয়ে গেল; শুষ্ক মুখে সে বল্‌লে, "আমার কথাটা দয়া ক'রে যদি একবার শোনেন বড়বাবু। আমি—

"না শুনবো না-আ-আ আ!"

"ও চিঠিটা আমি—"

"চু-উ-উ-উ-প্‌।"

"ও চিঠিটা আমি আপনাকে—"

উচ্ছ্বসিত ক্রোধে বড়বাবুর কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উদ্যত মুষ্টি বাগিয়ে হারানকে তাড়া কর্‌লেন। "বেরোও, বেরোও বল্‌ছি উল্লুক!"

বিস্মিত, ভীত, বিমূঢ় হারাণ একটা কথাও বলবার অবকাশ পেল না; এবং আর কিছু বুঝ্‌তে পারুক আর না পারুক তন্মুহূর্ত্তে সেই কক্ষ ত্যাগ করা যে সম্পূর্ণ উচিত, সে কথাটুকু নিঃসন্দেহে বুঝ্‌তে পার্‌লো। তাড়া খেয়ে তাকে বেরিয়ে আস্‌তে হ'ল একেবারে রাস্তায়। পাশ দিয়ে একটা রিক্স-ওয়ালা 'খবরদার খবরদার' বল্‌তে বল্‌তে ছুটে বেরিয়ে গেল। ফুটপাথে উঠেই, হারাণ মেসের পথ ধর্‌ল।

৪

এই ঘটনার পর দ্বিতীয় দিনে মেসের তপেশ বাবু হারাণকে ডেকে বল্‌লেন, "ওঃ! হারাণবাবু যে মস্ত লোক হ'য়ে পড়েছেন দেখ্‌ছি! যান্‌ যান্‌, দু'খানা মোটা খামের চিঠি আছে।" পেরেকে ঝোলানো তোব্‌ড়ানো বিস্কুটের টিনের 'লেটার-বাক্সটা' হাৎড়ে হারাণ দেখ্‌লে সত্যি সত্যিই তার নামে দু'খানা খাম এসেছে। একটার ঠিকানা 'টাইপ্‌' করা। সেখানা তখুনি ছিঁড়ে খুলে ফেলে হারাণ দেখ্‌লে মাত্র দেড় ছত্র লেখা:

Haran Chandra Karforma is dismissed for gross misbehaviour.

C. F. Jones.
Chief Manager,
Mc Pherson & Co.

অর্থাৎ বড় সাহেব জোন্স্‌ হারাণচন্দ্রকে জানাচ্ছেন যে বে-আদবীর জন্যে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হ'ল। বরখাস্ত ত আগেই হ'য়েছে, যেদিন বড়বাবুর ঘুঁসি এড়িয়ে 'রিক্স' চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিয়ে সে ভাল-মানুষের মত মেসের কোণ আশ্রয় করেছে।

অপর চিঠিখানি এসেছে স্ত্রী কনকলতার কাছ থেকে। সেখানা নিয়ে হারাণ নিজের ছেঁড়া মাদুরের 'সিটে'র ওপর বস্‌লো। চিঠিখানায় লেখা ছিল,—

সমীপেষু,—

আপনার চিঠিখানা প'ড়ে, আপনার জঘন্য রসিকতার পরিচয় পেয়ে আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছি। আপনি যে আমাকে এরকম অপমানসূচক নীচ ইঙ্গিত ক'রে ঠাট্টা কর্‌তে পাবেন, তা আমার ধারণা ছিল না। আমি আপনার চিঠিটা ফেরৎ পাঠালাম। এ চিঠি আমি নিজের কাছে রাখ্‌তে পারি না; নষ্ট করাটাও আমার পক্ষে উচিত হবে না। আপনি আমায় আর চিঠিপত্র দেবেন না। ইতি—

তলায় একটা নাম সই পর্য্যন্ত নেই। বড়বাবুর উদ্দেশে লেখা চিঠিখানাও এই সঙ্গে ফেরৎ এসেছে। হারাণের মাথায় চট্‌ ক'রে একটা ফন্দী যোগালো। সে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে লিখ্‌লে:—

শ্রীচরণকমলেষু,

বড়বাবু, আমি সেদিন একটা মারাত্মক ভুল ক'রে ফেলেছিলাম, আর তাতেই আমার চাক্‌রি গেল। চাক্‌রি গেল যাক্‌, কিন্তু আপনার মত সদয়, দরিদ্র-বৎসল, সহৃদয় লোক যে একটা ভুলের জন্যে আমার সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘৃণিত ধারণা পোষণ কর্‌বেন এটা আমার মনে বড় ব্যথা দেয়। বড়বাবু, আমি অকৃতজ্ঞ নই; আমার যদি আর চাকরি না জোটে, আমি যদি খেতে না পেয়ে 'ফুটপাথে' শুয়েও মরি, তবু আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি আপনার

দয়ার কথা স্মরণ করবো। আমি যখন কোনোদিন পরের অনুগ্রহে খেয়ে, কোনোদিন উপোস ক'রে, একটা চাকরির জন্যে 'মরিয়া' হ'য়ে ঘুরছিলাম, তখন আপনি আমাকে দেবতার মত নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই আপনাকে আমি যদি, প্রকাশ্যে ত দূরের কথা, মনে মনেও কখনও অভক্তি ক'রে থাকি তবে আমার নরকেও স্থান হবে না। বড়বাবু, আপনি যে চিঠিখানা সেদিন পেয়ে আমার ওপর রাগ করেছেন, সেখানা আমার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা। আপনি জানেন কিনা জানিনা, প্রায় একমাস আগে, চাকরী হবার ছ'দিনের আগু-পিছুতে, আমার বিবাহ হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার 'মেল্-ডে' থাকায় আমার পরিশ্রমটা কিছু অতিরিক্ত রকমেরই হয়েছিল। সেই জন্যে আমি আপনাকে কয়েকদিনের ছুটির জন্যে, আর আমার জায়গায় আগে যে দু'জন লোক ছিল তাদের দু'জনের কাজ আমায় একলা করতে হয়, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। এই চিঠিগুলো যখন লিখি তখন রাত সাড়ে বারোটা, আমি ঘুমে ঢুলছিলাম, খামে দেবার সময় চিঠিগুলো উল্টোপাল্টা চ'লে গেছে, আর তা হ'তেই এই বিভ্রাট। প্রমাণস্বরূপ আপনাকে লেখা যে চিঠিখানা আমার স্ত্রীর কাছে গিয়েছিল সেইখানা, ও সে সম্বন্ধে আমার স্ত্রী যে জবাব দিয়েছে সেটাও, এই সঙ্গে পাঠালাম। আপনি দেখে বুঝতে পারবেন যে আমার এই ভুল সেখানেও কি অনর্থের সৃষ্টি করেছে। আপনি বুদ্ধিমান, আশা করি সমস্ত বুঝতে পারবেন; আর এই অধম সেবক যে ইচ্ছে ক'রে বা আপনাকে পরিহাস করবার জন্যে ও চিঠি পাঠায় নাই, তাও বুঝবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

হারাণচন্দ্র কারফর্ম্মা

এই চিঠিখানার সঙ্গে হারাণ খাম সমেত তার স্ত্রীর চিঠি আর বড়বাবুকে লেখা সেই আগের চিঠিখানা একটা আলপিন্ দিয়ে গেঁথে রেজিষ্ট্রী ডাকে পাঠিয়ে দিলে। আর কনকলতাকেও একখানা চিঠি লিখ্‌লে :—

প্রিয়তমা,

আমি একটা মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছি। ঘুমের ঘোরে আমাদের অফিসের বড়বাবুকে লেখা চিঠিখানা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, আর তোমার চিঠিখানা চ'লে গেছে তাঁর কাছে। বুঝ্‌তেই পারছ বড়বাবুকে আমি দিন কয়েকের ছুটির জন্যে লিখেছিলাম। সে ছুটি পেলে, তোমায় নিয়ে এবার কার্ম্মাটারে দিদির বাসায় সপ্তাহখানেক ঘুরে আসবার ইচ্ছে ছিল। এই ছুটির কথা আর বেড়াবার কথা লেখবার সময় মনে আমার এমন আনন্দ হ'য়েছিল যে তোমার নামে চিঠির মধ্যে একটা কবিতাও বেঁধে ফেলেছিলাম। তোমায় বলেছিল'ম,

'ওরে আমার নতুন-পাওয়া বুল্‌বুলি......' ইত্যাদি। চিঠিতে তোমাকে আমার 'প্রাণের বড়বাবু' ব'লে সম্বোধন করেছিলাম। চিঠি প'ড়ে বড়বাবু ভাবলেন যে আমি বুঝি তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করেছি। ফলে তিনি ত মার-মূর্ত্তি হ'য়ে আমাকে অফিস্ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, আর সেইদিন থেকে আমার চাকরিটিও গেল। বুঝতে পারলে ত আসল ব্যাপারটা কি? আশা করি এর পর আর আমার ওপর তোমার রাগ থাকবে না। আর বুঝতে পারবে যে তোমাকে নিয়ে আমি কোনো জঘন্য পরিহাস করি নি। ভয়ানক ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমের ঘোরে যে ভুলটা ক'রে ফেলেছি, আশা করি তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে। ইতি,

আশীর্ব্বাদক
শ্রীহারাণচন্দ্র

৫

তিন দিন পরের কথা। পেরেকে ঝুলানো তোবড়ানো বিস্কুটের টিনের 'লেটারবাক্সটায়' হারাণবাবুর নামে দু'খানা খাম এসে পৌছোলো। একখানা টাইপ ক'রে জোন্স্ সাহেবের সই দিয়ে লেখা :—

The Chief Manager regrets his mistake in dismissing Babu Haranchandra Karfarma. He is re-appointed in his former post on an increased salary of Rs. 50/- per month. He may join at once.

হারাণের নির্জীব দেহটায় যেন তড়িৎ খেলে গেল। তার ভারী মনটা এক মুহূর্ত্তে নির্ভাবনায় হালকা হ'য়ে

শ্রীরামেন্দু দত্ত

উঠ্‌লো। অপর চিঠিখানা খুলে সে দেখ্‌লে যে কনকলতা তার নিজের ভুলের জন্যে অনেক দুঃখু করেছে। হারাণের এই দুঃসময়ে সে যে তাকে "তুমি আর আমায় চিঠি দিও না।" ইত্যাদি লিখে মনে কষ্ট দিয়েছে এর জন্যে তার অনুতাপের, লজ্জার অন্ত নেই। এই রকমের আরও কত কি কথা! চিঠির শেষ দিকটায় সে হারাণকে খুব খানিকটা সান্ত্বনা দিয়েছে। লিখেছে, "দুশ্চিন্তা কোরো না, তুমি পুরুষমানুষ তোমার ভাবনা কি? আজ চাকরি গেছে, কাল আবার হবে। আমি যদি সত্যিই একমনে নারায়ণকে ডেকে থাকি তবে হয়ত চিঠি পড়তে পড়তেই তোমার চাকরির যোগাড় হবে।......"

চিঠিখানা হারাণ আবেগভরে বুকে চেপে ধর্‌লো, বল্‌লো "এই, এই ত। এরাই হিন্দু সতী! সত্যবানকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল কে? সে এরাই। এদেরই শুভ কামনা যুগে যুগে হিন্দু গৃহে স্বামীর অক্ষয় কবচ হ'য়ে আছে।" চিঠির শেষ দিকটায় কনকলতা স্বামীর মনকে ভাল-করবার জন্যে বেছে বেছে অনেকগুলি মিষ্টি কথা বলেছে। আজ আনন্দ, আনন্দ! হারাণের ইচ্ছে করছিল যে লাফিয়ে কড়িকাঠের সঙ্গে নিজের মাথাটা ঠুকে ভেঙে ফেলে।

গামছা বালতি নিয়ে, চৌবাচ্ছার পাড়কে মুখরিত ক'রে হারাণ স্নান সমাপন করলো। উড়ে ঠাকুরটাকে অদ্ভুত উৎকল ভাষায় উত্যক্ত ক'রে উচ্চকণ্ঠে তাড়াহুড়ো দিয়ে হারাণ মহা সোরগোল সহকারে খাওয়া শেষ করলো। তপেশ বাবুরা বল্‌লেন "ওহে হারাণ বাবু, আজ তোমার হ'ল কি?" পাগলের মত হো-হো ক'রে হেসে, হারাণ তাদের কাউকে কোনো জবাব না দিয়ে, আপনার ভাবে আপনিই বিভোর হ'য়ে, পায়ে যেন ঘোড়া বেঁধে আপিস পানে ছুটলো! আপিসে পৌঁছেই প্রথমে বড়বাবুর খাস কামরায় ঢুকে, প্রণাম ক'রে, মাথা চুলকোতে আরম্ভ করে দিল।

বড়বাবু জিগ্‌গেস করলেন, "কি হে হারাণ, ব্যাপার কি?"

আম্‌তা আম্‌তা ক'রে হারাণ বল্‌লে, "আজ্ঞে, তা—আজ্ঞে, তা—আমার বড় লজ্জা করছে। সেই চিঠিখানা—"

কৌতুক-হাস্যে মুখখানি উজ্জ্বল ক'রে বড়বাবু চিঠির ফাইল থেকে হারাণের চিঠিখানা বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "ওহে, তোমার নতুন-পাওয়া বুল্‌বুলিটিকে আর পাড়াগাঁয়ের ঝোপে জঙ্গলে ছেড়ে না রেখে নিজের খাঁচায় এনে পোরো না? বাসা কর হে, কলকাতায় বাসা ক'রে থাক।"

হারাণ দেখ্‌লো এই ত সময়!

"আজ্ঞে, এই মাইনেতে—"

"হবে হে, হবে। এখন ত পঞ্চাশ হ'ল; আনো আনো, বাসা ক'রে থাকো, ওসব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় হারাণের বুক ভ'রে উঠ্‌লো, সে আর একবার বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে যখন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে, তখন বড়বাবু আবার হেঁকে বল্‌লেন,—

"ওহে হারাণ, শোনো! তোমার বারোদিনের ছুটি মঞ্জুর হ'য়ে গেছে। বুল্‌বুলির সঙ্গে কার্ম্মাটারে দিনকতক হাওয়া খেয়ে এস!"

সাঁওতালী গান

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

পথ চলার গান

"পরুয়া দারু" পান ক'রে প্রাণ চাঙ্গা ক'রে নে
ভাইয়া রে ভাইয়া,
মিষ্টি মদে শুক্‌নো তোর ও কণ্ঠ ভ'রে নে
ভাইয়া রে ভাইয়া।

ভাইয়া রে ভাইয়া,
"পরুয়া দারু" পান ক'রে প্রাণ চাঙ্গা ক'রে নে
ভাইয়া রে ভাইয়া।
(মাদল্—দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং দিপির্ দিপাং তাং
বাঁশী—তুতু তু আ উতু তু আ তুতুর্ তু আ তু...)

যেতে হবে অনেক দূর,—
অনেক দূর
মধুপুর,—
বাঁশী বাজা সুমধুর—
ভাইয়া রে ভাইয়া,
"পরুয়া দারু" পান ক'রে প্রাণ চাঙ্গা ক'রে নে—
ভাইয়া রে ভাইয়া।

আসবে নেমে আঁধার রাত,—
আঁধার রাত
অকস্মাৎ—
ধরব আমি তোমার হাত—

মেয়েদের গান

আমার ঘরের প্রদীপ হায়
আঁধার রাতে কে নিলো ?
ভয়েই আমার কাঁপ্‌ছে বুক—
ও সই কোথায় গেলি লো ?
কোথায় গেলি সই ?
এলো এলো আঁধার রাত
কোথায় গেলি সই ?
ওই যে দোরে আওয়াজ জোর—
চোর বুঝি বা,—লাগ্‌ছে ত্রাস—
স্বামী গেছে বিদেশ গাঁয়—

পরুয়া দারু · ধেনো মদ।

সাঁওতালী গান

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

টের পেয়েছে, সর্ব্বনাশ !
কোথায় গেলি সই ?
এলো এলো চামার চোর
কোথায় গেলি সই !

হঠাৎ আলো চমকালো
বাদল মেঘের বুক চিরে,
সেই আলোতে দেখনু ঠিক
আমার স্বামীর মুখটি রে ।

চোর এসেছে, বাস্তবিক—
ধর্‌লো ছি ছি আমার হাত—
আমার চিবুক চুম্‌তে চায়
লজ্জা কি নাই, কী বজ্জাত্‌ !
কোথায় গেলি সই ?
আজ্‌কে আমার সর্ব্বনাশ
কোথায় গেলি সই ?

কোথায় গেলি সই ?
আমার স্বামী ফির্‌লো ঘর
নাই বা এলি সই ।

(মাদল—ধিতাং ধিতাং তুরর্‌ ধিতাং......
বাঁশী—তুতুর্‌ তু আ উতুর্‌ তু অা তু......)

ছড়ায় চট্টগ্রামের পারিবারিক জীবন

মোহাম্মদ এনামুল হক

নিখিল বাঙ্গলার যাবতীয় স্থানে ছড়া গাহিয়া আমোদ উপভোগ করিবার প্রথা বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রচলিত। অল্প বিস্তর এই নিয়ম পৃথিবীর সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় ছড়ার প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে, দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সভ্যতা ও পারিবারিক জীবনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব উজ্জ্বলভাবে আমাদের নিকট ধরা দেয়। এইগুলি আর যাহার নিকট যত মূল্যবান হউক, সাহিত্যিকদিগের নিকট, রসের দিক দিয়া, কলার দিক দিয়া সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইলে কম মূল্যবান নহে। এই সকল ছড়া এক একটি অফুরন্ত রসের ফোয়ারা; সাহিত্য-সুধাসেবিগণ সেই ছড়াগুলির মধ্যে জহুরীর মত মাণিক্যের সন্ধান পাইবেন, এই ভরসায় বুক বাঁধিয়া, নীরস পারিবারিক চিত্রের পাশে পাশে রসের সমাবেশ করিবার জন্য আমরা অগ্রসর হইলাম। অবশ্য যে সমুদয় পারিবারিক চিত্র এই সকল ছড়ার মধ্য দিয়া গৃহকারারুদ্ধ কুলবধূর ন্যায় উঁকি মারিয়া বাহির হইতেছে তাহারও যে একটা মনোহারিত্ব নাই, একটা সরস কোমলতার স্ফুরণ নাই, সে কথা অস্বীকার করিবে কে?

চট্টগ্রামের সাধারণ পরিবারের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমোদ উপভোগ করিবার যে ধারা আছে, তাহা বাস্তবিকই অনুশীলনের যোগ্য। কচি কচি ছেলে-মেয়েদের মুখ দিয়া অবাধগতিতে যে সকল ছড়া নির্ঝরিণীর স্নিগ্ধতা ও কোমলতা বহন করিয়া চঞ্চল ক্রীড়া-ভঙ্গিতে স্ফুরিত হয়, তাহার পশ্চাতে একখানি পরিপূর্ণ সংসারের যে সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদের ছবি ভাসিয়া আসে, তাহাকে ত কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। সুরধারায় বিভোর হইয়া আমরা সমাধিস্থ হইতে পারি, বালকের মনস্তত্ত্বের কথা চিন্তা করিয়া আমরা নবীন তথ্যের সন্ধান পাইতে পারি, কিন্তু দৃষ্টি শক্তিকে ফিরাইয়া লইয়া একবার অন্দরের দিকে মুখ ফিরাইলে, আমাদিগকে কি কচি শিশুগুলি টানিয়া আনিয়া তাহাদের পিতামাতার স্তরে দাঁড় করাইয়া দেয় না?

সাধারণত দেখা যায়, যেখানকার ছেলেমেয়েই হউক, শহরে জন্মগ্রহণ করিলে বিলাস-সম্ভার-পরিপূরিত আধুনিক নগরগুলির সংস্পর্শে তাহারা বেশ একটু বিলাসী হইয়া পড়ে। বেশ-ভূষা এবং নানা বিদেশীয় অনুকরণে দেশীয় খেলনাগুলির প্রতি ইহাদের মন আকৃষ্ট হয়। গ্রাম্য শান্ত-মধুর জীবনের সরল আনন্দদায়ক ক্রীড়া এবং আমোদ-প্রমোদের সহিত ইহাদের কোন পরিচয় বা সম্বন্ধই থাকে না। এই জন্য আমাদের বক্ষ্যমান ছড়াগুলির সহিত শহরের লোকের, এবং যে দেশে এইগুলির প্রচলন নাই সেই দেশের অধিবাসীর হয়ত কোন সহানুভূতি থাকিতে পারে না। কিন্তু এইগুলির যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও কবিত্ব আছে, এইগুলি যে কেমন করিয়া গ্রাম্য সরল শান্ত-মধুর জীবনের ইতিহাস বা কাহিনী ঘোষণা করিয়া বেড়ায়, এইগুলি যে গ্রাম্য সমাজ পরিবার এবং বিশেষত বালকের কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ের ক্রীড়াশীল প্রতিকৃতি প্রদান করে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে প্রয়াস পাইব। অবশ্য গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, চট্টগ্রামের সকল অংশের সমস্ত ছড়া সংগ্রহ করিয়া তুলনামূলক সামঞ্জস্য দেখাইবার মত সুযোগ এখনও আমাদের ঘটে নাই। আমরা কেবল চট্টগ্রামের পারি-

এই প্রবন্ধ রচনায় বন্ধুবর মৌলবী ফজলুল করিম বি, এ, সাহেবের নিকট হইতে ছড়া-সংগ্রহ-ব্যাপারে এবং আরও নানা বিষয়ে আমি যে অযাচিত সাহায্যলাভ করিয়াছি, তাহা না হইলে, ইহা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। এই জন্য আমি তাঁহার নিকট একান্তই কৃতজ্ঞ। লেখক।

মোহাম্মদ এনামুল হক

বারিক জীবনের দিকটিই পাঠকের নিকট তুলিয়া ধরিতেছি। তবে স্থানে স্থানে ছড়াগুলির মধ্যে যে কবিত্বের ছাপ রহিয়াছে তাহার আভাসও সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর থাকিবে।

আমাদের এই ছড়াগুলি আলোচিত হইবার পূর্ব্বে ইহাদের রচনা-সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। চট্টগ্রাম প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। প্রকৃতি আপন হ'তেই এ দেশের বালক বালিকাকে Wordsworth-এর Lucy-র ন্যায় গড়িয়া তোলে। একে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ, তদুপরি প্রকৃতির এই অযাচিত অনুগ্রহে চট্টগ্রামের বালক বালিকারা যেন সুরময় হইয়া উঠে। ইহারা এইগুলির অর্থ বুঝে না, কিম্বা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও মাথা ঘামায় না। এই ছড়াগুলি সুর করিয়া সমস্বরে বিহ্বলতার সহিত আবৃত্তি করিতে করিতে, ইহাদের কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ের মাঝখানেই বুঝিবার জন্য সকল চেষ্টা নিমজ্জিত হইয়া যায়। সুখে দুঃখে সমানভাবে সদানন্দ মনে তাহারা মনের কথাগুলিকে সুর করিয়া গাহিয়া বেড়ায়। তাই তাহারা না বুঝিয়াও বুঝে, না জানিয়াও উপলব্ধি করে, এবং অকবি হইয়াও কবি হইয়া পড়ে। অন্তরই এগুলির পরীক্ষাস্থল, অন্তরই এ গুলির জন্মদাতা। কাঞ্চন কষ্টিতেই কষিত হয়; মর্ম্মর কেমন করিয়া ইহার স্বাভাবিকতার পরিচয় দান করিবে? উন্নত সাহিত্য যেমন মানুষকে সাধারণ ক্ষেত্র হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া লয়, এই স্বভাব-সঞ্জাত ছড়াগুলিও তেমনি ছেলে মেয়েগুলিকে আনন্দের সোনার রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। আমাদের বালক বালিকারা যখন সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া নাচিতে নাচিতে এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করে, তখন মনে হয়, আমরা আবার বালক হইতে পারিনা কেন? মনে হয়, ইহাদিগকে পুত্রকন্যা, পৌত্র-পৌত্রী এবং প্রপৌত্র-প্রপৌত্রীর স্তর হইতে টানিয়া আনিয়া আবার ভ্রাতা ভগ্নীর গলাগলির স্তরে লইয়া আসি। আমার মনে হয় এগুলি যেন পরশ পাথর, ছুঁইলেই আমি সোনা হইয়া যাইব। এই হিসাবে চট্টগ্রামের বালক কবির রচিত এই গাথাগুলিকে, তাহাদের সম্পূর্ণই অজ্ঞাত ও অনিচ্ছাকৃত সাহিত্য-সাধনা বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে।

> "ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্ত্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশু মূর্ত্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্ব্ব প্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু সাহিত্য; —তাহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।
>
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালক বালিকারাই এগুলি রচনা করে এবং তাহারাই এগুলি আবৃত্তি করে। সেই জন্য বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বালকসুলভ অবাধ গতি এবং চঞ্চলচিত্ততার ছাপ এগুলির প্রতি ছত্রে উঁকিঝুঁকি মারিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে। বালক বালিকা যেমন আপন সুখে অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতিতে ইচ্ছামত নাচিয়া বেড়ায়, তেমনই এই ছড়াগুলি ইহাদের সেই বন্ধনহীন নৃত্যভঙ্গী বহন করিয়া ইচ্ছামত নাচিয়া চলিয়াছে; অথচ ইহাদের এই স্বেচ্ছাধীন নর্ত্তনের মধ্যে যে মাধুর্য্য যে স্নেহ ও প্রীতির তরঙ্গ আমাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিত নর্ত্তনের চেয়ে বেশী আনন্দ দান করে, তাহা পূর্ণমাত্রায় এই চল-চঞ্চল হিল্লোলিত ছড়ামালায় উপ্‌ছিয়া পড়িতেছে। তাই, শিশুর হইলেও ইহারা আমাদিগকে আনন্দ দান করে, বালকের হইলেও বৃদ্ধকে লইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, বাহ্যত শিশুর সম্পদ হইলেও বস্তুত বিশ্বজনীন।

এই ছড়াগুলি বালকের রচিত বলিয়া, এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিতে সামঞ্জস্য খুঁজিতে যাওয়াও বৃথা। বালক যেমন মায়ের হাতের হলুদে মূল্যবান জিনিষটির জন্য অঞ্চল টানিয়া কাঁদিতে থাকিলে মা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের লাল জিনিষটি দেখাইতেই হলুদেটি পরিত্যাগ করিয়া লাল জিনিষটি লইবার জন্য লাফাইয়া উঠে এবং কাঁদিতে থাকে, ঠিক

তেমনই বালক-মনের প্রকৃতিসঞ্জাত বলিয়া এই ছড়াগুলিও এক কথা হইতে হয়ত হঠাৎ লাফাইয়া কথান্তরে চলিয়া গিয়াছে। ভাবের সামঞ্জস্য যেখানে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়-না সেখানে ছন্দের সামঞ্জস্যও আশা করা যাইতে পারেনা। বালকের আপন মনের আপন ছন্দেই এই গুলি স্ফুরিত, বালকজীবনের আপন কথাই এগুলিতে গীত, তাহাদের সুখ-দুঃখের, হর্ষ বিষাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবিই এগুলিতে অঙ্কিত। কিন্তু এই চিত্রগুলির পৃষ্ঠপটে (Back-ground) যে আর কতকগুলি চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য।

এখন আমরা ছড়াগুলি আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব; কিন্তু ছড়াগুলি আলোচনার পূর্ব্বে চট্টগ্রামী উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিলে বাঙ্গলার অপরাপর জিলার লোকের পক্ষে ঠিক করিয়া পাঠ করা অসুবিধা হইবে। কেননা অপর জিলার ন্যায় চট্টগ্রামের accentuation (উচ্চারণ প্রণালী) এক নহে। সকল উচ্চারণ প্রণালী এখানে আলোচনা করা সম্ভব নহে; তাই অতি বিশিষ্ট প্রণালীর মাত্র দুই একটি উল্লেখ করিতেছি:—

(১) যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণগুলির গোড়ায় হসন্ত (্) চিহ্ন দেওয়া হইল, চট্টগ্রামে একেবারে বদ্ধস্বরে উচ্চারিত হয়; আর যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দের একেবারে শেষ অক্ষর অথচ হসন্ত দেওয়া হয় নাই, তাহার পশ্চাতে একটী (অ) উচ্চারণ করিতে হইবে যথা:—বারীত্ = বাড়ীতে;

খাইছ্ = খাইতে থাকিও;

নানার বারীত্ = নানার (অ) বারীত = নানার বাড়ীতে;

(২) স্বরবর্ণের তলায় হসন্ত হইলে, সেই স্বরবর্ণের স্বরকে অতি হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, যেমন:—

হউ্র = হউর (অ) = শ্বশুরের

(৩) "ট" অক্ষরটি সকল সময় "ড"এর মত উচ্চারিত হয়:—

হাডত্ = হাটেতেঁ; ঘাঁড্ = ঘাট

(৪) বাঙ্গলার অসমাপ্ত ক্রিয়ার "তেছে" "তেছ" "তেছি" প্রভৃতি "যো" বা "ন্দে" দ্বারা সমাপ্ত হয়; যথা:—

খাযো = খাইতেছে; খাই্যো = খাইতেছি;

লই্ন্দে = লইতেছি বা "লইয্যে"।

(৫) তৃতীয়া বিভক্তির একবচন বা বহুবচনের চিহ্ন "হইতে"-এর স্থানে "ত্তু্ন" হয়, যথা:—

আঁর্ত্তুন = আমার নিকট হইতে, ভাইয়ত্তু্ন = ভাই হইতে।

(৬) "অ" অক্ষর যেখানে পরিষ্কার করিয়া কোন শব্দের শেষে লিখা হইল, তাহা অতি দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়; তখন ইহার অর্থ, "তোমাকে" শব্দের পরে "ও" অক্ষর বসান হইলে যেরূপ সেইরূপ হইবে, যথা:—

ভাই্য়রে অ = ভ্রাতাকেও;

এখানে অ = অ—অ।

(৭) ড় উচ্চারণ বাঙ্গলার র এর মত, যথা:—

বারী = বাড়ী; ঘরি = ঘড়ি; ছরি = ছড়ি।

(৮) "শ ও স" কোন কোন স্থলে "হ"এর মত উচ্চারিত হয়, যথা:—হউ্র = শ্বশুর (এখানে পরের শ টা লুপ্ত হইয়া উ টা খুব হ্রস্ব হইয়া গিয়াছে)। হাত্ = হস্ত বা সাত নামক সংখ্যা।

এবার ছড়াগুলি আলোচনা করা যাক:—

তাই, তাই, তাই,
নানার বারীত্ যাই,
নানীয়ে দিয়ে কেলা-মোলা
দুয়ারত্ বই খাই।

অর্থ:—দিয়ে = দিয়াছে; কেলা-মোলা = কলা ও মুড়ির লাড়ু; দুয়ারত্ = দরজায়; বই = বসিয়া।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের নিকট নানার বাড়ী কত প্রিয় সে আমাদের বালকেরাই জানে। বিশেষত যদি নানী জীবিতা থাকেন, নাতি নাতিনীর আদরের কোনই সীমা থাকে না। আমাদের বর্ত্তমান ছড়াটিতে নাতি নাতিনীর প্রতি নানীর স্নেহের যে মনোজ্ঞ চিত্র আমাদের বালক বালিকাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, তাহা বালক অতি সরল কথায় বলিতেছে। আমাদের শিশু কবির নিকট নানা-নানীর অন্য কোন গভীর আদরের কথা মনে পড়িতেছে

মোহাম্মদ এনামুল হক

না, কিন্তু সে নানার বাড়ীর দুয়ারে বসিয়া হয়ত পা নাড়িতে নাড়িতে যে কলা-মুড়ি খাইয়াছে সেই চিত্রই তাহার হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে।

উপরের ছড়াটিতে ছন্দের কোন মিল নাই। এইরূপ এই প্রবন্ধের বক্ষ্যমান কোন ছড়াতেই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অনিয়মের মধ্যেও, এই ছন্দ-বন্ধনহীনতার মাঝখানেও, একটি মিল, একটি ললিত ছন্দ, একটি গতির সামঞ্জস্য উঁকি মারিয়া বাহির হইতেছে; ইহাই এ সমুদায় ছড়ার বিশেষত্ব। ইহাই বালকের মনের উপর অলক্ষিতে ক্রিয়া করে, ইহাই তাহাকে এক মুহূর্ত্তেই বাবার বাড়ীর পাঠশালার কঠোরতার কথা ভুলাইয়া, নানার বাড়ীর অত্যাদরের স্বপ্নরাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। বালক দেখে, বাবার বাড়ীতে মাষ্টারের নিকট পড়িতে হয়, পড়া না পারিলে মার খাইতে হয়, আবার বাড়ী ফিরিয়া মাষ্টারের বিরুদ্ধে বাবার নিকট আবেদন করিলে বাবা মারেন, হয়ত বাবার মারের কথা মার কাছে বলিতে গেলে, তাহার সোনার চাঁদ দুলালকে বাবা কেন মারিল, বাবার উপর এই অভিমানে মাও দুই ঘা বসাইয়া দেন। কিন্তু সে যখন মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ীতে যায়, তখন কোন কঠোরতা থাকে না, সে কেবল নানা নানীর আদরের মধ্য দিয়া স্বাধীনভাবে নানা আবদার করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। বালকের নিকট এই যে চির-সমুজ্জ্বল সুখ ও আনন্দের নেশা, তাহা ছড়াটির প্রতিছত্রে বালকের প্রাণের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা বালককে যেমন আকুল করিয়া তোলে, আমাদিগকেও তেমনি বাল্যের সেই স্বর্গ-সুখের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (Bring unto me a tale of visionary hour)।

উপর্য্যুক্ত ছড়াটিতে কেবল সুখস্বপ্নের কথাই বিবৃত হইয়াছে; বালকের নানার বাড়ীর একটি সাধারণ সুখচিত্রই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বালকবীর নানার বাড়ীতে গিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া কি যে উৎপাত আরম্ভ করে, তাহার চিত্রও আমরা তাঁহার আপন তুলিকায় অঙ্কিত করিতে পারি :—

তা'—তা'—তা'
নানার বারীত্ যা,
নানীয়ে ন দের ফুলছাতি রইদে পোরের্ গা।
হাতত্তারগান্ বাঁধা দি ছাতি কিনা যা।

অর্থ ন দের = দিতেছে না; ফুলছাতি — ফুলের ছাতা; গা= শরীর; পোরের = পুড়িতেছে; রইদে — রৌদ্রের দ্বারা; হাতত্তারগান = হাতের "তার" নামক অলঙ্কার খানা; এখন এই অলঙ্কার খানার বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। বাঁধা = বন্ধক; দি = দিয়ে; কিনি = ক্রয় করিয়া

আমাদের বালক যখন নানার বাড়ীতে যায়, তখন সে স্বাধীন; তাহার মা তাহাকে শাসন করিলে আদরের নানী তাঁহার কন্যাকে গালি পাড়ে; নানা, মামা, মামী প্রভৃতি সকলের অব্যাহত প্রশ্রয়ে সে ছুটিয়া বেড়ায়। সে মনে করে নানার বাড়ী তাহার পক্ষে বাঞ্ছাকল্পতরু, কেননা নানার বাড়ীতে গেলে তাহাকে নূতন কাপড়, নূতন জুতা, নূতন জামা নানার পক্ষ হইতে দেওয়া হয়। তাই সে নানার বাড়ী গিয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গৃহে ফিরিয়া কষ্ট অনুভব করিল, তখন নানীকে হয়ত জড়াইয়া ধরিয়া আবদার করিয়া বসিল, "এই গরমের দিনে ফুলের ছাতা চাই।" সম্ভবত, সে তাহার কোন খেলার সাথীর নিকট পুষ্পখচিত রঙ্গিন ছাতা দেখিয়া আসিয়াছে, তাই ধন্না দিল, "ফুলের ছাতা চাই-ই।" তখন হয়ত নানী নাতির সহিত রগড় করিতে গিয়া বলিল, "লক্ষ্মীছাড়া! আমার হাতে টাকা নাই।" কিন্তু আতুরে নাতি ছাড়িবে কেন, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "না তা' হইবে না, তোমার হাতের তার বন্ধক দিয়া ছাতা দেও।"

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, চট্টলার "ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা" পল্লীর বালক বালিকারা প্রকৃতির হাতেই গড়িয়া উঠে। প্রকৃতি ও ইহাদের মধ্যে অলক্ষিতে যে জ্ঞাতিত্ব ও নৈকট্য স্থাপিত হইয়া উঠে, আমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব তাহা অনেক সময় নানা দেশের চিন্তাশীল পরিণত বয়স্ক মনীষীর বাণীর মধ্যে ধরা দিয়াছে। প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার মত

শক্তি ইহাদের নাই সে কথা মানি, কিন্তু অজ্ঞাতে ইহাদের মনে যে নিকট সম্বন্ধের ভাব আপনি উপলব্ধ হইয়া বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে দেশের বালক একখণ্ড কাঠকে, একটি তৃণের গুচ্ছকে আপন সন্তান, বা বৃক্ষের স্নিগ্ধছায়াতলকে আপন ঘর বলিয়া নিঃসঙ্কোচে, অসংশয়িতচিত্তে মানিয়া লয়, যে দেশের বালক তুচ্ছ ধূলা-রাশিকে একত্র করিয়া আপনার সহিত সম্বন্ধ পাতইয়া বসে, যে দেশের বালক নগণ্য মৃত্তিকাকে কর্দ্দম আকারে পরিণত করিয়া গায়ে মাখাইয়া অজানাদেশের স্নিগ্ধতা অনুভব করে, সে দেশের বালককে প্রকৃতির শিশু না বলিবার মত সাহস আমাদের নাই। নিম্নের কয়টি ছত্রে তাহাদের সে সম্বন্ধটুকু কেমন বালবিশ্বাসে ভরপুর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে নমুনা দেখুন :—

আম্‌পাতা কাট্‌ল্ পাতা,
তারা সোদ্দ্‌র্ ভাই ;—
রাজা ঝিয়র্ কথা শুই্‌নলে,
মাথাত্ উডে বাই্।

অর্থ : কাট্‌ল্=কাঠাল ; তারা=তাহারা ; সোদ্দ্‌র=সহোদর ; রাজাজ্‌ঝিয়র্=রাজার+ঝিয়র=রাজার কন্যার ; শুই্‌নলে=শুনিলে ; মাথাত্=মাথায় ; উডে=উঠে ; বাই্=বায়ুরোগ, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া।

আম এবং কাঁঠাল গাছের তলায় খেলা করিতে করিতে আমাদের শিশুদের সহিত এগুলির এমন এক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহারা নিঃশঙ্কোচে বিশ্বাস করে এগুলি যেন প্রাণী, শুধু প্রাণী নয়, মানুষের মত প্রাণী। তাই তাহারা বিশ্বাস করে আম ও কাঁঠালের পাতা যেন সহোদর ভ্রাতা। আমাদের শিশুরা যেমন ভাই ভাই গলাগলি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে যেমন প্রীতির বন্ধন বিদ্যমান, পাশা-পাশি একস্থানের আম এবং কাঁঠালেও তাহারা তেমনি ঠিক তাহাদের ন্যায় একই প্রীতির বন্ধন অনুভব করে। তাই তাহারা বলে, এই দুই সহোদর ভ্রাতা যখন রাজার কন্যার বিবাহের কথা শ্রবণ করে তখন ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, কেন না যদি রাজার কন্যার বিবাহে সভামণ্ডপ সুশোভিত করিবার জন্য অন্যান্য বৃক্ষের সহিত তাহাদেরও পত্র দান করিতে হয়। আমাদের ছেলে মেয়েরা প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে পূজায় আম্র শাখা দিয়া ঘটস্থাপন করিবার প্রথা, এবং বিবাহ বাসর পত্র পুষ্প শোভিত করিবার নিয়ম দর্শন করে, এবং বলপূর্ব্বক বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিবার বা পুষ্পবৃক্ষ হইতে ফুল আহরণ করিবার কার্য্যকে নির্ম্মম বলিয়া অনুভব করে। তাই সহোদর ভ্রাতা কাঁঠালকে সহকার-শাখার দুরবস্থায় মুহ্যমান বলিয়া অনুভব করিয়া আমাদের শিশুরা রাজার কন্যার বিবাহের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। আমাদের শিশুরা প্রকৃতির সম্বন্ধে Wordsworth-এর বিশ্বাস বা জগদীশ বসুর আবিষ্কারের কথা জানে না ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ইহা তাহাদের অন্তরের অনুভূতি।

এদেশের ছেলে মেয়েরা কেবল যে তরুলতার সহিত সম্বন্ধ পাতিয়া ফেলে তাহা নয়, তাহারা পশুপক্ষীর সহিতও যেন একটি বহুপুরাতন আত্মীয়তা অনুভব করে। এই আত্মীয়তা এত গভীর যে, তাহারা ওগুলির সহিত আদর আবদার করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। শ্রাবণের ধারা বর্ষণের পরে হঠাৎ যখন কাজল-কালমেঘের ফাঁক দিয়া একটুখানি রৌদ্র চিক্ চিক্ করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখন অনেক সময় চটুল গগনের মধ্য দিয়া, "ডিয়ালা" নামক এক প্রকার সারস জাতীয় পক্ষী, দলবদ্ধভাবে মৃদু মন্থর গতিতে সাগরাভিমুখে উড়িয়া যায়। মেঘের ফাঁকে, রৌদ্র ছায়ার রঙ্গ-ক্রীড়ায় আমাদের শিশুরা তখন মাতিয়া উঠিয়া এই দলবদ্ধ "ডিয়ালাকে" উড়িয়া যাইতে দেখিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে :—

ডিয়ালারে ভাই !
আগা কাডম্ চাগা চাগা,
ঝর্‌ত পরের দাগা দাগা,
হাত্‌কুরি হাউ্‌ত্যা পাক্ ন-খাইলে
তোর্ গুরুর দোহাই।

অর্থ : আগা=অগ্রভাগ, এখানে মস্তক ; কাডম্=কাটিব ; চাগা চাগা=গোল গোল টুকরা করিয়া ; ঝর্‌ত=বৃষ্টি ও ; পরের=পড়িতেছে ; দাগা দাগা=রহিয়া রহিয়া ; হাত্‌কুরি=সাতকুড়ি ; হাউ্‌ত্যা=সাতটি ; পাক্=আবর্ত্তন, ঘূর্ণন ; ন খাইলে=যদি না দাও।

পুরোনো সুর

শিল্পী—শ্রীমণীষী দে

মোহাম্মদ এনামুল হক

এই কয়টি কথায় কেমন সুন্দর করিয়া, তাহাদের বন্ধু পক্ষীগুলির সহিত শিশুরা আবদার করিতেছে। তাহারা বলিতেছে, "ওগো পাখী, এই রহিয়া রহিয়া বৃষ্টি পড়ার দিনে, মেঘের ফাঁক দিয়া যে ছায়া-রৌদ্রের লুকোচুরি চলিতেছে, ইহাতে একা আমরা আমোদ উপভোগ করিব কেন, তোমরাও আমাদের সঙ্গে একটু লুকোচুরি খেলিয়া যাও। ওগো! তোমাদের গুরুর দোহাই, আমাদের সঙ্গে তোমরা একটু আমোদ করিয়া যাও!"

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে.—গুরু-মহাশয়দের ভীতি শিশুদের নিকট যমভীতি সদৃশ। সেই জন্য তাহারা পাখীকেও গুরুভীতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাহাদের এই আদর আবদার যেন পাখীরা পালন করে। বাস্তবিকই আমরা দেখিয়াছি এই পাখীগুলি আকাশে বেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে থাকে। নিশ্চয়ই ইহা পাখীদের স্বভাব; কিন্তু আমাদের শিশুরা মনে করে, বুঝি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করা হইল। তাই পাখীগুলি যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে উড়িতে অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহারা এই পাখীগুলিকে অযথা কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত হয়; তাহারা মনে করে অযথা তাহাদের ভাইকে, তাহাদের বন্ধুকে কষ্ট দেওয়া হইল। তাই তাহাদের কষ্ট মোচনের জন্য আবার বলিয়া উঠে:—

সোনার্ ডাবা নাই্র্কলর্ পানি,
ডিয়ালা যাইতে জাল্ মেলানি।

অর্থ—ডাবা=হুঁকা—দাবা; নাই্র্কলর=নারিকেলের, যাইতে=যাইবার সময়; জাল মেলানি=জালের মত বিস্তৃত হইয়া।

অর্থাৎ "তোমরা এবার যাও, তোমাদিগকে নারিকেলের জল দিয়া হুকা সাজাইয়া দিব; তোমাদিগকে ইহা ব্যতীত আর দিবার মত কি আছে; যাও, যাও, এবার জালের মত বিস্তৃত হইয়া চলিয়া যাও।"

আমাদের ছেলেরা প্রত্যহই দেখে, যখন কোন লোক তাহাদের বাড়ীতে আসে তখন তাহাকে হুঁকা সাজাইয়া দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। তাই তাহারা মনে করে, বুঝি হুঁকাই অভ্যর্থনার চূড়ান্ত। কিন্তু তাহাদের পরিবারে যে-হুঁকা সাজাইয়া দিয়া অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করা হয়, তাহা মাটির এবং তাহার জল সাধারণ জল। ছেলেরা কি তাই দিয়া তাহাদের অন্তরের বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিতে পারে? তাহাদের শিশুকল্পনার চূড়ান্ত কল্পনা হইল সোনার হুঁকায় নারিকেলের জল এবং তাই দিয়া অভ্যর্থনা।

শীতকালে দিগন্তব্যাপী কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া রৌদ্র উঠিতে যখন বিলম্ব হয়, তখন আমাদের ছেলে মেয়েরা রৌদ্র-সেবন করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিয়া শীঘ্র রৌদ্র উঠিবার জন্য নাচিয়া নাচিয়া রৌদ্রকে ডাকিতে থাকে। তাহাদের এই ডাকিবার ছড়াটিকে তাহারা মন্ত্রের মত কার্য্যকরী বলিয়া বিশ্বাস করে। আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন এই মন্ত্র গাহিতে থাকে; আমার মনে তখন বৈদিকযুগের মন্ত্রের (Hymn) কথা উদিত হয়। আমার মনে হয়, মানবের মন যখন অনুতপ্ত অবস্থায় কেবল কল্পনায় ভর করিয়া বেড়ায়, তখন মানুষ এ হেন মন্ত্র বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের খোকাখুকির ছড়াটি এইরূপ:—

রইদানীরে রইদানী,
চাঁদার মা পুতানী,
চাঁদার আগাত্ বইল্ ফল
চিচ্চিরাইয়া রইদ্ তোল;
মঁউ্ আস্যে ঘামাইয়া
ছাতি ধরি নামাইয়া;
মঁউর খাঁডাত্ ঢলু বাঁশ,
ঘর তুলি দে আঅ্নমাস;
আঅ্নমাস্যা কউ্র্গা তেল্
তেলই্ন্ ফুডি সুর্গা গেল্;
সুর্গা খাইয়ো বিলাইয়ো
বউয়রে ধরি কিলাইয়ো;
বউয়র্ মার্ কাঁদনে
মক্কাগুলা আননে;
কুডুর্ কুডুর্ চাবানে।

অর্থ রইদ্—রৌদ্র, শ্রী=রইদানী; পুতানী=পুত্রগারা, দুর্ভাগা; আগাত্=অগ্রভাগ, এখানে=মধ্যে; বইল=বকুল; চিচ্চিরাইয়া=চিক্ চিক্ করিয়া; আস্যে=আসিয়াছে; ঘামাইয়া=ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া; মঁউর=আমাদের; খাঁডাত—বাড়ীর সম্মুখভাগস্থ প্রাঙ্গণে; ঢলুবাঁশ=

এক প্রকার বাঁশ; আঅ্ন্মাস=অগ্রহায়ণমাস। কউ্রগা তেল= সরিষার তৈল; তেলইন=বাঞ্জনপাত্র; ফুডি=ফুটিয়া, ছিদ্র হইয়া; সুরগা=ঝোল; বিলাইয়ো=বিড়ালে; বউয়রে=বউকে; কিলাইয়ো=কিল দিয়াছে, অর্থাৎ মারপিঠ করিয়াছে; মক্কাগুলা= ভুট্টা; কুডুর=কুটকুট শব্দ; চাবান=চিবান।

আমাদের শিশুদের বিশ্বাস রৌদ্রকে যদি এমন আত্মীয়তার সুরে আপনভাবে ডাকিতে পারা যায়, রৌদ্র শীঘ্র তাহার ঈষদুষ্ণ ক্লেশনাশক মূর্ত্তিখানি প্রকটিত করে। শীতের কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রৌদ্র যেন তাহাদের নিকট স্নেহশীলা জ্যেষ্ঠাভগ্নী। তাই তাহারা এ হেন শীতের প্রাতে তাহাদের ভগ্নী রৌদ্রের নিকট হিম-সখা চন্দ্রের কুৎসা রটনা করিতেছে। চন্দ্রের মধ্যে যে কলঙ্ক দেখা যায়, তাহাকে শিশুরা বকুল ফুলের গাছ বলিয়া কল্পনা করিতেছে, এবং তাই রৌদ্রকে বলিতেছে, "ওগো রৌদ্র! তুমি উঠ, তোমার উষ্ণ মধুর হাতখানি আমাদের মধ্যে বুলাইয়া দেও; তুমি প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিও না, কেননা এখন আর কলঙ্কিত চন্দ্রমা বিগত রজনীর মত আধিপত্য বিস্তার করিতেছে না।" কিন্তু রৌদ্রকে উঠিবার জন্য সাধাসাধি করিতে করিতে হঠাৎ শিশু তাহার মামাকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আসিতে দেখিয়া হাত হইতে ছাতা লইয়া খুব সম্ভব, তাঁহাকে ঘরের দিকে লইয়া চলিল। মামাকে গৃহের পানে লইয়া চলিতে না চলিতেই, মামার বাড়ীর সম্মুখে যে "ডলু" বাঁশের ঝাড় অবস্থিত, তদ্দ্বারা অগ্রহায়ণ মাসে ঘর বাঁধিবার কথা মনে পড়িল। শিশুর হঠাৎ এরূপ সখ হইবার কারণ হয়ত মামাকে পৌষ মাসের কন্‌কনে শীতেও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া আসিতে দেখিবারই ফল। হয়ত সে মনে করে, মামার বাড়ীর বাঁশ দিয়া ঘর বাঁধিলে আর শীত লাগে না। অগ্রহায়ণ মাসের কথা মনে হইতেই, ঠিক সেই সময়ে তাহার পরিবারের একটি ঘটনা হঠাৎ শিশুর মনে জাগিয়া উঠিল। তাই, ইহার সঙ্গে সে তাহাও যোগ করিয়া দিল। গল্পটি এইরূপ—একদিন তাহার মা সরিষার তৈলে তরকারী ভাজিতে বসিয়াছিল। দৈবাৎ মাটির বাঞ্জনপাত্র ছিদ্র হইয়া গেলে সমস্ত ব্যঞ্জন পড়িয়া যায়, এবং তাহা বিড়াল খাইয়া ফেলে; এই অপরাধে তাহার মা মার খায়। এমন সময় খোকার নানী ভুট্টা লইয়া নাতি নাতিনীকে দেখিতে আসিয়া কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর আমাদের খোকাবাবু সেই অবসরে নানীর আনীত ভুট্টা একটা একটা করিয়া বেশ আনন্দে চিবাইতে লাগিল।

এই কয়টি ছত্রে একটি চট্টল কৃষক পরিবারের ছবি সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৈবাৎ ব্যঞ্জন বিড়ালে খাওয়া প্রভৃতি সামান্য কারণে মেয়েদের প্রতি যে অত্যাচার করা হয়, সংসারের এই লোকচক্ষুর অন্তরালের দিকটি এই কয়ছত্রে অতি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। মাতার মার খাওয়ায় পরিবারে কত বড় একটি দুঃখের ছায়া পতিত হইয়াছে, অথচ রোরুদ্যমানা মাতামহীর নিকট হইতে ভুট্টা লইয়া খোকা বেশ আনন্দে খাইতেছে। বাস্তবিকই শিশুদের সুখের জীবন! সংসারের সুখ-দুঃখ, শোক-তাপ, চিন্তা ও অনুশোচনার বাহিরে ইহারা আনন্দসাগরতীরে কেমন মহাসুখে খেলিয়া বেড়ায়!

চট্টলার কোন কোন স্থানে, উল্লিখিত ছড়াটির শেষ অংশটুকু একটু পরিবর্ত্তিত আকারে গীত হইতে শুনা যায়; এইরূপ প্রত্যেক ছড়াই অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে নানাস্থানে প্রচলিত আছে। আমরা বাহুল্য ভয়ে প্রত্যেকটির পরিবর্ত্তিত পাঠ না দিয়া কেবল একটিরই নমুনা দিতেছি:—

যাই্য়ম্‌গইরে যাই্য়ম্‌গই,
বজা তেলত্ দিয়ম্‌গই;
বজা খাইয়ো বিলাইয়ো
বউয়রে ধরি কিলাইয়ো;
বউয়র্ মার কাঁদনে
নাউ্ক্যাকেলা আননে
কুডুর কুডুর চাবানে।

অর্থ—যাইয়ম্‌গই=আমি চলিয়া যাইব; গই="পর" অর্থে, যেমন যাওয়ার পর; বজা=বয়জা=ডিম্ব; তেলত্ দিয়ম্=ভাজিব; নাউক্যাকেলা=কাঁচকলা।

এই ছড়াটি পূর্ব্বের ছড়াটির সঙ্গে একত্র হইলে আমাদের খোকার চঞ্চলচিত্ততার পরিচয় প্রদান

মোহাম্মদ এনামুল হক

করে; কেননা সে এক বিষয় হইতে এমন দ্রুতগতিতে বিষয়ান্তরে চলিয়া যায় যে, আমাদের আর পূর্ব্বের বিষয় ভাবিবার অবসর থাকে না। কিন্তু এই অংশটি যখন স্বতন্ত্র করিয়া বলা হয়, তখন তাহা খোকার ভাজা ডিম খাইবার লোভ হইতেই উদ্ভূত হয়। খোকার মাতা ডিম ভাজিতে গেলে ডিম দৈবাৎ বিড়ালে খাইয়া যায়, এবং সেই অপরাধে খোকার মাতা মার খায়।

খেলার সাথীদের প্রতি আমাদের খোকাখুকুদের হৃদয়ের সহানুভূতি কত গভীর, তাহা একটি সুদীর্ঘ-ছড়ার নিম্নোদ্ধৃত চারিপংক্তিতে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

আঁধা গরুরে বাঁধা দিয়ম্,
জেবনীরে বিয়া দিয়ম্,
জেবনীত্যো হাত্ ভাই,
নাইয়র্ নিত কেহ নাই।

অর্থ—আঁধা গরু = আঁধা (অন্ধ) গরু, অর্থাৎ যে দুগ্ধবতী গাভীকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিয়া অন্ধের ন্যায় অন্য কোথাও যাইতে দেওয়া হয়না; বাঁধা = বন্ধক; দিয়ম = আমি দিব; জেবনী = জেবুন্নিছা; ত্যো = নিকট; বিয়া = বিবাহ।

আমাদের খোকা দুগ্ধবতী গাভীকে বন্ধক রাখিয়া জেবুন্নিছার বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে; জেবুন্নিছা আর কেহ নহে সে আমাদের খোকাবাবুর খেলার সঙ্গিনী। হয়ত, খোকার ধারণা, দুগ্ধবতী গাভীকে তাহার পিতা মাতা (কৃষক-কৃষাণী) যখন এত আদর যত্ন করেন, নিশ্চয় তাহাকে বন্ধক রাখিলে অধিক টাকা পাইবে এবং তদ্বারা জেবুন্নিছার বিবাহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন করিবে।

এখানে খোকার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে আমাদের কৃষক সমাজের দুরবস্থা ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধক এবং বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার মত বুদ্ধিমান খোকা নিশ্চয়ই হয় নাই। বন্ধক রাখিলে গাভীকে আবার ফিরাইয়া পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই 'বিশ্বাসে অথবা বুদ্ধিতে খোকা বন্ধক রাখিবার উল্লেখ করিতেছে বলিলে, আমাদের সরল গ্রাম্য শিশুকে ভাল করিয়া জানা হয় না। তবে সে এ ব্যাপার প্রায়ই দেখে এবং তাহার পিতা মাতাকে এবিষয়ে পরামর্শ করিতে শুনে। বৎসরের প্রায় ছয় মাস তাহার পিতামাতাকে কেবল খাওয়ার ভাবনাই বিব্রত করিয়া রাখে; তাহার উপর যখন আবার কোন দুঃখ হঠাৎ দুর্ঘটনার আকার ধরিয়া বসে, তখন তাহার পিতামাতা আজ এইটি কাল ঐটি করিয়া গৃহের জিনিষ একে একে মহাজনবাড়ী ভর্ত্তি করিয়া তুলিতে থাকে, হয়ত তাহা আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না। এই যে দারিদ্র্যের অবস্থা আমাদের খোকা নিত্য দর্শন করে, তাহাই তাহাকে হঠাৎ তাহার সঙ্গিনী জেবন্নিছার বিবাহ ব্যবস্থার বুদ্ধি দিয়াছে।

জেবুন্নিছার সপ্তভ্রাতা বিদ্যমান থাকিলেও, তাহারা ভগ্নীকে তেমন আদর করে না;—খুব সম্ভব জেবুন্নিছা সপ্তভ্রাতার বৈমাত্রেয় ভগ্নী। অথবা বিমাতা জেবুন্নিছার মাতার দুর্ব্যবহারে এই সপ্তভ্রাতা এত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে, একমাত্র কনিষ্ঠভগ্নীকেও আদর করিবার মত প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। এই জন্যই আমাদের খোকা ভাবিতেছে তাহার সঙ্গিনীর বিবাহে উৎসবাদি কিছুই হইবে না; তাই তাহাকে দুগ্ধবতী গাভী বন্ধক রাখিয়াও জেবুন্নিছার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু গাভী বন্ধক রাখিয়া না হয় বিবাহ হইয়া গেল; তারপর তাহাকে বাপের বাড়ী নাইয়র আনিবে কে? জেবুন্নিছার এহেন অন্ধকার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমাদের খোকার কি অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আমাদের দেখা না থাকিলেও সে যে তাহার এ দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না।

নিম্নে আমরা যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহা চট্টলার পারিবারিক জীবনের আর এক দিক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। ইহার পূর্ব্বে আমরা গৃহবধূর উপর অত্যাচার এবং সংসার গৃহ কেমন শ্রীহীন তাহার কিছু কিছু খবর পাইয়াছি, কিন্তু ইহা তাহার বিপরীত দিক। ইহাতে চট্টলার সুমধুর পারিবারিক জীবনের চিত্র দেওয়া হইতেছে :—

অউ্‌গ্যা বউ্‌ আই্‌য়েন্দে ধলীচ্ছরাত্তুন্‌!
পাই্‌ন্যা ফুলর্‌ খোশ্‌ব উড়ের্‌ বউয়্যর্‌ খুঁডাত্তুন্‌!
ফই্‌রা হাডর লল্যা ইচা,
বউ্‌য়ে খায় কাট্টল্‌ বিচা।

অর্থ—অউ্‌গ্যা = একটি; আই্‌য়েন্দে বা আইয়েজ্‌ঞে = আসিতেছে; ধলীচ্ছরাত্তুন = ধলী নামক কোন ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী হইতে; পাই্‌ন্যা ফুল = এক প্রকার সুগন্ধি ফুল, এগুলিকে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য স্রোতস্বিনীর তীরে জন্মিতে দেখা যায়; খোশ্‌ব = খোশবু = সুগন্ধ; উড়ের = উঠিতেছে; খুঁডাত্তুন = খোঁপা হইতে; ফইরা হাড = চট্টগ্রামের নানাস্থানে ফকীরের হাট আছে, তবে রাউজান থানার অন্তর্গত ফকীরের হাট অতি প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ; লল্যাইচা = লম্বা লম্বা চিংড়ীমাছ; কাট্টল = কাঁঠাল; বিচা বা বিচি = ভিতরের শক্ত আঁটি।

খুব সম্ভব, কোন বরযাত্রী বর ও কনেকে সঙ্গে লইয়া "ধলীচ্ছরা" পার হইতেছিল; তখন "ছরার" কূলে কূলে "পাই্‌ন্যা" ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় আমাদের খোকাবাবু দূরে দাঁড়াইয়া নববধূর শ্বশুর বাড়ীর আগমনদৃশ্য মুগ্ধনেত্রে দর্শন করিতেছিল। হয়ত হঠাৎ পাল্কীর দরজার ফাঁক দিয়া নববধূর গোলাপী সাড়ীর একটুখানি অঞ্চল খোকা দেখিয়া ফেলিল, অমনি সে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ধলীচ্ছরা" হইতে একটা রাঙ্গা টুকটুকে বউ আসিতেছে; ওগো! তাহার খোপা হইতে যে "পাই্‌ন্যা" ফুলের সুগন্ধ বাহির হইয়া আমাকে আকুল করিয়া দিল! কোথা হইতে বউ লইয়া বরযাত্রী আসিতেছিল সে বিষয় চিন্তা করিবার মত বুদ্ধি ও অবসর খোকার কোথায়? সে সরল বিশ্বাসী, যাহা দেখে তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। এখানেও তাহার সরল বিশ্বাসের বশেই সে বিশ্বাস করিয়া বসিল, বোধ হয়, "ধলীচ্ছরা" হইতে বউ আসিতেছে; এবং এই যে সৌরভ বাহির হইতেছে, তাহা নববধূর সুগন্ধি তৈল-সিক্ত খোঁপার গন্ধ, যদিও "পাইন্যা" ফুলের মত ইহার সৌরভ।

বউ শ্বশুর বাড়ী আসিয়া দাম্পত্য জীবন উপভোগ করিবে এই কথা মনে হইতেই মধুময় দাম্পত্য জীবনের যে সকল ঘটনা প্রায়ই সাধারণ সমাজে ঘটিয়া থাকে তাহার কথা খোকার মনে পড়িয়া গেল। সে ভাবিল এই যে বউ শ্বশুর বাড়ী যাইতেছে, সেখানে ফকিরের হাট হইতে তাহার স্বামীর আনীত চিংড়ি-মাছগুলি সে স্বামীকে একাই খাওয়াইবে, আর নিজে কেবল কাঁঠালের বিচির তরকারি খাইয়া স্বামীর সন্তুষ্টিতে নিজেও সন্তুষ্টি অনুভব করিবে।

আমাদের পল্লীর "বুকভরা মধু" বধূদের মধ্যে এমন গভীর ও শাশ্বত পতিভক্তি অতি সুলভ। আমাদের চাষী-দের মধ্যে দাম্পত্য জীবন যত সরল ও মধুর, তথাকথিত উন্নত পরিবারগুলিতে তাহা নিতান্তই বিরল। উন্নত পরি-বারগুলিতে বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য জীবনও যেন বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই নিরক্ষর চাষীদের সরল সহজ মধুর জীবন, তাহাদের দাম্পত্য জীবনের আদর্শকেও সহজ ও সরল করিয়া রাখিয়াছে। কৃষাণী হয়ত স্বামীর নিকট মৌখিক প্রেম দেখাইতে জানে না, নিজের মোহজনক ব্যবহারের দ্বারা এবং যেখানে সেখানে মান অভি-মানের পালা আরম্ভ করিয়া স্বামীর শরীর মন মুগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু সে অন্তরের অন্তঃস্থলে স্বামীর জন্য যে আন্ত-রিকতা অনুভব করে তাহাতে সাংসারিক সুখ-দুঃখের ভ্রূকুটি ভীত এবং পার্থিব চিন্তা বা অনুতাপে বিব্রত করিতে পারে না বলিয়া সে যে শাকান্ন প্রস্তুত করে, তাহা নিজে না খাইয়া স্বামীর জন্য তুলিয়া রাখে, স্বামীর মাঠ হইতে ফিরিবার সময় হইলে তাহার জন্য দুয়ারে পাদ্য সাজাইয়া রাখে, এবং বাড়ীর সকল কাজ স্বামীর শ্রমলাঘবার্থে নিজহাতে সম্পন্ন করিয়া রাখে। কৃষকপরিবারের শতকরা পঁচানব্বই জন গৃহিণী আমাদের এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

কৃষক পরিবারের এমন মধুর চিত্র-সম্বলিত ছড়া দেশে অসংখ্য। আমরা বাহুল্যভয়ে অধিক উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। পাঠকদিগকে আমরা কেবল নমুনাই দিতেছি।

নিম্নের সুদীর্ঘ ছড়াটিতে চট্টলার আর এক দিক দেখা যাইবে।

মোহাম্মদ এনামুল হক

ইহার মধ্যে এক একটি চিত্র পর পর এমন সুন্দর ভাবে চলচ্চিত্রের মত আমাদের সাম্‌নে আসিয়া দেখা দেয় যে, কোন্‌টি ফেলিয়া কোন্‌টি উদ্ধৃত করি এই সংশয়ে সবটুকুই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ছড়াটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়,—ইহা এমন এক কৃষকশিশুর উক্তি যে অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূর যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে। খোকা তাহাদের যত্নে এত সন্তুষ্ট যে, মায়ের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। ছড়ার কোথাও মায়ের নাম গন্ধও নাই,—এমন কি খোকা যখন বিলে কাঁটাবিদ্ধ হইয়া চীৎকার করিল, তখন তাহার মুখ দিয়া মার নাম বাহির হইয়া পড়া স্বাভাবিক হইলেও ভাবীর নামই বাহির হইয়া পড়িল। ভাবীর প্রতি আবদার, ভ্রাতার প্রতি অনুযোগ এবং বালকসুলভ চিন্তাধারার চাঞ্চল্য এই ছড়াটিকে একেবারে ভরপুর করিয়া দিয়াছে—

ভাকুস্ ভাকুস্ কেঁয়ারা,
মইষে ভাইঙ্গে টেঁয়ারা ;
মইষ মারি দিতাম্ গেলাম্ দে
কেঁড়া ফুডি মইলাম রে ;
কেঁড়ার্ তলে ভাউয়া বেঙ,—
অ ভজি অ ভজি ফিরি চা
গরুর্ ঠেংগান্ এরি যা।
অ ভজি অ ভজি চুরা দুক্ ;—
চুরাত্ ক্যা -ধান্ ?
চুলত্ ধরি আন্ ;
চুল্ ক্যা—কালা ?
নাক্ কাডি ফেলা ;
নাকত্ ক্যা—লউ ?
বর্ ভাইয়র্ বউ !
বর্ ভাই বর্ ভাই গর্জ্জং তলে
ছঁড ভাই ছঁড ভাই তেতই তলে।
রাজার্ বউয়র লাম্বা চুল,
মেইল্‌তে মেইল্‌তে চাম্বা ফুল্।
চাম্বা গাঁছর্ তলে—
দুয়া বাত্তি জ্বলে,
বাত্তি চাইতাম্ গেলাম্ দে হাফর্ ছাতি তলে ;
এক্ হিয়ালে রাঁধে বারে
আর এক্ হিয়ালে খায়,
আর এক্ হিয়াল্ ছাতি ধরি
হউর বারিত্ যায়।

অর্থ —ভাকুস্—বড়, বৃহৎ ; কেঁয়ারা—কাঁকড়া ; ভাইঙ্গে = ভাঙ্গিয়াছে ; টেঁয়ারা—ক্ষেত্রের চারিদিকের বেড়া, টেংরা (Fencing) ; মারি = তাড়াইয়া দে—এই শব্দ ক্রিয়ার পর বসিলে অর্থ হয় কাজের পর, ইহা কোথাও কোথাও "পে" দ্বারা ব্যক্ত করা হয় ; কেঁডা—কাঁটা ; ভাউয়া ব্যাঙ = কোলাব্যাঙ ; অ = সম্বোধন চিহ্ন ; ভজি = ভাবী, বড় ভাইয়ের স্ত্রী ; গান্—পানে ; এরি—রাখিয়া ; চুড়া—চিঁড়ে ; দুক্—তৈয়ার কর ; ক্যা—কেন ; লউ = রক্ত, লহু ; বর—বড় ; গর্জ্জং = এক প্রকার গাছ, এই গাছের তৈল অনেক কাজে লাগে, ইহা চট্টগ্রামের রপ্তানির একটি প্রধান বস্তু ; ছঁড—ছোট ; তেতই—তেঁতুল ; লাম্বা = লম্বা ; মেইল্‌তে = খুলিতে ; চাম্বা—চম্পক ; দুয়া = দুইটি ; বাত্তি = বর্ত্তিকা ; হাফর্‌ছাতি—ওল ; হিয়াল = শিয়াল ; হউর বারিত = শ্বশুর বাড়ীতে।

ছড়া হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, খোকার বাড়ী খুব প্রকাণ্ড এক বিলের ধারে। বাড়ীর ধারেই তাহাদের চাষের জমি ; জমিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁকড়াগুলি আলির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া দিয়া জমির জলনিকাশের সহায়তা করিত ; এবং পশুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য জমির চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া হইয়াছিল। একদিন আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁকড়া-উপদ্রুত জমির বেড়া মহিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং সেই মহিষ তাড়াইতে গিয়া হঠাৎ খোকার পায়ে কাঁটা বিঁধিয়া যায়। খুব সম্ভব কথিত বৃহৎ বৃহৎ কাঁকড়ার পায়ের শুষ্ক কাঁটা হইবে। সে পায়ের তলা হইতে কাঁটা খসাইতে গিয়া দেখিল, তাহার পাশ দিয়া একটি কোলাব্যাঙ লাফাইয়া পড়িল। খোকা চমকিয়া উঠিয়া আর পায়ের কাঁটা খসাইবার অবসর পাইল না। মহিষ তাড়ানোর কথা ভুলিয়া, "কাঁটা ফুটিয়া মরিলাম" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া তাহার ভাবীকে ব্যাঙ দেখিবার জন্য ডাকিল। ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ খোকার পায়ের কাঁটা আপনিই খসিয়া পড়িয়াছে।

তাই ইহার পর খোকার আর কাঁটার কথা মুখে নাই। খোকা এখনই দেখিয়া আসিয়াছে,তাহার ভাবী রান্নাঘরে নৈশ আহারের আয়োজন করিতেছে। তাহার ভাবী হয়ত আসিয়া দেখিল, তাহার আদুরে দেবর সামান্য কাঁটা ফুটার ছল করিয়া ডাকিয়াছে; সে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিল; কিন্তু যাওয়ার সময় দেবর কর্ত্তৃক চিঁড়ে তৈয়ারী করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিল। এদিকে গৃহের সমস্ত কাজ ত্যাগ করিয়া সে তাড়াতাড়ি খোকার মন রাখিতে চিঁড়ে তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেল। ওদিকে খোকা মহিষ তাড়াইয়া গৃহে ফিরিয়া দেখিল, চিঁড়েতে ধান রহিয়া গিয়াছে। খোকা রাগে গর গর করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়া ফেলিল, "তাহাকে চুলে ধরিয়া লইয়া আস।" হয়ত তাহার ভাবী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিতেই, সে হাতের বাসন ভাবীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল; তাহা একেবারে তাহার ভাবীর নাকে গিয়া পড়ায় নাক দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল। বড় ভাবীর নাকের রক্তপাত আমাদের খোকাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহার বড় ভ্রাতা গর্জ্জং এবং ছোট ভ্রাতা তেঁতুল তলায় কাজ করিতেছিল। সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাদিগকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিতে গিয়া আসল কথা ব্যস্ততার জন্য বলিতে পারিল না। নাকের রক্ত পড়ার কথা বলিতে গিয়া, রাজার রাণী (তাহার বড়দাদা যিনি গৃহের মালিক) বড় ভাবীর চাঁপাফুল সদৃশ সুরভিত চুলের কথাই বলিয়া ফেলিল। চাঁপা ফুলের কথা মনে হইতেই সে হয়ত তাহার পিতামহীর নিকট শ্রুত কোন গল্প আবৃত্তি করিতে লাগিল। রক্তপাতের কথা বলিতে গিয়া আসল কথা হারাইয়া সে বলিয়া ফেলিল,—

এক হিয়ালে রাঁধে বারে
দুই হিয়ালে খায়,
আর এক হিয়াল ছাতি ধরি'
হউর বাড়ীত্ যায়।

আমাদের ছেলে-মেয়েরা মাতাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহাদের শিশু-ভগ্নীকে ঘুম পাড়াইতে দোল্‌নার কাছে নিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন তাহারা শিশুকে দোল্ দিতে দিতে এইরূপ গান করে—

অলি অলি ঘুম্ যারে পরী,
ঘুমত্তুন্ উডিলে বাছা খাইবা দুধর্ নলী।
ন কাঁদিছ্ রে দুধের্ সাইর্ ন ভাঙ্গিছ্ রে গলা,
হেই গলা ভাঙ্গিলে বাছা ন লইব আর্ জোরা।
কেলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম্ দুয়ারত্ বই খাইয়,
টাঁকি দিয়ম্ সোনার্ দুলইন্ পরী ঘুম্ যাইয়।
উত্তরর্ ঘরত্ নাখল্ জুঁয়াল্ দইনর্ ঘরত্ কই?
কেলা বনত্ বইস্তে বাদুর্ ধাপাই আইয়ম্ মুই।
এমন্ শতাগ্যা বাদুর্ থোঁরর্ কেলা খছ্
হেই বাদুরগ্যা মাইত্ত গেলে হারা রাইত্ পোহছ্। *

অর্থ—অলি = শিশুর সম্বোধন সূচক শব্দ; দুধের নলী = স্তন; দুধের সাইর = কচি শারী বা শুক অর্থাৎ শিশু; দিয়ম = দিব; মোলা = মুড়ির লাড়ু; খাইয় = তুমি খাইও; টাঁকি = টাঙ্গাইয়া, ঝুলাইয়া; দুলইন্ = দোল্‌না; উত্তরর = উত্তরের; নাখল = লাঙ্গল; দইনর্ = দক্ষিণের; কই = কোথায়? কেলাবন = কলা বাগান; বইস্তে = বসিয়াছে, ধাপাই = তাড়াইয়া দিয়া; শতাগ্যা = দুষ্ট; থোঁরর কেলা = যে কলা মোচার মধ্যে রহিয়াছে; খছ্ = খাইন্; হেই = সেই; মাইত্ত = মারিতে; হারা = সারা।

এই ছড়াটিতে খোকা দুধ, মুড়ি, মুড়াকি সোনার দোলনা প্রভৃতির প্রলোভন দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। এ সকল স্থলে সকল সময় আমাদের মনে রাখা উচিত, এই ছড়াগুলির প্রায় সকলগুলিই আমাদের কৃষক শিশুর (অবশ্য এখানে কৃষক পত্নীরও হইতে পারে) রচিত। তাই কৃষক জীবনের একটি ছবি ছড়াগুলির প্রতি ছত্রে এবং প্রাণে প্রাণে মিশিয়া রহিয়াছে। তাই এই ছড়ার প্রথমভাগে আমাদের দরিদ্র কৃষক বালক (এখানে, কৃষক পত্নী যে সকল বস্তু তাহাদের খোকাখুকুকে খাইতে দেয়) প্রায়ই যে সকল জিনিষ খায় তাহার প্রলোভন দেখাইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কল্পনার লীলার মধ্যে কেবল দুইটি জিনিষই দেখিতেছি— প্রথমে সৌন্দর্য্য কল্পনা করিতে গিয়া "পরী" বলিয়া শিশুকে

* এই ছড়াটি শিশুদের দ্বারা রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না; খুব সম্ভব ছড়াটি কোন শিশুর মাতা কর্ত্তৃক রচিত। ছড়াটিতে যেরূপ সুর ও লয় আছে, তাহাই আমাদের সন্দেহ বাড়াইয়া দেয়। সুর ব্যতীত কথার মধ্যেও একটি প্রবীণতার আভাস আছে।— লেখক।

মোহাম্মদ এনামুল হক

আহ্বান, আর পরে সোনার দোলনায় দোলনের কথা। হয়ত আমাদের খোকা বেতের দোলনায় নিদ্রা যাইয়া বিশেষ সুখ পায় নাই। সোনার জন্য জগত যখন সম্পূর্ণ লালায়িত, এহেন দুষ্প্রাপ্য জিনিষের জন্য সকলেরই মন আকুল। আমাদের কৃষক শিশু (বা পত্নী) হয়ত কোন দিন ভাল করিয়া সোনা দেখে নাই, দেখিলেও তাহা বড় লোকের নিকটই দেখে; তাই কল্পনার বলে সে মনে করিতেছে সোনার দোলনায় সুখের মাত্রা বোধ হয় অধিক হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জন্য শিশুকে তাহার লোভ দেখাইতেছে। কিন্তু তাহাতেও যদি কাঁদিয়া উঠে, এই ভয়ে, শিশুকেও একটু ভয় দেখাইল, "যদি তুমি ক্রন্দন কর তবে তোমার স্বর-ভঙ্গ হইবে; আবার আরোগ্যলাভ করিবার আশা থাকিবে না।" শিশু প্রলোভনের বশেই হউক বা স্বরভঙ্গের ভয়েই হউক, বালকের চেষ্টায় ঘুমাইয়া পড়িল। এখন তাহাকে যাইতে হইবে; কিন্তু সে নিঃসন্দেহ নহে যে শিশু প্রকৃতই ঘুমাইল না ভয়ে চুপ করিয়া আছে; তাই সে ভাল করিয়া শিশুকে শুনাইতে চাহে, সে ফিরিয়া আসিবে, কেবল লাঙ্গল জোয়ালগুলি তাহার পিতাকে (বা স্বামীকে) বাহিরে দিয়া আসিবার জন্য তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। রাত্রে চাষের জন্য লাঙ্গল জোয়ালের অবতারণা হাস্যাস্পদ বটে, কিন্তু দোলনার শিশুকে তাড়াতাড়ি একটি কথা বলিয়া যাইতে হইবে, এমন সময় কৃষকবালকের (বা পত্নীর) মুখ দিয়া এ সকল কথা নিতান্তই স্বাভাবিক। কেননা তাহার সমস্ত চিন্তাধারা জুড়িয়া কেবল চাষ আবাদের কথাই বিরাজ করিতেছে। খোকা ঘুম হইতে জাগিতেছে কিনা দেখিবার জন্য ভাণ করিয়া সে এ ঘরে ও ঘরে লাঙ্গল জোয়াল তল্লাস করিতে করিতে এক দৌড়ে খোকার নিকট আসিয়া খোকাকে দেখিয়া বলিয়া গেল, "কলাবনে বাদুড় বসিয়াছে, আমি একটু তাড়াইয়া আসি।" বাদুড় তাড়াইতে গিয়া সে ত ঘুমন্ত শিশুকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যে আর ফিরিয়া শিশুর নিকট আসিবে না সে কথা চিন্তা করিতেই তাহার মনে হইল, শিশু নিশ্চয় বলিবে, "বাদুড়টি এমন শয়তান যে কলার মোচার ভিতরের ছোট্ট ছোট্ট কাঁদিগুলিও বোধ হয় খাইয়া ফেলে এবং তাহাকে তাড়াইতে গেলে বোধ হয় রাত্রি কাটিয়া যায়।"

শৈশবে মাতাপিতার মৃত্যু হইলে, এবং একে একে সকল জ্ঞাতি কুটুম্ব বালককে ছাড়িয়া গেলে, বালকের আর কষ্টের অবধি থাকে না। পারিবারিক দুর্ঘটনার মত কষ্ট জগতে নাই। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী বিবর্জ্জিত বালকের কষ্টের কথা বালক সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, মর্ম্মে মর্ম্মে এ হেন অনাথ বালক যে কষ্ট অনুভব করে তাহা নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির প্রতি ছত্রে বেশ বুঝা যায়। বালকের পক্ষেই দুঃখকে সহজ ও সরল ভাবে গ্রহণ করিতে পারা সম্ভবপর। এ হেন সহজ বিষাদের ভাব নিম্নের ছড়ায় সুন্দর ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে—

ভাই্য়রে পাল্যাম্‌দে হুরুম্ খাবাই খাবাই,
ভইনরে নিলদে বাজন্ বাই বাই।
ভইনর উত্‌রদি অলিন্নিছার্ ঘর্,
অলিন্নিছারে বাঁধি এইর্‌গো ঢিলাদি মইষর।
বাজান্যার উতর্‌দি ছখিন্নিছার্ ঘর্,
ছখিন্নিছা কাঁদেদ্দে ঝর্ ঝর্ ঝর।

অর্থ—পাল্যাম্‌দে = পালন করিলাম; হুরুম = মুড়ি; খাবাই = খাওয়াইয়া; বাজন্ বাই বাই = বাদ্য বাজাইয়া; উতরদি = উত্তর দিকে; অলিন্নিছা = অলিয়ন্নিছা; এইরগো = রাখিয়াছে; ঢিলাদি = রজ্জু দিয়া; ছখিন্নিছা = ছখিয়ন্নিছা।

খোকার সংসারে আপনার বলিবার যে কেহ নাই, তাহা তাহার এই করুণ উক্তিতে বেশ বুঝা যাইতেছে। সে তাহার শিশু ভাইকে মায়ের মৃত্যুর পর মুড়ি খাওয়াইয়া পালন করিতে লাগিল, অথচ অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সেও খোকাকে ফাঁকি দিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিল। তাহার বড় ভগ্নীর বিবাহও ইতিমধ্যে বাজনা বাজাইয়া ধুমধামে হইয়া গেল। এখন বালক সংসারে একা; হয়ত সে কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে কাল যাপন করিতেছে। সংসারের দুঃখ কষ্টে এখন তাহার প্রাণ একেবারে কোমল হইয়া উঠিয়াছে, তাই কোথাও কোন দুঃখের চিত্র দেখিলে সে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করে। তাই সে ভগ্নীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া যখন মহিষের দড়ি দিয়া বাঁধা অলিয়ন্নিছার

কষ্ট দেখিল এবং তাহার ভগ্নীর বিবাহের বাদ্যবাদকের বাড়ীর উত্তর দিকের ছখিয়ম্নিছার ক্রন্দন শুনিল সে অশ্রুপ্লাবনের সহিত সুর করিয়া সেই কাহিনীই গান করিতে লাগিল।

এখানে কেবল যে সহজ দুঃখের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে, চট্টলার সাধারণ কৃষকসমাজের কয়েকটি চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। বিবাহে বাজনা বাজাইয়া বউকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাইবার প্রথা চট্টগ্রামে অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল; এমন কি কোন কোন জায়গায় এখনও সময় সময় ইহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এখন তাহা একেবারেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। অলিয়-ম্নিছাকে মহিষের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখার চিত্রও সম্ভবতঃ স্বামীবিরহিতা পাগলিনী মেয়েরই চিত্র হইবে। গ্রামে যে সকল মেয়েকে পাগল দেখা যায়, অনুসন্ধান করিলে জানা যায় ইহাদের অধিকাংশই শোকসন্তাপে পাগল। আর ছখিয়ম্নিছার ক্রন্দনের কোন কারণ দেওয়া না হইলেও আমাদের বুঝিতে বাকি থাকে না যে, অন্নাভাবে অনাহারের যন্ত্রণায় কৃষাণীর এই আর্ত্তস্বর। শোকে ও অভাবের যন্ত্রণাতেও অনেক সময় অনেক লোককে, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোককে, ক্রন্দন করিতে দেখা যায়।

বাঙ্গলার সকল দেশের কৃষকের ন্যায় চট্টলার কৃষক-সমাজও নিতান্ত দরিদ্র। এই আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যই তাহারা অর্থব্যয় করিতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত। পাল্কীবাহককে পয়সা দিয়া তাহারা মেয়েদের নাইয়র করায় না বা জামাতারাও পাল্কী করিয়া বউকে কেবল বিবাহ উপলক্ষ ব্যতীত অন্য কোন সময়ে আপন বাড়ীতে আনে না। ...ত্রে পদব্রজে তাহারা এই কাজ সারিয়া লয়। পল্লীর ...ই চিত্রটি আমাদের বালক কবির মোহিনী তুলিকায় সামান্য ...য়েক ছত্রে কেমন মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

জামাই্ আইস্তে বিয়ালে,
কুরা নিল হিয়ালে;
ধুতির্ ভিতর্ ঝুন্ঝুনি,
জামাই আইয়ের্ কুন্কুনি;
পাতিলার্ ভিতর্ ধোরাহাপ্,
ফাল্দি উডে বউয়র্ বাপ্।

অর্থ—আইস্তে=আসিয়াছে; বিয়ালে=সন্ধ্যায়; কুরা=মুরগী বা মোরগ; নিল=লইয়া পলায়ন করিল; ঝুন্ঝুনি=টুন্ টুন্ শব্দকারী একপ্রকার খেলনা; কুন্কুনি=গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া; পাতিলা=হাঁড়ি; ধোরাহাপ্=একপ্রকার বিষহীন সর্প; ফাল্দি=লাফ দিয়া।

বিকাল বেলায় শ্বশুর বাড়ী হইতে স্বামী স্ত্রীকে নিতে আসিয়া শুনিতে পাইল, খোকা আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহার শাশুড়ী জামাতার জন্য হয়ত চুপি চুপি মোরগ জবাই করিতেছিল; কিন্তু জামাই মনে করিল শৃগাল বুঝি মোরগের টোপর হইতে একটি চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছে। হয়ত জামাতা শৃগালের পিছু দৌড়াইতে গিয়া শাশুড়ীর সম্মুখে পড়িয়া গিয়াছিল। জামাতার কটিদেশে যে "ঝুন্ঝুনি" ছিল (হয়ত জামাতা নিজের ছেলের জন্য তাহা আনিয়াছিল এবং জামার অভাবে তাহাকে ধুতির খুঁটেই বাঁধিয়া রাখিছিল) তাহা শব্দ করিয়া উঠায় শাশুড়ী মনে করিল, "কি বালাই, জামাতা কি গুন্ গুন্ করিয়া এদিকে আসিতেছে!" শাশুড়ী তাড়াতাড়ি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া জবাই করিবার মোরগকে লইয়া উঠানের ধারে যেখানে একটি পুরাতন হাঁড়ি পড়িয়াছিল তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সম্ভবতঃ সেখানে শাশুড়ী আত্মগোপন করিতে পারে এমন কিছু আড়াল ছিল। হয়ত শ্বশুরও শাশুড়ীর সহিত তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে পড়িতে পুরাতন হাঁড়িতে পা ঠেকাইয়া বসিল। পা ঠেকাইতেই হাঁড়ীর ভিতর হইতে একটা "ধোরাসাপ" বাহির হইয়া পড়িল, কিম্বা সাপটি লাফ দিয়া পলাইতেই শ্বশুরের পায়ে ঠেকিল। শ্বশুর সর্প-দংশন-ভয়ে অমনি ছুরি হস্তে লাফ দিয়া উঠিল। তারপর কি হইল তাহা খুলিয়া যদিও খোকা বলে নাই, তবুও আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে, জামাতা লজ্জা পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

এখানে সাধারণ কৃষকসমাজে শ্বশুরবাড়ীতে জামাতা আসিলে কেমন করিয়া আদর অভ্যর্থনা করা হয়, তাহার একটা নমুনা পাইতেছি। দরিদ্র জামাতা গায়ে একখানা মোটা চাদর চাপাইয়া এবং একখানা মোটা ধুতি পরিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। শ্বশুরবাড়ী আসিবার সময় হাতে

মোহাম্মদ এনামুল হক

কোন "তোফা" (উপঢৌকন) কাহারও জন্য আনিবার তাহার সাধ্য নাই ; কিন্তু বাড়ী ফিরিবার সময় পথে যদি খোকা কাঁদে, তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার জন্য দু-চার পয়সা দিয়া একটা "ঝুনঝুনি" আনিয়াছে মাত্র। পথে খোকা কাঁদিলে হয়ত লোকে দেখিবে—কেহ মেয়েমানুষ লইয়া রাত্রে কোথাও যাইতেছে। কোন দুষ্ট লোক যদি পথে তাহার স্ত্রীকে দেখে, তাহাও লজ্জার কথা। সে দরিদ্র বটে, তাই বলিয়া তাহার স্ত্রী বে-পর্দা ও বে আব্রু নহে। সে শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া মনে করিতে পারে নাই, তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহার জন্য মোরগ জবাই করিবে। তাহার শ্বশুরও দরিদ্র কৃষক ; অবশ্য সকল সময় জামাতার জন্য মোরগ জবাই করিতে না পারিলেও তাহার অন্তর বড়।

আমাদের বাঙ্গলা দেশের প্রায় সকল জায়গায় অত্যধিক আদুরে ও বিলাসী ছেলেগুলিকে "আলালের ঘরের দুলাল" বলিয়া আখ্যাত করা হয়। ইহা সময় সময় ঠাট্টা বিদ্রূপচ্ছলেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ঠিক তদ্রূপ একটি ছোট্ট ছড়া আমাদের শিশু মহলে ঠাট্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার ভিতর দিয়া আমাদের কৃষকসমাজের খুব আদুরে ছেলের আদরের মাত্রা কতটুকু তাহা বেশ বুঝা যায় ; এবং ইহাও বুঝা যায়, খুব আদুরে হইলেও দরিদ্র কৃষকসমাজ প্রাণের চেয়ে প্রিয় একমাত্র মেয়েকেও কতটুকু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া আদর দেখাইতে পারে।

আমাদের ছেলে মহলে যখন কোন বালক অপরাপর বালকদের সহিত মিশিতে চাহে না, বা মিশিলেও খেলিতে খেলিতে হাঁফাইয়া পড়ে বা একটু আঘাত পাইলেই কাঁদিয়া ফেলে, তাহাকে আমাদের শিশুরা নিম্নলিখিত ছড়াটি গাহিয়া ঠাট্টা করে :—

অউ্গ্যা বঅর অউ্গ্যা ঝি
কি নাম্ থোয়াইল্ মজ্জাম্বি,
বালুশ্ দিয়ম্, পাড়ি দিয়ম্ দুই হাতত্ দুই বালা দি।

অর্থ—অউ্গ্যা=একটি ; বঅর=বাপের ; ঝি=কন্যা ; থোয়াইল=রাখিল, নাম করাইল ; মজ্জাম্বি=মরিয়ম বিবি ; দিয়ম=আমি দিব ; হাতত্=হাতে ; দি=দিয়া।

অর্থাৎ "বাপমায়ের মরিয়ম বিবি নাম্নী একমাত্র কন্যা কিনা, তাহাকে বালিশ পাটি দিয়া শুইতে দেও এবং হাতের বালা দিয়া অভ্যর্থিত কর।" এই ছোট্ট ছড়াটিতে একটি চলিত প্রথার ইঙ্গিত আছে। ঘটা করিয়া পাড়ার মোল্লার দ্বারা ছেলে বা মেয়ের নামকরণ করিবার একটি প্রথা এখনও চটলার নানাস্থানে দেখা যায় ; ইহাকে চটলাবাসীরা, "নাম্থোয়ানী" বা নামরাখা-দিন বলিয়া থাকে। কোথাও কোথাও আবার ইহা "ছটি্ট" বলিয়াও অভিহিত হয়। এই "ছটি্টর" (ষষ্ঠী) অর্থ জন্ম তারিখ হইতে ছয় দিনের পরের দিন, যেদিন ছেলের নাম রাখা হয়। এইদিন একটি তৈলপাত্রে সাতটি বাতি দিয়া সাতটি নাম রাখা হয়। এক একটি নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি বাতিতে ক্রমান্বয়ে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। সকল গুলিতে আগুন দেওয়া হইলে, যে বাতিটি অধিক জ্বলিয়া উঠে, সেই নামটিই রাখা হইয়া থাকে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল প্রথা দিন দিন লোপ পাইতেছে।

প্রায় সকল দেশে ছেলে মেয়েদের বুদ্ধিবিকাশের জন্য ধাঁধা (Riddle) উত্তর দিবার একটা রীতি আছে। আমাদের চট্টগ্রামের ধাঁধাগুলি অন্যান্য দেশের ধাঁধা হইতে একটু স্বতন্ত্র। অন্যান্য দেশের ধাঁধা কেবল বুদ্ধি পরীক্ষা লইয়াই ব্যস্ত, সাধারণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক এগুলির খুব অল্প। কিন্তু চট্টগ্রামের ধাঁধাগুলি সাধারণ কৃষকজীবনের সঙ্গে যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয়, এগুলি এদেশের সাধারণ লোক দ্বারা রচিত। • এই সাধারণ লোকের সঙ্গে বৃদ্ধ বা যুবক সম্প্রদায় যে বিজড়িত নহে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। তবে এগুলি একেবারে শিশুর দ্বারা রচিত নহে। দশ বারো বৎসরের বালকদের মধ্যে একে অপরকে বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইয়া পরাস্ত করিবার জন্য এই সকল ছড়ার যেরূপ বহুল প্রচলন দেখি, এবং প্রতিপক্ষের অবর্ত্তমানে নূতন ছড়া তৈয়ারির জন্য যে চেষ্টা এবং সাধনা দেখা যায় তাহাতে নিঃসন্দেহ মনে হয়, এই সকল বালকই এই সব ছড়ার জন্মদাতা ; ইহা কোন বৃদ্ধ বা যুবকের কাজ নহে। আমাদের বালকেরা যদি কাহারও নিকট হইতে একটি নূতন ছড়া শিখিতে পারিল, বা নিজে একটি ছড়া

তৈয়ারি করিতে পারিল, তবে হাতে আকাশ পাইল বলিয়া মনে করে। এগুলি একদিকে যেরূপ ধাঁধা, অন্য-দিকে তেমনি ছড়া। এপ্রকারের অসংখ্য ধাঁধার মধ্যে নিম্নে কেবল তিনটি ধাঁধার উল্লেখ করিতেছি :—

(১) হিলত্ লুডে বিলত্ লুডে
লেজত্ ধইর্‌লে ফালাই উডে।

অর্থ—হিলত বিলত=বিলে খালে=সর্ব্বত্র ; লুডে=লুটিয়া পড়ে ; লেজত্=লাঙ্গুলে ; ধইর্‌লে=ধৃত করিলে ; ফালাই=লাফ দিয়া।

কৃষকবালক সারাদিন গরু চরায় ; গরু লইয়াই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। কাজেই ধাঁধা রচনা করিতে গিয়া, গরুর উপমায় ধাঁধা রচনা করা তাহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। তাই সে ঢেঁকিকে দুর্ব্বোধ্য করিবার জন্য বলে, "যে জিনিষটি সর্ব্বত্র লুটিয়া পড়িতে পারে, অথচ লোক ল্যাজ ধরিলে লাফ দিয়া উঠে তাহা কি?" উত্তর—"ঢেঁকি।" ঢেঁকি যন্ত্র তাহার অন্নদাতা, আর গরু তাহার প্রতিপালক।

(২) হাঁডেদ্দে লুতুর্ লাতুর্ দুধালু গাই,
হাডত্-অ ন মিলে, দেশত্-অ নাই।

অর্থ—হাঁডেদ্দে=হাঁটিতেছে ; লুতুর লাতুর=ঢুলুঢুলু ভাবে ; দুধালু=দুগ্ধবতী ; গাই=গাভী ; অ="ও" বোধক ; নমিলে=মিলেনা।

খুব সম্ভব খোকা কোন দিন কোথাও কোন বাঘ দেখিয়াছে এবং বাঘের গতি বিধি খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছে ;—তাই সে বাঘের কথা বলিতে গিয়া বলিল, "দুগ্ধবতী গাভী যেমন ঢুলু ঢুলু করিয়া হাঁটিয়া চলে, তেমন কোন জীবের নাম কর বাজারে বা দেশে পাওয়া যায় না।" উত্তর—"বাঘ।" উপমা দিতে গিয়া বালকের পক্ষে গাভীর কথা উল্লেখ করাই স্বাভাবিক।

(৩) কালা কালা মুরার্ মাঝে
কালা হরিণ্ চরে,
দশ্ বেতে খেচে আনি
দুই বেতে মারে।

অর্থ মুরার্=বনের ; কালাহরিণ=শূকর, বরাহ ; বেতে=বেত্র দ্বারা ; খেচে আনি=টানিয়া আনিয়া।

এখানে বালক বলিতেছে, "কালো কালো টিলা বা বনের মধ্যে যে সকল শূকর চড়িয়া বেড়ায় তাহাকে দশ-বেত দিয়া বাঁধিয়া আনিয়া দুই বেত্রের প্রহারে মারিয়া ফেলে,—তাহা কি?" উত্তর—"উকুন।" এখানেও কৃষক জীবনের ছাপ অত্যুজ্জ্বল।

বালক বালিকাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্নের আগ্রহ বিদ্যমান। তাহাদের উন্মুক্ত মন যাহা দেখে তাহার বিষয়েই প্রশ্ন করিয়া বসে। এ জগতের সহিত পরিচিত হইবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়,—ইহারা যেন এখানকার পথিক। পথিক যেমন কোন নূতন দেশে পদার্পণ করিলে প্রতি বিষয় জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হয়, শিশুদেরও তাহাই। পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা সকল দেশের শিশুদের মধ্যে যেমন, আমাদের শিশুদের মধ্যেও তেমনি। দুইটি ছেলে নিম্নের ছড়াটি এক এক ছত্র করিয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে এবং অপর ছেলে মেয়েরা তাহা শুনিতে থাকে। প্রশ্নকর্ত্তা যখন প্রশ্ন করিতে করিতে উত্তরকারীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে তখন শেষে প্রশ্নকর্ত্তার নানীর মতো অন্ধ বলিয়া বকের প্রশ্ন শেষ করে। প্রশ্নকর্ত্তাও লজ্জায় আর প্রশ্ন করে না ; কেন না তাহা হইলে তাহার নানী যে অন্ধ সে দুর্নাম রটিত হইয়া পড়িবে। ছড়াটি এইরূপ :—

এক্কান্ কথা হুন্যছ্ নি ?
হুন্যি।
কেয়েন্ কথা ?
বেঙর্ মাথা।
কেয়েন্ বেঙ ?
শুরু বেঙ।
কেয়েন্ শুরু ?
বাঅন্ গরু।
কেয়েন্ বাঅন্ ?
হাডর্ বাঅন্।
কেয়েন্ হাড্ ?
গজর্ হাড্।
কেয়েন্ গজ্ ?
আইচ্ছা গজ্।
কেয়েন্ আইচ্ছা ?

মোহাম্মদ এনামুল হক

বাঁদর্ বাচ্ছা।
কেয়েন্ বাঁদর?
ঝারর্ বাঁদর।
কেয়েন্ ঝার্?
বরই ঝার্।
কেয়েন্ বরই?
লাল্ বরই।
কেয়েন্ লাল?
বোগার্ বাল্।
কেয়েন্ বোগা?
কানী বোগা।
কেয়েন্ কানী?
তোর নানী।

অর্থ এক্কান্ = একটি; হুগ্গছ্‌নি = শুনিয়াছ কি? হুন্ন্যি = শুনিয়াছি; কেয়েন্ = কেমন, কিরূপ; শুরু বেঙ = কোলা ব্যাঙ; বাওন = বামুন, ব্রাহ্মণ; আইচ্ছা = ভাল; বাচ্ছা = শিশু বাঁদর; ঝারর্ = বনের। বরই = কুল; বোগার্ বাল্ = বকের পালক; কানী = অন্ধের ন্যায় শিকার সন্ধানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা।

এই ছড়াটির অনেক স্থান অর্থ শূন্য; তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবারও আছে। দেশে অনেক রকমের বামুন বা ব্রাহ্মণ আছে, সে কথা আমাদের খোকা জানে; কেননা সে কতকগুলিকে গজের হাটে বসিয়া ফুল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে; আর কতকগুলি চাষবাসও করে, গরুও পালে এবং তাহা গজের হাটে নিয়া বিক্রয় করে। গজের হাট বাঁশখালী থানার অন্তর্গত একটি অতি প্রসিদ্ধ বাজার।

নিম্নের চারিপংক্তিবিশিষ্ট ছড়াটিতে চট্টগ্রামের অনেকগুলি প্রথার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রায় যাবতীয় প্রথাগুলির ন্যায় এগুলিও এখন দেশ হইতে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একে একে লোপ পাইতে বসিয়াছে। বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামের হাটহাজারি থানায় এমন এক দল সংস্কারক মৌলবীর আবির্ভাব হইয়াছে, অন্যান্য যত দোষই তাহাদের থাকুক, কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ-কল্পে ইহাদের সমবেত চেষ্টা প্রত্যেক শিক্ষিতের নিকট প্রশংসা পাইবার যোগ্য। ইঁহাদের সঙ্ঘ খুব দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত। ইঁহারা দেশের নানাস্থানে মক্তব মাদ্রাছাহ্ স্থাপন করিয়া হাতে কলমে দেশবাসীকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিক্ষা দিতেছেন, এবং শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে দেশের অসাধারণ উপকার সাধন করিতেছেন। ছড়াটি এইরূপ:—

আট্‌করার্ সিন্নি
আশীহাজার্ পীর্;
বেজার্ ন হইয়্ পীর্
এক্কেনা এক্কেনা দির্।

অর্থ —করার = কড়ার; সিন্নি = সির্‌নি; বেজার = অসন্তুষ্ট; ন হইয় = হইবেন না; এক্কেনা = একটু; দির্ = দিতেছি। পীর = এখানে ছেলেকে বুঝাইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত নিতান্ত দরিদ্র; কিন্তু দরিদ্র বলিয়া তাহারা হৃদয়হীন নহে, বিশেষত তাহারা অতিশয় ধর্ম্মভীরু। নূতন ধানের ভাত খাইবার পূর্ব্বে তাহারা "বরকতের" জন্য খোদার নামে "সির্‌নী" দেয় এবং সেই সির্‌নী পাড়া প্রতিবেশীর ছেলে মেয়েকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবার পূর্ব্বে নিজেরা খায় না। ইহা ব্যতীত আরও অনেক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ইহারা খোদার নামে সির্‌নী দিয়া তবে কাজে হাত দেয়।

এই ছড়াটিতে আমরা সির্‌নী এবং পীরের উল্লেখ পাইতেছি। পীরের কথা একটু পরে বলিব। এখন ছড়াটির অর্থ দেখা যাক। ছড়াটি পাঠ করিলে বুঝা যায়,—কোন দরিদ্র কৃষক আটকড়ির গুড় দিয়া সির্‌নী তৈয়ার করিয়া পাড়ার ছেলেকে ডাকিয়া আনিয়া দেখিল যে, ছেলে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে; তখন অনন্যোপায় কৃষক আর কি করিবে? সে অনুনয় করিল, "বাছাধনেরা, অসন্তুষ্ট হইও না; কেননা, তোমাদিগকে অতি অল্প অল্পই দিতেছি।" ছেলেরা কিন্তু এই অনুনয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া এই ছড়াটি রচনা করিয়া পাড়াময় ঘুরিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। এখন এই ছড়াটি একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

ইহা এখন এমন স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে কোনো জিনিষের অল্পতা পরিদৃষ্ট হয়, অথচ সেই জিনিষের জন্য বহু লোক লালায়িত।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে যখন কৌড়ির প্রচলন ছিল, তখন এদেশে পীরেরও অতিশয় সম্মান ছিল। এই ছড়াটিতে কিন্তু পীরের নাম উপহাসচ্ছলেই বলা হইয়াছে। কাজেই দেখা যায়, কৌড়ি প্রচলন উঠিয়া যাইবার সময় হইতে আমাদের দেশ হইতে পীরের প্রভাব উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছড়ায় বলা হইয়াছে একজন "মুরিদের" (শিষ্যের) যদি আশীহাজার (অসংখ্য) পীর (গুরু) থাকে তাহার পীর সন্তুষ্টির পরিমাণের যে দশা ঘটে, এখন অল্প সিরনীর অত্যধিক খাদক হওয়ায় ঠিক সেই দশাই ঘটিয়াছে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পশ্চিম ভাগের কয়েক স্থান বাদ দিলে এখন আমাদের দেশে পীরের প্রভাব একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কয়েকটা জায়গায় আছে, তাহাতেও পীর এখন আগের মত সম্মান পাইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

নিম্নে আমরা যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে আমাদের খোকা মাত্র কয়েক পংক্তির মধ্যে একটি চট্টল পরিবারের বিবাহের ছবি অঙ্কিত করিয়াছে। বিবাহে যে সকল কাণ্ডকারখানা সাধারণত ঘটিয়া থাকে, আমাদের খোকার সহিত তাহার পরিচয় নাই, অথবা সে তাহা দেখিলেও মনে করিয়া রাখিয়া ছড়া করিয়া গাহিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করে নাই। খোকা সাধারণত অন্দর মহলেই থাকে, এবং অন্দরের যে ছবি খোকার প্রাণকে আনন্দোদ্দেল করিয়াছে, তাহাই সে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে। ছড়াটি এই রূপ—

ইঁঅ্লারে ইঁঅ্লা!
কন্যার মারে নেঅলা, তুলার্ মারে ঘল্লা;
তুলার্ মারে নেঅলা, কন্যার মারে ঘল্লা।

অর্থ—ইঁঅ্লা=বিবাহের বা অন্য কোন উৎসবের সময় অন্তঃপুর-চারিনীদের গান। নেঅলা=বাহির কর, (নেকাল দেনা); তুলা=বর; ঘল্লা=ঢুকাও, ভিতরে নিয়া এস।

এখানে খোকা বলিতেছে, "ওগো! বিবাহ হইতেছে, সুখের আর অন্ত নাই! বামাকণ্ঠে গান হইতেছে, বরের মাতা কনের মাতার বাড়ীতে বউ লইয়া যাইতে আসিয়াছে। আর কি! ওগো, হঠাৎ চারিদিকে রব পড়িয়া গিয়াছে, তোমরা আর কনের মাকে দেখিও না বরের মাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আন।" বিবাহ যখন শেষ হয়, খোকা দেখে, বরের মা সঙ্গে করিয়া রোরুদ্যমানা নববধূকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল, আর কনের মা কন্যাকে বেয়ানের হাতে তুলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির। তখন খোকা মনে কষ্ট পায় এবং বলে, "ওগো, তোমরা এবার কনের মাকে একটু যত্ন কর, সে যে একেবারে মরনোন্মুখ।"

এই ছড়াটিতে চট্টগ্রামের একটি কুৎসিত প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাই। এখন কিন্তু এই প্রথাটি ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে; এমন কি অধিকাংশ স্থলে একেবারেই দেখা যায় না। কিন্তু ছেলে মেয়েগুলি এখনও বিবাহে এই ছড়াটি নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করে, আর আমোদ উপভোগ করে। এই কুৎসিত প্রথাটি "বিবাহে বামাকণ্ঠের রাগিণী।" মেয়েদের দ্বারা সমস্বরে বিবাহ বা অন্য কোন আনন্দ উৎসবে এই "ইঁঅ্লা" গান গীত হইত। সুখের বিষয়, দেশে সুরুচিপন্থীদের দল বাড়িয়া যাওয়ায় এই কুপ্রথাটি ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

এইবার আমরা খোকাখুকুদের সহিত সুর মিলাইয়া তাহাদের কাহিনীর শেষ ছড়ার সহিত আমাদের বক্তব্যও পরিসমাপ্ত করিব। রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া নানাবিধ গল্পগুজব করার পর ছেলে-মেয়েদের মাতামহীরা যখন ঘুমাইয়া পড়েন, ঔৎসুক্যপরবশ নাতি নাতিনীরা অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিয়াও যখন কোন উত্তর পায় না, তখন নিম্নলিখিত ছড়া গাহিয়া তাহারা মনকে প্রবোধ দেয়—

কিচ্ছা, মিচ্ছা,
নাইর্‌কলর্ চুচ্ছা,
বাপ্ ন হইতে পোয়া গেইয়ে মুচ্ছা।
এক্‌সের্ চুন্,

মোহাম্মদ এনামুল হক

কিচ্ছা হুন্।
এক্‌সের্ মরিচ্,
কিচ্ছা ধরিছ্।
এক্‌সের্ তেল্
কিচ্ছা গেল্।

অর্থ—কিচ্ছা=গল্প; মিচ্ছা=মিথ্যা; নাইর্‌কলর্=নারিকেলের; চুচ্চা=খোসা, ব্লাকল। পোয়া=ছেলে; মুচ্চা=মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া; ন হইতে=জন্ম না হইতে; মুন=লবণ; হুন=শুন।

এই ছড়াটির প্রথম তিন পংক্তিতে, প্রত্যুত্তর-হতাশ-বালক গল্পগুজবকে নারিকেলের খোসার ন্যায় অসার এবং বাপের জন্মের পূর্ব্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ার ন্যায় অলীক বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছে। কিন্তু তাহার উৎসুক মন তবুও শান্তি পাইতেছে না; পরে একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া, যে ব্যক্তি গল্প শুনে এবং যে গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, তাহাকে পর্য্যন্ত গালি পাড়িতে লাগিল।

লবণ ও মরিচ দিতে বলা চট্টগ্রামের নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটি অকথ্য গালি। হয়ত আমাদের শিশু তাহা শুনিয়া থাকিবে; তাই গল্পের শ্রোতা ও সায়দাতাকে সেই কথায় গালি পাড়িতেছে। গালি গালাজ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত যখন কিছু হইল না, তখন হঠাৎ তৈলের উল্লেখ করিয়া গল্প শেষ করিয়া দিল ও সঙ্গে সঙ্গে হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই ছড়াটির সঙ্গে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ছড়া

"আমার কথাটি ফুরাল,
নটে গাছটি মুড়াল,
কেন নটে মুড়ালি"

ইত্যাদির কি কোন জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ নাই?

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের এইরূপ অসংখ্য ছড়া এদেশের বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও দেশীয় চিত্রের পরিচয় দেয়। তাহার সবগুলি সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিতে গেলে আমাদের মনে হয় একটি প্রকাণ্ড পুস্তক এবং দেশের পারিবারিক পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের একটি বিরাট ইতিহাস রচিত হইতে পারে। দেশের কেহ এদিকে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা কেবল ইঙ্গিত করিলাম।

আম্‌হার্ষ্ট স্ট্রীট্‌, জলমগ্ন জলের কল

'গো-যান', না 'জল-যান' ?

নদী নয়, আম্‌হার্ষ্ট স্ট্রীট্‌ !
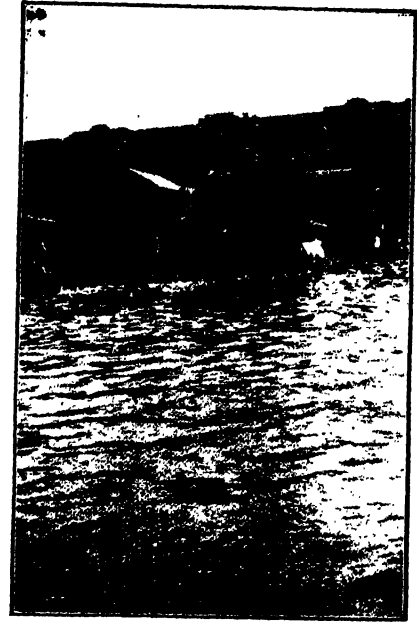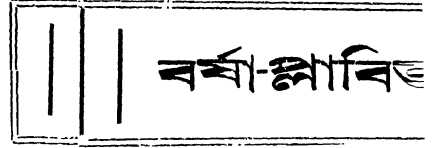
কলিকাতা
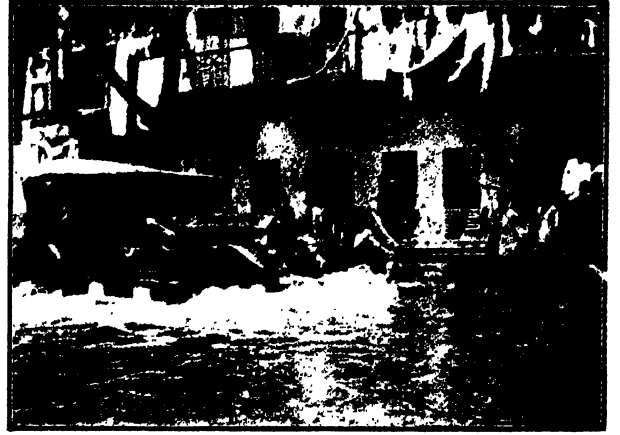
অর্দ্ধমগ্ন ডাক-পিয়ন

মাছের পুকুর নয়, মেছোবাজার

এই আলোক চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত কর্ত্তৃক গৃহীত।

মোটর বোট নয়, মটরকার

নিমন্ত্রণ

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।'"

রবীন্দ্রনাথ

ছত্রিশ ব্যঞ্জনে পূর্ণ অন্নথালিখানি
এ মরজীবনে দিলে,—ওহে পরমেশ!
বিচিত্র আস্বাদে ভরা; আজি যুক্তপাণি
বলিতেছি,—করেছ কী প্রেম-পরিবেশ!
গব্য ঘৃত—শিশুকাল,—সহজ সরল.
ভোগের প্রথম-ভাগ স্বাদু ও রুচির;
পরে বাল্য—আলুভাতে,—সরস কোমল,
স্নিগ্ধতায় চারু অতি মধুর মদির;
কৈশোরের নিমঝোল,—তিক্ততায় ঘন;
কষা-কটু-লবণাক্ত নানা স্বাদযুত
পরে দেছ সে আমার,—নবীন যৌবন,—
আমিষেতে কাঁটা এত, তবুও নিখুঁত!
প্রৌঢ়ত্বের অম্লরসে,—রসনা তৃষিত,
বার্দ্ধক্য,—ধবল-শীর্ষ—সাজায়েছ দধি,
শেষের মিষ্টান্ন,—মৃত্যু,—তুলনারহিত,
খেয়ে যাই নিমন্ত্রণে ডাকিয়াছ যদি।
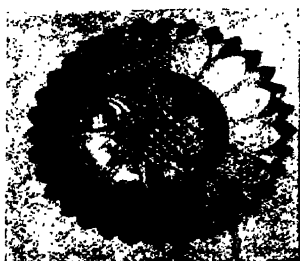
সহযোগী-সাহিত্য

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের ধারা

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

১

রোমান্টিজ্‌মের আবির্ভাব

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে, প্রথমেই যে কথাটি মনে উদয় হয়, সেটিকে ফরাসী ভাষায় বলে romantisme, ইংরেজীতে romanticism। কথাটির বাংলা ভাষায় তেমন কোনো প্রতিশব্দ নাই, এবং আমাদের মনে হয়, অনুসন্ধানের চেষ্টা করাও বৃথা। তার কারণ, কথাটি যে ভাবকে প্রকাশ করে, সে ভাবটি তেমন সুনির্দ্দিষ্ট নয়;—নদীর স্রোতের মতই তাহা নিয়ত-চঞ্চল, বিরাম-বিহীন; দেশে দেশে যুগে যুগে তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তাই কোনো একটি বিশেষ সময়ে,—ধরুন না কেন,—বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই ভাবের যে রূপটি দেখিতে পাই, সেই রূপটিকেই ভাষার মধ্যে বাঁধিয়া যদি কোনো শব্দ সৃষ্টি করি, তবে সেই শব্দের আর যতই উপযোগিতা থাকুক না কেন,—রোমান্টিক আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে যে চঞ্চলতা, যে অনুপ্রেরণা, তাহারই কোনো আভাস না থাকায় শব্দটির কোনো সার্থকতা থাকিবে না। এই যুক্তি ক্রমশঃ আরো পরিস্ফুট হইবে আশা করি, সুতরাং এ সম্বন্ধে এখানে আর কিছু না বলিয়া আপাততঃ romantisme কথাটিই আমরা বাংলা ভাষায় অবলম্বন করিলাম, কেননা ফরাসী কথাটি ইংরেজী কথাটির চেয়ে উচ্চারণ করা সহজ।

সাধারণতঃ রোমান্টিজ্‌ম্ বলিতে আমরা আজকাল বুঝি একটা ভঙ্গিমা,—কল্পনাই যাহার প্রধান অবলম্বন,—এবং যাহার মধ্যে অন্যান্য চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা প্রাণের আবেগ ও অনুভূতিরই প্রাধান্য বেশী। কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে আমরা রোমান্টিজ্‌মের এই বিশেষ রূপটি যখন দেখি, তাহার বহুপূর্ব্বেই সমস্ত ইউরোপ জুড়িয়া সাহিত্যে আরও প্রশস্ততর যে আন্দোলন উঠিয়াছিল,—তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছিল রোমান্টিজ্‌ম্। উৎপত্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে রোমান্টিজ্‌ম্ কথাটির মানে,—রোমান্ জাতীয়দের মানবজীবনের অনুধাবনা, যাহার প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই রোমান্‌দের মহাকাব্যে। রোমান্‌দের নিকট হইতেই মধ্যযুগের আলো আসিয়াছিল, তাই সেই যুগের মনীষার নাম হইয়াছিল রোমান্টিক্। সকলেই জানেন এই রোমান্টিক্ মনীষার যে ধর্ম্ম, তাহা প্রাচীন ক্লাসিক মনীষার ধর্ম্মের ঠিক উল্টা; এই রোমান্টিক মনোবৃত্তি হইতে নিঃসৃত হয় যে আর্ট,—তাহার উদ্দেশ্য অনন্তকে প্রকাশ করা,—যাহা অসীম, যাহা অনধিগম্য, যাহা অদ্ভুত, রহস্যময়, মায়া-বিজড়িত —তাহারই পানে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেওয়া।

ফরাসী দেশে এই রোমান্টিজ্‌মের আবির্ভাব হইয়াছিল অনেক বিলম্বে,—প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন সাহিত্যের অনুকরণে ক্লাসিক আদর্শের একটা পরিণতি—স্থির যুক্তি ও ভাবের পরিস্ফুটতাই ছিল সে সাহিত্যের লক্ষ্য। সেই যুগের বিখ্যাত দার্শনিক ডেকার্ট কোনো কিছুই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন,—যাহা স্থির যুক্তির বিচারে তাঁহার অন্তরে পরিষ্কার প্রতিভাত না হয়। ভগবানকে তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল, প্রাণের কোনো আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য নয়,—ভগবান্‌কে না হইলে জগতের একটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা যায় না বলিয়া। স্থিরযুক্তির বিচারের

এই যে বন্ধন, মানুষ কোথাও তাহা প্রসন্ন চিত্তে চিরকাল মানিয়া লইতে পারে না,—মানুষের অন্তর ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠে, বিশেষ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে,—কেননা সাহিত্যের যাহা বিষয়, তাহা চিরপরিবর্ত্তনশীল,—মানুষের ভাবরাজি। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা দেখি, যে সপ্তদশ শতাব্দীর এই ক্লাসিক আদর্শের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে,—কিন্তু তবুও আদর্শটি যাই যাই করিয়াও যাইতেছে না;—"Académie des Sciences"এর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল,—তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার শেষ অনুপ্রেরণাটি ধুক্‌ধুক্ করিতেছে। এই জন্য আর্টের দিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য সপ্তদশ শতাব্দীর ক্লাসিক সাহিত্যের চেয়ে এবং উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক সাহিত্যের চেয়ে নিকৃষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকেরা চিন্তাশীল ছিলেন, কিন্তু শিল্পী ছিলেন না। তাঁহাদের চিন্তায় ছিল বস্তুতন্ত্রতার প্রাধান্য,—এমন কি, তাঁহদের লেখায় মানুষের মনুষ্যত্বটুকুও পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহার শরীরটুকুর মধ্যে। এমন আব্‌হাওয়ায় গীতি কবিতার জন্ম যে সম্ভব নয় তাহা স্বতঃসিদ্ধ,—হয় ও নাই, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত রুসো মানুষের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন,—স্থিরশীতল বুদ্ধির অনুমান-প্রমাণ হইতে অন্তঃকরণের গভীরতর ধ্রুব উপলব্ধির দিকে, বিজ্ঞানের কল্পনা হইতে বিবেকের অভ্রান্ত বাণীর দিকে, শিক্ষিত সমাজের কৃত্রিমতা হইতে সুস্থ সহজ-বোধের স্বাভাবিকতার দিকে। সুতরাং অনেকদিন পর্য্যন্ত ফরাসী সাহিত্যে কোন কবি ছিল না। প্রায় দুইশত বৎসর ব্যবধানের পর, অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেসভাগে আমরা ফরাসী সাহিত্যে দেখিতে পাই, একজন সত্যকারের কবি,—আঁদ্রে সেনিয়ে (André Chénier)। তিনি মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে গিলোটিনে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, কিন্তু এই বয়সের মধ্যেই তিনি অনেক নূতন নূতন ছন্দ আবিষ্কার করিয়া পরবর্ত্তী রোমান্টিক কবিদের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিলেন। তাঁহার "তরুণী বন্দিনী" (La jeune captive) শীর্ষক কবিতাটি, তাহার নিখুঁত রূপ ও সকরুণ সুরের জন্য ফরাসী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

এইখানে হইল ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিজ্‌মের সূচনা,—যাহার পরিণতি আমরা দেখিতে পাই ভিক্টর হিউগোর মধ্যে। এই রোমান্টিজ্‌মের বীজ বপন করিয়াছিলেন রুসো। ফরাসী সাহিত্যের উপর তাঁহার অসাধারণ হৃদয়ের ছাপ দিয়া তিনি যেন একাই সাহিত্যে এক যুগান্তর আনিয়া ফেলিলেন। প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া যেখানে একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি,—সেই সাহিত্যরাজ্যে তিনি তাঁহার হৃদয়-বৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একেবারেই তাহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। মানুষের হৃদয় উজাড় করিয়া দেওয়া, তাহার আকাঙ্ক্ষা, তাহার বেদনা, তাহার আবেগ নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়া,—এই ত সাহিত্য। তাই সর্ব্বত্রই রুসো তাঁহার আত্মাকে প্রসারণ করিয়া দিলেন,—কি বহিঃপ্রকৃতি, কি অন্তঃপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। কত চিন্তা, কত চেষ্টা, কত যুক্তি, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন, কত বেদনা তাঁহার অশান্ত অন্তরে নিয়ত আলোড়িত হইয়া তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিল। এমন হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য-সম্ভার যখন অফুরন্ত চমকপ্রদ প্রস্রবণে জগতের উপর নিঃসারিত হইয়াছিল, তখন যে একটা যুগান্তর ঘটিবে, তাহা আর বিচিত্র কি! "তিনি সে প্রাচীন জগৎকে এমনই ভাবে একই সময়ে নাড়া ও দোলা দিয়াছিলেন, যেন মনে হয় তিনি তাহার বিনাশ করিয়াও তাহাকে সোহাগ করিতে ছাড়িতেছেন না"।* পরবর্ত্তী রোমান্টিক কবিদের মধ্যে দেখিতে পাই যে বেদনা, সে ত রুসোরই অন্তরের বেদনা। তিনিই বিশ্বের অশ্রুজলের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই লোকচক্ষু উন্মীলন করিয়া প্রাণ-পাগল-করা ভাষায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের গরিমা, বসন্তরাতের প্রাণস্পর্শী স্নিগ্ধতা, মাঠে মাঠে শ্যামল শস্যের উল্লাস, স্তব্ধ ঘন নিবিড় অরণ্যানীর গোপন রহস্য, কত বর্ণ শব্দ গন্ধের মেলা,—ফুলের সুষমা, পাতার মর্ম্মর, পাখীর গান, পতঙ্গের নৃত্য, বাতাসের শন্ শন্ ধ্বনি।

*[Il a tellement secoue´ et berce´ à la fois l'ancien monde qu' il semble l'avoir tue´ sans cesser de le caresser—E´mile Faguet.]

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

এককথায় রুসোই ফরাসী সাহিত্যে রোমাণ্টিক যুগের জন্ম দিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ তিনি সমসাময়িক সাহিত্যকে এমন নাড়া দিয়াছিলেন, যাহাতে শীঘ্রই একটা আমূল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। এই পরিবর্ত্তন-যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁহাদের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ-যোগ্য, তাঁহাদের মধ্যে একজন মাদাম দ'স্তা-য়্‌ল্ (Madame de Staël), আর একজন শাতোব্রিঁয়া (Chateaubriand)। নেপোলিয়নের সহিত শত্রুতার দরুণ মাদাম স্তা-য়্‌লের জীবনের অনেকটা অংশ কাটিয়াছিল ফ্রান্সের বাহিরে, জার্ম্মানীতে। সেখানে আর্টের যে বিশেষ রূপটি তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, সেটি সেই যুগের নবীনতা-পিয়াসী ফরাসী-সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজনেই আসিয়াছিল। তাঁহার জার্ম্মানী সম্বন্ধে লেখা বইখানির মধ্যে আমরা এমন অনেক জিনিস পাই, যাহা সে যুগের ফরাসী সমাজে ও সাহিত্যে একটা নূতন বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল। তখনকার ফরাসীসমাজ প্রতিভার চর্চ্চা করিয়া তাহাকে তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল,—হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চা করিয়া সেগুলিকে সুন্দর ও সকরুণ করিয়া তুলিয়াছিল,—কিন্তু মানুষের গোপন অন্তরের মধ্যে যে নিভৃত দেবতাটি লুকাইয়া থাকেন, তাহারই কোনো খবর রাখে নাই। তখনকার লেখকেরা লিখিয়া যাইতেন, সেই সনাতন মামুলি নিয়মগুলি মানিয়া চলিয়া, এই বিশ্বাসে যে পাঠকেরা সেই নিয়মগুলি জানে ও মানিয়া লইয়াছে,—অতএব তাঁহাদের লেখার আদর হইতে দেরি হইবে না। তাই তাঁহাদের লেখার প্রধানগুণ যাহা ছিল, তাহা হয় তৎকালীন সমাজের আচার ব্যবহারের একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুকরণ,—নয়-ত এমন একটা কিছু, যাহার উৎকর্ষ শুধু একটা ধারালো প্রতিভার দ্বারাই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। এই সমাজে এবং এই সাহিত্যে মাদাম স্তা-য়্‌ল্ জার্ম্মানী হইতে আমদানী করিলেন, এমন একটা নূতন ধরণের আর্ট যাহার উৎস মানুষের সেই অন্তরতম নিভৃত দেবতাটির মধ্যে; এমন কাব্য, যাহার ছন্দের ঝঙ্কারে মানুষের গোপনতম প্রাণের গভীরতম বেদনা বাজিয়া উঠে। সে কাব্যে না ছিল কৃত্রিমতা, না ছিল অনুকরণ,—শুধু ছিল মানুষের সরল অনুভূতি, তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাহার স্বপ্ন, তাহার সঙ্গীত, আর তাহার হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য।

মাদাম স্তা-য়্‌লের "De = Allemagne" শীর্ষক এই গ্রন্থখানি তৎকালীন সাহিত্যের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু লেখক হিসাবে শাতোব্রিঁয়া ছিলেন আরও শক্তিশালী। উপর্য্যুপরি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি সহসা যেন সে যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে কল্পনার নদী বহাইয়া দিলেন। তাঁহার ভাব-প্রবণতা ও ব্যক্তিতন্ত্রতার মধ্যে আমরা পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর নির্ব্বিকার সংযমের একেবারে উল্টা সুর। তিনি পড়িয়াছিলেন অনেক, তাঁহার প্রতিভাও ছিল গুণগ্রাহী, তাই তিনি ক্লাসিক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট যা-কিছু, তাহার প্রতি যে অন্ধ ছিলেন তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার আপত্তি ছিল ক্লাসিক আদর্শের একেবারে গোড়ার কথাটিতে। ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শ আসল মানুষটিকেই বাদ দিতে চায়। সাহিত্যের হওয়া চাই একেবারে নির্ব্বিকার, স্বয়ং-বোধ-বিহীন; লেখক তাঁহার রচনার মধ্যে স্বয়ং উঁকি মারিতে পারিবেন না,—ইহাই ছিল ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শ। এইখানেই ক্লাসিক প্রতিভা ভুল করিয়াছিল। অনেক উৎকৃষ্ট জিনিস ক্লাসিক প্রতিভা দান করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ভুলটি না করিলে আরও উৎকৃষ্টতর জিনিস দান করিতে পারিত,—ইহাই ছিল শাতোব্রিঁয়ার বিশ্বাস। তাঁহার "খ্রীষ্টধর্ম্মের মনীষা" (Génie du Christianisme) শীর্ষক গ্রন্থে তিনি নবীন উনবিংশ শতাব্দীকে যে বাণী দান করিয়াছেন, এক কথায় তাহা এই,—'হৃদয়ের মধ্যে অনুসন্ধান কর, সেইখানেই তোমার প্রতিভার অধিষ্ঠান, অন্ততঃ তোমার মধ্যে গভীর যা-কিছু, উর্ব্বর, ফলপ্রসূ যা-কিছু তাহার সন্ধান সেইখানেই মিলিবে। তোমার যা-কিছু অনুভূতি সব প্রকাশ করিয়া ফেল, যা-কিছু আবেগ সব ঢালিয়া দাও, উচ্ছ্বাস দমন করিয়ো না। এমনি করিয়াই একটা নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, যাহার আবেদন মানুষের প্রাণের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে এ যেন একটা নূতন আলো আসিয়া পড়িল। এই আলোর প্রথম রশ্মি—লামার্তিনের

কবিতা। এতদিন পরে, এই গভীর অনুপ্রাণনায় ফরাসী সাহিত্যে যথার্থ গীতি-কাব্যের জন্ম হইল।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে মানুষের মনে ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিস্তর উপন্যাস রচিত হইয়াছিল, যাহা নিতান্তই সাধারণ, এবং 'পনেরো আনা' লোকেদের মত অচিরেই বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল;—কিন্তু সেই সব উপন্যাসেই একটা কথা বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে,-বাঁচিয়া থাকা, এবং ভাষায় মানব-জীবন ফুটাইয়া তোলা,—তাহা ঠিক যুক্তি ও বিশ্লেষণের কাজ নয়,—অন্তরের বাণীও শ্রবণ করা চাই, মানুষের সকরুণ অনুভূতির রসাস্বাদন চাই,—দুর্দ্দমনীয় অথচ কোমল হৃদয়ের আবেগরাশির দোলন চাই, সর্ব্বগ্রাসী বাসনার বিষে ও বেদনায় জর্জ্জরিত হওয়া চাই, বেদনার মধ্যেও যে মাধুর্য্য আছে তাহার অনুসন্ধান করা চাই,—এমন কি, বিস্মৃতি ও বিলুপ্তির মধ্যেও যে মর্ম্মন্তুদ বিশ্রাম, তাহারও অন্বেষণ করা চাই।

এমনি করিয়া ফরাসী সাহিত্যে রোমাণ্টিক আন্দোলন আরম্ভ হইল। সত্যের মধ্যে প্রয়াণ, সমগ্র জীবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ, আর্টে স্বাধীনতা—ইহাই ছিল নবীনপন্থীদের মন্ত্র। তাঁহাদের মন্ত্রণা-সভা (cénacle) ছিল চার্ল্‌স্‌ নোদিয়ে নামক একজন সাহিত্যিকের বৈঠকখানায়। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় জড় হইয়া তাঁহারা আর্ট ও সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। ইঁহাদের দলপতি ছিলেন ভিক্টর হিউগো। এই মন্ত্রণা-সভায় রোমাণ্টিক সম্প্রদায়ের মতামতগুলি সম্যক্‌ আলোচিত হইয়া ওজস্বী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইল। এতদিন যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, যে সমস্ত প্রবৃত্তি এলোমেলো ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল,—এইবার ভিক্টর হিউগোর নেতৃত্বে সেগুলি একত্রিত হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইল।

(ক্রমশঃ)

গোপন কথা

শ্রীউমা দেবী

সেই কথাটি আমার মনে
আজকে শুধু জাগে,
শুনেছিলেম তোমার মুখে
কতদিনের আগে।
সেদিন ছিল পূর্ণিমা রাত
নবীন বরষার,
তুমি আমি একলা সেদিন
কেউ ছিল না আর।
আধোয় আলো ভরেছিল
কালো মেঘের ফাঁক,
ছিলাম সেদিন দোঁহে মোরা
নীরব নির্ব্বাক।
হঠাৎ তুমি বল্লে তোমার
না-বলা সেই বাণী
আবেশ ভরে কাঁপ্‌ল যেন
আকুল হিয়া খানি।
কতরকম ঘট্‌ছে ব্যাপার
হেথায় বারোমাস
হিসেব তাহার রাখছে কেবা
লিখ্‌ছে ইতিহাস?
আমার মনের গোপন কোণের
একটি ছোট মুখ
এ জগতে কার কাছে তার
মূল্য এতটুক্‌?
একটি ছোট কথা আমার
অমূল্য দাম তার,
আমি জানি আর জানে সে
কেউ জানে না আর

গান
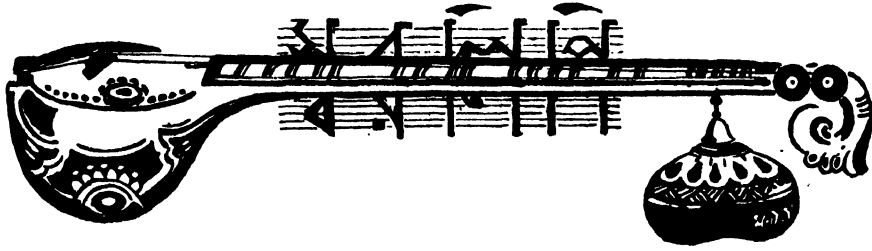
স্থরের ঐ স্থরধুনী চিরদিন বওয়াও প্রাণে
মুছে দাও মনের কালী রসেরি উতল বানে।
তোমার ঐ গানের মধু যদি না পাই হে বধু
জীবনের যাত্রা পথে চলিব কিসের টানে!
জগতের যতই কাজে যখনি বাঁধা পড়ি
সুমধুর বেণুর স্থরে ডেকো হে আমায় স্মরি'।
সারাদিন দেখব মেলা কত যে খেলব খেলা
সাঁঝেতে আসব ছুটে পূরবীর করুণ তানে।

কথা—শ্রীস্থধীরচন্দ্র কর

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সা II রা মা -া । পা পদা পণা । ণদা পা -া । -া দা -মা I
স্থ রের ঐ ০ স্থ র ০ ০ ধু নী ০ ০ ০ চি

I পা দা -পা । মা পা -দা । দমা -পদা -মপা । মজ্ঞা -া সা I
র দি ন্ বও য়া ও প্রা ০ ০ ০ ০ ণে ০ মু

I রা জ্ঞা -া । রা জ্ঞা ঋা । সা -া রা । জ্ঞা -া সা I
ছে দা ও ম নে র্ কা ০ ০ লী ০ র

I র্সা র্সা -ঋা । ণা র্সা -জ্ঞা । জ্ঞঋা -র্সা -ণা । দা -া সা II
সে রি ০ উ ত ল্ বা ০ ০ নে ০ "স্থ"

I -া -া মা II ণদা দা -ণা । ণা র্সা -া । র্সা -র্ঋা -ণা । র্সা -া র্সা I
০ ০ তো মার ঐ ০ গা নের্ ০ ম ০ ০ ধু ০ য

I র্রা র্জ্ঞা -র্ঋা । র্সা -র্ঋর্মা র্মর্জ্ঞা । র্ঋা র্সা -া । -া -া র্ঋা I
দি না ০ পা ই হে বঁ ধু ০ ০ ০ জী

I র্সা ণা -দা । পা -া ণা । ণদা পা -া । -া -া মা I
ব নে র্ যা ০ ত্রা প থে ০ ০ ০ চ

I পা দা -পা । মা পা -ণা । ণদা -া -পা । মজ্ঞা -া সা II
লি ব ০ কি সে র্ টা ০ ০ নে ০ "সু"

I -া -া সা II সা সা -রা । জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞা -া -রা । জ্ঞা -া জ্ঞা I
০ ০ জ গ তে র্ য ত ই কা ০ ০ জে ০ য

I মা মা -া । মা মা -হ্মা । হ্মা মা -া । -া -া সা I
থ নিই ০ বাঁ ধা ০ প ড়ি ০ ০ ০ সু

I রা জ্ঞা ঋা । সা মজ্ঞা -ঋজ্ঞা । ঋা সা -া । -া -া দ্‌া I
ম ধু র্ বে ণু র্ সু রে ০ ০ ০ ডে

I ণ্‌া সা -জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞঋা -জ্ঞা । ঋা সা -া । -া -া পা I
কো হে ০ আ মা য়্ স্ম রি ০ ০ ০ সা

I ণদা দা -ণা । ণা -র্সা র্ঋা । ণা র্সা -া । -া -া র্সা I
রা দিন্ দে খ্ ব মে লা ০ ০ ০ ক

I র্রা র্জ্ঞা -র্ঋা । র্সা -র্মা র্মর্জ্ঞা । র্ঋা র্সা -া । -া -া ণা I
ত যে ০ খে ল্ ব খে লা ০ ০ ০ সাঁ

I -ণা ণা -দা । পা -ণা ণদা । মপা পমা -া । -া -া জ্ঞা I
ঝে তে ০ আ স্ ব ছু টে ০ ০ ০ পূ

I রা মজ্ঞা -ঋা । সা ঋা -মা । জ্ঞা -ঋা জ্ঞঋা । সা -া সা III
র বী র্ ক রু ণ তা ০ ০ ০ নে ০ "সু"

হরিদ্বার

শৈবালিক পর্ব্বতমালার পাদদেশে, গঙ্গা যেখানে শৈল-সানু হইতে উৎসারিত হইয়া সমতল ভূমির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সেইখানে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে, সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত এই প্রাচীন নগরটি উত্তর-ভারতে হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ-স্থান। গঙ্গার একদিকে হরিদ্বার, অপর তীরে চণ্ডী-পাহাড়। এই তীর্থটির কিঞ্চিৎ নাম-রহস্য আছে। বর্ত্তমান হরিদ্বার নামটি বিশেষ পুরাতন নহে। বিস্মৃত-প্রায় পৌরাণিক যুগের সংজ্ঞা হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার অনেক বার নাম-বদল হইয়াছে। এক সময়ে কপিলমুনির নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছিল "কপিল" বা "গুপিল"। প্রবাদ এইরূপ যে, কপিলমুনি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। আজও পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে 'কপিলস্থান' নামক একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া 'ইহা কপিলের আশ্রম ছিল' বলে। এক সময়ে ইহা মায়া-তীর্থ নামেও খ্যাত ছিল; সেই নামে ইহা সপ্ততীর্থের অন্তর্গত হইয়া আছে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব
সপ্তৈতা মোক্ষ-দায়িকা॥

এই "মায়া" নাম যে এক সময়ে হরিদ্বারকেই বুঝাইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হরিদ্বারের সন্নিকটে আজও একটি গ্রাম আছে যাহার নাম 'মায়াপুর'। এই মায়াপুরে আজও একটি বহুপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। এই সহরের উল্লেখ, প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন্ সাং, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার রচিত পুঁথির মধ্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাকে "ময়ুলু" (Mo-yu-lo) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি "ময়ুলুর" পরিধি তিন মাইল বলিয়া গিয়াছেন ও তাঁহার মতে এই স্থান অতিশয় জনবহুল ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কানিংহাম সাহেব বর্ত্তমানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে একথা সত্য বলিয়া অনুমান করেন।

হরিদ্বার

ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরে আজকালকার হরিদ্বার অবস্থিত। "ময়ূলুর" ধ্বংসাবশেষ এই মায়াপুরে, মায়াদেবীর মন্দির বর্ত্তমান ; ইহার কথা পরে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

আবু রিহান্ ও রসিদ্দ্দিন, তাঁহাদের গ্রন্থে ইহাকে "গঙ্গাদ্বার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবুল ফজল স্বীয় পুস্তকে ইহাকে মায়া (ময়ূরা বা মায়াপুর) নামে অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা গঙ্গাতীরে দৈর্ঘ্যে ৩৬ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত পবিত্র-ভূমি। আকবরের পরবর্ত্তী সময়ে টম্ করায়াৎ (Tom Coryat) নামে জনৈক পাশ্চাত্য পরিব্রাজক ইহাকে "হরদ্বার" বা শিবের দুয়ার বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর এই 'হরিদ্বার' লইয়া দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে ইহা 'হরদ্বার' হইতেই পারে না, আসল নাম নিশ্চয়ই "হরিদ্বার" ; এদিকে শৈবেরা শিব-পুরাণ হইতে মায়াদেবী সম্বন্ধীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে 'হরিদ্বার'টা বর্ণাশুদ্ধি ও উচ্চারণের অশুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে, প্রকৃত শুদ্ধ শব্দটি হইতেছে "হরদ্বার" ! এখন এ কজিয়ার মীমাংসা করে এমন কাজী বর্ত্তমানে কেহ নাই। উভয় পক্ষেরই তর্ক-যুক্তির তূণীর শরপূর্ণ ; কেহ কাহারো নিকট পরাজিত হইতে অনিচ্ছুক। হরিদ্বার হইতে দ্বন্দ্বটা গঙ্গায় পৌঁছাইয়াছে। বলা যায় না পরে আরো কতদূর গড়াইবে ! বিষ্ণুপুরাণে বলে যে বিষ্ণু হইতে 'গঙ্গা' ও শিব হইতে গঙ্গার পূর্ব্বদিকস্থ শাখানদী 'অলকানন্দা' উৎপন্ন হইয়াছে। সত্য বলিতে বর্ত্তমান শৈব ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভৃতির উদ্ভবের বহু পূর্ব্বে এই তীর্থ বর্ত্তমান ছিল ; পরবর্ত্তী বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব ধর্ম্মের কিছু কিছু চিহ্ন সেই জন্য আজও এখানে পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিদ্বার—গঙ্গাতীর

প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর যে মেলাটি বসে তাহার নাম কুম্ভমেলা। প্রতি বৎসর যে মেলাটি বসে তাহাতে সাধারণতঃ এক লক্ষ লোক সমবেত হয়, কিন্তু কুম্ভমেলায় অন্যূন তিন লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এই কুম্ভ মেলা পুণ্যকামীদের যতই আকর্ষণের বস্তু হউক না কেন, লোক সমাগমের বিপুলতা-প্রযুক্ত পণ্যদ্রব্যের আমদানী হয়। এখানকার 'ঘোড়া হাটা' উত্তর ভারতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। পশুপণ্য ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু প্রকারের শিল্প-জাত দ্রব্যাদিও এখানে বিক্রীত হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য ও শস্যাদির বাণিজ্যও এই মেলায় বিশেষ অর্থকরী।

হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। যাঁহাদের সে মহান উদার পবিত্র সৌন্দর্য্য দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে,
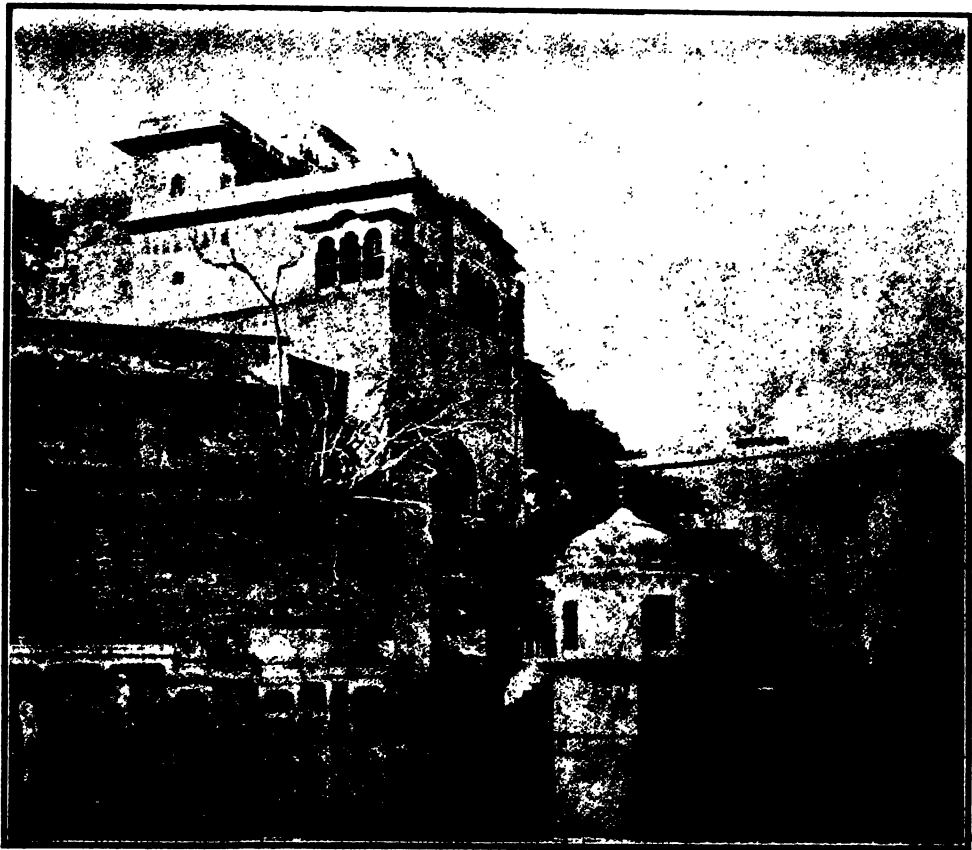
গঙ্গাতীরস্থ হরিদ্বারের স্নানের ঘাট

তাহা বিশেষ ভীতিকর ও বিপজ্জনক হইয়া উঠে। বিগত পূর্ণ কুম্ভযোগের সময় ৩০।৩৫ জন নর-নারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সংবাদপত্রে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে একটি প্রকাণ্ড বাজার বসে। ভারতবর্ষের নানা দূর প্রদেশসমূহ হইতে এই সময় এখানে বহুবিধ ভাষার বর্ণনায় তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করা সুদুষ্কর। পুণ্যতোয়া গোমুখী-নিঃসৃতা কল-তরঙ্গিনী গঙ্গা, রাশি রাশি ক্ষুদ্র বৃহৎ বর্ত্তুলাকার উপলখণ্ড বক্ষে করিয়া শিশুর মত ছল ছল কল কল হাস্যবিলাসে খেলা করিতে করিতে যেন এখানে সমতল ভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া বহিয়া চলিয়াছেন!

উর্দ্ধে অন্তহীন শান্ত নীলাকাশ, সম্মুখে গম্ভীর গিরিরাজের শাসন-তর্জ্জনী, আকাশ-বাতাস ব্যাপিয়া মন্দিরোত্থিত সন্ধ্যারতির মধুর কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খ-ধ্বনি, শত শত দীপালোক-ঝলসিত লাস্যময়ী লহরী-মালা, তাহার সহিত মুক্ত পবিত্র স্বাস্থ্যসঙ্গীতময় বাতাসে গন্ধ-ধূপের সৌরভ—সমস্ত মিলিত হইয়া হরিদ্বারকে বিশালতায়, পবিত্রতায়, সুমহান সৌন্দর্য্যে, প্রকৃতপক্ষে স্বর্গদ্বার তুল্যই করিয়া রাখিয়াছে !

দশম কি একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মায়াদেবীর মূর্ত্তিটি একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। ইঁহার তিনটি মস্তক ও চারিটি হস্ত এবং ইনি ভূপতিত একটি শত্রুকে হত্যা করিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে চক্র, আর হস্তে নরমুণ্ড এবং তৃতীয় হস্তে ত্রিশূল। নামের সাদৃশ্য থাকিলেও, বলা বাহুল্য বুদ্ধদেবের জননীর সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার সহিত বরং কিছু সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু

চণ্ডীদেবীর মন্দির হইতে হরিদ্বারের সাধারণ দৃশ্য

কয়েকটি প্রধান মন্দির ও দ্রষ্টব্য স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই আমি এ নিবন্ধ শেষ করিব।

১। চণ্ডীপহর মন্দির—ইহা গঙ্গাতীরস্থ একটি ক্ষুদ্র শৈলোপরি অবস্থিত।

২। মায়াদেবীর মন্দির—সম্পূর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উপর যে সমস্ত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় ইহা

নামটি যদি সত্যই অবিকৃত অবস্থায় আজও প্রচলিত হইয়া আসিয়া থাকে, তবে উহা পৌরাণিক মায়া-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি হইবে। শাস্ত্রে আছে যে শ্রীভগবানের আদ্যাশক্তি মায়া দ্বারাই বিশ্ব সৃজিত হইয়াছিল। ইহা সেই মায়াদেবী হইতে পারিত। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার বিশ্বসৃজনকার্য্যের সাক্ষ্য দেয় না। সেই জন্য কল্পনা ও যুক্তির সাহায্যে এই মায়াদেবীকে দুর্গার সহিত অভিন্ন ধরিয়া লওয়া

শ্রীরামেন্দু দত্ত

স্বাভাবিক। তাহার একটা সুবিধাও আছে। কারণ শিবানীকে বিষ্ণু তাঁহার চক্র এবং শিব তাঁহার ত্রিশূল দিয়াছিলেন। নরমুণ্ডটি দেবী স্বয়ং কোথাও হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া থাকিবেন! মায়াদেবীর সন্নিকটে অষ্ট হস্ত-বিশিষ্ট একটি পুরুষ-মূর্ত্তি উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন। তিনি শিব। মন্দিরের বহির্দেশে একটি ষণ্ডমূর্ত্তি ও একটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সব ব্যতীত আরও একটি বৃহৎ প্রস্তর-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এত অস্পষ্ট যে স্বরূপ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু মন্দিরের অপর সকল প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষা উহা অনেক বড়। সুতরাং কে জানে, হয়ত উহাই আদি মায়া-দেবীর মূর্ত্তি ছিল। বহু পুরাতন এবং আকারে বৃহৎ বলিয়া কালের করাল হস্ত অগ্রে উহারই উপর প্রসারিত হইয়াছে, এবং যেগুলি টিকিয়া গেল তাহাদের উপরই ঐ মূর্ত্তির নাম ও রূপস্বরূপ কিছু সংশয়ও আরোপিত হইয়া রহিল।

৩। সর্ব্বনাথের মন্দির—ইহা অপেক্ষাকৃত আদিম। বোধিবৃক্ষের নিম্নে ধ্যানরত বুদ্ধের একটি প্রতিকৃতি ইহার বহির্দেশে বিদ্যমান। তাহার সহিত আরও চারিটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইটি দণ্ডায়মান ও দুইটি শয়ান অবস্থায় আছে। মন্দিরের বেদীর উপর সিংহমূর্ত্তিধৃত একটি চক্র আছে ও আদি বুদ্ধের প্রতি-মূর্ত্তিও বর্ত্তমান।

৪। 'গঙ্গাদ্বার মন্দির' বা 'হরি-কী-চরণ'—এটি একটি স্নানের ঘাট। আজো ইহার সোপানশ্রেণীতে বহু স্নানার্থীর ভীড় হইয়া থাকে। এরূপ নাম-করণ হইবার কারণ এই যে এই ঘাটের উপরিস্থিত প্রাচীর মধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ড আছে যাহাতে বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত বলিয়া লোকের ধারণা। এই হরি-কী-চরণ বা হর্-কা-পীঁড়ি পুণ্যলোভী হিন্দুদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। এখানেও সেই নাম বিভ্রাট!

হরিদ্বার-গঙ্গাতীর

উপরি-উক্ত মন্দিরগুলি ব্যতীত নারায়ণ-শিলা ও ভৈরব-মূর্ত্তি প্রভৃতির কতকগুলি ছোট ছোট মূর্ত্তিও আছে। হরিদ্বারের গঙ্গা যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ, সেখানে উহা প্রস্থে এক মাইল। এই গঙ্গাবক্ষে কতকগুলি সুবৃহৎ দ্বীপ বিরাজিত। হরিদ্বারের দু' মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কন্‌খলে কতকগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থ ও দ্রষ্টব্য মন্দির আছে—

রাজা দক্ষ প্রজাপতির মন্দির। সতীকুণ্ড, যেখানে সতী দেহত্যাগ করেন। দক্ষস্থান, যেখানে দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কন্‌খল ব্যতীত হরিদ্বার হইতে আরও দুইটি প্রসিদ্ধ তীর্থে যাওয়া উচিত। একটি শৈবতীর্থ কেদার নাথ, অপরটি বৈষ্ণবতীর্থ বদ্রীনারায়ণ। শ্রীরামেন্দু দত্ত

ভূগর্ভ-নিহিত নগরী

—উর্—

বাইবেল উক্ত কেলডিয়ানদের উর (Ur) নগরী ইরাকের (মেসোপটেমিয়া) ভূগর্ভ-নিহিত নগরসমূহের মধ্যে প্রধান। এই স্থানের কথা বাইবেলের সৃষ্টি-প্রকরণে (Book of Genesis) বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও ইহার ঐতিহ্য সম্বন্ধে কাহারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। ইহা শুধু 'কথা'

উর-এর ব্যাবেল-স্তম্ভ

(tradition) মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহার অবস্থান স্থিরীকৃত ও উহা খননের দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক বিষয়-সকলের গোচরীভূত হওয়ায় এই নগরীর ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এই বালুকা প্রোথিত নগরীতে যে, কোন এক সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ও ক্ষমতা-শালী সাম্রাজ্যের বহু চিহ্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ানদের মতে নোয়া (Noah) ও জলপ্লাবনের সময় হইতে বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিহাসের প্রারম্ভ। প্রকৃতপক্ষে এই যুগ, লিখিত ঐতিহাসিক যুগের এত নিকটবর্ত্তী যে বাইবেলের সৃষ্টি-প্রকরণে জগতের ইতিহাসের এই বিশিষ্ট ঘটনা অতি অসম্বদ্ধ-ভাবে লিখিত আছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের দ্বারা ঐ নগরীখননে প্রাগৈতিহাসিক যুগের তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সব তারিখ-যুক্ত বস্তু এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে বাইবেলের প্রথম অংশের কয়েক অধ্যায়ের ঘটনা ব্যতীত আর সব ঘটনা তাহার আরও বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। লিখিত প্রাচীন ইতিহাসের আরো বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বিবরণ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

হইয়াছে। জলপ্লাবনের পর যে তৃতীয় রাজবংশ উরবংশ নামে খ্যাত, যৎসম্বন্ধে বেবিলনে কিংবদন্তী আছে, উহার রাজত্বের সময় ৪৩০০ খ্রীঃ পূঃ নির্ণীত হইয়াছে।

১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ ব্রিটিশ মিউজিয়মের অধীনে বসরার কন্‌সল্ জি, ই, টেলর (G. E. Taylor) কর্ত্তৃক প্রথমে এই নগরীর অবস্থান নির্ণীত হয়। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কার উত্তর দিকের মৃত্তিকা-স্তূপের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কৃত বস্তুর দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় ইরাকের কতক অংশ ইংরাজের অধীনে আসে। সেই সময়ে প্রাচীন উর নগরীর প্রত্ন-তত্ত্বের জন্য বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠে। এক বিশেষ নির্ব্বাচিত সভায় এই কার্য্যের জন্য গবেষণাকারীদল পাঠান স্থির হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ম এই কার্য্যে একসঙ্গে কাজ করিবার জন্য পেনসিল-ভেনিয়া য়ুনিভারসিটি মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমন্ত্রিত করেন, যাহাতে এই উভয় মিউজিয়মের বৈজ্ঞানিকরা সমবেত অভিযানের দ্বারা ঐতিহাসিকযুগের পূর্ব্বের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। তাঁহারা কেলডিয়ান্‌দের প্রাচীন উর-নগরীর অবস্থানের মাটি খুঁড়িয়া সৃষ্টি প্রকরণে (Book of Genesis) বর্ণিত অব্রাহামের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার প্রায় ৪০০০ খ্রীঃপূঃ সমসাময়িক অতি উন্নত ধরণের সভ্যতার অবিসংবাদী প্রমাণ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

১৯১৯ খ্রীঃ অঃ শীতকালে ব্রিটিশ মিউজিয়মের অধীনে ডাঃ হল (Dr. Hall) চন্দ্র দেবের (Nannar) মন্দিরের খননকার্য্য আরম্ভ করেন। ইরাক দেশের ভূগর্ভ নিহিত এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগরীখননে অনেক বিষয় জানিতে পারা যাইবে তাহার নিশ্চিত আভাস পাওয়া যায়। ১৯২২ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বোল্লিখিত সম্মিলিত অভিযান অনেকগুলি প্রাচীন প্রাসাদাবলীর আবিষ্কারে ও সহরের অন্তর্ভাগের নক্সা ঠিক করিতে সক্ষম হইয়াছিল। গৃহতল, প্রাচীর, মন্দির, ইত্যাদি এরূপ দক্ষতার সহিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে খনন করা হইয়াছিল যে, প্রথম অবস্থান হইতে এক খানি ইটও অযথাভাবে স্থানচ্যুত হয় নাই। প্রথমে তাঁহারা মন্দিরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান, এবং নগরীর অন্তর্ভাগকে যে বিখ্যাত প্রাচীরদ্বয় (temens) বেষ্টিত রাখিয়াছে তাহা আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পরিবৃত স্থানের নাম সুমেরিয়ান ভাষায় এ-টেমেন্-নি-ইল্ ("E-Temen-ni-il" বা "The House-of-the-Platform-He-Raised.); প্রধান প্রধান তোরণদ্বারের সাহায্যে এই প্রাচীর অনুসরণ করিয়া যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই মণ্ডলীর ভিতর কোথায় কোথায় বিভিন্ন প্রাসাদাবলী পাওয়া যাইবে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই তাঁহারা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।
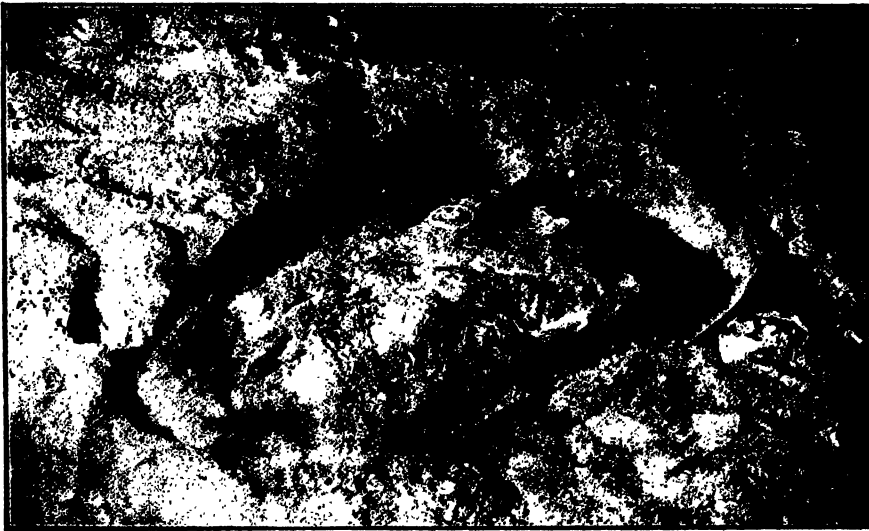
চল্লিশ শতাব্দী পূর্ব্বের সমাধিস্থান

এই সুবিখ্যাত প্রাচীর এই নগরীর খ্যাতনামা রাজা উর-ইন্-গুর (Ur-in-Gur) দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইঁহার আগে আরো দুই বংশ রাজত্ব করিয়াছিল।

এই সুবিশাল প্রাচীর প্রস্থে ১১ গজ, উচ্চে ১০ ফিট ও পরিধি প্রায় ১২০০ গজ। এই প্রাচীর উরের প্রধান গৌরবের বস্তু; ইহা চন্দ্র-দেব ও তাঁহার স্ত্রীর মন্দিরসমূহ, সিনার-দেশ-বিখ্যাত সুমহান জিগারৎ ও সম্ভবতঃ উর-ইন্-গুরের

মিশর ও উরের ষণ্ডমূর্ত্তি
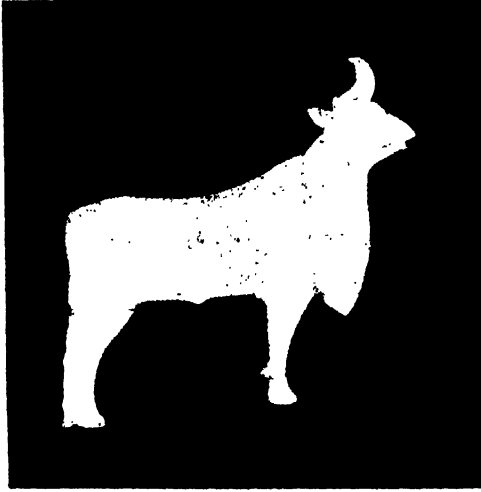
প্রাসাদ বেষ্টন করিয়াছিল। এই উরনগরীর জিগারৎ বা স্তম্ভ প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরম্ভ হইয়াছিল। যখন অব্রাহাম তাঁহার তাঁবু, গো মহিষ ও লোকজনসহ ইরাকের সমতল ভূমি দিয়া কেনাম (Cannam) দেশে বাস করিতে গিয়াছিলেন, তখন এই নগরী পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত ও এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই জিগারৎ বা স্তম্ভের চারিদিক বৃতি দ্বারা বেষ্টিত—এইস্থান চন্দ্র-দেব বা সিন্ (Sin) দেবের পূজার পবিত্র স্থান ছিল। এই সিন নাম হইতে সিনাই পর্ব্বতের ও অন্যান্য স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এই বেষ্টনের ভিতর পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দিরাদি ব্যতীত নিন্-সুনের-দেউল, ই-হরসাগ্ (E-Harsag) নামক প্রাসাদ ছিল। এই প্রাসাদ উরের তৃতীয় রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা ডুঙ্গী (Dungi) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। আর একটি প্রাসাদ ই-নান্-মাঃ (E-nun-mah) নামে কথিত।

অব্রাহামের সময়েই চন্দ্র-দেব ও চন্দ্র-দেবীর পূজা অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রচলিত ছিল। এই নগরবাসী জাতি নানাবিধ শিল্প-কার্য্য ও সভ্যতার বিলাস সামগ্রীর সহিত সুপরিচিত ছিল। ইরাক দেশের এই প্রধান নগরী উর বহুদিন ধরিয়া সুখশান্তি ভোগ করিয়াছিল। এই সব মন্দিরের পুরোহিতদিগকে পূজা দিবার জন্য যাত্রীরা পুরুষানুক্রমে আসিত। কৃষি-কার্য্য ও বাণিজ্য খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মেষচর্ম্ম, খর্জ্জুর ও অন্যান্য ব্যবসার দ্রব্যাদির বিবরণসম্বলিত অনেক শিলালিপি ইহার উন্নত অবস্থা প্রমাণ করিয়াছে। সংক্ষেপে, কেল্‌ডিয়ান দিগের সমসাময়িক উর-দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা বর্ত্তমানকালের ইরাক দেশীয় ধনী ব্যক্তির মতনই জীবন যাপন করিত। এখন যেরূপ চিরুণী ইরাকের বাজারে পাওয়া যায়—সেই সময় স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ চিরুণী কেশ-

সুবিখ্যাত ষণ্ডের আর একটি মূর্ত্তি

প্রসাধনের জন্য ব্যবহার করিত। আজকালের মত তাহারা সীসমণি (carnelian) গোমেদ (agate) ও সোনার হার পরিত এবং এখনকার আদর্শানুযায়ী এয়ারিং ও নথ ব্যবহার করিত। সূতা কাটিতে ও

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

কঙ্কণ

রেশম পশম প্রভৃতি বুনিতে তাহারা পারদর্শী ছিল, এবং এখনকার মত মাদুর ব্যবহার করিত। গাঁতি (pick-axe), মুষলাগ্রভাগ (mace-heads) ও অন্যান্য বিবিধ যন্ত্রাদি মন্দিরে দেবতার নিকট মানত স্বরূপে রক্ষিত হইত—এই সব যন্ত্রাদি বিংশ শতাব্দীর নির্ম্মিত যন্ত্র হইতে অতি অল্প তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

যদি অব্রাহামের সময় এই সভ্যতা অনেক পুরাতন হইয়া থাকে, তবে এই সব সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহ আরো অনেক পুরাতন ছিল। চন্দ্র-দেবী নিন্-মক্-এর (Nin-Mack) মন্দির এবং চন্দ্রদেবের অন্তঃপুর—জগতে পরিচিত যে কোন প্রাসাদ অপেক্ষা সুন্দর ছিল—প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন এই মন্দিরের প্রথম ভিত্তি-স্থাপন হয়, তখন হইতে খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—তখন পর্য্যন্ত। ইহার বহিঃপ্রাচীরকে এই স্থানের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Epitome) বলিলেও চলে। এই প্রাচীরের নিম্নের কয়েক স্তর অর্দ্ধ-শুষ্ক মাটির ইটে গাঁথা—ইহা কাঁচা ইট (Green brick) নামে অভিহিত। এখনও ইরাকের অধিবাসীরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা প্রাগৈতিহাসিক তামস যুগে ব্যবহৃত হইত। তারপর উর-ইন্-ওর ও তাঁহার পুত্র দুঙ্গী রৌদ্র-পক্ক ইট ব্যবহার করেন। পিতার মৃত্যুর পর দুঙ্গী তাঁহার পিতার প্রাসাদ নির্ম্মাণের অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করেন। এই দুঙ্গী রাজার নাম ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় অনেক ফলকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ে উর তদানীন্তন প্রধান নগরী হইয়া উঠে। তাঁহার পর পরে পরে নানা রাজার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বেবিলনের প্রথিতনামা রাজা দ্বিতীয় নেবুখাদ্-নেজ্জার (Nebuchadnezzar) নিজ নামখোদিত ভাল পোড়া ইট ব্যবহার করেন। সর্ব্বশেষে পারস্যদেশীয় নৃপতি কাইরাস (Cyrus) তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের প্রাচীরের উপরিভাগ পুনর্গঠিত করেন।

উরের নিকটে টেল্-এল্-ওবিড্ (Tell-el-obeid) নামক স্থানে পারস্য উপসাগরের উপরে ও তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটস্ নদীর সংযোগ স্থলে ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বের অতি উচ্চশ্রেণীর সভ্যতার যে সব অবিসংবাদী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে প্রায় ৪৩০০ খ্রীঃ পূঃ যুগের রাজা মেস্-অন্-নি-পদ্দ (Mes-an-ni-padda)-র পুত্র অ-অন্-নি-পদ্দ (A-an-ni-padda) কর্ত্তৃক গঠিত নিন্‌খুরসাগ (Ninkhursag) দেবীকে উৎসর্গীকৃত মন্দিরের মর্ম্মর-রচিত সংস্থাপন-ফলক একটি অসংশয়িত প্রমাণ। এই শিলালিপি অতি প্রাচীনকালের তারিখ সম্বলিত। সকলেই যে রাজবংশের কথাকে গল্পকথা বলিয়া মনে করিত—এই শিলালিপি তাহার ঐতিহাসিক সত্তা প্রমাণ করিয়া

সুমেরীয় দেশীয় দুগ্ধবতী গাভী

দুগ্ধদোহনের দৃশ্য

ফুল—এত বহুসংখ্যক যে ফুলের বাগান বলিলেও চলে, খচিত-কার্য্য (inlays), উপলচিত্র (mosaics) এবং উৎকীর্ণ তাম্র নির্ম্মিত ষণ্ড (copper reliefs of bull) উল্লেখযোগ্য। এই সকল আবিষ্কৃত বস্তু প্রতিপাদন করিতেছে যে এই জাতি প্রাচীন তামস যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অব্রাহামের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেবিলনের রাজধানী উরে সভ্যতার

মুখাবয়ব

উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সম্ভবত এই জাতি প্রাগৈতিহাসিক প্রাগ্-বাইবেল যুগে আরো উত্তরে পার্ব্বত্যপ্রদেশ ত্যাগ করিয়া পারস্য উপসাগরের নিকটবর্ত্তী সমতল ভূমিতে বাস করিত। তাহারা সমস্ত নগরে প্রদর্শনী বুরুজ (Stage Tower) নির্ম্মাণ করিয়াছিল—তাহার মধ্যে বেবেল নগরীস্থ বুরুজ (Tower of Babel) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা ৩০০ ফিট উচ্চ ছিল। সম্ভবত তাহারা পাহাড়ের উপর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার-অনুষ্ঠান করিতে অভ্যস্ত ছিল।

দিয়াছে। কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছে জানিতে না পারিলেও অনেক শিল্প বস্তুর নির্ম্মাণের সময় জানা গিয়াছে।

প্রাচীনতম রাজ-অলঙ্কার—এইরূপ উল্লেখ যোগ্য আবিষ্কার। গোবরে পোকার আকারে কর্ত্তিত মণি (Scaraboid)—দৈর্ঘ্যে ১৫ মিলিমিটার। ইহাতে অ-অন্-নি-পদ্দর নাম খোদিত। এই রাজকীয় মণি ও মন্দিরের শিলা-লিপি আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই রাজার নাম বেবিলনে কিংবদন্তী বর্ণিত সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া লোকে মনে করিত। প্রায় ৬০০০ বৎসর পুরাতন বলিয়া স্বীকৃত বস্তুর মধ্যে—কৃত্রিম

সুমেরীয় দেশীয় পেটিকোট

যে সমস্ত আবিষ্কার বাইবেলোক্ত ঘটনাবলীর উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে—সেই গুলি সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক। খ্যাতনামা ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা নেবুখাদ্-নেজ্জার এই-মান্-মাঃ নামে দেউলের অধিকাংশ নির্ম্মাণ করিয়াছিল—ইহা বাইবেলের Book of Daniel-এ বর্ণিত আছে।

সুবর্ণ-গঠিত মূর্ত্তি—ডেনিয়েল (৩ : ১) অনুযায়ী

নব বধূ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাত নিয়োগী

পঞ্চম বর্ষ, ১ম খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ | ৫ম সংখ্যা

নাত বৌ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তরে তা'র যে মধু মাধুরী পুঞ্জিত,
সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত
মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে।
দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিত্বে,
প্রবাস-বাসের অবকাশ ভরি' আতিথ্যে,
সে-কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে

সযতনে যবে সূর্য্যমুখীর অর্ঘ্যটি
আনে নিশান্তে, সেও নিতান্ত মন্দ না।
এও ভালো যবে ঘরের কোণের স্বর্গটি
মুখরিত করি' তানে মানে করে বন্দনা।
তবু আরো বেশি ভালো বলি শুভাদৃষ্টকে
থালাখানি যবে ভরি' স্বরচিত পিষ্টকে
মোদক-লোভিত মুগ্ধ নয়ন নন্দে সে॥

প্রভাতবেলায় নিরালা নীরব অঙ্গনে
দেখেছি তাহারে ছায়া-আলোকের সম্পাতে।
দেখেছি মালাটি গাঁথিছে চামেলি রঙ্গনে,
সাজি সাজাইছে গোলাপে জবায় চম্পাতে।
আরো সে করুণ তরুণ তনুর সঙ্গীতে
দেখেছি তাহারে পরিবেষনের ভঙ্গীতে,
স্মিতমুখী মোর লুচি ও লোভের দ্বন্দ্বে সে॥

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত,
মালতী-জড়িত বঙ্কিম বেণী-ভঙ্গিমা?
দ্রুত অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝঙ্কৃত?
শুভ্র সাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা?
পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তা'র লজ্জিত,
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত,
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে?

বিজয়া দ্বাদশী
১৩৩৮
দার্জ্জিলিং

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রাবলী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

রাজকোট

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি, সম্প্রতি আছি কাঠিয়াবাদে রাজকোটে, এখান থেকে আরো নানাস্থানে ঘুরপাক খেতে হবে। হয় ত ডিসেম্বরের আরম্ভে একবার আমেদাবাদ যাব, তখন যদি তুমি সেখানে যাও দেখা হবে।

সঙ্গীত সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মতের যদি অনৈক্য থাকে তা নিয়ে কোনো সঙ্কোচ বোধ কোরো না। পৃথিবীর ভূগোলসংস্থানে পাহাড়ের সঙ্গে সমুদ্রের যদি অনৈক্য নিয়ে ঝগড়া হ'ত তাহ'লে জীবজন্তু টি'কতে পারত না—আর যদি পাহাড়ে সমুদ্রে কোন অনৈক্যই না থাক্‌ত তাহ'লে সেই মরু-বসুন্ধরায় টেঁকা আরো দায় হ'ত। মানুষের মানসজগতে মতের অনৈক্য থাক্‌বে অথচ সেই অনৈক্য নিয়ে বিরোধ হবে না; সংঘাত হবে কিন্তু অপঘাত হবে না; এইটেই হচ্চে প্রার্থনীয়। তুমি সঙ্গীততত্ত্ব নিয়ে আমার মতের প্রতিবাদ করলেও আমি বিবাদ করব না এ কথা নিশ্চয় জেনো। মতের সম্বন্ধ না থাকলেও প্রীতির সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে এটার দ্বারাই প্রীতির গৌরব প্রকাশ পায়। ইতি, ১১ই নভেম্বর ১৯২৩

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৬ই বৈশাখ ১৩৩৫
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, কিছুকাল থেকে মনে মনে তোমার সন্ধান করছিলুম, কিন্তু বাহ্যজগতে তোমার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত বিবরণ না জানা থাকাতে, এবং আমাদের ঋষি পিতামহদের দিব্যদৃষ্টির উত্তরাধিকার আমার জন্মকালের

বহুপূর্ব্বে নিঃশেষিত হ'য়ে যাওয়াতে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে ছিলুম। হেনকালে তোমার পত্র এল—বোধ করি তার মধ্যে আমার ইচ্ছাশক্তির কিছু প্রভাব ছিল। আশা করি সেই ইচ্ছাশক্তি শেষ পর্য্যন্ত কাজ করবে এবং তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ইচ্ছাশক্তির তুলনায় আমার চলৎশক্তি অনেক কম—তাই এখানে ব'সে ব'সে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। ইতি

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, অমিয়কে যে চিঠি লিখেচ দেখলুম। একটি কথা কেবল বল্‌তে চাই—আমি তোমাকে গভীর ভাবেই স্নেহ ক'রে এসেচি—আজ কোনো কারণে তার অপঘাত ঘট্‌বে এমন আশঙ্কা মাত্র নেই। আমি কোনোদিন আঘাতের স্মৃতি স্নিগ্ধজনের বিরুদ্ধে মনে টাঙিয়ে রাখি নে।

বারবার বলেচি আবার বলি, আমি যে-কাজকে আমার নিজের কাজ ব'লে এতকাল বহন ক'রে এসেচি—সে কাজে আমার সহায় প্রায় কেউ নেই—শরীরও ক্লিষ্ট মনও ক্লান্ত, আয়ুও শেষের দিকে। আজ এই কাজের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেচি—অন্য কোনো দাবী যদি এর উপর চাপাই তবে আমি ব্যর্থ হব। তোমরা একথা এই কারণেই বুঝতে পার না, যেহেতু এটাকে তোমরা যথেষ্ট গুরুতর মনে কর না। শরীর ভাল থাক্‌লে বয়স অল্প হ'লে সঙ্গীতে যে-কাজ তুমি আমার কাছে চেয়েছ সে-কাজে যোগ দিতে চেষ্টা করতুম—একদিন ছিল যখন বহুলোকের দাবী মিটিয়েছি, আজ শক্তি নেই। আমার নিজের কর্ম্মতরীর লগি অনেককাল একলাই ঠেলে এসেচি, তৎসত্ত্বেও অন্যের বোঝায় কাঁধ দিয়েচি।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পক্ষ আমি সমর্থন করি নি এমন কথা তুমি অমিয়র পত্রে কেন লিখেচ বুঝতেই পারলুম না—আমি স্পষ্ট ক'রে একমাত্র ভাতখণ্ডের পক্ষই সমর্থন করেচি—দ্বিতীয় কারোরই না।

আর একটি কথা। বেশি নাড়াচাড়া করলেই যে বোঝাপড়ার সব সময়ে সুবিধা হয় তা তো নয়। এক এক সময়ে সহজে বোঝবার অবস্থার ব্যতিক্রম হয়, তখন তাড়া লাগিয়ে বোঝাতে গেলে আরো বিপত্তি ঘটে। একথা তুমি অনেক সময়ে ভুলে যাও দেখেচি যে ব্যক্তিগত কারণের উপর যুক্তিগত আলোচনার জোর প্রায়ই খাটে না। গায়ে যখন জ্বরের কাঁপুনি ধরে তখন বসন্তের হাওয়াকেও শীতের হাওয়া ব'লে মনে

হয়। সে সময়ে তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে হাওয়াটার উত্তাপ নির্ণয়ের বৃথা চেষ্টা না ক'রে কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকাই একমাত্র উপায়। ইতি, ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৪

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, তোমাকে যদি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ না করতুম তাহ'লে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার লেশমাত্র চেষ্টা করতুম না। জীবনে এত লোক আমাকে বারবার ভুল বুঝেচে যে সে-সম্বন্ধে আমার একটা উপেক্ষা-বোধ জ'ন্মে গেছে। আমি পারতপক্ষে কৈফিয়ৎ দিতে যাইনে। তা ছাড়া, আমাকে ভুল বোঝবার সাইকলজিকাল কারণ যখন বুঝতে পারি তখন ক্ষোভ অনেক চ'লে যায়। একদিকে বাতাস হালকা হ'লে অন্য দিক্ থেকে ঝড় আসে এ নিয়ে মকদ্দমা ক'রে ত কোনো লাভ নেই। হালকা বাতাসেরও দোষ নেই, উদ্দাম বাতাসেরও। উভয়ের মধ্যেকার অসঙ্গতি একটা উপদ্রব ক'রেই থাকে। আমার নিজের স্বভাবের সব দিক সহজে পরিদৃশ্যমান নয়—বিশেষভাবে যে-দিক্‌টাতে আমার মর্ম্মস্থান। এইজন্যে আমার অসম্পূর্ণ পরিচয়ের দ্বারা মানুষ যে আঘাত পায়, এবং সব কাজের ঠিক্ হিসাব পায় না,—সেটা আমার অদৃষ্টের চক্রান্তে। বস্তুতই সেটা অদৃষ্টের রচনা—অর্থাৎ তার মূল হচ্চে আমার যে-জায়গা দৃষ্ট নয় সেইখানে। যাক্‌গে। ঝড় আপনিই থেমে যায়—বিরোধের অসঙ্গতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আপনিই সামঞ্জস্যে গিয়ে পৌঁছয়। আরোগ্যের দাওয়াইখানা বিভাগ কালের হাতে। ইতি, ১০ই ফাল্গুন ১৩৩৪

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, ঝগড়া যদি করতেই হয় সেটা মোকাবিলায় ভালো, লিখিত পত্রে নৈব নৈব চ। যেটাকে পাণ্ডু-লিপি বলা হয় সেটা ঘোরতর কৃষ্ণলিপি, ভাবের অনেকখানি আলো সে লুপ্ত করে। তাছাড়া, বাদবিবাদের

পাকা দলিল যদি না থাকে সেটাকে অস্বীকার করা সহজ হয় ; এমন কি স্থান কাল পাত্রে সেটাকে উপভোগ করাও চলে। মনে পড়্চে, Keats তাঁর প্রণয়িনীর rich angerএর কথা খুব লালায়িত ভাষায় বলেচেন, তার কারণ, angerএর সঙ্গে কম্পিত ওষ্ঠাধর ও বাষ্পম্লান নীল চোখ দুটিকে মিশ্রিত ক'রে তবে সেটা তাঁর কাব্যের থালাতে অমন সরস ক'রে সাজাতে পারলেন। কিন্তু ভেবে দেখ angerটি যদি পৌঁছত রেজেষ্ট্রিপত্রযোগে তাহলে কবিকে মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হ'ত। তাঁর কফির পেয়ালা অনাস্বাদিত, বেক্‌ন্ ও ডিম্ব অভুক্ত এবং সিগারেট অ-ধূপিত হ'য়ে থাক্‌ত। তোমাদের গানের আসরে তুমি এবার আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করবার উদ্যোগে ছিলে, এর পরে বোধহয় ধোবা-নাপিত বন্ধ করবার চেষ্টা করবে, সকলের চেয়ে শোকাবহ ব্যাপার হবে তোমার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্ভাবনামাত্র থাকবে না, ম'লে পোড়াবে না তার চেয়ে এটা অনেক বেশি, কারণ চিতাদাহের চেয়ে বিরহের চিত্তদাহ অনেক উগ্রতর। কবি মাত্রই একথা অন্তত কবিতায় লিখে থাকেন। স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমাদের হাতে স্বরাজ পড়লে আমার পক্ষে সেটা ভয়াবহ হবে। এই কথাটাই মনে ক'রে মনে স্বস্তি পাচ্চিনে, কেন না অতি সত্বর তোমরা স্বরাজ পাবে এই গুজবটা দীর্ঘকাল থেকে চল্‌চে।

কিন্তু হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে আমার যতটা বদনাম শুনেচ তার সবটা আমার অপরাধ নয়, অর্থাৎ ফাঁসি বা নির্ব্বাসনের আমি যোগ্য নই, এক আধবার এক আধখানা টিকিট পাঠিয়ো, নইলে দরজা ভাঙবার দলে ঢুকতে হবে। এমন ক'রে তোমার কাছে টাকা ধার ক'রে তোমার কন্সার্টের টিকিট কেনা পর্য্যন্তও এগোতে পারি, তবে কবুল করছি যে তার পরে শোধ করবার বেলায় স্মরণশক্তির ত্রুটি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়।

রমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তোমার সাঙ্গীতিক আলাপ আলোচনা পড়েচি, অনেক তর্কের বিষয় আছে, সেটা সাক্ষাতে হবে। ইতি, ৭ই মাঘ ১৩৩৪।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপরের পত্রগুলি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত

"জয় হোক্ মানুষের"

[ভাদ্রের বিচিত্রায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ" সম্পর্কে লিখিত]

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু

মানুষের যে জয়গান, সহজের যে অভিনন্দন রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশ জুড়িয়া আছে; নানা প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্যাসে ও নাটকে, সভ্যতাপিষ্ট মানুষের যে কাতর ক্রন্দন ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিয়া উঠিয়া পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়াছে; চিরন্তন সত্যের প্রতি যে দৃঢ় নির্ভর, কবির দৃষ্টিকে আধুনিক সভ্যতার নিত্য-অনুচর সহস্র পঙ্কিলতা পার করিয়া, বহু ঊর্দ্ধে আলোকের রাজ্যে লইয়া গিয়াছে; তাহারই এক নবতন রূপ, অপূর্ব্ব বেগবান ছন্দোময় গদ্যে অপরূপ চমৎকারিত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে এই রূপক্ রচনাটির মধ্যে।

পশ্চিমের মদস্ফীত সভ্যতার অশোভন আস্ফালনের নীচে যে মানুষের বুকফাটা ক্রন্দন চাপা পড়িয়া যাইতেছে, এ সভ্যতা যে একান্তই আত্মঘাতী এবং মানবশোনিতপুষ্ট, একথা কবি-চিত্তকে বারবার আন্দোলিত করিয়াছে। পশ্চিম সমুদ্রতটের এই লোহিত-রাগকে কবি কোনওদিন নবারুণ লেখা বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। সজ্জাহীন সহজের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াই যে ইহাকে বাঁচিতে হইবে; দুর্য্যোগ রাত্রির অবসানে মুক্তির শুভ্র প্রভাতকে যে বরণ করিয়া লইবে, সে হয়ত আজ 'বহু দুঃখে নম্র-লাজে' পূর্ব্ব সিন্ধুতীরেই মৌন হইয়া আছে; কবি আমাদের এই আশ্বাসবাণী দিয়াছেন।

বর্ত্তমান সভ্যতা যে বিরাট দানবের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গগন-বিসর্পী সজ্জিত দেহকে পুষ্ট করিতে যে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়রক্তের নিত্য প্রয়োজন হইতেছে; পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যে দুঃখের ঋণ জমিয়া উঠিতেছে; সে কথা আমাদের অপেক্ষা অধিক আজ আর কে জানে। সে যে, কল্যাণকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহার রথের দুর্নিবার বেগ মানুষের সুখের নীড়গুলিকে চূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। মানুষ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তুমি কোন্ মহাতীর্থের যাত্রী, 'কোন্ বন্ধুসাথে হবে দেখা' ", কিন্তু, অগ্রসর হইবার সর্ব্বনাশা মোহে, সে কথায় সে কর্ণপাত করে না। মথিত মানুষের ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে পৃথিবীর আকাশ বাতাস কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই, জগদ্ব্যাপী স্বার্থের দ্বন্দ্ব, মানুষে মানুষে হানাহানি, ভ্রাতৃরক্তে তর্পণের বিশ্বজোড়া ব্যবস্থা।

ব্যথিত কবি-চিত্ত তাই বেদনার ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছে। 'মুক্ত ধারা'র মধ্যেও এই আবেগের চাঞ্চল্য, 'রক্তকরবী'ও এই বেদনায় স্পন্দিত। কোনও বিশেষ দেশ, কাল বা ঘটনার বহুউর্দ্ধে যদিও এই কাব্যের স্থান, তাহা হইলেও পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন, ভারতবর্ষের মূক মর্ম্মবেদনা ইহার মধ্যে মূর্ত্তি পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার সাধনার পথ এবং সিদ্ধির ইঙ্গিতও যেন ইহা বহন করিয়া আনিয়াছে। চিরন্তন ও চির-নবীনের বর্ণিত লীলারূপটীর সহিত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার যেন একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে।

* * * *

মহাকালের যে ভয়াবহ রূপবর্ণনার মধ্য দিয়া কাব্য আরম্ভ হইয়াছে, দুঃস্বপ্নের মত তাহা পাঠকের মনের উপর

চাপিয়া থাকে। আজ জগৎ হইতে প্রকৃত ধর্ম্ম, সহজ আনন্দ, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখানে আজ পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিৎ জনশ্রুতি, অবজ্ঞার কর্কশ হাস্য। চারিদিকে মানুষের সহস্র অপমান।

"যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া,
কূল উল্লঙ্ঘিয়া।"

আজ,

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান"

বিধাতার বক্ষে শেল হানিতেছে।

নির্ব্বিচার বিবাদ দিকে দিকে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখানে মানুষের কোনও মূল্য নাই। এই বিভীষিকাময় ধ্বংসের তাহারা মাত্র ইচ্ছাহীন যন্ত্র-স্বরূপ। কল্যাণরূপিণী নারীর মাতৃহৃদয় এই বিপর্যায়ে ক্ষত-বিক্ষত আর যৌবনমদ-বিলসিত নগ্নদেহ অপরজন ইহাতেই মাতিয়া উঠিয়াছে। এই ক্লেদাক্ত জগৎ তাহার সমস্ত কলুষের সহিত এক প্রলয়-রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত। উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন উঠিতেছে "এ রাত্রির কি অবসান নাই ? 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব কত আর।' "

প্রলয়রাত্রির কি ভয়াবহ বর্ণনা!

[এখানে বর্ণনীয় বিষয়ের ভীষণ রূপকে ভীষণতম করিবার জন্য নাটকীয় কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু, পাঠকের মনের উপর ইহার ফল অব্যর্থ হইলেও, কোথায়ও নাটকীয় অত্যুক্তি বা নিরর্থক উক্তি রচনার শিল্পসৌন্দর্য্যকে আঘাত করে নাই।]

* * * *

মুক্তির ইঙ্গিত, আলোর ইঙ্গিত যেখান হইতে আসিতেছে, সেখানে জনতা নাই, কোলাহল নাই, বিপুল আয়োজন নাই। তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ভক্তের চক্ষু আলোর ইঙ্গিত খুঁজিতেছে। বিপদ যখন ঘনীভূত হইয়া উঠে, মানুষ আর্ত্ত-স্বরে চিৎকার করে, তখন ভক্তের অভয়বাণী শুনা যায়। তিনি মনুষ্যত্বের জয়গান করেন। সন্দিগ্ধ লুব্ধ মানুষ বিশ্বাস করিতে চায় না। সে সাধুতাকে বলে আত্ম-প্রবঞ্চনা; সে পশুশক্তিকে আত্মাশক্তি বলিয়া জানে। সে মনে করে মানুষকে চিরদিন মরীচিকার অধিকার নিয়া হিংসাকণ্টকিত মরুভূমির মধ্যে সংগ্রাম করিতে হইবে।

[ইহার মধ্যে যেন বর্ত্তমান জগৎ এবং তাহারই একপাশে বসিয়া যে কয়জন মনীষী শান্তির বাণী প্রচার করিতেছেন— তাহার চিত্রটি এক বিশেষ রূপ নিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

* * * *

জগতের পূর্ব্ব দিগন্তে শুক তারা দেখা দেয়। কেন না, মানুষ হাঁপাইয়া উঠে; সে মুক্তির জন্য পাগল হইয়া যায়। তাই সময় বুঝিয়া ভক্ত আসিয়া ডাক দেন, যাত্রার জন্য। যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী সবাই আসিয়া যোগ দেয় — বিপুল উৎসাহে যাত্রা আরম্ভ হয়।

কিন্তু, আজও মানুষ নিজের রিপু জয় করিতে পারে নাই। কেবল নিজের লোভকে মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়া উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করে, আর শান্তি-শঙ্কাহীন চৌর্য্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন, ক্লিন্ন দেহমাংসের অনন্ত লোলুপতা দিয়া কল্প স্বর্গ রচনা করে। তাই যাত্রা ব্যর্থ হয়। অতৃপ্তলোভ পুরুষদের তর্জ্জন প্রবল হইয়া উঠে, মেয়েদের বিদ্বেষ তীব্র হয়। ইহারা অধিনেতাকে বলে মিথ্যা প্রবঞ্চক এবং অবশেষে তাঁহাকেই আঘাত করে। এই অভিযানের মধ্যেই ইহার ব্যর্থতার বীজ লুকানো ছিল। এই যাত্রা শুধু সত্যসন্ধানীর নয়। থালায় শ্বেত চন্দন ও ঝারিতে গন্ধবারি লইয়া, মাতা, কুমারী, বধূ চলিয়াছিলেন; আর সেই সঙ্গে চলিয়াছিল বেশ্যা; চলিয়াছিল সাধুবেশী ধর্ম্মব্যবসায়ী, দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা। তাদের কাহারও মনে ক্রোধ, কাহারও মনে সন্দেহ।

[এখানে যাত্রার উন্মাদক বর্ণনা, তাহার করুণ ব্যর্থতা পাঠকের মনে সত্যই কল্পলোক সৃষ্টি করিয়া তোলে। জগতে কতবার এমন হইয়াছে; কত বিপুল উদ্যমে মুক্তি-

যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, আর যাত্রীদের নিজেদের দুর্ব্বলতা এবং ভিতরের রিপুই এই পথে বৃহত্তম বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই যাত্রার বর্ণনাটি আমাদের গতবর্ষের ভারতবর্ষের কথা মনে করাইয়া দেয় "জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক। মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ···।"]

*　　*　　*　　*

মুক্তির আহ্বান ব্যর্থ হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা আকুল হইয়া উঠে মেয়েরা,—কেন না, ব্যথা এখানেই গভীরতম। ভগবানের দয়া হয়; পূর্ব্বাকাশ আবার লোহিতাভ হইয়া উঠে। মানুষ বুঝিতে পারে, সংশয়ের মোহে সে সত্যকেই আঘাত করিয়াছে। সে ক্রোধে যাহাকে হনন্ করিয়াছিল সংশয়ে যাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাকে প্রেমের দ্বারা লাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। এবার আর অধিনেতার প্রয়োজন হয় না। সবাই সত্যাগ্রহী। যখন বাধা আসে তরুণ বলে "থেমো না বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে আমাদের পৌছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।" পূর্ব্বদেশের বৃদ্ধ এবার পথ দেখায়।

[বারে বারে মুক্তির বাণী শান্তির বাণী পূর্ব্বদেশ হইতেই আসিয়াছে এবং সম্ভবতঃ কবি বিশ্বাস করেন প্রাচ্যই জগৎকে মুক্তির পথ দেখাইবে।]

*　　*　　*　　*

আবার যাত্রা আরম্ভ হয়। এবার শুধু অগ্রসর হয় সাধকের দল। তরুণের দল ডাক দিয়া বলে "চলো, যাত্রা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে, জ্ঞানের তীর্থে, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের তীর্থে।" এবার সকলে সুদৃঢ় শুধু ইহলোককে জয় করিবার জন্য নয় লোকান্তরকেও। এবার অন্তরের কলুষ খসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্রলোভ আজ আর মহৎ সার্থকতার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এবার মুক্তির সন্ধান মিলিল। কিন্তু, রাজার দুর্গ, সোনার খনি, মারণ-উচাটন মন্ত্রের মধ্যে নয়—প্রচুর ঐশ্বর্য্য, বিপুল আয়োজনের মধ্যে নয়। সহজ, সরল জীবনের মধ্যে শ্যামল ধরণীর বুকে, উন্মুক্তদ্বার পর্ণকুটীরের মধ্যে আবার মানুষ আপনাকে কুড়াইয়া পাইল। দিগ্ দিগন্তে মনুষ্যত্বের জয় ঘোষিত হইল।

আজ জগৎ এই তরুণ সাধকদলের জন্যই উদ্গ্রীব হইয়া আছে। *

শ্রীসুশীলকুমার বসু

* পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদে পঠিত।
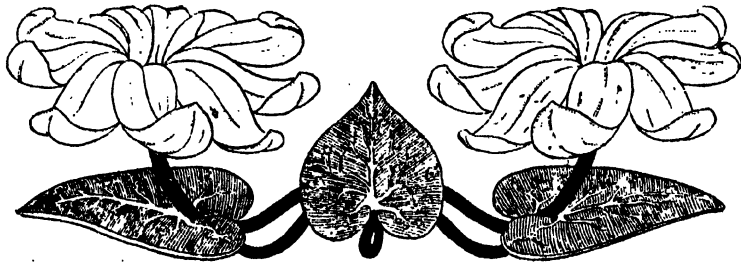
বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, এম্‌-এ

বাংলা ছন্দকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আমি ঐ তিনটি ধারার যথাক্রমে নাম দিয়েছি—মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত।* বাংলা ছন্দে তিনটি বিভিন্ন উপায়ে ধ্বনির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে এবং ধ্বনির পরিমাণ-নির্ণয়ের এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি থেকেই বাংলা ছন্দের তিনটি মূল প্রবাহের উৎপত্তি হয়েছে। মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত, ছন্দের এই তিন ধারাতেই অযুগ্ম ধ্বনির (অ আ ই ঈ ক কা কি ইত্যাদি) একই মর্য্যাদা, সংস্কৃত ভাষার স্বভাবদীর্ঘ স্বরগুলিও হ্রস্ব স্বরের সমান মর্য্যাদাই পেয়ে থাকে অর্থাৎ একমাত্রিক বলে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ তিন ছন্দে যুগ্ম ধ্বনির পরিমাণ-নির্ণয় হয় তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে। মাত্রাবৃত্তে যুগ্ম ধ্বনি, তা সে স্বরান্তিকই হোক আর ব্যঞ্জনান্তিকই হোক্, সর্ব্বত্রই দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য হয়; অন্য কথায় এই বলা যায় যে মাত্রাবৃত্তে সর্ব্বদাই যুগ্ম ধ্বনির শেষাংশটিকে অর্থাৎ আশ্রিত বর্ণটিকে গণনার মধ্যে ধরা হয়। দৃষ্টান্ত—

> যে বাণী আমার্ | কখনো কারে ও্ | হয় নি বলা
> তাই্ দিয়ে গানে | রচিব নূতন্ | নৃত্যকলা।
>
> —নিবেদন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এখানে দণ্ডচিহ্নিত তিনটি ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্ম ধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক বলে গণনা করা হয়েছে; যোগচিহ্নিত দু'টি স্বরান্তিক যুগ্ম ধ্বনিকেও দ্বিমাত্রিক বলেই ধরা হয়েছে; অর্থাৎ র্ য় ন্ এই তিন আশ্রিত ব্যঞ্জন এবং ও্ আর ই্ এই দু'টি আশ্রিত স্বর ‡, এরা সকলেই গণনার আমলে এসেছে। সুতরাং ছন্দ মাত্রাবৃত্ত।

স্বরবৃত্তের ব্যবস্থা তার ঠিক উল্টো অর্থাৎ এ ছন্দে যুগ্ম ধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য করা হয় না, আশ্রিত বর্ণগুলি হিসাবের আমলে আসে না। মোট ধ্বনি সংখ্যা গু'ণে গেলেই এ ছন্দের প্রকৃতি ধরা পড়ে। দৃষ্টান্ত—

> সে দিন্ যেন | কৃপা আমায়্ | করেন্ ভগ- | বান্,
> মেশীন্-গান্-এর্ | সম্মুখে গাই্ | জুঁই ফুলের্ এই্ | গান্।
>
> —চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে স্বর বা ধ্বনি আছে, কেবল শেষ ছেদে একটি করে; দণ্ডচিহ্নিত ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্ম ধ্বনি এবং যোগচিহ্নিত স্বরান্তিক যুগ্ম ধ্বনি, কাউকেই হিসাবে ডবল বলে ধরা হয়নি অর্থাৎ দশটি আশ্রিত ব্যঞ্জন এবং তিনটি আশ্রিত স্বর কেউ গণনার আমলে আসেনি। সুতরাং ছন্দ স্বরবৃত্ত।

অক্ষরবৃত্তের ব্যবস্থা এ দুয়ের মাঝামাঝি অর্থাৎ এ ছন্দে যুগ্ম ধ্বনিকে কোথাও ডবল বলে গণনা করা হয়, কোথাও হয় না। অবশ্য এ গণনার একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেটি হচ্ছে এই—শব্দের মধ্যবর্ত্তী* যুগ্ম ধ্বনিকে ধরা হয় এক, কিন্তু শব্দের অন্তস্থিত* যুগ্ম ধ্বনিকে ধরা হয় দুই। দৃষ্টান্ত—

---

* প্রবাসী—১৩২৯, পৌষ—চৈত্র; ১৩৩০, বৈশাখ, মাঘ—চৈত্র।

‡ আশ্রিত স্বরবর্ণকেও আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় হসন্তচিহ্নযোগে নির্দ্দেশ করা গেল। ছন্দপ্রসঙ্গে হসন্তচিহ্নকে আশ্রয়চিহ্ন নামে অভিহিত করাই সঙ্গত মনে করি।

* এ প্রবন্ধে শব্দের অ-প্রান্তবর্ত্তী স্বরমাত্রকেই মধ্যবর্ত্তী বলে ধরা হয়েছে এবং একস্বর শব্দের স্বরধ্বনিটিকে প্রান্তবর্ত্তী বলে গণ্য করা হয়েছে।

\+ । + । ।
উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।

\+ !
মোর চিত্ত মাঝে

\+
চির নূতনেরে দিল ডাক

। +
পঁচিশে বৈশাখ।

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্ম ধ্বনিগুলিকে এক বলে গণ্য করা হয়েছে, কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত; আর যোগচিহ্নিত যুগ্ম ধ্বনিগুলিকে দুই বলে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত। শব্দের অন্তস্থিত যুগ্ম ধ্বনিগুলি যে আসলে দ্বিমাত্রিক তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে এই ধ্বনিগুলিকে শব্দমধ্যবর্ত্তী ধ্বনিগুলির চেয়ে দীর্ঘতর করে অর্থাৎ টেনে উচ্চারণ করতে হচ্ছে; তার আরেক প্রমাণ এই যে 'বৈশাখের' ঐ-কারকে এক বলে ধরা হলেও প্রথম পংক্তিস্থিত 'ঐ'কে প্রত্যক্ষতই দুই বলে গণনা করা হয়েছে।

কবিরা কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনার সময় শব্দের এই অন্তিম দ্বিমাত্রিক প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন না; তাঁরা শুধু ধ্বনির চাক্ষুষ প্রতিরূপ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ অক্ষর সংখ্যা গুণেই এ ছন্দ রচনা করেন। বলা বাহুল্য এই কৃত্রিম ও স্থূল বিচারের ফলে এ ছন্দে সময় সময় ত্রুটি ঘটে থাকে; কি করে তা হয় তাই দেখাচ্ছি। ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য না রেখে রচনা করা সত্ত্বেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে এত কম ত্রুটি ঘটে সেইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়; কিন্তু তার কারণ আছে। দৈবক্রমে ভারতবর্ষে ব্যঞ্জনসংহতিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করার পদ্ধতি হয়েছিল; বাংলা ভাষায়ও (বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দের বেলায়) এই রীতি অনেকটা প্রচলিত আছে; তাই বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টি হতে পেরেছে; নতুবা অর্থাৎ বাংলায় যদি ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার মতো হসন্ত বর্ণকে স্বতন্ত্ররূপে লেখার রীতি থাকৃত, তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উদ্ভব হতে পারত না। এই উক্তিটি আপাতত বিস্ময়কর মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক্—

ঝঞ্‌ঝার্ মঞ্‌জীর্ বাঁধি উন্মাদিনী কাল্‌বই শাখীর্
নৃত্য্ হোক্ তবে।

—বর্ষশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে শুধু যুগ্মধ্বনিগুলিকে আলাদা করে দেখিয়েছি; স্বরবর্ণগুলিকে প্রচলিত আ-কার ই-কার রূপেই রেখেছি। ইংরেজির মতো স্বতন্ত্র করে দেখালে এই কথাগুলি আরও দীর্ঘ হয়ে যেত। কিন্তু এখানে উদ্ধৃত কথাগুলিকে ইংরেজির তুলনায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা গেল; এ রকম লিপি-পদ্ধতিও যদি প্রচলিত থাকৃত তবু কি শুধু অক্ষর গুণে ছন্দরচনার অন্ধ অভ্যাস এদেশে হতে পারত? এর একমাত্র উত্তর, পারত না। আর ইংরেজির মতো স্বরবর্ণগুলিও যদি স্বতন্ত্ররূপে লেখা হত তবেতো আর কথাই ছিল না। কিন্তু বাংলায় যুগ্মধ্বনিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা হয় বলেই যুক্তাক্ষরকে এক গণনা করে এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনা করা হচ্ছে। তবে মনে রাখা উচিত যে বাংলায়ও এই যুক্তাক্ষরের লিপিপদ্ধতি বিশেষভাবে শুধু সংস্কৃত শব্দের পক্ষেই খাটে। অনেক অ-সংস্কৃত খাঁটি বাংলা বা বাংলায় প্রচলিত বৈদেশিক শব্দে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের প্রচলন নেই; যথা—বোল্‌তা, বাদ্‌লা, পশ্‌লা বাদ্‌শা, বুলবুলি, মস্‌জিদ ইত্যাদি; এই সমস্ত হসন্ত-মধ্য অ-সংস্কৃত শব্দগুলিকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যথাসম্ভব পরিহার করে চলারই চেষ্টা দেখা যায়, কারণ হসন্তবর্ণগুলিকে গ্রাহ্য করা হবে কি না এ সম্বন্ধে সব সময়ই একটু দ্বিধা থেকে যায়। কিন্তু 'উৎসব' 'বৎসর' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা না হলেও খণ্ড ৎ-কে পরবর্ত্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। যথা—

আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু 'দিক্‌চক্ররেখা,' 'দিক্‌ভ্রান্ত' প্রভৃতি শব্দে হসন্ত ক্-কে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করা হবে কি না, এ বিষয়ে সংশয় দেখা যায়। যথা—

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে চেয়ে
ওগো দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ, তৃষার্ত্ত নয়ানে
লুব্ধ বেগে !
—মরীচিকা, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে "দিক্‌ভ্রান্ত" শব্দে চারটি অক্ষর গোণা হয়েছে। কিন্তু,

"উদয়-দিক্-প্রান্ত-তলে নেমে এসে"
—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে "দিক্‌প্রান্ত" শব্দে তিন অক্ষর ধরা হয়েছে। যদি লেখা হত—

উদয়ের দিক্‌প্রান্ততলে নেমে এসে

তা হলেও খারাপ শোনাত না; কারণ 'দিক্‌ভ্রান্ত' শব্দের মতো এখানেও 'দিক্' কথাটিকে একটু টেনে পড়তে হত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দটিতে তিন অক্ষর না ধরে চার অক্ষর ধরেছেন। যথা—

চলেছে উজান ঠেলি' তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার,
—নববধূ, মহুয়া রবীন্দ্রনাথ

দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।
—প্রত্যাগত, মহুয়া রবীন্দ্রনাথ

যাহোক আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ-রচনায় সংযুক্তবর্ণকে এক অক্ষর বলে ধরে নেওয়ার অভ্যাসের ফলে এই শব্দের মধ্যবর্ত্তী অসংযুক্ত অথচ হসন্ত বর্ণগুলিকে (বিশেষতঃ অ-সংস্কৃত শব্দে) কি হিসাবে গণনা করা হবে, এ বিষয়ে খুবই একটা সংশয় রয়ে গেছে। তাই এ ছন্দে সংযুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের এত প্রসার দেখা যায়। তা ছাড়া 'ধর্‌ব,' 'কর্‌ব' 'কর্‌ত' প্রভৃতি হসন্ত-মধ্য প্রাকৃত ক্রিয়াশব্দগুলি অনেকটা ওই কারণেই এ ছন্দের ধাতুতে সহ্য হয় না; গর্ব্ব, সর্ব্ব, মর্ত্ত্য, গর্ত্ত প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি কিন্তু এ ছন্দে অনায়াসেই চলে; শুধু উক্ত প্রাকৃত ক্রিয়াপদগুলি ধরিব, করিব, ধরিত, করিত প্রভৃতি সাধুবেশধারী না হলে এ ছন্দের আসরে স্থান পায় না। তাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দটা শুধু সাধুভাষার ছন্দ হয়েই রইল; কোনো বিদ্রোহী কবিই আজ পর্য্যন্ত চল্‌তি বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনা করতে সাহস পান নি।

আমরা দেখলুম যে শব্দের মধ্যবর্ত্তী হসন্ত বর্ণগুলিকে (বিশেষত সংস্কৃত শব্দে) পরবর্ত্তী বর্ণে যুক্ত করে দেওয়ার প্রথা থাকাতেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হতে পেরেছে এবং যেখানেই শব্দের মধ্যে হসন্ত বর্ণ অসংযুক্ত থেকে যায় সেখানেই এ ছন্দকে ইতস্তত করতে এবং বহুস্থানেই পশ্চাৎপদ হতে হয়। কিন্তু যুগ্মস্বর ব্যবহারের ক্ষেত্রেই এ ছন্দের দুর্ব্বলতা বেশি ধরা পড়ে। আমরা দেখেছি যে সংস্কৃত ভাষায় অই্ আর অউ্ ছাড়া যুগ্মস্বর নেই, অথচ বাংলায় আই্, ইউ্, এউ্, অও্, আও্ ইত্যাদি বহু যুগ্মস্বর রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সংস্কৃত যুগ্মস্বর দুটির জন্যে দুটি স্বতন্ত্র অক্ষর রয়েছে, যথা ঐ (অই) এবং ঔ (অউ্); বাংলায় যে সব অতিরিক্ত যুগ্মস্বর আছে তাদের জন্যে কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র অক্ষর নেই, দুটি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণের যোগে তাদের প্রকাশ করতে হয়। এই পার্থক্যের জন্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কতকটা মুশ্‌কিলে পড়তে হয়েছে। সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী অই্ এবং অউ্ এদুটি যুগ্মস্বর ঐকার ঔকারের যোগে লিখিত হয় বলে এরা প্রত্যেকেই এক স্বর বলেই গৃহীত হয়; কিন্তু আই্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মস্বরের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর না থাকাতে এরা দ্বিস্বর বলে গণ্য হয়। এই দ্বৈধ ব্যবহারের ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তা বলা বাহুল্য। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

বর্ষার নবীন মেঘ এলো ধরণীর পূর্ব্ব দ্বারে,
\+
বাজাইল বজ্রভেরী। * * *
* * তাহাদের লাগি'
\+
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া। * * *
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।
* * *

না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত প্রভাতে।
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিগুলিতে দু'টি ঐকার ছাড়া আরও তিনটি যুগ্মস্বর (যোগ-চিহ্নিত) আছে এবং তিনটিই শব্দের মধ্যবর্ত্তী, অন্তস্থিত নয়। কিন্তু ঐকার দুটিকে একস্বর বলে ধরা হয়েছে, কেন না একটি মাত্র বর্ণলিপি (ঐ) বা বর্ণসঙ্কেত (ৈ) যোগেই তাকে প্রকাশ করা যায়; আর আই্ (বাজাইল, কাটাইলে) কিংবা ইউ্ (শিউলি) এ দুটিকে প্রকাশ করার মতো একমাত্র বর্ণলিপি বা বর্ণসঙ্কেত নেই বলেই এদের দ্বিস্বর বলে গণনা করা হয়েছে। অথচ ধ্বনি-মর্য্যাদা হিসাবে আই্, ইউ্ এবং অই্ বা ঐ এর মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। এখানেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দুর্ব্বলত ধরা পড়ে। এ দুর্ব্বলতা ঢাকা দেবার জন্যই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শব্দমধ্যবর্ত্তী আই্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মস্বর পৃথকভাবে আ-ই, ই-উ (যথা বাজা-ই-ল, শি-উ-লি) ইত্যাদি রূপে টেনে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু শিউলি কথাটার মধ্যে যে আসলে দুটিমাত্র ধ্বনি আছে তা ঐ শব্দটিকে স্বরবৃত্ত ছন্দে বসালেই ধরা পড়বে; যথা—

আশ্বিনে ঐ | শিউলি শাখে |
মৌমাছিরে | যেমন ডাকে |
—প্রবাহিনী, ঋতুচক্র (৪৭), রবীন্দ্রনাথ

এখানে সমস্ত যুগ্মধ্বনিকে একক বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাতেই অই (ঐ) অউ্ (ঔ) এবং ইউ্ যে একই মর্য্যাদার ধ্বনি তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ঐ আর ঔকে অন্য যুগ্মস্বরগুলি থেকে পৃথক্ মর্য্যাদা দেওয়া হয়। তার ফল এই হয় যে আই্ ইউ্ প্রভৃতিকে টেনে পরে আ-ই, ই-উ ইত্যাদি রূপে পৃথক উচ্চারণ করতে হয়; আর যে ধ্বনিটা মূলে এক তাকে যদি অকারণে দুয়ের মতো করে উচ্চারণ করা যায় তবে ছন্দের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দরচয়িতা কবিরা এ ছন্দের এ দুর্ব্বলতাটা প্রতি পদেই টের পেয়ে থাকেন; তাই তাঁরা শব্দের মধ্যবর্ত্তী ঐ এবং ঔ ছাড়া আর সমস্ত যুগ্মস্বরকেই বর্জ্জন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এজন্যই দেখা যায় আজকাল কবিরা 'হইতে, লইয়া, যাইবে' প্রভৃতি সাধুশব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে বর্জ্জন করার অভিপ্রায়ে 'হ'তে, ল'য়ে, যা'বে' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত চল্‌তি রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক'রে থাকেন; অথচ আমরা আগে দেখেছি যে শব্দের মধ্যবর্ত্তী অসংযুক্ত হসন্ত বর্ণকে পরিহার করার চেষ্টায় তাঁরা 'কর্‌ব, কর্‌ত' প্রভৃতি চল্‌তি রূপের পরিবর্ত্তে করিব, ধরিব ইত্যাদি সাধুরূপেরই ব্যবহার করেন। তার ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভাষাটা সাধু ও চল্‌তি ভাষার একটা অদ্ভুত মিশ্রণে পরিণত হয়েছে। শিউলি প্রভৃতি শব্দের যুগ্ম ধ্বনিটাকে দ্বিধাবিভক্ত করে টেনে পড়ার অভ্যাসের ফলে এক সময় কবিরা প্রয়োজনের খাতিরে ঐ এবং ঔ-কেও ভেঙে ব্যবহার করতে ইতস্তত করতেন না তাই বাংলা অক্ষরবৃত্তের রাজ্যে 'গউড়, পউষ' প্রভৃতি শব্দে ঔকারের দ্বিধাকৃত শিথিল রূপের অভাব নেই। তবে সুখের বিষয় আজকাল আর কবিরা এ দুর্ব্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দেন না। আধুনিক কালের রচনা থেকেও ঔকারের সম্প্রসারণের দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আসি' বসন্তের মাতাল বাতাস।
—১৩, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁট সাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত করে' গড়া স্বর্ণ পাঞ্চালিকা।
—সনেট-সুন্দরী, পদ-চারণ, প্রমথ চৌধুরী

এখানে 'পউষের' এবং 'রউদ্র' কথা দুটিতে ঔকারকে ভেঙে অ-উ করা হয়েছে এবং উকারের স্বতন্ত্র উচ্চারণ করা প্রয়োজন। পৌষের বা পউ্ষের এবং রৌদ্র বা রউ্দ্র এ রকম উচ্চারণ করলে ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকবে না; আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে র-উ-দ্র না পড়ে রউ্দ্র অর্থাৎ রৌদ্র পড়লে পূর্ব্ববর্ত্তী "ক্ষুদ্র" শব্দের সঙ্গে তার মিলও অব্যাহত থাকবে না।

অ-সংস্কৃত বাংলা বা বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দে যেমন অনেক সময় হসন্তবর্ণকে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত না করারই প্রচলন দেখা যায় (যথা—মাত্‌লামি, হাল্‌কা, পাল্‌টা, পশ্‌লা) তেমনি অ-সংস্কৃত শব্দে ঐ এবং ঔকেও অযুক্ত রাখাই রীতি, যথা—লইতে, লউক, প্রভৃতি শব্দকে লৈতে, লৌক এরূপ লেখা বিধি নয়। তার ফল এই হয়েছে যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শৈল, দৈব প্রভৃতি শব্দে দু'অক্ষর ধরা হয়; মৌন, ধৌত ইত্যাদিতে দু'অক্ষর, আর হউন্, লউক্ ইত্যাদিতে তিন অক্ষর। শুধু অক্ষর গুণতির দিক্ থেকে না দেখে ধ্বনির দিক্ থেকে বিচার করলে অক্ষরবৃত্তের এ ত্রুটিগুলোকে গুরুতর বলেই স্বীকার করতে হবে। প্রাচীন কবিরা কিন্তু অনেক সময় হৈতে, লৈয়া ইত্যাদি রূপ ব্যবহার করতে ইতস্তত করতেন না। এক হিসাবে এরূপ ব্যবহারকে সঙ্গত বলে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাঁরা সব সময় এ রীতি রক্ষা করতেন না বলে ছন্দেও ত্রুটি থেকে যেত। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আই্‌লা গঙ্গাতীরে॥

* * * * * *

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায়॥

* * * * * *

জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥

সবগুলি যুক্তস্বরই একাক্ষর বলে গণ্য হয়েছে, 'দাঁড়াইয়া' কথায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়, 'আই্‌লা' শব্দে 'আই্' যুগ্ম-ধ্বনিটি এক বলেই গৃহীত হয়েছে, যদিও এর জন্য কোনো একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট বর্ণলিপি নেই। 'হৈল' শব্দের 'অই্' এবং ভৈরবের 'ঐ' প্রাচীন কবির কাছে সমান মর্য্যাদা পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিরা প্রাচীন বানান-রীতি গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নন, অথচ প্রচলিত বানান-পদ্ধতি রেখে 'অই্' 'আই্' ঐ, ঔকে সমান মর্য্যাদা দিতেও রাজি নন, কারণ তাতে চাক্ষুষ গুণতির হিসাব ঠিক্ থাকে না। এভাবে কানকে চোখের অধীন করে রাখার ফলে আর যাই হোক্ না কেন, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হবে না।

ঐ এবং ঔকারের বানানের এই স্বৈরাচারের ফলে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিদের আরেক রকম সমস্যা আছে, তাই এখন দেখাচ্ছি। বাংলায় কতগুলি শব্দ আছে যার উচ্চারণ স্থির আছে, কিন্তু ঐ এবং ঔকারের যুক্ত ও বিভক্ত দুই রূপের ফলে তাদের বানান স্থির নেই। যথা—বৈঠা, পৈঠা, পৈতা, বৌমা প্রভৃতি শব্দের যুক্তধ্বনিকে বিযুক্ত করে বইঠা, পইঠা, পইতা, বউমা, ইত্যাদি রূপেও লেখা যায়। যে ভাবেই লেখা হোক্ না কেন, এদের ধ্বনি যখন স্থির আছে তখন মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে এ শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে কবিদের কিছুমাত্র ভাবনায় পড়তে হয় না। যথা—

শৈলের পৈঠায় এস তনু-গাত্রী
পাহাড়ের বুকচেরা এস প্রেমদাত্রী।
—ঝর্ণা, বিদায়-আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে যদি 'পইঠায়' লেখা হত তা হলেও ছন্দ ঠিক্‌ই থাক্‌ত; কারণ চোখের হিসাবে এদের মধ্যে অক্ষর-সংখ্যার পার্থক্য থাকলেও কালের হিসাবে এ দুটি শব্দের মধ্যে ধ্বনি-পরিমাণের কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনার সময় কবিরা কানকে অস্বীকার করে চোখের দ্বারা চালিত হয়ে থাকেন বলে এই সমস্ত দ্বিরূপ শব্দ ব্যবহারের সময় তাঁদের প্রতারিত হবার সম্ভাবনা আছে। সংখ্যাপূরণের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁরা হয়তো কখনও পৈঠা লিখে দুঘর ভর্ত্তি করতে পারেন, আবার কখনও বা প্রয়োজনের খাতিরে 'পইঠা' লিখে তিন ব'লে গণ্য করতে পারেন। এ রকম করা রচনাকার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে; কিন্তু ছন্দ-সৌষ্ঠবের পক্ষে মারাত্মক নয় কি?

শব্দের অন্তস্থিত ঐকার নিয়েও কবিদের মধ্যে সংশয় আছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি আপনেই দ্বিমাত্রিক এবং সেজন্যই ব্যঞ্জনান্তিক বা

স্বরান্তিক উভয় প্রকার যুগ্মধ্বনিকেই শব্দের অন্তে একটু টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করে পড়তে হয়। পূর্ব্বে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি; এস্থলে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

+ + × + × ×
দাও, খুলে দাও্ দ্বার্, | ওই্ তার্ বেলা হলো শেষ, |

+
বুকে লও্ তারে।

। × × × × ×
শান্তি-অভিষেক্ হোক্, | ধৌত হোক্ সকল্ আবেশ্ |

। ।
অগ্নি-উৎস-ধারে।

—সাবিত্রী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে শব্দের মধ্যবর্ত্তী তিনটি যুগ্মধ্বনি (দণ্ড-চিহ্নিত) একাক্ষর বা একমাত্রিক হিসাবেই উচ্চারিত হচ্ছে; কিন্তু শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিগুলি (স্বরান্তিক ধ্বনি যোগ-চিহ্নিত, ব্যঞ্জনান্তিক ধ্বনি গুণ-চিহ্নিত) দ্বিমাত্রিক এবং সে জন্য এগুলির দীর্ঘ বা বিলম্বিত উচ্চারণ হচ্ছে। বাংলা ছন্দ-রচয়িতারা কিন্তু এ ছন্দের বিচার এভাবে করেন না; তাঁরা শুধু লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যা গুণেই এ ছন্দ রচনা করেন; এই গুণতির হিসাবে তাঁরা যুক্তবর্ণ, অযুক্তবর্ণ, হসন্তবর্ণ, স্বরবর্ণ সকলকেই আদমসুমারির মতো সমান মর্য্যাদা দিয়ে থাকেন। উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে স্বরান্ত ব্যঞ্জন (যুক্ত ও অযুক্ত), হসন্ত ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ সবাইকে প্রচলিত হিসাবে সমান দর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে আশ্রিত ব্যঞ্জন (অর্থাৎ হসন্ত ব্যঞ্জন)-গুলির কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, আশ্রয়দাতা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা যে যুগ্মধ্বনির সৃষ্টি করেছে তারই বিচার করতে হবে; এ বিচারে শব্দের অ-প্রান্তবর্ত্তী আশ্রয়দাতা স্বরগুলি (দণ্ড-চিহ্নিত) লঘু স্বরের মত একমাত্রিক বলেই গণ্য হয়েছে (যেমন স্বরবৃত্ত ছন্দে হয়), আর শব্দের প্রান্তবর্ত্তী আশ্রয়-দাতা স্বরগুলি (গুণচিহ্নিত) দ্বিমাত্রিক বলে গ্রাহ্য হয়েছে (যেমন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হয়)। ঠিক তেমনি আশ্রিত স্বরবর্ণগুলির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রয়দাতা স্বরের (যোগ-চিহ্নিত) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে-যুগ্ম স্বরের সৃষ্টি করেছে তারই ধ্বনিপরিমাণ বিচার করতে হবে এবং সে বিচারে এখানে সমস্ত যুগ্মস্বরগুলিই প্রান্তবর্ত্তী বলে দ্বিমাত্রিক রূপে গণ্য হবে। প্রচলিত হিসাবে এ ছন্দটি আট, দশ ও ছ' অক্ষরের ত্রিপদী ছন্দ। ধ্বনিপরিমাণের হিসাবেও এ ছন্দের তিন পাদে যথাক্রমে আট, দশ ও ছ'টি ধ্বনি মাত্রা রয়েছে। দুই হিসাবেই মোটের উপর গণনার ফল সমান হয়েছে, অতএব ছন্দ ঠিক্ আছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে এরূপ দুই হিসাবের মধ্যে সাম্য থাক্‌বেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ শুধু সংখ্যাগুণতির হিসাবের মধ্যে ধ্বনিপরিমাণ-নির্ণয়ের কিছুমাত্র চেষ্টা থাকে না। কাজেই এই সংখ্যা গোণার ফলে অনেক রকম বিপদ ঘটতে পারে তা আগে দেখিয়েছি। এখানে আরেকটি বিপদের কথা উল্লেখ করছি।

উপরের দৃষ্টান্তটির প্রথম পংক্তিতে একটি শব্দ হচ্ছে 'ওই'; এ যুগ্ম স্বরটির আসলরূপ 'ঐ'। বাঙালীর উচ্চারণে অই্, ওই্ এবং ঐ একই রকম। উক্ত দৃষ্টান্তটিতে যদি 'ওই' এর জায়গায় 'ঐ' লেখা হত, তবু ছন্দ-পতন হত না; কারণ ধ্বনিপরিমাণে 'ওই্' আর 'ঐ' সমতুল্য অর্থাৎ দ্বি-মাত্রিক। কিন্তু 'ওই' না লিখে 'ঐ' লিখ্‌লে অক্ষর গুণতির হিসাবে এক অক্ষর কম পড়ে যায়; তাই কবি অতি সতর্ক ভাবে ঐ-কে পরিহার করে 'ওই' বসিয়েছেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে স্বরবৃত্ত ছন্দে কিংবা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ 'ঐ' ব্যবহার করতে কখনও ইতস্তত করেন না; যথা—

ঐ বাজেরে | ঘণ্টা বাজে।
চম্‌কে উঠেই | হঠাৎ দেখে | অন্ধ ছিল | তন্দ্রা মাঝে।

(স্বরবৃত্ত ছন্দ)

—বিজয়ী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতিসৌরভ | রভসে

(মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

—বর্ষামঙ্গল, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্রই 'ঐ' বর্জ্জন করে 'ওই' ব্যবহার করেন। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি!
—ছবি, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অক্ষরবৃত্তে ব্যবহৃত একটি মাত্র 'ঐ' আমার চোখে পড়েছে; সেটি আছে পূরবীর 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটিতে। যথা—

উদয়-দিগন্তে ঐ | শুভ্র শঙ্খ বাজে।

অক্ষরসংখ্যা ঠিক্ রাখার জন্যই যে রবীন্দ্রনাথ 'ঐ' ছেড়ে 'ওই' ব্যবহার করেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের প্রান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্ব্বদাই দ্বিমাত্রিক বলে 'ঐ' ছেড়ে 'ওই' ব্যবহারের আবশ্যকতা নেই। ('ঐ' একস্বর শব্দ বলে এর ধ্বনিটাকে প্রান্তিক বলেই ধরতে হবে।) উপরের দৃষ্টান্তটিতেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আরও দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ থাক্‌বে না।—

পিতৃহীন, নিরুপায়, | দরিদ্র সে—ঐ তার ঘর;
দাসী ভেবেছিনু যারে | —মা তাহার, নহেক অপর!
—সত্যদাস, জাগরণী, যতীন্দ্রমোহন

ঐটুকু ছোট পায়ে | কতদূর গেল সে যে চলি!
সেখানে যায়না যাওয়া? | সে পথ কি দিতে পার বলি'?
যুগ্ম অশ্রু, নীহারিকা, যতীন্দ্রমোহন

ঐ টুকু কচি বুক | কোন্ ভয়ে করে দুরু দুরু
কি বেদনা ঐ মর্ম্মমূলে!
—দেয়ালা, নীহারিকা, যতীন্দ্রমোহন

বলা বাহুল্য এ তিনটি দৃষ্টান্তই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ওই তিনটি দৃষ্টান্তের মধ্যে চার জায়গায় 'ঐ' কথাটি দ্বিমাত্রিক রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে অথচ ছন্দ পতন হয়নি, একথা নিশ্চয়। সুতরাং অক্ষরবৃত্তেও দ্বিমাত্রিক ধ্বনির স্থান আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাক্‌তে পারে না।

ওই বা ঐ সম্বন্ধে যা বলা হল দই বা দৈ, বউ বা বৌ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাই সত্য। অর্থাৎ কেউ যদি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দই বা বউ না লিখে দৈ বা বৌ লেখেন তথাপি গুণতির হিসাবে অক্ষরসংখ্যা কম হলেও ছন্দ পতন হবে না। কারণ যে রূপেই লেখা হোক্ না কেন ওই, ঐ, দই, দৈ, বউ, বৌ প্রভৃতি শব্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও সর্ব্বদাই দ্বিমাত্রিক রূপেই ব্যবহৃত হয়। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে অই্ (বা ওই্) এবং অউ্ এর ন্যায় আই্, আও্, অও্ প্রভৃতি শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মস্বরও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দ্বিমাত্রিকই বটে। সুতরাং এ ছন্দে যাই, যাও, লও প্রভৃতি শব্দকে দুটি অক্ষর বলে না ধরে ঐ, দৈ, বৌ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দুটি মাত্রা বলে ধরাই সঙ্গত। আর অই্ কিংবা অউ্ যেমন শব্দের মধ্যে (শেষ প্রান্তে না হলেই তাকে মধ্যে বল্‌ছি) একমাত্রিক বলে গণ্য হয় (যথা শৈব, মৌন) তেমনি আই্, ইউ্, প্রভৃতি যুগ্ম স্বরকেও শব্দের মধ্যে একমাত্রা হিসাবেই গণ্য করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে অক্ষর-বৃত্তে দৈ এবং দৈব, বৌ এবং মৌন কার্য্যত সমান; কারণ এ ছন্দে উভয়কেই দুই বলে ধরা হবে। একই কারণে 'শিউলি'কেও তিন না ধরে দুই ধরা উচিত। আর এ ছন্দে যুগ্ম স্বরের ন্যায় ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনিও শব্দের অন্তে দ্বিমাত্রিক বলেই গণ্য হয়। অর্থাৎ অই্ (ঐ), অউ্ (ঔ) আই্, আউ্ ইত্যাদির ন্যায় অর্, ইন্, আপ্ প্রভৃতিকেও দুটি অক্ষর না বলে দুটি মাত্রা বলাই উচিত, যদি এরা শব্দের শেষে থাকে। কিন্তু মধ্যে থাক্‌লে অই্, অউ্ প্রভৃতির ন্যায় এরা একমাত্রিক বলেই গ্রাহ্য হবে। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয় প্রণালী হচ্ছে এ রকম—

। । । ॥ ॥ ॥ ॥ । । । । ॥
দাও্, খুলে দাও দ্বার্, | ওই তার্ বেলা হলো শেষ, |

। । ॥ । ।
বুকে লও্ তারে।

। । । । ॥ ॥ । । ॥ । ॥ । ॥
শান্তি অভিষেক্ হোক্, | ধৌত হোক্ সকল্ আবেশ। |

। । । । । ।
অগ্নি-উৎস-ধারে।

আশ্রিত ব্যঞ্জন (অর্থাৎ হসন্ত বর্ণ) এবং আশ্রিত স্বর উভয়কেই হসন্ত চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা হল এবং শব্দান্তস্থিত দ্বিমাত্রিক বা যুগ্মধ্বনিগুলি যুগ্মদণ্ড চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হল। আর অযুগ্মধ্বনি এবং শব্দমধ্যবর্ত্তী

যুগ্মধ্বনিগুলিকে একটিমাত্র দণ্ড-চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে। প্রচলিত প্রণালীতে অক্ষর না গুণে এই দণ্ড-সংখ্যাগুলি গুণ্‌লেও দেখা যাবে যে এটি যথাক্রমে আট, দশ এবং ছয় ধ্বনির (অক্ষরের নয়) ত্রিপদী ছন্দ।

প্রচলিত প্রণালীতে এ ছন্দের হিসাব রাখা হয় চাক্ষুষ ভাবে অক্ষরসংখ্যা গুণে,' ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা নয়,—এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ধ্বনির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে সব সময়ই শুধু অক্ষর গোণা হয়, একথা বলা অন্যায় হবে। আগেই দেখেছি 'উৎসব', 'বৎসর', 'ভৎ‌র্সনা' প্রভৃতি শব্দে খণ্ড-ৎ কে স্বতন্ত্র দেখা গেলেও তাকে স্বতন্ত্র ভাবে গোণা হয় না; একে পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত বলেই ধরা হয়। কাজেই এখানেও ধ্বনির চেয়ে অক্ষর-গুণ্‌তির প্রতিই লক্ষ্য বেশি। কিন্তু 'চাওয়া, পাওয়া, হাওয়া' প্রভৃতি শব্দকে দেখতে তিন দেখলেও এগুলিকে দুই বলেই ধরা হয়; কারণ এসব স্থলে 'ওয়া'র উচ্চারণ পৃথক হয় না অন্তঃস্থ 'ব'-য়ের মতো এক সঙ্গেই উচ্চারণ হয়। সুতরাং এখানে ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য থাকার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার 'আমারই' 'তোমারও,' 'যখনই' প্রভৃতি শব্দকেও দেখতে চার দেখালেও এরা আসলে 'আমারি, তোমারো, যখনি' প্রভৃতির মতো উচ্চারিত হয়, তাই এগুলিকে তিন বলেই ধরা হয়; এখানেও অক্ষর সংখ্যার চেয়ে ধ্বনিরই প্রাধান্য। দৃষ্টান্ত—

॥ । । । । ॥ ।
মোর্ সন্ধ্যাদীপালোক্,
॥ । । । । ॥
পথ্-চাওয়া দুটি চোখ্,
। । । । । । ।
যত্নে গাঁথা মালা
—অশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
।
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে?
—লিপি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'চাওয়া' এবং 'এক-ই' কোথাও তিন ধরা হয়নি; ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রেখে দুই ধরা হয়েছে।

কিন্তু ধ্বনির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রেখে লিপিবদ্ধ অক্ষর-সংখ্যার প্রতি নজর রাখাই এ ছন্দের সাধারণ রীতি। সুতরাং এ ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে বাংলা লিপিপদ্ধতি। আগেই দেখানো হয়েছে যে যদি বাংলার যুক্তবর্ণগুলিকে বিযুক্ত করে লেখার প্রথাই এ দেশে প্রচলিত থাকৃত তবে অক্ষর গোণার অন্ধ অভ্যাস হতে পারতনা, সুতরাং অক্ষরবৃত্তছন্দেরই উৎপত্তি হত না। বাংলা স্বরবর্ণের লিপিপদ্ধতির ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উপর কি প্রভাব হয়েছে, এখন তাই দেখা যাক্। অযুগ্ম স্বরের লিপিপদ্ধতিতে (অন্তত ছন্দের তরফ থেকে) কোনো গোলযোগ নেই। কিন্তু যুগ্মস্বরের লিপি-পদ্ধতি নিয়েই যত মুশ্‌কিল। আমাদের বর্ণমালায় দুটি মাত্র যুগ্মস্বর-(অই্ এবং অউ্) এর স্থান আছে; কারণ এরা সংস্কৃত ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় স্থানলাভ করেছে। এ দুটি যুগ্মস্বরের যুক্তরূপ হচ্ছে ঐ এবং ঔ; আর ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হলে এদের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র সঙ্কেত-লিপিও আছে, যথা—ৈ এবং ৌ। কিন্তু অসংস্কৃত যুগ্মস্বর-(আই্, আউ্ ইত্যাদি) গুলির কোনো স্বতন্ত্র যুক্তরূপ নেই এবং তাদের জন্য কোনো সঙ্কেত-লিপিও নেই। এর ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের পথে অনেক বাধা হয়েছে।

যদি অই্ এবং অউ্‌এর কোনো যুক্তরূপ ও বিশেষ সঙ্কেত-লিপি না থাকৃত, অর্থাৎ যদি শৈল, মৌন প্রভৃতি শব্দকে শইল, মউন ইত্যাদি রূপে লেখার রীতি থাকৃত, তবে অক্ষর-গোণা ছন্দের যে কি রূপ হত তা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে যদি আই্, আউ্ ইত্যাদি সমস্ত যুগ্মস্বরেরই স্বতন্ত্র যুক্তরূপ থাকৃত, তবে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বর্ত্তমান রূপ হতে পারৃত কিনা সন্দেহ। দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে আশা করি।

হে অপ্সরি,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হোক্ ম্লান—লৈনু বিদায়।
—স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

যদি 'হউক্' এবং 'লইনু' কথা দুটিকে উদ্ধৃতরূপে লেখা আবশ্যিক হত, তবে এই পংক্তিগুলিতে ছন্দ ঠিক্ থাকৃত

কি না তা অনুমান করা শক্ত নয়। আবার যদি 'আই'কে 'ী' এই সঙ্কেত-চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করাই রীতি হত তবে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির কি আকার হত দেখা যাক্—

অন্ন চী, প্রাণ চী, আলো চী, চী মুক্ত বায়ু,
চী বল, চী স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।

—এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এরকম লিখ্‌লেও কিন্তু ছন্দপতন হবে না; কারণ চাক্ষুষ গুণতির হিসাবে পার্থক্য থাকলেও ধ্বনি-পরিমাণের হিসাবে 'চাই' এবং 'চী' এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যেমন 'ওই' এর বদলে 'ঐ' লিখ্‌লে, কিংবা 'বউ' না লিখে 'বৌ লিখ্‌লে ছন্দ-গত কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেনা, তেমনি 'চাই' না লিখে 'চী' লিখ্‌লেও কোনো পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে না। ঠিক্ এভাবে যদি অও্, আও্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনি প্রকাশেরও একেকটি সঙ্কেত-চিহ্ন থাক্‌ত তবে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কিরূপ আকৃতি ধারণ কর্‌ত তা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়।

'চাই' কে 'চী' লেখাতে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের প্রথম পংক্তিতে আপাত দৃষ্টিতে চারটি অক্ষর কমে গেছে; কিন্তু ধ্বনিমাত্রা-সংখ্যার (আঠারোর কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি বলে ছন্দ অব্যাহতই আছে। তেম্‌নি যাও, লও, দেই, ঢেউ, প্রভৃতি কথাকেও যদি সঙ্কেতে লেখার ব্যবস্থা থাকত তথাপি অধুনা-প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অক্ষুণ্ণই থেকে যেত; কিন্তু অনেক স্থলেই অক্ষর সংখ্যার মধ্যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হত এবং তার দ্বারাই প্রমাণ হত্ যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষর-সংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না। *

* সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার কখনও ব্যতিক্রম ঘটে না! কারণ প্রাচীন ভারতীয় লিপিপদ্ধতিতে আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ কিংবা আশ্রিত স্বরবর্ণ কখনও স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয় না, সর্ব্বদাই যুক্তরূপে লিখিত বা গৃহীত হয়। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দে প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ অক্ষর প্রকৃতপক্ষে একেকটি সিলেব্‌ল্। বাংলায় কিন্তু বহুস্থলেই যে সব আশ্রিত স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তারাও স্বতন্ত্র-ভাবেই লিপিবদ্ধ হয়; এইজন্যই বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উপরোক্ত মিশ্র প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে। বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ বা মুদ্রিত হরফ্‌মাত্রকেই একটি অক্ষর বলে গণ্য করা হয়; আমারাও প্রচলিত অর্থেই অক্ষর শব্দের ব্যবহার করছি। বাংলায় অক্ষর বলতে সিলেব্‌ল্ বোঝায় না। এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক।

আমরা আগেই দেখেছি যে স্বরবৃত্ত ছন্দে শুধু স্বরসংখ্যা অর্থাৎ যুগ্ম বা অযুগ্ম ধ্বনির সংখ্যাকেই গণনা করা হয়, ধ্বনিমাত্রার পরিমাণ-নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় না। পক্ষান্তরে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিমাত্রার উপরই নির্ভর করে, এ ছন্দে ধ্বনিসংখ্যা অর্থাৎ স্বরসংখ্যার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। যথা—

পদ্মকোষের্ | বজ্রমণি | ওরাই্ ধ্রুব | সুমঙ্গল্;
আলাদিনের্ | মাথার্ প্রদীপ্ | ওই্ আমাদের্ | ছেলের দল্

ছেলের দল, কুহু ও কেকা, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে স্বর বা ধ্বনি আছে, শেষ ছেদে তিনটি করে; যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনি অর্থাৎ গুরু ও লঘু ধ্বনির মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি; সুতরাং ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ স্থির নেই। অতএব এ ছন্দকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বল্‌ব। পক্ষান্তরে—

চিরযুবা | শূর্‌বীর্ | বিজয়ীর্ | কুঞ্জে
আমাদের্ | মঞ্জীর্ | মদালসে | গুঞ্জে;

*   *   *   *

ফুটে উঠি | হাসি সম | খড়্‌গের্ | ঝলকে,
মোরা কার | মনোরম | মৃত্যুরে | পলকে।

—বিদ্যুৎপর্ণা, তুলির লিখন, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে ধ্বনিমাত্রা আছে, শেষ ছেদে তিনটী করে; যুগ্ম বা গুরুধ্বনিগুলি দ্বিমাত্রিক, কাজেই যুগ্মদণ্ড-চিহ্নিত হয়েছে, আর অযুগ্ম বা লঘু ধ্বনি-গুলি একমাত্রিক বলে একটি করে দণ্ডচিহ্নে চিহ্নিত হয়েছে। এই হিসাবে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ স্থির রয়েছে বলে' এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বল্‌ব। বলা বাহুল্য এখানে স্বরবৃত্তের মতো ধ্বনির বা স্বরের সংখ্যা স্থির নেই।

এখন একটি অক্ষরবৃত্তের দৃষ্টান্ত ধরা যাক—

বিপরীত্ | মুখে তারে | পড়েছিনু | তাই্

বিশ্বজোড়া | সে লিপির্ | অর্থ বুঝি | নাই্

—৪০, নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ

স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের একটি বিশেষ মিশ্রণের ফলে উদ্ধৃত পংক্তি দুটি রচিত হয়েছে; প্রত্যেকটি শব্দের পূর্ব্বাংশে রয়েছে স্বরবৃত্তের তত্ত্ব, সেখানে রয়েছে ধ্বনিসংখ্যারই প্রাধান্য (বিশ্ব ও অর্থ শব্দের পূর্ব্বাংশে দুই না ধরে একই ধরা হয়েছে); আর তার শেষাংশে আছে মাত্রাবৃত্তের তত্ত্ব, ধ্বনিমাত্রাই এখানকার গোড়ার কথা (লিপির্ শব্দের শেষ ধ্বনিটিকে মাত্রা হিসাবে দুই ধরা হয়েছে, সংখ্যাহিসাবে এক ধরা হয় নি)। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের এই যৌগিক রীতিতে উদ্ধৃত পংক্তিতে প্রতি পর্ব্বে চারিটি করে unit বা একক রয়েছে, শেষ পর্ব্বে আছে দুটি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই এককগুলি কোন্ তত্ত্বের একক? ধ্বনি-মাত্রার নয়, কারণ মাত্রাহিসাবে প্রথম পংক্তিতে চোদ্দমাত্রা থাকলেও দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে ষোল (বিশ্ব ও অর্থ শব্দে একমাত্রা করে বেশি আছে); ধ্বনিসংখ্যারও নয়, কারণ এর পর্ব্বগুলিতে সংখ্যার সাম্য নেই। অর্থাৎ এতে ধ্বনি-মাত্রা ও ধ্বনিসংখ্যা কারও স্থিরতা নেই, সুতরাং এ ছন্দ মাত্রাবৃত্তও নয়, স্বরবৃত্তও নয়।

পূর্ব্বেই বলেছি এ ছন্দ আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশ্রণ-জাত একটি মিশ্র ছন্দ; কাজেই এর গোড়ায় যে তত্ত্ব আছে তার একক বা unitকে একটা বিশেষ নাম দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অগত্যা এই unitকে 'অক্ষর' নাম দিয়ে এ ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বলে অভিহিত করেছি। এ নামকরণের অবশ্য আরেকটি কারণ আছে; সেটি হচ্ছে গোড়ায় আপাত দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যা গুণে 'ছন্দ' রচনার অভ্যাস থেকেই এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং আজকালও প্রধানত অক্ষর-সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ছন্দ রচনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং এদিক্ থেকে দেখ্তে গেলে একে "অক্ষরবৃত্ত" নাম দেওয়া অসঙ্গত মনে হবে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

ভ্রম-সংশোধন

এই প্রবন্ধে ছাপার কিছু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পড়িবার সময় নিম্নলিখিত সংশোধনগুলি করিয়া লইবেন।

৫৭৪ পৃঃ ১ম কলমে নীচে হইতে একাদশ পংক্তিতে—"ফলে এই শব্দের মধ্যবর্ত্তী"-র পরিবর্ত্তে "ফলে এই ছন্দে শব্দের মধ্যবর্ত্তী" পড়িবেন।

৫৭৪ পৃঃ ১ম কলমে নীচে হইতে সপ্তম পংক্তিতে "ধরব করব"র পরে 'ধরত' কথাটি বসাইয়া লইবেন।

৫৭৫ পৃঃ ১ম কলমে নীচে হইতে ৬ষ্ঠ লাইনে "পরে"র স্থলে 'পড়ে' পড়িবেন।

৫৭৬ পৃঃ ১ম কলমে উপর হইতে অষ্টম পংক্তিতে,—"'দু' অক্ষর ধরা হয়;" এর পরে "কিন্তু হইল, লইব প্রভৃতিতে তিন অক্ষর ধরা হয়"—এই কথা কয়টি বসাইয়া লইবেন।

৫৭৬ পৃঃ ২য় কলমে নীচে হইতে তৃতীয় পংক্তিতে "ঐকার নিয়েও" এর পরিবর্ত্তে "ঐকার ও ঔকার নিয়েও" পড়িবেন।

৫৭৮ পৃঃ ২য় কলমে নীচে হইতে অষ্টম পংক্তিতে 'দাও' কথাটির উপর এক দণ্ডের পরিবর্ত্তে যুগ্ম দণ্ড হইবে।

সন্ধ্যাসঙ্গীত

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর

কবির আধুনিক কাব্যসংগ্রহের প্রথম গ্রন্থ সন্ধ্যাসঙ্গীত। ইহার আগেও তিনি কবিকাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় এই তিনখানি কাব্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলির রচনা নেহাৎ কাঁচা এবং বিশেষত্বহীন বিবেচনায় তিনি কাব্য-গ্রন্থে তাহাদের স্থান দেন নাই, প্রথম সংস্করণের পর সেগুলিকে আর মুদ্রিতও করেন নাই, বরাবর লোকচক্ষুর অগোচর রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি আত্মপ্রকাশের বিশিষ্ট ধারাটি প্রথম খুঁজিয়া পান। এই বইখানি সম্বন্ধে শোভন সংস্করণ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন—"ইহার কবিতার মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে কিন্তু যদি তাহাদের পরবর্ত্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে, তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সেজন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।"

এ যাবৎ কবির জীবনে বহুবিচিত্র সাধনা ও সিদ্ধির সমাবেশ ঘটিয়াছে। বাণী এবং ব্যঞ্জনাভঙ্গীও তাঁহাতে কালে কালে বহুবিচিত্র হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের প্রবল উদ্বেগের মধ্যে পরিণত জীবনের সেই বাণী ও ব্যঞ্জনা-ভঙ্গীর অস্ফুট আভাস মিলে।

সন্ধ্যা বাহিরের কর্ম্মজগতে বিরামদায়িনী। কিন্তু অনন্তের চিন্তাজগতে সংঘাত-ঘোর ঘনাইয়া তোলে। দিনের অনারব্ধ, অসমাপ্ত বা বিফল উদ্যমের মর্ম্মপীড়ার মধ্যে সার্থক কর্ম্মের ক্ষীণ আনন্দটুকু মৃৎপ্রদীপের আলো বিতরণ করে। যেখানে অতীতের সেই সার্থক কর্ম্ম নাই, সেখানে আগামী দিবসের নূতন চেষ্টার উদ্দীপনা হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে। সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার সময় কবিজীবনে এমনি একটি সন্ধ্যা নামিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে যে-দিন অবসান হইয়াছে, তাহার ব্যর্থ প্রয়াসের হতাশ্বাস, অমূর্ত্ত অভিলাষের উদ্বেগ এবং ভাবী স্বপ্নই বইখানাতে সঙ্গীতের রূপ ধরিয়া উহাকে সার্থক-নামা করিয়াছে।

প্রথম কবিতা "উপহারে" কবি সন্ধ্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"সন্ধ্যা, তোরই যেন স্বদেশের প্রতিবেশী, তোরি যেন আপনার ভাই, আজ আমার প্রাণের প্রবাসে দিশা হারাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।" প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতার পরিচয় এখানে পরিস্ফুট।

শিশুবয়সে প্রকৃতির রূপ এবং সঙ্গমাধুর্য্য মানুষকে পাইয়া বসে। তাহার জল, আলো, আকাশ, বাতাস, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মানুষ, গরু প্রত্যেকটি শিশুমনে এক একটি সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করে। বয়স যত বেশি হয়, সংসারের জনসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার সেই প্রকৃতিপ্রেম তখন বিশেষভাবে জীবপ্রেমে রূপান্তর লাভ করে। এবং তাহা জীবনের পটভূমিতে গুহাহিত নির্ঝরিণীর মতো সুদূরে অলক্ষ্য থাকিয়া প্রাণের গতিবেগ সঞ্চার করে। কিন্তু বৃহৎ যাঁহাদের মন, সব সময়ই জীব এবং প্রকৃতি সমানভাবে উভয়ের প্রেমেই তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে। সেই বিপুল প্রেমের বলে তাঁহারা ক্ষুদ্র গৃহ ছাড়িয়া বিশাল জগতকে বক্ষে পাইতে ব্যগ্র হন। এই সময় আগে যে-মন থাকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাই হইয়া উঠে সংহত যোগধর্ম্মী। কারণ আগে কেবল এইটি ভালো, ঐটি মন্দ—এই করিয়া বিশ্বের নানা বস্তুর সহিত খণ্ড-পরিচয় বাড়িতে থাকে। কিন্তু ক্রমে এই পরিচিতের সংখ্যা এত বেশী হইয়া দাঁড়ায় যে প্রত্যেকটি বস্তুকে বিচ্ছিন্নভাবে সুদীর্ঘকাল মনে রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই তখন প্রয়োজন হয় একটি সাধারণ শৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলার গুণে দিনেদিনে জমানো বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার

* শান্তিনিকেতনে "রবীন্দ্র-পরিচয় সভার" তৃতীয় বার্ষিক প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

ভাণ্ডারের সঙ্কীর্ণ স্থানে সুবিন্যস্ত রাখিয়া গিন্নীরা আজীবন ঘরকরণা চালাইয়া থাকেন। দ্রব্য সাজাইবার শৃঙ্খলাটি জানা থাকিলে যতদিন যাক্ না কেন, ঘরের তৃণটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের অগোচরে কোথাও সরিয়া যাইতে পারে না। ভাণ্ডারে রাজ্যের জিনিষের মধ্যে ডুব মারিয়া থাকিলেও শৃঙ্খলার সূত্রে বাঁধা পড়িয়া প্রয়োজনের বেলায় তাহা এক মুহূর্ত্তে হাতের কাছে আসিয়া ধরা দেয়। এই শৃঙ্খলার প্রয়োজনবোধ পরিণত বয়সে মানুষের মনে আপনা হইতেই উদিত হয়। ক্রমে তাঁহারা সাধনার দ্বারা তাহা লাভ করিতেও সমর্থ হন। এই শৃঙ্খলার সূত্র ধরিয়া তাঁহাদের প্রেম তখন লীলায়িত হইতে থাকে। কেহ এই সূত্রকে বলেন ভগবান, কেহ বলেন প্রকৃতি, অন্ধনিয়তি। যিনি যে-নামরূপই তাহাতে আরোপ করুন না কেন, সকলে সেই এক সূত্র ধরিয়াই বিশ্বের বিচিত্র বস্তুর মধ্যে একটি নিগূঢ় যোগের আকর্ষণ অনুভব করেন। তখন কত অজানাই যে তাঁহাদের জানা হইয়া যায়, কত ঘরে তাঁহাদের ঠাঁই মিলে, দূর তাঁহাদের নিকট হইয়া যায়, পর তাঁহাদের ভাই হইয়া উঠে। এইভাবে মনের প্রসার হওয়ায় তাঁহারা মহাত্মা হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বজনের হৃদয়ে, ঔষধিতে, বনস্পতিতে তদ্‌গতচিত্তে বিহার করিতে থাকেন। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের মহাপুরুষদের জীবন এই ধারাতেই বিকশিত হইয়াছে।

জীবনের ন্যায় কবির কাব্যও আশৈশব এই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রথম হইতেই তিনি প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালোবাসিয়াছিলেন। তাহাতে প্রাণে যে অপরিমেয় রসের আধান হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে সাজাইয়াছে বিচিত্রের দূত, বিশ্ব-প্রেমিক কবি।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে এই প্রকৃতিই একরকম সারা কাব্যজগত ছাইয়া বসিয়াছে। উহার লতাপাতা, ফুল ফল, আকাশ বাতাস, চন্দ্রসূর্য্যতারকাই কবির সব। উহাদের মধ্যে তিনি আপনার ঈপ্সিতের আভাস পান, তার গান শোনেন, কিন্তু সুরের পথ বাহিয়া তখনো "পূর্ব্বজনমের প্রথম প্রেয়সীর" সহিত একাত্ম হইয়া মিশিতে পারেন না। তাঁহার ব্যাকুল মন—

> "আরবার ফিরে যেতে চায়
> পথ তবু খুঁজিয়া না পায়।"

কিন্তু খুঁজিয়া না পাইলেও যেটুকু আভাস পান, কখনো তাহার কণামাত্র যদি অনুভবে কম পড়ে, তবে আর উদ্বেগের সীমা থাকে না। মনে হয় সব গেল :—

> "ফুল গেল, পাখী গেল, আলো গেল, রবি গেল,
> সবি গেল, সবি গেল।"

এই সব হারাইবার বেদনায় 'দুঃখ'কে আহ্বান করিয়া কবি এই বইতে নানা খেদোক্তি করিয়াছেন ;—

> "আয় দুঃখ আয় তুই
> তোর তরে পেতেছি আসন,
> হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি' টানি' উপাড়িয়া
> বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
> বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ ;
> জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ !
> হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন।"

যাঁহারা কবিকে দুঃখবাদী বলিয়া থাকেন, ইহা শুনিয়া তাঁহারা হয়তো আর একটি চারিত্র-লক্ষণের সন্ধান ইহাতে পাইবেন। কিন্তু কবিকে আসলে দুঃখবাদী বলা যায় কিনা তাহাতেই বিশেষ সন্দেহ আছে। যে অবস্থায় আকাঙ্ক্ষা থাকে কিন্তু তাহা পূর্ণ করিবার আর কোনো আশা বা উপায় থাকে না, মানুষের সেই অবস্থাই যথার্থ দুঃখের অবস্থা। যাঁহারা বস্তুতান্ত্রিক, এই দৃশ্যমান বস্তুজগতকেই মাত্র সত্য বলিয়া জানেন, তাঁহাদের নিকট মৃত্যু এরূপ একটি দুঃখের অবস্থা।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি দুঃখ বলিয়া যে জিনিষকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা এই অর্থে ঠিক দুঃখের পর্য্যায়ে পড়ে না, তাহাকে বরঞ্চ উদ্বেগ বলিলেই যথার্থ বলা হয়। ইহা সৃজনের পূর্ব্বে প্রলয়ের আলোড়ন, প্রসূতির প্রসব-বেদনার উন্মাদনা। প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতির চক্ষে চারিদিক

যেমন ঘোর হইয়া আসে, সেই ঘোরান্ধকার নয়নে লইয়া কবিও বলিয়াছেন—

"সম্মুখে অসীম পারাবার
সম্মুখেতে চির অমানিশি
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ
গেল, গেল, বুঝি নিয়ে গেল,
আবর্ত্ত করিল বুঝি গ্রাস।"

কবির তখনকার এই বেদনা-উন্মাদনার তীব্রতা কিছু অনুভূত হয়, যখন শুনা যায় তিনি দুঃখকে বলিতেছেন—

"প্রাণের নর্ম্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে,
দুই হাতে তুলে নেরে সবলে বাজায়ে দেরে
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌!
ভাঙে তো ভাঙিবে বাদ্য ছিঁড়ে তো ছিঁড়িবে তন্ত্রী,
নেরে তবে তুলে নেরে, সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌!
দারুণ আহত হ'য়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গণি,
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়
দুঃখ তুই আয়, তুই আয়।"

বেদনা সাময়িকভাবে কবিকে মুহ্যমান করিয়াছে, কিন্তু একেবারে নিরাশায় অসাড় করিয়া ফেলিতে পারে নাই; বরঞ্চ ঐ বেদনার আঘাতই যে প্রতিরোধ-চেষ্টা জাগাইয়া তাঁহার হৃদয়ে নবীন তেজের উদ্দীপনা আনিয়াছে—এ কথা কবির মুখেই শুনা যায়—পরাজয় সঙ্গীতে,—

(ক) "এই বেলা প্রাণপণ কর,
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই
স্রোতমুখে ভাসিস্‌নে আর।"—

সংগ্রামসঙ্গীতে—

(খ) "ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম!
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর ঊষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা!
ফিরে নেব হারানো সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।"

কিন্তু এইখানে একটি কথা উঠে। প্রকৃতির মধ্যে কবি যাহার আভাস পাইয়াছেন, এবং যাহাকে ধরিতে না পারিয়া বিরহব্যথায় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার সেই "পূর্ব্ব জনমের প্রেয়সীটি" কে; কি তাহার পরিচয়, কবির জীবনে পরিণত রূপই বা তাহার কি রকম?

সন্ধ্যাসঙ্গীতে সন্ধ্যা, সুখ দুঃখ, ভগবান, আশা, ইত্যাদি এত জিনিষের আহ্বান আছে, যে, সে সকলের মধ্য হইতে কোনো একটিকে নিশ্চিত করিয়া তাঁহার ঈপ্সিতা বলা শক্ত। তবে এইমাত্র বোঝা যায় যে প্রকৃতির বিচিত্র বস্তু তাঁহার হৃদয়ে বিচিত্র রসের সঞ্চার করিয়াছে এবং তিনি অন্তরের সেই বিচিত্র রসকে কোনোরূপে প্রকাশের জন্য উদ্বিগ্ন।

প্রকাশই কবির ধর্ম্ম। উহা তাঁহার চিরকামনা, চিরসাধনার ধন। তিনি যে কবি, তাঁহার এই পরিচয় আজ জগতে কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পরিচয়ের সূচনাও সন্ধ্যাসঙ্গীতেই রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি হৃদয়ের মধ্যে দুর দুরান্তরে কোথাকার কোন-এক উদাসী প্রবাসীর কণ্ঠগীতি শুনিতেছেন। তাঁহার মধ্যজীবনের রচনা "উৎসর্গের" মধ্যে সেই প্রবাসী যে তিনি নিজেই, ইহা স্পষ্টতর করিয়া বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সব বোঝানো শেষ হয় নাই। জীবন-সায়াহ্নে সত্তর বাৎসরিক জয়ন্তীউৎসবে তিনি যে বাণী বিতরণ করেন, তাহাতে বাকী পরিচয়টুকু পূর্ণ করিয়া বলিলেন:—

"জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র আমার পরিচয় আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।...আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই।—"

"শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি সদা আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি— ।"

ঠিক সন্ধ্যাসঙ্গীতেও দেখা যায়, গ্রন্থের মধ্যে একস্থানে তিনি বলিতেছেন—"কবি হ'য়ে জন্মেছি ধরায়"—, এবং নানা ভাবনা ও বর্ণনার পর গ্রন্থের শেষদিকে যখন তাঁহার গান-সমাপনের সময় সন্নিকট হইয়াছে, তখনও আপন সত্যস্বরূপের পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহার লেখনী দিয়া এমনি একটি উক্তি বাহির হইয়াছে :—

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসারতলে,
আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র অক্ষর দেখি
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন,
ভাঙি ফেলি' অতীতের কারা।
আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না।
এমন মহান এ সংসারে
জ্ঞানরত্ন রাশির মাঝারে,
আমি দীন শুধু গান গাই।"

সুর গতিছন্দ এবং সুপরিণতি লইয়াই গান। খাঁটি কবির রচনামাত্রেই কিছু না কিছু সংগীতধর্ম্ম থাকে। সে রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার মধ্যে ভাবের সুকুমার রেশ, ছন্দময় গতি এবং সুসম পরিণতি প্রকাশ পায়। তাহা ভাষা আশ্রয় করিলে হয় কবিতা, সুর আশ্রয় করিলে হয় সঙ্গীত, রং রেখার আশ্রয়ে হয় চিত্র এবং জীবনের আশ্রয়ে হয় "লীলাখেলা"। পরিণত জীবনে যদিও কবির এ সকল রকম প্রকাশই সম্ভব হইয়াছে, সন্ধ্যাসঙ্গীতের জীবনে কিন্তু একটির বেশি প্রকাশরূপ তাঁহার চোখে প্রতিভাত হয় নাই। সেই প্রকাশটি হইতেছে ছন্দোবদ্ধ হৃদয়ের বাণীরূপ কবিতায়। তাই যখন নানা জিনিষের মধ্যে "সাধের কবিতাকেও" সন্ধ্যাসঙ্গীতে আহ্বান করিতে শোনা যায়, তখন ঐ একটি খণ্ডরূপকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি যে পরবর্ত্তী জীবনের বিচিত্র প্রকাশ-ব্যাকুলতারই সূচনা করিলেন, এ ইঙ্গিতে পাঠকের মন স্বতই বিস্মিত হইয়া উঠে। জীবন যত বাড়িয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কবিতা ছাড়াও সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম-সাধনা, দেশসেবা, বিশ্বসেবা,—কত কী প্রকাশের বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন! এবং সেই অনুপ্রেরণা হইতেই পরে "চিত্রার" প্রকাশের ভাবঘন অখণ্ড আদর্শকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

"কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রচিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

কবির সমগ্র কাব্য-জীবনের উপসংহারে পৌঁছিয়া দেখা যায়, প্রথম জীবনে সন্ধ্যাসঙ্গীতের "পূর্ব্বজনমের প্রেয়সী" বলিয়া প্রকৃতির মধ্যে যাহার আভাস পাইয়াছেন, তাহাকেই পরবর্ত্তী জীবনে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালিতে ভগবানের রূপে দেখিয়াছেন ; জীবনসন্ধ্যায় সেই এক 'সূত্রকেই' বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিয়া "বিচিত্র" এই বিশেষ একটি নিজস্ব নামরূপে বিভূষিত করিয়া লইয়াছেন। আর ইহা দেখিয়াও মুগ্ধ হইতে হয় যে, কবি নিজে প্রথম হইতেই তাহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর মত বিচিত্র রূপরচনার কাজে পতির ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। জীবনদেবতার শেষ পরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন—"শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্ম্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য, তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন তখন তিনি, নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি, নাচাই, হাসি, হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি,

যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুকী আনন্দে অধীর, আমরা তাঁরি দূত। যে-বিচিত্র বহু হ'য়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্য, চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখে দুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্ররসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তার রঙ্গশালার বিচিত্র রূপগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর। ······বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌চে নিখিলের চিত্ত, তারি তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হ'য়েছিল, আজো তার বিরাম নেই।......এই আশ্রমের কর্ম্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার।······এই ধূলোমাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে।" এই বিচিত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রথম হইতেই 'আমি-তুমি'র দ্বৈতভাবাপন্ন। পূর্ব্বরাগে শিখি-চূড়া, পীতবসন, বংশীরব রাধার হৃদয়াশ্রয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপনা আনিয়াছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতে দেখা যায় প্রকৃতির আকাশ বাতাস, ফুলফলের মৌন স্পর্শই কবির হৃদয়ে তখনকার প্রকৃতিরূপধারী বিচিত্রের অনুরাগ-বীজ উপ্ত করিয়াছে। যাহাকে ভালোবাসিয়াছেন, আপনার সব দিয়া তাহাতেই সমাহিত হইবার কামনা সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতেই কবির মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। সে কামনা এত উদগ্র, যে তিনি চান,—

"আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি' উঠি
দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্রভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি' গাহিয়া উঠে
আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
ভেঙে ফেলি' উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ,
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।"

গোড়াতে প্রেমের এই বিশাল অনুভব ছিল বলিয়াই পরবর্ত্তী কালে তাঁহার পক্ষে বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত হওয়া সম্ভব হইয়াছে! যে কবিতায় তিনি এই বিশ্ব-প্রেমের সূচনা দেখাইয়াছেন, সেই "অনুগ্রহ" কবিতাতেই তাঁহার পরিণত জীবনের প্রেমের বাণীর একটি চমৎকার পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমতত্ত্বের আকর বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রেমের উৎকর্ষপথে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি স্তরভেদ করা হইয়াছে। শান্ত হইতে বাৎসল্য এই চারিটি স্তরেই নায়িকা নায়ককে নিজের চেয়ে কোন-না-কোন গুণে শ্রেষ্ঠতর ভাবে, তাহাতে পূর্ণ মিলন না হইয়া পরস্পর তাহারা কিছু-না-কিছু দূরে থাকে। কিন্তু মধুর রতির স্তরে নায়ক-নায়িকা পূর্ণ সমতার ভাবে এক হইয়া যায়, তুলনামূলক কোন গুণের পার্থক্য-বোধ তাহাদের মনে স্থান পাইতে পারে না। ভারতবাসী বিশেষতঃ বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশ্ববাসীর ভাবনা ও সাধনার প্রিয়তম প্রতীক ভগবানকে মধুররতির বিষয় করিয়া প্রেমের খেলাতে আদিকাল হইতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রতীচ্যে প্রেমের এই স্তরের কথা বহুদিন কল্পনার অতীত ছিল। খেয়ালী ভগবানের খেয়ালী বিচারব্যবহার দণ্ড-আশঙ্কা লইয়া পাপবাদী খৃষ্টানমণ্ডলী অনুগ্রহভিক্ষায় দিন কাটাইত। কবি তাঁহার গীতাঞ্জলির মারফতে তাঁহাদিগকে ভারতের এই মধুর প্রেমের সন্ধান দান করেন। এই রসামৃত আস্বাদনে তাহারা ভয়ভাবনা ভুলিয়া জীবনের এক নব-উদ্বোধন অনুভব করিয়া নূতন মুক্তিপথে যাত্রা করিল। এবং দিশারীকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনসূচক নোবেলপ্রাইজের অর্ঘ্য দান করিল। যে মধুর প্রেমের বাণী শুনাইয়া পরিণত জীবনে তিনি প্রতীচ্যের এই প্রাণের অর্ঘ্য লাভ করিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে সেই প্রেমের বাণীর প্রাথমিক আলাপ রহিয়াছে। তখন হইতে তাঁহার মনে খটকা বাধিয়াছে, এই বিশ্ব কি কাহারো অনুগ্রহের দান? আমরা কি কোন ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত স্রষ্টা বিধাতার কৃপাকটাক্ষের ভিখারী? তাহা হইতেই পারে না।

"এই যে জগৎ হেরি আমি
মহাশক্তি জগতের স্বামি,
এ কি হে তোমার অনুগ্রহ
হে বিধাতা, কহ মোরে কহ।"

যদি তাই হয়, তবে—

"মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহি না থাকিতে এ সংসারে।"

আমি যে—

"কবি হ'য়ে জন্মিছি ধরায়
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালোবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালোবাসা চায়।"

এই ভালোবাসাই লীলার মূলধন। জীবনের প্রারম্ভে তাই কবি সুখের আশা করেন নাই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তিনি চাহিয়াছেন প্রেম।

"সুখ কারে চায় প্রাণ তোর
সুখ কার করিস্ রে আশা?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে
ভালোবাসা—ভালোবাসা গো।"

সুখ দুঃখ দুইই আপেক্ষিক, সঙ্কীর্ণ অবস্থা মাত্র। উহারা এই আছে তো এই নাই। কিন্তু প্রেমবস্তু শাশ্বত; সমুদ্রের মত বিস্তারের আর অবধি নাই, উহার মধ্যে সুখ দুঃখ দুইই আছে; সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাহাদের উত্থান পতন। কবি প্রথম হইতে ঢেউয়ের উপর নির্ভর না করিয়া সমুদ্রেই তরণী ভাসাইয়াছেন। ঢেউ-সংঘাত আন্দোলিত হইয়া তাহা যেখানেই যখন গিয়া পড়ুক না কেন, নৃত্যছন্দ, কলধ্বনি ও অপরূপ দৃশ্যলীলাই আপনার চারিদিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহার যে বেদনা, তাহা বিচিত্রের সহিত বিচ্ছেদের বেদনা, তাঁহার যে আনন্দ তাহাও বিচিত্রের সহিত মিলনেরই আনন্দ। বিচিত্রের সাধনায় প্রতি লক্ষ্য থাকায়, এই আনন্দ-বেদনাও বিচিত্ররূপে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে নাই। প্রিয়বিরহে দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া শতছিদ্রময় হৃদয়-বাঁশিতে এক একটি রূপ প্রকাশ করিতেছে—সন্ধ্যা-সঙ্গীত হইতেই এ কথার সূচনা হইয়াছে। তারপরে প্রৌঢ় বয়সেও যখনই তাঁহার সাংসারিক কোন প্রিয়-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে অমনি সেই দুঃসহ বেদনা কোন-না-কোন অপূর্ব্বকাব্যে মূর্ত্ত হইয়া তাহার রসে রূপে কবিকে ও মানব-সমাজকে আনন্দিত করিয়াছে। অনুপরমাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চিরকাল তাঁহার চোখে সেই এক বিচিত্রই নানা নামরূপে বিরাজমান। সে ছাড়া কোথাও একটু শূন্যতা নাই। প্রেম প্রাণের শূন্যতা দূর করে। তাঁহার মধ্যে এই প্রেমের ধারা আজন্ম প্রবাহিত আছে বলিয়া বেদনাও তাঁহার কাছে আনন্দের রূপ ধরিয়াছে, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাই তিনি জোরের সহিত বলিতে পারিয়াছেন

"দুঃখ ক্লেশে আমি কি ডরাই,
আমি কি তাদের চিনি নাই,
তারা সবে আমারি কি নয়?"

বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন অনুভূতি সেই একেরই সুধাস্পর্শে তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। তাই দুঃখকেও তিনি আপন বলিয়া প্রেমের সহিত হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। এই জন্যই পরবর্ত্তীকালে আত্মীয়দের মরণ তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। মরণের মধ্যে অতি অদ্ভুত দোললীলা দেখিয়া তিনি পরম বিস্ময়ে ও পুলকে জীবনদেবতাকে বলিয়াছেন—

"আছে তো যেমন যা ছিল,
হারায়নি কিছু ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যেবা বাঁচিল।
বহি' সব সুখ দুখ,
এ ভুবন হাসিমুখ
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া শুধু আসা।"

আরো কিছুকাল পরে পূরবীর জীবনে পৌঁছিয়া তিনি বলিলেন—"

আমি যে রূপের পথে ক'রেছি অরূপ-মধুপান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।"

এই আনন্দ দুঃখ ও সুখকে এক চরম উপলব্ধির মধ্যে মিলাইয়া লয়। সত্যের খণ্ডরূপই সংসারে সুখ দুঃখের

আলোড়ন জাগাইয়া তোলে, পরিপূর্ণ সত্যের বোধজনিত যে আনন্দ তাহার মধ্যে সুখ দুঃখ এক সমগ্র চেতনার মহাসমুদ্রে এক হইয়া আছে, সেখানে বিশুদ্ধ সত্তাব পরম প্রকাশ। সেখানে প্রেমেব পূর্ণ উদ্বোধন।

বাস্তবিক প্রেমিকেব নিকট সুখ দুঃখ বলিয়া কোন কাম্য জিনিষ নাই, প্রেমই তার সবাব বড়ো একমাত্র সাধনার বস্তু। সন্ধ্যাসঙ্গীতের যুগে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে কবির মধ্যে এই প্রেমের উদ্রেক হয়, এবং প্রাকৃত জীবনলীলার অবসান মুখেও তিনি এই প্রেমই জগতে রাখিয়া যাইবার সঙ্কল্প সকলকে শুনাইলেন—

"এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি' সব কর্ম্ম, সব তর্ক সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাবো "আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।"

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

স্বরলিপি

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
জাগার বেলা হোলো,—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।

ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো—
বেদনা হবে পরম রমণীয়,
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খণেক তরে যদি
সজল আঁখি তোলো॥

নিমেষহারা এ শুকতারা
এমনি উষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।

রজনী শেষে এই যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে,
হে বিরহিণী, আপন হাতে তবে
বিদায় দ্বার খোলো॥ বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৭

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সা সা ॥ রা -া -পা পমা । পা -া পা ধা ৷ ধমা -ণা -ণধা পা । মা -গা মা -রা ৷
স্ব প নে • • দোঁ হে • ছি নু কী • • • মো হে • জা •

৷ গা -মা -ধা পা । পমা -গা মা -রা ৷ সা -া -া -া । -া -া সা -া ৷
গা • র্ বে লা • হো • ল • • • • • যা •

সা -মা -া মগা । গপা -া -া -া ৷ মপা -ধনা-র্সর্রা র্সনা । র্সা -ধণা ণপা -া ৷
বা • র্ আ গে • • • শে • • ষ্ ক থা • • টি •

I ধা -র্সণা ধপা -া । -া -া -া -া I রা- গা ,গরা -পা । -া -া সা সা II
বো • • লো • • • • • বো • লো • • • "স্ব প"

পা পা II পা -া -া ধা । ধা -া ধা -া I ধা না না না । না -ধা না -া I
ফি রি য়া • • চে য়ে • এ • ম ন কি ছু দি • য়ো •

I -া -া না না । নধা -না -র্সা র্সা I র্সা -না র্রর্সা -না । ধা না র্সা র্সনা I
• • বে দ না • • হ বে • প • র ম র ম

I ধনা -র্সনা ধপা -া । -া -া র্সা -না I র্সা -নর্গা র্গা র্রা । র্গর্সা -না ধা না I
ণী • • য় • • • আ • মা • • র ম নে • র ছি

I র্সা -নর্গা র্রা র্সা । র্সা -না র্রর্সা -না I
বে • • নি র ব • খি •

I ধা না র্সা র্সনা । ধপা -া পা -হ্মা I পা -হ্মধা পা পা । পা -মা মা -া I
বি দা য় থ নে • থ • নে ক্‌ ত রে স • ন্ধি •

I সা রা রা গা । গা -া গরা -গমা I মা -া -া -া । -া -া মা -া I
স জ ল আঁ খি • তো • • লো • • • • • যা •

I মা -গা -পা পহ্মা । পা -া -া -া I হ্মপা -ধনা -র্সর্রা র্সা । র্সা -ধণা ধপা -া I
বা • র্‌ আ গে • • • শে • • ষ্‌ ক থা • • টি •

I ধা -র্সণা ধপা -া । -া -া -া -া I রা -গা গরা -পা । -া -া সা সা II
বো • • লো • • • • • বো • লো • • • "স্ব প"

-া -া II সা সা সা সা । রা -া -া -া I রা রা গা গরা । গা -া -া -া I
• • নি মে ষ হা রা • • • এ শু ক তা রা • • •

। রা গা মা মা । মা -গা পা -হ্মা । পা -া পা পা । পা -া পা -হ্মা ।

০ উ ঠি বে ০ দু ০

। ধপা -া মা মা । মা -গধা ধপা মগা । মা -রা সা -া । -া -া পা পা ।

। পা -া -া পা । ধা -া ধা -না । র্সা -র্গা র্গর্রা -র্না । র্সা -না র্রর্সা -া ।

নী ০ ০ শে যে ০ এ ই যে ০ শে ষ্ কাঁ ০ দা ০

। -া -া র্সা -না । নধা -না র্সা র্সনা । র্রর্সা -া র্সা না । নধা -না র্সা র্সনা ।

০ ০ বী ০ ণা ০ র তা রে ০ প ড়ি ল ০ তা হা

। ধনা -র্সনা ধপা -া । -া -া -া -া ।

বা ০ ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০

। র্সা র্সর্গা র্গা র্রা । র্রর্সা -না ধা না । র্সা -নর্গা র্গর্রা র্সনা । র্সা -না র্রর্সা -না ।

হা রা নো ম ণি ০ স্ব প নে ০ ০ গাঁ থা র ০ বে ০

। ধা না র্সা না । ধপা -া পা -হ্মা । পা হ্মধা পা পা । পা -মা মা -া ।

হে বি র হি ণী ০ আ ০ প ন হা তে ত ০ বে ০

। সা -রা রা -গা । গা -া -া -মা । মরা -গমা মা -া । -া -া মা -া ।

বি ০ দা য় ছা ০ ০ র্ খো ০ ০ লো ০ ০ ০ যা ০

। মা -গা -পা পহ্মা । পা -া -া -া । হ্মপা -ধনা -র্সর্রা র্সনা । র্সা -ধণা ধপা -া ।

বা ০ র্ আ গে ০ ০ ০ শে ০ ০ ষ্ ক থা ০ ০ টি ০

। ধা -র্সণা ধপা -া । -া -া -া -া । রা -গা গরা -পা । -া -া সা সা ।।

বো ০ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ বো ০ লো ০ ০ ০ "স্ব প"

—০—

এপার-ওপার

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ, বার-এ্যাট-ল

তিন

শরৎ ও হেমন্ত

বড় কথা বড় করে
বিশ্বসভা মাঝে
কইতে নাহি জানি,
সোজা কথা সরল হয়ে
আমার বুকে বাজে
দোলায় হিয়া খানি।
মোর প্রাণেরি তারে তারে
নানান্ সুরে বারে বারে
কাঁপন লেগে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বময়,
সে কথাটি শুধু তোমার আর ত কারও নয়।

সে কথাটি কইব বলে
তোমার কানে কানে
আজও বেঁচে আছি,
সে কথাটি কবে তোমার
রঙ লাগাবে প্রাণে,
তবেই আমি বাঁচি।
বিশ্ব-জোড়া রঙের মেলা,
আজ প্রভাতে রঙের খেলা,
আকাশ ভরে সুনীল রঙে একী গভীরতা—
আজ প্রভাতে রঙ মেখেছে আমার মনে কথা।

আজ শরতে নবীন প্রাতে
মাঠের ঘাসে ঘাসে
করে কাণাকাণি,
আমার কথা নিয়ে তারা
ছড়ায় আশে পাশে
করে জানাজানি।
আজকে এ প্রাণ আবেগ ভরে
আলো রঙে লুটিয়ে পড়ে,
মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে গাছের ডালে ডালে
রৌদ্রটুকু দেছে ধরা আমার মায়াজালে।

আজ সকালে চেয়ে দেখি
পুণ্যা নদী খানি
ঘুম ভেঙেছে তার,
সলাজ আঁখি মিটমিটিয়ে
মোর পানেই জানি
চাইছে বারে বার।
ছোট ছোট ঢেউএর পরে
কী যে মায়া নৃত্য করে.
মোর প্রাণেরই পরশ ভাসে পুণ্যানদী জলে
প্রতিবিন্দু ঝিকমিকিয়ে সেই কথাই বলে।

মোর কথাটি ভুবন মাঝে
আপন রূপ ধ'রে
আজকে দিল দেখা,
মোর কথাই শরত প্রাতে
দূরে গগন পরে
গভীর নীলে লেখা।

তাইত তুমি মাঠের পরে
আজ সকালে ক্ষণেক তরে
ঐ ওপারে যখন আসি বারেক দাঁড়ালে,
আমার মায়ায় আপনাকে আজ আপনি হারালে।

* * * *

আজকে আমার প্রাণ বেরুলো পথে
নবীন পথে
শরৎ কালের অরুণ আলোর রথে।
আজকে এমন সকাল বেলায়
ভুবনভরা আলোর মেলায়
আপনাকে আজ পাঠিয়ে দেবো দূরে
অনেক দূরে—
চারিদিকে ভুবন ভরে বেড়াব আজ ঘুরে।

যাবো চলে কোন্ বিদেশে বনে
গভীর বনে,
আলোছায়ার দোলা দেবো মনে।
গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে
দেবো ধরা আলোর ডাকে,
চারিদিকে কিচির-মিচির খেলা
পাখীর খেলা—
বনে বনে কাটিয়ে দেবো সারা সকাল বেলা।

আবার যাব অনেক দূরে মাঠে
খোলা মাঠে,
মাঠ পেরিয়ে যাবো নদীর ঘাটে।
পাদুটি মোর ভিজিয়ে জলে
রইব শুয়ে গাছের তলে,
ঘাসে ঘাসে রৌদ্রটুকু চিনে
নেবো চিনে—
এমন প্রভাত পরাণ দিয়ে আজকে নেবো কিনে।

হয়ত যাবো ঐ দূরে ঐ পথে
গগন পথে,
যাবো ভেসে সাদা মেঘের রথে।
আকাশ ভরা নীল সাগরে
তলিয়ে গিয়ে সিনান করে—
আস্‌ব নেমে মাঠের শেষে দূরে
অনেক দূরে—
পথ হারিয়ে এদিক ওদিক বেড়াব আজ ঘুরে।

দেখব হঠাৎ মাঠের পরে এলে
আবার এলে,
ঘরছাড়া কার ডাকের সাড়া পেলে।
রৌদ্রটুকু আঁচল ভরে
ছড়িয়ে দিলে দেহের পরে
সলাজ আঁখি তুলে সরস প্রাণে
রঙীন প্রাণে
শরত প্রাতে চাইলে বারেক আমার মুখের পানে

সেই আলোতে অচেনা পথ চিনে
নিলেম চিনে ;
দিগ্বিজয়ে আকাশ ভুবন জিনে।
এই যে মায়া ভুবনভরা
তোমায় আজি দিল ধরা
তোমার রূপে রূপ নিয়েছে প্রাণ
বিশ্বপ্রাণ—
গগন ভরে বাজে বাঁশী—তোমার বিজয় গান।

* * * *

ভাবি মনে আস্‌বে সেদিন কবে,
যবে
শরৎ কালের দুপুর বেলা ছায়াপথে বনে
চল্‌ব আমি নিরিবিলি কেবল তোমার সনে,
যাবো অনেক দূরে
গাছের তলায় তোমায় নিয়ে বনে বনে ঘুরে।

শ্রান্ত হয়ে যাবো বনের শেষে,
এসে
দেখব চেয়ে হঠাৎ আকাশ ফাঁকায় দেছে ধরা,
ছোট্ট নদী ঘাসের বনে কুলে কুলে ভরা—
স্বচ্ছ কালো জল
দুপুর বেলার আলো ছায়ায় কর্‌তেছে টল্‌মল।

ক্লান্ত তোমার অবশ তনু নিয়ে,
গিয়ে
একেবারে নদীর কূলে ঘনঘাসের পরে
বস্‌ব মোরা গাছের তলে গভীর অলস ভরে।
বিছিয়ে আঁচল ভুঁয়ে
সেই খানেই এলিয়ে দেহ রইবে তুমি শুয়ে।

স্তব্ধ সবই, কারোই সাড়া নাই,
তাই
উঠব কেঁপে, হঠাৎ যখন দমকা হাওয়া এসে,
মর্ম্মরিয়া গাছের পাতা যাবে জলে ভেসে।
দূরে সঙ্গীহারা
একটা ঘুঘু ডেকে ডেকে বনে হবে সারা।

খানিক পরে হঠাৎ কখন দেখি,
একি—
থেমে গেছে মোদের কথা মোদের আলাপন,
কিসের যেন মায়ায় অবশ ধরা দেছে মন।
কেবল নদীর জলে
কুলু কুলু তোমার আমার পরাণ ভেসে চলে।

তোমার মুখে আমার অলস আঁখি
রাখি,
দেখ্‌ব তখন গভীর সুখে ঘুমিয়ে আছ তুমি,
গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যাচ্ছে আকাশ চুমি
তোমার নয়ন দুটী;
স্তব্ধ দুপুর অবশ করে তোমায় নিল লুটি।

*　　*　　*　　*

হেমন্তের বেলা শেষে বেলা নাই আর,
দিন বয়ে যায়—
অলস রৌদ্রটুকু শেষ হয়ে এল
নীরবে ঝিমায়।
মাঠে মাঠে পাকা ধানে
গভীর স্নেহের টানে
বিদায়ের ব্যথাটুকু আলো হয়ে ভাসে
চারিদিকে মোর আশে পাশে।

শরতের সুখস্বপ্ন কিছু নাই আর,
ভেঙে গেছে সব;
বসে আছি নদী কূলে, থেমে গেছে প্রাণে
যত কলরব।
চেয়ে দেখি নদী নীর
বড় শান্ত বড় স্থির
ক্লান্ত রৌদ্রটুকু ভাসে নদী জলে,
অবসন্ন আকাশের তলে।

চেয়ে দেখি দূরে ঐ পশ্চিম গগনে
আরক্ত তপন
বিদায়ের ব্যথা দিয়ে বনানীর শিরে
এঁকেছে চুম্বন।
ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে
সুনীল গগন তলে
পাখী উড়ে যায় ফিরে আপন কুলায়,
বেলা যায়—বেলা বয়ে যায়।

বেলা যায়, মোর প্রাণে বেলা বয়ে যায়—
বৃথা এ জীবন !
এখনি আঁধার হবে, মোর প্রাণে আলো
জ্বলিবে কখন ?
পশ্চিম গগন তলে
দিবসের চিতা জ্বলে
নানা রঙে লেলিহান, মোর বুক পানে
আগুনের দীপ্ত শলা হানে।

মিছে সবই মিছে মোর প্রাণের বারতা ?
মিছে এ জল্পনা ?
বিলাসের মদিরায় শুধু কি অলসে
করেছি কল্পনা ?
ধীরে ধীরে পথ ঘাট
গাছ পালা বন মাঠ
আঁধারের ছায়া লেগে বিষাদে মলিন—
বসুন্ধরা হল দীন হীন।

হেনকালে চেয়ে দেখি ওপারের ঘাটে
এলে তুমি এলে,
কলসী ভরায়ে আজও তেমনি নীরবে
ঘরে চলে গেলে।

এই তব আসা-যাওয়া,
চরণের ধ্বনি পাওয়া,
সন্ধ্যার গায়ে গায়ে পদ-চিহ্ন আঁকা,
মাঠে মাঠে পথধূলি মাখা—

এ যে মোর অঙ্গে অঙ্গে প্রতিরক্ত কণা
পুলকে নাচায়,
আমার অবশ প্রাণ প্রচণ্ড আঘাতে
ঘা মেরে বাঁচায়।
অপরূপ ঢেউ তোলে,
আকাশ পাতাল দোলে,
শিরায় শিরায় প্রাণ পূর্ণ তেজে চলে,
নয়নে নয়নে দীপ জ্বলে।

তখন চাহিয়া দেখি আকাশে আকাশে
তারায় তারায়,
তোমার নয়ন দুটি অগ্নি হয়ে ভাসে,
মোর পানে চায়।
স্তব্ধ আঁধারের প্রাণ
চূর্ণ করি শতখান
তোমার প্রাণের আলো জ্বলে মোর প্রাণে—
সত্য মিথ্যা—কেই বা তা জানে !

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্রশালায় আমরা প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী [শ্রী]যুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সাতখানি শিল্প-সৃষ্টির প্রতিকৃতি [প্র]কাশিত করিলাম। এগুলি কলারসলিপ্সু সুধিবর্গের [চি]ত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিচিত্রার পাঠকপাঠিকাগণের নিকট শিল্পী রমেন্দ্রনাথের [প]রিচয় আজ নূতন হইবে না, ইতিপূর্ব্বে বিচিত্রায় বুদ্ধের [বাণী]য় প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি বহুবর্ণ চিত্র প্রকাশিত [হই]য়া সমাদৃত হইয়াছিল।

রমেন্দ্রনাথ শিল্পীবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের [শ্রে]ষ্ঠ শিষ্যবর্গের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বভারতী কলাভবনে [তি]নি তাঁহার গুরু-প্রবর্ত্তিত শিল্প-ধারায় শিক্ষা লাভ করিলেও [সে]ই সময়েই তিনি বিদেশী শিল্প অনুশীলন করিবারও সুযোগ [পা]ইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিবার পর [ভ্র]মণের দ্বারা রমেন্দ্রনাথ তাঁহার শিল্প বিদ্যাকে সমৃদ্ধ [করে]ন। অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার চারুশিল্প শাখার অধ্যক্ষ-[রূপে] মসুলিপটনমে অবস্থান কালে তিনি কাঠের ছাঁচ [দ্বারা]ত বস্ত্র চিত্রণ বিদ্যা ও বাটিক প্রস্তুত করিবার কৌশল [অনু]শীলন করেন।

গোলাপ ফুলের গাছ যেমন যে-দেশেরই জল বায়ু হইতে [পুষ্টি]সাধন করুক না কেন ফুল ফুটাইবার সময়ে গোলাপ ফুলই [ফোটা]য়, তেমনি এই নানা দেশের নানাপ্রকার শিল্পসৃষ্টি [হই]তে আহৃত জ্ঞানের দ্বারা স্বীয় কলাজ্ঞানকে পরিপুষ্ট [করি]লেও রমেন্দ্রনাথ যে-শিল্প-সামগ্রীই রচনা করেন তাহার [মধ্যে] তাঁহার স্বকীয়তা, তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতির আনুগত্য [ফুটি]য়া উঠে। বিদেশের আহার্য্যকে পরিপাক করিয়া তিনি [নিজ] দেহের মধ্যে রক্ত বৃদ্ধি করেন যাহা তাঁহার শরীরকে [পুষ্ট] করে কিন্তু আকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করে না।

এ কথা তাঁহার চিত্রাঙ্কন বিষয়ে যেমন খাটে—মূর্ত্তি গঠন, [উড]কাট্ এবং এচিং সম্বন্ধেও তেমনি খাটে। বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় পাঠকপাঠিকাগণ চিত্রশালার মধ্যে রমেন্দ্র-নাথের মূর্ত্তি গঠনের দুইখানি নমুনা ও পূর্ণপৃষ্ঠ স্বতন্ত্র ছবিতে এচিংএর একখানি নমুনা পাইবেন। এই দুইটি সামগ্রী হইতে আমাদের উল্লিখিত কথার সারবত্তা প্রমাণ হইতে পারে। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাঁহারা বুঝিবেন তাঁহার মূর্ত্তিখানি কত সুন্দর ও যথাযথ হইয়াছে। আকৃতির প্রধান বৈশিষ্টগুলি অতি নিপুণ-ভাবে শিল্পী তাঁহার গঠিত মূর্ত্তির মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এচিং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য—কিন্তু অহল্যাঘাটের এচিং-খানির মধ্যে ভারতীয় শিল্পকলার রীতি যে সুপরিস্ফুট তাহার জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন নাই।

উড্‌কট্ রচনাতেও রমেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। আমরা বারান্তরে তাঁহার উড্‌কট্ চিত্রাবলী "বিচিত্রা-চিত্রশালায়" প্রকাশিত করিব। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বার-য়্যাট্-ল রমেন্দ্রনাথের রচিত কুড়িখানি উড্‌কটের একটি আলবাম্ প্রকাশিত করিয়াছেন। নানা প্রকার বিষয় অবলম্বন করিয়া আলবামটি শিল্পভাণ্ডারের একটি রমণীয় সম্পদ হইয়াছে। প্রবল এবং সূক্ষ্ম রেখার সামঞ্জস্যে বিষয়-বস্তুগুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আলবামটির মূল্য পঁচিশ টাকা—সুতরাং শুনিয়া সহসা মনে হইতে পারে দুর্ম্মূল্য—কিন্তু দেখিলে মনে হইবে অমূল্য। প্রত্যেক চিত্রটি শিল্পী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত স্বতন্ত্র প্লেটে সুরক্ষিত—এমন কুড়িখানি প্লেটের মূল্য পঁচিশ টাকা অধিক নহে।

বর্ত্তমানে রমেন্দ্রনাথ কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের প্রধান সহকারীর পদে কার্য্য করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি এই প্রতিভাবান শক্তিশালী শিল্পীর শিল্প-সাধনা জয়যুক্ত হউক।

সম্পাদক

শিবের বিবাহ

সাঁওতাল জননী

বুদ্ধ ও সুজাতা

সাঁওতাল নৃত্য

রাখাল বালক

মূর্ত্তিগঠন শিল্প

বিচিত্রা
৬০১

শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূর্ত্তি-গঠন শিল্প

লক্ষ্মী

Stained glass window

গুণী সুরেন্দ্রনাথ*

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

একজন চিন্তাশীল আর্ট ক্রিটিক বড় সুন্দর ব'লেছেন: "Art is the expression of a certain attitude towards reality, an attitude of wonder and value, recognition of something greater than man. Where that recognition is not art dies." বাংলার অদ্বিতীয় গুণী ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গানের পাশাপাশি যিনিই ভারতের অধুনাতন শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদের প্রাণহীন গান শুনেছেন তিনিই জানেন একথাটি কত সত্য।

সাতষট্টি বৎসর বয়সে বাংলার গুণীমুকুটমণি সুরেন্দ্রনাথ গত ভাদ্রমাসে তাঁর ভাগলপুরের ভবনে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ ক'রেছেন। হয় তো গুণী, স্রষ্টা, রচয়িতা সুরেন্দ্রনাথের গুণপনা বিচারের সময় এ নয়। আজ আমরা তাঁর বিয়োগে কাতর—বাংলার সত্য সঙ্গীতানুরাগীদের মনে তাঁর তিরোধানের বেদনা পুঞ্জীভূত। কিন্তু তবু সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু আমি আজ বল্‌ব—তাঁর অমর প্রতিভার তর্পণচ্ছলে। কারণ ভারতে যে কয়টি মুষ্টিমেয় স্রষ্টা গুণী ভারতীয় সঙ্গীতের লুপ্ত গৌরবের তথা অদূর-নবজন্মের আভাষ দিতে পারতেন তিনি ছিলেন যে তার প্রধান পুরোধা। বাংলায় বাংলাগানের যে নূতন ও সমৃদ্ধ বিকাশ হবে তিনি যে ছিলেন তার অন্যতম রূপকার। এককথায় শ্রুতিপথে বাগ্বাদিনী জগতে অতুলন রাগসঙ্গীতের দোলা ভারতবর্ষে যে অমর ঝঙ্কার রূপায়িত ক'রে তুল্‌তে চান বর্ত্তমান যুগে, সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়বীণায় ধ্বনিত হ'য়েছিল যে তার প্রথম রেশ—বাংলাদেশে। তাঁর দেহ রক্ষার মুহূর্ত্তেও তাই তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করছি।

প্রথমেই মনে হয় তাঁর অপরূপ সুকণ্ঠের কথা। তাঁর কণ্ঠ যিনি শুনেছেন তিনিই জানেন সুকণ্ঠের পরিণতি কতদূর হ'তে পারে। শুধু অপরূপ মিষ্টকণ্ঠ নয়। যেমন তার জোয়ারি, তেমনি তার সুরেলা বাহার, তেমনি তার দরদ, তেমনি সমৃদ্ধি, তেমনি ঔদার্য্য, তেমনি রেঞ্জ। সমগ্র ভারতে সব প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের গানই আমি শুনেছি, কিন্তু অকুতোভয়ে বল্‌তে পারি—সুরেন্দ্রনাথের মতন কণ্ঠমহিমা কখনো কোথাও শুনি নি না পুরুষ গায়কের মধ্যে না বাইজীদের মধ্যে। সুরের নিছক মিষ্টতায় এক কাশীর বিখ্যাত মোতিবাই তাঁর একটু কাছাকাছি আস্‌তে পারতেন বটে, কিন্তু গলার গাম্ভীর্য্য ও বিশেষ করে রেঞ্জে গায়িকারা তো কোনো দেশেই পুরুষদের সমকক্ষ ন'ন। তবু আমাদের দেশে আজকাল অধিকাংশক্ষেত্রে বাইজীরা ওস্তাদদের চেয়ে ঢের বড় গুণী, গানের মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার বড় দরদী পূজারী। কেবল সুরেন্দ্রনাথের মতন দুচারটি গুণীর কণ্ঠ দরদে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার ব'লেছেন "Many persons are almost incapable of expressing by ascents and

* রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভাগলপুরের বিখ্যাত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার রামরতন মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৬৪ সালে জন্ম। ১৮৮৭ সালে বি এ অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। পর বৎসরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। "সাহিত্যে" "বিচিত্রায়," "ভারতবর্ষে," "উত্তরায়," প্রভৃতি বাংলার নানা পত্রিকায়ই তাঁর অপূর্ব্ব মৌলিক রসিকতাপূর্ণ বহু গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকাকারে তাঁহার মাত্র কয়েকটি গল্প প্রখ্যাত "কর্ম্মযোগের টীকায়" সম্বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ, জামাতা কুমার শশিশেখর রায় ও ভাগিনেয় মেঘেন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—সুরেন্দ্রনাথের সমস্ত ছোট গল্প, সঙ্গীতনিবন্ধ প্রভৃতি একটি খণ্ডে অবিলম্বে প্রকাশ করুন তাঁহার ছোট জীবনী সমেত। বাংলায় সে পুস্তকের সমাদর অবশ্যম্ভাবী। গত ভাদ্রমাসে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

descents of voice, any of the gentler feelings." সত্য। কারণ খুব কম গায়কের কণ্ঠেই বীণাপাণি তাঁর সোণার কাঠি ছোঁয়ান—বিশেষ আমাদের ওস্তাদ-তর্জ্জিত দেশে। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে কিন্তু শ্বেতভুজা দুহাতে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর এই মিষ্টতার মন্দাকিনী—লালিত্যের মুক্তধারা। তাঁর কণ্ঠ যে কী আশ্চর্য্য সাবলীল ছিল, কী রঙীন ছিল, কি দীপ্ত মনোহর ছিল তা যাঁরা তাঁর গান না শুনেছেন তাঁরা কোনোমতেই এমন কি কল্পনাও করতে পারবেন না। একান্ত সহজতার—effortlessness সঙ্গেই তিনি ফুটিয়ে তুল্‌তেন যে-কোনো সূক্ষ্মতম আবেগ। শুধু gentler feelings-ই নয়, গরিমা, বর্ণিমা, মেদুরতা, প্রবলতা, মন্দ্র-গাম্ভীর্য্য তার-স্নিগ্ধতা সবই তাঁর ছিল যেন ইঙ্গিত-অধীন। একজন বড় ফরাসী কবি সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক Jules Lemaître যে-প্রশস্তি জ্ঞাপন ক'রেছেন সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলা চলে অবিকল সেই কথা:—"Il fait de tous ces mots ce que d'autres n'en feraient pas : Il y fait passer le phosphore que les grands poètes ont au bout des doigts."

—"সাধিতে যাহা পারে না হেথা অপরে
মোদের গুণী শবদে তা-ই বিতরে
হেলায় কবি যে-ঝিকিমিকি জ্বালে গো
মোদের গুণী অঝোরে তা-ই ঢালে গো।"

সত্যই সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠের ছিল এই বিরল সম্পদ: God's plenty. কণ্ঠস্বরে একাধারে এতগুণ—দুর্লভ—যেকোনো দেশেই।

বেশ মনে আছে আমার শৈশবে ও বাল্যে পিতৃদেবের ওখানে তো কত গানই শুনেছি, কিন্তু নিছক কণ্ঠস্বরের মনোহারিত্বে এমন মুগ্ধ হ'য়েছি মাত্র দুজন গুণীর গানে—বাঙালীর একমাত্র সত্যকার বড় ধ্রুপদী ৺অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বাঙালীর একমাত্র সত্যকার বড় খেয়ালিয়া সুরেন্দ্রনাথ।

বাল্যে কোনো ললিতকলারই শ্রেষ্ঠতম আবেদন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় না। কিন্তু তবু যে সুরেন্দ্রনাথের উচ্চতম শ্রেণীর খেয়াল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পারতাম সে শুধু তাঁর কণ্ঠস্বরের মাদকতায়। বেশ মনে আছে—আমার সর্ব্বাঙ্গ সে-মিষ্টতায় যেন রিম ঝিম ক'রে আস্‌ত। তাঁর সুশ্রী উজ্জ্বল আনন ও সরস ব্যক্তিত্বও অবশ্যই এ আবেশের অন্যতম কারণ ছিল, কিন্তু শুধু তা-ই নয়। আসলে ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো, দে না মা সাধ হ'য়েছে পরিয়ে দেনা মাথায় দুটো," গানটি তো কত শতবারই তাঁর মুখে শুনেছি। ওর তানের বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধি ও অপরূপ মাধুর্য্যে সে-বাল্যে রস পাওয়া আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব ছিল। কিন্তু তবুও মনে পড়ে শুধু এ গন্ধর্ব্বকণ্ঠ গুণীর কণ্ঠস্বরের যাদুতে ভক্তের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ কতরকম রূপই না পরিগ্রহ করত আমার বালক কল্পনায়। যখন তিনি অন্তরায় গাইতেন:

মা ব'লে ডাকব তোরে হাততালি দে' নাচ্‌ব ঘুরে
দেখে মা হাস্‌বি কত আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো

তখন তাঁর তার-সপ্তকের অজস্র তানের উচ্ছল প্রবাহে নয়নের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ত বাংলা গানের মধ্যে এক নূতন সম্ভাবনা। তখন উচ্চসঙ্গীতের কতটুকুই বা বুঝতাম! কিন্তু তবু অজ্ঞাতে সেই বাল্যের মাহেন্দ্র লগ্নে তাঁকেই প্রথম গুরু-পদে বরণ করি—ও তিনিও আমাকে শিষ্যপদেই বরণ ক'রে ধন্য ক'রেছিলেন। তাঁর কাছে কত যে শিখেছি তা বল্‌বার নয় তাই আজ তাঁর তিরোধানের দিনে আমার এই সর্ব্বোত্তম দীক্ষাগুরুর উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।

আবাল্য তাঁর গানই আমার অবচেতনার নিত্য নব ছন্দে উপ্ত ক'রে গেছেন তিনি। আবাল্য বিভোর হ'য়ে শুন্‌তাম তাঁর গান। অবশ্য শিল্পকলায় বালকের নিন্দাপ্রশংসার তেমন মূল্য থাকতেই পারে না, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গান যত বয়স হ'য়েছে ততই যে বেশি ভালবেসেছি, যতই বুঝতে শিখেছি ততই যে তার মধ্যে গভীরতর স্পর্শ পেয়েছি একথার মূল্য নিশ্চয়ই আছে! পরে ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপরপ্রান্ত ঘুরেছি—শুধু গান শুনতে। কিন্তু যতই শুনেছি ততই বুঝেছি সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা কি স্তরের ছিল। মহত্ত্বের ধর্ম্মই এই সে গ্রহীতাকে দেয় তার গ্রহণ-অনুপাতে। কত নামজাদা ওস্তাদের গান শুনেছি—যত বয়স হ'ত ততই তাদের গুণপনার মধ্যে নানা অসম্পূর্ণতা

চোখে পড়ত ও বালকের উচ্ছ্বাস-জোয়ারে আস্‌ত ভাঁটা। ছোট বই, ছোট কবি, ছোট শিল্পীর ক্ষেত্রে এম্‌নিই হয়। কিন্তু বড় বই বড় কবি বড় শিল্পী গ্রহীতার প্রবর্দ্ধমান মনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বাড়ে যেহেতু বড়র ধর্ম্মই ওই। মনে পড়ে বাল্যে ও কৈশোরে কত গায়ক গায়িকার গানই না মুগ্ধ হ'য়ে শুন্‌ত আমার গান-পাগল তৃষিত বালক-মন। কিন্তু যতদিন যেত তাদের মোহ ঘনিয়ে না উঠে যেত পাণ্ডুর হ'য়ে। একা সুরেন্দ্রনাথ আমার বয়োলব্ধ নিবিড়ায়মান রসস্পৃহার ও নবনবোন্মেষী অনুসন্ধিৎসার খোরাক সমানে জুগিয়ে যেতেন। তাঁর এক একটি গান অজস্রবার শুনেছি—কিন্তু কখনো একঘেয়ে হয় নি, পুরোনো হয় নি! মনে পড়ে ভাগলপুরে, কলকাতায়, পুরুলিয়ায় তাঁর "পটতোরা" ব'লে একটি ইমন কতবারই না শুনেছি, "বনঘন মুরলিয়া" ব'লে একটি মালকোষ, "রঙ্গিলে লালে" ব'লে একটি বাহার "ঘাঁউ ঘাঁউ ঘন গরজে" ব'লে একটি দেশ, "বিয়োগা বিধুরা রাজবালা" ব'লে একটি ভৈরবী "এই তো কানন গো" ব'লে একটি কীর্ত্তন—সে কত গান! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কোনো গান কখনো দুবার এক রকম শুনি নি। সেইজন্য তাঁর আরও কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে আমি প্রায়ই বলাবলি করতাম যে তাঁর গান শেখা কত শক্ত! তাঁর কণ্ঠে নিত্য এত নতুন নতুন ঢঙের তান মীড় ও স্বরবিন্যাস তাঁর অফুরন্ত কল্পনার ঐশ্বর্য্যে দীপ্যমান্ হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ত যে শিক্ষার্থী দিশেহারা না হ'য়েই পারত না। শিখ্‌ব কী—চিত্ত ছেয়ে যেত প্রতিদিনের অভিনবত্বের আবেশে। কী দরদ!—কী চাল! কী লচক! কী বৈচিত্র্যের চমক!—তানের কতরকম উদ্ভাবনা!—রসের সে কী প্লাবন! কূলে কূলে ব'য়ে চ'লেছে ভরা নদী। কোথাও কি এতটুকু দৈন্য আছে? এতটুকু অগভীরতা? এতটুকু স্রোতের অভাব, গতির বাধা-পাওয়া কল্পস্বনের দৌর্ব্বল্য? কখনো এ সুরের প্রবাহিণী চলে হৃদয়ের শত উষরতা ও অনুভবের দৈন্যকে স্নিগ্ধ ও উর্ব্বর ক'রে দিয়ে, কখনো বা সে ব'য়ে যায় তার হাজারো হেমবিশ্বের লাস্যলীলায় অপার বিস্ময় জাগিয়ে, কখনো সে জাগে হৃদয়ের নিহিত কুঞ্জে আনন্দ-বেদনা-নিষিক্ত লাখো গোলাপ ফুটিয়ে, কখনো কখনো বা সে বাণ ডাকিয়ে দিয়ে যায় নৃত্যোচ্ছল রোমাঞ্চ-শিহরণে অনুভবকুণ্ঠ হৃদয়ের সব জড়িমাকে ভাসিয়ে দিয়ে।

তাঁর গান শুনে নিত্যই মনে হ'ত অমর কবি ভবভূতির সেই—"স্তোয়স্তেবাপ্রতিহতরয়ঃ সৈকতং সেতুমোঘঃ।"

—যে-স্রোতোধারা বাধারে বাধা বলিয়া নাহি মানে
সৈকতের বাঁধেরে ভাঙে উছল অভিমানে।

কত সময়ে হৃদয়ের কত অন্ধকার তাঁর যাদুকণ্ঠ মুহূর্ত্তে ক'রেছে দূর—মনে হ'য়েছে কবি মরিসের সেই—

The wind that sighs before the dawn
Chases the gloom of night,
The curtains of the East are drawn
And suddenly—'tis light!

—যে পবন ফেলে দীরঘশ্বাস নব-উদয়ের আগে
নিশির তিমির পলায় পরশে তার!
প্রাচী-গুণ্ঠন পড়ে খসি,'—ও কী! সে আননে অনুরাগে
ঝরিল সহসা আলোক গঙ্গাধার!

সত্য—সত্য! কতদিনই না মনে হ'য়েছে যে এক সুরেশ্বরীর প্রেরণায়ই এ-ইন্দ্রজাল মর্ত্তে নামে। শুধু হায়! সুরেন্দ্রনাথের মতন কয়জন সুরসাধক সে-দেবীর প্রেরণাকে অনাবিল রাখ্‌তে সক্ষম তাঁদের গোপন অন্তরের পূত ধ্যানলোকে? কয়জনা পারেন ভগীরথের তপস্যায় এ অরূপ-ভাগীরথীকে ধূলির ধরণীতে নামিয়ে আন্‌তে? কয়জনার ভাগ্য হয় শ্বেতসরোজবাসিনীর অমল ধবল পদাম্বুজ হৃদয়-কমলে ধারণ করবার?

এ সব যে ভক্তের ভক্তি-উচ্ছ্বাস নয় তা হয়ত যাঁরা সুরেন্দ্রনাথের গান শোনেন নি তাঁদের বোঝানো যাবেই না। কিন্তু তাঁর সুর-অলকনন্দাধারে বিধৌতগ্লানি হবার সৌভাগ্য যাঁদের হ'য়েছিল তাঁরাই জানেন যে এ তর্পণ একটুও বাড়াবাড়ি নয়। অবশ্য যে কেউ যে তাঁর গানের মহিমা বুঝবে এমন কথা বল্‌লে সে হবে পাগলের মতন কথা। দরদী হওয়া চাই—মরমী হওয়া চাই—সুরপাগল হওয়া চাই। কারণ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম সুর-মূর্চ্ছনায় যে-সব পেলব সৌন্দর্য্যের মায়াজাল প্রতি মুহূর্ত্তে সৃজন করতেন তার লাবণী ও অপূর্ব্ব ছন্দিমা স্থূলদৃষ্টি স্থূলশ্রুতি বে-দরদীর জন্যে নয়। He

who hath ears let him hear একথা বলা যায় সব বড় আর্ট সম্বন্ধেই। তাই আমি একথা বলতেই পারি না যে অরসিকের কাছেও তাঁর সুর-নিবেদন সার্থক হ'ত। তবে এ কথা বোধ হয় গৌরব করেই বলতে পারি যে সুরের প্রেমিক তাঁর গানের মধ্যে যে স্বাদ পেত সে এক অননুভূতপূর্ব্ব স্বাদ। তার কাণে তাঁর স্বরলহরী নিত্য আলোক লহরীর তালেই উঠত বেজে। এক কথায় সুরেন্দ্রনাথের গান তার কাছে প্রতিভাত হ'ত revelation এরই ছন্দে।

মনে পড়ে কতদিন এক একটি রাগের আলাপ ও বিস্তার শুনেছি—সে কতক্ষণ ধ'রে! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যেও কি পুরোণো হ'য়েছে? সে কি পুরোণো হবার? সে প্রতিভাবতারের কণ্ঠ দিয়ে মীড় মূর্চ্ছনা গমক মন্দ্রমধ্যতার সপ্তকের স্বরগ্রামে যে কী নিত্যনব ছন্দে খেলে যেত! কোনো সময়ে তাঁর তানালাপের রূপ ছিল যেন খাপখোলা তরবার—বিদ্যুৎগতি, ধারালো, দীপ্যমান্; কোনো সময়ে বা "বসনে পরিধূসরে বসানা" ছায়াগুণ্ঠিতা বিরহিণীর; কোনো সময়ে শান্ত উদয় গরিমার চলদীপ্তির; কখনো বা অলস মধ্যাহ্নের পাতাঝরা দীর্ঘশ্বাসের; কখনো শারদ প্রভাতে নির্মেঘ নীলিমার,—সে কতরকম উপমা বা মূর্ত্তি—image—যে শ্রোতার চিত্তপটে ফুটে উঠত তাঁর গানের কিরণসম্পাতে! কবি যেমন চলচ্ছক্তিহীন শব্দকে নিমেষে ছন্দের সঞ্জীবনোষধিরসে উজ্জীবিত ক'রে তোলেন, চিত্রী যেমন কয়েকটি শুদ্ধ রেখায় এক সমাপ্তিহীন গতিপ্রবাহকে লীলায়িত ক'রে তোলেন, প্রিয়জন যেমন একটি নীরব চাহনিতে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত আনন্দ-বেদনাকে তরঙ্গায়িত ক'রে তোলেন, সুরেন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর মীড় দিয়ে আঁকতেন ছবি, তাল দিয়ে সৃজন করতেন কাব্য, সুরের উদাত্ত স্থিতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতেন স্বপ্নরাজ্যে।

এ বেদনার বা স্তুতির আতিশয্য নয়। বস্তুতঃ তিনি যে-ভঙ্গীতে একই রাগের নানা তান লয় ও মূর্চ্ছনার প্রকারভেদে রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ বইয়ে চল্‌তেন সে প্রেরণা এক বাণীর বরপুত্রের কণ্ঠেই দেখা দেয়।

আর কী আশ্চর্য্য ছিল তাঁর ঢং! এখানে ঢং সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলতেই হবে—যেহেতু সুরেন্দ্রনাথের একটা প্রধান সম্পদ ছিল তাঁর ঢঙের বাহার। হিন্দুস্থানী গানের চাল বা ঢং বল্‌তে যে ঠিক্ কী বোঝায় খুব কম বাঙালীই তা জানেন—কারণ বাঙালী মূলতঃ সঙ্গীতপ্রিয় জাতি নয়—কাব্যপ্রিয় (যদিও বাঙালী নিজে একথা জানেও না—এবং জানেনা ব'লেই বাঙালীর কণ্ঠে হিন্দুস্থানী গান বা নিছক্ সুরবৈচিত্র্য প্রায়ই উত্‌রোয় না) কিন্তু আমি যত বাঙালী গায়কের গান শুনেছি তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই জান্‌তেন ঢং কাকে বলে।* আরও আশ্চর্য্য এই যে হিন্দুস্থানী গান হিন্দুস্থানী ঢঙে গেয়েও তিনি তার মধ্যে এক অপূর্ব্ব বাংলা সৌকুমার্য্য এনেছিলেন—যাকে বলা যেতে পারে colour; এ বস্তু এক কল্পনাপ্রবণ বাঙালীই আনতে সক্ষম। এই কারণে তাঁর হিন্দুস্থানী গানে এমন এক মহিমাময় স্বকীয়তা ফুটে উঠ্‌ত যা এমন কি গুণিরাজ আবদুল করিমের মধ্যেও মেলে না। বস্তুতঃ এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে তুলনা করতে হ'লে হিন্দুস্থানীর কাছে যাওয়া চলবে না যেতে হবে ঐ বাঙালীরই কাছে—[যে বাঙালী অবশ্য হিন্দুস্থানী ঢঙে নিজেকে রসিয়ে তুল্‌তে পেরেছে]—যেমন তন্ত্রিরাজ আলাউদ্দীন খাঁ, বা তাঁর তরুণ শিষ্য বাঙালীর গৌরব তিমিরবরণ। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বাঙালীর মধ্যে আর কেউই নেই ভরসা করে যাঁর নাম করা যেতে পারে—সত্য হিন্দুস্থানী ঢঙের রসয়িতা ব'লে। আর গায়কদের মধ্যে বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথের মতন খেয়ালিয়া অদূর ভবিষ্যতে মিলবে ব'লে ভরসা তো হয় না।

ভরসা না হওয়ার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ তো এই গেল ঢঙ। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ খেয়াল বাংলা ঢঙে গাওয়াও যা আর হারমোনিয়ামে রাগের আলাপ করাও তাই। যিনিই রসজ্ঞ তিনিই একথা জানেন—এবং যিনি ঢঙ্ সম্বন্ধে রসজ্ঞ নন, তিনি সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা

*৺অঘোর চক্রবর্ত্তীর গান আমি বাল্যকালে শুনেছি, তাই কিছু বলতে পারি না জোর ক'রে তার ঢং সম্বন্ধে। বাঙালীর মধ্যে এক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য গায়ক—সত্য হিন্দুস্থানী চাল কি বস্তু জানেন। তার কারণ অঘোর চক্রবর্ত্তী ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখতে মেটবুরুজে নিজ যেতেন ওয়াজিদ আলি শা'র বিখ্যাত সভাগায়ক আলিবক্সের কাছে। বামাচরণ বাবুর কাছে তবু সে সময়কার ধ্রুপদেরও একটু আমেজ পেয়েছি।

মস্ত দিক্ সম্বন্ধেই অজ্ঞ র'য়ে গেছেন বলা যেতে পারে। একথাটা বিশেষ ক'রে বলছি শুধু দেখাতে কি কারণে সুরেন্দ্রনাথ বিরাট প্রতিভা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এক রকম অজ্ঞাতই র'য়ে গেছেন।

কিন্তু শুধু ঢঙই সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র সম্পদ ছিল না একথা বলাই বেশি। তাঁর আর একটি মহান্ সম্পদ ছিল এই যে তিনি ছিলেন প্রায় যাকে বলে audience-proof। তাঁকে দুজন শ্রোতার সাম্‌নেও যেমন তদ্‌গতচিত্তে গাইতে দেখেছি—দুশো: জনের সামনেও ঠিক তেমনি। বস্তুত: তিনি গাইতেন কিন্তু বাহবার জন্যে না; রাগের মধ্যে চমকপ্রদ যোগাযোগ ঘটাতেন কিন্তু চম্‌কে দেবার জন্যে না; অপরূপ স্বরসম্পাতে শ্রোতার সঙ্গে দরদের বন্ধন অবলীলাক্রমে গ'ড়ে তুল্‌তেন অথচ শ্রোতার মুখ চেয়ে না। ওস্তাদদের মধ্যে নিত্য যে বাহবাস্ফোটের ভাব সুকুমার-হৃদয় শ্রোতাকে নিত্য পীড়া দেয়—এ নিরভিমান গুণীর গানে সে তাল ঠোকার, জাহির করার ভাবটি একেবারেই ছিল না। তাই তো তাঁর গুণিহৃদয়ের মনোজ্ঞ স্পন্দনে দরদীর হৃদয়তন্ত্রীও কেঁপে উঠত এত সহজে। সত্য আত্মপ্রকাশ যেখানেই দেখি, অকৃত্রিম আবেগস্ফুরণ যেখানেই দেখি সেখানেই যে আমরা তাঁকে ছুঁই যিনি সব প্রকাশের পিছনে থেকে সৃষ্টিকে সার্থক করেন। "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা" ছিল তাঁর বিনয়গৌরবা প্রতিভা। ভারতীয় সঙ্গীতের এ-অধঃপতনের যুগে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে তাই সত্য রসজ্ঞমাত্রেই অভিনন্দন করবেন। অবশ্য ওস্তাদেরা চিরদিন তাঁর নিন্দাই ক'রে গেছে। আমরা কত সময়ে অধৈর্য্য হ'য়েছি—কত আসরে তাঁর অপমানে; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে অপমান কর্‌বে তাদের সাধ্য কি? যিনি জন্ম-নিরভিমান অপমান কি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে? ওস্তাদেরা তাঁকে বুঝত না। বুঝবে কোত্থেকে? সব দেশেই একদল গুণী থাকেন যাঁরা হচ্ছেন সুরের পালোয়ান—acrobat, যাঁদের বিজ্ঞম্মন্য সমালোচনা সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার ব্যঙ্গ করে বলেছেন: "Musical critics often give appplause to compositions as being scientific"; এই দলের গুণী ও গুণজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথের গান শুনে শুধু বলত "হাঁ, মিঠা গাতে হেঁ।" কারণ তাঁর গানে না ছিল সুরের মল্লযুদ্ধ, না ছিল তালের লম্ফঝম্প, না ছিল আত্মগুণকীর্ত্তন, এবং সর্ব্বোপরি না ছিল বিজ্ঞম্মন্যদের সায়েন্টিফিক "তৈলাধার-পাত্র কিংবা পাত্রাধার-তৈল" তর্কের অবসর। তিনি অনেক সময়েই রাগ গাইতে গাইতে বদলাতেন। সে প্রেরণা এলে কখনো তাকে তথাকথিত রাগশুদ্ধতার খাতিরে অপমান কর্‌তেন না। শুদ্ধভাবে রাগালাপ করবার কৃতিত্বের তাঁর অভাব ছিল না—অথচ শুচিবাই তাঁর ছিল না একেবারেই। আমাকে কতবার মালকোষে কোমল রে, কেদারায় কোমল নি, ভৈরবীতে কড়ি মধ্যম প্রভৃতি লাগিয়ে শোনাতেন। বল্‌তেন "ওস্তাদেরা এতে এত অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠেন—জানোই তো কিন্তু কী করব? এতে আমি দোষ দেখি না—এমন কি ভস্ম হবার ভয়েও না।"

এতে দোষ দেখতেন না কারণ তিনি ছিলেন, বৈয়াকরণিক না—গুণী টীকাকার না—স্রষ্টা, শুষ্ক সমালোচক না—দরদী। তাই তিনি রাগের বিস্তারে অসামান্য শিল্পী হ'য়েও কোথাও কোনো গানে নতুন কিছু সৌন্দর্য্য দেখলেই আনন্দে শিশুর মতন আত্মহারা হ'য়ে উঠতেন। আমার পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্র লালের অনেকগুলি খেয়াল-ঘেঁষা গানই সুরেন্দ্রনাথের গান শুনে রচিত। পিতৃদেব অনেক গানের সুররচনায় সময়ই তাঁর কাছে নানা নির্দ্দেশ গ্রহণ করতেন। সুরেন্দ্রনাথের কাছে তিনি শিখেছিলেনও অনেক গান,—তাই তো তাঁর রচনায় ভারতীয় রাগসঙ্গীতের লীলায়িত সৌন্দর্য্য এত বেশী প্রকট—যার জন্যে তাঁর গান গুণীর কাছেও এত সমাদর পেয়েছে। কিন্তু যখনই তিনি কোনো রাগে চ্যুতি ঘটাতেন বা মিশ্র করতেন মিষ্ট হ'লে তাতে সবচেয়ে খুসি হতেন সুরেন্দ্রনাথ। অতবড় ওস্তাদ হয়েও ও রাগসঙ্গীতের মর্ম্মে প্রবেশ করেও রাগের বাঁধাবাঁধি দিয়ে তিনি কখনো নিজের রসবোধকে পিষে মারতেন না। এককথায়, তিনি গান গাইতেন বা বিচার করতেন খোলা মন নিয়ে। ওস্তাদরা এর পরেও তাঁকে ভস্মীভূত করতে না চেয়ে পারে?

আর এই জন্যেই সুরেন্দ্রনাথকে কেউ ওস্তাদ বল্‌লে—অসামান্য ওস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে কুণ্ঠিত হতেন তিনি নিজে। এমনকি ওস্তাদি আসরে পারতপক্ষে গাইতেও তিনি চাইতেন না। একবার কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে

বিখ্যাত আবদুল করিমের গান হয়। সুরেন্দ্রনাথেরও সে আসরে গাইবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি এলেন না। পরে দেখা হ'লে কেন এলেন না জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন: "ওস্তাদি আসরে আমার গান কি কখনো জমতে দেখেছ দিলীপ? না ওদের সামনে গেয়ে আমাকে আনন্দ পেতে দেখেছ? ওস্তাদদের কাছে গাওয়া উচিত ওস্তাদদের।" ব'লে, মুখটিপে তাঁর অপরূপ স্নিগ্ধ ভঙ্গীতে হেসে বললেন: "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—এ আর বুঝলে না।" অল্প দুএকটি কথা ব'লে সুকুমার ব্যঙ্গের সঙ্গে এম্‌নি হাসিই হাসতে পারতেন তিনি দরকার হ'লে!

ওস্তাদদের নিয়ে এমন কতরকম ঠাট্টাই যে তিনি কর্‌তেন! অথচ তার মধ্যে কোথাও কি এতটুকু দাহ ছিল? অথচ ওস্তাদদের মধ্যে সত্য গুণপনার তিনি আন্তরিক সম্মান করতেন—কারণ তিনি ব্যঙ্গ-প্রিয় হলেও মনে প্রাণে ছিলেন যাকে বলে—"কদরদান"—reverent; কিন্তু কালোয়াতের নানা মুদ্রাদোষের নকল, নানা ভঙ্গির সম্বন্ধে স্নিগ্ধ উপভোগ্য ঠাট্টা, কত আসরে কত কি হাস্যজনক ব্যাপার ঘটত তার নানান্ কাহিনী এমন অপরূপ ঢঙেই বলতেন! এমন রসিক "গপ্পে" লোক জীবনে কমই দেখেছি। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন "কোষ্ঠীর ফলাফল" প্রণেতা রসরাজ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বজাতি।

তাঁর ওস্তাদদের নিয়ে রসিকতার একটিমাত্র উদাহরণ দেই, কারণ এ প্রবন্ধে বেশি উদাহরণ দেওয়ার স্থানাভাব। তাঁর অনুপম বলার ভঙ্গী বা টোন্ তো লিখে ফোটানো যাবে না—তাই তাঁর কথাগুলি সরস করবার জন্যে ছড়ায় বলি—কল্পনাশীল পাঠক-পাঠিকা এ থেকে তাঁর সরস ভঙ্গী কল্পনা ক'রে নেবেন এই মিনতি।

তখন তিনি কলকাতায় ছিলেন একটি বাসা ভাড়া করে। প্রায়ই সন্ধ্যায় তার ওখানে আসর হত, একতলায়। একদিন যেতেই বললেন:

"জানো দিলীপ, নাতনি আমার দুধ খেতে না চায়,
কোনো মতেই ঘুম ভাঙে না।"—"ঘুমিয়ে কি দুধ' খায়?"
—"নাহে, পরম দয়াময় যে দিলেন একটি বর
একটি বিরাট্ ওস্তাদ আসেন নিত্য সাঁঝের পর।"
—"তাতে কি?"—"বাঃ! হুঙ্কারে তার আঁৎকে ওঠেন মেয়ে
তিনতলাতে—ঢক্ ক'রে খান দুধ মহাভয় পেয়ে।"

ওস্তাদদের নিয়ে এ ধরণের ঠাট্টার তাঁর আর অন্ত ছিল না, এবং বোধ করি সেই জন্যেই নিজেকে ওস্তাদ বলে পরিচয় দিতেন না ভুলেও। অথচ ওস্তাদের তানের ক্ষমতা, দম, রাগজ্ঞান, লয়দুরস্ত্, সুরের কর্ত্তৃত্ব এ সবই তাঁর ছিল পুরোপুরিই। সারা ভারতবর্ষে ঘুরে সমস্ত বড় বড় ওস্তাদের গান শুনেই আমি নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে রাগের যে বিকাশ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব্ব ঢঙে নিত্য প্রাণময়, গতিময়, দীপ্তিময়, ক'রে তুল্‌তেন সে রকম ভাবে রাগের পূর্ণ বিস্তার করতে শুনেছি—মাত্র একজন ওস্তাদকে। তিনি ভারতের অদ্বিতীয় গায়ক—আবদুল করিম খাঁ। তাই এ প্রবন্ধের সমাপ্তি টান্‌বার আগে তাঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের একটু তুলনা ক'রে দেখাবার প্রয়াস পাব সুরেন্দ্রনাথ কোথায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

ওস্তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে আলাপের ঢঙে* রাগের রূপবিস্তার-নৈপুণ্যে আবদুল করিমের মতন গায়ক—ইনি আলাপচারী গায়ক—ভারতে দুটি নেই। এঁর (তথা চন্দন

---

* আমি ধ্রুপদ আলাপের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে এমন একজন ধ্রুপদীও আমি শুনিনি যাঁর ধ্রুপদে সত্য নিবিড় রস ফুটে ওঠে। এক চন্দন চৌবের তথাকথিত ধ্রুপদে প্রাণকাড়া স্বরস্থিতি ও মীড়ে ধ্রুপদের খানিকটা রস ফুটে ওঠে বটে। কিন্তু চন্দন চৌবের ধ্রুপদকে ধ্রুপদ কেন বলা চলে না…ধ্রুপখেয়াল বলাই সঙ্গত—তার কারণ "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়" বিশদ ক'রে বলেছি। তার মোট কথা এই যে ধ্রুপদের নানা গুণ তাঁর গানে থাকা সত্ত্বেও তার প্রধান গুণটিই নেই—যথা, ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য ও স্থাপত্য (architecture)। বস্তুতঃ সারা ভারত ঘুরে একটিও এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ধ্রুপদীও দেখতে পাইনি। শুধু আমি না পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও পান নি। তাই কয়েক বছর আগে আমার কাছে দুঃখ ক'রে বলেছিলেন যে ধ্রুপদ আজকের দিনে ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে। ধ্রুপদের এই গঠন-গাম্ভীর্য্য ও স্থাপত্য-কারু যদি আজকের দিনে কারুর গানে একটুও পাওয়া যায় তবে তিনি বোধ হয় কাশীর হরি নারায়ণ বাবু। রামপুরের ছম্মণ সাহেব ও মহম্মদ আলীর সঙ্গে তানসেনের ঘরোয়ানা ধ্রুপদের অন্ত্যেষ্টিসৎকার হয়ে গেছে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

চৌবের) সম্বন্ধে আমার "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়" যা লিখেছি তার পুনরুক্তি করলে হয়ত ভাল হ'ত—কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তা করতে পারছি না। এখানে সংক্ষেপে শুধু সুরেন্দ্রনাথের গরিমার বৈশিষ্ট্যটি নির্দ্দেশ করবার জন্মে এই দুই অনুপম খেয়ালীর একটু তুলনামূলক সমালোচনা ক'রেই ক্ষান্ত হব।

আবদুল করিমের গানে কর্ত্তৃত্ব—mastery—সুরে দখল, রাগের জ্ঞান অবশ্যই সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি। গলায় তিনি বীণার সূক্ষ্ম কাজ "বাৎলাতে" সক্ষম। আমি স্বকর্ণে তাঁকে পর পর অনেকগুলি পর্দ্দায় কোমল অতি কোমল শ্রুতি গলায় "বাৎলাতে" দেখেছি—(তাঁর গলার শ্রুতি নিয়েই ক্লেমেন্টস্ সাহেব তাঁর বাইশ শ্রুতির হার্মোনিয়াম তৈরি ক'রেছিলেন)—এবং এযে কত কঠিন তা জানেন এক নিপুণ গায়ক। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল "সঙ্গীত সময়সার" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ক'রেছেন :

'তে তু দ্বাবিংশতির্নাদা ন কণ্ঠেন পরিস্ফুটাঃ।
শক্যা দর্শয়িতুং তস্মাদ্বীণায়াং তন্নিদর্শনম্॥

কিন্তু আবদুল করিমের কাছে আমি কিছুদিন স্বরসাধনা শিখেছিলাম ব'লেই জানি যে তিনি এ "দ্বাবিংশতির্নাদাঃ" কণ্ঠেই পরিস্ফুট করবার শক্তি ধরতেন। তবলা তরঙ্গে ঘোর কোলাহলের মধ্যে কন্সার্ট হলে বসতের ঠাটে সুর বাঁধতে দেখেছি মিনিট দুয়ের মধ্যে—এম্নিই আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম তাঁর কান। তান্‌পুরো বাঁধতে তাঁর কখনো এক মিনিটের বেশি সময় লাগ্‌তে দেখিনি। গাইতে গাইতে দুধারে দুটো তান্‌পুরোর একটি তারও এতটুকু উঁচু নীচু হ'লেই তৎক্ষণাৎ সে তারের নীচেকার কড়িটি সরিয়ে মুহূর্ত্তে সুর মিলিয়ে গেয়ে চলেন। তার ওপর অগাধ তাঁর কস্‌রৎ। মাদ্রাজে আমার কয়েকটি বন্ধুর কাছে শুনেছি যে তাঁরা আবদুল করিমের গান শুন্‌তে আরম্ভ ক'রেছেন রাত দশটায় আর শেষ ক'রেছেন পরদিন সকাল সাতটায়। সমস্ত রাত গেয়েছেন খাঁ সাহেব একা। আর এরকম ভাবে গাইতেও পারেন তিনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত। এছাড়া অদ্ভুত তাঁর গানের সাধনা—সুরের তপস্যা। এই বছর দুই আগেও এখানে তাঁকে তিন সপ্তকের বিজ্‌লি-তান দিতে শুনেছি হলক তান, জম্‌জমা তান, তোড়ের তান, দীর্ঘ গমক, কঠিন মীড়, বিদ্যুদ্‌গতি আরোহণ অবরোহণ, এক রাগ থেকে মুহূর্ত্তে অন্য রাগে প্রস্থান, মিনিটে মিনিটে ষড়জ-সংক্রমণ (change of key বা modulation), জলদ সার্গম রাগের ঠায় গতি দুন্ চৌদুন্—সে কী বিপর্য্যয় নৈপুণ্য! আর শুধু নৈপুণ্যই নয় অবশ্য, এ-সব আনুসঙ্গিকের সঙ্গে আছে সেরা বস্তুটি, আছে সুরের দরদ, আছে রাগের প্রাণকাড়া বিস্তার, আছে গানে জীবনের স্ফূর্ত্তি, আছে আত্মপ্রকাশের স্বত-উৎসারিত স্রোতোধারা। কবি বদ্‌লেয়ারের সুরে মন ব'লে ওঠে :

La musique souvent me prend comme une mer!
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther
Je mets à la voile.

"গান টানে গো মোরে সিন্ধু যথা টানে তাহার স্রোতে
মোর শান্ত তারা পানে,
আমি কুহেলিঘন চাঁদোয়াতলে বিপুল ব্যোমপথে
চলি পাল তুলি' উজানে।"

অবশ্য এসব দিকে সুরেন্দ্রনাথও অসামান্য ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু নানা বিষয়ে তিনি আবদুল করিমের সমকক্ষ ছিলেন না—যথা কস্‌রতে, দমে, গলার 'পরে বিস্ময়কর কর্ত্তৃত্বে ও পুঁজির অজস্রতায়। কিন্তু তাই ব'লে প্রতিভার native genius এ—তিনি আবদুল করিমের চেয়ে হীন ছিলেন না, ঢঙের স্বকীয়তায় (originality) ও গরিমায় নিশ্চয়ই তাঁর সমান ছিলেন, এবং কল্পনায় ও কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় ছিলেন আবদুল করিমের চেয়ে অনেক বড়। আবদুল করিমের কল্পনা ছিল না বলা আমার উদ্দেশ্য নয়—কারণ কোনো আর্টেই কল্পনা বিনা সত্যি বড় হওয়া যায় না—কিন্তু তাঁর কল্পনার প্রেরণার অনেকখানি যোগাত তাঁর অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও সাধনা এই-ই আমার বল্‌বার কথা। শুধু আবদুল করিম কেন, যে কোনো "তৈয়ার গাওয়াইয়া"-র সঙ্গে তুলনা করলেও সুরেন্দ্রনাথের সুর-সাধনাকে "সাধনা"

আখ্যায় অভিহিত করা চলে না। (আমাদের ওস্তাদদের এই বিপুল সাধনার ক্ষমতাকে গুণী মাত্রেই যে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য একথা আমি "ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকায়" ব'লেছি, কাজেই ওস্তাদদের "প্রাপ্য" যে আমি তাঁদের দিতে নারাজ আমার বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ সত্য নয়।) কিন্তু ঐখানেই তাঁর প্রতিভার জলন্ত প্রমাণ নয় কি? আমি তো অনেকবারই তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি "আপনি তো খুবই পড়াশুনো ক'রে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্সে বি-এ পাশ করলেন, ডেপুটি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'লেন, চিরজীবন চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে গেলেন—সাহিত্য-চর্চ্চায়ও সময় কম দেন নি—অথচ এরকম গান করেন কী ক'রে? তাছাড়া শুনলেনই বা কোথায়, আর শিখলেনই বা কবে?" সুরেন্দ্রনাথ এসব প্রশ্নের বড় একটা উত্তর দিতেন না। জনশ্রুতি—কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাইজীর কাছেও না কি তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে শিখ্তেন স্কুলকলেজ পালিয়ে। কিন্তু যতই কেন শিখুন না—খোঁজ ক'রে জানা গেছে যে বড় জোর দু-তিন বছরের বেশী তিনি শেখেন নি—আর তা-ও সাগ্রেদরা ওস্তাদজীর কাছে যে ভাবে "তনমনধন" ঢেলে শেখে সেভাবে শেখেন নি কখনো।* শুধু তাই না। গানের চর্চ্চা রাখারই বা সময় ও সুযোগ তিনি কতটুকু পেতেন? একে ত ডেপুটির হাড়ভাঙা খাটুনি, তার উপর এমন সব পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে নিরন্তর বদ্লি হওয়া যে গানের আসর বস্‌বে কোত্থেকে? তিনি এমন সব জায়গায় বছরের পর বছর কাটিয়েছেন যে গড়পড়তা হয়ত বছরে একমাসও গান ক'রেছেন কি না সন্দেহ। মনে আছে একবার ছুটেছিলাম পুরুলিয়ায় তাঁর গান শুন্‌তে। (অনেকদিন তাঁর গান না শুন্‌লে কি রকম যে একটা তৃষ্ণা জাগত!) সুরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন: "তাই তো হে—কতদিন যে গান করিনি—এখানে কেউ শোনে না হে আমার গান—লুচি সন্দেশ খাওয়ার নিমন্ত্রণ না করলে!" ...যাহোক্ অতি কষ্টে তানপুরোর নতুন তার চাড়িয়ে খুঁজে পেতে এক অখাদ্য তবলচিকে তো যোগাড় করা গেল। কিন্তু যে লোক তিনচার মাস গান করে নি—তার বিখ্যাত "নিবিড় আঁধারে মাগো চমকে অরূপরাশি" গানটি বাগেশ্রীতে ধরতে না ধরতে কি স্বয়ং বীণাপাণি তাঁর কণ্ঠে বাঙ্ময়ী! মনে আছে মনে মনে তাঁর চরণে প্রণাম ক'রে সেদিন ব'লেছিলাম: "গুণী, এমার্সন যে প্রতিভাকে 'বিপুলশ্রমক্ষমতা' ব'লে বিরাট ভুল ক'রেছিলেন তা তাঁকে মানতে হ'তই যদি মাত্র একটিবার তোমার গান শোনবার সৌভাগ্য তাঁর হ'ত।" এই জন্যই মনে হয় যে native genius-এ সবজড়িয়ে সুরেন্দ্রনাথ আবদুল করিমের চেয়ে কম তো ছিলেনই না—হয়ত বড় ছিলেন। অন্ততঃ আবদুল করিম একটি বছর ব'সে থাকুন তো দেখি গান না গেয়ে। তারপর গাইতে সুরু করলে কী দেখতাম? না—গলায় সুর তেমন বস্‌ছে না, রাগের রূপ তেমন খুলছে না, কণ্ঠপেশীর জড়িমা কাটতে চাইছে না—কত কী। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এবিষয়ে ছিলেন যেন পিতামহ ভীষ্মদেব। বহুদিন তীর ধনুক স্পর্শ করেন নি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন বল্‌লেন "পিতামহ, যুদ্ধং দেহি," অমনি পিতামহ যে সব্যসাচী সেই সব্যসাচী। আর এমন "যুদ্ধই দিলেন" যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়ে রণক্ষেত্রে নামিয়ে তবে জলগ্রহণ! এম্‌নিই তাঁর বৃদ্ধ হস্তের নিপুণ সন্ধান!

সত্যি, বৃদ্ধ বয়সেও সুরেন্দ্রনাথের গান যতবারই শুনেছি ততবারই মনে জেগেছে এই পিতামহ ভীষ্মদেবের ছবি। তাঁর শেষ গান শুনি আমাদের ওখানে—কল্‌কাতায়-১৯২৮শের মাঝামাঝি। তখন তাঁর বয়স চৌষট্টি বৎসর। দেহ দুর্ব্বল, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বাত' অম্লশূল—তার উপর পায়ে কি এক অসহ্য জ্বালা—সর্ব্বদাই। কিন্তু সব ভুলে গেলেন এ সুর-সুন্দর মানুষটি তানপুরো ধরতে না ধরতে। আর, কী গানই গাইলেন! এক দৌড়ে সন্ধ্যা

---

* গুণিচূড়ামণি যন্ত্রী আলাউদ্দীনের মুখে শুনেছি রামপুরের উজীর খাঁর কাছে তিনি বার বছর শিখেছিলেন—তামাক সেজে। আর সে কী সাধনা! সে এক শোন্‌বার জিনিষ। তরুণ বাঙালী-গৌরব তিমিরবরণকেও মাইহারে আলাউদ্দীন কম সাধনা করান নি। রোজ রাত তিনটে থেকে সকাল আটটা সাধতেন। দিনে শিক্ষা আবার সন্ধ্যায় সাধনা ইত্যাদি। বস্তুতঃ ওস্তাদি সঙ্গীতে এই সাধনার বিবরণ সত্যই বিস্ময়কর। অনন্য-সাধারণ প্রতিভা নইলে প্রচণ্ড সাধনা বিনা উচ্চ সঙ্গীতে প্রথম শ্রেণীর গুণী হওয়া যায় না। তবে এবিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল এক আলাদা শ্রেণীর।

সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা। একাই। আরও তাঁর গাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু তাঁর শরীর অসুস্থ বলে আমরা জোর ক'রে তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম।

আর তখনও কী খোলা মিষ্ট কণ্ঠ! যৌবনের সে প্রাবল্য বা তেজ নেই শুধু। কিন্তু আর সবই আছে। সেই অপূর্ব্ব সুরের দরদ, সেই বিচিত্র কল্পনা, সেই নিখুঁৎ সুরের কাজ, সেই প্রাণস্পর্শী মীড়, সেই তারাসপ্তকের মধ্যম পঞ্চমে অচঞ্চল স্থিতি ও মন্দ্র সপ্তকে ইচ্ছামাত্রই খরজে নেমে আসা—বস্তুতঃ সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। Spirit willing হ'লে যে flesh weak এর অজুহাতটা মায়া,

৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

একথার যেন সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁর গান শুন্‌তে শুন্‌তে প্রাদেশিকতায় আমাকে বার বার পেয়ে বস্‌ত—বন্ধুবর সার্ব্বভৌমিক সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপ্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও। মনে হ'ত বাঙালীর যত ত্রুটিই থাকুক না কেন নিষ্ঠায়, সাধনায়, নিয়মানুগত উচ্ছ্বাসপ্রবণতায়,—তার দরদ আবেগ ও সর্ব্বোপরি কল্পনা যাবে কোথায়? কই অন্য প্রভিন্স বার করুক তো দেখি একজন সুরেন্দ্রনাথ—একজন আলাউদ্দীন—একজন তরুণ তন্ত্রী তিমিরবরণ! ও যে বাঙালীর পিতৃপৈতামাইক প্রাণসম্পদ—মরিয়া না মরে রাম! বনেদি ঘরের ছেলে যে! ফতুর হ'লেও এখনই চাল তার কি যায়!

সুরেন্দ্রনাথ হয়ত আমাদের সঙ্গীত জগতের শেষ এলাহি চালের গাইয়ে—বনিয়াদি ঘরের শেষ বংশধর। কিন্তু তাই ব'লে তিনি শুধু বনিয়াদি ঘরের ছেলেই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক অত্যাশ্চর্য্য শিল্পী। দুঃখ এই যে চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনির চাপে তাঁর নানামুখী প্রতিভা যথোচিত বিকাশ পাবার সুযোগ পায় নি, কিন্তু তবু তিনি যাই করতেন তাতেই তাঁর মৌলিকতার ছাপ রেখে গেছেন। কী আসর জমানোয়, কী গল্প লেখায়, কী গানে, কী ক্যারিকেচারে। এর উপর ছিলেন তিনি নিপুণ চিত্রী, আশ্চর্য্য শিকারী, সেরা সামাজিক মানুষ—একান্ত বন্ধুবৎসল, মহৎ উদার, অমায়িক, বসুধৈবকুটুম্বক প্রীতি-নিলয়।

কিন্তু মানুষ সুরেন্দ্রনাথ বা সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বর্ণনাযোগ্য অনেককিছু থাকলেও এ প্রবন্ধে তার স্থান নেই—যেহেতু এর বর্ণনীয়—শুধু গুণী সুরেন্দ্রনাথ, সঙ্গীতস্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর এই দিকের আর একটি কথা ব'লেই তাই বিদায় নেব। কারণ ভারতীয় সঙ্গীতের আসন্ন রেনেসাঁসে তাঁর গানের এ গুণটির মূল্য বোধহয় তাঁর অন্য কোনো অবদানের চেয়েই কম না।

সে গুণটি হচ্ছে সুরেন্দ্রনাথের গানের সৌকুমার্য্য refinement। এমন কি অতবড় যে গুণী আবদুল তাঁরও গানেও সময়ে সময়ে মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা যায়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গানের মধ্যে কথনো গ্রাম্যতা বা কর্কশতা বা লম্ফঝম্প—coarseness—আস্‌তে দেখি নি—ভাল আসরে তো নয়ই,—হাজার coarse শ্রোতার মাঝেও না। এটা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বিশেষ ক'রে গানে, অভিনয়ে ও বাগ্মিতায় মন্দ শ্রোতার স্থূল মাধ্যাকর্ষণ বরাবর কাটিয়ে চল্‌তে পারা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেও দুঃসাধ্য। সস্তা যশের মোহে না পড়া সম্ভব হয় কেবল বহু পুণ্যফলে, যে জন্য চিন্তাশীল অ্যালডুস্ হাক্‌সলি দুঃখ ক'রেছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর য়ুরোপীয় সঙ্গীতকারদেরও স্খলনে: "Even serious musicians seem to find it hard to dispense with barbarism."

রেডিয়ো ও গ্রামোফোনের যুগে এ barbarism হ'য়ে উঠছে আরও সহজ (এবং তার স্বপক্ষে চমৎকার চমৎকার যুক্তিও গ'ড়ে উঠছে অবশ্যই—যার সাইকো-আনালিটিক নাম—rationalization)—এবং ঠিক সেইজন্যেই এত আনন্দ হয় ভেবে যে সুরেন্দ্রনাথ এ যুগের মানুষ ছিলেন না। কারণ এই প্রাণখোলা, সদানন্দ, স্বভাবনম্র, উচ্চাশা-বিরহিত, মিষ্টভাষী, সুশীল, উদার, অমায়িক অথচ তীক্ষ্ণধী মানুষটি গান করতেন এ-যুগের কাড়াকাড়ির ভাব নিয়ে না, এক্হাত দেখাব এ তাল ঠোকার ভাব নিয়েও না—এমন কি (সেটা শুনলে হয়ত আধুনিকী অনেকেরই বাড়াবাড়ি মনে হবে) নিজের গুণপনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যেও না। তিনি গান করতেন—গান করা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল ব'লে—গান না করে তিনি থাকতে পারতেন না ব'লে।

গান না ক'রে তিনি যে থাক্তে পারতেন না এর একটি সরস দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—বিশেষ এইজন্যে যে এতে ক'রে তাঁর অপূর্ব্ব নিরভিমানিতার বড় একটা মনোজ্ঞ পরিচয় দেওয়া হবে। এ ধরণের ছোট ছোট দৃষ্টান্তে তো আসল মানুষটা কম ফুটে ওঠে না।

আমাদের দেশের দুর্ব্বাসা-সোদর গুণীদের সঙ্গে যে ভুক্তভোগীরই পরিচয় আছে তিনিই জানেন গায়কের সঙ্গে বাদকের ললিত সহযোগিতার সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই কী ভায়োলেন্ট নন-কোঅপারেশনের রক্তারক্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু "তরোরিব সহিষ্ণু" সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ছিলেন মাটির মানুষ। যে-রকমই তবলচি হোক্ না এ নিরভিমান মিষ্টভাষী গুণী মানিয়ে চল্‌বেন। ভাল সঙ্গতদারের সঙ্গে ঝগড়া হওয়া তো দূরের কথা অতি নিকৃষ্ট তবলচিকেও তিনি সদা প্রসন্ন ভাবে যাকে বলে চালিয়ে নিতেন। অনেক সময়ে এতে তাঁরি মজা হ'ত। একটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করি।

তখন আমার এক ভ্রাতা শচীন্দ্র সবে মাত্র তবলার একতালা ও তেতালার ঠেকাটি শিখেছেন। সেদিন ভাগলপুরে তবল্‌চি পাওয়া গেল না—(কারণ বরাদ্দ লুচি সন্দেশের বন্দোবস্তে সেদিন কি কারণে চুক হ'য়ে গিয়েছিল) অথচ আমরাও গান শুনবই। কী করা যায়?

সুরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন "তাতে কি, শচীনই ঠেকা দেবে।" সে-বেচারী তো অতবড় ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গত করতে হবে ভেবে কেঁপেই অস্থির। কিন্তু সদাশিব সুরেন্দ্রনাথ ছাড়লেন না। বল্‌লেন "ভয় কি? কাওয়ালির ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, না তিন্ তিন্ তা, তা ধিন তেটে ধিন্—এই অবধিও তো জানো? তাই সই। ও-ই দিয়ে চলো।" গান তো সুরু হ'ল।

কিন্তু তাই বা সে পারবে কেন? অত বড় গাইয়ে! বিষম নার্ভাস হ'য়ে পড়ল। ফলে কখনো বা ঢিমা তেতালায় ষোল মাত্রার জায়গায় কুড়ি মাত্রা পরে "সম" দেয়, কখনো বা একতালায় বারো মাত্রার জায়গায় ভুলে পনের মাত্রা বাদে "ফাঁক" দেয়। এ ধরণের রসভঙ্গে অন্য যে-কেউ হ'লেই থেমে যেত। কিন্তু পাছে তাতে তার মনে আঘাত লাগে ব'লে সুরেন মামা হেসে বল্‌লেন—

"মাভৈঃ শচীন, বাজাও না ভাই, প্রাণের মায়া ছেড়ে
চলো উধাও বাজিয়ে সাথে—হর্ষে মাথা নেড়ে।"
কইনু আমি—"সে কি বলুন! মাত্রা যে ভুল করে!
ফাঁকের পরে চার তাল দেয়—বাক্য মোদের হরে!"
কহেন গুণী—"তাতেই বা কী? যেমন বাজাও, জেনো
সমে এসে মিলিয়ে দেবই,—মুখখানি চুণ কেন?
শুধু তুমি এইটি কোরো—তালটি যেয়ো দিয়ে,
ফাঁক ও মনের হিসেব আমিই স্রেফ্ নেব মিলিয়ে।"

আমাদের মধ্যে হাসির সাড়া পড়ে গেল। শুধু সে হাসির সঙ্গে সে সভার কোন্ শ্রোতার না মনে মুগ্ধ ভক্তি জেগেছিল—এ নিরহঙ্কার ভোলানাথের সদানন্দ চরিত্রের প্রতি?

বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথ যে একটা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে পারতেন তার প্রধান কারণ—বড় গাইয়ে ব'লে এতটুকু self-consciousness তাঁর ছিল না। এবং সেই জন্যই তিনি অমন শ্রোতা-নিরপেক্ষ হ'য়ে গান ক'রে যেতে পারতেন, ভাল শ্রোতা মন্দ শ্রোতা উভয়কেই সমভাবে আদর ক'রে তাঁর গান শোনাতে পারতেন। সত্যি, নিরভিমান তাঁর এত মজ্জাগত ছিল যে শুধু যে ধনী দরিদ্রেরই তাঁর কাছে প্রভেদ ছিল না তাই নয় যে তাঁর গানের নিন্দা করত সেও তাঁর গান

শুনতে এলে তাঁর গানের অনুরাগীর সঙ্গে সমানই আদর পেত। তিনি ভুলেও ভাবতেন না শ্রোতা তাঁর গানের মহিমা বুঝছে কি না। তিনি শুধু গেয়ে যেতেন—দুহাতে বিলিয়ে যেতেন—তাঁর সুরের স্ফুলিঙ্গ অপরের মনে আগুন জাল্‌ল কি না জাল্‌ল সে নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথাই কখনো দেখি নি। বাস্তবিক, কোনো গায়ক যে এমন প্রশংসানিরপেক্ষ হ'য়ে আজীবন গান ক'রে যেতে পারে, অসমজদারের কাছেও যে এমন উদার ছন্দে তার সুরৈশ্বর্য্যের ঝুলি উজাড় ক'রে আনন্দ লাভ করতে পারে, এবং সর্ব্বোপরি তার উচ্চতম প্রেরণার কাছে অনুক্ষণ খাঁটি থাকতে পারে—শ্রোতার বাহবার লোভে একটুও নীচে না নেমে—এ মহিমাময় দৃশ্য আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নি, না এদেশে, না য়ুরোপে।

কেবল এক আক্ষেপ জাগে। এতবড় প্রতিভা আমাদের সঙ্গীত জগতে নিজেকে এমন অবাধে বিলিয়ে দিয়ে গেল, এমন আত্মভোলা প্রতিভার বরপুত্র আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজন হ'য়ে তার স্বরসাধনায় সুরজাহ্নবীকে মর্ত্ত্যে বইয়ে দিয়ে গেল অথচ আমরা তাকে চিন্‌লাম না। গীতায় নিষ্কামতার সান্ত্বনা রয়েছে বটে, কিন্তু তবু ভাবতে কি একটু দুঃখ না হ'য়ে পারে যে—the world does not know its greatest men ?—অন্ততঃ কোনো অনাদৃত প্রতিভার ভক্তদের মনে?—আমাদের মনে? যে আমরা জানি যে তিনি কী ছিলেন?

কিন্তু না। দুঃখ কেন? কতটুকু আমাদের দৃষ্টির পরিধি যে তাই দিয়ে ফলাফল বিচার করতে যাই? কেন মনে করি যে সুরেন্দ্রনাথের গান সমজদারের সংখ্যাবাহুল্যের অভাবে ব্যর্থ হ'য়ে গেল? জীবনে সত্যের যে-আগুন একবার জলে সে কি কখনো নেভে? না, তার আলো, শক্তি, পাথেয় কখনো পথহারা হয়?

সুরেন্দ্রনাথ আমাদের আভাষ দিয়ে গেছেন বাংলা ও হিন্দী গানের ভবিষ্যৎ বিকাশ কোন্ লীলায়িত উজ্জ্বল পথ নেবে। তিনি তাঁর সুরের আলোয় প্রতিভার স্রোতস্বিনীতে পথ কেটে চ'লে গেছেন—দেখিয়ে গেছেন গানে চাইলে কী বস্তু পাওয়া যায়, আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন গানে সত্যতম রস কাকে বলে। তাঁর দেহদীপ আজ নির্ব্বাপিত বটে—কিন্তু গানে তাঁর সত্যোপলব্ধির বহ্নিবাণী চিরদিন আমাদের হৃদয়ে অনির্ব্বাণ হ'য়ে জলবেই। আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বিকাশ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর যে-জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখে গেছেন—সে দৃষ্টিবর তিনি আমাদের সকলকেই দিয়ে গেছেন চিরদিনের জন্যে। তাই আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলি :—

গুণী গাইলে হেথায় যে গান, সে কি গাওনি চিরতরে
দানি বিস্মৃতিরে লাজ?
তুমি যে কিঙ্কিণী বাজিয়ে এ-প্রাণ সুধায় দিলে ভ'রে
সে কি লুটবে ধূলামাঝ?
দূরে ঐ যে তারা পড়্‌ল খসি,'—স্পন্দটি তার সারা
আকাশ লয় না কি বুক পেতে?
হেথা কলস্বনা একটিও ঢেউ হয় কি সাগরহারা
থামি' মধ্য পথে যেতে?
তোমার কান্ত প্রাণের শান্ত গানে করলে যে আরতি
তাহে অলখ এল নেমে;
তোমার সেই পূজারই পায় পূজারী আমরা—করি নতি
উছল ভক্তি প্রীতি প্রেমে।
তোমার ঝঙ্কারে এই উষর ভুঁয়ে জাগ্‌ল নাকো ফুল
তাহে আঁধার হ'ল আলা!
বাণী গন্ধে তারি অবতরি,'—দুলিয়ে তারা দুল
নিলেন তোমার বরণমালা
তোমার নিত্য নূতন সৃষ্টি জালে বাঁধলে এ অন্তর
সে কি বিচিত্র বাঁধন!
সে-সুর যতই বাঁধে ততই ভাঙ্গে বেসুরো পিঞ্জর
রচি' জাগ্রতে স্বপন!
তোমার তানের আরাধনে দ্যুলোক নাম্‌ল ভূলোকে
পরি' বাসর-মিলন হার;
তুমি রচলে গুণী, সে-সঙ্গমের চুম্বন-পুলকে
সে কোন্ সুদূর অভিসার!
হেথা আনলে বাহি' কোন অলকার দীপ্র সুরধুনি
যাহে পৃথ্বী উতরোল?
সে কোন্ চির চেনায় ডাক দিলে হে মূর্চ্ছনা ফাল্গুনী!—
বুকে জাগিয়ে অচিন্ দোল!
তুমি মোদের মাঝে চির জীবন রইলে ছদ্মবেশী
তোমার নয়ত হেথায় ধাম!
দিয়ে সেই ধামেরি একটু পরশ হ'লে নিরুদ্দেশী,
মোদের লও গুরু, প্রণাম।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

—o—

টুক্‌রি

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

ভূমিকা

গগনের কথা সূর্য্যের আলো ;
ধরণীর কথা সূর্য্যমুখীর বনে।
পাখী কথা কয়, বৌ কথা কও ;
সখীতে সখীতে কানে কানে হয় কথা।
বাজারে বাজারে চলে সারা বেলা
কথার হট্টগোল।
আমি ফিরি তারই মাঝে,
কথা কুড়োনোর ব্যাবসা আমার
টুক্‌রি বোঝাই করি ॥

দ্বন্দ্ব

ঝড়ের সকালে পাখী পড়ে আছে
আমবাগানের তলে,
মণিতে বিনুতে তারে নিয়ে কাড়াকাড়ি।
মণি বলে—ওকে পুষ্‌ব খাঁচায়—
বিনু বলে, ওকে বাসায় ফিরিয়ে দেব।
এ তর্কে পাখী আপনার শেষ কথা
জানালো দিনের শেষে—
বাসা ও খাঁচার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল।

কলাপাতা

তালের পাতা ঘন দোলায় মাথা,
শালের পাতা
বাজায় করতালি,
খেজুর পাতার শূন্যে লড়াই
লক্ষ হাজার বর্শাফলক তুলে।
ঝোড়ো-হাওয়ায় বাঁশের পাতা নাচে,
আম্‌লা পাতার শাম্‌লা নাচের নেশা,
কেবল শুধু কাঁদে কলার পাতা
ছিন্ন ভিন্ন বেশে।

ভরা বাদর

পথের আকাশ মেঘের কালোয়
ভরলো দিকে দিকে।
দত্ত বাড়ীর
মরা দীঘি কানায় কানায় ভরা
কাক-চক্ষু জলে।
আমবাগানে, জামবাগানে, নেবুর বাগানে
স্তূপে স্তূপে সবুজ হলো ঘন।
আমার মনে উঠ্‌লো ভরে অকারণের ছায়া।

চোর

কেউ বা বলে—লোকটা পাগল।
কেউ বা বলে—চোর।
কেউ বা বলে – বেজায় রোগা, ম্যালেরিয়ার রুগী।
রুলের গুঁতো দিয়ে পুলিস বলে—রে বদমাস।
লোকটা বলে—দুঃখী আমি,
তার বেশী দোষ নেই।

জ্যৈষ্ঠ

রক্তজবা ঝাম্‌রে আসে রোদে;
পাপ্‌ড়িগুলি নেতিয়ে পড়ে নুয়ে,
কাঁঠালবনে পাতার আগায় তীক্ষ্ণ আলো
চক্‌চকিয়ে ওঠে।
শুক্‌নো কুয়োর ধারে নামে
জলের আশায় দলছাড়া দাঁড়কাক;
খেঁকি কুকুর নর্দ্দমাতে ঠাণ্ডা কাদায় শুয়ে
চক্ষু বুঁজে জিভ্‌ লেলিয়ে হাঁপায় বোসে।

বন-পথে

বনের পথে কঠিন কাঁটা,
একটা বুঝি ফুটলো পায়ে।
চোখ নামিয়ে দেখি
ক্ষত চরণ মোহন রঙে ঘিরে
চাইল ক্ষমা কাঁটা-লতার ফুল।

পলাতকা

বুড়ো বরের হাতে আমায় দিলি,
বুড়ো গেল ম'রে।
এক্‌লা ঘরে কেমন কোরে থাকি?
মাগো, আমি চলে যাবো তোদের সঙ্গ ছেড়ে
ইষ্টিসনের কলগাড়ীতে চেপে,
রাত্রি যখন নিশুত হবে,
আঁধার হবে বন,
সঙ্গে রবে করিম গাজীর ছেলে।
নিয়ে যাবে পদ্মাপারের দেশে;
গড়িয়ে দেবে হাতের বাজু,
পরিয়ে দেবে গলায় মটরমালা।

রথ

ছুটে এসে দুয়ার খুলে চাই,
বর গিয়েছে চলে,
দূরে বাজে রথের শব্দ—শূন্য আঁধার পথ।

শিশির

পথের পাশে
ঘুমিয়ে ছিলেম,
কখন এলে গোপনচারিণী।
সকাল বেলায়
ললাটে মোর স্বপ্ন শেষের শিশিরঝরা জল।

শিকারী

ঘুরে ঘুরে পড়ে ধূলায় লুটিয়ে,
চঞ্চুর সাথে চঞ্চু মিলায়ে ডাকে,
অবশ ডানায় ডানা ঝাপটিয়া
নীরব নিচল সাথীরে জাগাতে চায়।
যারে মারো নাই,
তাহারে শীকারী
মেরেছ অনেক বেশি।

চাঁপা

এই চাঁপারে চিনিনে তো,
সেই চাঁপাটি কই?
সেই যে তোমার প্রথম চোখের চাওয়া,
খোঁপার থেকে খসিয়ে দেওয়া প্রথম দোলন চাঁপা।

রক্তজবা

দেখ্‌তে পেলেম, বুনোছেলে
রক্তজবা পরিয়ে দিল কালো মেয়ের কানে।
একটু দূরে—আরেক মেয়ে
কেমন করে তাকিয়ে থাকে এই ছেলেটির দিকে।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়,
এক পলকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথার জবা
অকারণেই ছুঁড়ে ফেলে ছিন্ন ছিন্ন ক'রে।

সকাল বেলা

মাকড়্‌সা-জাল ঘাসের পরে মেলা।
বেলা বাড়ে, শিশির শুকায়,
মাকড়সা-জাল ছিঁড়ে হয় খান খান,
ফুলের ফুরায় পালা।
তৃণ-বেদিকায় ক্ষণিকের আল্পনা,
তারি পর দিয়ে লক্ষ্মীর পা দুখানি
চলে গেল—হেরিলাম।

মোতিয়া

যে গেছে তাহারই শূন্য পথের পানে
প্রজাপতি, তোর ডানা তোরে নিয়ে চলে।
মোতিয়া কাটালো সারা রাত পথ চেয়ে,
গেল যবে চ'লে
এলি সন্ধানে তারি।

খেলা

বৃষ্টির জল ছলো ছলো
শিউলি গাছের পাতায় পাতায়,
টগর গাছে ভিজে ফুলের দল
পুব হাওয়াতে ঘরছাড়া হয় বুঝি।
আজ আমারো বাদল লাগা মন
আকাশ থেকে পেয়েচে কার দোলা

কে—

লাল ঠোঁট!
ভাসা ভাসা চোখ!
কালো এলোচুল বাতাসে দুলিয়ে
সকাল বেলায়
চলে গেল ঐ পথের বাঁকে।

শেষের খেয়া

দূর থেকে ঐ আব্‌ছা আলোয় হাত ছানি দেয়
অস্তাচলের তারা,
শেষের খেয়ার পাল তোলে মোর
পারাপারের মাঝি।
তবু আমার মন্থর মনখানি
পিছিয়ে পড়ে রইলো তোমার ঘাটে।

নতুন খেলা

ডাণ্ডাগুলি—নোন্তা—হাডুডু,
সব খেলাই তো হচ্ছে পুরোণো।
নতুন খেলা চাই আমাদের
বলছে খেলার দল।
তাই পুরোণো খেলাগুলোর সাজের বদল কোরে
ডাকে নতুন নতুন নামে খেলার সর্দ্দার॥

প্রজাপতি

কোনো কাজ নেই, নানা-রঙা সাজ প'রে
হেথা হোথা ফেরে কিসের প্রশ্ন নিয়ে,
আলোয় ছড়ায় ডানা।
চরণে জড়িত চূর্ণ পরাগ,
মধু কণা তার মুখে—
অকারণে বেলা হেলায় কাটায়
মোর মন প্রজাপতি।

এক পশ্‌লা

কেমন কোরে জান্‌বো বলো
মোর আঙিনার কাঙাল টগর গাছ
শুধু কেবল এক পশ-লা বৃষ্টি জলের তরে
এম্‌নি তরো ছিলো উদাস হয়ে,—
যেম্‌নি পেল ঐ টুকু দান পথিক মেঘের হাতে
অমনি যে তার ডালে ডালে ফুলের মাতন লাগে।

জল-মুক্তা

কচুর পাতায় মুক্তো ছিলগো,
সকালবেলার আলোয় ঝল-মল্‌;
যেমনি তারে দিলেম নাড়া
ভূষণটি তার হারালো সে,
আমি পেলেম ফাঁকি।

ছবি

মাথার কাছে ঐ যে দেখি
মেঘ, না ওকি চুল,
হাত পা ওকি লতার বাঁকা ডাল,
যায়না বোঝা নারী কিম্বা পরী।
তারো চেয়ে সত্য ওযে
মন আমারে বলে,
ঐ তো ছবির মায়া।

ছবি

আমার মুখের ছবিটি কিনিল
সোনার মোহর দিয়ে;
মনটি আমার বিনা দামে কেন
কিনিল রাজার ছেলে?

হরিণী

ফল-জল-পাতা পড়ে থাকে পাশে,
আঁখি দুটি তুলে কোন দূরে যেন চায়—
বনের দুলালী ওযে।
ওগো সৌখীন সহরের বিলাসিনী,
ওর সুকঠোর চিরজীবনের দুখে
যেটুকু তোমার সুখ,
যদি তা হারাও পর নিমেষেই
রবেনা তাহার স্মৃতি।

ঝড়ের পরে

আজ সন্ধ্যায়
ঝড়ে উড়ে পড়ে জানালায় বার বার
মোর আঙিনার মধুমল্লিকা শাখা।
বিজন রাতের বেলা,
আমার শূন্য বুকে
বার বার কোরে উড়ে উড়ে পড়ে কার সে মুখের স্মৃতি।

শ্রাবণ পূর্ণিমা

আকাশ ভ'রে জমে আছে
শ্রাবণ মাসের কাজল-কালো জল;
সেই জলেতেই বারেক ডুবে,
বারেক ভেসে উঠে—
কোন রূপসী—পঞ্চদশী
সাঁতার কাটে আজ।

ভালুক নাচ

তোরঙ্গ তোল মাথার উপরে,
এবার তোমার শশুরবাড়ীতে যাও।
দেখাও তো দাদা, শাশুড়ীকে তুমি প্রণাম কোরেছ
কেমন কোরে।
বৌটি তোমার প্রথম তোমাকে দেখেছিল যেই দিন
কতখানি জিব বার কোরেছিল দেখাও দেখি।
—না না, হলো নাতো,
পাজী বেয়াদব! দেখা, ভালো কোরে দেখা।
নাকের দড়িতে টান পড়ে যেই—
দারুণ যন্ত্রণায়
ভালুকের জিভ্ ঝুলে পড়ে মুখ থেকে।
দর্শক দল
তাই দেখে দেখে হাততালি দিয়ে হাসে।

ভালোবাসা

বধূ বলে এসে সখিরে তাহার,
"ওকি যাদু জানে সই,
কী মন্ত্রে ওযে কেড়ে নিল প্রাণমন"।
বর বলে তার বন্ধুরে ডেকে,
"বুঝি ও বাসেনা ভালো,
ভালো কোরে কথা বলেনা আমার সাথে"।

পাখী

মেয়ে যেন রেলগাড়ী, মা বলেন হেসে,
কেন এত তাড়াতাড়ি; কোথা যাবে শুনি?
মেয়ে বলে,
জান না মা, বোসেদের পুকুরের পাড়ে
আতা গাছে ব'সে আছে না-জানা কী পাখী,
এক্ষুনি উড়ে যাবে!
মা হঠাৎ মনে ভাবে, এ মেয়ে বুঝিবা
আমার অজানা পাখী!
চোখে এলো জল।

আনমনা

"আন্‌মনে কোন্‌ ভাব্‌না তোমার
বকুল বনের নির্জ্জনে?"
ভাব্‌নার ভার সয়না যে আর
তাই এসেচি—
ঝরিয়ে দেবো ঝড়ে-পড়া বকুল ফুলের মতো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

অতিথি

(প্রহসন)

শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু

প্রথম দৃশ্য

[পট উঠাইলে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। খোলা একটা জানলা দিয়া কিছুকাল পরে প্রভাতের আলোর একটু আভাস পাওয়া গেল। আলো যখন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তখন দেখা গেল সেটা একটা লাইব্রেরী-ঘর। বই-এর সেল্‌ফ্‌; বড় বড় দু-একটা ছবি। মাঝখানে বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কতগুলি চেয়ার ইতঃস্তত ছড়ান। একধারে একটা মশারি টাঙান রহিয়াছে কিন্তু কোনো খাট পালঙ্ক নাই।

ঘরের দরজা একটা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল। বাড়ীর প্রধান ভৃত্য বনমালী প্রবেশ করিল। মশারিটার কাছে আগাইয়া গিয়া কি চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। আলো এখন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বনমালী সবগুলি জানালা খুলিয়া দিল। কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর :]

বনমালী। বাবু! [মশারিটা একটু নড়িয়া উঠিল] বাবু! [ঘুমভাঙা অর্দ্ধেন্দু চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মশারিটির ভিতর হইতে বাহির হইল। অর্দ্ধেন্দু সুপুরুষ; বয়স আন্দাজ সাতাশ। চুলগুলি এলোমেলো হইয়া কপালে আসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি নিদ্রালসে স্তিমিত থাকিলে, দীর্ঘ মনে হয়। ঠোট দুটি সুকুমার—চেহারাটা একটু লাজুক গোছের তাহা চোখে দেখিলেই সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু ঠোঁট ও চিবুক দেখিলে বেশ বুঝা যায়। মৃদু হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে জিজ্ঞাসু-চোখে ভৃত্যের প্রতি তাকাইল। বনমালী এদিকে মশারিটা তুলিয়া ফেলিয়াছে। তখন দেখা গেল অর্দ্ধেন্দু একটা ইজিচেয়ারে ঘুমাইয়াছিল]

বনমালী

বাবু! আরো তিনবাবু এইমাত্র এয়েছেন; ঐ যে যারা দু'হপ্তা আগে মাসখানেক থেকে চলে গিয়েছিল।

অর্দ্ধেন্দু

[উদাস-ভাবে] হুঁ।

বনমালী

ইষ্টিশনে তাদের গাঁয়ের আরো নাকি পাঁচ জন রয়েছে তারাও নাকি এ-বাড়িতেই এসে উঠবে। বাবু জায়গা হবে কোথায়? বাড়ি আপনার হোটেল হয়ে উঠ্‌ল বাবু।

অর্দ্ধেন্দু

কাল যে বুড়া বাবুদের যাবার কথা ছিল তাঁরা যাননি।

বনমালী

না:। তাদের মকদ্দমার তারিখ পড়েছে। আরো দিন সাতেক তারা থাক্‌বেন বল্লেন। [অর্দ্ধেন্দু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল]

অর্দ্ধেন্দু

আর ঐ আমার পিসির খুড়োর শ্বশুরের শালার শ্বশুর; তার তো যাবার কথা ছিল কাল ভোরেই। তার বিছানাটাতো খালি আছে।

বনমালী

না তার যাওয়া হ'লো না। তার বাতের ব্যামোটা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে আরো কিছুদিন থেকে চিকিৎসা করাবেন মনে করেছেন। আপনাকে ডাক্তার আন্‌তে বলবার জন্য বলে দিলেন। কাল কবিরাজের টাকা আমাদের তহবিল থেকেই নিয়েছেন। [অর্দ্ধেন্দু ঢোক গিলিল]

অর্দ্ধেন্দু

আর ঐ বাবার বন্ধুর ভায়ের সাড়ু-জামাই?

বনমালী

তিনি কোকো আর ডিমের পোচ্ হুকুম দিয়েছেন। কাল রাতে বলে গিছলেন খিচুড়ী খাবেন। ব্রজঠাকুর কাট্‌লেট্ করতে ভুলে গিছ্‌ল বলে খিচুড়ীর থালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

অর্দ্ধেন্দু

হুঁ।

বনমালী

কিন্তু বাবু ঐ যে আপনার দিদিমাদের দেশ থেকে বুড়ো বাবু এসেচেন তাকে নিয়ে মহামুস্কিলে পড়েছি। দৈনিক এক সের করে ছাগলের দুধ না হ'লে তিনি তো চটে মটে আগুন,—কিন্তু এদিকে ছাগলের দুধ তো আমি জোগাড়ই করতে পারি না। বাবু আপনিই বলুন তো সে কি আমার দোষ,—গয়লা ব্যাটারাও এমন হয়েছে কোনো ব্যাটা যদি ছাগলের দুধ রাখে। নইলে আন্‌তে আমার আর কি আপত্তি,—পয়সা আপনার,—আপনার অতিথ্‌দের খাওয়াব তাতে আমার কি? [অর্দ্ধেন্দু বিব্রত ভাবে ঘাড় নাড়িল]

অর্দ্ধেন্দু

সবশুদ্ধ আজ ক'জন আছেন ওরা?

বনমালী

আজ্ঞে এদের নিয়ে পনেরো জন হলেন। আগের মাসের চেয়ে কিছু কমেছেন। আপনার কিন্তু বাবু সত্যি বল্‌তে কি আমার বড় রাগ হয়। যত রাজ্যের যত লোক এসে মাস-মাস এখানে থেকে যাবে—তাও না আছে এদের একটু হুঁস-পবন, না আছে একটা কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান। রাগ কি সাধে হয় বাবু, এদের জ্বালায় নিজের শোবার ঘরেও আপনার জায়গা হ'লো না শেষে চেয়ারে শুয়ে আপনাকে রাত কাটাতে হয়। আমি হলে কিন্তু বাবু শক্ত হতুম—যে সে এসে আমার বাড়ীতে হোটেল বসাবেন সে আমি ঘট্‌তে দিতাম না —হুঁ। আমি হ'লে—

অর্দ্ধেন্দু

আহা কি বল বনমালী! এঁরা সব আসেন, এঁদের তো আর চলে যেতে বা না আসতে বল্‌তে পারব না। চুপ কর, এ সব শুনলেই ওরাই বা কি মনে করবেন। [একটু চুপ] ওদের ভোরের খাবার ব্যবস্থা ট্যাবস্থা কি করেচ?

বনমালী

তা আজ্ঞে সব প্রস্তুত হচ্চে। মনু বাবু খাবেন কেকো আর ডিমের পোচ; মুকুন্দবাবু চা আর টোষ্ট আর ডিম সেদ্ধ; অনুকুল বাবু খাবেন চিড়ে দৈ। অখিল বাবু ডন্ করেন, তিনি ছোলা সেদ্ধ, মাখন আর পেস্তার সরবত করতে বলেছেন। কুনু বাবুর শুধু এক পেয়ালা দুধ মিশ্রি দিয়ে। বিভূতি বাবুর চাই চিড়ে ভাজা আর নারকোল কোরা। আর কারুর জন্য লুচি আর ডাল্‌না, না হয় পরোটা আর অমৃতি এই সব। তাছাড়া বুড়ো বাবুদের জন্য তামাক আন্‌তে হবে। গঙ্গা বাবু খান্ মিঠে, যোগেশ বাবু খান কড়া। মনু বাবুর চাই কাঁচি চুরুট; কুনু বাবুর বিড়ি। আর বিশু বাবু—[ঘরের দরজাটা অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ ও ছাতা বগলে উপস্থিত হইলেন। দাড়ি গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, যেমন কালো তেমনি মোটা। জুতোটাতে যত রাজ্যের ধুলো কাদা লাগিয়া আছে। তিনি ময়লা ব্যাগটা ও ছাতাটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরে অনায়াসে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ণ গর্ব্বিত দৃষ্টিতে ঝাঁটার মত একবার অর্দ্ধেন্দুর পানে চোখ বুলাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত অর্দ্ধেন্দুর প্রতি ক্রুদ্ধস্বরে]

আগন্তুক

বলি প্রণাম করতে পার না? দু-পাতা ইংরেজি শিখে সে জ্ঞানও হারিয়েছ নাকি?

অর্দ্ধেন্দু

[বিব্রত-ভাবে] আপনাকে কিন্তু চিন্‌তে পারছি না ত।

আগন্তুক

চিন্‌তে পারছ না তো হয়েছে কি? হামেশাই কি আর আমি তোমার বাড়ী আসি যে চিনতে পারবে? চেনে নয়নপুরের লোক—নায়েব মশাইর নাম শুনলে ছেলে বুড়ো ভয়ে কাঁপতে থাকে। আগে নমস্কার কর,—তারপর পারচয় দিচ্ছি।

অর্দ্ধেন্দু

[দ্বিধা না করিয়া] আজ্ঞে—

আগন্তুক

কি, প্রণাম করতে তোমার মান ক্ষয় হয়? গোপেশ্বর ভট্‌চাজের পদধূলির জন্য নয়নপুরে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় আর তুমি কোথাকার কোন্ নবাবপুত্র যে গুরুজনকে একটা প্রণাম করতে তোমার অপমান লাগে; চল্লুম তবে,—এখানে আর এক মুহূর্ত্ত নয়। নিতান্ত আত্মীয়পুত্রের বাড়ী বলেই এসেছিলাম, নয়ত কলকাতা সহরে কত গণ্ডা লাখোপতি গোপেশ্বর ভট্‌চাকে বাড়ী নেবার জন্য লালাচ্ছে তার ঠিক নাই! শোনো মূর্খ, আমি তোমার বাবার সাক্ষাৎ কাকার মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ কাকার শ্বশুর। [ব্যাগ ও ছাতা উঠাইয়া দ্বারের দিকে হন-হন করিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেল। তারপর সহসা ফিরিয়া] কেমন যাবো চলে? থাক্‌তেও বল্‌বে না?

অর্দ্ধেন্দু

আপনি দয়া করে থাকলে তো অত্যন্ত খুসী হবো, আর কি বলতে পারি? [প্রৌঢ় তখন ফিরিয়া আসিল। একটু [illegible] করিয়া অর্দ্ধেন্দু একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল]

গোপেশ্বর

চিরজীবি হও বাছা। এই তো সুবুদ্ধি ফিরে এসেচে। গুরুজন দেবতার মতো,—দেবতাকে নমস্কার না করেও গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলেও স্বর্গপথ অক্ষয়। [বনমালীর দিকে ফিরিয়া] ওহে শোনো, আমি কিন্তু ভাত খাই না,—লুচির ব্যবস্থা করো। বিশেষ কিছু করতে হবে না, লুচি, পাঁটার ঝোল, মাছের কোর্ম্মা, চাটনী আর রাবড়ি। আর এখন কিছুটা কাঁচা ছানা আর মিশ্রি হলেই হবে।

অর্দ্ধেন্দু

বনমালী, বাবুকে একটা ঘর দেখিয়ে দাও।

[তাহাদের প্রস্থান]

[অর্দ্ধেন্দু একটা টুথ-ব্রাসে পেষ্ট মাখিয়া দাঁতন করিতে লাগিল। এমন সময় আর একজন চাকর আসিয়া খবরের কাগজ দিয়া গেল। অর্দ্ধেন্দু সেটা খুলিয়া লইতেই একজন অতিথি ঘরে ঢুকিয়া--]

অতিথি

কী খবর লিখছে আজকে [আগাইয়া আসিয়া] দেখি দেখি। [এক হাত দিয়া কাগজটা কাছে আকর্ষণ করিয়া] উঃ ভারী জোর খবর। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই ছোঁড়া-গুলির আস্পর্দ্ধা দেখ না, যাবে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে। আর জব্দও হয় তেমনি,—দেখি ভাল করে। [কাগজ সম্পূর্ণ টানিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু নির্ব্বাক ভাবে দাঁত মাজিতে লাগিল] [সহসা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া] কেমন মনুচন্দ্র, বলেছিলাম কিনা—যে নেপচুন থিয়েটারে আজ টোডরমল্ল হবে। বাজি বড় যে বাজী রেখেছিলে, দেখনা এখন চাঁদ তোমার—(বলিতে বলিতে কাগজ লইয়া সে অন্তর্হিত হইয়া গেল]

[মুখ ধুইবার জন্য অর্দ্ধেন্দু বাহির হইয়া গেল। মনু ঘরে প্রবেশ করিল। সিল্কের পাঞ্জাবী গায়, পায়ে চক্‌চকে পাম্প। চুল বারো আনি, চার আনি ছাঁটা। সে আসিয়া ইজি চেয়ারটা দখল করিয়া টেবিলটার উপর পা তুলিয়া দিল এবং একটা সিগ্‌রেট ধরাইয়া গান ধরিল। তারপর গান থামাইয়া হাঁকিল, বনমালী, বনমালী]

মনু

[ডাকিয়া] বনমালী! বনমালী! ইডিয়টগুলির যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। আধ ঘণ্টা হ'লো কোকো আর পোচ্ অর্ডার করেছি এতক্ষণেও তার দেখা নেই। যত সব ই-রেস্‌পন্সএব্‌লদের আড্ডা হয়েছে এ জায়গাটা; টায়ার্ড হয়ে পড়েছি বাবা। বনমালী, ওহে বনমালী চন্দর [বনমালী প্রবেশ করিল] কিহে, দুপুরের আগে কি ভোরের খাবার তোমাদের বাড়ীতে আসবে না? এমন জায়গায় জন্মে—

বনমালী

আজ্ঞে আপনার ঘরে তো দিয়ে আসা হয়েছে।

মনু

কোথায়, ঐ ডানজেনটাতে! ওখানে তোমার বাবুকে বসে খেতে ব'লো,—আমি বাপু ঐ ছোট ঘরেই খাওয়া শোওয়া চান করা সব সারতে পারব না। শোনো বাপু, ওগুলি এইখেনে নিয়ে এসো।

বনমালী

কিন্তু বাবু এটা পড়ার ঘর।

মন্থু

পড়ার ঘর তা জানি। সেটা আমাকে শেখাতে হবেনা। লাইব্রেরীর কথা তুমি আমাকে কি শেখাবে,—আমি যখন ইস্কুলে পড়তুম তখন আমাদের লাইব্রেরী ছিল,- দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঠাণ্ডা কোকো আমি খাইনে জান তো।

বনমালী

কিন্তু বাবু যে ওখানে এক্ষুনি পড়্তে আসবেন। পড়া-শোনার বিঘ্ন হ'লে ওর বড় রাগ হয়।

মন্থু

[চটিয়া] তোমার বাবু রাগ হবেন তো আমি সারা ভোরে নাই খেলাম আর কি। তার চেয়ে তোমার বাবু স্পষ্ট বলুন না কেন চলে যাই।

বনমালী

আহা সে কি একটা কথা হ'লো। তবে কিনা বাবু— পড়ার ঘর। এখানে কোনো দিন,—তা আপনি বলছেন এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান] [একটু পরে অর্দ্ধেন্দুর প্রবেশ]

মন্থু

এই যে অর্দ্ধেন্দুবাবু গুড্ মর্ণিঙ্। কিন্তু মশায় আপনার চাকরগুলি হয়েছে এমনি বেয়াড়া যে আর কি বলব। চলুম ওহে,—হ্যাঁ ভালকথা আপনার লাইব্রেরীতে ভাল বই-টই মোটেই রাখেন না দেখতে পাচ্ছি। কাল সারা দুপুরটা আলমারীগুলি হাত্ড়ে ফিরেছি একটা যদি ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস পেলাম। বড় সুন্দর লেখে ঐ তিনকড়ি ভৌমিক। 'রূপসীর গুপ্তকথা' পড়েছেন? [অর্দ্ধেন্দু ঘাড় নাড়িল] পড়্বেন, বেড়ে লিখেছে। [অর্দ্ধেন্দু একটা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা বই টানিয়া পড়িতে সুরু করিল।]

মন্থু

আচ্ছা মশায় রোশ্‌নারাকে লাগে কেমন আপনার? রোশ্‌নাই করে কিনা? [অর্দ্ধেন্দু বিহ্বলের মত তাকাইয়া রহিল] কি রকম, রোশ্‌নারাকে চেনেন না না কি? এও বিশ্বাস করতে হ'বে? আর থাকেন কলকাতায়! একা রোশ্‌নারাই নেপ্‌চুন থিয়েটারকে রোশ্‌নাই ক'রে রেখেচে।

অর্দ্ধেন্দু

[বিব্রতভাবে] আজ্ঞে আমি থিয়েটারে যাইনা।

মন্থু

আর দেখলেন আপনার চাকরটার কাণ্ড। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল খাবারগুলি এখানে আন্তে বলে দিলাম তো নবাবপুত্রের দেখাই—[বনমালী প্রবেশ করিল] কি হে, আনতে পেরেচ? [বনমালীর হাত হইতে কোকো ও পোচ্ লইয়া মন্থু অর্দ্ধেন্দুর একটা দামী সুন্দর মলাটের বয়ের উপর সেগুলি রাখিয়া আহারে মনযোগ দিল। আড় চোখে একবার অর্দ্ধেন্দুর দিকে চাহিয়া বনমালীর প্রস্থান]

[বাহিরে খক্ করিয়া কাসি ফেলিবার একবার শব্দ হইল এবং তারপর চোখে রূপার ফ্রেমের চশমা আঁটিয়া খেলো হুকা টানিতে টানিতে যোগেশবাবুর প্রবেশ। বৃদ্ধ, এবং কদাকার দেখিতে। সে আসিয়া অর্দ্ধেন্দুর সমুখে একটা চেয়ার টানিয়া কহিল —]

যোগেশ

ওহে অর্দ্ধেন্দুবাবু, বাবা আজ রব্‌বার, খাওয়ার ব্যবস্থাটা একটু ভাল করে করো দেখিনি। সেই তো আগের রব্‌বার পোলাও মাংশ করেছিলে তারপর এক হপ্তা একটা, আর খাওয়াই হ'লোনা তেমন। ব্যাটারা মাংস করে তারই— কিন্তু তারই সাথে চাট্টি করে পোলাও রাঁধ্‌বে সে বুদ্ধি ঘেটে নেই। আর পরশু মাংস তো আমার রীতিমত কম [বলিয়া হুকায় জোরে টান দিয়া দারুণ কাসিয়া উঠিল। তারপর খক্ করিয়া এক দলা কফ্ আনিয়া মেজেতে ফেলিল]

অর্দ্ধেন্দু

[শিহরিয়া উঠিয়া তারপর] আচ্ছা, বেশ তো। বনমালী শুনে যাও তো। [বনমালীর প্রবেশ] ওরা আজ পোলাও মাংস খাবেন তার ব্যবস্থা ক'রো।

বনমালী

অখিলবাবু নিরামিষ খাবেন বলেছেন। মুকুন্দবাবু শুধু ফলমূল দিয়ে একাদশী। গঙ্গাবাবু শুধু শুকতো দিয়ে ভাত, বিভূতিবাবু খাবেন শুধু দই আর সন্দেশ।

যোগেশ

তা ওরা ওসব খান্ গিয়ে আমার কি বলবার আছে?

কিন্তু আমি বাবু আজ পোলাও মাংস ছাড়া কিছু খাবনা। আর, হ্যা দেখ বৌবাজার থেকে কিছু রাব্ড়ি দেখে নিয়ে এসো তো।

মনু

আর কিছু ডিমের চপ্।

যোগেশ

[হুকাটা টানিয়া দেখিয়া] উঁহু, আগুন নেই। [কলিকাটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর উপুড় করিয়া ছাই ফেলিয়া বনমালীর হাতে আগাইয়া দিল] নাও তো, আর এক ছিলুম সেজে আন। শীগ্গীর ক'রো বাপু। [বনমালীর প্রস্থান] তখন সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করিল বিভূতিবাবু। বাতের বেদনা পিঠে বলিয়া উপুড় হইয়া চলে প্রায়। সে আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া অর্দ্ধেন্দুর দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া বলিল]

বিভূতি

বেশ, বেশ ভদ্রতা শিখেচ। কাল রাত থেকে আছি বাতের ব্যথায় পড়ে একবার দেখতে যেতে পারলে না,—খুব অতিথি সৎকার শিখেচ যা হোক।

অর্দ্ধেন্দু

[বিব্রত ভাবে] আজ্ঞে আমি শুধু একটু আগে শুন্লুম। তা কবিরাজের ওষুধটা লাগিয়েছেন তো।

বিভূতি

[চটিয়া] কিন্তু কেবল কব্রেজের চিকিৎসার উপরই ভরসা করে থাক্‌ব কেন,—আমার কি দুঃখটা পড়েচে? বিদেশ বিভূঁয়ে এসে পড়েচি বলে মরতে তো আসিনি। তোমারও যেমন আক্কেল বাপু যে এত বড় একটা গুরুতর ব্যামোর কথা শুনেও বই টেনে পড়তে বসেচ। কেন ক'লকাতা সহরে কি ডাক্তার নেই নাকি। পাঁচ সাতটা ডাক্তার কব্রেজ একত্র হ'লে তবেই না চিকিৎসা—[যোগেশের দিকে চাহিয়া] কেমন কিনা?

যোগেশ

তাতে আর সন্দেহ কি?

বিভূতি

তবে বলেন ত, অনাত্মীয়ের বাড়ী ব'লেই না আমাকে কব্রেজের হাতে ছেড়ে দিয়েছে! নইলে একজনের চিকিৎসা করতে কত টাকাই আর ব্যয় হয়। [অর্দ্ধেন্দুর দিকে] এক গৃহাগত অতিথির জন্য যদি পাঁচ-সাতশো টাকা ব্যয় হয় তাতেই বা এমন কি।

মনু

[বিভূতিকে] কিন্তু আপনিই তো সার ঐ কব্রেজকে ডাকিয়েছলেন।

বিভূতি

চুপ করো ডেঁপো ছোঁড়া! ডাকিয়েছিলাম তো কি হয়েছে। তার জন্য আমার প্রতি কারুর কোন কর্ত্তব্যই বুঝি আর থাক্‌বেনা। মহা জ্বালায় পড়েছি।

অর্দ্ধে

বনমালী! [বনমালীর প্রবেশ] আমাদের ডাক্তার বাবুকে খবর দিয়ে এসো তো। শীগ্গির করে আসতে বল্‌বে।

মনু

[ব্যঙ্গ করিয়া] বলো অবস্থা খুব খারাপ।

বিভূতি

[চটিয়া] কি, আমার অবস্থা খারাপ! তোর অবস্থা খারাপ, যমের বাড়ি থেকে খাট এসেছে তোকে নিতে। মুখে বলতে একটু বাধ্‌ল না। কোথাকার নচ্ছার—

যোগেশ

[বাধা দিয়া] আহা চটেন কেন বিভূতিবাবু?

বিভূতি

চটি কেন? আশ্চর্য্য হলুম। এতে চটব না তো চটব কিসে? ছোঁড়া বলে কিনা আমার অবস্থা খারাপ। হ'তো যদি নিজের বাড়ি,—হুঁ। [হাস্যকর মুখভঙ্গী করিল] বলে কিনা আমার অবস্থা [সহসা বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া] উঃ মাগো, ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল, উঃ উঃ [বিভূতিবাবু চেয়ার হইতে উল্টাইয়া পড়িতেছিল, অর্দ্ধেন্দু, মনু, যোগেশ প্রভৃতি তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। তারপর বনমালীকে ডাকিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল]

[একটু পরে একটা খোলা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া অর্দ্ধেন্দু প্রবেশ করিল। সঙ্গে আসিল বনমালী।]

বনমালী

কিসের টেলী বাবু?

অর্দ্ধেন্দু

[নিরুত্তরে কিছুকাল ভাবিয়া তারপর] আরো দুজনের জন্য খাওয়ার তৈরী রাখতে বলে এসো ঠাকুরকে।

বনমালী

[বিস্ময়ে] আরো দুজন?

অর্দ্ধেন্দু

এরা আমাদের খুব সম্ভ্রান্ত অতিথি বনমালী। বাবার পুরানো বন্ধু বিভাসবাবু বোম্বাই থেকে আস্‌ছেন কলকাতায়। সঙ্গে তার মেয়ে আসছেন। আমাকে লিখেছেন একটা হোটেল ঠিক ক'রে রাখতে। কিন্তু সেটা ভালো দেখায় না,—তার চেয়ে বরঞ্চ এখানেই নিয়ে আসি।

বনমালী

কিন্তু থাকবার জায়গা?

অর্দ্ধেন্দু

সেটা করে নেওয়া যাবে। ছাদের উপরের ঘর দুটিতে খাট-টেবিল নিয়ে সাজিয়ে দাও। আলমারী খুলে গালচে বের করো। সিন্দুকের ভেতর থেকে রূপোর ফুলদানীগুলো। আর গদি-আঁটা ভাল দেখে কতগুলি চেয়ার। বেশ ভাল করে সাজিয়ে রাখো। আর দেখো এ-ঘরটাও গুছিয়ে রেখো একটু,—যা নোংরা করছে তা বলবার নয়। আমি ষ্টিশানে চললুম তাদের আন্‌তে। শোফারকে গাড়ি ঠিক করতে বলে দাও তো।

বনমালী

আজ্ঞে গাড়ি নিয়ে এতক্ষণ অতিথ্‌দের একদল কালিঘাটের গঙ্গায় চান্ করতে গেচে। বিভুতিবাবু ব'লে দিয়েছেন মাটী খানিকটা নিয়ে আস্‌তে,—পিঠে মেখে বাত-বেদনা কমাবেন। গাড়িটার যে কি অবস্থা হবে ভগবানই জানেন।

অর্দ্ধেন্দু

হুঁ। যাক্ ট্যাক্সিকরেই যাবো এখন। [প্রস্থান]

[বনমালী ঘরটা গুছাইতেছিল এমন সময় মন্টু যোগেশ বাবু মুকুন্দ বাবু এবং অন্যান্য জন পাঁচেকের প্রবেশ।]

মুকুন্দবাবু

বেশ, এই উপযুক্ত ঘর হয়েছে। তবে যোগেন ভায়া একটু উচ্চৈস্বরে পাঠ ক'রো,—তা বইখানার নাম বেশ, 'প্রেমের কাঠপিপড়া,—হেঁঃ হেঁঃ।

বনমালী

আজ্ঞে, আপনারা যদি অন্য ঘরে গিয়ে বসতেন তবে বড় সুবিধা হ'তো,—এঘরটা ঝেড়ে-পুছে একটু ঠিকঠাক করতাম,—একজন ভদ্রলোক আস্‌বেন

মুকুন্দ

কে হে তুমি ধৃষ্ট,—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ভদ্রলোক আসবেন তো কি পিতৃনাম ভুলে যেতে হবে নাকি! বলি আমরা কি ভদ্রলোক না

বনমালী

আজ্ঞে তাই কি আমি বলছি, আমি শুধু—

যোগেশ

তাই বলছ না তো বলছি কি। তাইতো বলছ।

মন্টু

আমাদের কি আর কান নেই' বলি কালা পেয়ো আমাদের?

মুকুন্দ

[রাসভারী কণ্ঠে] আর কুত্রাপি নয়, এইস্থানে;—এইস্থানেই আমরা অবস্থান করব। তোমার বাবুর বাব এসে সরায় কি ক'রে দেখি। যাও যাও এখন পথ দেখ আর দেখ, আপেল যেন বেশী করে আনা হয়,—আর শুধু ফলমূল খাবো। মনে আছে তো না সে এরই মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েচ? [বনমালীর প্রস্থান]

যোগেশ

বেশ তাড়ান গেছে ব্যাটাকে। তবু শুনুন মুকুন্দবাবু,—হ্যাঁ হে মন্টু বলি কর্ত্তার কাছ থেকে আজ টোডরমল্লের টিকিটের পয়সাটা আদায় করতে পারো? ছোঁড়া হাবা-গব টাকা-পয়সা আদায় করতে সুবিধা [সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

মুকুন্দ

বাবা, হাবা-গবা না হ'লে আর এদ্দিন ধরে ঘাড়ে পদক্ষেপ করে দিব্য আনন্দে থাকা যাচ্ছে এখানে। হাড় মূর্খ। শাস্ত্রে আছে মূর্খদের নিপীড়ন করলে দোষ নেই।

কুমু

[বিড়ি ধরাইয়া] বিশেষত নিপীড়ন করলে যদি এ হেন রাজভোগ আসে দিনের পর দিন। মাছ-মাংস মিষ্টি ফল-মূল-এ দিব্যি রাজার হালে কাটান যাচ্ছে হিঃ হিঃ হিঃ। বাড়ি গিয়ে এখন আর ডাল ভাত মুখে রুচবে না। তাছাড়া দিব্যি বিড়ির পয়সা পাওয়া যাচ্ছে; চাইলেই পান আর দোক্তা পাওয়া যায় [সবাই হাসিয়া উঠিল]

মনু

এইবার মাইরি কিনা একে-একে দু-একজন করে সরা ভাল। শেষ কালে একদিন রেগে মেগে সব না মাটী করে দেয় সার্। তারপর বদ্‌লে বদ্‌লে পরে এলেই চল্‌বে।

মুকুন্দ

তাই না তো বিভূতি-বুড়োকে বলেছিলুম কি। তার চোটেই হঠাৎ পিঠে তার বাতের রস গিয়ে দাঁড়াল। [সকলে আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

একজন

তা আপনারা একটা রুটিন্ করে ফেল্লেই তো সব গোল চুকে যায়। এখন কে আগে যাবে কে পরে যাবে করেই না মারামারি। রুটিন করলে যাওয়া আর ফিরে আসার নিয়ম বাঁধা হয়ে যাবে। কেউ বেশী দিন বাইরে থাকবে না।

যোগেশ

এ প্রস্তাব মন্দ নয়। সব কিছুই সইয়ে সইয়ে করা ভাল। বেশী টানাটানি করলে ছোঁড়ার মতি যদি বিগড়ে যায় তবে এ-কূল ও-কূল দু-কূলই যাবে। তার চেয়ে মোকদ্দমার যদি কদিন পরে পরে দিন পরে তবে আপত্তি হতেই পারে না। [হাসি]

মনু

বেশ আজই একটা রুটিন করা যাবে না হয়। মোদ্দা পোলাও মাংসটা আগে খাওয়া যাক্

যোগেশ

আর টোডর মল্লের টিকিটের টাকাটা যদি পারো।

মনু

দেখ্‌বো।

একজন

চলুন আগে স্নান টান সারা যাক গিয়ে। রসুই ঘর থেকে মাংসের গন্ধ আস্‌ছে চমৎকার। পড়া এখন থাক্।

যোগেশ

তা ঠিক, আজ বাপু আমি ফার্ষ্ট ব্যাচ্-এ। সেদিন আমার কম পড়ে গিছ্‌ল। নাও ওঠো এখন [সকলে উঠিয়া পড়িয়া] প্রেমের কাঠপিপ্‌ড়াটা না হয় স্নানের পরে পড়া যাবে।

একজন

[যাইতে যাইতে] তা যাই বলুন অর্দ্ধেন্দু ছোঁড়ার কল্যাণে স্বাস্থ্যটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। [সকলে হাসিয়া উঠিয়া প্রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এমন সময় অন্য দুয়ার দিয়া বিভাসবাবু সুনীতা ও অর্দ্ধেন্দু প্রবেশ করিল।]

সুনীতা

[আশ্চর্য্য হইয়া অর্দ্ধেন্দুকে] এরা সব কারা?

অর্দ্ধেন্দু

আমার অতিথি।

সুনীতা

আজ কি গঙ্গা চান টান কিছু আছে নাকি?

অর্দ্ধেন্দু

না ওরা নিত্য নৈমিত্তিক অতিথি; প্রায়ই ওরা এখানে থাকেন। গঙ্গা স্নান টান বিশেষ কিছু করেন না অমনি শুয়ে বসে কাটান্।

বিভাস

তোমার আত্মীয় স্বজন বোধ হয় এরা?

অর্দ্ধেন্দু

ঠিক জানিনা।

সুনীতা

জানেন না। তবে এরা এখানে এলেন কি করে?

এরা যে দলে বেশ পুষ্ট আছে দেখতে পাচ্ছি, জন দশেক হবে।

অর্দ্ধেন্দু

আরো জন নয়েক অন্যত্র আছেন। তবে এরা এখানে এলেন কি করে বলতে পারি না। বাবার সঙ্গে হয়ত পরিচয় ছিল, সেই সূত্রেই এখানে ওঠেন।

বিভাস

তবে শুধু এখানে আমাদের টেনে মিছে মিছি তোমার হাঙ্গামা বাড়ালে কেন বাবা। দিব্যি তো এক হোটেলে গিয়ে উঠ্‌তে পারতুম,—আর ভাল সব হোটেল হয়েছে এখন শুনেছি।

অর্দ্ধেন্দু

আপনি বলেন কি? আমার বাড়ি থাক্‌তে আপনাকে হোটেলে উঠ্‌তে দেব! তবে ভয় হচ্চে আমার। বাড়ির এই হোটেলে আপনাদের অসুবিধা না হয় [বাহিরে শব্দ]

সুনীতা

[হাসিয়া] আমাদের অসুবিধে না হয়েই পারে না। এখন আপনার ধর্ম্মশালা,—আমরা যাত্রী এসেচি। তবে একটা খাটিয়া যদি পাওয়া যায় তবে আর কথা নেই,—রাত্রি কাটিয়ে পরদিন আবার ট্রেণ ধরব।

অর্দ্ধেন্দু

আপনি অতটা শঙ্কিত হবেন না। আপনাদের জন্য ছাতে দু-টো ঘর ঠিক আছে,—আর যদিও খাটিয়া নেই তবে খাটের যোগাড় করব বলেছিলুম।

বিভাস

[হাসিয়া] তবে তোমার অতিথদের ভেতর পড়ে একেবারে মাঠে মারা যাব না দেখ্‌তে পাচ্চি। কিন্তু—[বনমালীর প্রবেশ]

বনমালী

আজ্ঞে খাবার ঠিক হয়েছে।

অর্দ্ধেন্দু

চলুন

বিভাস

খাবার? খাবার কে খাবে এখন। আমাদের ভোরের খাওয়া তো গাড়িতেই সারা গেছে। [সুনীতার প্রতি] খাবি তুই সুনীতা?

সুনীতা

উহুঁ। গঙ্গাস্নান করব। হ্যাঁ, অর্দ্ধেন্দুবাবু, পাঁজি টাজি আছে আপনাদের বাড়ীতে। দেখুন না আজ কোনো পুণ্য তিথি টিথি একটা খুঁজে পাওয়া যায় না কি। [হঠাৎ প্রবল শব্দ শুনিয়া] ওঃ কিসের শব্দ?

বিভাস

কি, হে অর্দ্ধেন্দু, মহাতব খাঁ কি তোমার দুর্গ আক্রমণ করল নাকি?

অর্দ্ধেন্দু

আজ্ঞে আমার অতিথ্‌রা সব স্নানের উদ্যোগ করছেন।

সুনীতা

তবে এসো না বাবা আমরাও চীৎকার করে স্নানের উদ্যোগ করি,—আমরাও তো অতিথ্‌।

অর্দ্ধেন্দু

আপনারা একটু বসুন,—আমি ওদের একটু দেখে আস্‌ছি। ওদের অভিমান বড্ড,—দেখা শুনা সব স্বয়ং না করলে রেগে যান বড়ো। ওরা ভাবেন আমি ওদের যথেষ্ট আদর করিনে [প্রস্থান]

সুনীতা

[বনমালীকে] এটা তো পড়ার ঘর দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু এ কোণায় ঐ মশারিটাই বা টাঙানো কেন? [বিভাসবাবু খবরের কাগজ তুলিয়া পড়িতে লাগিলেন]

বনমালী

আজ্ঞে বড্ড মশা,—রাত্তিরে মশারী না টাঙালে কামড়ায় বড়।

সুনীতা

মশারী টাঙিয়ে পড়া-শোনা করেন বুঝি তোমাদের বাবু?

বনমালী

আজ্ঞে না, এইখানেই ঘুমোন্। বাড়ি ভরা সব অতিথি,—বাবুর শোবার ঘরও তাদের কৃপায় খালি নেই। আর

অতিথরা দিদিমণি আজও আছে কাল আছে, নড়েনও না সরেনও না। বাবুর খুবই কষ্ট হয় কিন্তু এমনি দেবতার মত মানুষ যে বাড়ি কেউ এলে তার একটু অযত্ন—অবহেলা অসুবিধে ঘট্‌তে দেন্ না।

সুনীতা

এরা বুঝি অনেক দিন ধরে আছেন?

বনমালী

অধিকাংশ। এই তো যোগেশবাবু আছেন তিন মাস। বিভূতিবাবু মাস চারেক। মনুবাবু সাড়ে তিন চার। তারপর আছেন অখিলবাবু, নন্দবাবু, অনুকূলবাবু এরা সব বছরের অধিকাংশ সময় এখানেই থাকেন। আর যারা এক সঙ্গে বেশী দিন থাকেন না তারা ঘুরে ঘুরেই আসেন, যান্।

সুনীতা

এরা বুঝি চাক্‌রির খোঁজে আসেন।

বনমালী

কেউ বলেন মোকর্দ্দমা কর্‌তে, কেউ বলেন চিকিচ্ছে করাতে, কেউ বা চাকরীর খোঁজে। তবে সত্যি বল্‌তে দিদিমণি কাউকেই কিছু করতে দেখিনি। দাদাবাবু সারা দুপুর অফিসে খেটে মরেন আর এরা সব দিব্যি তাসা পাশা, দাবা আর ঘুমিয়ে আরাম করেন।

সুনীতা

আর কোনো আপত্তি করেন না তোমাদের বাবু?

বনমালী

আজ্ঞে দিদিমণি তবে আর বলচি কি। বাবু মহাদেব কিছুতেই তাঁর আপত্তি নেই! কিন্তু দিদিমণি, আমার রাগ হয় ভারি। মাসের পর মাস এরা আল্‌সেমী ক'রে বাবুর ঘাড়ে ভর করে কাটাবে তা আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু বাবুর কাছে কিছুতো বলবার জো নেই। বলেন এরা এলে যেতে বল্‌তে পারিনে তো। অথচ দিদিমণি আমি শুনেচি ওরা সব বাবুকে বোকা চলে' আড়ালে ঠাট্টা করে। কেননা, ওদের বসিয়ে আরাম করিয়ে খাওয়াচ্ছে। [সুনীতা ভাবিতে লাগিল] আর এদের দৌরাত্ম্যির কি শেষ আছে দিদিমণি। পান-দোক্তা, চুরুট, তামাক, বিড়ি, লেমনেড্ সোডা, বরফ। কারুর দৈ-সন্দেশ। কারুর পোলাও মাংস। কারুর সুক্তো ঝোল। কারুর চাই পাঁপড় ভাজা, কারুর পলতা ভাজা। কারুর লুচি, কারুর পুরী, কারুর গরুর দুধ, কারুর ছাগলের দুধ,—ফরমাস কুলিয়ে আর পারিনে দিদিমণি। অথচ এক মিনিট দেরী হ'লে আর রক্ষে নেই, যেন ওরা সব—

সুনীতা

[বিভাসকে] বাবা শুন্‌চো [বিভাস ফিরিয়া তাকাইলেন] অর্দ্ধেন্দু বাবুর অতিথিদের সম্বন্ধে যা আমরা শুনেছিলাম সবই একেবারে ঠিক। [বনমালীকে দেখাইয়া] এই তো এর কাছ থেকে সব খবর শুনে নিলুম। ভদ্রলোকের ওপর এদের দৌরাত্ম্যের আর সীমা পরিসীমা নেই।

বিভাস

বেশী ভালো মানুষ হলে অমনি সকলে তাকে পেয়ে বসে। আমাদের দেশের লোকগুলিই এমনি যে লোকের উদারতার সুযোগ নিয়ে তার উপর অত্যাচারের ভার চাপাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না।

সুনীতা

কিন্তু এ আমার সহ্য হয় না। এর একটা প্রতিবিধান না ক'রে এখান থেকে আমি কিছুতেই যাব না। অম্‌নি কতগুলো লোফার বসে বসে দিনের পর দিন একজনের অন্ন-ধ্বংস করবে,—তার শোবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত রাখবে না—শুনলে আমার গা জ্বালা ক'রে ওঠে। আর এদের কি রকম সব ফাই-ফরমাস, তুমি যদি সব শুন্‌তে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে। যেন সব লাট সাহেব পোলাও, মাংস, দৈ-সন্দেশ, চপ্-কাট্‌লেট, লেমনেড-সোডা হুকুম করা মাত্র না পেলে বাবুরা রেগে লাল।

বিভাস

কিন্তু যার বাড়ী তারই যখন আপত্তি নেই তখন—

সুনীতা

তার আপত্তি নাই থাক্‌ল কিন্তু আমি বল্লুম এর একটা কিছু উপায় না করে আমি এ-বাড়ী থেকে নড়ব না কিছুতেই। আর কী অকৃতজ্ঞ লোকগুলো, ওঁর আতিথেয়তার ওপর জুলুম করে ভাবে বোকা পেয়ে ভারী ঠকাচ্ছে ওকে।

বনমালী

দিদিমণি আপনি এর একটা ব্যবস্থা করে দিন,—এ ার সহ্য হয় না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[প্রকাণ্ড বড় একটা ঘর। সমস্ত ঘর তক্তপোষে ভরা; াতে এক একজনের বিছানা পাতা রহিয়াছে। মেঝেতে তরঞ্চি পাতিয়াও কতগুলি বিছানা রচনা হইয়াছে। বড় াড় ছবিগুলির উপর কাহারও-কাহারও কাপড়-জামা ্লিতেছে। এখানে-ওখানে ময়লা ছেঁড়া জুতার ছড়াছড়ি। কাথাও তামাকের ছাই পড়িয়া আছে, কোথাও থুথু। ভাল ভাল কতগুলি চেয়ারে তামাক, টিকে প্রভৃতি বিরাজমান।

এই ঘরেতে এখানে ওখানে বিছানায় মেঝেতে বসিয়া আছে যোগেশ, মনু, মুকুন্দ, নন্দবাবু, মন্তু, টুনু, অখিল ইত্যাদি। পট উঠিলেই দেখা গেল তাহারা ভারী উত্তেজিত অবস্থায়।)

মুকুন্দ

কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসে রাজত্ব সুরু করলেন। তার প্রতাপ দেখ না,—দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

যোগেশ

অথচ আমরা যা নিজেরা তাই,—বাপকে নিয়ে তো ছুঁড়ি এখানে গিল্‌তে এসেচে—নয়ত কি ?

মনু

এ যেন হ'লো সার্ পরের ধনে পোদ্দারি,—বেশ মজা বাবা !

নন্দবাবু

কথায় বলে যার বিয়ে তার মনে নাই পাড়া-পড়শীর ঘুম নাই। এও যে তাই হ'লো।

অখিল

আজ তিন দিন ধরে পেস্তার সরবৎ পাওয়া যাচ্ছে না,—আর শালার ঐ চাকর হয়েছে যেমন বদমাস্। বল্লেই জোড় হাত,—আজ্ঞে,—দিদিমণির কাছে বলব। দিদিমণির কাছে বলবে তো আপ্যায়িত হয়ে গেলাম আর কি ! কি কাণ্ড দেখুন তো মশায় পেস্তার সরবত না খেয়ে মারা গেলুম যে।

মনু

টায়ার্ড হয়ে পড়ছি দাদা। দু-দিন ধরে কোকা আর পোচের দেখা নেই,—কতগুলি রুটি আর হালুয়া,—ব্যাটাকে বল্লুম, পাঁচটা ডিমের পোচ, ওতে আর এমন কি খরচ লাগে, —কেপ্‌টামো করোনা। সব কথাই দিদিমণিকে বল্‌বে। আর উড়ে আসা দিদিমণিটা এমনি হাড়-কঞ্জুষ,—হাত দিয়ে একটী ডিম গলে বদি। না খেয়ে না খেয়ে রোগা ইঁদুরটি হয়ে যাচ্ছি।

যোগেশ

আর বলো না ভায়া। কোথায় গেল ভোরের লুচি ডাল্‌না আর অমৃত্তি আর কোথাই বা গেল বৌ-বাজারের রাবড়ি। আর দুপুরে খেতে বসে কান্না পায় ভাই, মিছে বল্‌ছিনা কান্নাই পায়। আজ পাঁচ দিন ধরে মাংস খাই না, —আর চার রকমের মাছের জায়গায় দাঁড়িয়েছে এক রকম। তাও যদি এক টুকরোর বেশী পাওয়া যায়,- বলি সুখের আর রৈল কি।

একজন

স্বাস্থ্য টেকা ভার।

মুকুন্দ

আর ডাইনী মাগীর হুকুমে তিন ঘরের লোক আমাদের জড়ো করেছে এনে এক ঘরে,—যোগেশ বাবুর নাক ডাকের চোটে রাতে না পারি ঘুমোতে—আর তোমার অখিলের শরীর মর্দ্দানোর চোটে কাক ডাকার আগেই লাফিয়ে উঠতে হয়—জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

টুনু

এদিকে পাঁচ দিন থেকে বিড়ির পয়সা বন্ধ।

মনু

আর কাঁচির।

যোগেশ

আর তোমার যা আসে তাতে [কাসিয়া উঠিয়া মেঝেতে কফ ফেলিয়া] এক ছিলুম সাজা ভার।

অখিল

মোদ্দা ঐ ব্যাটা চাকরটা. আজ যদি পেস্তার সরবত না আনে তবে আর কথা নেই,—নাকের উপর বিরাশি শিক্কার

একখানা [ইঙ্গিতে ঘুষি বুঝাইয়া দিল] তারপর জেলে যেতে হয় সেও ভী আচ্ছা।

মুকুন্দ

চাকরের আর দোষ কি,—এ-সব ঐ মিটমিটে ভান ছুঁড়ির কারসাজী। কর্ত্তার আমাদের বয়স কাঁচা কিনা, ধিঙ্গী বিবি দিয়েছে মাথা ঘুরিয়ে। এখন ভাঁড়ার এসেছে ওর হাতে',—বাড়ির তিনি কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন।

যোগেশ

আর কর্ত্তার খুজে তো দেখাই পাওয়া যায় না,—দেখা হ'লে না হয় সব বলতে পারতাম। কদিন ধরে খাওয়াটা মোটেই যুতসই হচ্চে না,—বল্লে হয়ত পোলাও মাংস একদিন করতে পারত।

মনু

আর করতে পারত। তেমন উপন্যাস টুপান্যশ পড়েন নি তো নইলে দেখতেন কি করে মেয়েমানুষগুলি পুরুষকে বোকা বানিয়ে দেয়।

টুনু

কামরূপে ভেড়া বানায় যেমন। আচ্ছা ভেড়া বানিয়ে শেষে তার মাংস খায় নাকি ওখানে?

মুকুন্দ

মোটকথা এ অবস্থা আর সহ্য করা যায় না। আমি চুপ করে একটা সেদি নকার ছুঁড়ির কাছে হার মান্‌ব এ হেন ব্যক্তি আমি বটি না। এর একটা বিহিত না করলে নাম আমার মুকুন্দ বাড়ুয্যেই নয়

মনু

টায়ার্ড হয়ে পড়ছি দাদা

একজন

স্বাস্থ্যও ক্রমেই খারাপ হচ্চে।

যোগেশ

তেমন যুতসই একটা খাওয়াই হচ্চেনা। না হচ্ছে মাংস, না হয় পোলাও। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] আর রাব্‌ড়ী!

টুনু

কিন্তু কষ্ট হচ্চে বড় বিড়ি না খেয়ে। আজ পাঁচ পাঁচ দিন বিড়ি টানি না,—মুখের কথা নয়।

মুকুন্দ

অতএব বিহিত একটা করতেই হবে।

যোগেশ

অবশ্য। কিন্তু কথা হচ্চে [উপুড় হইয়া বিভূতিবাবুর প্রবেশ। ঘরে ঢুকিয়া চারদিক চাহিয়া সে যখন দেখিল যে সবাই মিত্র-শ্রেণীর তখন আগাইয়া দাঁড়াইল] এই যে আসুন বিভূতিবাবু। আমরা বলছিলাম কি না যে এমত অবস্থা তো আর সহ্য হয় না। অর্দ্ধেন্দুর পিতৃ-বন্ধুর এই লক্ষীছাড়ী মেয়েটার দৌরাত্ম্যে যে টেকা ভার হ'লো।

বিভূতি

[চটিয়া] তোমরা যেমন কাপুরুষ তেমনি সহ্য করচ এই অপব্যবহার। কেন হাতে কি তোমাদের জোর নেই নাকি, গলাতে শব্দ লোপ পেয়েছে নাকি? টেবিল ভাঙ্গ, চেয়ার ভাঙ্গ, বাতির বাল্‌ব্‌ ফাটাও, চীৎকার করে একটা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দাও। চাকরটাকে পিটাও, হতচ্ছাড়ী ছুঁড়িটাকে গাল দাও,—দেখ্‌বে সব গোলমাল চুকে যাবে যেমন ছিলে আবার দিব্যি তেমনি আরাম ক'রে থাকা যাবে।

মনু

কিন্তু আর শেষকালে কর্ত্তাবাবু যদি চটেমটে বেরিয়ে যেতে বলে দাদা তখন কি হবে মশায়।

বিভূতি

[ভেঙচাইয়া] বেরিয়ে যেতে বল্লেই হ'লো। আমরা যেন আইন জানিনা,—নোটিশ দিক আগে এক মাসের তবে তো উঠ্‌ব। আর তাইবা ধর, কেন,—আদালতে মোকদ্দমা টেনে ছাড়ব। এই বাড়িতে এদ্দিন ধরে আছি,—থাকার আমাদের একটা অধিকার হয়ে গেছে,—

মনু

ওসব মশায় চালাকি চল্‌বে না। পুলিশ ডেকে ঠেঙিয়ে তাড়াবে,—তারা সত্য বাতও বুঝ্‌বেনা মিথ্যে বাতও বুঝ্‌বেনা।

বিভূতি

মিথ্যে বাত কি রকম। হতচ্ছাড়া, তুমি আমার ব্যাধির উপর ইঙ্গিত করো। লজ্জা করেনা? বাত-বেদনায় এদিক ওদিক হ'তে পারিনা আর একটা অর্ব্বাচীন এসে বলবেন আমার বাত মিথ্যে। বলি, এখানে থাকার জন্য আমি তোদের মত কেয়ার করি না কি যে মিথ্যে ছল ক'রে আঁক্‌ড়ে থাক্‌ব? পাজী, শূয়ার,—

যোগেশ

আহা রাগেন কেন, বিভূতিবাবু। ওকি তাই বলেছে? ও বলছে পুলিশ এসে সত্য মিথ্যে দুই—[কাশিয়া কফ ফেলিল]

বিভূতি

[বাধা দিয়া] রাগি কেন? ওকি বলতে চায় সে কি আমি বুঝি না,—আমি কি হাবা, আমার মগজে কি অতটুকু বুদ্ধি নেই? আমি [সহসা মুখ বিকৃত করিয়া বেদনার অভিনয় করিয়া] উঃ মাগো [চেয়ার উল্টাইয়া পড়িতে যাইতেছিল, দু-একজন ধরিয়া ফেলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল। এমন সময় অন্য দরজা দিয়া প্রবেশ করিল গোপেশ্বর ভট্‌চায্‌]

গোপেশ্বর

[রাগিয়া] বাড়িটা এখন কার মশায় শুনি? এটার কি মালিক বদলে গেছে? বলি চন্দ্রকান্তবাবুর পুত্রের বাড়ি কি আর নয় এটা? নইলে কোথাকার এক নির্ল্লজ্জা এসে যাচ্ছে-তাই ক'রে বেড়াচ্ছে মশায়?

যোগেশ

ব্যাপার যেন তাই মনে হচ্চে। মশায়ে না খেয়ে না খেয়ে—

গোপেশ্বর

ভাত খাইনা বলে লুচির ব্যবস্থা করতে বলেছিলুম, আর এই চারদিন ধরে তার বদলে আস্‌চে কিনা মশায় আটার রুটী। শুক্‌তলির মত শক্ত,—দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়া যায় না। শুনি আমি কি খোট্টা যে রুটী চিবিয়ে জীবন ধারণ করব? বলুন তো মশায় কাণ্ড?

মুকুন্দ

তবে আর বলচি কি এতক্ষণ মশায়! রাজভোগ এসে ঠেকেচে কুলীর খাওয়ায়,—এবার কোন্ দিন না বলে বসে, ছাতু নয়ত উপোস।

গোপেশ্বর

বল্‌লেই হ'লো আর কি। মূর্খের দেখা পাইনা, নয়ত শুনিয়ে দিয়ে আসতাম গোপেশ্বর ভট্‌চায নিতান্ত আপনার লোক বলেই দয়া ক'রে এস্থানে উঠেছিল নইলে কলকাতা সহরে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখোপতি তাকে বাড়ি নেবার জন্য লালাচ্ছে।

যোগেশ

আর তিন দিন দেখি। তারপর খাওয়া দাওয়ার উন্নতি যদি না হয় তবে বাড়িই ফিরে যাব। এ-হেন খেয়ে বিদেশে থাকা আর পোষায় না।

টুনু

ডিমের পোচের আর আশা নেই।

মনু

আর বিড়ির

অখিল

পেস্তার সরবত না পেয়ে মারা য়াচ্চি।

মুকুন্দ

[দাঁড়াইয়া উঠিয়া] ভাই সব, আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করচি, মনযোগ দিয়া অবধান করুন্। অর্দ্ধেন্দুর পিতৃ-বন্ধুর পুত্রীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের,—অতিথিদের,—সেবায় এ-বাড়ীতে এ-হেন অ-মন-যোগ অবহেলা, এবং ইচ্ছাকৃত অপমান হচ্চে যে এর একটা বিহিত না করলেই কোনো মতে চলে না। আমি আপনাদের ইহার প্রতিকারের জন্য আহ্বান করছি। ভাই সব, সঙ্ঘবদ্ধ কাজের দ্বারা পৃথিবীতে কিই না ঘটানো চলে,—এই তো রিশ্‌ড়ার কুলীরা সেদিন ধর্ম্মঘট ক'রে এক আনা করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েচে। অতএব আপনাদের আমি আহ্বান করছি আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হউন,—আসুন একসঙ্গে আমরা ধর্ম্মঘট ক'রে বলি যে আমাদের খাওয়া দাওয়ার যদি উন্নতি না হয়, যোগেশবাবুর পোলাও, মাংস, মনুর পোচ, অখিলের

পেস্তার সরবত, ইন্দুর বিড়ি, গোপেশ্বরবাবুর মুচি, আমাদের বরফ, লেমনেড, তবে আমরা এক-যোগে নিরম্বু উপবাস ক'রে এই স্থানেই পড়ে থাক্‌বো। না খেয়ে এই স্থানেই আমরা দেহ ত্যাগ কর্‌ব –

একজন

আজ্ঞে আমি নতুন বিয়ে করেচি।

মুকুন্দ

চুপ কর মূর্খ। দেহ ত্যাগ কি আমরাই করব? ও শুধু ভীতি প্রদর্শন। তারপর দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথা গিয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা আর সহ্য হয় না। ভাইসব আমার প্রস্তাব আপনাদের সমূখে নিবেদন করলাম এখন এসম্বন্ধে আপনারা কি বলেন?

যোগেশ, গোপেশ্বর, মনু, টুনু, অখিল প্রভৃতি।

চমৎকার চমৎকার। এই একমাত্র উপায়। ধর্ম্মঘট ধর্ম্মঘট।

অন্য কয়জন

সে হয় না, সে হয় না, লজ্জার মাথা তা হ'লে খেতে হয়।

যোগেশ, গোপেশ্বর প্রভৃতি

তা ছাড়া উপায়?

অন্য কয়েকন

আর উপায়? উপায় নেই। এবার বাড়ি চল।

যোগেশ গোপেশ্বর প্রভৃতি

যাও কাপুরুষের দল,—একটা নির্ল্লজ্জা স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হয়ে ল্যাজুড় গুটিয়ে বাড়ি পালাও।

অন্য ক'জন

অপমানিত হয়েও বেহায়ার মত পড়ে থাকার চেয়ে সেটা ভাল।

গোপেশ্বর প্রভৃতি

কি আমরা বেহায়া? তোদের বাপ্ বেহায়া, তোদের চোদ্দ পুরুষ বেহায়া। [হৈ চৈ পড়িয়া গেল। উভয় পক্ষই ঘুষি উদ্যত করিল। মারামারি লাগে আর কি। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিল বনমালী]

বনমালী

আজ্ঞে আপনারা যদি একটু আস্তে কথাবার্ত্তা চালান্ তবে বড় সুবিধে হয়। দিদিমণির বড্ড মাথা ধরেচে।

মুকুন্দ

ধৃষ্ট, কে তুমি হে চুপ করতে বলবার? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার দিদিমণির মাথা ধরেচে তবে কি আমাদের মাথা কেটে ফেলতে হবে নাকি?

বনমালী

আজ্ঞে আমি কি আর তাই বল্লুম?

যোগেশ

তাই তো বল্‌লে, বল্লে না আবার কি রকম?

গোপেশ্বর

আস্তে কথা বল্‌ব? কেন, কার হুকুম? বলব না আস্তে। আরো চীৎকার করব। এসো তো সবাই— প্রচণ্ড চীৎকার করা যাক্। আস্তে কথা বল্‌বে,—যেন দায় পড়ে এসেচি এখানে! কত লাথোপতি—

মুকুন্দ

তোমার দিদিমণি এ কোলাহল সহ্য করতে না পারেন তবে অন্যত্র চলে যান্।

মনু

তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে এ-বাড়িতে রাখেনি তো কেউ।

বনমালী

আজ্ঞে, এ তারই বাড়ি,—তিনি আর যাবেন কোথায়?

যোগেন

কি রকম?

মুকুন্দ

[যোগেশ প্রভৃতিকে] বলেছিলুম কিনা যে ছুঁড়ি আমাদের কর্ত্তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। যা সোমত্ত মেয়ে, – তারপর কর্ত্তাটিও আইবুড়ো,—হবেনা কেন?

গোপেশ্বর

আরে আমরা কি আর বুঝিনা,—ঐ জন্তই উঠেছিলেন এসে এখানে।

বনমালী

আজ্ঞে বাড়িটা দিদিমণির বাবা কিনে নিয়েছেন। এখন এটা তাদেরই বাড়ি। [সকলে বিস্ময়ে চাহিল]

কয়েকজন

তবে তো আমাদের আজই চলে যেতে হবে।

মুকুন্দ

কি রকম আমাদের খবর না দিয়েই বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'লো! কি রকম কথা হ'ল এ শুনি।

যোগেশ

আমাদের কোনো ব্যবস্থা না করেই পালাল না কি ছোঁড়া?

গোপেশ্বর

সোজা কথা হচ্চে বাড়ি যারই হোক্ এখান থেকে আমরা উঠ্‌চি না।

মন্থু

আমাদের একটা occupancy right হয়ে গেছে। কিন্তু শোন চন্দর কথা হচ্চে এই যে আমার ডিমের পোচ্ হয়েছে?

অখিল

[গর্জ্জাইয়া] আর আমার পেস্তার সরবত।

গোপেশ্বর

আর আমার কাঁচা ছানা আর মিশ্রি। বলি সকলের খাবার তৈরী হয়েছে আমাদের?

বনমালী

আজ্ঞে রুটী আর হালুয়া প্রস্তুত আছে।

অখিল

আর আমার পেস্তার সরবত?

মন্থু

আমার পোচ?

গোপেশ্বর

আমার কাঁচা ছানা?

বনমালী

আজ্ঞে সে-সবের আমি কি বলব। দিদিমণি যা করতে বল্লেন তাই আমি করেছি বইত নয়। যার চাকর তার হুকুম ছাড়া আমি আর—[অখিল যেন লাগাইয়া দিবে এমনি রকম ঘুসি বাগাইতে লাগিল। গোপেশ্বর যেন রাগিয়া আগুণ। মন্থু বিরক্ত। যোগেশ পর্য্যন্ত দুঃখিত]

গোপেশ্বর

আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব তোমার রুটী আর হালুয়া।

অখিল

থেঁৎলে তোমায় হালুয়া বানিয়ে ছাড়ব।

মন্থু

ভোরে পোচ না হ'লে আমার চলেনা,—তোমাদের অত্যাচারে টায়ার্ড হয়ে পড়ছি দাদা। রুটী আর হালুয়া তোমার দিদিমণিকে দাও গে।

যোগেশ

রুটী আর হালুয়া একটা খাওয়া হলো—পেটে গেলে বমি হয়ে যাবে। [ধীরে ধীরে বনমালী ঘরের বাহির হইয়া গেল]

গোপেশ্বর

ব্যাটা চলেই গেল দেখা যায়।

মন্থু

পোচের আশা নেই।

অখিল

পেস্তার সরবত ও আর হ'লো না।

যোগেশ

কিন্তু ক্ষিধেতে পেট চোঁ-চোঁ করচে দাদা। রুটী হালুয়া নেহাৎ খারাপ জিনিষ নয়। কি বলেন মুকুন্দবাবু—

মুকুন্দ

তা বটে।

মন্থু

চলুন, যা পাওয়া যায় তাতেই লাভ।

গোপেশ্বর

[মুখ বিকৃত করিয়া] রুটী আর হালুয়া আবার একটা খাবার। তবে,—হ্যা চল। [সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

[অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল অর্দ্ধেন্দু ও একটু পরেই সুনীতা]

সুনীতা

কি ভয়ঙ্কর; আপনি এখানে কেন? সমস্ত প্লট্ এক্ষুনি মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে পেলে ওরা কি আর বশে থাক্‌বেন!

অর্দ্ধেন্দু

কিন্তু এর পরেই কি আমাকে আস্ত রাখ্‌বে?

সুনীতা

সেটা পরের কথা। বর্ত্তমানে আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেটা রক্ষা করাই আপনার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য! কেবল খাবার সময়ে চুপি চুপি বাড়ি আস্‌বেন আর অনেক রাত্তিরে শুতে। [হাসিয়া] বাড়ি তো আর আপনার নয় এখন, আমরা কিনে নিয়েচি;—আমি যা করব শুনতে হবে।

অর্দ্ধেন্দু

[আশঙ্কিত] সত্যি সত্যি ওদের তাই বলেচেন নাকি? বাড়ি বিক্রী করে' দিয়েচি?

সুনীতা

[হাসিয়া] দিদিমণির নামে অর্ডার পর্য্যন্ত সব পাশ্ হচ্চে বলেন কি। আর আমাকে কী গালাগালি ওরা দিচ্ছেন তার—

অর্দ্ধেন্দু

কেন মিছে মিছি আমার জন্য গালাগাল যেচে নিচ্ছেন? তার চেয়ে ওরা আছেন থাকুন, যদ্দিন পারি খাওয়াই। আর ওরা কি সহজেই এখান থেকে যাবেন মনে করেছেন?

সুনীতা

অতিথিদের জন্য আপনার একটা মায়া হ'য়ে গেছে সন্দেহ হচ্চে আমার কিন্তু একটু মায়াও নেই। আপনার বাড়িটা একটা আলসের আড্ডা হয়ে উঠবে, ভালোমানুষ পেয়ে যত রাজ্যের যত ভ্যাগাবণ্ড এসে অত্যাচার লাগাবে আপনার ওপর সে আমি সহ্য করতে পারিনে। নইলে পরশুই তো আমাদের চলে যাবার দিন ছিল,—বাবাকে কিছুতেই যেতে দিলুম না।

অর্দ্ধেন্দু

তা আপনারাই বা অত শীগগির চলে যাবেন কেন?

সুনীতা

আপনার অতিথদের না তাড়িয়ে আমি যাচ্ছি না।

অর্দ্ধেন্দু

তারপর?

সুনীতা

তারপর আর কি। তারপর চলে যাব।

অর্দ্ধেন্দু

[অন্যমনস্কভাবে সুনীতার দিকে চাহিয়া] কেন?

সুনীতা

[হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] কেন? কেন আবার কি। আপনার অতিথদের ওপর বড্ড মায়া দেখতে পাই।

অর্দ্ধেন্দু

[মৃদু হাসিয়া] বড্ড।

সুনীতা

[ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া] উঃ, আপনাকে ভদ্রলোকেরা এ কদিন ধরে কি জ্বালাতনই করেছে তাই শুধু আমি ভাবি। অথচ আপনি যে কিছু করবেন তা আপনার দ্বারা হয়ে ওঠে নি। অত মুখ-চোরা কেন আপনি?

অর্দ্ধেন্দু

মুখ খুলব তবে?

সুনীতা

আমার কাছে নয়, ওদের কাছে গিয়ে খুলুন।

অর্দ্ধেন্দু

[মৃদু হাসিয়া] ওদের কাছে নয়, শুধু আপনার কাছে।

সুনীতা

[লজ্জিত ভাবে] তাতে বীরত্ব নেই কিছু।

অর্দ্ধেন্দু

বীরত্ব? বীরত্ব চাই নে। বীরত্বে আমার কী হবে বলুন তো,—সেই সম্মানের বুদ্বুদ্—সেক্সপীয়ার যাকে বলেছে,—bubble reputation,—তা দিয়ে আমার কি প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন—

সুনীতা

থাক্ থাক্ যথেষ্ট মুখ খুলেছে। আর খুলতে হবে না।

অর্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] কেবল আরম্ভ হ'লোতো

সুনীতা

শেষও এইখানেই করুন। যারা খেতে গিয়েছিল তারা ফিরলেন বলে। আর এসেই যদি দেখেন যে বাড়ির ভূতপূর্ব্ব [হাসিয়া] মালিক এইখেনে বসে আছে তবে একটা বিপ্লব না বাধিয়ে আর ছাড়বেন না।

অর্দ্ধেন্দু

বীরত্ব দেখাবার তবে একটা ক্ষেত্র পাওয়া যাবে,—আমার বীরত্ব নেই বলে আপনার যে আক্ষেপ সেটা দূর ক'রে দেওয়া যেত।

সুনীতা

[হাসিয়া] আমার কাছে দাঁড়িয়ে যেটা বীরত্বের বড়াই করছে সেটা ওদের সুমুখে জলে না দাঁড়ালে বাঁচি।

অর্দ্ধেন্দু

আপনার সঙ্গে আর কথায় পারা যাবে না। অতএব কি করতে হবে বলুন।

সুনীতা

শীগগির পলায়ন করুন,—ওদের আসার আগেই। সেটা বীরদের না হ'লেও মহাজনদের পন্থা। আর বীরদের প্রতি আপনার যেমন বিরাগ মহাজনদের প্রতি তেমান ভক্তি। পলায়ন আপনাকে মানাবে ভালো।

অর্দ্ধেন্দু

আপনাকে বাড়ি থেকে একাদন তাড়িয়ে বীরত্বের পরিচয় আমি একটা দেবই।

সুনীতা,

দেখা যাবে।

অর্দ্ধেন্দু

কিন্তু আমার জামার বোতামটা যে ছিঁড়ে গেছে,—এখন বের হই কি ক'রে। চলুন একটু শেলাই ক'রে দেবেন।

সুনীতা

[মুখ টিপিয়া হাসিয়া] যান্, আমি বনমালীকে পাঠিয়ে দিচ্চি। ও শেলাই করে ভালো।

অৰ্দ্ধেন্দু

থাক্ গে, আর একটা জামা পরে' যাবো এখন। [প্রস্থান]

[একটু হাসিয়া লইয়া সুনীতাও বাহির হইয়া গেল। তখন অন্য দরজা দিয়া অতিথিরা কোলাহল করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। পট পতন]

তৃতীয় দৃশ্য।

[সেই একই ঘর। অতগুলি তক্তপোষ আর নাই। পাশাপাশি তিনটা তক্তপোষ এক-ধারে বিদ্যমান। আর এক ধারে একটা তক্তপোষ খালি পড়িয়া আছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন। এখানে ওখানে টিকে-তামাকের ছাই, কাগজ ছেঁড়া এইসব পড়িয়া আছে। সময় সন্ধ্যা।

পট উঠিলে দেখা গেল নিজ নিজ তক্তপোষে বসিয়া আছে মুকুন্দ, বিভূতি-বুড়ো এবং গোপেশ্বর। বিভূতি আলবোলা টানিতেছে। গোপেশ্বর ক্রুদ্ধ। মুকুন্দ মর্ম্মাহত।

মুকুন্দ

লজ্জার কথা। নিতান্তই লজ্জার কথা। একে-একে সবগুলি কাপুরুষই রণে ভঙ্গ প্রদান করে পলায়ন করল।

বিভূতি

[চটিয়া] জাহান্নমে যাক্ তারা।

গোপেশ্বর

এই কাপুরুষরা কেনই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে,—যে জননীগণ এহেন সন্তান প্রসব করে তাদেরও আক্কেল বলি।

মুকুন্দ

অথচ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করলে কে তাদের সরায়। দিব্যি আনন্দে সবাই একত্র বসবাস করা যেত।

গোপেশ্বর

মোট কথা তারা যাক্ আর থাকুক্ নিদেন গোপেশ্বর ভট্‌চায এখান থেকে নড়চেনা। যেতে পারতাম কত লাখোপতির কাছেই কিন্তু কেন যাব শুনি? চন্দ্রকান্তবাবুর অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রের অতিথদের বঞ্চিত করে' পিতৃগৃহ বিক্রী করার কোন্ অধিকারটা আছে মশায়?

বিভূতি

অধিকার আছে কিনা জান্‌তে চাইনা,—আমার বাত নিয়ে আমি সরি কোথায়? চল্লেই হ'লো। এইখানে,—এইখানেই আমি থাক্‌ব,—দেখি কার বাপের সাধ্যি সরায়।

গোপেশ্বর

রইলাম আমিও। এ-বাড়ির ইট-কাঠ যদ্দিন আছে, আমিও আছি।

মুকুন্দ

কাপুরুষরা গেছে যাক্, কিন্তু এ শর্ম্মা আরো শক্ত ধাতুর। চন্দ্র সূর্য্য কক্ষ থেকে ছিট্‌কে পড়্‌বে তো আমি এখান থেকে নড়্‌বনা।

গোপেশ্বর

নড়্‌ব কেন? কার কথায়? বাড়ি যদি বিক্রী হয়েই থাকে তবু ক্রেতা কোনমতে বিক্রেতার অতিথদের সেবার দায় এড়াতে পারে না। আইনের কথা আর আমাকে শেখাতে হবেনা, সব ঠোঁটাগ্রে। কম দিন নায়েবী করেচি নাকি। আর বরখাস্ত হয়েছি কোন্ শালা বলে,—নিজের ইচ্ছায় কাজে ইস্তাফা দিয়ে এসেচে গোপেশ্বর ভট্‌চায, নয়ত কি!

বিভূতি

এক কথা আমার,—এস্থান হ'তে পাদমেকম্ ন গচ্ছাম।

মুকুন্দ

ঠিক্ ঠিক্ ঐ যোগেন ভট্‌চাযিার মস্ত ছোঁড়ার ভেবেছিলুম সাহস টাহস আছে। অখিলের মুগুর ভাজাই সার। সবগুলিই শেষে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এ শর্ম্মার কাছে চালাকি নয়। কমই খেতে দাও, শোবার অসুবিধে কর, মার ধোর্ যা ই'চ্ছে করতে পার, কিন্তু হার স্বীকার করবনা কোনো দিন।

গোপেশ্বর

দেখি হারেই কে আর জেতেই কে। যে সে লোকের হাতে পড়নি বাবা, নন্দনপুরের নায়েব একটা কেউ-কেটা নয়। যার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়, তারই সাথে লড়্‌তে এসেচে সে দিনের এক ছুঁড়ী।

বিভূতি

[চটিয়া] নারী-জাত অতীব অধম জাত।

মুকুন্দ

আজ্ঞে যা বলেছেন। পৃথিবীতে যত হাঙ্গামা বাধে এই এদের জন্য।

গোপেশ্বর

নারী-জাতি ধরা-পৃষ্ঠ হ'তে বিলুপ্ত হ'লে শান্তিতে থাকা যেতো মশায়। তবে পুত্রের জন্মে বিঘ্ন হ'তো, এই যা। শুনেচি পুৎ নরক নাকি অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। এরই জন্যই তো মশায় গিন্নীকে সহ্য করে থাকি, নইলে পরে—দেখোত মুকুন্দবাবু, রাত বাজে কটা।

মুকুন্দ

এইতো সন্ধ্যা হ'লো মাত্র। আর কি মুস্কিল বলুন তো মশায়, দুপুরের ঘুম ঘুমিয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই রোজ দেখি রাত্রি হয়ে গেছে।

গোপেশ্বর

তা দিবা নিদ্রা অবহেলার জিনিষ নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ওটা অপরিহার্য্য। দুপুরে যদি না ঘুমোও দেখ্‌তে দেখ্‌তে কদিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়্‌বে।

বিভূতি

তাই যদি না হবে তবে আর আমি সারাক্ষণ শুয়ে থাকি কেন? আর মাসখানেক যদি নির্ব্বিঘ্নে শুয়ে কাটাতে পারি তবে অসুখ বিসুখ কি আর ঘেঁষ্‌তে পার্‌বে? তবে খাওয়াটা যুৎসই চাই। কিন্তু কি অবিবেচকের পাল্লায়ই প'ড়েছি যে এদিকে কোনই দৃষ্টি নেই। এখন স্বাস্থ্য থাকে কি ক'রে হ্যা?

মুকুন্দ

একা যদি পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাও রাজী মোদ্দা এ দেহে জীবন থাক্‌তে এ স্থান থেকে নড়ছি না। কাল থেকে বেড়াতেও আর যাব না। কে জানে মশায় দেউড়ীর গেট যদি বন্ধ করে দেয় তবেই গেল।

গোপেশ্বর

যা বলেছ দাদা। বরঞ্চ—[এমন সময় বনমালী ঘরে প্রবেশ করিল। তার হাতে গোটা-দুয়েক বালিশ, বিছনার চাদর ইত্যাদি। পরিত্যক্ত বিছানাটার কাছে গিয়া সে চাদর বালিশ পাতিয়া ঠিক করিল। উল্টো দিকের একটা দরজা অর্দ্ধেক খোলা হইল! তার ভিতর দিয়া দেখা গেল সুনীতাকে। সে ইসারা করিয়া কি যেন বনমালীকে বুঝাইয়া দিল]

মুকুন্দ

এ বিছানা হচ্চে কার?

বনমালী

আজ্ঞে দিদিমণির এক পিস্‌তুত ভাইয়ের মামাশ্বশুরের।

গোপেশ্বর

ভালো ভালো। তোমার দিদিমণির যে দিল্ বড় দরাজ হয়ে গেছে,—নইলে অতিথিকে দরজা থেকে বিদায় না করে শোবার জায়গাও একটা করে দেওয়া হচ্চে। বড় কম কথা নয়।

বিভূতি

[চটিয়া] অতিথ্ যে দেবতা সে জ্ঞানটা এদ্দিনে হয়েছে নাকি?

বনমালী

আজ্ঞে না, সে ভদ্রলোক নেহাৎ ঠেকায় পড়েই এখানে এসে উপস্থিত হচ্চেন। হোটেলেই এসে তো তিনি বরাবর ওঠেন কিন্তু এবার কোনো হোটেলে—মেসে নেবে না তার তাকে।

মুকুন্দ

কেন হে ফেরারী নাকি?

গোপেশ্বর

তবে তো তাকে এ-ঘরে থাক্‌বে দিতে পারিনে। আমার ব্যাগে কম ক'রে কোন্ তিন চার টাকা না আছে!

বিভূতি

[চটিয়া] কী এত বড় আস্পর্দ্ধা,—চোর বাট্‌পাড় সঙ্গী কর্‌বে আমাদের! জাননা আমরা কোন বংশ জাত? গোকুল-ডাঙার বাড়ুয্যের বংশের—

বনমালী

আজ্ঞে না, তিনি চোর বাট্‌পাড় মোটেই নন্,—সকালে বিকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন,—নিরিমিষ খান্,—

মুকুন্দ

অমন বক-ধার্ম্মিক অনেক ব্যাটাকেই দেখা গেছে,—তাই ব'লে ভদ্রলোকের সাধু সঙ্গ তার জন্য নয়। অন্যত্র তার ব্যবস্থা করো।

বনমালী

আজ্ঞে জানেন তো অন্য সব ঘরই চুণকাম হচ্চে। দিদিমণির, বড় বাবুর আর আপনাদের এই তিন ঘর বাদে সবগুলি বাঁশে আর চুণে ঠাসা। আর একটা জায়গা নেই যে তাতে শোবার ব্যবস্থা করতে পারি। [বনমালী চলিয়া যাইতে যাইতে ঘরের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা দরজা অর্দ্ধেক ফাঁক হইল। দেখা গেল সুনীতা তাকে ইসারাতে কি বলিতেছে]

বনমালী

[ফিরিয়া আসিয়া] আজ্ঞে আপনাদের সব টিকে হয়েছে তো?

গোপেশ্বর

দুই ছিলুম টানা যায় মা তো টিকে হয়েছে। কত পয়সার টিকে আনো শুনি?

বনমালী

আজ্ঞে আমি সে কথা বলছি না। বলি বসন্তের টিকে নিয়েছেন আপনারা?

মুকুন্দ

[শঙ্কিত হইয়া] কেন হে চন্দর, বলি সহরে মা শেত্‌লার গুরুতর প্রকোপ আরম্ভ হয়েছে নাকি? [হাত জোড় করিয়া শীতলার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া] কী ভয়ানক ব্যামো দাদা, টিকে দাও আর না দাও কি আর এসে গেল। যেবার পরিবারের ওপর হয় মা শেত্‌লার দয়া,—সেই নি শোনা মুকুন্দ চকোর্ত্তীকে আর কোন্ শালা ঘরে

বেঁধে রাখে। বাপ্‌রে বাপ্‌ কি ব্যামো,—শুন্‌লে গা শিউরে ওঠে [আবার হাত জোড় করিয়া প্রণাম]

বনমালী

আজ্ঞে না টিকে হ'লে আর তেমন ভয় নেই। তবু একটু সাবধানে থাক্‌বেন। দেখ্‌বেন যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়,—একই ঘর কিনা একটু সতর্ক থাকা ভালো।

মুকুন্দ

[শঙ্কিত] ছোঁয়াছুঁয়ি! ছোঁয়াছুঁয়ি কার সাথে!

বনমালী

আজ্ঞে ঐতো দিদিমণির পিসতুত ভাইয়ের মামাশ্বশুরের সাথে। এই বিছানাই ওর থাকার ব্যবস্থা করা হ'লো কিনা। কি বল্‌ব বাবু সারা গা ছেয়ে গিয়েছে,—

মুকুন্দ

কী সর্ব্বনাশ!

বিভূতি

কোন্‌ শালা আনে তাকে দেখি। খপরদার—

গোপেশ্বর

বলি এইখেনে আনার কি দরকার। ইচ্ছে হ'লেই হ'লো আর কি,—আমরা কি আর মানুষ নই,—আমাদের জীবনের মূল্য তুমি মূর্খ কি জান? নন্দনপুরের নায়েব, একটা কেউ কেটা নয়। আর মহামারীগ্রস্ত একটা কুলাঙ্গারকে বাড়িতে স্থান দেবার কোন্‌ প্রয়োজনটা হ'লো?

বনমালী

আজ্ঞে একটা লোক অচিকিৎসায় অশুশ্রূষায় বিঘোরে বিদেশে এসে প্রাণ হারাবে সেই কি আর একটা ভালো কথা হ'লো! তাইতো দিদিমণি তাকে থাক্‌তে বল্লেন। আর ঘর ঠিক নেই বলেই তো আপনাদের এখানে আন্‌তে হ'লো নইলে আর,—হ্যাঁ যাই, শ্যালদর কাছে এক হোটেলে তিনি পড়ে আছেন। আনবার ব্যবস্থা করি গে। [প্রস্থান]

বিভূতি

ধৃষ্টতা দেখে মারা যাই। না যদি থাক্‌তো পিঠে বাতের বেদনা তবে দেখে নিতাম কোন্‌ শালা আসে ঘরে।

গোপেশ্বর

সম্মুখ রণে না পেরে এখন যমকে লেলিয়ে দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু বাবু যে সে লোক নই আমি,—রইলুম এখানে,—তা মহামারীই আসুক আর প্লেগই আসুক।

মুকুন্দ

না মশাই, আমি আর না। যে স্থানে মায়ের দয়া [নমস্কার করিয়া] সে স্থানে আমি আর নই। প্রাণে বাঁচলে তবে তো মশায় থাকা আর খাওয়া। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়,—এক্ষণি আমি চল্লুম। [বোচ্‌কা গুছাইয়া ছাতা লইয়া হাস্যকর দ্রুততার সহিত প্রস্থান]

গোপেশ্বর

নিতান্ত কাপুরুষ! পলায়ন করল।

বিভূতি

[ক্রুদ্ধভাবে] আসুক সেই মহামারীগ্রস্ত নরাধম। এক দিনেই তার পঞ্চত্বের ব্যবস্থা না করি তো আমার নাম বিভূতিই নয়। কিন্তু তার ভয়ে নড়্‌ব? হাস্যকর!

গোপেশ্বর

আমরা আজও রইলাম, কালও রইলাম।

[দরজা খুলিয়া এমন সময় প্রবেশ করিল বনমালী। তার পিছনেই হ্যাট্‌-কোট পরিয়া একজন লোক। তাহার বুক-পকেট হইতে ষ্টেথিস্কোপ উঁকি দিতেছে। ডাক্তার নিশ্চয়। [আর একটা দরজা অর্দ্ধেক ফাঁক হইলে দেখা গেল সুনীতা কি ইসারা করিতেছে]

বনমালী

[ডাক্তার কে] আজ্ঞে ইনিই রোগী,—বহুদিন যাবত পিঠে বাতের ব্যথা হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। [বিভূতিকে] ইনি হ'লেন ডাক্তার সাহেব। বহুদিন ধরে শুধু-শুধু কষ্ট পাচ্ছেন এই জন্য দিদিমণি শেষে এঁকেই আনালেন।

বিভূতি

[বিরক্ত] মশায়ের নাম কি?

ডাক্তার

নাম দিয়ে আর কি হবে? তবে জেনে রাখুন আমি বাত-রোগের স্পেশালিষ্ট্‌। [আগাইয়া আসিয়া] বেদনাটা কোথায় দেখি।

বিভূতি

কত চুল-পাকা টাক-ওয়ালা বদ্যি-হেকিম হাঁড়ির হাল্‌ আর সেদিনকার এক ছোকড়া এসেছেন চিকিচ্ছে কর্‌তে।

ডাক্তার

দেখুন, কথা কাটাকাটি করবার আমার সময় নেই। চৌষট্টি টাকার একটা ভিজিটের জন্য আর দু-ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে পারিনা। বেদনাটা কোথায় বলুন।

বনমালী

আজ্ঞে ওনার বেদনা হচ্ছে পিঠে। কী কষ্টটা মাস তিনেক ধরে পাচ্ছেন সে আর কি বলব। বিছানায় শুয়ে শুয়েই খাওয়া-পরা, মাথা ধোওয়া,- একটু নড়লে চড়লেই পিঠের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠে।

ডাক্তার

কদ্দিন ধরে বল্লে?

বনমালী

মাস তিনেকের ওপরে হবে।

ডাক্তার

কি, মাস তিনেক ধরে পিঠে বেদনা,—আর কোনো ওষুধেই সারেনা! সিরীয়াস্ কেস্, বলি পেকে টেকে যায় নাই তো [বিভূতির উপর ঝুকিয়া পড়িয়া] উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন দেখি। [বিভূতি অনিচ্ছার অভিনয় করিল। কিন্তু ডাক্তার এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপর নানা রকম ভাবে সেই স্থানের পরীক্ষা চলিল। কাসুন তো একবার [বিভূতির তথাকরণ] জোরে নিঃশ্বাস নিন্ [তথাকরণ] [পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তার-পর আঙ্গুল দিয়া পিঠটা টিপিয়া বিমর্ষ মুখে সরিয়া বসিল] [বনমালীকে] কোন্ ডাক্তার এতদিন ওর চিকিৎসা করেছিল বলোতো,—তার নামে আমি কেস্ করব। এ অত্যন্ত সিরীয়াস্ অবস্থা,—যখন—তখন একটা যা-তা হয়ে যেতে পারে। অথচ সেই হাতুড়ে ডাক্তার এতদিন টেরও পেলনা।

বনমালী

[শঙ্কিতভাবে] আজ্ঞে অবস্থা কি খুব খারাপ ?

ডাক্তার

খারাপ ? এর চেয়ে খারাপ কেস্ আমার হাতে পড়েনি কখনো। সমস্ত পিঠ একেবারে পেকে গেছে।

বনমালী

এখন উপায় ?

বিভূতি

কোথাকার তুমি ডাক্তার ভয় দেখাতে এসেচ। বলি পাকা ডাক্তার যে হয়ে উঠেচ, কটা রোগী মরেছে তোমার হাতে ? শতমারী না হ'লে আবার বদ্যি কি রকম!

ডাক্তার

চুপ করুন্, অল্প ষ্ট্রেইন্ হ'লেই হার্ট-ফেল্ করা অসম্ভব নয়।

বনমালী

এখন কি উপায় ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার

যদি বাঁচাতে হয় এক্ষুণি ওর পিঠে অস্ত্র করতে হবে। সারা পিঠটা আক্রান্ত, ক্লোরোফর্ম্ম করে সারা পিঠ না ফেঁড়ে ফেল্‌লে সেপ্‌টিক হয়ে মরবে। তুমি গরম জল করতে বলে দাও, আমি আধঘণ্টার ভেতরই অস্ত্রটস্ত্র নিয়ে এসে হাজির হব।

বিভূতি

এত গণ্ডা ডাক্তার কবরেজ গেল কেউ অস্ত্র করল না আর বিলেত থেকে বড় বিদ্যে শিখে এসেচেন অস্ত্র না করলে তার চলেনা। ওষুধ দাও মাখতে পারি,—কাটাকুটি মরে গেলেও করতে দেবনা। পিঠটা আমার সে জ্ঞান আছে তো ?

ডাক্তার

তা আছে। কিন্তু আপনি রাজী হন্ আর নাই হ'ন্ আমাকে কর্ত্তব্যের খাতিরে অস্ত্র করতেই হবে। আর অত বড় একটা অ-পারেশান্ মেজর মিত্রকেই ডেকে আন্‌ব মনে করছি। কারণ একটু এদিক ও-দিক হ'লে আর রক্ষা নাই।

বিভূতি

কোন্ শালা অস্ত্র করে আমার পিঠে।

ডাক্তার

[বনমালীকে] অস্ত্রের কথা শুনে এর ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সন্দেহ হচ্চে। দেখো ইনি যেন বিছানা থেকে উঠে পালাতে না চেষ্টা করেন। আমি শীগ্‌গীরেই অস্ত্রশস্ত্র-গুলি আর মেজর মিত্রকে নিয়ে আস্‌ছি। আর গরম জল যেন ঠিক থাকে। [ডাক্তারের প্রস্থান।]

বনমালী

[বিভূতিকে] উঠে বস্‌তে চেষ্টা করবেন না কিন্তু বাবু। ভয়ের আর এতে কি আছে ; অস্ত্র হ'তে গিয়ে অনেকে মারা পড়ে বলে আপনিও যে মর্‌বেন তার কি কথা আছে [প্রস্থান]

বিভূতি

[গোপেশ্বরকে] কাণ্ডখানা দেখুন তো মশায়, কাণ্ডখানা দেখুন তো। কোথা থেকে এক ভুঁইফোঁড় এসে বলে বস্‌লেন কিনা পিঠ ফেঁড়ে ফেলবেন। এখন কি করি মশায় বলুন তো,—এখন উপায়টা কি করি,—এযে সত্যি সত্যি ছুরি আন্‌তে ছুটল।

গোপেশ্বর

পিঠ যদি পেকে' যেয়ে থাকে তবে অস্ত্র না করে আর করে কি ?

বিভূতি

পিঠ পেকেছে না ওর মাথা হয়েছে। মশায় আমার অসুখ, আমি জানিনে ? পিঠ আমার পাকা দূরের কথা এমন কি বেদনার বংশও পিঠের আশে-পাশে নেই। বাত মশায় আমার কোনো কালে ছিলনা।

গোপেশ্বর

তবে ?

বিভূতি

তবে আর কি। বাতের নাম দিয়ে ক'মাস ছিলাম সুখে, তা মশায় ভাগ্যে সে সুখও সইলনা। ব্যাপার ক্রমেই

সঙ্গীন হয়ে আস্‌ছে,—শেষে সুস্থ পিঠেই ব্যাটারা ছুরি লাগাবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখন উপায়টা কি করি বলুন তো,—জীবনটা শেষে খোয়াব নাকি।

গোপেশ্বর

তবে মশায় আর দেরী কর্‌বেন না। ব্যাটারা এসে পড়বার আগেই পোট্‌লা পুটুলি নিয়ে সটান চম্পট দিন্।

বিভূতি

[উঠিয়া দাঁড়াইয়া] তা ছাড়া আর উপায় নাই। [পোট্‌লা পুটুলি গুছাইয়া লইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া এক ছুট্]

গোপেশ্বর

[হাই তুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া] যাই একটু জলটল খেয়ে আসি। নবাবপুত্র ব্যাটাদের ডেকে তো আর পাওয়া যাবে না। [তখন অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল সুনীতা, অর্দ্ধেন্দু, বনমালী]

সুনীতা

[অর্দ্ধেন্দুকে] আপনার সোফারটা যে অত ভাল থিয়েটার করতে পারে তা আমি ভাব্‌তেই পারতুম না। অথচ ডাক্তারের পার্টটা করে এলো একেবারে নিখুঁত।

অর্দ্ধেন্দু

বুড়োটা যে মিথ্যে করে এদ্দিন বাতের অভিনয় করেছিল সেটা আমি ভাব্‌তেই পারিনি,—সেটা সোফারের চেয়েও ভালো হয়েছিল। তবে এদের এম্‌নি ক'রে তাড়ান কি ঠিক হচ্ছে।

সুনীতা

একশোবার হচ্চে। যারা শঠতা করে পরের ঘাড়ে পা দিয়ে থাক্‌বে, নির্ব্বোধ না হ'লে আর কেউ তাদের চিরদিন সহ্য করেনা।

অর্দ্ধেন্দু

কিন্তু—

সুনীতা

কিন্তু কিছু নয়। আপনি এখন চুপ করে থাকুন। দেখুন ব'সে বসে' কেমন ক'রে এই গোফ্-আলা গোপেশ্বরকে তাড়াই। এটা কি ভয়ানক মানুষ বলুন, একেবারে আঠার মত আটকে রয়েচে। অথচ ওকেই নাকি কত লাখোপতি বাড়ি নেবার জন্য লালাচ্ছিল। [বনমালীকে] দেখ ঠিক যখন শ' আটটা বাজ্‌বে, তখন দেবে সব মসালগুলিতে আলো জেলে! আর চাকরগুলিকে সব জোগাড় করে ঠিক ঐ গোপেশ্বর বাবুর ঘরের পাশে এক-একটা করে মসাল হাতে দাঁড় করিয়ে দেবে। আর বিস্তর ধুপ ছিটিয়ে দেবে তার ওপর,—আগুন যেন খুব উঁচুতে ওঠে। আর ফট্‌কা ছোটাবে, আর সব হৈ-হৈ চাৎকার। রীতিমত একটা অগ্নি কাণ্ড করা চাই। তারপর দেখি বুড়ো কেমন করে বাড়ির বের না হয়। তোমার ঠিক আছে তো সব, যেমন সব বলে দিয়েছিলাম।

বনমালী

সব ঠিক দিদিমণি।

অর্দ্ধেন্দু

তার চেয়ে সোজাসুজি বলে দিলেই তো হ'তো।

সুনীতা

সোজাসুজি বলে দিলে হ'তো কিনা এ সম্বন্ধে আমার বিস্তর সন্দেহ আছে,—আর সন্দেহ যে অমূলক নয় তা আপনিও জানেন। কিন্তু বুড়োকে খানিকটা শাস্তি না দিয়ে আমি ছাড়্‌বনা কিছুতেই। [বনমালীকে] আর দারোয়ানকে আবার বলে রেখ যেই বুড়ো ফটকের বার হয়েছে,—অমনি গেট্ দেবে আট্‌কিয়ে। লাখোপতির বাড়িতেই এখন ওর যাওয়া দরকার। নইলে তারা রাগ হবে যে। [অর্দ্ধেন্দুকে] আসুন এখন আমরা থাই,—অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রায় হ'য়ে এলো। [হাসিয়া] বাড়ি আপ্‌নার ইস্পিওর করা আছে তো ?

অর্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] আছে,—আপনার কাছে।

[সকলের প্রস্থান]

[একটু পরে গোপেশ্বর পুনঃ প্রবেশ করিল।]

গোপেশ্বর

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে যে অল্প-নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রশস্ত। অতএব স্বাস্থ্য লাভে আর বাধা কি। [বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। একটুক্ষণ শান্তিতে কাটিল। গোপেশ্বরের তন্দ্রা আসিয়াও ছিল। সহসা কক্ষের চারিদিক আগুনের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—তাহাদের শিখা যেন ঘরের ভিতরও প্রবেশ করিতেছে। ফট্‌ফট্ শব্দ হইতেছে। আগুন আগুন বলিয়া আর্ত্ত ভীত চীৎকার উঠিল,—চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

ঘুম-বিজড়িত চোখে উঠিয়া বসিয়া গোপেশ্বর ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কোথা হইতে আগুনের আঁচ আসে। ফট্‌ফট্ করিয়া বুঝি দুয়ার জান্‌লা ফাটিতেছে। আগুন—আগুন বলিয়া বিষম কোলাহল। [সহসা সেই ডাক্তারের প্রবেশ।]

ডাক্তার

পালান্ পালান্ মশাই। বাড়ি-ঘর পুড়ে' ছাই হয়ে গেল। আর এক মিনিট দেরী করলে পুড়ে আপনিও কয়লা হয়ে যাবেন। শীগ্‌গীর আসুন আমার সাথে।

গোপেশ্বর

[চীৎকার] কী সর্ব্বনাশ কী সর্ব্বনাশ, পৈত্রিক্-প্রাণটা খোয়ালাম শেষে। মাগো আমার কি হবে গো। বাবা! বাবা!

ডাক্তার

চলে আসুন্।

গোপেশ্বর

আমার ব্যাগ্ যে পড়ে রইল [কান্না]

ডাক্তার

তবে পুড়ে ছাই হোন্।

গোপেশ্বর

ওরে বাবা যাই কোথা, চারদিকে যে আগুণ। এবার যদি প্রাণে বাঁচি তো কানমলা,—গিন্নীর পাশ ছেড়ে আর এক মুহূর্ত্ত কোথাও নড়্ব না [দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ডাক্তারের আগেই ছুট্ দিল। কাছা খুলিয়া গেল। ব্যাগ পড়িয়া রহিল। চেয়ারের সাথে গুঁতা খাইল। আশে-পাশের জিনিষ-পত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া খালি গায়ে খালি পায়ে গোপেশ্বর বাহির হইয়া গেল। পিছনে পিছনে হাসিয়া ডাক্তারের প্রস্থান।

কিছুক্ষণ রঙ্গমঞ্চ খালি রহিল। আগুণের চিহ্নমাত্র নাই। ভিতর হইতে হাসির এক হর্‌রা উঠিয়াছে।

তারপরে প্রবেশ করিল সুনীতা ও পরে অৰ্দ্ধেন্দু]

সুনীতা

[হাসিয়া] এত অগ্নিকাণ্ডেও বাড়িটা পুড়্ল না যা হোক।

অৰ্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] আপনার কাছে যে ইন্সিওর করা আছে।

সুনীতা

সত্যি ?

অৰ্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] হ্যাঁ।

সুনীতা

যাক্, আমার কাজ সারা হয়েছে। কালই আমরা বোম্বাই চল্লাম।

অৰ্দ্ধেন্দু

কেন ?

সুনীতা

আরে কি মুস্কিল। বাড়ি ফিরে যাব না।

অৰ্দ্ধেন্দু

এত শীগ্‌গীর ?

সুনীতা

আমরা তো আর আপনার সাক্ষাৎ মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ কাকার শ্বশুর নই যে বাড়িতে আগুন লাগা না পর্য্যন্ত বিদেয় হব না। [হাসি] এদ্দিনই আর কে আপনার বাড়ি থাকৃত,—কেবল ঐ ভ্যাগাবণ্ডদের তাড়াবার জন্যই তো।

অৰ্দ্ধেন্দু

অতিথ্ না হ'লে আমার চলে না জানেন তো—হাঁপিয়ে উঠি। [সুনীতার পানে চাহিয়া হাসিয়া] অতিথের ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে।

সুনীতা

[না দেখা অভিনয় করিয়া] বেশ্ বিভূতিবাবুকে তার করে দেই।

অৰ্দ্ধেন্দু

উহুঃ, ভাল নয়।

সুনীতা

[ঔদাসীন্য অভিনয় করিয়া] তবে মুকুন্দবাবু ?

অৰ্দ্ধেন্দু

[সুনীতার দিকে চাহিয়া হাসিয়া] যাঃ

সুনীতা

আমি চল্লুম।

অৰ্দ্ধেন্দু

আমার অতিথ্‌দের তাড়িয়ে এখন বুঝি চল্লেন। তা হবে না,—অতিথ্‌দের যেমন তাড়িয়েছ তেমনি [হাসিয়া] তোমাকে থাকতে হবে। আর একদিন দু'দিনের জন্য নয়,—সারা জন্মের জন্যে। [অৰ্দ্ধেন্দু সুনীতার কাছে আগাইয়া গেল]

সুনীতা

দূর্ [বলিয়া মিষ্টি করিয়া মুখ ভেঙ্‌চাইয়া দুষ্টু মেয়ের মত ছুট্ দিল। অৰ্দ্ধেন্দু তাহার পিছনে ছুটিতেছিল সহসা চেয়ারে পা বাঁধিয়া পড়িয়া যাইবার অভিনয় করিয়া]

অৰ্দ্ধেন্দু

[ব্যথা পাওয়ার অভিনয় করিয়া] ঈঃ মাগো, গেলুম, [উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িল। সুনীতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার পর শঙ্কিতভাবে কাছে আসিয়া]

সুনীতা

কি হ'লো।

অৰ্দ্ধেন্দু

[তেমনি] উঃ মাগো।

সুনীতা

চেয়ারটাতে উঠে বসুন, দেখি কি হয়েছে [অৰ্দ্ধেন্দুকে উঠিতে সাহায্য করিল। চেয়ারে বসিলে পরে] কোথায় লেগেচে ?

অৰ্দ্ধেন্দু

[সুনীতার হাত চাপিয়া ধরিয়া] এইখানে [বুক দেখাইয়া দিল। তারপর সুনীতার হাত টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিল। ভাবাবেশে চেয়ারে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল হয়ত বেশী। সহসা চেয়ার-সহ অৰ্দ্ধেন্দু উল্টাইয়া পড়িল। সুনীতা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিল।]

যবনিকা।

শ্রীসুবোধ বসু

সত্যাসত্য

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৬৯

বাদল হচ্ছে ভাবের মানুষ। এক একটা ভাবনা নিয়ে বিভোর থাকে, কখন রাত ভোর হয়ে যায় সে খবর রাখে তার এলার্ম টাইমপিস্। খাচ্ছে, কিন্তু কি খাচ্ছে খেয়াল নেই, সঙ্গিনীর কথাগুলি মনোযোগীর মত শুনছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বলছে, "ক্ষমা চাইছি, কুইনি। কি বলছিলে ঠিক্ ধরতে পারিনি।" ট্রেনে কিম্বা বাস্-এ চড়ে কোথাও যাচ্ছে, আপন মনে ফিক্ করে হাসছে। যাচ্ছে ত যাচ্ছেই, গাড়ী থেকে নামবার কথা ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে দয়া করে ক্লাসে উপস্থিত হয়, সেখানেও প্রোফেসারের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে তিনি মনে করেন ইনি তন্ময় হয়ে শুনছেন। বাদলের সৌভাগ্যক্রমে ছাত্রকে প্রশ্ন করার রীতি ইংলণ্ডের অধ্যাপক মহলে নেই, নতুবা বাদল পদে পদে অপদস্থ হত।

ইদানীং তার মাথায় কি এক ভাব চেপেছে, সে কিছু একটা দেখলেই ভাবে, বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফিরছি, ফিরে দেখছি দেশের তুমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেখানে ছিল Foundling Hospital সেখানেটা এখন ফাঁকা জমি, শুনছি সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের বাড়ী উঠবে। মন্দ প্রস্তাব নয়, কিন্তু funny! অত বড় একটা পুরাতন ইমারৎ আমি দেখতে পেলুম না, আমার আসার আগেই ভেঙে ফেলেছে। এই ত সেদিন Grosvenor Houseটাকেও ফেল্ল ভেঙে। ১৯২৪ সালে ভাঙল Devonshire House; এখন সেখানে হোটেল আর ফ্ল্যাট্। মন্দ নয়, কিন্তু funny! রিজেন্ট্ ষ্ট্রীটের চেহারা বদলে গেছে, Strand ত এখন বেশ চওড়া হয়েছে, পার্ক লেন-এর আভিজাত্য-গর্ব্বিত প্রাসাদ এখন ধনগর্ব্বিতদের রুচি অনুযায়ী প্রথমে ধূলিসাৎ ও পরে পুনরায় নির্ম্মিত হচ্ছে, Dorchester House নাকি হবে Dorchester Hotel। মন্দ নয়, যুগের দাবী মানতে হবেই ত, কিন্তু funny! আমার অনুপস্থিতিতে দেশটার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।

বিশ বছর আগে মাটীর নীচে এত রেল লাইন ছিল না, ইলেক্ট্রিসিটির দ্বারা চালিত হত না কোনো ট্রেন। রাস্তায় মোটরের ভিড় ছিল না, এত মোটর বাস্ কল্পনার অতীত ছিল, এই যে সব পথপ্রান্তীয় গারাজ্ এগুলি অধুনাতন। ট্র্যাফিক একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের হাতে নিয়ন্ত্রণের ভার থাকা আর পোষাচ্ছে না দেখ্ছি। রেলের মত সিগ্ন্যাল চাই রাস্তায় রাস্তায়। অটোমেটিক সিগ্ন্যাল। দেশটাকে আর একটু Modernise করতে হবে। না, না, "Modernise করা" বলে কোনো কথা থাকতে পারে না। অর্থহীন বুলি। Rationalise করতে হবে। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। অবস্থা বদলে যাচ্ছে, ব্যবস্থা বদলে না গেলে ঘোর দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফিরতে বড় funny লাগে। সিটি অঞ্চলের শ্রী দেখ! ব্যাঙ্ক্ অব্ ইংলণ্ড-এর সাবেক কালের বনেদী সৌধ নতুন ছাঁচে তৈরি হবে কেউ ভাবতে পারতে? আর লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক কিনা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। হা হা হা!

মহাযুদ্ধের চিহ্নাবশেষ বাদল লণ্ডনের সর্ব্বত্র আবিষ্কার করছে। ধর, সন্ধ্যার আগে দোকান বাজার বন্ধ করা। এ নিয়ম ত প্রাগ্যুদ্ধীয় ইংলণ্ডে ছিল না। তখনকার রাস্তাগুলো অর্দ্ধেক রাত্র অবধি আলো-ঝলমল্ করত। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন আলো দেখলে বোমা ছুঁড়বে বলে D. O. R. A. (Defence of the Realm Act) সন্ধ্যার পর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল। ইস্, ছিল বটে সে একদিন! মাথার উপর সাঁই সাঁই করে এরোপ্লেন ছুটেছে, কানের কাছ দিয়ে গোলা বন্ বন্ করে ধাওয়া করেছে, জলের নীচে সাব্মেরিন কিলবিল কিলবিল, ডাঙার উপর "Tank" গড়গড়! তখন বাদল ছিল বহু দূরে, এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল বাদলের অনুপস্থিতিতে, বাদলের বিনা সহযোগে। তখন তার বয়স আট থেকে বার। তার বয়সের ইংরেজ ছেলেরা বোমা ফাটছে শুনে ভয় পাওয়া দূরে থাক্ পুলকিত হয়ে বলত, ডিম ফাটছে। আহা, তখন যদি বাদল বিলেতে থাকত! অমন একটা যুদ্ধ শতাব্দীতে একবার আসে, যদি এল দশ বছর পরে এল না কেন? দশ বছর আগের কথা বাদলের মনে পড়ে বাস্। তখন সে ইংরেজী দৈনিকপত্রের বড় বড় হেড্লাইনগুলো পড়ে তার বাবাকে শোনাত। সব কথা বুঝতে পারত না। বলত "বাবা, GERMAN OFFENSIVE AGAINTT ROUMANIA—এর মধ্যে একটা কথা আছে, offensive। ওটার মানে কি?" বাবা বলতেন "ডিক্সনারী থেকে নিজেই খুঁজে বের কর্।" বাদল বিরক্ত

হয়ে ডিক্সনারী খুলে বস্‌ত। ইংরেজী-বাংলা ডিক্সনারী বাড়ীতে রাখা বারণ। চেম্বার্স্‌ ডিক্সনারীতে ইংরেজী কথার ইংরেজী অর্থ বাদলের বোধগম্য হত না, তবু তার বাবার আদেশে তাই মুখস্থ করতে হত। সেই থেকে বাদলের চিন্তার ছাঁদটা ইংরেজী। তা বলে তার বাবার ইংরেজী জ্ঞানের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি যে তাকে ডিক্সনারী দেখ্‌তে বাধ্য করতেন সেটার মূল কারণ তাঁর নিজের অজ্ঞতা কিম্বা অনিশ্চয়তা। সেদিন CAMOUFLAGE শব্দটা নিয়ে তিনি বিষম ফাঁপরে পড়েছিলেন। বাদল বল্লে "ডিক্সনারীতে নেই।" বাবা বল্লেন, "অসম্ভব। আমার যৌবনকালে আমি A থেকে E পর্য্যন্ত ডিক্সনারীর সমস্তটা কণ্ঠস্থ করেছি। আমি জানি, আছে।" তারপর সত্যিই যখন ডিক্সনারীতে নেই দেখা গেল তখন তিনি বল্লেন, "কি করে থাকবে! এটা ত একখানা চটি ডিক্সনারী। আচ্ছা আমি আজ ওয়েবষ্টার আনিয়ে দেখ্‌ছি।" তাতেও পাওয়া গেল না। তখন তিনি বল্লেন "শব্দটা একটু archaic হয়ে গেছে বলে ডিক্সনারীর নতুন এডিশন থেকে তুলে দিয়েছে। ঠিক মনে পড়্‌ছে না, ওর মানে পতাকা টতাকা কিছু হবে। ঐ যে শেষের দিকে flag আছে কিনা।"

ওসব মনে পড়লে বাদলের হাসি পায়। তার বাবা বলেছিলেন, "জার্ম্মানরা রুমেনিয়ার প্রতি offence অর্থাৎ অপরাধ করেছে।" জার্ম্মানগুলো অত্যন্ত নীচমনা নীচপ্রকৃতির লোক। ইংরেজের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ছে না, রুমেনিয়ার মত ক্ষুদ্র রাজ্যের পিছনে লেগেছে। ওরা ঠিক হেরে যাবে দেখিস্‌। অধর্ম্মের পরাজয় হবে না?" বাদল অত শত বুঝ্‌ত না। জার্ম্মান কাইজারের চেহারাটা তার মনে ধরেনি। ইংরেজ পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিকৃতি তার পছন্দ হয়েছে। কাইজারটা বদ্‌মাইসের মত দেখ্‌তে। বাদলের শত্রুরা কাইজারের জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ক্লাসের কয়েকটা গুণ্ডা ছেলে বাদলকে একলা পেলে তার গাল টিপে দেয়, তার সঙ্গে পাঞ্জা কষ্‌বার ভাণ করে তার হাতখানাকে পিষে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে চায়, তাকে আচম্‌কা প্যাঁচ দিয়ে চিৎপাত করে। ঐসব ডাকাতদের রাজা কাইজার, আর বাদলের মত ভদ্রলোকদের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ। বাদল তার এক শত্রুর সঙ্গে বাজি রেখেছিল, যদি কাইজার জেতে তবে বাদল চার আনার চানাচুর খাওয়াবে, যদি পঞ্চম জর্জ্জ যেতেন তবে সুকুমার চার আনার জলছবি কিনে দেবে। দুঃখের বিষয় বেচারা সুকুমার ঠিক সেইদিন মারা গেল যেদিন আর্ম্মিষ্টিস্‌ ঘোষণা হয়। বাদল তার জন্য কেঁদেছিল, ভগবানকে প্রার্থনা করেছিল—"হে প্রভু, সুকুমারকে বাঁচিয়ে দাও। ও ত এখন আমার বন্ধু। আর্ম্মিষ্টিস্‌ হয়ে গেল, আর কিসের কলহ? ওকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।" বেচারা সুকুমারের জন্য এখনো বাদলের কান্না পায়। তাকে এখনো স্বপ্নে দেখে। সে তেমনি দুর্দ্দান্ত, তেমনি বাদলের প্রাইজ্‌ বই চুরি করে নিজের বলে চালায়, বাদলের মাথায় চাঁটি মারে ও হাস্‌তে হাস্‌তে বলে, "আহা রাগ করিস্‌নে, লক্ষীটি।" স্বপ্নে এখনো বাদল ক্ষেপে যায়, দাঁত কিড়মিড় করে।

মহাযুদ্ধের কত কথাই মনে পড়ে যায়। কিন্তু ওসবকে প্রশ্রয় দিলে চল্‌বে না। বাদলের নিজস্ব স্মৃতি বলে কিছু থাক্‌বে না। ইংরেজ ছেলেদের যে স্মৃতি বাদলেরও সেই স্মৃতি। বাদল কল্পচক্ষুতে দেখে বোমা পড়ে ফেটে চৌচির হচ্ছে, সে উল্লসিত হয়ে বল্‌ছে, ডিম ফাট্‌চে। পচা ডিম। হা হা হা।

৭০

অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। মেয়েরা কেশ ও বেশ হ্রস্ব করেছে। তারা আর গজেন্দ্রগামিনী নয়। বাদলদের পাড়ার অনেক মেয়ের বাইসিকল আছে। কত মেয়ে মোটর সাইক্লিষ্টদের পিছনে বসে প্রাণ হাতে করে বেড়াতে বেরয়। থিয়েটারে বেআব্রু মেয়ে শত শত। নাচের বাতিক সংক্রামক হয়েছে। মন্দ বাতিক নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বাদল নাচ শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু কুইনী বিশেষ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, "তোমার সঙ্গীতের কান একেবারেই নেই, বার্ট। তোমার পদক্ষেপ বেতালা হবে।" বাদল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার ধারণা ছিল সে ইচ্ছা করলেই যে কোনো বিষয়ে কৃতী হতে পারবে। মানুষ কি না পারে? "What a man has done a man can do." ইচ্ছা কর্‌লে বাদল একজন বিচক্ষণ সেনাপতিও হতে পারত। বৈজ্ঞানিক কিম্বা মেরু-আবিষ্কারক, সঙ্গীতকার কিম্বা ফিল্মি ষ্টার, বণিক কিম্বা ইঞ্জিনীয়ার, যা খুসী তা হতে পারা কেবলমাত্র ইচ্ছা, উদ্যোগ, সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। "অসম্ভব" বলে কোনো কথা নেপোলিয়নের অভিধানে ছিল না, বাদলের অভিধানেও নেই।

কুইনী এর উত্তরে বলেছিলেন, "নাচ ত খুব কঠিন বিষয় নয়, বার্ট। চাও ত তোমাকে আজকেই শিখিয়ে দিতে পারি। কি জান, ও জিনিষটা আজকাল এত খেলো হয়ে উঠেছে যে কোনো ভদ্রলোকের ও জিনিষ মানায় না।"

বাদল গম্ভীর ভাবে বলেছিল, "ওকথা আমারও মনে হয়েছিল, কুইনী। বাস্তবিক মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডের স্ত্রী-চরিত্র থেকে dignity চলে যাচ্ছে। আমরা পুরুষরাও এর জন্যে বহু পরিমাণে দায়ী। সিরিয়াস্‌ মেয়ে দেখ্‌লে আমাদের গায়ে জ্বর আসে।"—এই বলে বাদল তার কলেজের সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের বর্ণনা দিয়েছিল। সহপাঠিনীরা সামনের সারিতে বসে। প্রোফেসারের প্রত্যেকটি আপ্তবাক্য

খাতায় টুকে নেয়। সহপাঠীরা এই নিয়ে তাদের অসাক্ষাতে রসিকতা করে থাকে। কেউ কেউ তাদের কার্টুন আঁকে। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের একটি "সোশ্যাল্"-এ বাদল নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে ছেলেরা ও মেয়েরা মিলে "There was a miner fortyniner" ইত্যাদি হাস্য সঙ্গীত গেয়েছিল। বাদলের কাছে যে মেয়েটি বসেছিল সে বলেছিল, "আপনি গাইছেন না যে।" বাদল বলেছিল, "গানটা জানা থাকলে ত?" মেয়েটি তার নিজের বইখানা বাদলের সঙ্গে ভাগ করে বাদলকে বলেছিল, "গলা ছেড়ে গান ধরুন। সকলেই আনাড়ি, কে কার ভুল ধরবে?" বাদল তাই করেছিল। কিন্তু সে কি জানত যে গানটা এত লঘু? আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে হঠাৎ শেষের দিকে এক নিঃশ্বাসে ও একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

"Then I kissed the little sister
And forgot my Clementine."

বাদলের ত লজ্জায় বাক্‌স্ফূর্তি হল না। দিনের বেলার ঐ সব লক্ষ্মী মেয়ে সন্ধ্যা বেলা এই সব গানে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? বাদল পরে ভেবে দেখেছিল। অন্যায়টা এমন কি হয়েছিল? চুম্বন করা ত কথা বলার মতই একটা শারীর ক্রিয়া। এদেশে ত ভাইবোন মা-বাবা সবাই সবাইকে চুম্বন করে কিন্তু ওটা না হয় মাফ করা যায়। গানের পর সেই যে নাচটা হল সেটাতে বাদল যোগ দিতে না পেরে এক কোণে চুপটি করে বসেছিল। পুরুষ সংখ্যা কম পড়ে যাওয়ায় মেয়েরা জোড়া জোড়া হয়ে নাচতে বাধ্য হচ্ছিল। তাদের কারুর কারুর হাতে ছেলেবেলাকার টেডি ভালুক কিম্বা অন্য রকম পুতুল ছিল। ছেলেরা পাছে সিরিয়াস্ বলে পরিহাস করে সেই জন্যই যে তারা অতিরিক্ত ছেলেমানুষী করছিল বাদল এক কোণে বসে এইরূপ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল। সেই সময় একটি ছেলে এসে তার সঙ্গে গল্প জমায়। ওয়েল্‌স্ থেকে এসেছে, জোন্স্ তার নাম। তার সঙ্গে যোগ দিতে এল তার বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকা আগত টম্‌লিন্‌সন্। মাঝে মাঝে একবার করে আসতে বসতে গল্প করতে ও পালাতে থাকল ভ্যান্ কোপেন। বাদল জিজ্ঞাসা করল, "ওলন্দাজ?" ভ্যান কোপেন বিরক্তি চেপে বল্ল, "মা ইংরেজ, সুতরাং আমিও।" তাকে কেউ ওলন্দাজ বলে পর ভাববে এটা কি তার সহ্য হতে পারে! যাক্, ভ্যান কোপেন সৌখীন মানুষ। তার গোঁপ ছুঁচলো। পোষাক পরিপাটী। জোন্স টম্‌লিন্‌সন ও ভ্যান কোপেন তিনজনেই আইন পড়ছে। বাদলের সঙ্গে তিন মিনিটে ভাব হয়ে গেল।

জোন্স্ বল্ল, "ভ্যান কোপেন আজ বড় বেশী নাচছে।"

টম্‌লিনসন বল্ল, "কাউকে বাদ দিচ্ছে না। প্রত্যেকের সঙ্গে একবার করে।"

ভ্যান কোপেন গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্ল, "তেমন খুবসুরৎ ত কাউকেও দেখছিনে। ঐ ছুঁড়িটা বকের মত ঠ্যাং ফেলে। ঐ ছুঁড়িটা পাউডার প্যাডের মত থপ্ থপ্ করে। ঐ ছুঁড়িটা ঘোড়ার মত গ্যাল্‌প করে। কেউ নাচতে জানে না। আর কিই বা চেহারা। কলেজে পড়া মেয়েগুলোর মুখে লাবণ্য নেই। শুষ্কং কাষ্ঠং।"

জোন্স্ সশব্দে ও টমলিনসন নিঃশব্দে মতৈক্য জানাল। তখন ভ্যান কোপেন উঠে গিয়ে সেই বেড়াল-কোলে-করা মেয়ের সঙ্গে নাচতে সুরু করে দিল।

জোন্স বল্ল, "লোকটা কেমন জোগাড়ে।"

টমলিনসন বল্ল, "মেয়েদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে জানে।"

বাদলের মনটা তিক্ত হয়ে গেছ্‌ল। আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের তেমন সম্মান করে না। মেয়েরাও সম্মান-প্রার্থী নয়। অবশ্য বাদল অবাধ মিশ্রণের পরম পক্ষপাতী। অর্থহীন ও কৃত্রিম ব্যবধান স্ত্রী-পুরুষের মনে পরস্পরের প্রতি মোহ রচনা করে। মোহ সত্যের শত্রু, বাদলের চক্ষুঃশূল। কিন্তু সম্মানের চেয়ে কাম্য কি থাকতে পারে? পুরুষ যেমন পুরুষের সঙ্গে অব্যাহতভাবে মিশেও সম্মান দাবী করে ও পায়, নারীও তেমনি পুরুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশুক ও সম্মানের প্রতি কপর্দ্দক আদায় করে নিক্। ভিক্টোরীয় যুগে তাদের সম্মান ছিল, স্বাধীনতা ছিল না। আমাদের যুগে তাদের স্বাধীনতা আছে, বহিঃসম্মান আছে, কিন্তু আন্তরিক সম্মান নেই। বাদলের মর্ম্মে পীড়া লাগ্‌ছিল।

সেদিনকার গল্প কুইনীকে বলায় তিনি কৌতুকহাস্য করলেন। বল্লেন, "তোমার একটুও humour-জ্ঞান নেই। কোথায় কি প্রত্যাশা করতে হয় জান না। পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা, উৎসবের সময় উৎসব, কাজে কাজ। এই আমাদের রীতি। আপিসের পোষাক পরের জলকেলি করিনে, জলকেলির পোষাক পরে টেনিস্ খেলিনে, টেনিসের পোষাক পরে থিয়েটারে যাইনে। যখন যেমন। তুমি চাও আমরা শবানুগামীর পোষাক পরে পেচকের মত গম্ভীর হয়ে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিই?"

বাদল বলে, "বা রে, তা কখন বল্লুম?"

কুইনী বলেন, "প্রকারান্তরে বল্লে! কিশোর ছেলে, কিশোরী মেয়ে। ওরা পরস্পরের সম্মান নিয়ে কি করবে শুনি? একেই ত দুঃখের জীবন ওদের সামনে। জীবন-সংগ্রামে কে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। প্রথম যৌবনের এই ক'টা দিন ওদের যা খুসী করতে দাও, বার্ট।

তোমার মত মহাপুরুষ ত সকলে হবে না, হতে পারবে না, হতে চাইবে না।”

কিছুক্ষণ থেমে বল্লেন, “তোমার ভাই বোন না থাকায় তুমি একটা কিম্ভুত বালক হয়ে বেড়েছ। অল্পবয়সীরা ভাইবোনেরই মত কিলাকিলি চুলাচুলি করবে, তারপর হাসি-তামসায় দ্বেষ হিংসা ভুলে যাবে। তা নয় ত সকলে সব সময় ভালো ছেলে ভালো মেয়ে হয়ে এক মনে বড় বড় বিষয় ভাববে, এমন সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তোমার মত ক্ষ্যাপাদের মগজে গজায়।”

বাদল এর উপর কথাটি কইল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল (এই নিয়ে চতুর্থ বার) কুইনীর সঙ্গে নেহাৎ দরকারী সাংসারিক বিষয় ছাড়া বাক্যালাপ করবে না।

কুইনী তার ভাবটা আঁচ্‌তে পেরে বল্লেন, “অমনি রাগ হল? আচ্ছা, নাও এই দুধটুকু লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল ত আগে। গায়ে জোর না হলে রাগ করবে কি দিয়ে?”

৭১

সব চেয়ে বড় পরিবর্তন শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি। বিশ বছর আগে পার্লামেন্টে শ্রমিক সদস্য ছিলেন নথাগ্র-গণ্য। আজ লেবার পার্টি ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল। ইতিমধ্যে ট্রেড্ ইউনিয়ন্‌স্ কাউন্সিল্ পার্লামেন্টের দোসর হয়ে উঠেছে। হয় ত এমন একদিন আস্‌বে যে দিন ট্রেড্ ইউনিয়ন কাউন্সিল একচ্ছত্র হবে। বাদল ভারতবর্ষে থাকতে ইংলণ্ডের General Strikeএর খবর পেয়েছিল। ইংলণ্ডে এসে ধনিকে শ্রমিকে পথে ঘাটে মারামারি দেখ্‌তে পায়নি। তাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ছুটকো বিরোধ ত চোখে পড়ে না। কেউ কারুর প্রতি অভদ্রাচরণ করে না। বরঞ্চ বড়লোকের বেশী মান। বাদলের পোষাক থেকে তাকে বড়লোকের মত মনে হয়। সেই জন্য হোক কি সে বিদেশী বলেই হোক বাদলকে বাস্ কণ্ডাক্টর, ট্রেনের টিকিট কলেক্টর, পোষ্টম্যান, দুধওয়ালা, রেস্তোরাঁর লোক, দোকানের লোক, ইত্যাদি সকলেই সম্বোধন করে “সার” বলে। ভিক্ষুকরা তার কাছে মন খোলে, ফুটপাথের গায়ে রঙিন চক্‌খড়ি দিয়ে যে সব খোঁড়া বা কুঁজো ছবি আঁকে তারা বাদলের বাঁধা আলাপী।

এই সব বেকার মানুষের জন্য কি যে করা যায় সে সম্বন্ধে বাদল ভাবুকদের লেখা পড়ে, নিজেও ভাবে। কিছু দিন থেকে লিবারল্ পার্টির প্রস্তাব নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেছে। লিবারলরা বলেন ধনী লোকের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে সকল শ্রেণীর লোকের সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে আরো রাস্তা ও আরো খাল তৈরি করা হোক্, পতিত জমি আবাদ করা হোক, জঙ্গল রোপণ করা হোক্। দেশের ধনবৃদ্ধিও হবে, বেকার মানুষের কাজও জুটবে। লিবারলরা গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে এসব করাতে চান না। ধনিকে শ্রমিকে নিজেরাই একমত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব করুন। গবর্ণমেণ্ট কেবল বাধা না দিলেই হল। লিবারলদের নালিশ এই যে কন্‌সারভেটিভ গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট নিষেধের ডোরে দেশের লোকের হাত পা বেঁধে রেখেছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যও করছেন না, পরামর্শও দিচ্ছেন না, নতুবা কয়লার খনিকদের সঙ্গে মালিকদের ও অপরাপর ব্যবসায়ের শ্রমিকদের সঙ্গে অপরাপর ধনিকদের এতদিনে একটা সন্ধি হয়ে যেত।

সার আলফ্রেড্ মণ্ড্-এর সঙ্গে শ্রমিক প্রতিভূদের কথা-বার্তার বিবরণ বাদল মনোযোগ সহকারে পড়্‌ছিল। কিন্তু অব্যাপারীর পক্ষে ওর পরিভাষায় দন্তস্ফুট করা দুর্ঘট। বাদলের বন্ধু কলিন্স অবশ্য দোভাষীর কাজ করে। তবু অর্থনীতির ভাষা বড় দুর্বোধ্য। বাদল যদি আজন্ম ইংলণ্ডে থাকৃত তা হলে মুখে মুখে সেই সব শব্দের সংজ্ঞা জেনে নিত যে সব শব্দ ইংরেজ সাধারণের পক্ষে সহজ এবং বাদলের পক্ষে দুরূহ। Safeguarding, derating প্রভৃতির উপর সবাই পাঁচ দশ মিনিট বক্তৃতা করতে পারে, একা বাদল কিছু বল্‌তে ভয় পায়। তারপর Free Trade ও Protection—এ নিয়ে এখনো ইংলণ্ডের লোক ঠিক তেমনি উত্তেজিত রয়েছে যেমনটি ছিল সত্তর আশী বছর আগে কব্‌ডেন্-এর যুগে। লিবারল্‌দের অধিকাংশই Free Trade চায়, কন্‌সারভেটিভ্‌রা অধিকাংশেই চায় Protection। লেবার পার্টির লোক কোনটা যে চায় ওরাই জানে কিম্বা ওরাও জানে না। ওদের এক কথা, সোশ্যালিজম্ চাই। ছোট ছেলের মুখে যেমন একটি মাত্র দাবী, “খাবো।” খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু করা বোঝে না, দুনিয়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় মুখগহ্বরের মধ্যস্থতায়।

ইংলণ্ডের পার্টি পলিটিক্স ইংলণ্ডের প্রধান জিনিষ। প্রায় আড়াই শ’ বছর কোনো না কোনো আকারে ইংলণ্ডে পার্টি আছে। বংশানুক্রমে কোনো কোনো পরিবারের লোক টোরী কিম্বা হুইগ্। ভারতবর্ষের মানুষ যেমন ব্রাহ্মণ কিবা কায়স্থ হয়ে জন্মায় ইংলণ্ডে জন্মায় কন্‌সারভেটিভ কিম্বা লিবারল্ হয়ে। বাদল কোন পার্টির লোক? গোড়ায় কন্‌সার-ভেটিভ্‌দের প্রতি তার টান ছিল। কিন্তু ওরা সাধারণত হাই চার্চের সভ্য। বাদল নাস্তিক। নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, Non-Conformist, ইহুদী ইত্যাদি বাধ্য হয়ে লিবারল দলের দিকে ঝোঁকে। তারপর Free Tradeএর আদর্শ বাদলের মনের মত। পৃথিবীর যাবতীয় দেশে বাণিজ্য অবাধ হোক, কোথাও শুল্ক না লাগে। যার যা খুসী বেচুক,

যার যা খুসী কিনুক। বেচাকেনা অবাধ হলে এত মন-কষাকষিও থাকবে না। ইস, জ্বালাতন করে তুলেছে। মেছোহাটার মত ব্যাপার। ফ্রান্স ও আমেরিকা ত একেবারে নির্লজ্জ।

বাদল "টাইম্‌স্" বন্ধ করে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" নিতে আরম্ভ করল কিন্তু সোজাসুজি নিজেকে লিবারল বলে ঘোষণা করলনা। পীল, পামারষ্টন, গ্লাড্‌ষ্টোন, রোস্‌বেরীর নামের কুহক তাকে লিবারল্ দলের দিকে আকর্ষণ করছিল। কিন্তু যে দলের কেবল অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই, সে দলে যোগ দিয়ে বাদল কার কি উপকার করবে? কিন্তু ভবিষ্যৎ যে নেই তাই বা কেমন করে বলা যায়। লিবারল গবর্ণমেণ্ট হয়ত অসম্ভাব্য, কিন্তু যত দূর মনে হয় ভাবীকালের ইংলণ্ডে দুই দলের বদলে তিন দল কায়েমী হবে। এক সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল সত্য মিথ্যা বলে পরস্পরবিরোধী দুটি মাত্র দিক আছে, এখন আরো একটা দিক মানুষের চোখে পড়্‌ছে। লিবারল্ দল দেশের লোকের তৃতীয় চোখ ফুটিয়ে দেবে।

৭২

বাদল ছিল হাড়ে হাড়ে ডেমক্র্যাট। তার ইউটোপিয়ায় সকলে স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে একজনের স্বাধীনতা যেন অপরের স্বাধীনতার সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধায় এটুকু দেখ্‌তে হবে। এটুকু দেখার জন্য সকলের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-মণ্ডলী এবং প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় জনকতক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা মন্ত্রী। রাষ্ট্র যার নাম সেটা আর কিছু নয়, সেটা তোমার আমার স্বাধীনতার সীমা-নির্দ্দেশের জন্য তোমার আমার কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তোমার আমার হাতে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র। যন্ত্রের যন্ত্রী তুমি আমি।

তাই ফাসিস্‌ম্ ও বোলশেভিস্‌ম্ বাদলের চোখের বিষ। আমি যন্ত্রী নই, আমি যন্ত্রের অঙ্গ কিম্বা অধীন, যন্ত্রই ভগবান আমি তার পূজারী—ওঃ! বাদলের নাস্তিক মন যুদ্ধং দেহি বলে চীৎকার করে ওঠে। চাইনে শান্তি, চাইনে আরাম, অন্ন বস্ত্রের স্বাচ্ছল্য যাদের কাম্য তারা ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করুক। কিন্তু আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আমার প্রতিবেশীর খাতিরে আমার অধিকারে খানিকটা আমি ছাড়্‌তে রাজী আছি, কিন্তু সবটা ত্যাগ করতে আমি কস্মিন্‌কালে পারব না।

ডেমক্রেসী রাজাদের সমাজ। আমরা সবাই রাজা। কেবল নিজ নিজ রাজ-অধিকারকে সংঘর্ষমুক্ত করবার জন্য আমাদেরি কতক অধিকার আমরা ডান হাত্ থেকে নিয়ে বাঁ হাতে রেখেছি, ঘর থেকে সরিয়ে সভায় ন্যস্ত করেছি। আর ফাসিস্‌ম্-বোলশেভিসমের সমাজ দাসের সমাজ। কিছু আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে নিজেদের ক্ষমতা অস্বীকার করেছি, যা নিজেদেরি রচনা তার ক্ষমতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে দিইনি, পরন্তু ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বল্‌ছি, আহা, রাষ্ট্র! সে কি যে-সে জিনিষ! সে যদি হয় জগন্নাথের রথ; তবে আমরা সামান্য পোকা মাকড়? সে হচ্ছে অব্যক্ত, অব্যয়, সর্ব্বক্ষম, পরম রহস্যময়। ভাগবত বিভূতি বিশিষ্ট অথবা অতিমানুষিক শক্তিসম্পন্ন। আমরা কেবল তাকে মান্য করতে পারি, তার সেবা করতে পারি, তার জন্য মরতে ও মারতে পারি।

ইংলণ্ডের প্রতি বাদলের পক্ষপাত প্রধানতঃ ইংরাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দরুণ। রাষ্ট্র যেদিন রাজার মধ্যে মূর্ত্ত ছিল সেদিন সে রাষ্ট্রের অধিকার সংকুচিত করেছে, প্রজার অধিকার প্রসারিত করেছে। Magna Carta-র অনুরূপ অন্য কোনো ইতিহাসে আছে কি? রাজাকেও ক্রমশঃ ডেমক্র্যাট করে আনা হয়েছে। নাম ছাড়া রাজা-প্রজায় প্রভেদ বড় কিছু নেই। ফ্রান্স্ ও ডেমক্রেসীর দেশ। কিন্তু তার ডেমক্রেসী ভূঁইফোঁড়। ফরাসী বিপ্লব আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত এবং উক্ত আন্দোলন ইংলণ্ডত্যাগী ইংরেজেরই কীর্ত্তি (কিম্বা কুকীর্ত্তি। বাদলের মনে হয় আমেরিকা ইংলণ্ডের সংযুক্ত থাকলেই ভাল করত। অবশ্য অধীনের মত নয় সমানের মত।) ফরাসী যে লিবার্টি মন্ত্রের উপাসক সে বিষয়ে বাদলের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু লিবার্টির চেয়ে ইকুয়ালিটির উপর ফরাসীর বেশী ঝোঁক। ফরাসী যদি সাম্য পায় তবে স্বাধীনতা ছাড়্‌তে রাজী। কিন্তু ইংরেজ মোটের উপর উঁচু নীচু ভালবাসে, তার সমাজে অনেক ধাপ, কিন্তু বাক্যের ও কর্ম্মের স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে, তার চেয়ে যা দামী—চিন্তার স্বাধীনতা—তা ক্যাথলিক ফরাসীর নেই প্রোটেষ্টাণ্ট ইংরেজের আছে।

বাদল সাম্যের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যকে কাম্য মনে করে। সে যেদিকে দু'চোখ যায় সে দিকে চল্‌তে চায়, কেউ যদি তাকে ঠেকাতে আসে তবে তার বিরক্তির সীমা থাকে না। ইংলণ্ডে এসে অবধি সে প্রতি সন্ধ্যায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে, অন্ধকার গলির ভিতর ঘুরেছে, কেউ তাকে বাধা দেয়নি, সন্দেহ করে তার পিছু নেয় নি। ইংলণ্ডের পুলিশ ভদ্র। তার কারণ পুলিশের কাজই হল ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করা—প্রত্যেক ব্যক্তির। যখনি পুলিশের দ্বারা ব্যক্তির অমর্য্যাদা ঘটেছে তখনি তার প্রতীকারের জন্য লোকমত জাগ্রত হয়েছে। বাদলের ইংলণ্ডে আসার সমসাময়িক একটি ঘটনা বাদলের মনে পড়ে। হাইড পার্কে একজন স্বনামধন্য বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে একটি শ্রমিক শ্রেণীর অনূঢ়া তরুণীকে কুরুচিকর অবস্থায় পুলিশে দেখ্‌তে পায় এবং ধরে নিয়ে

থানায় আটকে রেখে মেয়ে পুলিশের বিনা সহায়তায় তাকে প্রশ্ন বাণে জর্জ্জর করে। পার্লামেন্টে এ নিয়ে কথা উঠল, অনুসন্ধানের জন্য কমিশন বস্‌ল। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ!

স্বাধীনতা যদি থাকে তবে সাম্যের কি যে প্রয়োজন বাদল বুঝ্‌তে পারে না। সে ত কারুর সঙ্গে সমান হতে চায় না? সে নিজেই একটা দিক্‌পাল, একটা গৌরীশঙ্কর কি কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপরে তার সমান হতে সাধনা কর্‌তে চায় ত করুক, কিন্তু বাদল করবে সাম্যের কামনা! তবে আইনের চোখে সবাই সমান হোক; যথা ডিউক অব ইয়র্ক তথা জন স্মিথ কয়লার খনির মজুর। পার্লামেন্টের নির্বাচক হবার অধিকার সকলকে দেওয়া হোক। সকলের প্রাণের দাম সম না হোক, একটা বুড়ো ভিখারীকে খুন করলে যে অপরাধ একজন ধন কুবেরকে হত্যা করলে তার চেয়ে বেশী অপরাধ যেন না হয়। এগুলো সাম্যবাদের অঙ্গ নয়, এগুলো স্বাতন্ত্র্যবাদেরই সামিল। কাজেই বাদল সাম্যবাদের সার্থকতা দেখ্‌তে পায় না।

প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করুক, অনবরত কর্‌তে থাকুক। প্রত্যেকে ক্রমাগত এগিয়ে যাক্, ধনে মানে জ্ঞানে কর্ম্মে চিন্তায়। সমাজ ত একটা শোভাযাত্রার মত। পিছনে জায়গা পাওয়া লজ্জার কথা নয়, পেছিয়ে পড়াটাই লজ্জার। বাদল ত ক্লাসে সকলের শেষ সারিতে বস্‌ত ও বসে।

বাদলের মতবাদ অবিকল লিবারল দলের মতবাদ। কন্‌সারভেটিভরা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের শত্রু, সোশ্যালিষ্টরাও তাই। দু'পক্ষই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়ে ঐ ক্ষমতার দ্বারা ব্যক্তির উপর জবরদস্তি করতে কৃতসংকল্প। একপক্ষ গাঁথ্‌বে উঁচু tarrif দেয়াল। বিদেশী পণ্যের উপর চড়া শুল্কের হার উশুল করবে। অপর পক্ষ চায় বড় লোকের উপর বিপুল ট্যাক্স চাপিয়ে সেই টাকায় বেকারকে অলসকে অপটুকে পরম স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রতিপালন করতে। কেলেঙ্কারী! Dole-এর টাকায় ওরা বিয়ে করে, সন্তান সন্ততির জনক জননী হয়। ধনীর চাঁদায় চল্‌তে-থাকা হাঁস-পাতালে চিকিৎসা পায়, ধনীর চাঁদায় সমুদ্রকূলে হাওয়া বদ্‌লাতে যায়। ছিঃ ছিঃ ওদের আত্মসম্মান নেই!

৭৩

পলিটিক্স নিয়ে মিসেস্ উইল্‌স্ তর্ক করেন না। কিন্তু মিষ্টার উইল্‌স্ বাদলের সঙ্গে খুব ভদ্রভাবেই বাক্য বিনিময় করেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারেন না। ভদ্রলোক খেটে খুটে অনেক দূর থেকে আসেন। পেট ভরে রোষ্ট বীফ খান, আস্ত জন বুলের মত চেহারা। প্রথম যৌবনে নাকি বক্সার ছিলেন, এখনো তার পরিচয় দিয়ে থাকেন স্ত্রীর উপর রেগে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করে। (বাদল ক্রমশ জান্‌তে পেরেছে যে তিনি স্ত্রীকে মুষ্ট্যাঘাত করতে একদা ভালবাস্‌তেন, কিন্তু স্ত্রী যেদিন থেকে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছেন সেদিন থেকে তিনিও স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ সশ্রদ্ধ হয়েছেন।) তারপরে একে একে নানা ব্যবসায় লোকসান দিয়ে অবশেষে করছেন ডক্-এর ম্যানেজারী। অদ্যাপি তাঁর ভূতপূর্ব্ব দোকানের পুরান ছাপান কাগজপত্র বাড়ীতে পাওয়া যায়, গিন্নী তাতে বাজার-হিসাব লেখেন।

এ বাড়ীতে আসার পর থেকে মিষ্টারের সঙ্গে বাদলের তেমন বন্‌ছে না। মিষ্টার হচ্ছেন গোঁড়া সোশ্যালিষ্ট। সান্ধ্য সংবাদপত্রখানা হাতে করেই বাড়ী ফেরেন, বাদলের মত ট্রেণে কিম্বা বাস্-এ ফেলে আসেন না। এসেই গজ্ গজ্ করেন, কন্‌সারভেটিভরা arn't playing fair। কিম্বা থেকে থেকে একটু হি হি করেন, বাই-ইলেকশন-গুলোতে লেবার পার্টির লোক জিতে চলেছে। এই বলে আওড়ে যান:—Darlingtion, Stockfort, East Ham, Hammersmith, Northampton না, না—Stourbridge, Northapmton, Hull, বাদলের দিকে চেয়ে বলেন, "Now what do you say to that?"

আগামীবার জেনারল ইলেকশনে লেবার পার্টিই যে পার্লামেন্টের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল হবে এ বিষয়ে মিষ্টার উইল্‌সের সংশয় দিন দিন অপসৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সংশয়াত্মক শ্লেষ তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। স্ত্রী বলেন, "আর দেরি নেই, জর্জ। 'Jerusalem on England's green and pleasant isle'—এর আর দেরি নেই।"

বাদল বলে, "কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত মিষ্টার উইলস্। লেবার পার্টি এবার পার্লামেন্টে লাট বহর নিয়ে ঢুকবেই। বাদল কথাটা গম্ভীরভাবে বলে, তবু মিষ্টার উইল্‌সের বিশ্বাস হয় না যে বাদল ব্যঙ্গ করছে না। তিনি বাদলের দিকে কটমট করে তাকান।

বাদল যেন মস্ত রাজনীতিবিশারদ। বলে, "আমার ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে এই যে লেবার যদিও কন্‌সারভেটিভ্‌দের থেকে সংখ্যায় গুরু হবে এবং লিবারলদের থেকে ত হবেই, তবু অন্য দুই দল যোগ দিলে হবে সংখ্যায় লঘু।"

মিষ্টার উইল্‌স্ চটে গিয়ে বল্লেন, "Damn the Liberals." তাঁর মনে ১৯২৪ সালের সেই Zinovieff letter এর স্মৃতি হুল ফোটাতে থাক্‌ল।

বাদলও ক্ষেপে গেল। বল্ল, "আমি আপনাকে বলে রাখ্‌ছি দু'পক্ষের কোনো পক্ষকেই এবার লিবারলরা সাহায্য করবে না। নেমকহারাম লেবার, চিরশত্রু কন্‌সারভেটিভ্

কোনো পক্ষকে এবার মন্ত্রীত্ব করতে দেওয়া যাবে না। লিবারলরা নিজেরাই গবর্ণমেণ্ট চালাবে।”

উত্তেজনার মুখে বাদল ওকথা বল্ল বটে, কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল, সে কি সম্ভব? কোনো একটা বিল্ পাশ না হলেই ত পদত্যাগ করে লজ্জা পরিপাক করতে হয়।

সে মুখ তুলে দেখ্‌ল যে মিষ্টার ও মিসেস্ দু'জনে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছেন। হয় ত ভাব্‌ছেন, ছোকরা বদ্ধ পাগল!

অবশেষে মিষ্টার বল্লেন, “ভারতবর্ষে বুঝি তাই হয়?”

বাদল আহত বোধ কর্‌ল। তর্কের মাঝখানে দেশ তুলে অপমান করা কেন? তা ছাড়া বাদলকে যে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতীয় মনে করে, তাকে বাদল ক্ষমা করে না। সেদিন মিসেস্ উইল্‌স্ জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, “বার্ট, তোমাদের ভাষায় scissors-কে কি বলে?” বাদল বলেছিল, “কি জানি, কুইনী, আমি ও ভাষা ভুলে গেছি।” তিনি এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলেন যেন সে একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। আর সেও তাঁর উপর তেমনি রাগ করেছিল যেমন রাগ করেছিল কুম্ভকর্ণ, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে দেওয়ায়। মনে মনে একটা ভাব নিয়ে তার দিন কাটছিল, সে ইংলণ্ডে আছে, সে ইংরেজ, ইংলণ্ডের বাইরে তার অতীত ছিল না। হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গ করা হল।

তথাপি এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাবার চিন্তা তার মনে উদিত হয় নি। হল, যখন মিষ্টার উইল্‌সের সঙ্গে তার ক্ষণস্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ ঘটতে লাগ্‌ল। একদিন সে বল্‌ছিল, “আজ এক পাদ্রী এক মজার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন জন্মনিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু রাস্তার কোণের nasty flapperরা যেভাবে করে সেভাবে, না, St Joseph, St Ethelreda ইত্যাদি যেভাবে কর্‌তেন সেভাবে?”

মিসেস্ উইল্‌স্ খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লেন। বল্লেন, “পাদ্রীসাহেবের রসবোধ আছে।”

বাদল বল্‌তে লাগ্‌ল, “কিন্তু মজা সেখানে নয়, কুইনী। একটু পরেই পাদ্রী পুঙ্গব বল্‌ছেন, ক্যাথলিকদের সংখ্যা হু হু করে বাড়্‌ছে, নিগ্রোদের সংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে, আমরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে নিজের সংখ্যা কমাই ও বলবীর্য্য হারাই তবে আমাদের ভবিষ্যৎ থাকে না। পরিশেষে তিনি দ্বাদশ সন্তানের জনক কোন এক ব্যক্তিকে আদর্শ বলে রচনা শেষ করেছেন।

জর্জ এতক্ষণ গম্ভীরভাবে আহার কর্‌ছিলেন। আহার্য্য অবশিষ্ট রেখে তিনি কথাবার্ত্তায় যোগ দেন না। পরিতৃপ্তির ভার সংবরণের জন্য তিনি ভাল করে ঠেস দিয়ে বস্‌লেন ও বিনাবাক্যব্যয়ে পাইপ ধরালেন। দাঁতের ভিতর দিয়ে কথা বেরিয়ে এল, “তোমরা আমাকে মাফ করবে কেমন?”

তিনি বাদলকে জেরা করলেন। “কেন? কি দরকার? জন্মনিয়ন্ত্রণের অভাবে সমাজে কি ক্ষতি ঘট্‌ছে?”

বাদল হতাশ হয়ে বল্ল, “আপনি নিজেই এর উত্তর দিন, মিষ্টার উইল্‌স্। কেননা আপনার দলের লোকই ভুক্তভোগী।”

মিসেস্ উইল্‌স্ কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বল্লেন, “বার্টের কাণ্ডজ্ঞান নেই। কীটপতঙ্গের মত সন্তান বৃদ্ধি না কর্‌লে লেবার দলের ভোটার সংখ্যা বাড়্‌বে কি করে শুনি? তোমার অত সাধের ডেমক্রেসীর পরিচালন-ভার ত সেই দলের হাতে যাদের পিছনে ভোট বেশী?”

মিষ্টার উইল্‌স্ যেন ধরা পড়ে গেলেন। স্ত্রীকে বক্র দৃষ্টিতে শাসন করলেন। বাদলকে বল্লেন, “ক্যাপিটালিষ্টের হাতে আছে ধন। আমাদের হাতে আছে জন। আমরা যদি আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করি তবে অনায়াসে হেরে যাব। ওরা আগে ওদের অস্ত্র সমর্পণ করুক, তার পরে আমরাও আমাদের করব।”

৭৪

এমন বাড়ীতে টিঁকে থাকা বাদলের পক্ষে দুষ্কর হচ্ছিল। কুইনী সব কথাতেই সবাইকে ব্যঙ্গ করেন, কখনো জর্জকে কখনো বাদলকে কখনো আমন্ত্রিত অতিথিদের। তাঁর নিজস্ব মত বা যে কি তা বাদল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আবিষ্কার কর্‌তে পারল না। বাদলের ধারণা প্রত্যেকেরই একটা সুস্পষ্ট সুবোধগম্য মতবাদ থাকা আবশ্যক। যার নেই সে অমানুষ। তাই কুইনীর প্রতি সে বিমুখ হয়ে উঠ্‌ছিল। বাদলের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাক্‌ত তবে সে এই তিন মাসে নিশ্চয়ই টের পেত যে কুইনীর প্রধান দুঃখ তিনি নিঃসন্তান। পলিটিক্স ইত্যাদিতে তাঁর মন নেই, তবে স্বামীর যখন ওতেই মন বেশী তখন ওবিষয়ে উৎসাহের ভাণ করতে হয়। বাদলকে তিনি সেদিন বল্‌ছিলেন, “রান্‌সিম্যানরা স্বামীস্ত্রী পার্লামেণ্টের মেম্বার হলেন। তুমি দেখো, বার্ট, আমরাও একদিন ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর্‌ব—জর্জ ও আমি।”

জর্জের উপর বাদলের বিরূপ ভাব প্রথম থেকেই। তিনি কথায় কথায় ভারতবর্ষের মহারাজদের টেনে আন্‌তেন, তাঁর বিশ্বাস বাদল রাজবংশীয় হবে। তিনি কোথায় শুনেছিলেন যে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ওদেশের সর্ব্বত্র। কাজেই বাদল ব্রাহ্মণবংশীয় হওয়া সম্ভব। তারপর বেনিয়াদের ধনের সংবাদ যে ইংলণ্ডে পৌছায়নি তা নয়। “The wicked bania” অতএব বাদল বেনিয়াবংশীয়ও বটে। একাধারে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-বৈশ্য। ভদ্রলোকের অমন বিশ্বাসের কারণ ছিল। বাদল খরচ করত রাজার ছেলের মত। তার নিজের লাইব্রেরীর পিছনেই মাসে চার পাঁচ পাউণ্ড বাঁধা খরচ। প্রতিদিন একে খাওয়ায় তাকে খাওয়ায় এবং বাই

ফিরে এসে গল্প করে। ময়লা কাপড় বলে ফরসা কাপড়কেও সে ধোপার বস্তায় দেয়। রোজই কিছু না কিছু কিনে আনছে। কুইনীকে উপহার দিচ্ছে। একটা সুন্দর রিষ্ট্‌ওয়াচ, এক তাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড, হাত ব্যাগ, কাপড়ের ফুল।

জর্জের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাদল স্থির করল এবাড়ী ছেড়ে দেবে। কোনো বাড়ীতে তিন মাসের বেশী থাক্‌বে না, এ সংকল্প তার মনে পড়ে গেল। তখন সে কুইনীকে না জানিয়ে অন্যত্র থাক্‌বার জায়গা খুঁজ্‌ল। কলিন্সকে বল্ল, "ওয়াই-এম্‌-সি-এ'তে হবে ?" কলিন্স বল্ল, "উহুঁ। এক বছর আগে যারা আবেদন করেছে তারা এখনো পায় নি।" বাদল ক্ষুণ্ণ হল। তার ভারি ইচ্ছা ছিল যুবকদের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থেকে একটা নতুন স্বাদ পেতে। হৈ হৈ করবে, টো টো করবে। লণ্ডনের মধ্যস্থলীর হট্টগোল কেমন লাগে সেটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। তার ফলে হয় ত এমন অনিদ্রায় ভুগ্‌বে যে হাঁসপাতালে ঢুক্‌বে। সেও ভাল, হাঁসপাতালের অভিজ্ঞতাও তার দরকার। সেখানে রোগীদের নার্সদের সঙ্গে ডাক্তারদের সঙ্গে ভাব করবে। কি মজা!

ব্লুমস্‌বেরীতে দেদার ইণ্ডিয়ান। রাসেল স্কোয়ারেও ইণ্ডিয়ান দেখা যায়। ওদিকে নয়। হ্যাম্পষ্টেড তো ইণ্ডিয়ানদের পাড়া হয়ে উঠেছে। ওদিকে নয়। সিটিতে রাত্রে মানুষ থাকে না, ওদিকে নয়। সাবার্ব-এ থাক্‌লে লণ্ডনের জন-সংঘাতমদিরা পান করা যায় না। ওদিকে নয়। বাদল হাইড্‌ পার্ক ও কেনসিংটন পার্কের সংলগ্ন অঞ্চল পায়ে চষে বেড়াল। এবার তার খেয়াল হল হোটেলে ঘর নেবে। পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক ভাড়া। এত ভাড়া দিলে বইপত্র কেনার জন্য বড় বেশী বাকী থাকে না। বাদল সপ্তাহে চার পাউণ্ড অবধি খাওয়া ও থাকার জন্য খরচ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু অত সস্তায় ওসব অঞ্চলের হোটেলে জায়গা পাওয়া অসম্ভব। বেচারা বাদলকে ঐ সব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হ'ল। সকাল বেলা পার্কে বেড়ান'র আশা রইল না। কত বড় ফ্যাসানেব্‌ল্‌ জিনিষ সে হারাল। স্বয়ং বার্ণার্ড শ' সেখানে পায়ে হেঁটে বেড়ান। বাদলের অভিলাষ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। পার্কের বাতাস গায়ে লাগ্‌লে রাত্রে তার ভাল ঘুম হতে পারে। যাতে ঘুম ভাল হয় সে জন্য সে কত ওষুধ পথ্য খেয়েছে, কিছুতে কিছু হয় নি।

চেল্‌সীর এক রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে বাদল আশ্রয় পেল। চেল্‌সীতে চিরদিন সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বাস করে এসেছে। সুইফ্‌ট্‌, ষ্টীল্‌, স্মলেট, লি হাণ্ট, কার্‌লাইল্‌, টার্ণার, হুইস্‌লার, রসেটী, এঁরা বাদলের পূর্ব্বাধিবাসী। ম্যানেজার বাদলকে একটি খালি ঘর দেখাতেই বাদলের অমনি পছন্দ হয়ে গেল। বাদল কথা দিল এবং কথার সঙ্গে অগ্রিম টাকা দিল।

মিসেস্‌ উইল্‌স্‌ যখন সমস্ত শুন্‌লেন তখন শুধু বল্লেন, "আচ্ছা।" তাঁর মন-কেমন করতে থাক্‌ল, কিন্তু মুখে তেমনি কৌতুক হাস্য। বাদল ভাব্‌ল, যাক্‌, তিনিও ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌লেন। আমি কি কম জ্বালিয়েছি তাঁকে। সাড়ে বারটা অবধি আমার কোকো তৈরি করে দেবার জন্যে বসে থাকা, এই কষ্ট স্বীকার করার কি মূল্য আমি তাঁকে দিতে পেরেছি। ডিয়ার ওল্ড্‌ কুইনী। বিদায়কালে তাঁকে সে কি উপহার দিয়ে যাবে ভাব্‌ল।

জর্জ প্রমাদ গণ্‌লেন। বাদলকে পেয়িং গেষ্ট রূপে পেয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে কিছু জমাতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে কিছু বলেছ টলেছ নাকি ?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "ওটা একটা পাগল। বলে তিন মাসের বেশী কোথাও থাক্‌বে না।" জর্জ লক্ষ্মীপেঁচার মত মুখ করে থাক্‌লেন। কি ভাব্‌লেন, হঠাৎ বল্লেন, "বার্ট শুনেছ ? লিবার্‌লরা ল্যাঙ্কাষ্টার বাই-ইলেকশনে জিতেছে ? তোমাকে আমার অভিনন্দন করা উচিত।" কিন্তু ভবী ভোলে না। বাদল বলে, "ধন্যবাদ, মিষ্টার উইল্‌স্‌। আর একটা কথা শুনেছেন ? আমি চেল্‌সীতে উঠে যাচ্ছি ? বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে দেখা হবে।"

বেগতিক দেখে জর্জ প্রস্তাব করলেন, বাদল যদি তার বন্ধুকে ঐ বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট্‌ করে দেয়! ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ঐ বাড়ীতে কোনো প্রেজুডিস্‌ নেই! মিস্‌ মেয়ো যে কত বড় মিথ্যাবাদিনী সেটা ঐ বাড়ীর মানুষ যেমন বুঝেছে —বিশেষতঃ বাদলের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেয়ে —তেমন আর কেউ এ দেশে বোঝেনি! বাড়ীর ছেলের মত থাকা একমাত্র ঐ বাড়ীতেই সম্ভব!

বাদল বল্ল, "কিন্তু আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু ত দুটি তিনটীর বেশী নেই। তাঁরা যেখানে আছেন সেখান থেকে নড়্‌বেন বলে ত মনে হয় না। আপনারা একবার বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন। লণ্ডনে দু'হাজার ভারতীয় ছাত্র আছে, মিষ্টার উইল্‌স্‌।"

মিসেস্‌ উইল্‌স্‌ রঙ্গ করে বল্লেন কি সত্যি সত্যি বল্লেন বোঝা গেল না,—বল্লেন, "কিন্তু আর একটিও বার্ট নেই, মিষ্টার উইল্‌স্‌।"

পরদিন বাদল অতি সহজভাবে বিদায় নিল। যেন এক রাত্রির অতিথি। একবার পিছু ফিরে চাইল পর্য্যন্ত না। ফিরে চাইলে দেখতে পেত মিসেস্‌ উইল্‌স্‌ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। তাঁর দৃষ্টি বাষ্পান্ধ। তবু তাঁর অধরে কৌতুকের আভা। (ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

অহল্যা ঘাট কাশী

[এচিং

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

রাত্রি, বাঁশ ঝাড়, আকাশে কয়টি তারা

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

বাঁশের আঁধার দোলে হাওয়াতে, মাথায় কয়টি তারা !······

যদি কেউ এসে বাঁশ বাগানের ঝোপের অন্ধকারে
—এমন হোতে ত পারে—
আমারে পলক দেখার আকুতি ভরে' নিয়ে দুই আঁখে
যদি কেউ এসে নিশুতি আঁধারে ওখানে দাঁড়ায়ে থাকে !—
আলো নাই ঘরে, আমারে দেখিতে দূর হ'তে পাবে না সে।
আমার বন্ধ বাতায়নখানি দোলায়ে দীর্ঘশ্বাসে
আমার বাগের সন্ধ্যামণির ফুলগুলো পায়ে দলি'
যাবে দূরে—দূরে—যেথা ওই বিলে ও আকাশে গলাগলি।
সখি, কাজ নাই—একটি প্রদীপ জেলে দাও পইঠাতে
কি জানি, হয়ত মোর লাগি' কেন কাঁদে আঁধিয়ার রাতে !

বাঁশের ঝাড়ের মাথার উপরে তাকায় কয়টি তারা !···

তারাগুলি যদি কোন কিছু বলে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

আমি জানি, নিশ্চয়
ওই যে দুইটি জল্‌জলে তারা বাঁশের আগার কাছে
ওরা আকাশেতে আগে ছিল না'ক—নূতন জন্মিয়াছে।
সেদিন যখন কাঁকন ভাঙিয়া সাঁজের আঙিনে লুটি,—
বলি, "ওগো, জাগো—চোখ মেলো—"
আর টানি তার আঁখি দুটি,
বুকে মুখ ঝাঁপি, ছুটে পায় পড়ি, নয়নে অঝোর ঝোর—
আর কাঁদি—"ওগো, জাগো—জাগো—
তুমি ছাড়া কেহ নাই মোর—
আঙিনে নয়ন-তারা খুলিল না ; দেখিনি অন্ধকারে
তা'র আঁখি দুটো জোড়া-তারা হ'য়ে উদিল আকাশ-পারে !
রোজ ঘরে ঘরে ওরা খিল দেয়, জাগিয়া থাকে না কেহ—
শুধু আমি একা কান পেতে থাকি ; মিটাইয়া সন্দেহ
ওই বাক্‌হারা তারকারা যদি কোন কথা কহে ভাই !—
পহর কেটেছে কত, ওরা কিছু কোনদিন কহে নাই।
সখি, দেখ—দেখ—ওই বাঁশবনে আলো করে চিক্‌চিক্‌—
আমার তারকা,—হোতে পারে—
আজ আমারে খুঁজিছে···ঠিক !
হায়, সে অবোলা বেড়ায় বেধে কি শেষকালে যাবে ফিরে ?
সখি, কাজ নাই—আজ দোরগুলো খুলে রাখো এ কুটীরে।

শ্রীমনোজ বসু

নীড়

শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয়ন্ত চাটুর্য্যে জমিদার, তার উপর মস্ত বড় ব্যারিষ্টার; সুতরাং পয়সার অভাব নেই। তার একমাত্র অভাব সংসারে মানুষের। আপনার বলতে জগতে কেউ নেই বল্লেই হয়। বিয়ে করেনি, আর করবার আশাও নেই। বন্ধু বান্ধবে [illegible]র কথা নিয়ে চোখ টিপে হাসাহাসি করে, অর্থাৎ জয়ন্তর স্বভাব নাকি ভাল নয়। জয়ন্তও তাদের সঙ্গে হাসে।

বয়স তার ছত্রিশ পেরিয়ে গেছে; কিন্তু দেখে তাকে আরও বেশী বয়স্থ বলে মনে হয়। কানের দু'পাশের চুল এরই মধ্যে ধপ্‌ধপে সাদা হোয়ে গেছে; গায়ের রংটা এক কালে ছিল উগ্র রকমের সাদা, এখন দাঁড়িয়েছে তামাটে ভাব। শ্যামবাজারের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ীতে সে থাকে একলা।

সেবার পূজার ছুটিতে সে বেরলো পশ্চিম বেড়াতে; ইচ্ছে রইল আগ্রা যাবে। তাজ সে অনেকবার দেখেছে, তবু আশ মেটেনি।

সেদিন সকালে পশ্চিমের একটা কোন্ ছোট ষ্টেশনে তাদের গাড়ি গেল দাঁড়িয়ে। জয়ন্ত প্রথম শ্রেণীর যাত্রী অতএব গার্ড খাতির কোরে খবর দিয়ে গেল, যে সামনের লাইনে কোথায় মালগাড়ি উল্টে গিয়ে রাস্তা বন্ধ হোয়েছে সেইজন্যে এ গাড়ি ছাড়তে দু'এক ঘণ্টা দেরী হবে।

জয়ন্ত একখানা ইংরাজি মাসিক পত্র খুলে পড়তে বসলো।

হঠাৎ কখন তার কানে এল একটি মিষ্টি গলার আওয়াজ—কে বোলছে "ভজু ঐ দেখ আমার বাবা।" জয়ন্ত বই থেকে চোখ তুলে দেখলে, লাল কাঁকর বিছানো platform-এর উপর দাঁড়িয়ে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে একটি আট নয় বছরের মেয়ে সঙ্গের চাকরকে দেখাচ্ছে।

জয়ন্তর বুকের মধ্যে তোলপাড় কোরতে লাগল। সকালের পরিপূর্ণ আলোর মাঝে মিষ্টি গলার মধুর ডাক "আমার বাবা!" এই ছোট্ট দুটি কথা তার চারিপাশে স্বপ্নের মোহন জাল বুনতে সুরু কোরলে। অপরিচিত গলার এই একান্ত আপন ডাক তাকে যেন কি মন্ত্র গুঞ্জনে আবিষ্ট কোরে ফেল্লে।

সে ঘোর কাটিয়ে, জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে কামরার দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে ডাকলে। সে অমনি চাকরের হাত ছাড়িয়ে সেইদিকে ছুটে এল।

জয়ন্ত তাকে ভিতরে তুলে নিয়ে নিজের কাছে বসালে। মেয়েটির একখানা হাত নিজের কঠিন মুঠার মধ্যে ধরে জিজ্ঞাসা কোরলে "তোমার বাবার নাম কি?"

মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়লো জয়ন্তর গায়ে, বল্লে "তুমি বুঝি জাননা আবার? আমার বাবার নাম শ্রীজয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়; মস্ত বড় জমিদার, ওকালতি করে।" বোলে ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণ দিয়ে জয়ন্তর পানে চেয়ে রইল।

এযে সেই হাসি, সেই চাউনি; এমন কি ঠোঁটের কোণের বাঁকা রেখাটিও যেন তারই মুখ থেকে তুলে আনা। জয়ন্ত কোনও কথা বলতে পারলে না। তার মনের মধ্যে তখন যে ব্যাকুল স্মৃতির ঝড় উঠেছে তাকে সে সাম্‌লাতে পারছিল না। কোন এক সময় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "আমি কি তোমার বাবা?"

মেয়েটি অমনি ঘাড় নেড়ে বলে উঠলো "বা! তা নয়ত কি? এই দেখনা!" সে তার গলায় পরা সোনার সরু হারে গাঁথা একটা পদক কাপড়ের নীচে থেকে টেনে-বার কোরলে। তারপর তার ঢাকনা খুলে দেখালে তার মধ্যে জয়ন্তর ২৬।২৭ বছর বয়সের একটি ছবি।

জয়ন্তর সমস্ত মুখ সাদা হোয়ে গেল। এ পদক সে পাঠিয়েছিল তার হৈমকে, বিলেত থেকে; এ ছবিও বিলেতে তোলা।

জয়ন্ত আর কোনও কথা না বলে মেয়েকে কোলে কোরে নেমে গেল গাড়ি থেকে। চাকরকে বলল তার সব জিনিষপত্র নামিয়ে নিতে।

ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্ পার হোয়ে যে লাল রাস্তাটি চলে গেছে, তার তুদিকে ছোট ছোট বাড়ি বাগান দিয়ে ঘেরা। তারই একটা বাড়িতে জয়ন্ত আর মেয়েটি ঢুকলো।

বাগানের রাস্তার কাঁকরে তাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে হৈম ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জয়ন্তকে দেখে চম্‌কে উঠে বল্লে "মাগো, কি চেহারাই হোয়েছে! এস ঘরে এস।"

হৈমর গলার স্বরে জয়ন্তর সমস্ত শরীর থর্ থর্ কোরে কাঁপছিল; সে হৈমর কাঁধে একটা হাত রেখে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

* * * *

জয়ন্ত যখন এম, এ, পাশ কোরে বাড়িতে বসে আছে, সেই সময় ওর সঙ্গে হৈমর দেখা হয়। হৈম সেই বৎসর আই, এ, পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার একটা ছোট মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। সেই স্কুলেরই কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে জয়ন্তর সঙ্গে হৈমর হোল দেখা। প্রথম সাক্ষাতেই ওদের তুজনের ভবিষ্যৎ মিলনের সূত্রপাত হোয়েছিল। তুজনে তুজনকে দেখে সঙ্কোচ অনুভব করেনি।

তারপর ওদের দেখা হয়েছে অনেকবার। হৈম কথা কয় অনর্গল, যেন পাখীর অবিশ্রাম কাকলি। জয়ন্তর মজা লাগে ওর কথা শুনতে। প্রতিদিনই ওদের মনে হোত আজ যেমন ভাবে পরস্পরকে পরিপূর্ণরূপে পেয়েছি এমন আর কোনও দিনই ঘটেনি। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হবার সময় রোজই মনে হয়েছে যেন অনেক কিছু বাকি রোয়ে গেল।

এই পৃথিবীর মধ্যে তারা নিজেদের একটি জগৎ সৃষ্টি কোরে নিয়েছিল; তারই মধ্যে তুজনের ঘোট্‌তো দৈনন্দিন মিলন। একটি অম্লান আনন্দের জ্যোতিতে তুজনে পরস্পরকে জানতে পেরেছিল।

হৈম সে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। ছোট বয়স থেকেই খৃষ্টান অনাথ-আশ্রমে মানুষ হোয়েছে। মা বাপকে তার মনে পড়ে না। আর কোনও যে আত্মীয় স্বজন আছে একথাও সে জানে না।

তার বিশ বছরের শুষ্ক মন জয়ন্তর ভালবাসায় আর্দ্র হয়ে একটি অপরূপ শ্রী ধারণ কোরলে। এতদিনে সে যেন আশ্রয় পেলে। জয়ন্তকে সে তার মন দিয়ে সর্ব্ব দেহ দিয়ে সদাই বেষ্টন কোরে থাকতো। সে দিলে জয়ন্তর কপালে পরিয়ে তার ভালবাসার রাজটীকা, জয়ন্ত নিলে তাকে নিজের মনোরাজ্যে নব-বধূর বেশে বরণ কোরে।

জয়ন্ত চিরদিনই খাম-খেয়ালি, ছন্নছাড়া। একথা হৈম জেনেছিল, তাই বেচারার ভয়ের আর সীমা ছিলনা, কবে বুঝি কোন অঘটন ঘটে, বুঝি জয়ন্তর ভালবাসার জোয়ারে ভাঁটার টান দেখা দেয়। ভীরু পাখীর মত হৈম, জয়ন্তর বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকতে চাইতো।

জয়ন্তর কাছে হৈম যেন নতুন খেলনা। সে তাকে রোজই নতুন নতুন সাজে সাজাতে চাইতো; উপহারের বন্যায় তাকে অস্থির কোরে তুলতো। হৈম যে-সব কথা কোনও দিন শোনেনি এমনি অভাবনীয় কথা কোয়ে তাকে লজ্জায় রাঙিয়ে দিত, কাঁদাতো, হাসাতো। জয়ন্তর ভালবাসা যেন কাল-বোশেখীর ঝড়, হৈমর সত্তা উড়িয়ে দিয়ে সে আপনার লীলাতেই আপনি মত্ত।

একটা রঙিন নেশার ঘোরের মধ্যে দিয়ে তাদের মিলনের প্রথম বছর কেটে গেল। জয়ন্ত অনেকবারই হৈমকে বিয়ে কোরতে চেয়েছে। হৈম ঘাড় নেড়ে বলেছে "তুমি আমার রূপ-কথার রাজপুত্তুর; তেমনিই থাক চিরদিন। ঘরের মানুষের মত তোমায় দেখতে পারব না। সংসারের হাজারো কাজের মধ্যে তোমায় পাবার আমার অবকাশ কোথায়?"

জয়ন্ত ওর কথায় হেসে বলে "চিরদিন আমি তোমার খেলার সাথী হোয়ে থাকি—তাই কি তুমি চাও?"

হৈম বলে "হ্যাঁ।"

ওদের জীবনে এখন ভালবাসার ঝড়ের বেগ কমে এসেছে; এখন যে ওদের মাঝে পরিপূর্ণ জানাজানির

দক্ষিণে হাওয়া। হৈম যেন নিশ্বাস ফেলবার সময় পেয়েছে। জয়ন্তর অনিশ্চিত জীবনটাকে সে এখন নিশ্চিতের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে; তাই যেদিন জয়ন্ত বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হোয়ে আসবার সঙ্কল্পে জানালে, সেদিন হৈমর বুকের মধ্যে কান্নার অকূল সমুদ্র দুলে উঠলেও তার কালো চোখের তটে তার আভাষ পাওয়া যায় নি।

শরতের নীল আকাশে তখন পালে পালে সাদা মেঘের যাতায়াত সুরু হোয়েছে; হৈমর মন হোল উতলা। জয়ন্তও এই সময় বলে যাবার কথা। সে যেন জয়ন্তর চলার পথের শ্যামল ছায়া; ক্ষণিক বিশ্রামের পরেই কি পথের পথিক তা'কে ছেড়ে যাবে? আর সেই থাকবে কেবল আপনার সুনিবিড় অন্ধকারে আপনি নিমগ্ন হোয়ে?

হৈম ব্যাকুল দুই হাত দিয়ে জয়ন্তর একটা হাত চেপে ধরে বল্লে "আমার একটা কথা রাখবে? যে কটা মাস আছ, আমায় কোথাও কলকাতার বাইরে নিয়ে চল।"

জয়ন্ত বল্লে "কিন্তু তোমার কাজ?"

হৈম বাধা দিয়ে বলে উঠলো "থাকগে আমার কাজ। এই কটা দিন তোমায় কাছে রাখতে চাই।"

তাই হোল; তারা গেল জসিডি। হৈম পাতলে সেখানে সংসার; জয়ন্তকে লাগিয়ে দিলে বাজার করার কাজে। অতএব ঘরে রোজই আসতে লাগলো দরকারের চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ। তা'তে তাদের রোজই নব নব পাক-প্রণালীর আবিষ্কারের সুবিধেই হোল। এই অপচয়ের খেলায় জয়ন্তর ভারি উৎসাহ। কিন্তু এ খেলা হৈমর সইল না বেশী দিন।

এই যে পুতুল খেলার সংসার তারা পেতেছে এশুধু দুদিনের জন্যে, এই কথা যখন তার মনে হয় তখন সে অপরিসীম ব্যথায় ব্যাকুল হোয়ে ওঠে! জয়ন্ত এই কটা দিন সুধায় ভরে দিয়ে গেল; সেই সুধা হৈম পান কোরেছে আকণ্ঠ; জয়ন্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুধা তো বিষিয়ে উঠবে। হৈম তখন বাঁচবে কেমন কোরে?

হৈমর নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে হোতে লাগলো। সে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের জন্যে তার জীবনে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে লাগলো। জয়ন্তর বিচ্ছেদে সে চায় তার দেহমন দিয়ে জড়িয়ে থাকতে এমন একটি অবলম্বনকে যা জয়ন্তর একান্ত আপন তার নিজেরও অতি আপনার। সে চায় এমন জিনিষ যা চিরদিনের; যার মধ্যে চিরকালের মত জয়ন্ত ধরা পড়ে থাকবে। পালিয়ে গিয়েও পালাতে পারবে না। হৈম দুর্ব্বল, সে শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না।

তাই ভীরু দুরু দুরু বুকে সকল বাধা সরিয়ে আপনিই ধরা দিলে জয়ন্তর কাছে।

এবার আবার তাদের হোল নতুন করে পরিচয়। বিচ্ছেদের যে কটা দিন বাকি, সেই কটা দিনকে তারা যেন নিষ্পেষিত কোরে আপনাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু মধু সঞ্চয় কোরে নিতে চায়। তাদের দিনগুলি দিয়ে যেন তারা আনন্দের মালা গেঁথে চল্ল, আসন্ন বিরহের গলায় পরাবে বলে।

জসিডি থেকে ফেরবার সময় হোয়ে এসেছে। সেদিন তারা গিয়েছিল মাঠের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে, একটা আধ শুক্‌নো নদীর ধারে।

মহুয়া গাছের তলায় শুক্‌নো পাতার উপর শু'য়ে হৈম জয়ন্তর কোলের উপর একটা হাত রেখে বল্লে "এ জীবনে যা কখনও পাই নি, পাবার আশা ছিল না, তা তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। এতদিন ছিলুম আমি অপূর্ণ, তুমি আমায় পূর্ণ কোরেছ। আমার এই বিশ বছরের ব্যথা তুমি এক মুহূর্ত্তে ভালবাসার রঙিন ফুলের মালা কোরে গেঁথেছ। আমার মনের গেরুয়া বসন ছাড়িয়ে, পরিয়েছ নব বধূর সাজ।"

হৈমর দুই সজল কালো চোখের পানে চেয়ে কান্নায় জয়ন্তর গলা ভারি হয়ে এসেছিল, সে বল্লে "জীবনের পান্থ-শালায় দুদিনের জন্যে দুজনের হোয়েছিল দেখা। ছেঁড়া কাথা গুটিয়ে আজ আবার চলতে হবে; কিন্তু অচিন ঘরের মেয়েকে আমার ঘরের বৌ করে নিতে সর্ব্বস্ব খোয়াতে রাজি ছিলুম, এই কথাটি মনে রেখ।"

হৈম মাথা নেড়ে বলেছিল "ভুলি নি, ভুলব না সে সে কথা। আমি তোমার পথের পাশের ছায়া; ক্লান্ত

হোলে এস আমার কাছে। আমার পথ চলা ফুরিয়ে এসেছে জানি; যাকে পেয়েছি নিজের মাঝে, সেই আমাকে ঘর বাঁধার কাজে লাগাবে এবার।"

জয়ন্ত কোন কথা বলতে পারে নি, কেবল হৈমকে নিবিড় আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিয়েছিল।

জয়ন্ত বিলেত চলে গেছে। সেথান থেকে লিখতো মস্ত বড় বড় চিঠি, হৈম দিত তার ছোট ছোট জবাব।

এক মেলে জয়ন্ত চিঠি পেলে, হৈম লিখেছে "তোমার খুকী অনেকটা আমারই মত হোয়েছে; কিন্তু তার চোখ দুটিতে তোমার দুরন্তপনার আভাষ পাই। তার চোখের দিকে চাইলে তোমার কথা মনে পড়ে।"

জয়ন্ত চিঠি পড়ে একরাশ খেলনা কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এরপর হৈমর তরফের চিঠি আসা ক্রমশঃই কমে এসে শেষে একেবারে বন্ধ হোয়ে গেল। জয়ন্ত দেশে ফিরে এসেও হৈমর সন্ধান করে তাকে খুঁজে পায় নি।

হৈমর সঙ্গে যে নীড় সে বাঁধতে চেয়েছিল তারই সন্ধানে, তাকে কোরলে ঘরছাড়া। সেযে ধরা দিয়েছিল একদিন, এই কথাটাই রোয়ে গেল ফাঁকি, আর এই যে তাদের দুজনের মধ্যে আড়াল পড়েছে এইটেই হোয়ে উঠলো সত্যি।

আজ সেই আড়ালের আবরণ ছিন্ন কোরে যে ছোট মেয়েটি, জয়ন্তর যৌবনের শেষ প্রহরে তাকে আপন বলে ডাক দিলে সে যেন ওর শুকতারা, সকল অন্ধকার ঘুচিয়ে উদয় হোয়েছে জীবনের আকাশে।

তারই আলোয় হৈম নিয়ে গেল জয়ন্তর হাত ধরে সেই ঘরে যে ঘর সে একদিন বাঁধতে চায়নি।

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মায়ের হৃদয়

(ফরাসীর ছায়াবলম্বনে)

শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

"মা যাব", বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল খোকা,
তখন সকলে কাঁদিতেছে চারিদিকে:
দিদি তার ভাবে,—আচ্ছা যা হোক বোকা,
একটু বুদ্ধি নাই যে কিছুই শিখে!
মা কি আর বেঁচে র'য়েছে যে নেবে তোকে?"
কিছু নাহি বুঝি' কাঁদিতেছে শিশু দুখে,
সে দৃশ্য আর দেখিতে না পারি' চোখে
পিতা তা'রে তুলি' দিল তার মা'র বুকে!
অভ্যাস মত বুকের বসন তুলি'
স্তনপান শিশু করে বিহ্বল হ'য়ে:
মাঝে মাঝে সুধু ছোট ছোট অঙ্গুলি
মা'র মুখে দেয় বুলাইয়া র'য়ে র'য়ে!
আর কি থাকিতে পারে প্রাণহীনা মাতা?
স্বর্গ হইতে ফিরিল সে ধরণীতে:
সহসা সকলে হেরিল নড়িছে মাথা:
"বাবারে আমার!" বলি' মা হৃদয়টিতে
সযতনে চাপে বুকের বাছারে তা'র!
যাহারা হেরিল, মানে তারা বিস্ময়!
সুধু জননীরা হাসি' ভাবে বার বার,—
"মায়ের হৃদয় এমনই জানি হয়!"

কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবজ্রানন্দ গুপ্ত

কবিকে চিনতুম না, যদিও অনেক কবিতা আগে প'ড়েছিলুম। মনে করতুম কবি বললে যে রকমটি হয় বুঝি তেমনি,—হয়ত' মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সরু ঘাড়, ক্ষীণ তনুবল্লরী ললিতলতার মতো, চোখে সোনার pincenez, [illegible] গরদের পাঞ্জাবী—কিন্তু একি, কল্পনার সে চিত্রটির সঙ্গে মিল মোটেইত' নেই ; সহজ সরল মানুষটি, আমাদেরই মতো প্রতিদিনকার জগতের মানুষ, কাব্য জগতের কোন বৈশিষ্ট্যইত' চেহারায় নেই ?

আশ্চর্য্য হলুম,— এত বড় একটা বিচ্যুতির জন্য প্রস্তুত ছিলুম না—অবশ্য কল্পনার বিচ্যুতি। কিন্তু বাইরের পরিচয়টা ত' মানুষের অন্তরের পরিচয় নয়, দৈন্য যেথানে মানুষের প্রধান সম্বল সেখানে সে বাইরের সজ্জা দিয়ে আপনাকে ঢাকতে পারে না, বারে বারে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবেই। আর অন্তরের ঐশ্বর্য্যে যে অপূর্ব্ব দীপ্তিমান্ তার পরিচয় আপনিই ফুটে উঠবে বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখা পদ্মের গন্ধের মতো—যতই না ময়লা কাপড় ঢাকা দিয়েই তুমি রাখো। তাই আশ্চর্য্য হয়েছিলুম—কিন্তু দুঃখিত হইনি।

হাওড়া কলেজে সেই আমার প্রথম দেখা, দুর থেকেই আমি দেখলুম, পরিচয় সেদিন বিশেষ কিছু হ'লো না। তার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোক সঙ্ঘে। সেদিনই হ'লো পরিচয়—দেখলুম, সত্যিই কী চমৎকার, কবি'ত এমনই হওয়া চাই। মনের ভেতর এক সহজ বন্ধুতার বন্ধন যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো, যেন উনি আমাদের পরমাত্মীয়। কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, সতেজ আনন্দ রসে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা কইলুম, তর্ক করলুম, হো হো করে হাসলুম—কোনো বাধাই অনুভব করলুম না। সেদিন

'প্রীতি দিয়ে গড়িলাম মোদের জগৎ'।

এমনি করে দিন দিন আমাদের আত্মীয়তা বেড়েই চললো। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ আমার চেয়ে নিবিড় ভাবে আরো অনেকেরই হয়েছে—সে পরিচয় তাঁরাই দেবেন। তারচেয়ে আমার বহুদিন আগের দেখা মানুষটির পরিচয় দেবার চেষ্টা আমি করব—সে মানুষটি আমার মনের মানুষ, তাঁর কাব্যের মানুষ। সেখানে তাঁকে আমি দু'চোখ ভরে দেখেছি, নিবিড় ভাবে চিনেছি, অতীন্দ্রিয়লোকের বিপুল আনন্দ বেদনা দু'জনেই সমভাবে উপভোগ করেছি—ভেবেছি কাছে পেলে কি কবিকে এত করে ভাল বাসতে পারতুম, না এমন করে আত্মবিনিময় করতে পারতুম ?

রবীন্দ্রনাথের ভাস্বর প্রতিভার ছায়াতলে আধুনিক বাংলায় যেকটি কবি আত্মপ্রকাশ করেছে তার মাঝে কবি কিরণধনও একজন। তাঁর একটি নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, সেখানে তিনি একান্ত একাকী, আপনার আকাশে আপনিই দ্যুতিমান্।

তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি—হঠাৎ একদিন 'ভারতীতে' 'বাহবা বেড়ে' পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম, শুধু তাই নয় অঙ্কের খাতাতে কবিতাটা সমস্ত না টুকে ক্ষান্ত হলুমনা। তখন কবিতাটা শুধু ভালো লেগেছিল, অন্তর্নিহিত ক্ষুরধার ব্যঙ্গোক্তিটি হয়ত ঠিক বুঝতে পারিনি ; কিন্তু এখন বুঝি সত্যই কত গভীর মনোবেদনা থেকে এ কবিতার উৎপত্তি। স্বদেশের পরাধীনতার গ্লানি, তার মুক্তির অভিযানে প্রয়াসের শৈথিল্য কবিকে নিরতিশয় ব্যথিত করেছে, দাস-মনোবৃত্তির ফলে আমাদের আদর্শের কী হীনতা ঘটেছে, রাজনৈতিক দলাদলি আমাদের কোথায় দাঁড় করিয়েছে, তা' দেখে কবি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু এসবের প্রকাশ হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে, নয়নে হাসি আর হাতে

বিদ্রূপের কশা নিয়ে কবি তাঁর বাণীর তুরঙ্গ ছুটিয়েছেন দেশের মুহ্যমান চেতনার উপর দিয়ে,—তাদিয়ে তিনি করেছেন আঘাত যদিও বুক তাঁর ব্যথায় ভেঙে গেছে। তবু সোজা কথায় তিনি উপদেশ দেন নি—বোধকরি তীর্য্যগ-পন্থায় তিনি ছিলেন আস্থাহীন।

"আপিসে চাকরী করিয়া এখন
সুখে শান্তিতে রয়েছি কেমন,
অন্তিমকালে আধা পেন্‌সন্
পাই দুই চারি শত!
মিছে গোলমাল কর হৈ চৈ
সবুরে ফলবে মেওয়া নিশ্চয়ই,
এখন আমড়া আমড়াই সই
কামড়া কামড়ি ছেড়ে!"

(বাহবা বেড়ে—নতুন খাতা)

কাজের চেয়ে বক্তৃতা দেওয়াটা যে আমাদের বড়ধর্ম্ম এবং সেইটেই আমাদের সব চেয়ে বড় দেশের কাজ তা' কবির দৃষ্টি এড়ায়নি—

"স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজী,
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর বাংলা এবং ইংরিজী।"

(বাংলায় খদ্দর—নতুন খাতা)

রোজকার জগতের ক্ষীণতম বস্তুর অস্তিত্ব থেকে কবির অনুভূতির আক্ষেপ ঘটেনি বলে current topics নিয়ে লেখা কবিতায় দেখি তাঁর অসামান্য control। কোন ছোট জিনিষটিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি—মধুর ভাবে তারা তাদের নিজেদের স্থানটুকু দখল করে বসে আছে।

"আলো জ্বেলে ঐ
বিন্দে বুড়ী
চাল ভাজা খৈ
ভাজচে মুড়ী।
ঝাঁট দেয় ঝুঁকে
ময়রা মাগী
তানপুরো বুকে
গায় বিরাগী।
বাজে প্রেয়সীর
চাবির রিং
সোনার চুড়ির
ঝিনিক্ ঝিন্।

(নিদ্রাহীনের স্বপ্ন—নতুন খাতা)

শিশু সাহিত্যে কিরণধন একটা অভিনব ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন। তাঁর শিশু-কবিতা পড়লে মনে হয় আমারও সেই শিশু বয়সে ফিরে গেছি, তেমনি মনের আনন্দে হাসি ঠাট্টা, কোলাহল, মারামারি করছি,—

"ভোররাতে গাঁর পথে আধো আলো আঁধারে,
পিছে রেখে গোলাবাড়ী মন্দির বাঁ ধারে,
দলে দলে ছুটে চলে হেসে নেচে কাহারা?"

ছেলের দল ছুটে চলেছে—

"তাইত'রে তাইতরে হো হো হো হুররে!"
সারা পাড়া জেগে ওঠে কী ভীষণ সুররে!
ভাঙে ডাল পাড়ে ফল লাফ মেরে ছেঁড়েফুল,
মরনিং ইস্কুল!

সকালে কে কেমন করে উঠেছে, তাই বলছে—

"আমি ভাই কেটে দিয়ে মশারির দড়িটা,
হুকে গুঁজে রেখে ছিনু ঘুম ভাঙা ঘড়িটা!"
"জামা টেনে ছিঁড়ে দিলি রাস্কেল ড্যাম ফুল!"
মরনিং ইস্কুল!

(মরনিং ইস্কুল—মৌচাক ১৩৩২)

তার পর—

দুষ্টুর শিরোমণি ত্রিলোচন নন্দী
মাথায় খেলিত তার রকমারি ফন্দি,
টেরি কেটে এলো ক্লাসে জানুয়ারী চৌঠো
হাতে তার চট্‌পটি বাজি চার কৌটো,
সেগুলো সে মেঝেময় দিল সব ছড়িয়ে
বেঞ্চি চেয়ার টুল চারিদিকে নড়িয়ে,
হেন কালে পণ্ডিত আসিলেন যেমনি
চটিপায়ে ফটাফট্; ফটাফট অমনি
বাজি গুলো ফেটে করে চারিধারে নৃত্য!
পণ্ডিত একেবারে রেগে খুন্—ক্ষিপ্ত!

(পণ্ডিত মূর্খ—মৌচাক ১৩৩৫)

কত কবিতাই আর উদ্ধার করবো, এগুলো পড়লে মনে হয়, আবার যেন মর্নিং ইসকুল করতে ছুটে চলেছি, ত্রিলোচন নন্দীর মত পণ্ডিতকে ঠকাবার চেষ্টা আমিই যেন করছি। লেখার যে মাপকাটি সব চেয়ে বড়ো তা হচ্ছে এই যে লেখকের আর পাঠকের অনুভূতির তার-গুলো একই সুরে ঝঙ্কার তুলতে পারবে যে লেখা, সেই হবে শ্রেষ্ঠ লেখা। অর্থাৎ, লেখকের অনুভূতির ক্ষেত্রে আর পাঠকের অনুভূতির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্যই তখন থাকবে না। ওপরের তোলা কবিতা গুলোর বেলায়ও এনিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

অতি আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বহু-পরিচর্য্যাই দেখি কাব্যের মূল বস্তু হয়ে উঠেছে, কিন্তু কিরণধনের কবিতায় দেখি তিনি একনিষ্ঠ প্রেমিক, কাব্যের যে মানসলক্ষ্মী তাঁর অন্তরে অন্তরে ফুল ফুটিয়েছে সে তাঁর এ জগতের প্রিয়া, নিত্য নব নব রূপে অপূর্ব্বশোভাময়ী। কখনো সে কৌতুকময়ী বালিকা বধূটির মতো হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে ভেঙে পড়েছে—

'জুই বেল চাইনা, চাঁপা এনে দাও ;
আমি কিতা জানি, তুমি পাও কিনা পাও ?

* * * * *

ভালোবাস কিনা বাস—ঠিক বলো না!
চাঁদ ঐ উঠ্‌ছে, ছাদে চলনা।

* * * * *

না বলে না কয়ে তুমি কেন চুমা খাও ?
বলিনাকো যতকিছু আশকারা পাও !

* * * * *

আমি মরে গেলে তুমি খুব কাঁদবে ?
তখন এ বাহুডোরে কারে বাঁধবে ?
ওকি, ওকি, চোখ থেকে পড়ে কেন জল ?
মরে কেন যাব আমি—মিছে করি ছল।

(আব্‌দারে আধঘণ্টা—নতুন খাতা)

প্রেমের প্রশান্তির চেয়ে প্রেমের দ্বন্দ্বশীল মুহূর্ত্তগুলি আরো মধুরতম, প্রেম সেখানে আরো বেশী প্রগাঢ়। বিরহ মিলনের এই অপরূপ আলোছায়া তাঁর কাব্যের আকাশকে এক নতুন বর্ণচ্ছটায় বিভাময় করে তুলেছে।

তাই—দিয়েছে সে আড়ি করে—কথা কবেনা,
ফেলেদে মালতী চাঁপা, চামেলি হেনা,
একি সই হ'লো বল
ফুলে নেই পরিমল
চোখে খালি আসে জল
চোখে রবে না,
দিয়েছে সে আড়ি করে—কথা কবে না।

* * * * *

নিঠুর পায় সুখ বেদনা দিয়ে,
করে খেলা একি ক্রূর আমাকে নিয়ে।
মিছে ছলে বিনা দোষে
ঘা মারে আমারে ওসে,
কাঁদি অভিমানে রোষে
বিজনে গিয়ে,
নিঠুর পায় সুখ বেদনা দিয়ে।

* * * * *

যাদু জানে সে কুহকী যাদু জানে গো !
ঘা মেরে আমারে ফিরে বুকে টানে লো !

(ফুলের ঘা—উত্তরা ১৩৩৩)

মানুষের যা সব চেয়ে প্রিয় ভগবান্ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে অনেক নিষ্করুণ খেলাই খেলেন যুগে যুগে, কালে কালে ; তাই যৌবন যে সময় আপন উচ্ছলতা ভরে আপনি ছুটে চলেছে এমনি মুহূর্ত্তে কবির প্রিয়াকে তিনি এ ধূলার ধরা থেকে টেনে নিলেন। কবির শেষের কথা বলা হ'লো না। মানুষের দুঃখ হয় সব চেয়ে বড়ো যদি শেষের সময় মৃতপ্রিয়জনের দেখা না মেলে বা শেষ কথা বলা না হয়, যদিও শেষের কথা আজও অবধি কোনো মানুষ কোনো মানুষকে শোনাতে পারেনি, কারণ প্রত্যেক কথাটির পর আরেকটি কথা থেকে যায় যেটি' হ'তো তার শেষ কথা—তবুও তিনি দুঃখ করেছেন—

সকল কথা সারা হোলো—শেষ কথাটি কানে কানে,
কইব তোমায় মনে ছিল—রইল গাঁথা প্রাণে প্রাণে ;

চির জীবন রইল গোপন বুকের মাঝে প্রকাশ ব্যথা,
তারি রাঙা রক্ত-রেখা আঁকি আমার গানে গানে!
(ব্যথার ভুল—বিচিত্রা—১৩৩৫)

প্রিয়াকে হারিয়ে কবি কেঁদেছেন—যে বিরহ এতদিন মরলোকের ছিল তা'হলো আজ পরলোকের। এতদিন নিশ্চিত মিলনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে বিরহ চলেছিল বলে' তার উচ্ছ্বাস ছিল হাওয়ার খেলায় পুকুরের যে তরঙ্গ, তার মতো, কিন্তু আজ মিলনে সুদূরতায় তা' হলো সাগরের তরঙ্গের মতো' বিপুল উদ্বেল, চাঁদকে ধরবার জন্যে তার অসহ্য আকৃতি। পুরুরবা যেমন করে উর্ব্বশীর জন্যে কেঁদে কেঁদে বনে বনে ফিরেছিল তেমনি করে ফিরেছেন—মানুষকে নয়, প্রকৃতিকে তিনি বারে বারে শুধিয়েছেন—কোথা তাঁর প্রিয়া। এই বিরহলোক আবর্ত্তন করে কাব্যের যে ধ্বনি-মন্ত্র জেগেছে তাই হয়েছে এর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সেখানেই এই কবিতার সার্থকতা।

"কে পাঠালো উড়ো চিঠি বসন্তের এই রঙীন হাওয়ায়—
ও ফুলেরা জানিস্ তোরা কোনখানে সে কোন ঠিকানায়?
গোলাপ বলে—তার ঠিকানা
আমার ভালো আছে জানা
বকুল বলে—না না না না কাজ কি গোলাপ পরের কথায়?"
(উড়ো-চিঠি—নতুন খাতা)

যদি তিনি প্রিয়াকে না হারাতেন হয়ত এরূপ আমরা তাঁর কাব্যে দেখতুম না। হয়ত অন্যতররূপে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হ'ত।

চণ্ডিদাস যে প্রেমের কথা তাঁর কবিতায় সুরু করেছিলেন, আধুনিক কালে তার নতুন করে প্রবর্ত্তন হচ্ছে,—কিন্তু পরকীয়াতেই প্রেমের আশ্রয় যে একান্ত একনিষ্ঠ একথার ধ্রুবত্বেরও কোনো মানে নেই—বড়ো কথা এই যে, যে-প্রেমের আমরা স্রষ্টা তা পাত্র-নির্ব্বিশেষে আসল কিনা। কবির কবিতাসমষ্টি খুব বেশী নয়, কিন্তু এই অল্পের মধ্যেই তাঁর কবিতা প্রেমের সমগ্রতা ও সত্যতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মনে হয়, আধুনিক কালে এগুলি প্রেমের কবিতার সত্য নিদর্শন বলে গ্রাহ্য হবে।

প্রেমের কবিতা ছাড়া অন্য কবিতাতেও তাঁর মনের বিপুল ব্যাপকতার যে পরিচয় পেয়েছি তাও অবহেলার নয়, বিশ্বমানুষের জন্যে তাঁর বুকে ছিল অসীম সহানুভূতি। তিনি ছিলেন একটী সতেজ মানবতার প্রতীক।*

শ্রীবজ্রানন্দ গুপ্ত

* বাজেশিবপুর আলোক সঙ্ঘে কবির শোক সভায় পঠিত।
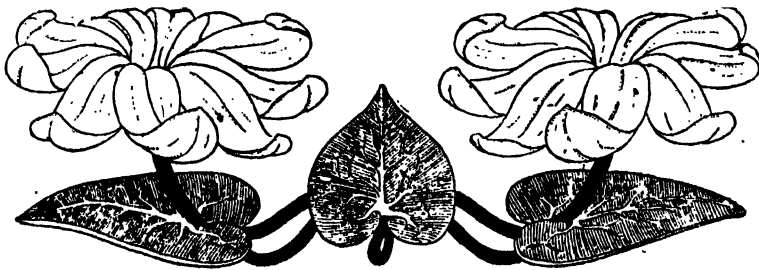
প্রথম চুম্বন

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম্‌-এ, বি-এল

আমি তা'কে সত্য সত্যই প্রাণের সমান ভালবাস্‌তাম। বোধ হয় এ কথাটা বলাটাই বাহুল্য, বিবাহিতা পত্নীকে কে কোথা না ভালবাসে?

তবে এটা ঠিক যে এ সে ধরণের ভালবাসা নয়। দেহের সম্পর্কে যে ভালবাসা, বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে যে ভালবাসার উৎপত্তি, আর একজনের জীবনের সঙ্গে যা'র অবসান,—এ সে ভালবাসা নয়। মৃত্যুকে অতিক্রম করে' যে ভালবাসা দিন দিন, তিল তিল করে বেড়ে উঠে,—এ তা'ই।

কিন্তু সে কথা বলেই বা কি হবে! যা'র জীবন-মরণ এই একটা কথার উপর নির্ভর করছিল, তাকেই যখন বলা হ'ল না, তখন জগৎ সুদ্ধ লোককে সে কথা শুনিয়ে আর লাভ কি?

তবু বলি। নিজের পাপ নিজের মুখে প্রচার না করে, কেবল আত্মগ্লানির তুষানলে পুড়ে ছাই হ'লেও, সে পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না। তাই আজ সব কথা খুলে বল্‌তে হ'ল। যে ভয়ে নিজের কলঙ্ক এতদিন গোপন করে রেখেছি, তাই আজ আমার একমাত্র ভরসা। জগতের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ধিক্কারে আমার প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা পূর্ণ হ'ক!

১

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে হয়েও, প্রধানতঃ নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে বেশ উচ্চ পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলাম। ছাত্রজীবনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্র-মহলে আমার বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়েছিল। যখন এম্‌-এ পড়ি সেই সময় থেকে আমার এই কাহিনী আরম্ভ।

সমপাঠীদের মধ্যে যা'র সঙ্গে আমার সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার নাম সনৎ। হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টারের ছেলে সে, ভবানীপুরে বাড়ী। সনৎ ছেলেটি বেশ,—যেমন সুন্দর চেহারা, স্বভাবটিও তেমনি সুন্দর। বড়লোকের ছেলে বলে তা'র মোটেই অহঙ্কার ছিল না, বাবুগিরিরও বাড়াবাড়ি ছিল না। পড়াশুনাতেও মন্দ নয়,—তবে অবশ্য আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বার আশা সে কোনদিন করে নি। বরং আমার সংসর্গে পড়াশুনার একটু উন্নতি হ'তে পারে, এই বিবেচনা করেই বোধ হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা একটু ঘনিয়ে তুলেছিল। তা'র সুযোগও হয়েছিল এই জন্যে যে আমিও ভবানীপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাক্‌তাম; আর দুজনের পড়াশুনাও ছিল এক,—এম্‌, এ আর, ল'।

কিন্তু পরের বাড়ীতে বাস,—যদিও আমার ঘর পৃথক এবং বাইরের দিকে, এমন কি সিঁড়ি পর্য্যন্ত আলাদা,—তবু, সর্ব্বদা যেন সঙ্কুচিত হয়ে থাক্‌তে হ'ত। তা'ছাড়া সনৎ বল্‌তো, এই বদ্ধ ঘরের ভিতর বসে প্রাণ হাঁফাই-হাঁফাই করে। তাই সনৎদের বাড়ীতেই আড্ডা হ'ল। সেখানে কিছুক্ষণ দু'জনে মিলে পড়াশুনা করে, আর তা'র চেয়ে ঢের বেশীক্ষণ গল্প আর উড়ো তর্ক করে সময় কাট্‌তো।

সনতের বাড়ীতে যতক্ষণ থাক্‌তাম, তা'র মধ্যে তা'র মা-বাপের দেখা পাওয়া বড় একটা ঘট্‌তো না। কিন্তু একজনের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হ'ত। যেদিন তা'র সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল, সেদিনকার কথা এখনও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার জীবনের সেটা যে একটা সন্ধিক্ষণ, সেদিন তা' জান্‌তে পারিনি, পরে বুঝ্‌লাম।

আমাদের পরস্পর পরিচয় করে দেবার জন্যে সনৎ প্রথমে আমার খানিকটা অযথা গুণ-কীর্ত্তন করে, শেষে আমার

দিকে ফিরে বল্‌লে,—ইনি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী,—নাম শোভনা। বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করেন। উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ,—প্রবেশ-অধিকার পা'বার জন্যে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্চেন্। এইবার সব পরিচয় দেওয়া হ'ল কেউ কারুর অচেনা রইল না ত?

আমি বল্‌লাম, "সম্পূর্ণ পরিচয় কই হ'ল? কনিষ্ঠা বল্‌লে কি বুঝ্‌বো? বয়ঃ-কনিষ্ঠা তা' ত দেখ্‌তেই পাচ্চি, কিন্তু ·····"

সনৎ বাধা দিয়ে বল্‌লে,—"তবে বলি। আমার তিনটি বোন, তা'র মধ্যে একজন আমার চেয়ে বড়। এই তিন জনের মধ্যে, দু'জন আবার আমাদের মায়া কাটিয়ে, গোত্র-পরিবর্ত্তন করে ফেলেচেন। বাকি আছেন ইনি। কোনদিন ইনিও মায়া কাটাবেন আর কি!"

আমি বল্‌লাম,—"এ তোমার অন্যায় কথা। তোমরাই মেয়েদের পর করে দেবার জন্যে ব্যস্ত। বাঙালীর ঘরের মেয়ের মা-বাপ, ভাই-বোনকে, ছেড়ে অজানা অচেনা লোকজনের মাঝখানে গিয়ে থাক্‌তে মোটেই আগ্রহ হয় না।"

অবিবাহিতা বালিকার সুমুখে তা'র বিবাহের প্রসঙ্গ উঠ্‌লে লজ্জা হ'বারই কথা। শোভনার দিকে চেয়ে দেখি, তা'র মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, মাথাটা একখানা বইয়ের পাতার উপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে। তা'কে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্যে; তার পড়াশুনার প্রসঙ্গ তুলে কথাটা চাপা দিয়ে ফেলা গেল।

দেখ্‌লাম মোটের উপর মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। বাঙলা না নিয়ে সাহস করে সংস্কৃতই পড়চে দেখে, তা'র খুব প্রশংসা কর্‌লাম। কিন্তু দেখ্‌লাম, গণিত-শাস্ত্রে তা'র মাথা তেমন খেলে না,—বিশেষ করে জ্যামিতিতে।

সেদিন এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সনতের বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোভনার কথা আমার মনে ছিল। আর কিছু নয়,—তা'র নামটি আমার বড় ভাল লেগেছে।

আমার মনে হয়, এই অধঃপতিত বাঙালী জাতটা, অন্ততঃ একটা বিষয়েও জগতের সকল জাতকে হারিয়ে দিয়েছে। মানুষের জন্যে এত রকম নূতন নূতন নাম, সৃষ্টি করতে, বোধ হয় আর কোন জাত্ পারে নি। এক এক দেশের বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গোটা কতক বাঁধাধরা নাম আছে, অতি পুরাকাল থেকে তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার হয়ে আস্‌চে। কিন্তু বাংলা দেশের মা-বাপ ছেলেমেয়ের জন্যে আর কোন সংস্থান করতে পারুন বা নাই পারুন, শব্দসিন্ধু মন্থন করে নূতন, সৌখীন, দুর্লভ নাম সংগ্রহ করে দিতে খুব পটু! তাই বাঙলার মাঠে-হাটে-বাটে কত 'কুমুদিনী কান্ত' 'রমণী-রঞ্জন', 'প্রভাতেন্দু-শেখরের' দেখা পাওয়া যায়।

গেজেটে যেবার পরীক্ষার ফল বা'র হয়, এই রকম বিচিত্র, অদ্ভুত, বিদ্‌ঘুটে, নানা রকম রাশি রাশি নামের একত্র সমাবেশ দেখে আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। গে পাতাগুলি উল্‌টে গেলে মনে হয়, যেন এক নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে চলেছি,—চারিদিকে কেবল গাছের পর গাছ,—ছোট, বড়, মাঝারি,—এক-একটি এক-এক রকমের, পরস্পর কোন সাদৃশ্য নাই, সামঞ্জস্য নাই। কেবল যেন উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে, মাঝে মাঝে গুটিকতক ফুল ফুটে আছে,—পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের অর্থপূর্ণ মধুর, কোমল নাম।

খুঁজে খুঁজে ভাল ভাল নাম সংগ্রহ করা আমার যেন একটা বাতিক ছিল। যে ক'টা নাম আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, তা'র মধ্যে একটি নাম এই শোভনা। কিন্তু বাস্তবিক এ নামটা যে কত সুন্দর, আগে তা'র ঠিক ধারণা ছিল না। উপযুক্ত আধারে পড়ে এই 'শোভনা' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ এবং সৌন্দর্য্য আজ সহসা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

শব্দ-মাত্রেরই একটা রূপ আছে,—যদিও সকলে সব সময়ে তা' ধরতে পারে না। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির পরিকল্পনা আছে। তেমনি এই শোভনা তা'র নামেরই পূর্ণ, জীবন্ত মূর্ত্তি,—অন্য কোন নাম যেন তা'র পক্ষে নিতান্ত বে-মানান্ হ'ত। যিনি এর জন্যে শৈশবেই এমন সুশোভন নামটি আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁ'র কল্পনা-শক্তি এবং সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের কথা ভেবে বিস্মিত হয়ে গেলাম।

তাই বলে, তা'কে কিছু নিখুঁত সুন্দরী বল্‌চি না। গল্প বল্‌তে বসেছি বলে যে নায়িকার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা

করতে হ'বে, এমন কি কথা আছে? বাস্তবিক, শোভনার যেটুকু দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌লাম, তা' মোটেই অসাধারণ নয়, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়। তা'র চোখে মুখে, তা'র প্রতি অঙ্গে, যে-একটা কোমল শান্ত শোভা ছেয়েছিল, তা' রাশ--পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতন স্থির, স্নিগ্ধ, শীতল,—বিদ্যুৎ-বিকাশের মতন দর্শকের চক্ষে চমক লাগিয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোরতর অন্ধকারে ফেলে দেয় না।

২

তা'রপর থেকে শোভনার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'ত। কোনদিন দু'-চারটে বাজে মামুলি কথা হ'ত, কোনদিন বা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা বুঝিয়ে দিতাম কি অঙ্ক কষে দিতাম।

তোমরা বোধ হয় ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছ, যে প্রথম-দর্শনেই শোভনার প্রতি আমার প্রণয় সঞ্চার হয়েচে,—এখন কেবল ওথেলোর মতন, বঙ্গ-বীরের একমাত্র পৌরুষ—পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় দিয়ে চলেছি,—ডেস্‌ডিমনার হৃদয় জয় কর্‌বার জন্যে। মোটেই না। শোভনাকে দেখে মনে একটা আনন্দ অনুভব করতাম বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আকাশের চাঁদকে দেখে শিশুর মনে যে আকাঙ্খা জেগে উঠে, বয়স্ক লোকের তা' হয় না,—সে শুধু দেখেই সুখী। আমিও গোড়া থেকে শোভনাকে এক ভিন্ন জগতের জীব বলেই বুঝেছিলাম; তাই কোন অসম্ভব আশা বা কল্পনা যা'তে মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে না স্থান পায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলাম। ব্যাপার কিন্তু দাঁড়িয়েছিল অন্য রকম,—সে কথা পরে বল্‌ছি।

এই ভাবে প্রায় দুটো বছর কেটে গেল। তা'র মধ্যে শোভনা ম্যাট্রিক্ পাশ করে কলেজে ভর্ত্তি হয়েচে। আমরা দুজনেও এম্, এ, পাশ করেছি। বরাবর যে স্থানটি আমার অধিকার করা ছিল, এবারও তা' থেকে বেদখল হইনি। এদিকে ল-কলেজে যাওয়াও শেষ হয়েছে, এখন কেবল আইনের শেষ পরীক্ষাটি দেওয়া বাকী। সুতরাং, আমরা এখন যেন জেল-খালাসী কয়েদীর মতন পুলিশের নজর-বন্দিতে আছি,—নূতন স্বাধীনতাটুকু ষোল-আনা উপভোগ কর্‌তে পাচ্চি না।

সনৎদের বাড়ী তেমন নিয়মমত যাওয়া-আসা এখন আর হয় না। গেলেও সবদিন তা'র দেখা পাওয়া যায় না। দেখা হয় শোভনার সঙ্গে, আর একজন নূতন লোকের সঙ্গে,—শোভনার মেজদিদি অপর্ণা। শুন্‌লাম তাঁর স্বামী,—পশ্চিমাঞ্চলের কোন কলেজের প্রফেসর,—কি একটা নূতন বিদ্যা শিখ্‌বার জন্যে জর্ম্মনী যাত্রা করার সময়, স্ত্রী-রত্নটি শ্বশুরালয়ে গচ্ছিত রেখে গেছেন।

সনৎকে যেদিন বাড়ীতে পাওয়া যায়, সেদিন বেশ মজলিস বসে। যেদিন সে না থাকে, শোভনাদের সঙ্গে দু-চারটে বাজে কথা কয়ে চলে আসি। যেদিন শোভনার সঙ্গেও দেখা না হয়, সেদিন কিন্তু কি-রকম একটা অস্বস্তি বোধ হয়,—সকালে উঠে চা না পেলে, কিম্বা চশমাখানা খুঁজে না পেলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম।

একদিন কথায় কথায় শোভনার পড়াশুনার কথা উঠলো। সনৎ বল্‌লে,—"দেখ সঞ্জীব, শোভনার লেখাপড়ার তেমন উন্নতি হচ্ছে বলে ত মনে হয় না। একটু আধটু যা দেখেছি তা, তেমন আশাপ্রদ নয়। তা'র উপর লজিক্‌টা নাকি ও তেমন বুঝতে পারে না। কিন্তু আমি ত ও রসে বঞ্চিত; তুমি যদি একটু দেখ।"

আমি বল্‌লাম,—"বেশ, মাঝে মাঝে দরকার মত একটু আধটু বলে দেবো এখন। ও এমন কিছু শক্ত জিনিস ত নয়।"

তারপর মাঝে মাঝে একটু-আধটু লজিক্ পড়ানো চল্‌লো।

একদিন ভাবলাম একটু পরীক্ষা করে দেখি। সহজ দেখে দু'-চারটে প্রশ্ন করলাম, বল্‌তে পার্‌লে না। শেষে নিজেই বোঝাতে আরম্ভ কর্‌লাম। শোভনা চুপ্‌টি করে শুনে গেল। কিন্তু মন দিয়া শুনচে কি না জান্‌বার জন্যে, মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেলাম। দেখি সে তখনও আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। তারপর যখন বুঝ্‌লে, আমি চুপ করে আছি, তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে।

বুঝ্‌লাম তেমন মনযোগ দেয়নি। বেশ মন দিয়ে শুন্‌তে বলে, আবার সেই সব কথা বোঝা'তে আরম্ভ করলাম। এবার সে আর মুখ তুললে না, হেঁট হয়ে খাতার উপর পেন্সিল দিয়ে আঁক কাটতে লাগলো।

খানিক বলে, ছোট একটা প্রশ্ন কর্‌লাম। কিন্তু শোভনা কোন উত্তর দেয় না, একমনে আঁক কেটে যায়। বল্‌লাম,—কি, বল্‌তে পার না? তখন তার চমক ভাঙলো; ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে বল্‌লে,—"আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন?"

হাল ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়্‌লাম। সনৎও বসেছিল। সে হো হো করে হেসে বলে উঠ্‌লো,—"যাক্ সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে,—"

সনৎকে এক ধমক দিয়ে বল্‌লাম,—"থাম,—তুমি আর বল'না। কলেজে লেক্‌চার শুন্‌তে শুন্‌তে তুমিও কি অন্যমনস্ক হ'তে না, গল্প কর্‌তে না?"

তারপর শোভনার দিকে ফিরে বল্‌লাম,—"তবে একটা কথা বলি। লজিকটা না হয় ছেড়েই দাও। ওটা নতুন জিনিস, হয়ত তেমন সুবিধা কর্‌তে পারবে না। তা'র চেয়ে সংস্কৃত নিলে হয়,—কতকটা ত পড়াই আছে—"

সনৎ বলে উঠ্‌লো,—"হ্যাঁ, আর কিছু না হয়, মুখস্ত করেও মেরে দেওয়া যায়।"

কিন্তু শোভনা কোন কথাই কানে তুল্‌লে না। তাড়াতাড়ি বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে, মহা অভিমান-ভরে সেখানে থেকে চলে গেল। তা'র মেজ-দিদি তা'র পিছনে ছুট্‌লেন,—সনৎ বসে মুখটিপে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সহজে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। বাসায় ফিরে এসে, একটু স্থির হয়ে কথাটা বুঝবার চেষ্টা করলাম। শোভনার হয়েচে কি? তা'র এ রকম আচরণের অর্থ কি? শুধু কি লজিক বুঝতে পারে না বলে, না আর কোন গূঢ় কারণ আছে? মনের মধ্যে একটা ঘোর সংশয় জমে উঠলো। তবে কি শোভনা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে? কিন্তু আমি তা'র কোন সুযোগ দিইনি। আমাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান তা' গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম, আর বরাবর সেই ব্যবধান ত বজায় রেখে এসেছি। কিন্তু আজ মনে হ'ল, আমারই একটা বিষম ভুল হয়েচে। আমি নিজেকেই বাঁচাবার উপায় করেছি, সেও আত্মরক্ষার কোন উপায় করেছে কি না, তা'ত দেখিনি। যে ব্যবধানকে আমি এত বড় করে দেখেছি, সেদিকে তা'র হয়ত নজরই পড়েনি। সরল-প্রাণা বালিকা সে, হয়ত তা'র হৃদয়-প্রবাহে নিশ্চিন্ত মনে গা' ভাসিয়ে দিয়ে এতক্ষণ অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে!

এ অনুমান সত্য হ'লে, আমার মত যুবকের পক্ষে খুব একটা গর্ব্বের বিষয় হ'তে পারতো। কিন্তু সে ভাবটা আমার মনে এল না। বরং একটা তীব্র আত্মগ্লানিতে হৃদয় ভরে উঠলো। ভাবলাম, হয় ত এখনও উপায় আছে,—কিছুদিন সনৎদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দেখা যা'ক্। পরীক্ষারও বেশী দেরী ছিল না, সুতরাং সঙ্কল্পটা কাজে পরিণত করা বেশ সহজ হয়ে গেল।

৩

পরীক্ষা হয়ে গেল। বিনা কাজে কল্‌কাতায় বসে থাক্‌বার কোন দরকার নাই ভেবে, একবার দেশে চলে গেলাম। ফেরবার কোন তাড়া ছিল না, সুতরাং সেবার প্রায় দেড় মাস বাড়ীতে কেটে গেল।

কলকাতায় ফিরে এসে একবার সনৎদের বাড়ী গেলাম, দেখা হ'ল না। লাইব্রেরী ঘরে অপর্ণা, শোভনা দুজনেই ছিল, তা'রা ডেকে বসা'লে। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে, শোভনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—"লজিক্‌টা একটু আয়ত্ব হ'ল, না ছেড়ে দেওয়াই স্থির?"

তা'কে আজ অনেক দিন পরে দেখে মনে হ'ল, তা'র চেহারার একটু পরিবর্ত্তন হয়েচে। রোগা হয়েচে কি না ঠিক বোঝা গেল না, তবে মুখখানা একটু বিষন্ন ম্লান মনে হ'ল। মুখ না তুলেই সে বললে,—"না, লজিকের আশা ত ছেড়েই দিয়েছি,—আমার দ্বারা আর কিছুই হ'বে না। পড়াশুনা একেবারেই ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু দাদা কিছুতেই শুনবে না। আপনি একবার দাদাকে বলবেন?"

বেদনাভরা চোখ দুটি তুলে এই প্রশ্ন করেই, যেন চোখ নামিয়ে নিলে, অপর্ণাও তা'র কথা সমর্থন করে বললেন,—"সত্যি, সঞ্জীব বাবু, এটা দাদার অন্যায় নয়? মেয়েছেলেকে ওষুধ গেলানোর মতন জবরদস্তি করে লেখাপড়া শেখানো কেন?"

আমি বললাম,—"হ্যাঁ, তা' বটে। বেটাছেলের বেলায় সেটা দরকার হ'তে পারে; কারণ তা'কে করে খেতে হ'বে। মেয়েছেলের বেলায় ত তা' নয়। তা'র লেখাপড়া শেখা কেবল মানসিক উন্নতির জন্যে। আচ্ছা, আমি সনৎকে বুঝিয়ে বলবো।"

কিন্তু সনৎকে বুঝা'ব কি, সে উলটে আমাকে বল্‌লে,—"তুমি বোঝ না। মেয়েছেলেকে পরীক্ষা পাশ করতে হ'বে, এমন কোন কথা নেই বটে। কিন্তু পড়াশুনা বজায় রেখে থা'ক না, যতটুকু শিখতে পারে ততটুকুই লাভ। আর আমাদের বাঙালীর ঘরের ব্যাপার জানই ত। ছেলেমেয়ে যতদিন লেখাপড়া করে, মা-বাপ দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন। তাই পড়াশুনা ছাড়া, অমনি ছেলের বেলায় চাকরি, আর মেয়ের বেলায় বিয়ে! লেখাপড়া ছেড়ে বসে থাকলে, মা এখনি শোভনার বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবেন,—তা আমি বেশ জানি। তা'র চেয়ে চলুক না,—হেসে খেলে যে কটা দিন যায় তাই লাভ।"

এ নিয়ে আর বেশী তর্ক করা গেল না, তবে সনৎকে অঙ্গীকার করিয়ে নিলাম, যে পড়াশুনার জন্যে বেশী পীড়াপীড়ি করবে না।

সনতের সঙ্গে আজকাল দেখাশুনা খুব কমই হয়। আইন পরীক্ষার পর থেকে, শিক্‌লি-কাটা পাখীর মতন, তা'র নূতন স্বাধীনতাটুকু সে পুরো মাত্রায় উপভোগ করচে। বাড়ীতে খুঁজলে তা'র দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু পথে-ঘাটে অপ্রত্যাশিত ভাবে যখন তখন দেখা হয়।

একদিন বৈকালে তার বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম সে বেরিয়ে গিয়েছে। ফটকের কাছ থেকেই চলে আস্‌ছিলাম, এমন সময় ভিতর থেকে ডাক এল। দেখলাম অপর্ণা একাই বসে কি একখানা বই পড়্‌চেন। তিনি তামাসা করে বল্‌লেন,—"চুপ চাপ পালাচ্ছিলেন যে বড়? সন্দেশ খাওয়াতে হ'বে, সেই ভয়ে বুঝি?"

তখন সবে মাত্র আইন পরীক্ষার পাশের খবর বেরিয়েছে। আমি হেসে বল্‌লাম,—"দুটো সন্দেশ খেয়েই যদি আপনারা সুখী হন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু সে দাবী ত আমারও আছে। তবে, দাবী করি কার কাছে; আসামীর ত দেখা নেই।"

অপর্ণা বল্‌লেন,—"আসামী বোধহয় বাড়ীতেই আছে। আপনি বসুন, দেখি। সন্দেশটা বোধহয় দু'তরফাই জুটবে। আমাদের তাই লাভ, আমরা ত ইতরে জনাঃ!"

বইখানা যেখানে পড়ছিলেন, সেখানে একখানা চিঠি গুঁজে রেখে, টেবিলের উপর ফেলে, তিনি ছুটলেন বাড়ীর ভিতর।"

আমি একলাটি চুপ করে বসেই আছি; কেউ আসেও না, কোন সাড়া শব্দও নাই। টেবিলের উপর যে বইখানা পড়েছিল, তুলে নিয়ে পাতা উল্‌টাতে উল্‌টাতে চিঠিখানার উপর চোখ পড়্‌লো। দেখেই চমকে উঠ্‌লাম। খামের উপর সনতের বাবা মুখার্জ্জি সাহেবের নাম-ঠিকানা লেখা, কিন্তু লেখাটা অবিকল আমার বাবার হাতের লেখার মতন! এ চিঠি কি তবে তা'রই লেখা? কিন্তু এঁদের যে পরস্পর আলাপ পরিচয় আছে তা' ত কখনও শুনিনি। কিম্বা এ আর কারুর লেখা? কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানি কোন দু'জন লোকের চেহারা যেমন এক রকমের হয় না, হাতের লেখাও তেমনি। কৌতুহল দমন করতে না পেরে, তাড়াতাড়ি খাম থেকে চিঠিখানা বা'র করে ফেল্‌লাম। ভাবলাম, তেমন কিছু গোপনীয় চিঠি হ'তে পারে না, তা'হলে বাপের চিঠি মেয়ের হাতে থাক্‌বে কেন?

প্রথমেই চিঠির তলার দিকে নজর পড়লো। তাইতো বটে! নাম সই করা রয়েচে, শ্রীপরেশ নাথ রায়! কাজেই সবটা না পড়্‌লে চলে না।

যতদূর মনে পড়ে বাবা লিখেছেন,—"আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। সঙ্গীর শিক্ষিত উপযুক্ত পুত্র, তার ইচ্ছার উপর আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে, যিনি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের জননী হ'বেন, তাঁকে একবার স্বচক্ষে দেখতে ইচ্ছা করি।"

দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথার ভিতর ছুটে এসে তোলপাড় করতে লাগলো।

তাড়াতাড়ি চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে একটু সহজ ভাবে বস্‌বার চেষ্টা করচি, এমন সময়ে,—"এই যে মশায়, আপনার

আসামী হাজির !" বলে, অপর্ণা পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরে এলেন। পিছনে আর একজন কে ছিল, চোখ তুলে চেয়ে দেখতে পারলাম না, আন্দাজে বোধ হ'ল,—শোভনা।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাইরে থেকে সনৎও এসে পড়েছে। এক সঙ্গে দু'দিক থেকে আক্রমণ,—আমার অবস্থা তখন ওয়াটার্লুতে নেপোলিয়নের মতন ! কি রকম যে হয়ে গেলাম, নিজেকে কিছুতেই আর সাম্লাতে পারি না,—পালাতে পারলে বাঁচি ! কিন্তু সনৎ কিছুতেই ছাড়বে না।

এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেন শেষে অপর্ণা ; বল্লেন,—"না দাদা ওঁকে ছেড়ে দাও। উনি চলেই যাচ্ছিলেন, আমি এতক্ষণ জোর করে বসিয়ে রেখেছিলাম।" তারপর আমার কাছে সরে এসে একটু চাপা গলায় বল্লেন,—"এখন যান, খোলা হাওয়ায় গিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। নেহাৎ কাঁচা চোর।"

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, চোখে না দেখলেও, ঢের শোনা গিয়েছে ; কিন্তু এমন বিনামেঘে রামধনুর উদয় কেউ কখনও দেখেচ কি ? সে দিনকার সেই সোণালী সন্ধ্যায়, আমার দেহে-প্রাণে, আকাশে-ভূতলে, রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সম্পদ দেখ্তে দেখ্তে বাসায় ফিরলাম।

৪

তারপর থেকে সনৎ এসে প্রায়ই আমাকে তা'দের বাড়ী ধরে নিয়ে যায়। সেখানে বসে খানিক গল্প-গুজব করে, চা খেয়ে, চলে আসি। কিন্তু আগেকার মতন আর তেমন সহজভাবে মিশ্তে পারি না। শোভনাও বড় একটা আসে না। তবে তা'র মেজদিদি মাঝে মাঝে তা'কে এক অদ্ভুত উপায়ে ধরে আনেন,—পর্দ্দার ভিতর হাত বাড়িয়ে দিয়ে, যাদুকরের মতন তা'কে হাত ধরে টেনে এনে খাড়া করে দেন। সে একটু বসে দাঁড়িয়ে এক সময়ে অলক্ষিতে সরে পড়ে। আবার তেমনি করে হাত বাড়িয়ে টেনে আনা। এই রকম করে কিছুদিন যায়।

ইতিমধ্যে একদিন দেশ থেকে বাবা-মা দুজনেই এসে উপস্থিত। তাঁরা এখানে ওখানে কত জায়গায় ঘুরলেন, কোথাও বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, কোথাও বা নিজেরাই যান।

এম্, এ, পাশ করার পর থেকে ডেপুটি-গিরির জন্যে একটু চেষ্টা করা হচ্ছিল ; এবার একটু ভাল করে লাগা গেল। যে দু'চার জন বড় বড় লোকের সঙ্গে বাবার একটু জানাশুনা ছিল, দু'জনে তাঁদের কাছে গিয়ে একটু উমেদারি করা গেল। গৃহস্থ ঘরের ছেলে, ওকালতিতে কিছু সুবিধা হ'বে বলে কেউ তেমন আশা দেন না ! তাই একটা ভাল চাকরির জন্যেই বিশেষ চেষ্টা। কিন্তু বলা যায় না, শেষ পর্য্যন্ত যদি ওকালতিই করতে হয়, তাই একজন বড় উকীলের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করে আসা গেল। এই রকম নানা কাজে ঘোরাঘুরি করে, তা'রা আবার দেশে ফিরে গেলেন।

আমার কিন্তু দিন দিন একটা উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠ্তে লাগ্লো। শোভনার কথা যখন মোটেই ভাব্তাম না, ভাব্তাম কেবল তা'র লজিকের কথা, তখন বেশ ছিলাম। কিন্তু সেই চুরি করে চিঠি পড়ার দিন থেকে, শোভনার চিন্তাই তিল তিল করে বাড়্তে লাগ্লো। তা'কে আজকাল ভিন্ন চক্ষে দেখ্তে আরম্ভ করেচি, ভিন্নরূপে ভাবতে আরম্ভ করেচি, কিন্তু এখন আর তা'কে কাছে পাই না। মরীচিকা বোধে এতদিন যা'কে সুমুখে দেখেও কাছে যেতে চাইনি, তা'কে যখন স্বচ্ছ শীতল সরোবর বলে জান্লাম, তখন থেকে সে মরীচিকার মতই ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগ্লো ! শুধু তাই নয়,—যে কথা শোন্বার জন্যে সলজ্জ আগ্রহ নিয়ে সনৎদের বাড়ী যাই, সে সম্বন্ধে কেউ আর কোন উচ্চ বাচ্য করে না। তবে কি কথাটা চাপা পড়ে গেল ? না' আমাকে নিয়ে শুধু একটু নিষ্ঠুর কৌতুক করা হয়েচে ?

এই রকম সংশয়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাট্‌চে, এমন সময় একদিন সনৎদের বাড়ী যাওয়া মাত্রেই অপর্ণা বল্লেন,—"আজ মশাই, আর এক প্রস্ত সন্দেশ খাওয়াতে হচ্চে !" কথাটার অর্থ বুঝ্তে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছি দেখে, অপর্ণা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্লেন। তারপর আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বল্লেন,—"এটা পড়ে দেখুন, বুঝ্তে পারবেন।"

চিঠিখানায় দেখলাম বাবা লিখেছেন যে শোভনাকে দেখে তাঁদের বেশ ভাল লেগেছে, মেয়েটি বড় সুলক্ষণা, বিবাহে তাদের সম্পূর্ণ মত আছে।

চিঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে অপর্ণা কিছুক্ষণ মুখের পানে চেয়ে দেখে বললেন,—"কেমন? এইবার?……আচ্ছা, সন্দেশটা না হয় পরে হ'বে, এখন শাঁখটা বাজাই?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি ছুটলেন দেখে, আমি বারণ করতে গেলাম,—"না না, কি সব ছেলেমানুষি করেন!" সনৎ ধরে বসালে, বললে,—"তুমিও ত আচ্ছা পাগল দেখ্‌চি! বস।"

শাঁখটা সত্যসত্যই আর বাজলো না। অল্পক্ষণ পরে অপর্ণা ফিরে এলেন,—সঙ্গে তাঁ'র মা। তাঁকে ইতি পূর্ব্বে দু'চার বার দেখেছি বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আজ তিনি পরম আত্মীয়ের মতন কাছে এসে বসলেন, বললেন,—"কি বল বাবা? সবই ত জান, এখন তোমার কথার উপরই নির্ভর।"

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম,—"যদি 'সকলের' তাই ইচ্ছা হয়, ত আমার কিছু বল্‌বার নেই।" শুনে তিনি যেন একটু সন্তুষ্ট হ'লেন, খুঁটিয়ে আমাদের ঘরের কথা অনেক জেনে নিলেন। তারপর, উঠে যাবার সময় বললেন, —"তা হ'লে ওঁকে বলি, তোমার বাবাকে লিখে একটা দিন স্থির করুন।"

আমি একটু বিনয় করে বললাম,—"দিন-কতক অপেক্ষা করলে ভাল হয় না? আমার একটা কাজকর্ম্মের কিছু ব্যবস্থা না হ'লে—"

সনৎও আমার কথায় সায় দিয়ে বললে,—"না না, তাড়াতাড়ির কোন দরকার নেই। সে আমরা ধীরে-সুস্থে সব ঠিক করে নেব এখন।"

মা চলে গেলে, অপর্ণাও উঠ্‌লেন, বললেন,—"এইবার তা'হলে আসামীকে তলব করতে হয়।" সনৎ ধমক দিয়ে বললে,—'দেখ্ অপর্ণা, বেশী বাড়াবাড়ি করিস্ ত চাঁটি খাবি!"

অপর্ণা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন,—"আচ্ছা, সে দেখা যাবে! দাঁড়াও না, এবার তোমার পালা। আমি এই কালই ভুবন চাটুয্যের বাড়ী যাচ্চি।" দাদাকে শাসিয়ে অপর্ণা চলে গেলেন।

শেষ কথাটার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে না পেরে, সনৎকে চেপে ধরতে, সে বললে,—"ও কিছু নয়। আইবুড়ো ছেলে-মেয়ে ঘরে থাকলে মেয়েদের স্বভাবই হচ্ছে, একটা মনগড়া বিয়ের সম্বন্ধ দাঁড় করিয়ে, তাই নিয়ে ঘোঁট পাকানো।" কথাটা এই রকম করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও, জেরার মুখে প্রকাশ হয়ে গেল যে ব্যাপারটা আরও বেশীদূর অগ্রসর হয়ে, পূর্ব্বরাগ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে। আমার কাছে এতদিন এ-সব লুকিয়ে রেখেছিল বলে সনৎকে খুব খানিকটা ভর্ৎসনা করলাম।

অপর্ণা শোভনাকে আন্‌তে গেলেন; কিন্তু আজ আর যাদুকরের মতন হাত বাড়িয়েই পর্দ্দার আড়াল থেকে টেনে বা'র করতে পারলেন না,—অনেকক্ষণ বিলম্ব হ'ল! যাই হোক, আসামীকে এনে হাজির করে বললেন,—"এই! নমস্কার কর্।……আরে গেল যা, কথা শোনে না। নমস্কার কর্,—করতে হয়!" শাসনের চোটে শোভনা কলের পুতুলের মতন হাত দুটি জোর করে কপালে ঠেকালে।

তারপর আমার কাছে সরে এসে অপর্ণা বললেন,— "সঞ্জীববাবু, এবার আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।……হ্যাঁ হ্যাঁ, করতে হয়!"

সনৎ ধমক দিয়ে উঠ্‌লো,—"ধ্যাৎ!" ওদিকে শোভনাও নিঃশব্দে সরে পড়্‌লো।

"এই রে! আসামী পালায়!" বলে অপর্ণাও ছুটলেন।

৫

হৃদয়ে গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

ঘর খুলে আলো জ্বালতেই, দেখি মেঝের উপর একখানা চিঠি পড়ে আছে। লম্বা-চৌড়া খাম দেখে বুঝ্‌লাম, সরকারী অফিসের চিঠি। খুলে পড়ে দেখলাম,—আমি ডেপুটী-গিরিতে বাহাল হয়েচি, সোমবার দিন অফিসে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

চিঠি পড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লাম। এ হল কি। একদিনের এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন সব অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এক সঙ্গে এসে পড়্‌লো! জানি না, এমন শুভদিন আর কারুর অদৃষ্টে কখনও ঘটেছে কি না। ভাবলাম আরও কোন শুভ-সংবাদ আসবার সম্ভাবনা আছে কি না। মনে পড়ে গেল, একখানা লটারির টিকিট কিনেছি। তা'তে কোন বাজী জেতার খবর আসে নিত? চিঠি কি টেলিগ্রাম?—ঘরের মেঝেটা আর একবার ভাল করে দেখ্‌লাম। কই না! তবে আর হ'ল না। তেমন কিছু হ'লে, ঠিক আজকের দিনেই তা'র খবর আস্‌তো। তা' যখন এল না, তখন আর আশা নাই। তা নাই থাক, আজ যা' পেয়েছি, লটারির দশ-বিশ লাখ তার কাছে তুচ্ছ! আজ আমার মতন ভাগ্যবান জগতে কে আছে?

সে রাত্রে কিছুতেই চক্ষে ঘুম এল না। একটার পর একটা করে, নানা চিন্তা এসে জুটতে লাগলো। শেষে ভাবতে লাগলাম, আচ্ছা, এই যে দু'-দুটো ঘটনা একসঙ্গেই ঘটে গেল, তা'র অর্থ কি—এটা কি শুধু দৈবযোগে, না মানুষেরও কিছু যোগ আছে? আগে তেমন খেয়াল হয়নি, কিন্তু এখন মনে পড়ে গেল, শোভনাদের বাড়ী আজ বাবার যে চিঠিখানা দেখলাম, তা'তে দশ-বারো দিন আগেকার তারিখ আছে। এতদিন পরে, ঠিক আজই এই চিঠিখানা দেখিয়ে, বিয়ের কথাটা পাকা করে নেবার কারণ কি? তবে কি এতদিন ওঁরা ভিতরে ভিতরে খবর রাখছিলেন,—আমার চাক্‌রি জোটে কি না? তাই বুঝি পাকা খবরটা জেনে তবে আজ......? আর তা' না হলে কি বিয়ের কথাটা একেবারেই চাপা পড়ে যেত? তাই যদি হয়, তা' হ'লে সেটা কি নিতান্ত হীন দোকানদারী নয়?

আর শোভনা? এতদিন যা'কে অমূল্য রত্ন ভেবে আমার মতন দরিদ্রের আয়ত্তের বাইরে বলে মনে কর্‌তাম, সে সামান্য পণ্যদ্রব্যের মতন এত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় হ'বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল? তা'র বাপ-মা যাই করুন, তা'র নিজেরও কি কোন ইচ্ছা বা মতামত নেই? সে ত সাধারণ হিন্দু-ঘরের ছোট্ট মেয়েটি নয়, তবু আমার প্রতি তা'র মনের ভাব কি রকম তা' ত কিছুই জান্‌তে দিলে না। এক সময়ে শোভনার আচরণ দেখে ভেবেছিলাম বটে, যে সে আমার অনুরাগিণী। কিন্তু হয় ত সেটা আমারই ভ্রম,—আমার আত্মাভিমানের একটা অলীক সৃষ্টি মাত্র। তা' যদি হ'বে তবে এত দিনের মধ্যে তা'র অনুরাগের কোন লক্ষণ দেখলাম না কেন? চোখের একটা ইঙ্গিতে, মুখের হাসিতে, প্রণয়ের দীর্ঘ ইতিহাস যে মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে যায়,—তা, কই?

তা'র চেয়ে ভাল ছিল,—হিন্দুর ঘরে সকলের যেমন হয়ে থাকে,—একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতাকে বরণ করে নিয়ে, ধীরে ধীরে তা'র রহস্যের আবরণ খুলে, ক্রমে তা'র ঘনি পরিচয় পাওয়া; তারহীন বীণায় তার সংযোগ করে, নিজের হৃদয়-সঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে সুর বেঁধে নেওয়া। কিন্তু এ ত তা নয়। যৌবনের পুলক-পরশে এ বীণায় যে কি একটা সুর বাঁধা হয়ে গেছে। সেটা শুন্‌তে পাচ্চি না, হয় ত আমার সুরে সে সুর মিল্‌বে না, চিরকাল বে-সুরোই বাজতে থাক্‌বে!

এই রকম অসম্বন্ধ বিক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে সারারাত কেটে গেল।

ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে, মাথায় খানিকটা জল ঢেলে, চলে গেলাম গড়ের মাঠে,...খোলা হাওয়ায় মাথাটা যদি ঠাণ্ডা হয়। মাঠে একটু বেড়িয়ে ক্লান্তিবোধ হ'ল, ইডেন গার্ডেনে একটু নির্জন স্থান দেখে বেঞ্চের উপর বস্‌লাম। বসে বসে কতকগুলো সিগারেট পুড়িয়ে, যখন উঠলাম, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। ভাবলাম বাসায় ফিরে স্নানাহার করে, শরীরটা একটু স্নিগ্ধ হ'লে, একবার ঘুমের চেষ্টা কর্‌তে হবে।

গলির মোড়ে পানের দোকান দেখে মনে পড়লো, সিগারেট ফুরিয়েছে, কিন্‌তে হ'বে। একটা খোলার বাড়ীর একটা কোণে, খানকতক তক্তা লাগিয়ে, ছোট্ট একটি কুঠরির মতন করে নিয়ে, তাইতে এই পানের দোকান হয়েছে। পানওয়ালাকে দোকানে দেখলাম না, বসে আছে একজন স্ত্রীলোক,—বোধ হয় তা'র স্ত্রী। দোকানে তা'কে অনেকবার বসে থাক্‌তে দেখেছি, আমাদের গলির ভিতরেও মাঝে মাঝে যাওয়া আসা কর্‌তে দেখেছি,—বোধ হয় ঐ গলিতেই তা'র বাসা। কিন্তু দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ তা'র যে মূর্ত্তি

দেখলাম,—চক্ষু জুড়িয়ে গেল। সুন্দরী না হ'লেও, ভদ্র-ঘরের মেয়ের মতনই তার চেহারা। চওড়া লাল পাড় শাড়ীতে তা'র যৌবন-পুষ্ট দেহখানিকে বেশ করে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু তা'তেও তা'র সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েনি। ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে, সীমন্তে দীর্ঘ উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে যখন সিগারেট চাইলাম, তখন একটু সলজ্জ হাসি হেসে, এমন আগ্রহের সঙ্গে বল্লে,—"এই দি," - মনে হ'ল তুচ্ছ এক প্যাকেট সিগারেট নয়, যেন তা'র যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে উপহার দেবার জন্যে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সিগারেট নিয়ে একটা সিকি দিলাম, কিন্তু তা'র বাকী পয়সা কটা নিতে ভুলে গিয়ে তা'র মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ ছিলাম জানি না; সে চোখ তুলে আবার একটু হেসে, যখন বল্লে,—"পান চাই কি?"—তখন জ্ঞান হ'ল তাড়াতাড়ি পয়সা কটা তুলে নিয়ে ছুটলাম।

মনে পড়্লো শোভনার কথা। এই সামান্য পানওয়ালী রূপে, গুণে,—হয়ত চরিত্রেও,—তা'র চেয়ে কত হীন। কিন্তু এরও একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। হায়, শোভনার কাছেও যদি এমনি একটু মধুর হাসি, একটা কোমল চাহনি পেতাম, প্রাণে কি যে এক আনন্দের সাড়া পড়ে যেত!

স্নানাহার করে শরীর স্নিগ্ধ হ'ল, কিন্তু ঘুম হল না। বরং আর একটা আতঙ্ক এসে দেখা দিল,—সনৎ কোন সময়ে বা এসে পড়ে। এ রকম মানসিক অবস্থায় তা'র সঙ্গে দেখা হওয়া, বা তা'র বাড়ীতে যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হ'ল না। কাজেই বাসা ছেড়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়্লাম। সারাদিন লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে, সন্ধ্যার অনেক পরে বাসায় ফিরলাম।

গলির মোড়ে এসে পানের দোকানের দিকে একবার না চেয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না। পথে ভীড় ছিল না, দোকানে খরিদ্দার ছিলনা, পানওয়ালী একা ম্লান মুখে আর এক দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। আমাকে দেখেই তা'র চোখে-মুখে সহসা যেন একটা ক্ষীণ জ্যোতি ফুটে উঠ্‌লো, তারপর ধীরে ধীরে সে চোখ্ নামিয়ে নিলে।

সে রাত্রে,—মাথাটা ক্রমে একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল বলেই হ'বে, কি সারাদিনের হাঁটাহাঁটিতে শরীর ক্লান্ত ছিল বলেই হ'বে—বেশ ঘুম হয়েছিল। সকালে বিছানা থেকে উঠে মনে হ'ল দেহের ও মনের গ্লানি অনেকটা কেটে গিয়েছে,—যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে উঠ্‌লাম মাত্র।

সেদিন রবিবার। কাল অফিসে সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতে হ'বে, এখন থেকে তা'র জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লাম। দেখ্‌লাম একটা ভদ্র রকমের পোষাক না হ'লে ত চলে না। তাই আহারাদি সেরে চলে গেলাম চাঁদনী,—পোষাক কিন্‌তে।

সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বড়-মামার সঙ্গে। তিনি বর্দ্ধমানে ওকালতি করেন। কি একটা দরকারে কাল এসেছেন,—বৌবাজারে তাঁ'র এক সম্বন্ধীর বাসায় নেমেছেন। তিনি কিছুতেই ছাড়্‌লেন না; আমাকে সঙ্গে নিয়ে নানাস্থানে ঘুরে, একরাশ জিনিসপত্র কিনে ফিরলেন। তারপর সন্ধ্যার সময় তাঁকে মালপত্র সমেত ট্রেণে তুলে দিয়ে তবে আমার ছুটি।

বাসায় ফেরবার সময় দূর থেকেই মোড়ের সেই দোকানটির দিকে নজর পড়্‌লো। কিন্তু কাছাকাছি এসে আর সেদিকে চাইলাম না, বেশ জোরে জোরে পা ফেলে অতি গম্ভীর ভাবে চলে গেলাম। কিন্তু যা'কে এমন নির্ম্মম অবহেলা দেখিয়ে চলে এলাম সে কি ভাব্‌চে এ চিন্তাও মনে উদয় হ'ল।

দীর্ঘকাল পরে এবার শোভনাকেও মনে পড়্‌লো। কিন্তু তা'তে হৃদয়ের একটা বিস্মৃত বেদনা যেন নূতন হয়ে জেগে উঠ্‌লো। জোর করে মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেলাম। শেষে কি আবার মাথা খারাপ করে বস্‌বো।

৬

সোমবার। যথা সময়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁ'র দর্শন-লাভ হ'ল। কথাবার্ত্তা কয়ে সাহেব যেন একটু খুসী হ'লেন। চাক্‌রিতে পাকা হয়ে বস্‌বার জন্যে আমার কি কি করা দরকার, সব

বুঝিয়ে দিলেন। কিছু উপদেশও দিলেন। বল্‌লেন,—"বাবু, তোমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তুমি একটু লাজুক আছ, আর বোধ হয় একটু ভীতু। সেটা আর কিছু নয়, নিজের শক্তির উপর তোমার আস্থা নেই, সাহস নেই। জোয়ান বয়স, এ সময়টা বেশ ফুর্ত্তিতে থাক্‌বে,—কিছু ভয় কর্‌বে না। সময়ে সময়ে হয়ত অনেক অন্যায় কাজও কর্‌তে হ'বে; তা'তে যদি ভয় পেয়ে যাও, তবেই গেলে! প্রাণে ফুর্ত্তি আন, সাহস আন!"

বেশ করে পিঠ ঠুকে দিয়ে আমার শরীরে ফুর্ত্তি ও সাহসের সঞ্চার করে, তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হ'ল, বাস্তবিক আমি যেন আর সে মানুষ নই!

দেশে বাবার কাছে একখানা টেলিগ্রাম করে দিয়ে, তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ছুটলাম। পোষাক ছেড়ে এখনি আবার বেরুতে হ'বে। কাল বৈকালে নাকি সনৎ আমাকে খুঁজ্‌তে এসেছিল, আজও যদি আসে! না, মনটা আর একটু স্থির না হ'লে তা'দের কাছে দেখা দেওয়া হবে না।

গলির মোড়ে পানের দোকানে পানওয়ালী সেই রকম চুপটি করে বসে আছে। যা'বার সময় একবার মাত্র তা'র দিকে চেয়েছিলাম। দেখ্‌লাম সে ফিক্ করে হেসে, মুখে আঁচল চাপা দিলে; কিন্তু কৌতুহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকেই চেয়ে রইল।

পোষাক ছেড়ে বাসা থেকে বেরিয়েই মনে পড়্‌লো, সিগারেট ফুরিয়েছে।······না এ দোকানে আর কিন্‌বো না, দোকান ত ঢের আছে। হঠাৎ সাহেবের উপদেশ মনে পড়ে গেল,—"প্রাণে ফুর্ত্তি আন, সাহস আন।" সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে সেই দোকানেই সিগারেট্ কিন্‌লাম।

প্যাকেট্‌টা হাতে দিয়ে পানওয়ালী ধীরে ধীরে বল্‌লে,—"আজ আবার সাহেব সেজেছিলেন যে?"

"একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম, তাই।"

"ওতে বড় কাটখোট্টা মতন দেখায়। তা'র চেয়ে দেশী পোষাকে আপনাকে বড় সুন্দর মানায়।"

আমার সাহস এবং ফুর্ত্তি দুই তখন বেড়ে গেছে। বল্‌লাম,—"তাই বুঝি আমার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে হেসেছিলে?"

একটু ইতস্ততঃ করে সে হেসে বল্‌লে,—"না, তা' নয়।···পান চাই কি?"

"না" বলে চলে আস্‌ছিলাম, ভাব্‌লাম কি সামান্য দু-এক পয়সার পান,—নিলেই বা! দোকানের পান আমি বড়-একটা খাই না বটে, কিন্তু যখন বল্‌চে···। ফিরে গিয়ে বল্‌লাম,—"আচ্ছা, দাও দু-পয়সার পান।"

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে খুব যত্ন করে সে পান সাজতে লাগলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা'র লজ্জাবনত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমার যেন একটা নেশা ধরে এল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌তে লাগলো। অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই ধাঁ করে বলে বস্‌লাম,—"আমাদের ওখানে একবার আস্‌বে?"

সে কেবল ঈষৎ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে,—মাথাটা আর একটু ঝুঁকে গেল।

আমার তখন সাহসের মাত্রা চরমে পৌঁছেছে। বল্‌লাম,—"আমার বাসা চেন?—কোন ঘরে থাকি জান?—বাইরের দিকে সিঁড়ি আছে ঘরে যাবার?"

"তা'হলে আজই—সন্ধ্যার পর,—আমি ফিরে এলে।"

পানগুলি হাতে তুলে দিয়ে, হাসি-মাখানো একটা ছোট্ট চোখের ইঙ্গিতে সে তা'র শেষ সম্মতি জানালে।

সময় আর কাটে না! বসে, দাঁড়িয়ে, পথে পথে ঘুরে, সন্ধ্যা আর হয় না। ফাল্গুন মাসের বেলা কি এত বড় হয়? আগে ত জান্‌তাম না! সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, তখন বাসায় ফের্‌বার জন্যে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগলাম। এতক্ষণে সনৎ নিশ্চয়ই খুঁজতে এসে ফিরে গিয়েছে।

বাসায় ফির্‌লাম। পানের দোকানে কিন্তু দেখলাম পানওয়ালা নিজেই বসে আছে। তাই ত! কোথায় গেল সে?—বুকটা দমে গেল। অতি কষ্টে পা-দুটোকে টান্‌তে টান্‌তে উপরে উঠে, ঘরের দরজা খুল্‌লাম। বড় গরম বোধ হ'তে লাগলো, কোটটা খুলে রেখে জান্‌লার সুমুখে চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লাম। তারপর উঠে আলো জালতে দেখলাম মেঝের উপর একখানা চিঠি পড়ে আছে। খামখানা তুলে নিয়ে দেখি শোভনার হাতের লেখা!

বুক কেঁপে উঠ্‌লো। ভাব্‌লাম এ আর খুলে কাজ নেই, পড়ে থাক। না হয় ছিঁড়ে ফেলে দি'। কিন্তু শেষে খুল্‌তেই হ'ল। সে লিখেছে ;—

"সোমবার
সকাল আটটা

আপনাকে কি বলে সম্বোধন কর্‌বো জানি না; কিন্তু এ দুদিন একবারও এলেন না কেন?

মেজ্‌দির কোন বুদ্ধি নেই, সেদিন আমাকে শুধু নমস্কার কর্ত্তে বল্লে, পায়ের ধূলো নিতে বল্লে না কেন? তাহলে পা দুটিতে মাথা ঠেকিয়ে ধন্য হতুম। কিন্তু অমন সুযোগ বৃথা গেল। তার ওপর দুদিন ধরে আপনার দেখা পেলুম না। যদি আজও না আসেন, তাই চিঠি না লিখে আর পার্‌লুম না।

একবার আস্‌তে পার্বেন না? দুমিনিটের জন্যে। যখন হোক। বেশী কিছু নয়, শুধু একবার আপনাকে দেখ্‌বো। আড়াল থেকে। মুখের দুটো কথা শুন্‌বো। তাও আড়াল থেকে।

একবার আসবেন। একটিবার।

ইতি
শোভনা

পুঃ—পাগলের মত মেলা যা-তা লিখে ফেলচি। বড় লজ্জা কর্চ্চে। কিন্তু আর গুছিয়ে লেখ্‌বার সময় নেই। মেজ দি হয়ত এখনি এসে পড়্‌বে। এ চিঠির কথা কারুকে বল্‌বেন না। পড়ে' ছিঁড়ে ফেল্‌বেন। কিন্তু আস্‌বেন একটিবার।"

সত্যি, শোভন! তবে কি এ আমারই ভুল? এতদিন কি তবে এমনি অলক্ষিতে তোমার ঐ অফুরন্ত ভালবাসা অজস্র-ধারে বর্ষণ করে এসেছে? আমি অন্ধ, মূঢ়,—কিছু বুঝ্‌তে পারিনি! চুরি করে ভালবাসা কি এতবড় অপরাধ!

এখন কি করি?......যাই। এখনি যাচ্ছি, শোভনা,—এখনি! হায়, এই মুহূর্ত্তেই যদি তোমার কাছে গিয়ে পড়্‌তে পার্‌তাম!

পিছনে দরজার কাছে একটা অস্পষ্ট শব্দ হ'ল। ফিরে চেয়ে দেখি,—আমারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে—এক নারী মূর্ত্তি!

"এসেছ? তবে নিজেই এসেছে, শোভনা? এস!"—দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলাম।

"আমার নাম শোভনা নয়,—জোছনা" বলে আমার বুকের উপর কে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো। যখন চিন্‌লাম এ সেই পানওয়ালী, তখন মনে হ,ল যেন একটা জলন্ত লোহার চাপে আমার ঠোঁট দু'খানা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে!

আতঙ্কে শিহরে উঠে তিন হাত পেছিয়ে পড়্‌লাম।

হায়! এই আমার জীবনে প্রথম চুম্বন! যুগ-যুগান্তর ধরে কত লক্ষ লক্ষ কবিতার ছন্দ এবং সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়েও যা'র মহিমা প্রকাশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েচে,—অমৃতের আস্বাদের সঙ্গে পারিজাতের সুরভি মিশিয়ে, যা'তে স্বর্গ-সুখের প্রথম আভাস এনে দেয়,—এই কি সেই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন? এতে যে গরলের তিক্ত আস্বাদ,—আগুনের তীব্র জ্বালা!

শোভনার চিঠিখানা তখনও হাতে ছিল। ভাবলাম তা'র উপযুক্ত উত্তরই দেওয়া হচ্ছে বটে!

শোভনা, দেখে যাও,—তোমার ঐ অসীম ভালবাসার কি অপূর্ব্ব প্রতিদান! কৃপণের মতন যে ভালবাসা এতদিন জগতের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে, সেই অমূল্য রত্ন পাওয়া-মাত্রেই তার কেমন সদ্ব্যবহার হচ্ছে,—একবার দেখে যাও!

অতি কষ্টে নিজকে কতকটা সাম্‌লে নিয়ে, কর্কশ চাপা গলায় বলে উঠ্‌লাম,—"তুমি—তুমি—এখন যাও। আমাকে এখনি বাইরে যেতে হবে। ভয়ানক দরকার!"

কোট্‌টাতে হাত চালিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আস্‌বার উপক্রম করতে, সেও সরে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো। বল্‌লাম,—তুমি আগে যাও,—একসঙ্গে যাওয়া হ'বে না।"

সে একটু ইতস্ততঃ করে ধীরে ধীরে দরজা ছেড়ে বারান্দায় নেমে দাঁড়ালো। বল্‌লে,—"আচ্ছা, যাই।" তারপর জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে বল্‌লে—

"তা'হ'লে, আজ আমাকে কিছু দেবেন? না, আর একদিন?"

তা'র হাসিতে, কথাতে যেন সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে দিলে। হাঁপা'তে হাঁপা'তে বললাম,—"না, না,—এখনি দিচ্ছি,—নিয়ে যাও।"

পকেটে গোটা তিন-চার টাকা আর কিছু খুচরা ছিল, মুঠো করে তুলে দিলাম; আঁচল পেতে নিয়ে সে নিঃশব্দে চলে গেল।

হায় নারী, এ কি মূর্ত্তিতে আজ দেখা দিলে তুমি! নারীর রূপ, নারীর নারীত্ব, নারীর দেবীত্ব, তা'র স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,—আত্ম-বিসর্জ্জন যা'র নামান্তর মাত্র,—এই অতুল সম্পদ এত হীন মূল্যে বিক্রয় কর্‌তে এসেছিলে! আমার আর যাওয়া হ'ল না; বড় গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগলো, স্নান করে এলাম। মুখে সাবান মেখে, ঠোঁট দু'খানা বেশ করে রগ্‌ড়ে বার বার করে ধুয়ে ফেল্‌লাম। কিন্তু জ্বালা কিছুতেই গেল না।

মাথা ঘুর্‌তে লাগলো, শরীর আসন্ন হয়ে এল, আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম। কতক্ষণ পরে ছট্‌ফট্ করে, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা,—শেষরাত্রে খুব শীত করে জ্বর এল।

পাপের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল। কিন্তু এই মোটে আরম্ভ এখনও অনেক বাকী।

৭

যে ক-দিন অসুখ হয়ে পড়েছিলাম, খবর পেয়ে সনৎ রোজ দেখ্‌তে আস্‌তো। মাঝে মাঝে অপর্ণাও আস্‌তেন, কত সেবা কর্‌তেন, শোভনার কথা বল্‌তেন। শুনে আমার চোখে জল আস্‌তো, কিছু বল্‌তে পার্‌তাম না। অপর্ণা বোধ হয় সেটাকে ভালবাসার চিহ্ন মনে করে কত রকমে সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন।

সেরে উঠ্‌তেই বিবাহের কথা আবার নতুন করে উঠ্‌লো। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। নিজের 'উপর দারুণ ক্রোধ এবং ঘৃণা হতে লাগ্‌লো। আমার পাপের শাস্তি আমাকে ত মাথা পেতে নিতেই হবে; কিন্তু এই নিরপরাধিনী বালিকাকেও ভুগ্‌তে হ'বে, এই চিন্তা বুকের মধ্যে শেলের মনে বিধ্‌তে লাগ্‌লো। অথচ তা'র কোন প্রতিকার খুঁজে পাই না। সে যেমন নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়েছে, আর কি ফিরিয়ে নিতে পারবে? তা'ও সম্ভব বলে মনে হ'ল না।

তবু, বিবাহে আপত্তি জানালাম, আমি অতি অধম, নির্ম্মল পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি শোভনা,—আমি তা'র সম্পূর্ণ অযোগ্য। এ ছাড়া আর কোন কারণ প্রকাশ না হওয়ায়, আমার আপত্তি গ্রাহ্য হ'ল না। পাঁজী থেকে শুভদিন খুঁজে বার করা হ'ল।

শুভদিন! অনন্ত আকাশে বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, যা'রা লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—তা'দের গতি-বিধি, যোগাযোগ দেখে মানুষের শুভাশুভ গননা! রক্ত-মাংসের ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে যারা এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, ছোট ছোট সুখ-দুঃখে যাদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,—তা'দের জীবনের গতি, তা'দের প্রাণের যোগাযোগ দেখে তা'দের শুভাশুভ নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা কি কোন জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নেই? তা' যদি হ'ত, তা'হ'লে এ বিবাহের জন্যে কোন শুভদিনই খুঁজে পাওয়া যেত না!

কিন্তু বিবাহ হয়ে গেল।

আমাকে পেয়ে শোভনা যে বিলক্ষণ সুখী হয়েছে, তা' বেশ সহজেই বুঝ্‌লাম,—বুঝে অনেকটা শান্তি লাভ করলাম। ভাব্‌লাম, তা'র পূর্ণ পরিতৃপ্ত ভালবাসা আমার হৃদয়ে সংক্রামিত হয়ে, মনের সকল গ্লানি মুছে ফেল্‌বে। এই সম্মিলিত প্রেমের অপ্রতিহত প্রবাহে আমার জীবনের ক্ষুদ্র কলঙ্কটুকু কোথায় ভেসে যা'বে,—আর তা'র কোন চিহ্ন থাক্‌বে না।

কিন্তু তা' হ'ল না। আমার কলঙ্কের স্মৃতি শত চেষ্টাতেও গেল না; বরং সতর্ক প্রহরীর মতন দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠ মিলনের পথে এক দুর্ল্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হয়ে রইল। তা'র কাছে যেন সর্ব্বদাই অপরাধী হয়ে রইলাম, তার প্রেমের দান নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পার্‌লাম না, উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারলাম না। যখনই শোভনা

একটু আদর যত্ন কর্‌তে গিয়েছি, একটা কুণ্ঠিত উদাসীনতার ভাব এসে তা'র অবাধ আত্ম-সমর্পণের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ঘনীভূত আলিঙ্গনের মধ্যে যখনই তা'র ঠোঁট দুখানি শিহরে উঠে তৃষিত পুষ্পের মতন স্নিগ্ধ বারিধারায় স্নান করবার জন্যে অগ্রসর হয়েচে, তখনই সেই স্ফীত উদ্যত অধরের ব্যগ্র আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে ফিরিয়ে দিয়েছি। কেবলই মনে পড়েছে,—সেই গরলের তিক্ত আস্বাদ, আগুনের তীব্র জ্বালা!

৮

বিবাহের পর শোভনার মুখখানি পরিপূর্ণ সুখ ও সার্থকতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দেহে যৌবনের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে, রূপ, লাবণ্য, স্বাস্থ্যের পরম পরিণতি লাভ হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে তা'র শরীর শীর্ণ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো, সলাজ-প্রফুল্ল বদন ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে এলো, একটা গাম্ভীর্য্য ও বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠ্‌লো। আমি সেগুলোকে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ মনে করে একটা গর্ব্ব এবং আনন্দ অনুভব কর্‌লাম।

কিন্তু সেটা যে আমার ভুল, তা' জানা গেল বিবাহের ঠিক দু'বৎসর পরে,—যখন শোভনার একটি ছেলে হয়ে দশ-দিনের দিন মারা গেল, আর সে নিজেও রোগে পড়লো। শরীর তা'র আগে থেকেই খারাপ ছিল; জীবনের এই প্রথম শোকে একেবারে ভেঙ্গে গেল।

আমি তখন কিশোরগঞ্জে নতুন বদ্‌লি হয়েছি, কাজের খুব ভীড়, ছুটী পাওয়া দুর্ঘট। মাস দুই পরে এসে দেখি, শোভনাকে আর চেনা যায় না, এমন তার অবস্থা!

চিকিৎসা রীতিমতই চল্‌ছিল; তবু এবার একজন ভাল ডাক্তারকে এনে দেখানো গেল। তিনি দেখে-শুনে বাইরে এসে, দ্বিধা-কুণ্ঠিত স্বরে রোগের নাম সংক্ষেপে বল্‌লেন,—"টি—বি।" চব্বিশ-ঘণ্টা জন্ম-মৃত্যু নিয়ে কারবার, তবু তিনি সাহস করে সোজা কথায় বল্‌তে পার্‌লেন না,—যক্ষ্মা!

তখন গ্রীষ্মকাল। সকলের পরামর্শমত শোভনাকে দার্জ্জিলিং নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে কোন উপকার হ'বার আগেই বর্ষা নাম্‌লো। সেখান থেকে ফিরে এসে, দিনকতক কলকাতায় থেকে—পুরী।

পুরীতেও তা'র কোন উপকার ত হ'লই না বরং দিনদিন অবস্থা খারাপ হয়ে আস্‌তে লাগলো। স্থানান্তরে নিয়ে যাবারও উপায় রইল না! তখন সনৎ এল মা'কে নিয়ে। তাঁরা রোগিণীর পরিচর্য্যা করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁদের বেশী কিছু কর্‌বার অবকাশ দিতাম না, যতক্ষণ পার্‌তাম নিজেই তা'র কাছে থাকৃতাম।

তাকে একটু প্রফুল্ল রাখবার জন্যে, কাছে বসে কত গান, কবিতা, গল্প বল্‌তাম,—পেড়ে শোনাতাম। সে অপলক-নয়নে আমার মুখের পানে চেয়ে নীরবে শুনে যেতো। মনে পড়তো সেই আগেকার কথা,—লজিক্ বোঝাবার সময় তা'র সেই একাগ্র, তন্ময় দৃষ্টি! হায়, এতদিনের সঞ্চিত ক্রম-বর্দ্ধমান এই অসীম ভালবাসার পরিবর্ত্তে আমি কি দিয়াছি?—নৈরাশ্য রোগ, শোক,—পরিণামে হয়ত মৃত্যু!

আজকাল রোগে ভুগে যত তা'র মুখটি মলিন হয়ে আস্‌ছে, ততই তা'র চোখদুটিতে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে দৃষ্টিতে গভীর বেদনার সঙ্গে যেন একটা সুখের আবেশ মিশে আছে। তা'র কি কষ্ট, কিসে তা' দূর হয়, মনে কি ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর্‌লে ম্লান হেসে কেবল বলে—"কিছু না।" চোখ বুজে আসে, শুষ্ক পাণ্ডুর ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কেঁপে উঠে।

সেইদিকে চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে মনে হ'ত, এমন অমৃতের উন্মুক্ত ভাণ্ডার সম্মুখে পেয়েও এতদিন তা'র আস্বাদ নিলাম না! কি মূঢ় আমি!—এতে যে আমার সকল কলঙ্ক মুছে যেত, সকল গ্লানি মিটে যেত। কিন্তু আর বোধ হয় তা' হ'ল না; শোভনা আর আমাকে বেশী কাছে যেতে দেয় না,—তা'র বিষাক্ত নিশ্বাস থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

একদিন সে অনেকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে, কি ভেবে, নিজেই ডেকে কাছে বসালে। আমার হাতের ভিতর একখানি শীর্ণ হাত রেখে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—"দেখ, আমার ত দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা স্বীকার

না পেলেও আমি ত বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি যাই, তা'তে দুঃখ নেই, কেবল তোমার জীবনটাকেও ব্যর্থ করে দিয়ে যা'ব,—এই বড় দুঃখ। হয়ত এখনও তুমি সুখী হ'তে পার। তাই বল্‌চি, আমি যা' বলি তা' শুনবে?"

তা'র হাতখানা সজোরে চেপে ধরে বল্‌লাম,—"যা' বল্‌বে তা' বুঝেছি,—কিন্তু তা হয় না। এখন তুমি সেরে উঠ্‌লে তবেই আমি সুখী হ'ব; না হ'লে—"

একটু ক্ষীণ হেসে শোভনা বল্‌লে,—"আমি জোর করে দিব্যি দিয়ে কিছু বল্‌চি না। শুধু এই বলি,—যদি আর কাউকে পেলে সুখী হও, যদি আর কাউকে সত্যিসত্যিই ভালবাসতে পার, তাহ'লে বৃথা আমার কথা ভেবে—"

তার কথায় বাধা দিয়ে, আবেগ-ভরে বল্‌লাম,—"তোমাকে কি ভালবাসি না, শোভনা? তোমার কি তাই বিশ্বাস?"

শোভনার মুখের উপর আবার তেমনি ঈষৎ হাসির হিল্লোল বয়ে গেল, ঠোঁট দু'খানি তেমনি কেঁপে উঠলো,— আমার মুখখানা আপনা হতেই অত্যন্ত ঝুঁকে পড়লো। অসহায়ের ক্ষীণ হাসি হেসে বল্‌লে,—"না না, আর হয় না। জান না কতবার সাবধান করে দিয়েছি,—আমার মুখে রোগের বীজ ছড়িয়ে আছে?"

"তুমি জান না, তা'র চাইতে ভীষণ বীজের আকর আমি! হয়ত ঐ বিষেই আমার বিষক্ষয় হ'বে!"

আর সে বাধা দিলে না, চোখ দুটি তা'র বুজে এলো বাঁ-হাতখানি আমার কাঁধের উপর তুলে দিয়ে, ধীরে ধীরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে।

এই ত প্রণয়ের প্রথম চুম্বন! এতদিন তা জানিনি, কিন্তু আজ সারা দেহ কি এক অপূর্ব্ব পুলক-প্রবাহে অবসন্ন হয়ে এল,—গরলের তিক্ত আস্বাদ, আগুনের তীব্র জ্বালা—কোথায় সে সব আজ! এতদিনের পুরাতন অভিশপ্ত জীবনের অবসানে নূতন জীবন-সঞ্চারের আবেশে বিভোর হয়ে গেলাম!

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। তা'র শ্লথ বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে উঠে, দেখি শোভনা তখনও তেমনি চোখ বুজে আছে, মুখে সেই ম্লান-মধুর হাসি ছড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তা'র হাত ধরে ডাক্‌লাম,—"একবার চেয়ে দেখ শোভনা—কি ছিলাম কি হয়েচি। আজ সঞ্জীবনী-সুধা পান করে নবীন জীবন পেয়েছি। জীবনের ভ্রম ভেঙেছে,— এস এইবার সব ভুলে গিয়ে, প্রেমের নূতন খেলাঘর পেতে, নূতন খেলা আরম্ভ করি!"

কিন্তু এ কি! সে যে কোন সাড়া দেয় না; চোখ চায় না,—হাতখানা ঠাণ্ডা বরফ! হায়, অভাগিনীর জীবনের প্রথম প্রণয় চুম্বনই তার শেষ, প্রাণে মিলনের এই প্রথম সূচনাতেই তা'র অবসান!

আর্ত্তনাদ করে তা'র শীতল নিস্পন্দ বুকের উপর আছড়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হ'ল, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তাকে একাকিনী কোথায় কোন অচেনা পথে পাঠিয়ে দিয়ে সকলে তখন ঘরে ফিরে এসেছে।

এই হ'ল আমার কথা!

এখন তোমরা বিচার করে বল, ···না না, তোমরা কি বিচার করবে,—আমার প্রাণের কথা আমার চেয়ে কে বেশী বুঝবে? জগতের লোক যদি আমাকে না বোঝে কি ভুল বোঝে,—তা'তে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু যার বোঝবার, বিচার কর্‌বার, অধিকার ছিল,— তা'কেই যে আমার গোপন কথা, আমার কলঙ্ক-কাহিনী শোনানো হ'ল না। সব কথা শুনে সে আমাকে ক্ষমা করে কিনা, জানা হ'ল না। আমার ভালবাসায় তা'র বিশ্বাস হয়েচে কি না, তা'র ভালবাসার একটুও প্রতিদান পেয়েছে কি না, তাও জানা হ'ল না। তা'র যে শেষ হাসি দেখলাম, তা' থেকে ত' কিছু বুঝলাম না। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে তা'র মুখে যে হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল তা'র অর্থ কি?

এই সব কথার উত্তর কে দেবে? তোমরা ত তা পার্‌বে না। বরং যদি পার ত বল,—কতদিন পরে এর উত্তর মিল্‌বে, কতদিনে এই দীর্ঘ বিরহের রজনী প্রভাত হবে!

তাও বল্‌তে পার না? কিন্তু আমি বল্‌তে পারি। সেই যে সঞ্জীবনী-সুধা পান করে নবীন জীবন লাভ করেছিলাম, তা'র সঙ্গে আরও পেয়েছিলাম—মৃত্যুর বীজ! এই অমৃত গরলের সম্মিলিত ক্রিয়া আমার দেহে-প্রাণে বেশ দেখা দিয়েছে, পলে পলে আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই পথে—ও-পারের সেই সুন্দরতর জগতের দিকে,—যেখানে মিলনের প্রথম চুম্বনে প্রাণে প্রাণ মিশে এক হয়ে যাবে, দুয়ের পৃথক সত্বা লোপ পেয়ে যাবে,— সৃষ্টি ধ্বংস হলেও সে মিলনে বিচ্ছেদের আশঙ্কা আর থাক্‌বে না!

এ-পারের অসমাপ্ত প্রথম চুম্বন যবে ও-পারে গিয়ে পূর্ণ পরিণতি এবং সার্থকতা লাভ কর্‌বে,—সেদিনের আর বেশী দেরী নেই!

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন।

পথের পাঁচালী ও অপরাজিত *

শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ

আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন কি, একথা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই বোধ হয় উত্তর দেওয়া যায় "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত।" ভাব ও ভাষা যে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী রচনা করিতে পারে তাহার পরিচয় পাই এই গ্রন্থ দুইখানিতে।

প্রথমে যাহা আমাদের মুগ্ধ করে তাহাই বোধ হয় পুস্তক দুইখানির শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব,—গ্রন্থকারের প্রকৃতির প্রতি আশ্চর্য্য ভালোবাসা। প্রকৃতির সহিত আপন ভাবে না মিশিলে, প্রকৃতিকে একান্তরূপে আপনার না করিয়া লইলে বোধ হয় ঐ অদ্ভুত সহানুভূতি জাগিতে পারেনা। নদী, মাঠ, বন, পাখীর সহিত অপু কতদিনের পরিচিত, সে যে প্রকৃতিরই আদরের দুলাল। তাহার ভাবুক মন প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে,—সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে চাহে না, বুঝিতে পারে না। কর্ম্মব্যস্ত প্রতিদিনের রুটিন-বাঁধা জীবন তাহাকে ডাক দিতে পারে নাই, সে সৌন্দর্য্যের খোঁজে আত্মহারা। এই চোখেদেখা মাটির সৌন্দর্য্যের পরেও যে আর একটা অসীম সৌন্দর্য্য আছে সে তাহার সন্ধান পাইতে চায়। ভিজামাটির গন্ধ, বুনো ফুলের সৌরভ, গাছের পাতার কাঁপন, এ যেন সবই সেই ভিতরকার সৌন্দর্য্যের মায়া-যবনিকা,—অপু এই যবনিকা সরাইতে চায় ভিতরে প্রবেশ করিবে বলিয়া; সেই সরাইবার চেষ্টাই পরে অপুকে অস্থির, ভবঘুরে ও বিশ্রামহীন করিয়াছে। পথের পাঁচালীর অপু নিশ্চিন্দিপুরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে সোনার কাঠির সন্ধান পাইয়াছিল, অপরাজিতের অপু সোনার কাঠি লইয়া রাজকন্যার ঘুম ভাঙাইতে চলিয়াছে।

পথের পাঁচালীতে অপু শুধু নিশ্চিন্দিপুরকে লইয়াই তাহার মায়াজগৎ রচনা করিয়াছিল। সে ছিল সেখানকারই প্রকৃতির একটা অঙ্গ-বিশেষ, প্রকৃতিরই একটা সৌন্দর্য্য যেন অপুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ভিতর দিয়াই নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃত সৌন্দর্য্য জাগিয়া উঠে। ছেলেবেলায় সে নিশ্চিন্দিপুরের সবকটি জিনিষকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, শুধু সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যই তাহার চোখের কাছে ধরা পড়ে নাই—যাহা আমাদের চোখে অসুন্দর, ইটের দেওয়াল, কাঠের বাক্স, এ সকলেরই একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য একটা অবোধ্য রহস্য সে দেখিতে পাইত, উপভোগ করিত, তাহার ভিতর নিজেকে বিলাইয়া দিত। অপরাজিতে দেখিতে পাই তাহার মন বিস্তীর্ণতর হইয়াছে; যে মন শুধু নিশ্চিন্দিপুরের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিত, তাহা সমস্ত জগতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে শুধুই আর তাহার গ্রামের প্রকৃতিকেই প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসে না, সমস্ত জগতের উপর তাহার ভালোবাসা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার দৃষ্টি দূরপ্রসারী ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিন্দিপুরের পাতা গাছ নদী মাঠ তাহার প্রাণের মধ্যে যে ভাব জাগায়, তাহার মনে হয় নাগপুরের অরণ্য কি অন্য এক স্থানের প্রকৃতি সেই একই ভাব জাগায়। এগুলি যেন আরও এক অসীম রহস্যময় সৌন্দর্য্যের দুয়ার, এই দুয়ারের চাবীকাঠির সন্ধানে সে ফেরে। তাই সে আর তেমন করিয়া নিশ্চিন্দিপুরকে ভালোবাসিতে পারে না যেমন করিয়া অবুঝ ভাবে শৈশবে সে ভালোবাসিত। অবশ্য সে ভালোবাসা আমরা আশাও করিতে পারি না; সে এখন দূরকে চিনিয়াছে, দূরকে আপন করিয়া ফেলিয়াছে। যখন সে দেখিল কাজলকে কলিকাতায় রাখিলে তাহার মন প্রসারতা লাভ করিতে

* পথের পাঁচালী গ্রন্থাকারে বহুপূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে; অপরাজিত যন্ত্রস্থ, প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পারিবে না, তখন সে কাজলকে নিশ্চিন্দিপুরে রাখিয়া নিজে দূরের সৌন্দর্য্য—যাহা জগতে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহার খোঁজে বাহির হইয়া গেল। নিশ্চিন্দিপুর যেন তাহার কাছে এই ছড়ান সৌন্দর্য্যের আয়নার প্রতিচ্ছবি হইয়াছিল।

কিন্তু এক জায়গায় তাহার সহানুভূতি সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সহরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, সহরকে সে দু'চোখে দেখিতে পারে না। সে দূরের স্বপ্ন দেখে, বিলাতকে দেখে জুনিপারের বনে, পুরাণো নর্ম্মাণদুর্গে, কিন্তু সে ভাবে না, কুয়াসাঢাকা নগরগুলির কথা। সে প্রাচীন গ্রীসের কথা ভাবে—অলিভ ও মার্টল-কুঞ্জ, কিন্তু ভাবে না স্তম্ভরাশি শোভিত গৃহগুলি; সে ভাবে প্রাচীন মিশর—নলখাগড়ার বন, নীলনদ, কেবল সে দেখিতে পায় না ঐ নীলনদের বাঁকে প্রাচীন সহরের ক্রীতদাসগুলির আনাগোনা, রৌদ্রপক্ক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাড়ীগুলির উপর পড়া ম্লানায়মান সূর্য্যকিরণের কথা। কোথাও সে সহরকে দেখিতে পারে না, দেখিতে চাহে না।

তাহার সহরের প্রতি এই সীমাবদ্ধ সহানুভূতি, আমার মনে হয়, আরও বেশী করিয়া ফুটিয়াছে তাহার কলিকাতার প্রতি আচরণে। কলিকাতাকে সে বরাবরই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে; কলিকাতার যে একটা সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে তাহা তাহার আদৌ মনে হয় নাই। কলিকাতা বলিতেই তাহার মনে পড়িয়াছে বস্তী, আপেলের খোসা, আবর্জ্জনা ও সুটকী মাছের গন্ধ! বাস্তবিকই কি কলিকাতার কোনও সৌন্দর্য্য নাই? আমার মনে হয় কলিকাতা তথা সহরের একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। সে সৌন্দর্য্য গ্রাম্য প্রকৃতির সহিত একজাতীয় হইতে না পারে, কিন্তু তথাপি সেই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ আছে। আমি সহরের আকর্ষণ বলিতে ড্রয়িংরুম, চায়ের বাটী, টেনিসগ্রাউণ্ড অথবা সিনেমা থিয়েটার, বিজলীবাতীর আকর্ষণ বলিতেছি না, প্রকৃতির যে আকর্ষণ মানবকে মুগ্ধ করে, আমি সেই আকর্ষণের কথাই বলিতেছি। সহরের ইট, কাঠ, ট্রাম-মোটরের যাওয়া আসা, পথিকের চলাচল এ সবারি একটা মাদকতা আছে। মুক্ত প্রকৃতি মানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, প্রকৃতির সহিত পরিচয় না ঘটিলে মনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া সহরকে ঘৃণা করা কি উচিত হইবে? ভাবুক মন অতি ব্যাপক, সে যেমন প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনই সহরের প্রতিও ত' আকৃষ্ট হইতে পারে; উভয়েই উভয়ের Complementary, যে সত্যকার ভাবুক সে একটার প্রতি উদাসীন থাকিবে কেন?

প্রভাতে নানা প্রকার ফেরীওয়ালা হাঁকিয়া যায়, খবরের কাগজ-বিক্রেতারা নানা প্রকার কাগজ নানাপ্রকার সুরে নানা প্রকার মন্তব্যের সহিত বিক্রয় করিতে ছুটে। ক্রমে বেলা বাড়ে; আফিসের বাবুরা দ্রুত পাদচালনা করিতে থাকেন। স্কুল-কলেজের ছেলেরা হাস্য-পরিহাসে পথ সরগরম করিয়া তুলে। ট্রাম ও বাসগুলি বোঝাই হইয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চলিতে থাকে। ধীরে ধীরে দ্বিপ্রহের শান্ত নীরবতা নামিয়া আসে। নিস্তব্ধ-নির্জ্জনতার মধ্যে হঠাৎ একটা কাক কা কা করিয়া ডাকিয়া টিনের চালে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে। ঐ পার্কের বড় মাঠটার উপর রৌদ্র চক্ চক্ করিতে থাকে; একটি রঙচঙে পোষাক পরা লোক ছাতামাথায় মাঠের উপর দিয়া গিয়া ঐধারের বড় বাড়ীটায় প্রবেশ করে। অদূরবর্ত্তী স্কুলগৃহে একবার গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিয়া নীরব হইয়া যায়। পাশের গুদাম হইতে প্যাকিং বাক্স তৈয়ারীর ঘটাঘট শব্দ খুব জোরে কয়েকবার হইয়া থামিয়া যায়। একটি ফেরীওয়ালা বৃথা হাঁকিয়া চলিয়া যায়, তাহার আওয়াজ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়। ওই বড় বাড়ীটার বড় দালানে পায়রাগুলি করুণসুরে ডাকিতে থাকে। ক্রমে বেলা গড়াইয়া যায়, স্কুলকলেজ অফিস হইতে সকলে ফিরিতে থাকে। রাস্তার আলো জ্বলিয়া উঠে। তারপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসে,—ওপাশের বাড়ী হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতে থাকে। ক্রমে রাত বাড়ে। একটা রিক্স ঠুং ঠুং আওয়াজ করিয়া চলিয়া যায় দূরের গির্জ্জার ঘড়ির আওয়াজ কানে আসে। রাত্রির নীরবতাকে ভঙ্গ করিয়া দিয়া রাস্তার একটা কুকুর অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠে। গভীর সুষুপ্তির মধ্যে কালো আকাশে তারাগুলি বড় বড় বাড়ীর ফাঁক দিয়া এক নিমেষে চাহিয়া থাকে। ঘাঁটিদার পাহারাওয়ালা হাঁক দিয়া চলিয়া যায়। একটা ষ্টীমার ভোঁ দিয়া উঠে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া যায়। ক্রমেই অন্ধকার পাতলা হইয়া আসে,—সহরের

ফেলা গাড়ীগুলি ঘড় ঘড় আওয়াজ করিয়া ছুটিতে থাকে। আবার ভোরের আলো ফুটিয়া উঠে। এই যে সহরের দৈনন্দিন জীবন ইহার ভিতর কি এমন কোনও সৌন্দর্য্য নাই, এমন কোনও রহস্য নাই যাহা অপুকে মুগ্ধ করিতে পারে? সে কেবল যেখানে গাছপালা দেখিয়াছে সেইখানেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, বাড়ীঘরের কৃত্রিমতা তাহাকে মুগ্ধ করে নাই; সে ভাবিয়াছে যাহা ভগবানের সৃষ্ট তাহাই সুন্দর; মানবের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য তাহার মনে স্থান পায় নাই। এমন কি সহরের লোকগুলিও সহরের লোক হিসাবে তাহার মনে কোনও ভাব জাগায় না! রামধনবাবু বা তেওয়ারী বউ—ইহারা তাহার পরিচিত, কিন্তু সহরের লোক বলিয়া তাহারাও যেন তাহার নিকট কি রকম অনুকম্পা লাভ করে।

কাজল খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের সম্মুখে আসিয়াছিল, তাহার ভীরুতা ও লাজুকতার জন্য আমরা তাহার সহিত বেশী ভাব করিতে পারি নাই। যেটুকু সময়ের জন্য আমরা কাজলকে পাইয়াছি, তহোতে তাহার কয়েকটি বিশেষত্ব বড় বেশী করিয়া চোখে পড়ে।

কাজল মামার বাড়ীতে মানুষ হইয়াছিল, কিন্তু মামার বাড়ীর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে থাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই কেন? কাজল তাহার পিতার মত ভাবুক হইয়াছিল,—পিতার কল্পনা-প্রবণতা তাহাকেও বর্ত্তিয়াছিল; তথাপি সে মামার বাড়ীর চতুর্দ্দিকের অবস্থাকে নিজের মধ্যে ধরিয়া লইতে পারে নাই। গ্রন্থকার তাঁহার চরিত্রের ভিতর দিয়া শিশুমনেরই পরিণতি আঁকিয়াছেন। শিশুর মন তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরে। তাহার প্রথম ভালোবাসা ওই আবেষ্টনের উপরই গিয়া পড়ে। কাজল জালার পাশে ভূত কল্পনা করে, নীল আকাশে রাজপুত্রের রথ দেখিতে পায়, আরব্যোপন্যাসের গল্প তাহার শিশুমনকে নাড়া দেয়; কিন্তু মামার বাড়ীর গাছপালা নদীর সহিত তাহার কোনও মনের যোগ নাই। হইতে পারে সেখানকার প্রকৃতি নিশ্চিন্দিপুরের মত সম্পদশালী নয়, কিন্তু শিশুমন ত' সৌন্দর্য্যের বাছ-বিচার করে না, যাহা পায় তাহাই একান্তভাবে আপনার করিয়া গ্রহণ করে। এমন কি, কাজল যখন কলিকাতায় আসিল, কলিকাতার প্রতিও তাহার চোখ পড়িল না। অবশ্য আমি একথা কখনো বলিতে চাহি না, কলিকাতার রূপ প্রকৃতির শোভার কোন প্রকার substitute বা প্রতীক হইতে পারে; আমি শুধু বলিতে চাই যে, কলিকাতারও একটা বিশিষ্টরূপ আছে, এবং সে রূপ মনকে আকর্ষণ করিতে পারে। যে বয়সে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হইতে মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, সে বয়স ত' কাজলের হইয়াছিল, তথাপি কাজল গঙ্গানন্দকাটি ও কলিকাতা কোনটার সহিতই ভাব করিতে পারে নাই কেন?

একটা কথা মনে হয়, গ্রন্থকার কাজলকে বড় একলা রাখিয়াছিলেন। কি গঙ্গানন্দকাটি, কি কলিকাতা কোথাও তাহার তেমন সঙ্গী জুটে নাই। তাহার দিদিমা ও বাবা তাহার কাছে কিছুদিন ছিলেন বটে, কিন্তু আমি সে সঙ্গীর কথা বলিতেছি না। দুর্গা ও অপু যেমনটি ছিল, কাজল সে রকমটি পায় নাই। দুর্গা কবে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু যেন এখনও তাহাকে কাছে পাইতেছে। নিশ্চিন্দিপুরের বন জঙ্গল হইতে সে দিদিকে পৃথক করিতে পারে না। সে এখনও রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহার দিদিকে শুইয়া থাকিতে দেখিতে পায়। বাহিরের কল-কোলাহলের অন্তরালে তাহার শিশু-মন আবার জাগিয়া উঠে—সে তাহার শিশুপ্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফিরে,—তাহার জন্য নীরবে চোখের জল ফেলে,—আমরাও চোখের জল রাখিতে পারি না। কিন্তু কাজলের সেরূপ সাথী ছিল না; বোধ হয় সেই জন্যই সে এতটা ভীরু ও লাজুক, আর সেই জন্যই সে তেমন নিবিড়ভাবে গঙ্গানন্দকাটি বা কলিকাতার সহিত মিশিতে পারে নাই। বায়স্কোপের ছবির মত তাহারা কাজলের চোখের সম্মুখ দিয়া আসিয়াছে গিয়াছে, মনে কোনও ছাপ দিতে পারে নাই।

গ্রন্থকার কয়েকটি ছোট চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলিও মনকে অত্যন্ত নাড়া দেয়, কিন্তু পরে আর তাহাদের পাই না;—তাহাদের বিরহ-ব্যথা মনকে পীড়া দেয়। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত—ইহাদের প্রতি চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত; তাহারা যেন আমাদের সঙ্গে ঘুরিয়া

বেড়ায়, খেলিয়া বেড়ায়, তাহাদের সুখ দুঃখ আমাদেরও আনন্দ বা পীড়া দেয়। অপু তাহার সমস্ত জীবনে যে সকল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাদের অনেককে আমরা পরে দেখিতে পাইয়াছি। সতুদা তামাকের দোকান খুলিয়াছে, তাহাতেই সে মনের আনন্দে আছে। দেবব্রত বিলাত ফেরৎ এঞ্জিনিয়র সত্যেন বাবু ওকালতী করিতেছেন, —সুরেশ্বর চাকরী করিতেছে, ইহারা সকলেই ভাবিতেছে বেশ আছি। লীলাদি, রাণীদি সকলকেই পরে পাইতেছি। কিন্তু পাইলাম না তাহাদের, যাহারা ঘন পল্লবের অন্তরালে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, যাহাদের কথা আমরা কেবল গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টি ও সহানুভূতির জন্যই জানিতে পাই। গুলকী—সেই ছোট্ট মেয়েটি, যে মার খাইত ও তরকারী চাহিয়া বেড়াইত,—দুঃখিনী গোকুলের বৌ,—বোষ্টম দাদু, ইহাদের কাহাকেও আর পরে পাইলাম না। বোষ্টম দাদুর কথা অপু আগে একবার পটুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। অপু শেষে নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া সকলের খোঁজ লইল, কিন্তু ইহাদের খোঁজ করিল না কেন? গ্রন্থকার অবশ্য সকলকে পুনরায় আনিতে পারেন না; হরিহর রায়ের শিষ্যবাড়ীর ছেলেরা কি কাশীর নন্দবাবু—ইহাদের পুনরায় দেখিতে পাইবার আশা করিতে পারি না, ইহারা আসে, চলিয়া যায়। সকলকে শেষে 'সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার' করিতে দেখিলে মনটা লুটাইয়া পড়ে, করুণ সুরটি বেসুরো হইয়া যায়। কিন্তু এই চরিত্রগুলি এমন গভীর ভাবে মনে দাগ কাটে, যে আর দেখিতে পাই আর না পাই, অন্ততঃ তাহাদের পরে কি হইল জানিতে ইচ্ছা করে। ইহাদের এত সহজে আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি না।

আর একটা কথা। (বর্দ্ধমানের) লীলাকে কি আর অন্যভাবে আঁকা যাইতে পারিত না? প্রথম হইতেই তাহার অনন্যসাধারণ তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা আমাদের মনকে স্পর্শ করে,—তাহার ঐরূপ পরিণতির জন্য শেষে বড় অনুকম্পা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই চরিত্রগুলি এত জীবন্ত যে মনে হয় ইহাদের আমরা চোখের সাম্‌নে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, অনেকের সহিত হয়ত কথাও বলিয়াছি। বই দুইখানি পড়িতে পড়িতে তাহার সাদা কাগজ ও কালো অক্ষরগুলি মুছিয়া গিয়া নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম—যেখানে অপু ও দুর্গা ঘুরিয়া বেড়ায়—কলিকাতা, গঙ্গানন্দকাটি প্রভৃতি স্থানে তাহাদের সত্যকার লক্ষ শোভাপূর্ণ রূপ লইয়া ঝলমল করিয়া ফুটিয়া উঠে। লীলা এমনই একটি চরিত্র যাহাকে এমনই জীবন্ত ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেই লীলার যখন ঘর ছাড়িবার কথা পড়ি,—তখন মনটা সত্যই খারাপ হইয়া যায়; বুঝিতে পারি লীলার কোনও মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল দুর্দ্দমনীয় তেজের বশেই সে ঘর ছাড়িল; তথাপি আমাদের যেন কি রকম কি রকম ঠেকে। অপূর্ব্ব রায় ভবঘুরে লোক, ইহার পরও সে তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে যায় বটে,—কিন্তু মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্যেরা তাহার সহিত আর তেমন প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারে না,—সমাজ তাহার উপর যে বড় কলঙ্কের ছাপ মারিয়া দিয়াছে। মহিমময়ী রাণীর মত তেজস্বিনী লীলার শোচনীয় মরণ অপুর মত আমাদের হৃদয়কেও আকৃষ্ট করিয়া দেয়, করুণায় সমস্ত মন ভরিয়া উঠে।

'পথের পাঁচালীর' মায়া-স্বপ্ন আজও শেষ হয় নাই। রজনীগন্ধার গন্ধের মত তাহার রেশ আমাদের মাতাল করিয়া তুলিতেছে, তাহার শেষ দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছি। যে চিরন্তন স্বপ্ন চিরদিনের শিশু, ভাবুক ও কবিকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, গ্রন্থকার আপন মনে সেই স্বপ্নই আঁকিয়াছেন। চিরদিনের মামুলী জীবনের ভিতরেও তিনি সৌন্দর্য্য ও সুর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এই জন্যই গ্রন্থ দুইখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়াইয়া পড়া মণিমুক্তার মত তিনি জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী লইয়া অপরূপ মায়াজালের সৃষ্টি করিয়াছেন; বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

মণ্টু

শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন পণ্ডিত

এক

উঃ মণ্টুটা কি দুষ্টুই না হয়েছে! তার দাপাদাপিতে গ্রামশুদ্ধ লোক তটস্থ; বাড়ীর লোকদের ত আর কথাই নেই। দুপুর বেলা ত তার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো নেই; ছুটে গেছে ঐ মহম্মদ বক্স-এর বাড়ীর লীচু চুরি করতে নয়ত বোসেদের বাগানের কাঁচা পাকা আম খেতে। গরমের ছুটিটা তার এই ভাবে কেটে যাচ্ছিল। পাড়ার লোকেদের নালিসের ঠেলায় ত তার পিতাঠাকুর মশায়ের প্রাণান্ত উপস্থিত।

এই ত সেদিন তার পিতা এই রাজসাহীতে বদলি হ'য়ে এসেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই সারা গাঁয়ে দুষ্টু মণ্টু আপনার ক্ষুদ্র নামটি বিশেষভাবে প্রচার করে ফেলেছে। মণ্টু, তার দাদা নন্তু, আর গুরুজন তার বাপ মা, কারো কথাই আমল দিত না। বারো বছরের চশমাধারী দাদা নন্তু যখন তার ছ'বছরের ছোট ভাই মণ্টুকে দু' একটা সদুপদেশ দিতে যেত, তখন সে হয় হেসেই উড়িয়ে দিত, না-হয়ত দাদার চশমায় দিত একটান।

তখন তার দাদা বেচারী স্বীয় ক্ষুদ্র বারো বছর বয়সের গাম্ভীর্য্যটুকু বাঁচাবার জন্য সরে পড়ত।

নন্তু ছিল বড় ভাল মানুষ। সে কলকাতায় মাতুল-গৃহে থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে অর্থাৎ মণ্টুর চেয়ে ঢের উঁচু ক্লাসে পড়ত, এইটাই ছিল তার গৌরব। প্রতি ছুটিতে সে পিতার নিকট আসত। সে বড় গম্ভীর প্রকৃতির ছিল। বড় একটা বেরুত না, মিশত না কারুর সঙ্গে বেশী; এইটাই ছিল তার চিরন্তন স্বভাব। আর বড় একটা দুষ্টু মণ্টু ছাড়া কেউ তার কাছে এগোতে সাহস করত না। কারণ সে যখন তার ক্ষুদ্র নাসিকার উপর বৃহৎ চশমাটি এঁটে গম্ভীর ভাবে তার পড়ার ঘরে বসে একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা করত, তখন তার কাছে কেউ কিছু বলা দূরে থাক, অদূরেই একটা নমস্কার করে পালিয়ে যেত। মণ্টুর মা বাপ প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন—"মণ্টুটা একেবারে বয়ে গেল; বংশের যদি কেউ নাম রাখে ত এই বড় ছেলে নন্তু।"

মণ্টুকে লক্ষী হ'তে বল্লে সে অবাক্ হ'য়ে তার কৌতূহলপূর্ণ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করত—"মা, লক্ষী কাকে বলে? কিরকম ক'রে লক্ষী হয়?"

তার মা হেসে উত্তর দিতেন—"এই দুষ্টুমি না ক'রে, লক্ষীছেলের মতন এই তোর দাদার মতন একমনে ঘরে বসে পড়াশুনা করলে সকলেই লক্ষীছেলে বলে।"

মণ্টু বলত হেসে—"ওরে বাপরে ঐ দাদার মতন চোখে চশমা এঁটে ঘরে চুপ করে বসে পড়তে আমি পারব না, দাদা খালি চুপ করে পড়ে। খেলে না, বাইরে বেরুতে চায় না—আমি যদি ও রকম থাকি তা হ'লে মনিয়াকে খেতে দেবে কে?

তার মা আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেন—"মনিয়া আবার কে?" মণ্টু উত্তর দেয়—"কেন, একটা পাখী, বন থেকে ধরেছি; কেমন সুন্দর খাঁচায় ওকে পুরে রেখেছি। রেখেছি ওই আম গাছতলায়।"

তার পরই সে তার মার আঁচল ধরে আর বলে ব্যাকুল ভাবে—"চল, চল, মা—দেখাব চল না।"

মণ্টুর মা সুষমা আটাশ বছরের হ'লেও, কর্ম্মভারে হ'য়ে পড়েছেন এক পাকা গিন্নী। তাঁর বিরাট চাবির গোছাই তার প্রধান প্রমাণ।

খাবার সময়ে মণ্টুকে পাওয়া যায় না। সবাইকার খাওয়া হ'য়ে যায়। "মণ্টু, মণ্টু ওরে কোথায় গেলি?" ডাকে কম্পমান আকাশ বিদীর্ণ হ'লেও মণ্টুর দেখা

নেই। কোথায় গেছে সে? তা কে বলতে পারে? হয়ত ছাদে আবার চুরি করে খাচ্ছেন। সুষমা যা ভাবেন, ঠিক তাই। দেন দুটো চড় একটা কিল। অভিমানী বালক সরোষে—"খাবনা, দেখি কি করে" বলে অভিমান ভরে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে। খায় না তখন—দাদা থাক্‌লে চলে যয়ে তার পড়বার ঘরে, বাবাকে বল্‌তে সাহস হয় না তাই। গোবর-গণেশ দাদাটিরই তখন শরণাপন্ন হ'য়ে মায়ের নামে নালিশ করে। কিন্তু দাদা ত আর অবিবেচক নন্; তিনি তাঁর বিরাট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে একটা বিচারকের দৃষ্টি হেনে অবশেষে রায় দেন—"বেশ হয়েছে,—চুরির সাজা।"

এইবার অভিমানী মণ্টু কেঁদে ফেলে দৌড়ে যায় মার কাছে—কিছু বলে না শুধু কাঁদে আর কাঁদে।

মায়ের প্রাণ। দুরন্ত মণ্টুকে বুকের কাছে নিয়ে বলেন আদর করে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে—"চ খাবি চ।"

মণ্টু মাকে মারে আর বলে—"না খাব না, খাবনা, কিছুতেই খাবনা;—তারপর মরে যাব—বেশ হবে।"

সুষমার প্রাণ কেঁদে ওঠে সন্তানের অমঙ্গলের কথায়। চোখ মুছে চেয়ে দেখেন মণ্টু তখন নীচে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। উদ্বেগে মায়ের বুকটা কেঁপে ওঠে, ডাকেন—"মণ্টু, মণ্টু।" সাড়া পাওয়া যায় না। নীচে নেমে এসে জোরে খুব জোরে কাণের কাছে মুখ রেখে ডেকে ওঠেন অশ্রুজড়িত কণ্ঠে—"মণ্টু—ও—মণ্টু।"

মণ্টু আর অভিনয় করতে পারে না। উঠে পড়ে ধড়মড়িয়ে বলে এক গাল হেসে—"একি মা, তুমি কাঁদছ?"

তারপর নীচে যায় খেতে। মা দেয় আদর করে ছেলেকে খাইয়ে। তারপর দুরন্ত শিশু তার মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এরকম প্রায়ই হ'ত।

দুই

"দেখুন আপনার ছেলে আর কয়টি ছেলের সঙ্গে গিয়ে আমার আমগাছের সমস্ত কাঁচা পাকা আম প্রায় শেষ করে এসেছে।"

এই তীব্র নালিসটি যখন এক প্রতিবেশী এসে মণ্টুর বাপের কাছে করছিলেন, তখন সকাল, সবে মাত্র মণ্টুর বাপ চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। ডাক পড়ল—"মণ্টু।"

সাড়া নেই। জিজ্ঞাসা করা হ'ল—"কোথায় গেছে সে?"

কেউ জানে না। অবিনাশবাবু প্রতিবেশীকে বল্লেন—"আচ্ছা আমি সে ছেলের শাসন করব।"

প্রতিবেশীটির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মণ্টু সেখানে হাজির হ'ল। অবিনাশবাবু সরোষে গর্জ্জন করে বল্লেন—"এদিকে আয়, হতভাগা, খালি দুষ্টুমী।"

মণ্টু ভাল ছেলেটির মতন বলে—"কি বাবা?"

অবিনাশবাবু উত্তর দেন—"আমার মাথা, গাধা কোথাকার।"

তারপর রেগে চীৎকার করে বলেন—"দীনু বোসের আম ধরেছ আজকাল?"

মণ্টু সহজভাবে উত্তর দিল—"শুধু বোসেদের কেন, সব বাগানেরই আম পেড়ে খাই, চুরি করি না ত।"

অবিনাশবাবু সুরটাকে আরও এক পর্দ্দায় তুলে বল্লেন—"কে নিতে বলেছে? তুমি ত না বলে আম চুরি করেছ।"

মণ্টু বলে—"বল্‌ব কেন? গাছে আম হ'য়ে আছে সে ত খাবার জন্যেই, তাই খাই।"

অবিনাশবাবু রাগে কাঁপছিলেন। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে দিলেন তার পিঠের ওপর বেশ জোরেই গোটা দুই চড়চাপড়।

বালক কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল দৌড়ে মায়ের কাছে, ঠোঁট ফুলিয়ে নালিস্ জানাল—"বাবা মেরেছে।"

সুষমা ঝাঁট দেওয়া রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন, কি করিছিলি?"

আজ মাকে ঝাঁট দিতে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। আসল জিনিষ ভুলে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি আজ ঝাঁট্ দিচ্ছ কেন মা?"

মা উত্তর দেন—"রাণীর আজ অসুখ।"

সুষমা ছেলেকে কান্না ভুলে যেতে দেখে হাস্‌তে হাসতে বল্লেন—"ওমা, এই যে কান্না ভুলে গেছে।"

তাইত। মন্টু তখন আবার কাঁদবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারে না। জব্দ হ'য়ে রেগে মার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত ক'রে বলে—"তুমি দুষ্টু, দুষ্টু, দুষ্টু।"

সুষমা ছেলের কাণ্ড দেখে হেসে উঠলেন। তারপর চেয়ে দেখলেন বড় বড় জলের ফোঁটা চোখের পাতাব পাশে শুকিয়েছে। তাড়াতাড়ি সস্নেহে গামছা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন—"মন্টু, লক্ষ্মী বাপ আমার, একটু পড়াশুনা কর্। শেষে মুখ্যু হ'য়ে গরু চরাবি?"

মন্টু আনন্দে নেচে বলে—"হ্যাঁ মা, গরু চরাব। সে বেশ। জান্‌লা দিয়ে চেয়ে দেখি কেমন রাখালেরা গরু চরাতে নিয়ে যায়। নদীর ধারের ঐ পড়ো জমিটার ওপব গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে, গাছতলায় বসে গান গায়। আমি ওকম গরু চরাব মা। তুমি আমার গামছায় একটু গুড় আর দুটো মুড়ি বেঁধে দেবে, আর আমি গরুর পাল নিয়ে যাব। গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দে বাঁশী বাজিয়ে গান গাব। তারপর সূর্য্য মামা ডুবে গেলে ফিবে আসবো। বেশ হবে তা হ'লে নয় মা?"

সুষমা ছেলের রকম দেখে না হেসে থাক্‌তে পারলেন না। শেষে বল্লেন—"আয়, চা খাবি ত আয়।"

মাতাপুত্রে টোষ্ট আর চা খেতে খাবার ঘরে ঢুকে খাওয়ার পালা শেষ করে নিলেন। খানিকক্ষণ পরে মন্টুর বন্ধু নরু ছুটতে ছুটতে এসে খবর জানল যে সে ডাব খেতে চায় কি না?

মন্টু জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় ডাব পাবি রে?"

নরু মাথা দুলিয়ে বলে—"আয়না"।

তারপরেই মন্টু মায়ের হাত ছাড়িয়ে মায়ের কোনও কথা না শুনে দৌড়তে দৌড়তে নরুর অনুসরণ করল।

তিন

হঠাৎ মন্টুর বাপ ডাকলেন—"মন্টু, মন্টু।"

তাড়াতাড়ি মন্টু তা'র ভিজে সপ সপে গা নিয়ে এসে হাজির হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—"বাবা, বাবা, আমি কেমন নরুর কাছে হতে সাঁতার শিখেছি। মন্টুর বাপ অবিনাশ বাবু বকে উঠ্‌লেন—"ও বাঁদর, তাই এই সকাল বেলায় গা ভিজোন হ'য়েছে? যা, যা, শিগগীর গা মুছে আয়—অসুখ করবে যে।"

মন্টু গা মুছে এসে দাঁড়ালো পিতার সাম্‌নে চুপটী করে—যেন কত শান্ত ছেলে! অবিনাশ বাবু দূরে একটি ভদ্রলোকের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করে বল্লেন -'মন্টু, ঐ তোমার মাষ্টার মশায়। উনি আজকাল তোমাকে সকালে রাত্তিরে পড়াবেন। বুঝলে?"

মন্টু ঘাড় নাড়লো, তারপর বল্ল—"আচ্ছা।" দূরে চেয়ে দেখলে ছেঁড়া সার্ট ও একটা ময়লা কাপড় পরা একটি শীর্ণকায় ভদ্রলোক বসে আছেন। মন্টু বিপদ গণলে—তা হ'লে ফাঁকি দিলে চল্‌বে না, পড়তে হ'বে। তার মাথা যেন ঘুরে উঠ্‌ল। সাম্‌নে ও ত মাষ্টার নয় যেন সাক্ষাৎ যমদূত।

মন্টু চলে যাচ্ছিল। অবিনাশ বাবু ধমক দিয়ে বল্লেন "যাচ্ছিস্ কোথা, পড়তে হ'বে না?" মন্টু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"এখন থেকেই?"

অবিনাশ বাবু বল্লেন—"হ্যাঁ"

বাধ্য হয়েই মন্টু পড়তে বসল। মাষ্টার মশাই আদর করে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার নাম কি?"

সে বল্ল—"আমার নাম মন্টু।" মাষ্টার মশাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার ভাল নাম কি?"

মন্টু উত্তর দিল—"শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায়।"

মাষ্টার মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কোনখানটা পড় ফাষ্টবুকের।"

মন্টু বল্ল—"ঘোঁড়ার পাতা পর্য্যন্ত পড়েছি।"

তারপর মাষ্টার মশাই মন্টুকে পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ মন্টু লাফিয়ে উঠে বল্ল—"হ্যাঁ মাষ্টার মশাই এইবার যাই মনিয়াকে ছোলা খাইয়ে আসি।" মাষ্টার ত অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন—"সে আবার কে?"

মন্টু বল্ল—"এই একটা পাখী, কেমন সুন্দর পাখী! দেখবেন আসুন না।" বলেই সে তার মাষ্টার মশাইকে টান্‌তে টান্‌তে আমগাছতলায় নিয়ে এল। মাষ্টার বেচারী

রোগা মানুষ। কি আর করবেন? টানাটানির চোটে অন্দরের সেই আমগাছতলায় এসে পৌছলেন।

সেখানে তখন সুষমা দাঁড়িয়ে মালীর কাছ হ'তে আম গুণে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখানে একজন অপরিচিত পুরুষের আগমনে একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খুব অবাকও হ'লেন। তাড়াতাড়ি সেখান হ'তে চলে গেলেন। মাষ্টার ত একেবারে হতভম্ব! তার পরেই রঙ্গস্থলে অবিনাশ বাবুর আগমন। তিনি অতিমাত্রায় আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি এখানে কেন?" মাষ্টার নিজের ভুল বুঝতে পেরে কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লেন—"মণ্টু আমাকে টান্‌তে টান্‌তে এখানে নিয়ে এসেছে।"

অবিনাশ বাবু বল্লেন—"তা', আপনি এখানে এলেন কেন? ওকে এখন পড়ান গে যান্‌। ছোট ছেলের কথায় আপনিও যদি নাচেন, তাহ'লে ত আর চলে না।"

মাষ্টার লজ্জিত হ'য়ে বলে উঠ্‌লেন—"মণ্টু চল।" বলে তাঁর গুণধর ছাত্রটিকে নিয়ে আবার বাইরের ঘরে পড়াতে বস্‌লেন।"

মণ্টু পড়তে বসে বিষণ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করল—"মাষ্টার মশাই, কখন ছুটি দেবেন?" মাষ্টার মশাই বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"এর মধ্যে কি, এইত মাত্র পড়তে বসলে।"

মণ্টু বল্ল—"তা জানি, কিন্তু আর কতক্ষণ পড়তে হ'বে?"

—"অন্ততঃ একঘণ্টাত পড়তেই হবে।"

"ও মোটে, আচ্ছা মাষ্টার মশাই জলটা খেয়ে আসি" বলে মণ্টু অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল।

"মণ্টু, মণ্টু" আর দেখা নেই, সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ পরে মণ্টু হেলতে দুলতে এসে হাজির হ'য়ে বল্লে—"মাষ্টার মশাই, এক ঘণ্টার আর কত বাকি?"

চার

সুষমার যে কী অসুখ করেছিল ডাক্তারে তা বহু চেষ্টা করেও সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করতে পারছিলেন না। চিকিৎসাও চলছিল অবিরাম। বড় ছেলে মন্তু তখন কলকাতায়—মামার বাড়ী। এবার সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে। সে দিনটা ছিল মেঘলা। সুষমা দোতলার বড় ঘরে না শুয়ে পাশের একটা খুব খোলা ঘরে খাটের উপর শুয়ে দেখছিলেন—বাইরে প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালী নৃত্য, আর শুনছিলেন আকাশের প্রাণখোলা মনভোলান ঝরঝরাণি গান। আঠারটী বছর এই তাঁর বিবাহিত জীবন। কোনখান দিয়ে যে তা কেটে গেছে, তা নিজেই ভাল রকম জানেন না। রাণী তখন সুষমার সেবা করছিল, আর বর্ষার এই জলমগ্ন দিনে তার দেশের কথাটাই বার বার ভাবছিল।

সুষমা শুয়ে ছিলেন চুপটি করে। ভাবছিলেন তাঁর ছোটবেলার ছোট ছোট টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতিগুলি। সেই মায়ের বুক ঘেঁসে গল্প শোনার সুখ—সে কি আর এ জীবনে পাবেন?

সেই—বৃষ্টি থেমে গেলে রাত্রে রজনীগন্ধা তুলতে যাওয়া ফুলের বাগানে। ফুলের গন্ধে তন্ময় হ'য়ে ভিজে মাটির কথাই তাঁর মনে পড়ছিল। রাণী মাথা নীচু করে তাঁর পা টিপছে।

বাইরের ঘর হ'তে ভেসে আসছিল—মণ্টুর গলা, সে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছে "The earth moves round the sun", আর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকছে। আবার মাষ্টার মশাইয়ের ধমকে চমক ভেঙ্গে আবার তার পুনরুক্তি করছে।

মাষ্টার মশাই চটে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাইরে কি দেখছো? তোমার মনিয়া কি ভিজে যাচ্ছে?"

মণ্টু উত্তর দিল, সংক্ষিপ্ত—"না।"

মাষ্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—"সে কোথায়?"

মণ্টু বেশ সহজ ভাবে বল্ল—"ওই ঐখানে, ঐ বনে; তাকে ছেড়ে দিয়েছি কিনা।"

মাষ্টার মশাই অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন, তাকে ছেড়ে দিয়েছ?" মণ্টু তার ঘন চুলের থোকাগুলি দুলিয়ে চোখ দু'টী তুলে বল্ল—"মা বল্লে বেচারীর কষ্ট হচ্ছিল।"

পড়ার ছুটি হ'লে মণ্টু দৌড়তে দৌড়তে ভিজে গায়ে মায়ের কাছে এসে বল্ল—"মা এইবার গল্পর বাকিটা বল, সেই

রাজপুত্তুর বনের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল ঘোঁড়ায় চেপে—তারপর কী ? তারপর ? বল না মা, ওমা…।"

সুষমা চাইলেন পুত্রের পানে—পুত্রের আহ্বানে। তারপর মণ্টুকে ভিজে দেখে তিনি ভীত হ'য়ে বল্লেন—"বেশ মণ্টু, জামা কাপড় ভিজিয়ে এসেছো, যদি আমার মতন অসুখ করে।"

মণ্টু একগাল হেসে বল্ল—"তা হ'লে বেশ হয় ; মাষ্টার মশাইয়ের কাছে তাহ'লে আব পড়তে যেতে হয় না। আজ কাল আবাব বাবার কথায় বিকেলে পড়ান ধরেছে। মাগো ! বেড়াতেও পাইনে।"

সুষমা বল্লেন—"আমার মতন অসুখ করলে পড়ে থাক্‌তে হ'বে এই বিছানায়, তখন ত আব বেরুতে পাবিনা।"

—"চাইনা বেরুতে।" বলে মণ্টু গর্জ্জন করে আবার বল্‌তে আরম্ভ করল—"মাষ্টার মশাই, তাহ'লে জব্দ হ'ন, আমাকে কেমন পড়াতে পার্ব্বেন না। এই তোমাব কাছে শুয়ে শুয়ে খালি গল্প শুনব, তুমি বল্‌বে যত রকম গল্প। বাবা ত আর তখন বারণ করতে পার্ব্বেন না।"

সুষমা হেসে বল্লেন—"যদি রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ি ?"

মণ্টু বল্ল—"তা হ'লে ঘড়ীর কাঁটা সবিয়ে দিয়ে তোমায় কাতুকুতু দিয়ে তুলে দিয়ে বল্‌ব—"মা গো, এই ত মা'ত্র সন্ধ্যে সাতটা, এরই মধ্যে কী ঘুম।" সুষমা ছেলের বুদ্ধিতে খুব হেসে উঠ্‌লেন। তাড়াতাড়ি রাণীকে দিয়ে মণ্টুর জামা কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে খাটের উপর তুলে নিলেন।

মণ্টু আবার বল্‌তে আরম্ভ কবল—"মাগো, তোমার জন্যে বড় মন কেমন করে, তাইত পড়তে চাইনা।"

সুষমা ভাব্‌লেন "তাঁর দিন শেষ হ'য়ে এসেছে।" তাই বড় আগ্রহে মণ্টুকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে একটা চুমু দিয়ে বললেন—

"মণ্টু-উ-মণ্টু।" মণ্টু মায়ের স্নেহে বিগলিত হ'য়ে উত্তর দিল—"কি মা ?"

সুষমা বুকের মধ্যে বুকের ধনকে পেয়ে স্নেহ-বিজড়িত কণ্ঠে বল্লেন—"গল্প শুন্‌বি ?"

মণ্টু তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্‌ল—"হ্যাঁ মা বলনা।"

পাঁচ

কি জানি কদিন মণ্টুর খুব পবিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে। সে আজকাল দুষ্টুমী করেনা। সারাদিন মায়ের কাছে থেকে মায়ের সেবা করে, রাত্তিরে গল্প শোনে। একদিন সুষমা বল্লেন—"মণ্টু বিয়ে করবি ?"

মণ্টু ঠাট্টা না বুঝে বলে উঠ্‌ল—"হ্যাঁমা, লক্ষ্মীটী আমার বিয়ে দাও। হ্যাঁ, মা, সবাইকাব বিয়ে হয়, কই তোমার ত বিয়ে হ'লনা। মা তোমার কবে বিয়ে হ'বে ?"

সুষমা আব থাক্‌তে পাবলেন না। হেসে উঠলেন খুব জোরে। তারপব পুত্রের গালে একটা মৃদু চড় মেরে বল্লেন "দুব পাগল, কবে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

মণ্টু অবাক নয়নে বল্ল—"কই তোমার বিয়েতে ত আমায় লুচি খাওয়ালে না।

সুষমা বল্লেন—"তুই কি তখন হয়েছিলি পাগল ?"

মণ্টু ব'লে উঠল আগ্রহান্বিত হ'য়ে—"তখন আমি হইনি ত কোথায় ছিলুম ?" সুষমা ছেলের গালে একটা চুমো দিয়ে বল্লেন—"এই অপর কারুর বাড়ী বুড়ো হ'য়ে।"

হঠাৎ খাণিকক্ষণ চুপ করে মণ্টু ব'লে উঠল জোবে, একটু আব্দারের সুরে—"মা, মা, ওমা আমি একটা রাজকন্যা বিয়ে করব—সেই রাজপুত্তুরেব মতন।"

সুষমা বল্লেন—"রাজকন্যা বিয়ে করতে হ'লে যে নিজের মাকে ছেড়ে পক্ষীরাজ ঘোঁড়ায় চেপে অনেক দূরে যেতে হয়, তা কি পারবি ?"

মণ্টু হেসে বলে উঠল—"বাঃ, তা কেন ? তোমাকে আর একটা ঘোঁড়ায় চাপিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

সুষমা উত্তর দিলেন—"আচ্ছা তা বড় হ'য়ে আমাকে নিয়ে যাস্‌। সুষমা একবার একটা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন—"জীবনে সেদিন কি আব আসবে যে তিনি তাঁর পুত্রবধূর মুখ দেখে সুখী হ'বেন ? হায়রে !"

সুষমা এরার হঠাৎ একটু বুকে ব্যথা অনুভব করলেন—কথা কইতে পারলেন না। তাই শুধু মণ্টুর দিকে নীরব হ'য়ে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ মাকে এতক্ষণ চুপ করে থাক্‌তে দেখে মণ্টু সুষমার গাটা বেশ জোর করে নাড়া দিয়ে বল্ল—

"মা, মা, ওগো মা, তুমি কী জানিনা—হ্যাঁ কথা কওনা।" সুষমা একটু হেসে বুকের ব্যথা ইঙ্গিতে জানিয়ে আপনার অক্ষমতা জানিয়ে দিলেন। শুধু একটু একটু গাল টিপে আদর করে ছোট্ট একটা চুমো তার মুখে এঁকে দিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। ঘরে ঘরে কুললক্ষ্মীর ওষ্ঠস্পর্শে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠল। কেবল দূরে নদীর ওপারে অস্তরবির শেষ লালিমাটুকু তখনও ছিল। সুষমা চুপ করে শুয়ে দূরের দিকে তাকিয়েছিলেন। বুকের মধ্যে মণ্টুর মাথাটা জাপটে ধরে, চোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে অশ্রুধারা ঝ'রে পড়ছিল মণ্টুর মুখের উপর।

মণ্টু তাড়াতাড়ি উঠে মায়ের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে উঠল—"মা তুমি কাঁদছ কেন?" তারপর আবার বল্ল মায়ের মুখে একটা চুমো খেয়ে—"লক্ষ্মী-মা, মাণিক আমার কেঁদনা, মানি।"

মণ্টু ভাবলে যে বুঝি তার মাকে এবার তার গল্প বলা উচিত। তাই সে বল্ল—"মা! একটা গল্প শুনবে?"

সুষমা একটু মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

মণ্টু তখন তার মাকে গল্প শোনাতে আরম্ভ করল—খানিকক্ষণ গল্প বলে ঘুমিয়ে পড়ল।

তাঁর কাছছাড়া হতে চায় না। আগে কি দস্যিই ছিল। আশ্চর্য্য।

কদিন সুষমার অনুরোধে মাষ্টারমশাই আর মণ্টুকে পড়াতে আসেন না। তাই মণ্টুও নিশ্চিন্ত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ মায়ের কাছে থাকে।

মণ্টু কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানিনা। যখন সে ঘুম থেকে উঠল, দেখে যে সে একটা আলাদা খাটে শুয়ে। আর ঘরভর্ত্তি লোকজন। একজন ডাক্তার এসেছেন, ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে সুষমার বুক পরীক্ষা করছেন। খাণিকক্ষণ পরে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন—"কি রকম বুঝলেন ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু ষ্টেথিস্কোপটা তুলে নিয়ে চিন্তিত মুখে বলে উঠলেন—"Very serious"।

ডাক্তার চলে গেলেন পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে।

অবিনাশবাবু ধীরে ধীরে এসে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর পাশে বসলেন। এই রকমই আর এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে ফুলশয্যার সময় একদিন সুষমার পাশে বসে ছিলেন। তারপর অনেক বৎসর পরে আজ আর এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

ছয়

নদীর ধারে একটা চিতা দাউ দাউ করে জলছিল। তখন ভোর পাঁচটা। ভোরের অস্ফুট আলোক আর চাঁদের শেষ ম্লান আলোর সঙ্গে একটা লুকোচুরী চলছিল। প্রিয়তমাকে চিরদিনের তরে বিদায় দিয়ে ধীরে ধীরে অবিনাশ বাবু লক্ষ্মীহীনা ঘরে ফিরলেন। একটা ব্যাকুলতা জেগে উঠল—এই মা-হারা মণ্টুর কথা ভেবে। তাকে তার বন্ধুদের হেফাজতে রেখে আসা হ'য়েছে। আর নন্তু? সে তবু একটু বড় হয়েছে।

ঘরে এসে শুনলেন মণ্টু ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করেছিল—তার মার কাছে যাবার জন্যে। তাঁরা অনেক করে ধরে রেখেছিলেন জোর করে। সে বলেছিল চেঁচিয়ে—"মা নদীতে যাচ্ছে, আমিও সঙ্গে যাব। আমি না গেলে মা যে জলে ডুবে যাবে।"

তিনি এসে দেখলেন মণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রান্ত হ'য়ে। তার থোকা থোকা চুলগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্তদিন সে শুধু কেঁদেছে। বার বার চেষ্টা করেছে নদীর ধারে ছুটে যাবার জন্যে। কেঁদেছে খুব, মা-মা বলে। সমস্তক্ষণ ধরে সে মায়ের কাছে যাবার জন্য যুদ্ধ করেছে, পরে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত

দুঃখের দ্বিতীয় রাত্রি অবসান হ'ল। পরদিন আষাঢ়ের বাদল প্রাতে অবিনাশবাবু শয্যা ত্যাগ করে দেখলেন শয্যায় মণ্টু নেই। কোথায় গেল সে? গৃহের সব কক্ষগুলো খুঁজলেন, মণ্টুর চিরপ্রিয় বাগানগুলিতে খুঁজলেন, চারি-

দিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। বার বার আকুল কণ্ঠে ডাকলেন—"মণ্টু, মণ্টু।"

কেউ সাড়া দিলে না, শুধু বৃষ্টির ঝম্‌-ঝম্‌ শব্দ আর কিছু নয়—যেন মা-হারা ছেলের তপ্ত অশ্রুজল।

অবিনাশবাবু ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে গেলেন—হয়ত সেখানে তাকে পাওয়া যাবে। সে যে এখানে আসবার জন্যে কাল সারা দিন রাত কেঁদেছে। সে ত জানে না যে আর কোন নদীর ধারেই তার মাকে পাওয়া যাবে না।

নদীর ধারে এসে দেখলেন ঐ দূরে নদীর বুকে দুষ্টু মণ্টুর শান্ত দেহটি নদীর ঢেউয়ের তালে তালে নাচছিল। দুষ্ট তার হাত দু'খানি এলিয়ে দিয়েছিল তার পলাতকা মাকে ধরবার জন্যে। বাদলধারা তার সমস্ত দেহটিকে অশ্রুধারায় সিঞ্চিত করে দিচ্ছিল। দুষ্টু মণ্টু শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নদীর বুকে নয়—তার চির প্রিয় মায়ের কোলে।

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

সাহিত্য-সমালোচনা ও শিষ্টাচার

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক

কোন লেখকের প্রতিভা বিচার করার সময় তাঁর লেখার ভুল-ভ্রান্তি বা অপকৃষ্ট অংশটুকু নিয়ে সমালোচনা ক'রে তাঁকে ছোট করা সাহিত্য-সমালোচকের কাজ নয়।

লিপি-নৈপুণ্যের যে-সকল ক্ষেত্রে ঐ-লেখক সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী,—তাঁর সেই সেই গুণাবলীর সম্যক আলোচনা ক'রে, সমালোচক সেই লেখকের প্রতিভার মূল্য নির্দ্ধারণ করবেন।

জীবনের অন্য ক্ষেত্রের মতো বুদ্ধির ক্ষেত্রেও ভুলভ্রান্তির বীজ এমন ক'রে উপ্ত থাকে যে, মানুষ সকল সময় তাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই স্খলন এবং ত্রুটি এমন অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে আছে যে, অতি-তীক্ষ্ণ-ধী লেখকও সকল সময় তাদের থেকে মুক্ত হ'তে পারেন না; এবং ঐ কারণেই জগতের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের রচনার মধ্যেও বড় বড় ভুলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সূত্রে Horace বলেছেন—Quandoque bomes dormitat Homerus (হোমারকেও কখনো কখনো নত হ'তে হয়); অর্থাৎ হোমারও কখনো কখনো ভুল করেন।

সুতরাং লেখকের গুণ বিচার হবে কি দিয়ে? শোপেনহাওয়ার বলেন—উপযুক্ত ক্ষেত্র, অবসর ও সুযোগ পেলে এবং সঠিক মেজাজে (mood) থাকলে মনীষী লেখক সাধারণ লেখকদের ছাড়িয়ে কতখানি উঁচু-স্তরে উঠ্‌তে পারেন,—তাঁর এই ঊর্দ্ধ-বিচরণের সীমাই হবে তাঁর প্রতিভার মাপকাঠি।

খ

একই শ্রেণীর দুজন শক্তিমান শিল্পীকে তুলনা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।—যথা, দুজন বড় কবি, বা চিত্র-শিল্পী বা সঙ্গীত-বিশারদ! তা করতে গেলে, একজন-না-একজনের ওপর অবিচার এসে পড়বেই। কারণ, ঐ রকম সমালোচনায়, সমালোচক একজন শিল্পীর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ আবিষ্কার করবেন এবং অন্যের মধ্যে সেই গুণটির অভাব দেখিয়ে তাঁকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করবেন। প্রতিপক্ষও তৎক্ষণাৎ তথা-কথিত নিকৃষ্ট শিল্পীর মধ্যে এমন-একটি বিশেষ গুণ লক্ষ্য করবেন যা অপরের মধ্যে নেই, সুতরাং অপর পক্ষকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে অভিমত প্রদান করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না।

এ-রকম সমালোচনার ফলে দুটি প্রতিভাই অযথা নিন্দিত এবং উপহসিত হন; এর দ্বারা তাঁদের সঠিক এবং উপযুক্ত বিচার কোন দিনই সম্ভবপর নয়।

ঔষধের মাত্রা যদি বেশী হ'য়ে যায় তাহ্‌লে তা যেমন কার্য্যকরী হয় না, সাহিত্যেও তেমনি বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং দোষ-দর্শন যখন সুবিচারের গণ্ডী লঙ্ঘন করে তখন তার যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

গ

যখন কোন সাঁচ্চা রচনা আত্মপ্রকাশ করে তখন তার পথের অন্তরায় হয় বাজারের রাশীকৃত মন্দ-রচনা, যেগুলিকে সাধারণে ভুল ক'রে ভালো ব'লে মেনে নিয়েছে। ত বহুদিনব্যাপী যুদ্ধের পর নবাগত যখন তার প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম অর্জ্জন করতে সক্ষম হয় তখন আবার তাকে নূতন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হ'তে হয়; এবারে হয় ত লোকে কোন-এক বিচার-বুদ্ধি-শূন্য অন্ধ অনুকারক-কে টেনে এসে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বেদীর ওপর প্রতিভাবানের পাশেই আসন নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেয়; তারা প্রতিভার সঙ্গে অনুকা

পার্থক্য বোঝে না, মনে করে, সেই-ক্ষেত্রে বুঝি আরও একটি শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তির শুভাগমন হ'ল। Yriarte তাই দুঃখ ক'রে বলেছেন—The ignorant rabble always sets equal value on the good and the bad,

সাধারণ সমালোচকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির একান্ত অভাবের আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন দেখি যে, প্রত্যেক যুগের প্রাচীন রচনাগুলিকে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে কিন্তু বর্তমানের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি তাদের বিমুখতার আর অন্ত নেই,—তাদের ভুল বুঝে অবহেলা করতে ঐ-সব সমালোচকের বাধে না মোটেই।

নিজেদের সমসাময়িকদিগের ভিতর থেকে যে-প্রতিভা ভাস্বর হ'য়ে ওঠে তাকে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা ওই সব তথাকথিত সমালোচকের দল উপযুক্ত সমাদরে বরণ ক'রে নিতে পরাঙ্মুখ হয়,—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালের প্রতিভাকেও সত্যকার উপলব্ধি করবার মতো বোধশক্তি তাদের নেই, সাহিত্যের কর্তৃপক্ষরা তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, এই জন্যেই শুধু তারা সেই প্রাচীন প্রতিভাকে সম্মান প্রদর্শন করে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নয়, বিদ্বজ্জনসমাজে মূর্খ প্রতিপন্ন হবার আশঙ্কায়।

দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে সূর্য্য যেমন আলো বিকীর্ণ করতে পারে না, কিম্বা শ্রবণ-শক্তি না থাকিলে সঙ্গীত যেমন সুর সঞ্চার করতে সক্ষম হয় না—তেমনি প্রতিভাবান লেখকের রচনার মূল্য নির্ভর করে তার পাঠকের বোধ-শক্তি এবং গ্রহণ-ক্ষমতার ওপর;—The value of all masterly works is conditioned by the kinship and capacity of the mind to which it speaks......

সাধারণ পাঠকের কাছে কোন অসাধারণ রচনা চাবী-বন্ধ রহস্য-কৌটার মতোই অর্থ-হীন; সুতরাং কোন চারু-শিল্প-কার্য্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করবার জন্য চাই একটি অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন অন্তর; কোন গভীর গবেষণা-মূলক রচনার গুণ-গ্রহণের জন্য চাই এমনি একটি চিন্তাশীল মন। কিন্তু জগতে এ যোগাযোগ অনেক সময়েই হয় না; অনেক সময়ে দেখি, যে-লেখক কোন উৎকৃষ্ট গবেষণা জগতকে উপহার দিলেন, তাঁর অবস্থা হ'ল ঠিক সেই আতস-বাজী-প্রস্তুত-কারকের মতো, যিনি তাঁর বহু-যত্নে নির্ম্মিত বাজীগুলির চমক্‌প্রদ সৌন্দর্য্য প্রচুর উৎসাহে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়ে শেষে জানলেন—তাঁর দর্শকগণের প্রত্যেকেই অন্ধ-আশ্রমের অধিবাসী! অনেক বড়ো লেখকের সাহিত্যজীবনে এই রকম ট্র্যাজিডি ঘটতে দেখা গেছে।

লেখক যে-কথাটি বলতে চাইছেন, পাঠক-চিত্তও সেই কথাটির মর্ম্ম উপলব্ধি করবার জন্য সমুৎসুক; লেখকের সহিত পাঠকের মনের একটি নিবিড় আত্মীয়তা,—পাঠকের সকল আনন্দ ও তৃপ্তির মূলে এই একাত্মবোধ নিহিত থাকে।

নিজের সকল জিনিষকেই যেমন সুন্দর দেখি, তেমনি যে-লেখকের সহিত আমার অন্তর এবং বোধশক্তির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মৈত্রী তাকেই আমার ভালো লাগবে সবার আগে। সমাজে মেলামেশার কালেও ঠিক এই স্বাভাবিক নিয়মই চলে। যাকে নিজের মতো দেখি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় সকলের বেশী। একজন অল্প-বিদ্য লোক পণ্ডিতমণ্ডলীর পাশ কাটিয়ে তারই মতো আর একটি মূর্খের সঙ্গেই আলাপ করবে অধিক। সাহিত্যের প্রাঙ্গণেও আবহমানকাল থেকে এই নিয়মই চলে আসচে।

স্থূল-বুদ্ধি, আড়ম্বর-প্রিয় এবং অন্তঃসার-শূন্য পাঠক সেই-সব লেখককেই সবার ওপরে আসন দেবে যারা তার মনের মতো ক'রে লিখতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু সর্ব্বজনপ্রশংসিত প্রতিভাবান লেখককে সে মুখে প্রচুর সম্ভ্রম দেখাতে কার্পণ্য করবে না। তার কারণ, মনের সত্যকার মতামত প্রকাশ করবার মতো সাহস তার নেই। কোন অসাধারণ রচনা তাকে কোন আনন্দই দেয় না, বরং তার মনকে না-বোঝার ভারে তিক্ত ক'রে তোলে,—কিন্তু এ-কথা সে প্রাণ গেলেও কারুর কাছে স্বীকার করবে না; কারণ তা করতে গেলে জনসমাজে তার প্রতিপত্তি হারাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

প্রতিভাবান্ লেখকের কোন সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট রচনা তারাই সম্যক উপলব্ধি করবে যাদের অন্তরে সৌন্দর্য্য-বোধ এবং চিন্তা-শক্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

ঘ

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্যিক পত্রিকাগুলির একটি বিশেষ মিসন্ আছে; অসংখ্য অর্ব্বাচীন লেখকের দল বাণীর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিনিয়ত যে-আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত করছেন, সেই সব অক্ষম এবং অযৌক্তিক রচনা-স্রোতের বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধের মতো দাঁড়িয়ে তাদের রুদ্ধ করাই সাহিত্যিক পত্রিকার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। তার মতামত এবং বিচার-নিষ্পত্তিও নিষ্কলুষ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং কঠোর হওয়া প্রয়োজন; অযোগ্য লেখকের প্রত্যেক অপকৃষ্ট প্রচেষ্টা প্রাণহীন অনুকরণ এবং রচনা-চৌর্য্যকে নির্ম্মমভাবে সমালোচনার কশাঘাতে বিধ্বস্ত করার মধ্যেই তার যথাযোগ্য কর্ত্তব্য নিহিত আছে। মন্দ রচনার স্রোতকে নিবৃত্ত করাই হবে তার কাজ; অর্থ-লুব্ধ প্রকাশক এবং স্বার্থান্বেষী সমালোচকের মতো তাদের প্রশ্রয় দিয়ে পাঠকদের প্রতারিত করা তার কাজ নয়।

এমনি যদি একটি কর্ত্তব্য-পরায়ণ সাহিত্য-পত্রিকা থাকে তাহলে তার হাতের লাঞ্ছনার ভয়ে প্রত্যেক অযোগ্য লেখক, প্রত্যেক গ্রন্থ-তস্কর, প্রত্যেক মন্দ কবি তার লেখনী ধারণ করবার পূর্ব্বে বারবার ভীত ও দ্বিধান্বিত হবে; তার এই সভয় চিন্তা তার লেখনীকে অসাড় নিষ্ক্রিয় ক'রে দেবে,—ফলে, তার লেখা হয়ত আর কোন মাসিকের অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করবে না, এবং সাহিত্য-লক্ষ্মীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবেন। প্রয়োজন-বিহীন আবর্জ্জনার ভারে সমাচ্ছন্ন বাণীর মন্দির-পথ এমনি ক'রেই অল্পে অল্পে সুগম এবং সুসংস্কৃত হবে।

সাহিত্যে যা মন্দ তা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়,—অহিতকর এবং সংক্রামকদোষ-দুষ্টও বটে।

লোক-সমাজে যে-সব মূর্খের দল ভিড় ক'রে আছে তাদের প্রতি যে সহনশীলতা দেখানো হয় সাহিত্য-সমাজে সেই প্রকারের পরমত-সহিষ্ণুতার প্রচলন করলে শুধু ভুল করা হবে না,—অন্যায় করা হবে। সামাজিক-ক্ষেত্রে শিষ্টাচার প্রয়োজনীয় কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে তা অসঙ্গত এবং অনেক সময় অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়: কারণ এর বশবর্ত্তী হলে, মন্দ লেখাকে ভাল আখ্যা দিতে হবে, এবং তাতে ক'রে সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

ঙ

সর্ব্বোপরি, সাহিত্য-ক্ষেত্র হ'তে আর একটি অসঙ্গত অন্যায়ের বিলুপ্তি একান্ত আবশ্যক; সেটি হচ্ছে—ছদ্মনামকতা বা অনামকতা, সকল প্রকার সাহিত্যিক নীচতার আবরণ। সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সমালোচককে লেখক এবং তার বন্ধু-বান্ধবদিগের ক্রোধ থেকে রক্ষা করবার জন্যই হয়ত ছদ্ম-নামের প্রচলন হ'য়েছিল; কিন্তু অধিকাংশস্থলেই দেখা যায়, দায়িত্ববিহীন সমালোচক ছদ্মনামের সুবিধা নিয়ে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। যে-লেখার নিন্দা বা প্রশংসা করলে স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে তেমনি-তর রচনার নিন্দা বা স্তুতিকল্পেই কাপুরুষ সমালোচক ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করে। এমনি ক'রে ছদ্মনামের আড়াল থেকে কোন উৎকৃষ্ট লেখার প্রতি যুক্তিহীন কটূক্তি নিক্ষেপ করা,—এর থেকে ইতরজনোচিত কাজ আর নেই। যে-লোক নিঃশঙ্ক-চিত্তে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে পিছন থেকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করা,—এ হচ্ছে গুণ্ডার কাজ, ভদ্রলোকের নয়।

এ-বিষয়ে Riemer তাঁর Reminiscences of Goethe নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন, যে তোমার প্রকাশ্য শত্রু, যে তোমার মুখো-মুখি হ'য়ে দাঁড়ায় তার মর্য্যাদা-বোধ আছে, তার সঙ্গে তুমি একদিন সম্মান-জনক সর্ত্তে সন্ধি-স্থাপন করতে পারো; কিন্তু যে-শত্রু লুকিয়ে থেকে তোমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে তার নীচাশয়তার তুলনা হয় না। প্রকাশ্যে নিজের মতামতগুলি সমর্থন করবার মতো সাহস তার নেই—এমনিই কাপুরুষ সে। তার নিজের যুক্তি থাক বা না থাক, তার জন্য সে কিছুই

র না; নিজে লুক্কায়িত থেকে, শাস্তি পাবার সম্ভাবনা ড়ুয়ে তোমার ওপর কটূক্তি বর্ষণ ক'রে আনন্দ পাওয়াই র একমাত্র উদ্দেশ্য।

ছদ্মনামকতা বা অনামকতা সকল প্রকার সাহিত্যিক ং সংবাদ-পাত্রিক নষ্টামির আশ্রয়; এর প্রচলন বন্ধ য়া একান্ত কাম্য। মাসিক-সাপ্তাহিক-দৈনিকের সকল নার সঙ্গে রচয়িতার নাম থাকা আবশ্যক এবং সে-নামের র্থতা সম্বন্ধে সম্পাদক হবেন দায়ী;—সুতরাং সংবাদ মারফতে যে-ব্যক্তি তাঁর মতামত সাধারণ্যে প্রকাশ বেন তার জন্য প্রয়োজন হ'লে তাঁকে (লেখককে) জবাবদিহী করতে হবে, এবং তাঁর লেখার জন্য তাঁর সম্মান এবং পদ-মর্য্যাদা (যদি কিছু থাকে) থাকবে দায়ী। সাধারণের কাছে লেখকের সম্মান এবং মর্য্যাদা যদি কিছু না থাকে তাহলে তাঁর নামের দ্বারাই তাঁর রচনার গুরুত্ব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে,—পাঠক সমাজ তাঁর কথার কোন মূল্যই প্রদান করবে না। এমনি ক'রে, সংবাদ-পত্রের অনেক অযথা মিথ্যা অপসারিত হবে, অনেক বিষাক্ত জিহ্বার স্পর্দ্ধিত গতি হবে রুদ্ধ।*

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

* শোপেনহাওয়ারের সাহিত্যিক মতবাদ অবলম্বনে রচিত।

ইরাণী

শ্রীযুক্ত গোপাললাল দে বি-এ

উত্তপ্ত মাধবী দিবা দিগন্তরে পুষ্ট শ্যামলিখা,
অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বসিয়া কামনার জ্বলে বহ্নিশিখা;
প্রভাত হইতে ফিরি, হেরি রূপমৃগতৃষা তার,
সরে যায় দূরে দূরে; হায়, জ্বালা কোথা জুড়াবার!

এমনি নিদাঘ বেলা সুনিভৃত পল্লীশ্যামাঞ্চলে,
একখানি ধ্যানপূত শান্ত শুদ্ধ কক্ষশিলা তলে,
বায়ু ঝুরে ঝিরি ঝিরি বনান্তের বহি সমাচার,
আরাত্রিক শঙ্খসম আসে পিক-কণ্ঠ-সুধাসার।

কুটজের গন্ধ পশে বাতায়ন মুক্ত পথ দিয়ে,
একটি ভ্রমর উড়ে কর্ণান্তিকে সুসংবাদ নিয়ে,
ধূপের ধোঁওয়ার মত প্রেয়সীর সুরভি নিশ্বাস,
হাওয়াখানি ছেয়ে আছে একখানি অনুরাগবাস।

নয়ন সম্মুখে হেরি কিশোরীর বয়োসন্ধিক্ষণ,
অন্তরে প্রেয়সীবক্ষে অকস্মাৎ মুরছিল মন।

শ্রীগোপাললাল দে

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা

শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত, এম্-এ

এ কথা কেউই অস্বীকার কত্তে পারবেন না যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির রূপ তাঁকে যে ভাবে মুগ্ধ করেছে জগতের অন্য কোন কবিকে কোন দিন সে ভাবে মুগ্ধ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। প্রকৃতির ক্রোড়েই তিনি একরূপ লালিতপালিত বর্দ্ধিত। প্রকৃতির কাছ থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁর জীবনকে, তাঁর কাব্যকে, তাঁর দর্শনকে আনন্দময় করেছে;—আনন্দ থেকেই এই জগতের উৎপত্তি—উপনিষদের এই বাণীর সত্যতা কবি উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের মধ্যে দিয়ে। জগৎময় ছড়ান এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য সেই অনন্ত আনন্দের বিকাশ রূপেই কবির চোখে প্রতিভাত হয়েছে।

প্রকৃতির অনন্তরূপ,—সেই অনন্ত রূপেই সে আমাদের কবিকে ভুলিয়েছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্রি—প্রকৃতির এমন কোন রূপ, এমন কোন অবস্থার নাম করা যেতে পারে না যা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন নি। তথাপি একথা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে তিনি বিশেষ ভাবে বর্ষার কবি। প্রকৃতির বর্ষারূপই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। বর্ষার আগমনে তিনি একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন, বর্ষার গানে তাঁর হৃদয়ে গান উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথের বর্ষার সম্বন্ধীয় কবিতায় যত রস ফুটে ওঠে জগতের অন্য কোন কবি বর্ষার কবিতা লিখে অত রস ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষা সম্বন্ধে যত কবিতা লিখেছেন আমার মনে হয় তার মধ্যে "আষাঢ়" কবিতাটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই আষাঢ় কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের তথা বিশ্বসাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে সমান আসন পাবার যোগ্য। অথচ এ কবিতায় কোন উচ্চভাব নেই, ভাষা উপমা অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারহীন নিতান্ত সহজ সরল। এই নিরলঙ্কার সরল সহজ ভাষার মধ্যে দিয়ে পল্লিগ্রামের বর্ষা-সন্ধ্যার একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে,—আর সে ছবি কি অপরূপ রূপ-মূর্ত্তিতে আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটে উঠেছে! এই আষাঢ় কবিতাটীর মধ্যে বর্ষা-প্রকৃতির যেরূপ একটী সমগ্ররূপ আমরা দেখ্‌তে পাই রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন বর্ষার কবিতায় সেরূপ একটি অখণ্ড রসরূপ আমাদের চোখে পড়ে না।

এমন অনেক সমালোচক আছেন ভাব ও রসের পার্থক্য সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা পরিষ্কার নয়। তাঁরা মনে করেন উচ্চ ভাব না থাক্‌লে কবিতা কখনও উচ্চ অঙ্গের হতে পারে না। এ কথা তাঁরা ভুলে যান যে রসই কাব্যের প্রাণ, ভাব নয়। ভাব কাব্যের বিষয়বস্তু হয় তখনই যখন তা কবির অনুভূতির আগুনে গলে রস-রূপ ধারণ করে। শুধু ভাবই যদি কাব্যের বিষয়বস্তু হত তা হলে দার্শনিক ও কবির মধ্যে কোন পার্থক্য থাক্‌ত না। কিন্তু আমরা জানি দার্শনিক ও কবি দুই বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। অলঙ্কারহীন নিতান্ত সহজ সরল ভাষার সাহায্যে কোন রকম উচ্চ ভাবহীন নিতান্ত সামান্য বিষয় নিয়ে কী গভীর রস ফুটিয়ে তোলা সম্ভব এই আষাঢ় কবিতাটীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লিখবার সময়কার কবির মানসিক অবস্থা অনুযায়ী কাব্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়।—কতকগুলি কাব্য সচেতন অবস্থায়, সজ্ঞানে, ধীর শান্তভাবে লেখা; আর কতকগুলি আবেগের আতিশয্যে তন্ময় অবস্থায় লেখা। এই দুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কাব্যের বিশেষত্ব কি, কোন্ শ্রেণীর কাব্য শ্রেষ্ঠ, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মূলতঃ জাতিগত কি মাত্রাগত এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আজ আমি করতে চাই না। আজ আমার বল্‌বার কথা শুধু এই

আষাঢ় কবিতাটি উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের অন্তর্গত। পড়লেই মনে হয় কবি বর্ষা-সন্ধ্যার রূপ ধ্যান করতে করতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন,—সেই অবস্থায় স্বতঃই তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাটি বেরিয়েছে, কলম ধরে লিখবার ক্ষমতাও বোধ হয় তখন তাঁর ছিল না।—

"এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু পোহালে।"—রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষেও সজ্ঞানে এরকম লাইন লেখা সম্ভব নয়।

আষাঢ় কবিতাটার প্রশংসা লিখতে গিয়ে আমার পক্ষে লেখনী সংযত করা শক্ত। কবিতাটার প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে এত অফুরন্ত রস যে এর কোন একটা অংশ বেছে নিয়ে বিশেষ ভাবে তার প্রশংসা করা চলে না। তথাপি কবিতাটার কিছু খানিকটা অংশ উদ্ধৃত না করলে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই কএকটি লাইন উদ্ধৃত কচ্ছি—

"ওই ডাকে শোন ধেনু ঘন ঘন
ধবলীরে আন গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি ?
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজ খোয়ালে ;
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে॥
শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে ?
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দর দর বেগে জলে পড়ি' জল
ছল ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥"

বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনা কোথায় জানি না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত

জামাইবাবু

শ্রীযুক্ত সতীনাথ ভাদুড়ী এম্‌-এ

১

মেজদির বিয়ে। বেশ মনে আছে; দিব্যি নাদুস নুদুস বর। মণিদি ব'ল্‌লো "বাব্‌বা! কি মোটা!" ছোট পিসিমা মেয়ের দোষ ঢেকে নিয়ে ব'ল্লেন, "জমিদার মানুষ, ক্ষীর দুধ খেয়ে মানুষ ।"

ডেঁপো ব'লে পাড়ার একটা অখ্যাতি ছিল। তাই জন্যেই বোধহয় ঐ অল্পবয়সেও বুঝতে পেরেছিলাম যে জামাই-বাবুর রুচি আর কথাবার্ত্তা বিশেষ মার্জ্জিত নয়। বড়দির সঙ্গে গল্প ক'রছিলেন "ব্রহ্মচারী থাকবো ব'লেই ঠিক ক'রে ছিলাম। আর লোকে যা মনে করে সবই যদি ক'রতে পারতো তা হ'লেতো কথাই ছিলনা·· ।"

২

মেজদিকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হ'লোনা। মা চব্বিশ ঘণ্টাই মেজদির উপর চ'টে আছেন। লজ্জায় তার নাকি আর দশজনের কাছে মুখ দেখানোর জো নেই। মেজদিরও আবার রাগ্‌লে জ্ঞান থাকেনা বলেন "আমি তো আর স্বয়ম্বরা হ'তে যাইনি।"

ওবাড়ীর জ্যাঠাইমা ঠেস্‌ দিয়ে বলেন "আসছে পূজোর বোধ হয় নিয়ে যাবে!"

মেজদি আমাদের কাছে শ্বশুর বাড়ীর কত গল্প করেন—বিয়ের প'রে গিয়ে এক সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ী ছিলেন কিনা। বাবা খোঁজ ক'রে জান্‌লেন জামাইয়ের জমিদারীর আয় বছরে চুরাশি টাকা; আর সম্পত্তির মধ্যে আছে এক প্রকাণ্ড জরাজীর্ণ বাড়ীর দুখানি ঘর।

৩

জামাইবাবু আমাদের বাড়ীতেই চ'লে এলেন—"শ্বশুর মশায়ের একটু ইয়ে influence আছে কিনা, যদি একটু চেষ্টা টেষ্টা করেন · ···

চাকরীও হ'লো।

কিছুদিন পরে চাকরকে ডেকে বলেন "আরে মঙ্গলু, আমার বিছানা আমি যে ঘরটায় শুই, তার পাশের ছোট খালি ঘরটায় ক'রে দিস্‌। আর দেখিস্‌ মাঝের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিস্‌"। বড়দির কাছে বলেন "আমি আগেই ব'লেছিলাম বিয়ে করা ইচ্ছে·ছিলনা"। পাড়ার বন্ধু নিলয় বাবুর কাছে বলেন "বৌটা কি ছিঁচকাঁদুনে, দাদা।". তবু পর পর তিনটী মেয়ে হয়।

মেজদার কাছে অযাচিত কৈফিয়ৎ দেন—"আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটু শিক্ষা দীক্ষার দরকার; নইলে পুরুষ মানুষ নিজের যা ইচ্ছে তা ক'রতে পারেনা"।

৪

গত কয় বছরের নিয়ম মত এবারেও মেজদির সময় এলো। লেডী ডাক্তার ব'ললেন "weak constitution, কি হয় বলা যায় না"।

হ'লোও তাই।

ও বাড়ীর জ্যাঠাইমা বল্লেন "বেশ গিয়েছে: নোয়া সিঁদুর নিয়ে যাওয়া কজনের ভাগ্যে ঘটে। এই দেখোনা..." ব'লে লম্বা নামের ফর্দ্দ আওড়িয়ে গেলেন। মা মেয়ে তিনটীকে দেখিয়ে বলেন "ম'রেও শান্তি দিলো না—হাড়ে দুর্ব্বা গজিয়ে রেখে গ্যালো"। জামাইবাবু মেয়েদের বাঁশী কিনে দিলেন।

আমার ছোটবোন টুলু ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে ব'সে কাঁদচে আর মাকে কি সব যেন ব'লচে।

যেতেই মা বলেন "তোরা যানা, তোরা এখানে কি ক'চ্ছিস"? পরে শুনলাম টুলু বুড়ীকে কোলে ক'রে ... কোণের ঘরে ব'সে আচার খাচ্ছিলো, তখন জামাই সেখানে গিয়ে কি সব "ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ডু" ব'লেচেন। ও তাই ছুটে ভাঁড়ার ঘরে পালিয়ে এসেচে।

মা বলেন "কাউকে যেন ব'লিস না। তোদের আবার যা সব মুখ আল্‌গা - কি ঘেন্না ·"

৬

শুনলাম জামাইবাবু রেলে বড় চাকরী পেয়েছেন। পান চিবুতে চিবুতে রামকেষ্ট ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করেন। তারপর মা আর বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে ঠেকিয়ে গাড়ীতে চ'ড়ে বসেন। বুড়ী, আর নেড়ী, বায়না ধরে বাবার সঙ্গে গাড়ীতে চ'ড়বে। বুলু বলে "বাবা আমার জন্যে একটা এত্তো বড় পুতুল এনো"। মা তাড়া দেন এখন পেছু ডাকিস না।

৭

কিছুদিন পরে আবার জামাইবাবুকে বাজারে দেখি, দূর থেকে। আমাকে যেন দেখেও দেখেন না।

নিলয়বাবু বলেন "বেশ দিয়েচে থুয়েচে—চুয়োডাঙ্গায় বিয়ে ক'রে এলো কিনা। মেসে এসে উঠেচে"। রেলের চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে আর সাহসে কুলোয় না।

মাকে এসে বলি।

মা বুড়াকে বুকে চেপে ধরেন। নেড়ী বলে "বুলু বড় দুষ্টু, না দিদিমা? বাবা পুতুল আন্‌লে আর কাউকে দেবোনা—খালি খালি আমি-ই আর তুমি-ই,—না দিদিমা"? মায়েরচোখ জলে ভ'রে ওঠে। আজ আর মা ওদের উপর রাগ করেন না।

শ্রীসতী নাথ ভা

ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ

শ্রীমতী ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ্‌ এম্‌-এ, পি-এচ্‌-ডি

নৃত্যকলা যে জানে না, সে না জানে সঙ্গীত, না জানে ভাস্কর্য্য, না জানে চিত্রাঙ্কন। প্রাচীন ভারতের পুঁথিতে এ কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে,—যে, সব রকম সৌন্দর্য্য-প্রকাশের মূলে হ'চ্চে নৃত্যকলা। এই গভীর কথাটি মানুষ অনেক দিন ভুলেছিল, আর তারই ফলে ভারতীয় নৃত্যকলা হারিয়েছিল তার বিশেষত্ব ও মর্য্যাদা, এবং সমগ্রভাবে ভারতীয় শিল্পই মোটের উপর অর্থহীন ও প্রাণহীন হ'য়ে পড়ছিল।

আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিলাভের উপায় ও যন্ত্র হিসাবে শরীরটাকে তৈরী করে নেবার একটা বিধিবদ্ধ-প্রণালী প্রাচীন ঋষিরা উদ্ভাবন করেছিলেন। সারা ভারতময় যোগীরা এই প্রণালীর প্রয়োগ আজও করে থাকেন। তেমনি, অপর পক্ষে,—যে আত্ম-প্রকাশের মূলে সৃষ্টির অনুপ্রেরণা, তারও উপায় ও যন্ত্রহিসাবে দেহটাকে তৈরী করে নেবার বিধিবদ্ধ প্রণালী প্রাচীনকালের জ্ঞানী-গুণীরা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে দেহ-সৃষ্টি ও পরিচালনার যে মূলমন্ত্র, তা' দেহটাকে শিখিয়ে তৈরী করে নেবার সমস্ত চেষ্টার চেয়েই বড়া; তাঁরা জান্‌তেন যে নটরাজ শিবই সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্য্যন্ত তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটি চলনায় জীবনের প্রতিটি অনন্ত মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করছেন, বিকাশ করছেন, আবার বিনাশ করছেন। এমন কি মানব-দেহের মধ্যেই বিকশিত যে নৃত্যকলা, তা'ও দেহের মধ্যে, আকাশের মধ্যে এবং দর্শকের হৃদয়ের মধ্যে সেই আদিম অঙ্গ-চালনার স্পন্দন জাগাতে পারে, যা' চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারাকে আপন আপন সুনির্দ্দিষ্ট পথে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবন্ত বস্তুকেই জন্ম-যৌবন-জরা-মৃত্যু ও পুনর্জন্মের সুনিয়ন্ত্রিত পরম্পরার মধ্যে বিধৃত করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথ এ দেশে নৃত্যকলাকে পুনঃসঞ্জীবিত করছেন। ধ্বনি, বাক্য, রেখা-রঙের যা কিছু প্রকাশ-ধর্ম্ম সমস্তই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তাঁর জয়যাত্রার তিনি সৃষ্টি-পথের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করেছেন,—এখন আমাদের সকলকে দেখাচ্চেন, কোথায় সৃষ্টির সুরু। এ দেখায় অসীম আনন্দ; কেন-না সকল শিল্পের শিল্প যে নৃত্যকলা,—তা' প্রত্যেক মানুষকেই গভীরভাবে নাড়া দেয়, যদি না সে মানুষ মৃত অতীতের সংস্কারের চাপে অন্ধ হ'য়ে থাকে। শিল্প-কলার সুবিচার করা সহজ নয়,—নাট্য-কলা, স্থাপত্য-কলা প্রভৃতি জটিলতর কলার কথা ছেড়ে দিলেও, একটা সামান্য ছবিকে তার সকল দিক দিয়ে, কিম্বা একটা সঙ্গীতকে তার সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতটুকু ধরে বিচার করতে তাঁরাই পারেন, যাঁরা অধিকারী। তবুও হাঁটতে শেখ্‌বার আগেই নৃত্য করতে সুরু করে এমন ছেলেও আছে। এবং যে সভ্যতা আশ্রয় করে মানুষ বেঁচে থাকে এবং যা' নিয়ে বেঁচে থাকে তা-ই প্রকাশ করে, সেই সভ্যতার মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের বড়ো বড়ো মুহূর্ত্তগুলির সাধনা ছন্দোবদ্ধ অঙ্গ-ভঙ্গিতেই তরজামা করা হ'য়ে থাকে। সকল সভ্যজাতির অগ্রণী এই ভারতবর্ষ শুধু যে নৃত্য-কলার মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেছিল এবং নৃত্য-চর্চ্চাকে একটা বিজ্ঞান করে তুলেছিল,—তা-ই নয়, অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বিস্মৃত হয় নি,—যে মানব-দেহ ছাড়া আর যা-কিছু,—ধ্বনি, রঙ, ইত্যাদি,—সৃষ্টি ক্রিয়ার উপকরণ হ'তে পারে,—তাদের সকলকেই এই নৃত্য-কলার নিয়মই অবলম্বন করতে হয়।

কিন্তু এই কলিযুগে অন্তরাত্মার বাণীর প্রতি মানুষ বধির হ'য়ে গিয়েছে; মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগের কৃত্রিম লজ্জাশীলতায়

ভ্রান্ত ধারণা ভারতবর্ষেরও কিছু ক্ষতি করেছে; তাই নৃত্য যে কী নয়,—কোন্ জিনিষের প্রতি যে তার লক্ষ্য নেই,—সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা আগে বলা প্রয়োজন; তবেই বোঝা যাবে ভারতীয় নৃত্যকলা কী,—এবং বর্ত্তমানে তার সম্ভাব্যতা কতদূর। শুধুই সুষ্ঠু গতি-কৌশল প্রদর্শন করাটা নৃত্যকলার উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র গতিশীল দেহের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নৃত্যকলা চায় না। পোষ্টকার্ডের চিত্র-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নৃত্যের কোনোই সম্পর্ক নেই। ব্যাধির মত যে-সব যৌন-বৃত্তি সমস্ত দৃশ্যবস্তুকে বিকৃত করে চোখের ওপর চেপে বসে তার নির্নিমেষ কলুষ-দৃষ্টিকে বিহ্বল করে রাখে,—সেই সব কু-বৃত্তিগুলোকে দূর করে দিতে হ'বে,—তাদের নাগালের বাইরে যা' কিছু তাকে যেন তারা অপবিত্র করতে না পারে। হাত-পা কিম্বা দেহের কোনো বিশেষ অঙ্গ নাচের আশ্রয় নয়; সমস্ত শরীরটাই,—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত, তার যন্ত্র। গ্রীবার ভঙ্গিমার মধ্যে যতখানি প্রকাশ-ধর্ম্ম আছে,—চোখের চাউনির মধ্যেও ততখানিই আছে; কিন্তু তাদের আলাদা করে দেখ্‌লে কারও বিচ্ছিন্ন বাণীরই আর কোনো মানে থাকে না। প্রত্যেকটি সুরের মধ্যে যেমন সমস্ত বীণাখানি ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে, তেমনি ছন্দোবদ্ধ গতির যন্ত্র-হিসাবে সমস্ত দেহখানাই অন্তরাত্মার অন্তরতম স্পন্দনে সচকিত হ'য়ে সাড়া দেয়। অন্তরাত্মার এই যে স্পন্দন,—এর অন্য কোনো নাম দেওয়া যায় না। কেন-না এ দুঃখের অতীত, সুখের অতীত, আনন্দের অতীত,—যে কোন আবেগেরই অতীত, যদিও তা' সকল আবেগেরই আধার,—অথবা সেই জন্যই সকল আবেগের অতীত। যে গান কানে শোনা যায় না অথচ কেউ কেউ শুন্‌তে পান তারায় তারায় সঙ্গতির মধ্যে, অন্যেরা তাই শোনেন আপনারই অন্তরের মধ্যে;—আবার কেউ কেউ অন্তরের মধ্যে এই গান শুন্‌তে শুন্‌তে সেই সুরে তাঁ'দের সমস্ত দেহখানা সমর্পণ করে ফেলেন,—এঁ'রাই হ'লেন আজন্ম নৃত্য-শিল্পী।

ভারতবর্ষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নমনীয়তা ও মর্ম্মস্পর্শী পরিচালনা প্রায়ই দেখা যায় যে-কোনো গ্রামের পথে ঘাটে মাঠে। যন্ত্রটায় এখনো মরচে ধরেনি, কিন্তু তার সঙ্গীত তন্দ্রাচ্ছন্ন। কোনো কোনো জায়গায় বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে অতীতের একটা বৃহৎ সংস্কারের প্রচলিত প্রথাগুলির পরিচয় এখনো পাওয়া যায় বহু নর্ত্তকের শরীরের মধ্যে। অথচ অঙ্গ-চালনার প্রকৃত মর্ম্ম যে কী, তার একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান কারো মধ্যে বড়-একটা দেখা যায় না। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত গীত-উৎসবের একজন দক্ষিণ-ভারতীয় নর্ত্তকের মধ্যে এই কথাটির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। দেখা গেল উদার অঙ্গ-ভঙ্গিমা,—ভয়ঙ্কর মহিমায় মণ্ডিত—বংশ-পরম্পরায় বহু চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতার ফল;—সমস্তটা কিন্তু যেন একটা শূন্যতার

অর্চ্চনা;—দেহ অসাধারণ সুগঠিত, গড়নের প্রত্যেকটি বাঁক একেবারে নিখুঁত, তবুও যেন অন্তঃসারশূন্য, অন্তত সার থাক্‌লেও এত কম যে দেহের সীমার মধ্যে দেহাতীতের আভাস ফুটে ওঠে না। তথাপি মনে হয় এইখান থেকেই ভারতীয় নৃত্যকলার পুনরুদ্বোধন সুরু হ'বে; দেহের এই সুরক্ষিত রূপের মধ্যে প্রাণ আবার জেগে উঠ্‌তে পারে যদি একবার এমন কেউ সেই রূপটাকে আয়ত্ত করতে পারেন, যাঁর হৃদয় অমর নটরাজের নৃত্যে স্পন্দমান। দেহের সঙ্গে প্রাণের, রূপের সঙ্গে অরূপের এই মিলনে বাংলাদেশেই ভারতীয় নৃত্যকলা নবজন্ম লাভ করবে। এই প্রসঙ্গে উদয় শঙ্করের নাম করা যেতে পারে, আর গীত-উৎসবের শিল্পীদের

মধ্যে একজন ছাত্রীর। নৃত্যের কলা-কৌশল শেখা এই সবে তার আরম্ভ কিন্তু তার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি অন্তরাত্মার স্পর্শে প্রাণবান্।

অপরপক্ষে, একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করবার—যে কত শীঘ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এরই মধ্যে অতীতের ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছে। কী আশ্চর্য্য শক্তি তাদের দেহের, যা' একটা প্রাচীন জাতির অতীত স্মৃতিকে এমনি ক'রে সঞ্জীবিত রাখ্‌তে পারে,—দেহ দিয়ে যা' প্রকাশ করা হয়, অপরিণত মনের মধ্যে তার কোনো সাড়া পাওয়া না গেলেও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন তরুণ ছাত্র মাত্র দু' মাস শিক্ষার ফলে ছন্দের কাছে তার দেহটাকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পেরেছে,—যদিও তার মুখমণ্ডলের মধ্যে না আছে কোনো গতি, না আছে কোনো অর্থ। তার দেহের মধ্যে এই যে বাণী প্রতীক্ষা করে আছে,—তার মন একদিন তা' শুন্‌বে নিশ্চয়ই।

দেহটা যে আত্মপ্রকাশের এত সুন্দর উপায়, এ কথা মানুষ এতদিন ভুলেছিল; অনেক ভুল-বোঝা, ঈর্ষা-দ্বেষের বড়জাল ভেঙে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে মানুষকে তার এমন অপরূপ দেহটাকে ফিরিয়ে দেওয়া,—এদেশে রবীন্দ্রনাথই একাজ করেছেন।

ভারতীয় নৃত্যকলার ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কোনো অবসরই নেই। আপাতত অবশ্য বলা যেতে পারে যে পাশ্চাত্য শৃঙ্খলাটা প্রথম শেখার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যকলার যে রূপ ও প্রাণ, পাশ্চাত্য শৃঙ্খলার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই; তবে অঙ্গচালনা একেবারে অভ্রান্ত করতে এবং চিত্তের যে কোনো আবেগ তখনি তখনি ফুটিয়ে তুলতে অবশ্য তা' সহায়তা করে। শ্রেণীবদ্ধ নৃত্যের প্রবর্ত্তনাতে ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত আছে। একজনে যা' ঠিক ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেনা, শ্রেণীর বৃহত্তর ঐক্যের ভিতর নর্ত্তকে নর্ত্তকে সংক্রামিত হ'য়ে তা' ফুটে উঠ্‌তে পারে। ভারতীয় নৃত্যকলার যে প্রকৃতি ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে চায় তার ঝোঁকটা এই দিকে। অতীতে এই চেষ্টা কখনো করা হয় নি, ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ অবিমিশ্রিত সুর সঙ্গতের সঙ্গে মিলে যাবে।

গীতি-উৎসবে দেখানো হয়েছিলো,—নৃত্যের বিভিন্ন অঙ্গ,—প্রকাশ ও গতি, গতি ও রঙ, রঙ ও আলো,—আবার প্রকাশ ও ধ্বনি, বাক্য প্রকাশ ও গতি কেমন করে পরস্পর-সম্বদ্ধ হ'য়ে একে অপরকে টেনে আনে। এই রকম সব অনুষ্ঠানের যে শিক্ষা তা' গ্রহণ না করলে ভারতের বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের ইতরতা থেকে মুক্তিলাভের আশা নেই। শুধুই রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ নয়,—ভারতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ এবং শিল্পের মধ্যে তার সার্থকতা নির্ভর করছে কত শীঘ্র দেশ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই প্রেরণা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে,—তারই উপর। *

* অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে ইংরেজী হইতে অনুদিত।
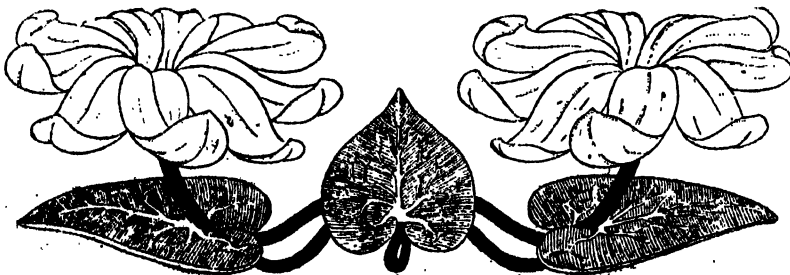
বিবিধ সংগ্রহ

বাহাদুরীর মোহ—পাশ্চাত্য জাতির জীবনীশক্তি যে কতখানি প্রবল তার পরিচয় আমরা নিত্য নানা ভাবে পাই। এদের জীবনীশক্তি প্রচুর বলে তার প্রকাশ হয় নানা ভাবে আর তার ফলে নানা বিচিত্র ঘটনার এবং খবরেরও সৃষ্টি হয়। নীচে কয়েকটি খবর দেওয়া গেল—তাই থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

——

(ক) **ডান্‌পিটে**ঃ—মিঃ স্যাম্‌লী বলে একজন ভদ্রলোক হচ্ছেন বিলেতে ডানপিটের রাজা। ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে যখন কোন রোমহর্ষক এবং বিপজ্জনক কাজের ছবি তোলার দরকার হয়, তখন ইনি ভারী কাজে লাগেন। মাত্র পাঁচ ছয় গিনি দক্ষিণা পেলেই ইনি এমন সব দুঃসাহসিক কাজ করেন যা' শুন্‌লে চম্‌কে যেতে হয়। চলন্ত ট্রেণ থেকে ওঠা নামা করা—খুব উঁচু জায়গা থেকে চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে পড়া—খুব জোরে চল্‌ছে এমন দু'খানা গাড়ীর ওপর একটা থেকে আর একটায় লাফালাফি করা এসব তাঁর কাছে নেহাৎ ছেলেখেলা। তিনি আজ পর্য্যন্ত যত রকম দুঃসাহসিক কাজ করেছেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ৯৮০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৮০ তালা উঁচু ঈফেল টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়া।

মিঃ স্যাম্‌লী বলেন—ছেলেবেলা থেকে আমি এই রকম ডান্‌পিটেমী না করে পারি না। এর জন্যে আমায় ভুগতেও হয়েছে বিস্তর, এমনকি কয়েকবার পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে জরিমানা পর্য্যন্ত করেছে। কিন্তু তবু স্বভাব আমার বদলায় নি।

মিঃ স্যামলীর মতন এই ধরণের দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে ওদেশের লোকরা যে বিপদে পড়ে না তা নয়। যেমন ধরুন—এরোপ্লেনের নানা রকম কসরৎ দেখানো। নোয়েল আর্থার আয়ার্ল্যাণ্ড, বলে একটি ২২ বছরের ছেলে ওখানকার একজন নামকরা Pilot Officer ছিলেন। কতকগুলি দর্শকের সাম্‌নে এরোপ্লেন শুদ্ধ শূন্যে ডিগবাজী খাওয়া দেখাতে গিয়ে ঘটনাচক্রে ভদ্রলোক সম্প্রতি প্রাণ হারিয়েছেন। ইনি একজন ওস্তাদ এরোপ্লেন চালক ছিলেন এবং এঁর খুব শীঘ্রই একখানি দ্রুতগামী এরোপ্লেন চালাবার আশা ছিল। কিন্তু তার আগেই এই দুর্ঘটনা হোল। শুধু এই একটি নয় এই বছরেই এই নিয়ে সবশুদ্ধ ৩২টী এই রকম শোচনীয় এরোপ্লেন-দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এবং ২৫ জন বিখ্যাত বিমান-চালকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এতেও ওখানকার লোকেরা নিরুৎসাহ হন না। এই সে দিনই Flight Lt. Stainforth এরোপ্লেনের কত রকম দুঃসাহসিক কসরৎ দেখিয়ে এবং ঘণ্টায় ৪১৫ মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে সকলকে কি রকম বিস্মিত করে দিয়েছেন এবং নিজে মারা যেতে যেতে কি রকম ভাবে বেঁচে গেছলেন সে কথা সকলেই জানেন। সহস্র বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দেবার নেশায় পাশ্চাত্য জগতের লোকরা একেবারে মশগুল্।

সেই জন্যে ওদেশের সবাই যে কোন কৃতিত্বপূর্ণ কাজের রেকর্ড ভেঙ্গে নিজে নতুন রেকর্ড রাখবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন। বিখ্যাত Motor চালক Major Segrave মোটরকারের speed record রাখতে গিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে কি রকম শোচনীয় ভাবে মারা যান সেকথা সকলে জানেন। কিন্তু তারপরেও এ-বিষয়ে উৎসাহী লোকের অভাব ঘটেনি।

এই রকম চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে ব্রিটেনই প্রায় সর্ব্বরকমের speed record গুলি রেখে যথেষ্ট বাহাদুরী অর্জ্জন করেছে। বিভিন্ন বিভাগে Britainএর স্থাপিত speed recordএর পরিচয় এইবার দিচ্ছি। সম্প্রতি Flight Lt Stainforth গড়ে ঘণ্টায় ৪০৮ মাইল বেগে এরোপ্লেন

চালিয়ে জগতে দ্রুত এরোপ্লেন চালনার রেকর্ড রেখেছেন। ইনি কিছুক্ষণের জন্যে ঘণ্টায় ৪১৫'২ মাইল বেগেও এরোপ্লেন চালিয়েছেন। তারপর Sir Malcolm Campbell মোটরকার চালানোর রেকর্ড রেখেছেন ঘণ্টায় ১৪৬'৯ মাইল বেগে মোটর চালিয়ে!

মোটর বোট চালানোতে রেকর্ড রেখেছেন Mr. Kaye Don, গতি হচ্ছে ঘণ্টায় ১১০ মাইল। আর ঘণ্টায় ১৫০'৭ মাইল গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে record রেখেছেন Mr. J. S. Wright. Mr. Wright তাঁর নিজের স্থাপিত রেকর্ড ভাঙ্গবার জন্যে শীগ্‌গীর আবার মোটর সাইকেল চালাবেন। বিশেষ সুবিধে হবে বলে এবার তিনি তাঁর Motor cycle-এর কতকগুলি অংশ তৈরী হবার সময় নিজে গাড়ীর ওপর বসে নিজের শরীরের চারিদিক ঘিরে গাড়ীটিকে সুবিধা জনক ভাবে তৈরী করিয়ে নিয়েছেন।

(খ) **৯ দিনে পৃথিবী ভ্রমণ**ঃ—ফরাসী ঔপন্যাসিক Jules Verne ৮০ দিনে পৃথিবী ভ্রমণের কল্পনা করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর সে কল্পনাকে পরাজিত করে ৯ দিনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন দু' জন ভদ্রলোক উড়ো জাহাজে চড়ে। উড়োজাহাজ চালানোর বিপদ বেশী, মৃত্যুর আশঙ্কা পদে পদে, কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত যানের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে আকাশযানগুলি। আকাশযান চালনায় কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে ইউরোপের সমস্ত জাত বর্ত্তমানে এক রকম ক্ষেপে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং এই সমস্ত দেখে মনে হয় যে কিছুদিন পরে যদি আবার কোন যুদ্ধ অনিবার্য্য হয় তা হ'লে এবারের যুদ্ধ আকাশের ওপরেই চলবে, এবং মর্ত্তের মানুষরা নিতান্ত অসহায় হোয়ে তাদের দুর্গের মধ্যে লুকিয়েও পরিত্রাণ পাবে না। উড়োজাহাজ চালাতে গেলে কষ্ট সহিষ্ণুতা, অদম্য সাহস ও ধৈর্য্যের প্রভূত প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্ব্বে Winnie May ব'লে একখানি উড়োজাহাজে চ'ড়ে মিঃ Wiley Post এবং মিঃ Gatty, দু'জন এমেরিকান, সারা পৃথিবী ৮ দিন, ১৫ ঘণ্টা, ৫১ মিনিটের মধ্যে ঘুরে এসেছেন। মিঃ পোষ্টের বয়েস ৩৫ বছর এবং তাঁর সহকারীর বয়স ৩০ বছর। যে উড়োজাহাজটি ক'রে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন সেটি বহুবার এই রকম নানা বিজয় যাত্রায় বেরিয়ে অনেকের গলায় জয়মাল্য দুলিয়ে দিয়েছে। মিঃ Post এবং মিঃ Gatty, উভয়ে যে গতিতে এবং যে সময়ের মধ্যে উড়োজাহাজ চালিয়ে ফিরে এসেছেন সে রকম আর কেউ এ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। আটলান্টিক মহাসাগরে একবারও না থেমে তাঁরা একাদিক্রমে ঘণ্টায় ১৪৫ মাইল বেগে উড়োজাহাজ পরিচালনা করেন। জার্ম্মাণীর গ্রাফ্ জেপ্‌লিনও এর তুলনায় গতিতে পিছিয়ে গেছে। সবশুদ্ধ্ তাঁরা ১৬,০০০ মাইল এই সময়ের মধ্যে ঘুরে এসেছেন। এ পর্য্যন্ত ৯ দিনের মধ্যে এতখানি পথ ঘণ্টায় ১৪৭ মাইল বেগে একাদিক্রমে উড়োজাহাজ চালিয়ে কোন লোকই এরূপ সাফল্য অর্জ্জন করেন নি।

(গ) SCHNIEDER TROPHY রেস :—বিলেতে উড়োজাহাজ কত জোরে কে চালাতে পারে এই নিয়ে সেদিন একটা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা হ'য়ে গেল। Schieder Trophy Race-এ Lt J. N Boothman প্রথম হ'য়েছেন। তিনি ঘণ্টায় ৩৪২'৯ মাইল গতিতে উড়োজাহাজ চালিয়েছিলেন। এত জোরে চালিয়ে তিনি অনেকক্ষণ চোখে ভাল ক'রে দেখতে পান নি। এক মিনিটে ৬ মাইলও মাঝে মাঝে তার উড়োজাহাজ চলছিল। এর পরে Lt Stainforth ঘণ্টায় ৩৮৩ মাইলের কিছু ওপরে ভীষণ গতিতে এরোপ্লেন চালিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। (এই ভদ্রলোকই ঘণ্টায় ৪১৫ মাইল গতিতে এরোপ্লেন চালিয়ে পৃথিবীতে সব চেয়ে দ্রুত এরোপ্লেন চালকের রেকর্ড রেখেছেন) এঁরা যখন এরোপ্লেন চালাচ্ছিলেন তখন এঁদের এরোপ্লেন ঠিক উল্কার গতিতে ছুটে চলেছিল এই রকম সকলের মনে হচ্ছিল। Lt Stainforth উড়োজাহাজ চালিয়ে পরে একটি সামুদ্রিক বিমানপোত চালাতে গিয়ে কিন্তু অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হ'য়েছিলেন। হঠাৎ কল বিগ্‌ড়ে গিয়ে তার বিমানপোতটি কি রকম উল্টে যায়—ফলে কোন রকমে মৃত্যুর হাত থেকে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। জীবন ও মৃত্যুকে এমনি তুচ্ছ যারা

করতে পারে তারাই জগতের মধ্যে প্রবলতম জাত হ'য়ে ওঠে। প্রতি বছরে এই এরোপ্লেন দৌড়ের প্রতিযোগিতার জন্যে ব্রিটেনের প্রতি বৎসর অনেক টাকা খরচ হয়। এই Schnieder Trophy প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'য়ে অবধি, ১৯২৬ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত, এই জন্যে ব্রিটেনের প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হ'য়ে গিয়েছে। বিলেতের টাইমস্ পত্রিকা বলেন যে এ টাকা খরচের সার্থকতা আছে, কারণ এতে ব্রিটীশ জাতের কদর সারা জগতে হয়, নতুন নতুন নানা ধরণের এরোপ্লেনের আবিষ্কার এই থেকেই সম্ভব, অভিজ্ঞতার সাহায্যে কলকব্জা আরও কার্য্যোপযোগী হয় এবং এর কৃতকার্য্যতার ফলে বাইরের লোকদের কাছে উড়োজাহাজ তৈরী করবার অর্ডারও খুব পাওয়া যায়—ফলে দেশের বাণিজ্যের অবশ্যম্ভাবী শ্রীবৃদ্ধি হ'য়ে থাকে।

(ঘ) গিরি অভিযান ঃ—সুদূর জার্ম্মাণী থেকে প্রতি গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করবার জন্যে একদল লোক আসেন ভারতবর্ষে—এবারেও একদল এসেছিলেন। পর্ব্বত অভিযান করা অনেকের একটা সখ। আল্‌পস্ পর্ব্বতের দুরারোহে ম্যাটারহর্ণ গিরিশৃঙ্গে ওঠার সংকল্প ক'রে বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে, হিমালয়ের সু-উচ্চ শৃঙ্গে উঠ্‌তে গিয়ে কত বিদেশী তাদের মহামূল্য প্রাণ চির-তুষারের কবলে সমাহিত ক'রে যাচ্ছে; তা' সত্ত্বেও মানুষের দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা যে অপরাজেয়কে পরাজিত করবে। আল্‌পসের ম্যাটারহর্ণ গিরিশৃঙ্গ হিমালয়ের চেয়ে উঁচু না হ'লেও সে রকম খাড়া পাহাড় জগতে খুব কমই আছে। এটি গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের চেয়ে ১০০২ ফিট্ নীচু, তা'হলেও এর উচ্চতার পরিমাণ বড় কম নয়, এটি ২০,০০০ ফিট্ উঁচু। ২০,০০০ ফিট্ উঁচু থেকেই প্রবল ঝড়, বৃষ্টি ও তুষারপাতে অভিযানকারীদের প্রাণসংশয় হ'য়ে ওঠে। এবং আরও যত ও'পরে ওঠা যায় ততই কষ্ট বেড়ে ওঠে, সময় সময় শ্বাসরোধেও অনেকের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুত Edwin Whympernামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক বহুকষ্টে কোনরকমে মৃত্যুকে এড়িয়ে এই ম্যাটারহর্ণ গিরিশৃঙ্গে উঠ্‌তে পেরেছিলেন। আজ পর্য্যন্ত আর কোন জাতির লোকই সেখানে পৌছুতে পারেন নি। কিছুদিন পূর্ব্বে ১১ জন লোক আল্‌পসের গিরি অভিযান করতে যাত্রা করেন। তাঁরা যখন ম্যাটারহর্ণের শৃঙ্গের একটু নীচে মণ্ট ব্লাঁতে পৌছলেন সেই সময় এক ভীষণ ঝড় এল। ন' দিন পরে তাঁদের কোন খোঁজখবর না পাওয়াতে একজন উদ্ধারকারী তাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকলে মৃত্যুর তুহিনস্পর্শে সেই তুষাররাজ্যে তখন চিরনির্ব্বাণ লাভ করেছেন। একটি লোকের নোট বুক পাওয়া গেল মৃত্যুর পূর্ব্বে অসহ্য কষ্টের বর্ণনা তা'তে লেখা। ঠিক এই রকম ব্যাপার গৌরীশৃঙ্গ আরোহীদের দু'জনের ভাগ্যে ঘটেছে। ইতিমধ্যে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলি। এক ১১ বছরের ইংরেজ বালিকা আল্‌পস্ পর্ব্বতে ১৫,৭৮১ ফিট্ উঁচুতে উঠেছিল। দু'বার সে এইখানে যায়। গোড়ায় ২ বার ঝড়ের বেগে বাধ্য হয়ে সে নেমে আসে, তৃতীয় বার সে মণ্ট্ ব্লাঁতে ঠিক পৌছেছিল। মেয়েটির নাম পামেলা উইল্‌কিন্‌সন্। এর পূর্ব্বে ১৮৮৯ সালে Charlie Stratton বলে আর একটি ছোট ছেলেও এখানে পৌছেছিল। তার বয়স ছিল ১১ বছর দু' মাস—মিস্ পামেলার চেয়ে সে ছিল মাত্র দু' মাসের বড়।

হিমালয়ের গিরিচূড়ায় আরোহণ ক'রে ফিরে আসতে অবশ্য আজ পর্য্যন্ত কেউই পারে নি। ১৯৩০ সালে যে অভিযানকারীরা জার্ম্মাণী থেকে আবার নতুন দল গঠন ক'রে এসেছিলেন তাঁরাই বর্ত্তমানে সকলের চেয়ে উঁচুতে উঠেছিলেন। ২৪,৪৭২ ফিট্ পর্য্যন্ত এঁরা উঠ্‌তে পেরেছিলেন। হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ অতি ভয়ানক। এর নিকটে যাওয়া সকলের চেয়ে শক্ত। পৃথিবীর সুউচ্চ পর্ব্বতমালার সাতশো গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন জনৈক জার্ম্মাণ, ডাইরেন্‌ফার্থ (Dyrenfurth)। এবারে তাঁর পত্নী ফ্রাউ ডাইরেন্‌ফার্থ একদল উৎসাহী গিরিঅভিযানকারী নিয়ে হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করবার জন্য যাত্রা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন Frank Smythe যিনি গতবারে গিয়েছিলেন। সঙ্গে বিশজন সাথী ছিল। Frank Smythe অবশ্য আরও উঁচুতে ২৫,৪০০ ফিট্ পর্য্যন্ত

উঠেছিলেন। এঁরা কিন্তু এবারে অতদূর উঠ্‌তে পারেন নি। এই হিমালয় অভিযানের সমস্ত বিবরণ তাঁরা যে শুধু বর্ণনা করেছেন তা' নয়—সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচিত্রও তুলে এনেছেন। ৬০,০০০ ফিট্ নেগেটিভ্ ফিল্ম তাঁরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে চারটি ক্যামেরা ছিল, পঞ্চাশজন পাহাড়ী বেয়ারা মালপত্র নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্য বশত স্থানীয় একটি পাহাড়ী বরফের চাঁইয়ের তলায় পড়ে প্রাণ হারায়। পর্ব্বতের চমৎকার দৃশ্য, পথের কষ্ট, গিরিচূড়ার অভিনব সৌন্দর্য্য সবই ছায়াপটে উঠে গিয়েছে। বিলেতের Prince of Wales থিয়েটারে কতকগুলি বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকের সম্মুখে সেদিন এক্‌সেল্‌সিয়র Excelsior বা উচ্চারোহী ব'লে এই ছবিটি দেখান হ'য়েছে। সকলে দেখে মুগ্ধ হ'য়েছেন। এর প্রত্যেক ঘটনা এত বিচিত্র ও সত্য যে দর্শক বা ছবিটি দেখ্‌তে দেখতে অভিভূত হ'য়ে পড়েন। অভিযানকারীদের মধ্যে জার্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়ান, সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী ও ব্রিটেনবাসী চার রকম জাতই ছিলেন। শ্রীমতী ফ্রাউ ডাইরেন্‌ফার্থ এই দলের গৃহকর্ত্রী স্বরূপ ছিলেন। একজন মহিলার পক্ষে এই অসমসাহসিকতার পরিচয় যে কতদূর প্রশংসনীয় তা' সকলেই অনুমান করতে পারেন! Excelsior ফিল্ম্‌টি প্রথমে বিলেতে খুব শিগ্‌গিরই সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হবে। পরে ভারতবর্ষে প্রেরিত হবে।

ফ্যারাডে শত বার্ষিকী—মাইকেল ফ্যারাডের নাম শুধু বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত নয় অবৈজ্ঞানিকেরাও প্রায় অধিকাংশই তাঁকে জানেন। ফ্যারাডে সাহেব ছিলেন কামারের ছেলে কিন্তু একশো বছর আগে এই কর্ম্মকার-পুত্র বিদ্যুত্যের অপূর্ব্ব আবিষ্কার ক'রে বিশ্ব-জগতের এক মহাকল্যাণের পথ আবিস্কৃত ক'রে গেছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁর দান অমূল্য এবং তাঁরই মহাদানের ফলে আমরা আজ হাফটোন্ ছবি তুলতে পারছি, বৈদ্যুতিক বহুজিনিষ নিয়ে নানা কার্য্যে লাগাচ্ছি। ফ্যারাডে সাহেবের মহান্ আবিষ্কারের জন্যই আজ মার্কনির পক্ষে বেতারকে আবিষ্কার করা ও কার্য্যোপযোগী ক'রে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। কেন্‌সিংটনের Royal Albert Hallএ ফ্যারাডে সাহেবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত ক'রে বৈদ্যুতিক আলোক-সম্পাতে সেটিকে আলোকিত করা হয়েছিল। হলটির মধ্যে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রায় দু'শো বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালান হ'য়েছিল। প্রত্যেক বাতিটি ১০০০ এক হাজার বাতির সমান আলোক দেয়। সারা দিবারাত্র বাড়ীটির ভিতর বাইরের সূর্য্যালোক যাতে না প্রবেশ করে সে জন্য সবিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। সমস্ত হলটি ঠিক দিনের আলোকের মতই উজ্জল হ'য়ে উঠেছিল। ফ্যারাডের প্রতিমূর্ত্তির কাছে তাঁর ব্যবহৃত পুরোণো coil (জড়ান তার) রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর একপাশে ব্রিটিশ বেতার কোম্পানির (Transmitter) নতুন একটি বেতার প্রেরক যন্ত্র সাজিয়ে রাখা হ'য়েছিল। তা'ছাড়া গ্রীড্ systemএ বৈদ্যুতিক সঞ্চালন যে রকম হয় (যার প্রথম উদ্ভাবনকর্ত্তা ফ্যারাডে সাহেব) সেটির সমস্ত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা সেখানে প্রদর্শনীর জন্য ছিল।—এই বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেশ এবং বিদেশ থেকে বহু মনীষি এলবার্ট হলে উপস্থিত ছিলেন। ১লা অক্টোবর ফ্যারাডে-স্মৃতি-প্রদর্শনী শেষ হ'য়ে গিয়েছে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে এলবার্ট হলে প্রত্যহ প্রায় গড়ে ৪০০০ হাজার লোকের সমাগম হত। এই প্রদর্শনী দেখতে শুধু স্কুলের ছেলেই এসেছিলেন সবশুদ্ধ প্রায় ১৯০০০। একজিবিশন-সাব-কমিটীর চেয়ারম্যানের হিসাবে প্রকাশ যে একজিবিশনের কর্ত্তাদের পপুলার সায়েন্স সম্বন্ধে অন্ততঃপক্ষে দেড়লক্ষ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। এতেই বোঝা যায় ও সব দেশের লোকের জানবার আগ্রহ কতখানি।

পরলোকে মহাত্মা এডিশনঃ—বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কর্ত্তা আমেরিকার বিজ্ঞানবিৎ এডিশন কিছুদিন আগে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুরাশী বছর। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই তিনি দেহে শক্তির অভাব বোধ কর্চ্ছিলেন বলে কর্ম্ম-জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তার পরেই তিনি অসুখে

পড়েন এবং কয়েক দিন মাত্র রোগ ভোগের পরই তাঁর মৃত্যু হয়। বর্ত্তমান সভ্য জগতের মানুষ যে সব সম্পদের অধিকারী তার অধিকাংশই তাঁর দান, সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে সারা সভ্য জগৎ আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে কচ্ছে। বর্ত্তমানে তাঁর স্থান পূরণ করবার মত দ্বিতীয় কেউ জগতে নেই।

অক্লান্তকর্ম্মা এডিশন ছিলেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর সুদীর্ঘ আশী বৎসরের জীবনে তিনি কত বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দিয়ে সহস্র বাধা অতিক্রম করতে করতে কেমন করে মানুষকে একটি একটি করে অসংখ্য অতুলনীয় সম্পদে বিভূষিত করেছেন তা ভাবলে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যেতে হয়।

তিনি সবশুদ্ধ এক হাজারটিরও বেশী—তাঁর নতুন আবিষ্কৃত জিনিষ patent করিয়ে নিয়েছেন, পৃথিবীর আর কোন লোকই যা আজ পর্য্যন্ত পারে নি। প্রথম জীবনে তিনি একখানি Trainএ সামান্য News Boy ছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই তাঁর মধ্যে উচ্চাভিলাষ এবং চেষ্টা ছিল অসাধারণ। সেই ট্রেণের সংলগ্ন একখানি কামরায় তাঁর এক ল্যাবরেটারী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ছিল। সেখানে আবার তিনি একটা Press স্থাপন করেন। সেই Press থেকে Weekly Herald বলে একখানি কাগজ তিনি বার করতেন। এই কাগজের সংবাদসংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে—তা ছেপে বিক্রী করা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ তিনি একা করতেন। তারপর তিনি নিজের চেষ্টায় ক্রমশঃ উন্নতি করেন। তাঁর ল্যাবোরেটারীতে বসেই তিনি Automatic Telegraph, Remington Typewriter প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক ৫৪ বছর আগে তিনি গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন।

বিদ্যুতের শক্তিকে সর্ব্ব রকমে কাজে খাটানোর উপায় আবিষ্কার করে তিনি মানুষের মস্ত উপকার করেছেন। Incandescent Bulb আবিষ্কার করে তিনি ইলেক্ট্রিক লাইট জালানো সম্ভবপর করে তুলেছেন। তাছাড়া current তৈরী, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী তৈরী প্রভৃতি কতরকমের আবিষ্কার যে তিনি করেছেন তার আর সংখ্যা নেই। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি এক torpedo আবিষ্কার করেন। তাছাড়া যুদ্ধ-জাহাজ, সাবমেরীন প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নানা জনহিতকর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। পরিশ্রম করতেন তিনি অসাধারণ। কাজের মধ্যেই ছিল তাঁর একমাত্র আনন্দ। পরিশ্রমের ওপর তার এতখানি বিশ্বাস ছিল যে "প্রতিভা জিনিষটা আর কিছুই নয়, শতকরা এক ভাগ প্রেরণা আর ৯৯ ভাগ স্বেদ জলের সংমিশ্রণ যেখানেই হয়েছে সেখানেই পাওয়া যাবে প্রতিভার সন্ধান।"

চিত্রগুপ্ত

——o——

পুস্তক-পরিচয়

সন্ধানঃ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্-এ, বি এল্ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক যে চিন্তাশীল পাঠক তাঁর এ বই পড়তে নিয়ে বারে বারে মনে জেগেছে। তাঁর গভীর জ্ঞানতৃষ্ণা দেখে আমাদের মনে আনন্দ সঞ্চার হয়। এবং এই জন্যে তাঁর লেখা আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে এই ধরণের বইয়ের পাঠকের সংখ্যা নেহায়েতই মুষ্টিমেয়। Amiel's Journals খুব বেশী লোকে পড়ে না তাতে দুঃখ করবার কিছুই নেই।

বর্ত্তমান আলোচ্য বইও অমিয়েলের বইএর মত, মনে হয় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে এ গ্রন্থ রচিত। সন্ধানের সঙ্গে জার্নালের পার্থক্য এই যে শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রকুমার একটু উগ্র ও রুক্ষভাষায় তাঁর সমাজ ও ধর্ম্মের মূঢ়তাকে আক্রমণ করেছেন,—বহুদিনকার প্রা সামাজিক বিধি বিধানের প্রতি রুদ্র দণ্ড নিক্ষেপ করেছেন। নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাঁর লেখার অনেক জায়গায় স্ফূর্ত্তিলাভ করেছে।

অনেক জায়গায় অনেক বিষয়ে সকলে গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হ'তে পারবেন না তবুও তাঁর মতামত অকুণ্ঠিত

চিত্তে শুনতে কোনই দ্বিধা করতে মন চাইবে না। এইজন্য তাঁর বইখানা পড়ে পাঠক বিমল আনন্দলাভ করবেন।

গ্রন্থখানি বাঙ্গলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে।

জরীন কলম

'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বঙ্কিমচন্দ্র—

মৌলভী একরামদ্দিন

সমালোচনার বই। ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন, বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমালোচনা লিখিয়া "অর্থলাভ না হইলেও খ্যাতিলাভ যথেষ্ট হইয়াছিল।" লেখকের নিজের যখন ধারণা তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তখন আমরা না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। "কৃষ্ণকান্তের উইল বি, এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়" আলোচ্য বইখানি লেখা হইয়াছে। সেবারের অলব্ধ বস্তুটি যদি ইহাতে লাভ হয় তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, আপত্তি কেবল তাঁহার অনেকগুলি অযৌক্তিক কথায়—

"রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপন্থী কোন কোন লেখক গদ্যসাহিত্যে শুধু কথ্যভাষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।" রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রপন্থীরা যে শুধুই কথ্যভাষা চালাইতে চান ইহা সত্য নহে।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন পুরাতনপন্থী এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নব্যপন্থী। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।" ইহা স্বীকার্য্য নহে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার উভয়েই পুরাতনপন্থী, উভয়ের ভাষাই সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বড় জোর এই পার্থক্য নিরূপণ করা যাইতে পারে যে অক্ষয়ের রচনারীতি অত্যন্ত logical কিন্তু বিদ্যাসাগরের কিঞ্চিৎ কাব্যগন্ধী। বঙ্কিমচন্দ্র সাধু ভাষার সহিত কথ্যভাষার সংমিশ্রণ করিয়া ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্পাদন করেন। আলালী ভাষা এবং বিদ্যাসাগর-অক্ষয়ের ভাষার মধ্যগা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা।

লেখকের অভিমত দেখিতেছি, বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রের তুলনায় "বর্ত্তমান ঔপন্যাসিকগণের চরিত্র তুচ্ছ ও নগণ্য।" কিন্তু অতিভক্তির আবেগে অবান্তর বিষয়ে ফাঁপাইয়া লিখিলে তাহাকে আর যাই হোক সমালোচনা বলা চলে না।

অন্যবিধ ভুলেরও অসদ্ভাব নাই। Wordsworthএর ৫ লাইন তুলিতে গিয়া অন্ততঃ ৫টা ভুল হইয়াছে এবং এমন দাঁড়াইয়াছে যে মানে হয় না।

কিন্তু এই সূচনা অংশ বাদ দিয়া কৃষ্ণকান্তের উইলের চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম তাহাতে "পাঠার্থীদের উপকার হইবে" বলিয়া বিশ্বাস করি।

শ্রীমনোজ বসু

শয়তানের সুমতি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এ[illegible] প্রণীত। মূল্য বারো আনা। প্রকাশক—আশু[illegible] লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এই শিশু-পাঠ্য ক্ষুদ্র উপন্যাসটি শিশু-চিত্তকে [illegible] করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শিশু-সাহিত্য যখন শি[illegible]গণকে আনন্দ দান করিবার সহিত তাহাদের কল্পনা-বৃত্তি[illegible] প্রবুদ্ধ করে তখনই বুঝিতে হইবে তাহা সর্ব্বতোভাবে স[illegible] হইয়াছে। শিশুদিগকে জ্ঞানদান করিবার প্রধান উ[illegible] হইতেছে তাহাদের মনে কৌতূহলপরায়ণতা, সহানুভূ[illegible] চিন্তাশীলতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি জাগাইয়া তোলা। শি[illegible] চিত্তের সেই বাতায়নগুলি উন্মুক্ত হইলে জ্ঞানের রশ্মি সহ[illegible] প্রবেশ-পথ পায়। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর রচনার সেই গুণটি অ[illegible] —ইহা আমরা পূর্ব্বেও লক্ষ্য করিয়াছি।

উপন্যাসখানি সচিত্র,—সুতরাং সে দিক দিয়াও শি[illegible] চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে।

স্নেহের-দাবী—শ্রীনিধিরাজ হালদার প্রণী[illegible] মূল্য এক টাকা চার আনা। প্রকাশক—বি[illegible] সাহিত্য ভবন; ১০।এ, ফকির হালদার লেন, কালীঘ[illegible] কলিকাতা।

এখানি একটি উপন্যাসের বই। গ্রন্থ-সূচনায় প্র[illegible] সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন বলিয়াছেন, "আমি [illegible] উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া নবীন লেখকের প্রশংসা করিতে[illegible] এবং আমার মনে হয় পাঠক-পাঠিকাগণও আমার স[illegible] একমত হইবেন।"

সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকার যে নবীন তাহাতে সন্দেহ না[illegible] আমরা যতদূর অবগত আছি, এই উপন্যাসখানিই তাঁ[illegible] প্রথম উপন্যাস, সুতরাং টেক্‌নিকের দিক দিয়া উপন্যা[illegible]খানিতে কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ে। নবীন লে[illegible]কেরা যদি তাঁহাদের রচনাগুলিকে কিছুদিন ফেলিয়া রা[illegible] পরে পরিশোধনে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে এই ধরণের ত্রু[illegible]গুলা তাঁহারা নিজেরাই লক্ষ্য করিয়া সংশোধিত ক[illegible] লইতে পারেন। নিবিড়তর সাধনার দ্বারা নিধিরাজবাবু ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিবেন—এ আশা আমরা করি।

বইখানির কাগজ ও বাঁধাই ভালো।

নানা কথা

সাময়িক সাহিত্য-আলোচনা

সাময়িক সাহিত্যের-আলোচনা করার প্রবৃত্তি সকল দেশেই আছে। সেটা যে ভালোই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক কিম্বা পাক্ষিক পত্রিকাগুলির পাতায় পাতায় অবিশ্রান্ত যে-সব সাহিত্য-রস বিতরণ করা হয়, তার মধ্যে কোন্‌গুলি গ্রহণীয়, কোন্‌গুলি বর্জ্জনীয়,—তার নিরপেক্ষ আলোচনা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। কোনো বিশেষ যুগে দেশের আব্‌হাওয়ার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো কাব্যে ও কথা-শিল্পে রূপ গ্রহণ করবার জন্য যে প্রতিভাকে আশ্রয় করে,—দু' একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ শিল্পীর কথা বাদ দিলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই প্রতিভা বিকশিত ও পরিপুষ্ট হ'য়ে নিজের পথটি ঠিক বেছে নেবার জন্য এই সমস্ত আলোচনার আলোক-সম্পাত ও রস-সিঞ্চনের অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে আজকাল এই সাময়িক সাহিত্যের আলোচনাটা যে ধরণে ও যে-ধারায় করা হয়,—তাতে করে সেটা তার এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে একেবারেই নিরর্থক হ'য়ে যায়। সেটা যেন নিতান্তই আমরা যাকে অবজ্ঞাভরে বলি "পরচর্চ্চা,"—তাইতে এসে দাঁড়িয়েছে। "পরচর্চ্চা" জিনিষটা কিন্তু আসলে খারাপ নয়; পরের 'চর্চ্চার' ভিতর দিয়েই আমরা 'আপনা'র বাইরে এসে পরের মধ্যে নিজেরই বৃহত্তর ঐক্যের অনুসন্ধান করি। কিন্তু এই 'পরচর্চ্চা' প্রবৃত্তির অপব্যবহার করলে সেটা মানুষের যে কতখানি নিন্দনীয় অভিব্যক্তিতে পরিণত হ'তে পারে,—তা' আমাদের সকলেরই জানা আছে, বিশদ ক'রে দেখানোর প্রয়োজন নেই। এই পরচর্চ্চার ব্যবসায়ে বিশেষ করে ধরা পড়েছেন অন্তঃপুর-বাসিনী মেয়েরা; কিন্তু সাহিত্যের নাম দিয়ে মুদ্রাযন্ত্র সহযোগে সাধারণতঃ যে আলোচনা হ'য়ে থাকে, সেটা অন্তঃপুরের নিঃশব্দ নথ-নাড়া ও চুড়ির কিঙ্কিনী সহযোগে আলোচনার চেয়ে কম নিন্দনীয় নয়। দুটিই একজাতীয়,—দু'য়েতেই আছে,—বেঁচে থাকার একটা অভিব্যক্তি,—দু'য়ের মধ্যেই আছে সেই বেঁচে-থাকা-টাকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলবার শক্তির অভাব; এই শক্তির যখন অভাব পড়ে, তখন বেঁচে থাকার স্ফূরণ হয় গ্লানি-জনক পরচর্চ্চার মধ্যে, এবং ঔদ্ধত্যের আবরণে দৈন্যকে হয় ঢাকা।

কিন্তু এজন্য দুঃখ করে লাভ নেই। জীবন যতদিন আছে, ততদিন জীবনে শুধুই সন্তোষ নয়, গ্লানিও থাকবে, শুধু প্রাচুর্য্য নয় অভাবও থাক্‌বে,—শুধুই তৃপ্তি নয়, অতৃপ্তিও থাক্‌বে। জীবনে আমরা ভালোও বাসি, মন্দও বাসি, ক্ষমাও করি, সাজাও দিই, ঝগড়াও করি, [illegible] করি; সর্ব্বত্রই বিরুদ্ধ বৃত্তির দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে জীবনের বিকাশ। এই সমস্ত বিরুদ্ধ বৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হ'য়েই তার সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ যুগে যুগে যা' গড়ে তুলছে,—তারই নাম সভ্যতা (civilisation)। আর যুগে যুগে মানুষের সাহিত্য ও শিল্পই তার এই সভ্যতাকে অমরতা দান করে। সাহিত্যে মানুষ তার গোপনতম সত্তাটিকে অনুসন্ধান করে বাইরে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়; এইখানে তার জীবনের একদিকের বিকাশ আনন্দে অন্যদিকের বিকাশ বেদনায়। এই আনন্দ-বেদনার দোলায় সে হ'য়ে ওঠে সৃষ্টি-কর্ত্তা,—তার ক্ষুদ্রত্বকে অতিক্রম করে মহীয়ানের স্পর্শলাভ করে। তাই সমালোচনার মুখোস প'রে এই সাহিত্যকে যখন টেনে আনা হয় জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলির চরিতার্থতার জন্য, তখনই সেটা ক্ষোভের কারণ হ'য়ে ওঠে।

আজকাল আমাদের দেশে, কোথা থেকে রস পেয়ে জানি না,—বন্য আগাছার মত নিত্যই এক একটা সাময়িক-

পত্রিকা গজিয়ে উঠে সাময়িক সাহিত্যের যে-সব আলোচনা করে থাকে সে-সব আলোচনা আর যা-ই হোক্ না কেন,—সাহিত্য-আলোচনা নয়। কিন্তু তাতে কারো কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই; তার কারণ, সেই সব পত্রিকার পাঠক-সংখ্যা তাদের লেখক-সংখ্যার মতই পরিমিত; তাদের পরিসর অন্তঃপুরের পরিসরের চেয়ে প্রশস্ততর নয়। তাই তাদের অসার আলোচনাগুলোকে সাধারণ জীবনেরই অন্যতম অভিব্যক্তি বলে ধরা যেতে পারে; জীবনে মহীয়ানের স্পর্শ লাভ করবার জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে মানুষের যে চেষ্টা, তার মধ্যে সেগুলো পড়ে না।

কিন্তু যাঁদের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-আলোচনার ক্ষমতা আছে তাঁরা যখন সমালোচনার উচ্চ আদর্শ থেকে নেমে আসেন, তখন একটু প্রতিবাদ করার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের মধ্যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সেই শক্তির অপব্যবহার করলে কোনো লাভ হয় না, এ কথা বলাই বাহুল্য। বৃথা আন্দোলনের ফলে কেবল গ্লানিরই সৃষ্টি হয়, সেই গ্লানিতে মানুষের স্বচ্ছ দৃষ্টি ব্যাহত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী যে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' লিখেছিলেন,—তা' পড়ে, দেখ্‌লাম, 'শনিবারের চিঠি' ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছেন। প্রমথ বাবু লিখেছিলেন, "বাংলায় যদি রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হ'তেন ত আজকের দিনে বাংলায় সাহিত্য বলে কোনো জিনিষ থাক্‌ত না, যেমন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নেই"। এ উক্তির যে অর্থ,—তার প্রতি, উক্তিটির শেষের দিকে বেশ স্পষ্টই ইঙ্গিত আছে,—"**যেমন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নেই**"। অর্থাৎ বাংলার যে-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে তার আসনটি সগৌরবে দাবী করছে, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হ'লে সে-সাহিত্যের সৃষ্টি এত শীঘ্র সম্ভব হ'ত না,—যেমন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে সম্ভব হয় নি। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে? এর মধ্যে বঙ্কিম মাইকেল প্রভৃতি সাহিত্য-মণীগণের প্রতি অশ্রদ্ধার ক্ষীণতম ইঙ্গিতটুকুও ত পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথই বাংলা-সাহিত্যের আদি-পুরুষ, প্রমথবাবু নাকি বড় গলায় এই কথা ঘোষণা করেছেন। এমন কোনো ঘোষণা আমাদের কানে ত পৌঁছল না। এ ঘোষণা প্রমথবাবু কবে কোথায় করলেন? বিংশ শতাব্দীতে কেউ কোনো সভ্যজাতির সাহিত্যের আদি পুরুষ হ'তে পারেন কি? যে-কথা প্রমথবাবু কখনো বলেন নি বা বল্‌তে চান্ নি, সেই কথা তাঁর মুখে বিনা কারণে আরোপ করে কটূক্তি করাটা নিতান্তই গায়ে পড়ে ঝগড়া করা নয় কি? কোনো রচনার প্রতিপাদ্য সারবস্তুটির প্রতি লক্ষ্য না রেখে, তার spiritটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে, তার প্রতি কথাটির ইচ্ছামত অভিধানগত অর্থ করে নিতে চান যে-সব সমালোচক, তাঁদের কটূক্তি থেকে বোধ হয় কোনো লেখকই নিষ্কৃতি পেতে পারেন না, তাঁদের কৃপাদৃষ্টির ওপর ভরসা না করে। এ ধরণের আলোচনার সাহিত্য-জগতে কোনো মূল্যই নেই।

'শনিবারের চিঠি'র সমস্ত আলোচনাই যে এই রকম তা' আমরা বল্‌তে চাই না। আমাদের বক্তব্য এই যে এই রকম গায়ে পড়ে ঝগড়া করার প্রবৃত্তিটা যদি 'শনিবারের চিঠি' জয় করতে পারেন, তবেই সাহিত্য-জগতে তার আলোচনার মূল্য থাকবে।

* * *

এ কথা স্বীকার করি আমাদের বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমালোচনার কাজটা তেমন প্রীতিকর হ'তেই পারে না। এমন সমস্ত জিনিষ সরবরাহ হ'চ্ছে, যার প্রতি তীব্র কষাঘাত না করে উপায় নেই। কিন্তু ঠিক সেইজন্যই আমাদের সমালোচনার আদর্শটা অতি উচ্চ স্তরে রাখা প্রয়োজন। বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে হ'লেও যদি কোনো লেখার কোনো একটা গুণও থাকে, ত তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত; সেই একটা গুণের চর্চাতেই সহস্র দোষের নিবারণ সম্ভব হ'তে পারে। তাছাড়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে হ'লেই যে অশিষ্ট ও রূঢ় ভাষা ব্যবহার করতে হ'বে, তারও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কোনো কোনো সময়ে ব্যঙ্গ করাটা বিরুদ্ধ সমালোচনার একটা প্রকৃষ্ট উপায় বটে, কিন্তু সেই ব্যঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দরদ ও বেদনা থাকা চাই,—যেমন ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গানে'।

* * *

প্রশংসা করে কোনো বইয়ের সমালোচনা করা সহজ। নিন্দা করে সমালোচনা করতে হ'লেই মুস্কিল। কোনো লেখক যদি এমন কোনো বই লেখেন সাহিত্যে যার স্থান হ'তে পারে না, তবে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর যতই অপরাধ হো'ক না কেন, মানুষ হিসাবে তাঁর কোনোই অপরাধ হয় নি। তাঁর লেখার বিরুদ্ধ-সমালোচনার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধটা যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে সেটা সমালোচকের অক্ষমতাই বল্‌তে হ'বে। সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে,—সাহিত্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও যা-কিছু নিকৃষ্ট তারই একটা সহজ-বোধ সাধারণ পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলা; একটা সাহিত্যিক মূল্য-বোধ এমন ভাবে গড়ে তোলা, যাতে করে, যা-কিছু নিকৃষ্ট, সাহিত্যে তার কোনো স্থান হওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

বিরুদ্ধ সমালোচনা-পদ্ধতির একটা আদর্শ পেলাম, কার্ত্তিক সংখ্যা 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্তের 'লঘু-গুরু' বই খানির রবীন্দ্রনাথ যে-সমালোচনা করেছেন তারই মধ্যে। 'লঘু-গুরু' বই খানি আমরা পড়ি নি,—কিন্তু সমালোচনাটা পড়ে বইখানির যে পরিচয় পেলাম, সেইটুকুই যথেষ্ট,—ও-বই পড়বার আর প্রয়োজনও নেই। তাই বলে লেখকের রচনা-নৈপুণ্য যে আছে সেকথা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। শুধু বলেছেন, "রিয়ালিজ্‌মের পালা সস্তায় জমাবার প্রলোভন" তাঁকে ত্যাগ করতে হ'বে। এ-সমালোচনায়, বইখানি ভালো নয়,—এই টুকুই যে শুধু বুঝ্‌লাম তা নয়, সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ তারও একটা ধারণা মনের মধ্যে আকার গ্রহণ করল। একটা কথাতেই বুঝ্‌তে পারলাম যে সাহিত্যে idealistic ও realistic এই ছুটি শ্রেণীর পার্থক্য নিয়ে যে মারামারি করা হয়, একের নিয়ম অন্যে খাটে না, ইত্যাদি যে অসংখ্য বাদানুবাদ করা হয়,—তা একেবারেই নিরর্থক, কেবলই সমালোচনার স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আড়াল করে রাখে। "কোনটারই জাতিগত বিশেষ মর্য্যাদা নেই। সাহিত্যে সম্মানের অধিকার বহি-র্নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী নিয়ে নয়, অন্তর্নিহিত চরিত্র নিয়ে।...চন্দনের তিলক যখন চল্‌তি ছিল তখন অধিকাংশ লেখা চন্দনের তিলকধারী হ'য়ে সাহিত্যে মান পেতে চাইত। পঙ্কের তিলকই যদি সাহিত্যসমাজে চল্‌তি হ'য়ে ওঠে তাহ'লে পঙ্কের বাজারও দেখ্‌তে দেখ্‌তে চড়ে যায়। বঙ্গবিভাগের সময় দেশী চিনির চাহিদা বেড়ে উঠ্‌ল। ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলে বিদেশী চিনিকে মাটি মিশিয়ে দেশী করা সহজ।... সাহিত্যেও মাটি মেশালেই রিয়ালিজ্‌মের রং ধরবে, এই সহজ কৌশল বুঝে নিতে বিলম্ব হয় নি।" রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে কল্পনাকে অলস রেখে শস্তা সাহিত্যের ব্যবসা চালালে সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি হ'বে—এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করে এই সমালোচনাটিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

* * *

সাহিত্য-প্রতিভাকে যে-দিকে পরিচালনা করবার ইঙ্গিত এই সমালোচনাটিতে আছে,—আমাদের তরুণ লেখকেরা তাঁদের প্রতিভাকে সেই দিকে চালনা করবেন কি? অরিজিন্যালিটির স্পৃহা, চমক লাগাবার মোহ,—বাইরে থেকে এই সমস্ত জিনিষের আমদানি করলে সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি করা হ'বে। অরিজিন্যালিটি যদি থাকে, সেটা ফোটাবার জন্য কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না; বরং সচেতন ভাবে এই দিকে কোনো চেষ্টা করলেই যেটা ফুটে ওঠে, সেটা আর যা-ই হো'ক না কেন, অরিজিন্যালিটি নয়। কল্পনার অবাধ বিস্তার,—সাহিত্য-প্রতিভা যাঁর আছে,—তাঁর এইটেরই চর্চ্চা করা প্রয়োজন। সৃষ্টি-শক্তির স্ফূরণ হয় সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলার কাজে, কুৎসিৎকে নয়। জীবনে অনেক কিছু কদর্য্যতা চারদিকেই ছড়ানো আছে; সেই গুলোকে কুড়িয়ে আন্‌লেই সাহিত্য হয় না। কুৎসিৎকে যদি সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তবে বেদনা দিয়ে তাকে সুন্দরের পটভূমিতে তুলে ধরতে হবে; আঘাত দিয়ে আমাদের সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিকে সুস্পষ্ট করা,—এ ছাড়া কুৎসিতের অস্তিত্বের অন্য কোনো সার্থকতা নেই।

* * * *

এই সব কথা ভাবলে যে-সত্যটাকে ঠেকানো যায় না সেটা হ'চ্ছে এই যে য়ুরোপের সাহিত্য বাংলার তরুণ মনকে যে খাদ্য জুগিয়েছে, সে খাদ্য বোধ হয় এখনো

তাদের রকম পরিপাক হয় নি। তাই সে মন এখন যে-সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করছে, তার মধ্যে সৃষ্টির সহজ আনন্দের চেয়ে উগ্রতা ও মাদকতাই বেশী করে চোখে পড়ে। মনে পড়ে সবুজ-পত্রের সেই প্রথম যুগের কথা,—যখন রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলার তরুণ মন আত্মপ্রকাশের জন্য একটা নতুন ও সহজ পথ আবিষ্কার করেছিল। বাংলা ভাষার সেই নতুন ভঙ্গির প্রবর্ত্তনায় বাঙালী প্রতিভার যে স্ফুরণ হ'য়েছিল তা যেমনি সতেজ [illegible] আজ সেই "প্রামথী" ভাষা বাংলা সাহিত্যে আসন [illegible] থাকবার জন্যই এসেছে,—নড়বার নামটি করে না,—তার বিরুদ্ধে যতই আন্দোলন-কথা হোক না কেন। ভাব-প্রকাশের জন্য এমন জড়তা-বিহীন, সহজ, সতেজ, স্ফূর্ত্তিবান [illegible] বাঙালী এ যুগে আর কোথায় পাবে? আজ [illegible]কার তরুণ-সাহিত্যিকেরা, রিয়ালিজমের ধুয়ো ছেড়ে দিয়ে, অরিজিন্যালিটি চমক-লাগানো প্রভৃতির মোহ-পাশ কাটিয়ে উঠে, সকল রকম গ্লানি ও মাদকতা থেকে মনকে [illegible] নিয়ে,—এই সহজ, সতেজ ভাষার আশ্রয় নিয়ে [illegible] করবার চেষ্টা করবেন কি? নতুন ত্রৈমাসিক [illegible] 'পরিচয়' [illegible] দিকে কোনো লক্ষ্য না রেখে [illegible]-সাহিত্য-প্রচারের জন্য যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ [illegible] এই দিকে আমাদের মনে কিছু আশার সঞ্চার [illegible] কার্ত্তিক সংখ্যা 'পরিচয়ে' গৌরবের বস্তু আছেও [illegible]—কিন্তু সে সবটুকুর জন্যেই সবুজ-পত্রের সেই লেখকদের [illegible] ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই।

* * * *

শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য

বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্যের [illegible] অপরিচিত নয়। তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ বিচিত্রায় [illegible] মাঝে প্রকাশিত হয়েছে।

ভবানীবাবু একজন প্রতিভাবান লেখক,—কিন্তু সে [illegible] বাঙলা ভাষাতেই নয়, ইংরাজি ভাষাতেও। তাঁর লিখিত [illegible] প্রবন্ধ বিলাতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রে উচ্চ [illegible] Empire Review-এ তাঁর লিখিত গল্পের, Manchester Guardian-এ শব্দ-চিত্রের Spectator-এ আলোচনার যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে। বিলাতে কোন সুবিখ্যাত প্রকাশক কর্ত্তৃক ভবানীবাবুর ইংরাজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা" শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য

বাঙলা দেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত দেশের উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজনারায়ণ দত্ত, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শশীচন্দ্র দত্ত, নবকৃষ্ণ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্ত্তী যুগে এ রীতি ক্রমশঃ কমে এলেও তরু দত্ত, অরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা চলে। বর্ত্তমানকালে ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা যাঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শীর্ষস্থানীয়

—তৎপরে সরোজনী নাইডু, হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কমে আছেন। সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষার সম্পদ এবং শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষা অনুশীলনের দিকে দেশের শিক্ষিত লোকের মন ফিরেছে এবং সেই কারণেই ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য সেবার আগ্রহ কমে গেছে। তা ছাড়া সম্ভবতঃ এটাও বোধ হয় দেখা গিয়েছিল যে, ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা ইংরাজি সাহিত্যে স্থায়ী স্থান পাওয়া বাঙালীর পক্ষে সুকঠিন ব্যাপার, সুতরাং ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ কোনো সার্থকতা নেই। কথাটা অনেকাংশে সত্য হলেও—বাঙালীর পক্ষে ইংরাজি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো সম্ভাবনাই নেই, এবং সে দিকে সাধনা অসমীচীন, একথা চলে না। ভবানীবাবু সেই দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হয়েছি তাঁর রচিত একটি ইংরাজী উপন্যাস বিলাতের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। উপন্যাসখানি লণ্ডনের কোনো প্রসিদ্ধ প্রকাশকের দ্বারা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ভবানীবাবুর ইংরাজি সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা সিদ্ধি লাভ করলে আমরা আনন্দিত হব।

ভবানীবাবুর বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স গ্রাজুয়েট—ইতিহাসে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দেশে ফিরেছিলেন—পুনরায় বিলাত গিয়েছেন, সেখান থেকে Doctor of Philosophy হ'য়ে দেশে প্রত্যাগমন করবেন।

আমরা ভবানীবাবুর মঙ্গল কামনা করি।

শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাশ

শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাশ

বর্ত্তমান বৎসরে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাশ ভারতীয় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। শ্রীযুক্ত নবগোপাল কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস্-সি পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং বি এ পরীক্ষায় ইকনমিক্সের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। All India Essay Competition for the Viceroy's Medals পরীক্ষায় নবগোপাল Best man's Prize লাভ করেছেন। এ বিষয়ে বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং এ পর্য্যন্ত অদ্বিতীয়। The League of Nations বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখে

[illegible] ১৯২৯-৩০ সালের আরউইন্ সুবর্ণ পদক লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাশ সাহা সমাজের লোক। জাতি অথবা সমাজ যে উচ্চশিক্ষা লাভ বিষয়ের নিরূপক নয়— তিনি তার প্রমাণ। [illegible]জাত বাধা অথবা সুযোগের কোনো কথা যদি না থাকে তা হ'লে তথাকথিত ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের পক্ষে জ্ঞানের পথ যে একই মাত্রায় সুগম অথবা [illegible] সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]গোপালের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা [illegible]

[illegible]সম্মেলন

[illegible] সম্মেলনের পরিচালক সমিতি ও [illegible] শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ [illegible] অবগতির জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বিচিত্রায় [illegible]

"প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন এই বৎসর বড়দিনের অবকাশে প্রয়াগে হইবে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীলালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।"

* * * *

ত্রুটি স্বীকার

(১) কার্ত্তিক-সংখ্যায় যে গীত-উৎসবের ছবিগুলি প্রকাশিত হ'য়েছিল, সেগুলি শ্রীযুক্ত জে, কে, স্যানিয়ালের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছিল,—এই কথাটির উল্লেখ করতে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।

(২) কার্ত্তিক-সংখ্যায় "আগুন নিয়ে খেলা" বইখানির যে-সমালোচনা বেরিয়েছিল, তা'তে প্রকাশকের নাম ভুল ছাপা হ'য়েছিল। ঐ বইখানির প্রকাশক D. M. Library,—M. C. Sarkar & Sons নয়।

[illegible] Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.